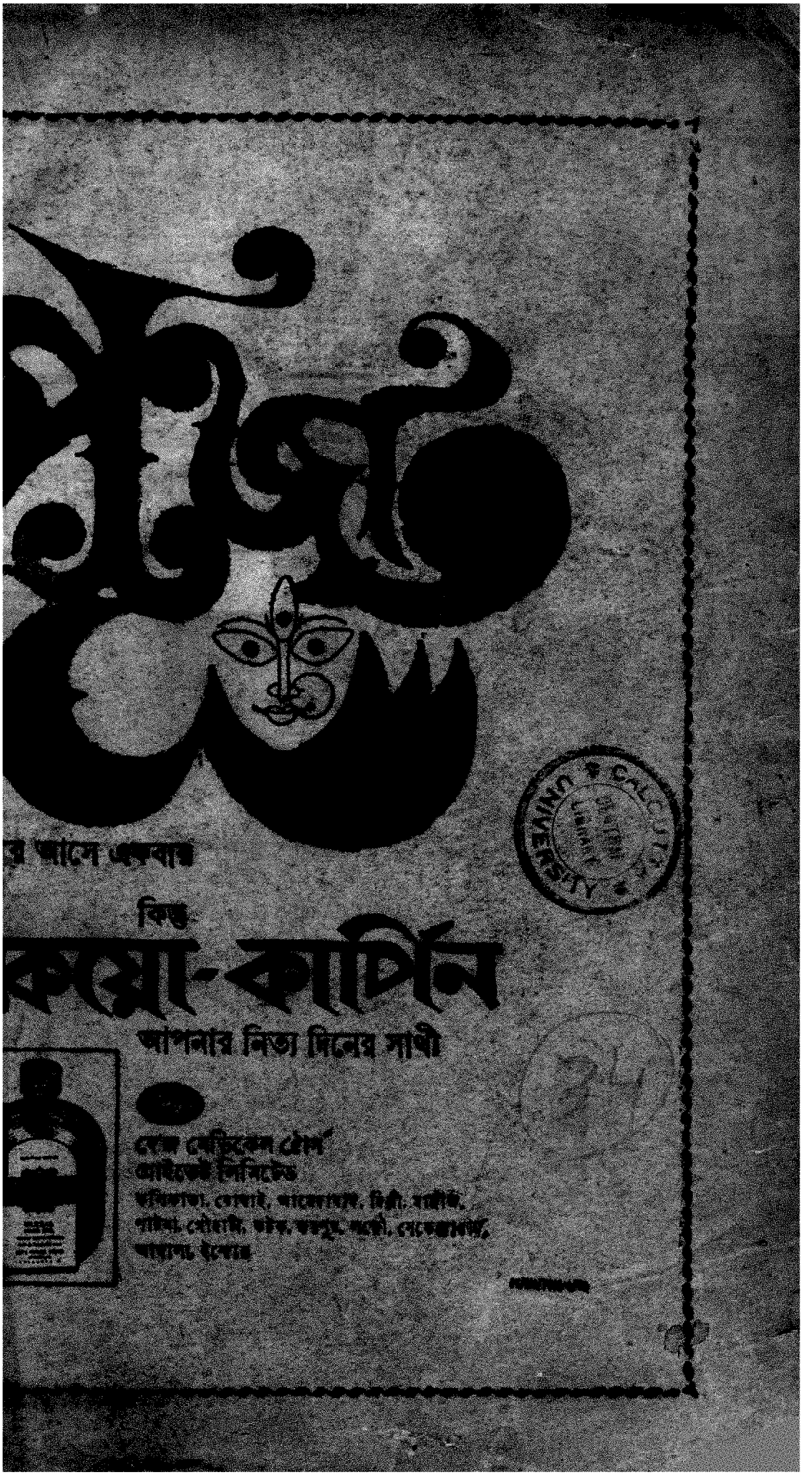
র পাশে এসবার
কিন্তু
কয়া-কার্পিন
আপনার নিত্য দিনের সাথী
রেজ ফেডিকেল ষ্টোর্স
প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা, বোম্বাই, আমেদাবাদ, দিল্লী, মাদ্রাজ,
পাটনা, গৌহাটি, কটক, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, সেকেন্দ্রাবাদ,
আহমদ নগর

আফগান স্নো

সৌ... প্রতিযোগি...

...পুরস্কা...

756.3
003/31

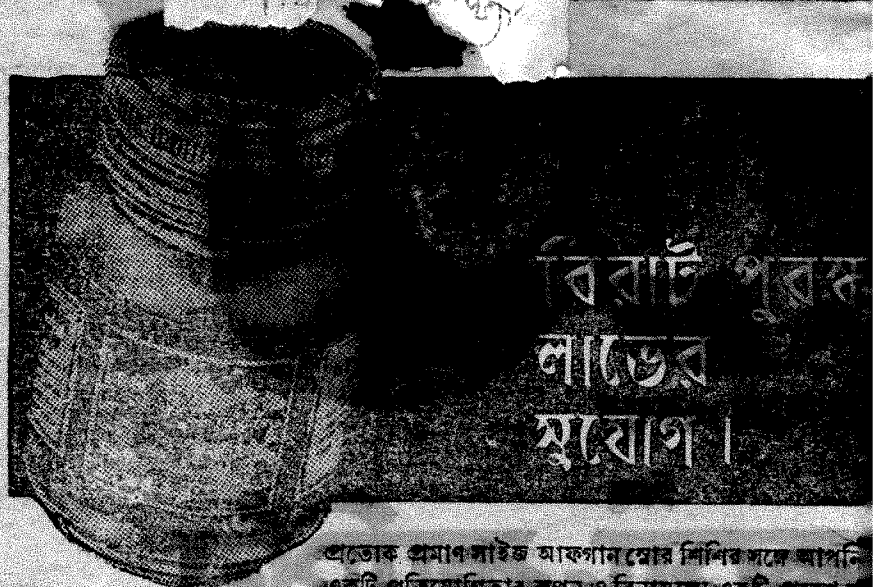

...বিরাট পুরস্ক...
...লাভের
...সুযোগ।

প্রত্যেক প্রমাণ সাইজ আফগান স্নোর শিশির সঙ্গে আপনি... একটি প্রতিযোগিতার কুপন ও বিনামূল্যে একটি প্রবেশ ... প্রবেশ কুপনটি কার্টন অর্থাৎ কাগজের বাক্সের ওপরে... রয়েছে এবং বিনামূল্যের প্রবেশ ফর্মটি বাক্সের মধ্যে প্যাক ... প্রবেশ ফর্মে আমরা আফগান স্নো সৌন্দর্য্য প্রসাধনী স... বাক্য দিয়েছি। সেইসঙ্গে প্রত্যেকটি বাক্যের উত্তর হিসেবে... সম্ভাব্য সমাধান দেওয়া আছে। সঠিক সমাধানটি বেছে নি... বাক্যের পাশে খালি জায়গাটিতে লিখে দিন।

আরেকটি কথা ভুলবেন না! দশটি শব্দের মধ্যে লিখবে... কেন আফগান স্নো সৌন্দর্য প্রসাধনী পছন্দ করেন।

সবসময় আফগান স্নো সৌন্দর্য প্রসাধনী কিনবেন। ওতে... ত্বক কোমল, মসৃণ ও তারুণ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে দিনের...

ই. এস. পতনওয়ালা, ৬২, কনট রোড, বোম্বাই-২৭।

BENGALI

সূচীপত্র

লেখক	পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
		গল্প		
		মোজাইক হাউস	আশাপূর্ণা দেবী	১৫
		চাকা	সুশীল জানা	৫৭
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৩৪		আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	৬১
মনোরঞ্জন হাজরা	১০১	বধূ	সুশীল রায়	৬৫
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	১৪৯	উত্তরাধিকারীরা আসে	সমীর মুখোপাধ্যায়	৬৮
		বনস্পতির মৃত্যু	শক্তিপদ রাজগুরু	৭৩
		কবরী বিচিত্রা	সুভাষ সমাজদার	৭৭
তারচর্চা			আশা দেবী	৮১
সত্যেন্দ্রনাথ বোস	৮	জহুরি	মানবেন্দ্র পাল	৮৭
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	১০	ক্যামেরার সামনে	ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়	৯১
প্রেমেন্দ্র মিত্র	১৪	নিষিদ্ধ ফল		
		অভিনেত্রী	হারেশচন্দ্র শর্মাচার্য	৯৫
		ডানা	বীরেন্দ্র মিত্র	১৭
গোপাল হালদার	১৮৩	সমুদ্র সৈকতে	দেবব্রত মুখোপাধ্যায়	১১৪
অন্নদাশঙ্কর রায়	১৯২	মাছি	ভবানী মুখোপাধ্যায়	১১৯
		নীরদ কিন্তু মরে নি	মনোজ বসু	১৪৩
		মিসেস কুম্ব	লীলা মজুমদার	১৯৩
		বিপথ গমন	রবীন্দ্র গুহ	২০৭
শঙ্করীপ্রসাদ বসু	১৯	যদি কোনোদিন	রজত রায়চৌধুরী	২৫৫

শৈলেশ দে-র

আমি সুভাষ বলছি

...পে বিপ্লবময় বাংলাদেশের
...কাহিনী...বলো, ভারতের
...র বীর সেনানায়ক...বলো,
...তার আকাঙ্ক্ষার মূর্ত বিগ্রহ
...ক্ট চির-বিজয়ী বীর...'বলো
আমরা কান পেতে শুনছি
তুমি বলো।'...

॥ তৃতীয় সংস্করণ ॥
॥ পনের টাকা মাত্র ॥

রবীন্দ্র লাইব্রেরী
...৫।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ :: ফোন : ৩৪-৮৩৫৬

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ব নারী		
আরো কাছে এসো	হরপ্রসাদ মিত্র	২৫
কবিতা		
মেঘ	জসীমউদ্‌দীন	৫৩
এ বড় রংগ তো	বিষ্ণু দে	৫৩
নিয়ন-আলোর ভিতরে	অরুণ মিত্র	৫৩
আমার অস্থির অস্থি		
স্বদেশ আমার	দিনেশ দাস	৫৪
পালাবো কোথায় ?	মণীশ ঘটক	৫৭
ল্যাং	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	৫৪
রক্তে ভাসা মানুষ	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫৩
আজই চৈত্র মাস	গোবিন্দ চক্রবর্তী	৫৫
গন্তব্য আলোর পথে	কিরণশংকর সেনগুপ্ত	৫৫
তিনি হাসলেন পথে		
দাঁড়িয়ে এবার	গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়	৫৫
যেখানে শব্দেরা	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	৫৬
নামা হে	দুর্গাদা	
চিত্ররেখা	শান্তিরঞ	
দারুণ নাছোড়	শান্তনু	
আহত পাখির মত	অপরাজি	
শুধু একটি মূল রহস্য	দেবতোষ	
সংহিতা	সমরেন্দ্র	
অনতিক্রান্ত	অমিয়	
ফাঁসি	বিশ্ব ব	
মন্ত্রবলে	অরুণ ভট্টাচ	
সাঁকো	সুনীলকুমার	
খেলাঘর	বরুণ মজুমদা	
ঝড় উঠলেও	জয়ন্তী সেন	
বিপ্লবী যুগের কথা		
বিপ্লবী জাতীয় আন্দোলনের স্মৃতিকথা	সতীশ	
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্র ও যুবকদের ভূমিকা	অনন্ত	

ইন্টারন্যাশন্যাল
ব্রাণ্ড
বিনীল হারডেস্ট টোনস্
ট্রি ডামটি
ভ্রেসেস্
ভ্রেসেস্ ভলি

পেতে হলে
কিংস্
শ্যামবাজার মোড় • ফোনঃ ৫৫-০৩১৫
সার্টিং শুটিং ও টেরী পোষাকের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে

পূজার বিপুল
নতুন নতুন ডিজা
এবং বস্ত্র ও
সর্বকি

সূচীপত্র

লেখক	পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
		সম্পাদকীয়		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	**কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ**		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

পড়াশুনায় ভালো
খেলাধুলায় চৌকশ
খুব উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ
এর সাইকেল ফিলিপ্‌স্‌

টেম্পার স্টীলে তৈরী
শক্ত-সামর্থ—সব রকম
ফিলিপ্‌স সুন্দর দেখতে—
চেহারা আপনার কা
মনে হবে। আপনাদের
পক্ষে এ অতি অপূর্ব সাই
ফিলিপ্‌স সাইকেল এ

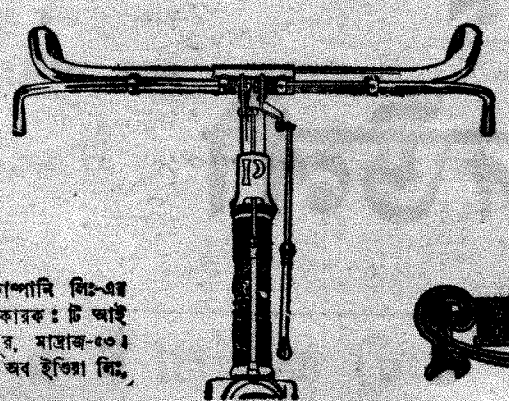

PHILLIPS

®যুক্তরাজ্যের কে. এ. ফিলিপ্‌স কোম্পানি লিঃ-এর রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক। ভারতে প্রস্তুতকারক: টি আই সাইকেল্‌স্‌ অব ইণ্ডিয়া, অম্বাত্তুর, মাদ্রাজ-৫৩। অনুষ্ঠানিকারী: টিউব ইনভেস্টমেণ্টস্‌ অব ইণ্ডিয়া লিঃ, মাদ্রাজ-১, রেজিস্টার্ড ব্যবহারকারী

শারদোৎসব

শহুরে আকাশেও নীলাভাস ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের চুপি চুপি আসা-যাওয়া। ছিঁচকাঁদুনে মুখের ভাবটি রয়েছে, আবার সোনালি রোদে হঠাৎ সে ফিক করে হেসে ফেলে।

শহরে কাশফুল নেই, শিউলি কোথায়? অপরাজিতা বা পুকুর জুড়ে পদ্মফুলও নেই। তবু অলিগলি ঘুরে রাজপথে এসে শরৎ উৎসবের ঘোষণা করে সারা শহরে।

পল্লী বাংলার তৃতীয় ঋতুর সুখের শোভাই বোধহয় কাশ-শিউলি-অপরাজিতা ও পদ্ম। দুয়ারে দুয়ারে কাঙালিনী ভিখিরি মেয়ে শুনিয়ে যায় আগমনী গান।

হায়, পল্লী-প্রকৃতির সে রূপ বুঝি এখন আর নেই। গুচ্ছ গুচ্ছ কাশফুল বিরলদর্শন, শূন্য পোড়া কাশবনে উদ্বাস্তু কলোনী, শিউলির গন্ধ স্বপ্ন-বিলাস, অপরাজিতা দুর্লভ, পদ্মগন্ধে বিভোর হয় না শরতের শিশিরঝরা প্রসন্ন সকাল। জীবন সংগ্রামে আগমনী গান লুপ্তপ্রায়।

এতদ্‌সত্ত্বেও বাংলার বুকে যার অপমৃত্যু নেই, তার নাম শারদোৎসব। এই উৎসব সর্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করে দুঃখের মধ্যে সবার ধরে। আর সে বর্ণ নির্বিশেষে মিলনের মধ্যে

দেশ-বিদেশে বেতার

সত্যেন বোস

বসু বিজ্ঞান মন্দিরে অগ্নিকাণ্ডের খবর বেতারে শুনলাম দিল্লী থেকে। ছাত্রজীবনে অহরহ যে বিজ্ঞান সাধকের সাক্ষাৎ পেলে নিজেকে ধন্য মনে করতাম তাঁরই সৌম্যমূর্তি চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

প্রায় ষাট বছর হতে চললো! প্রেসিডেন্সি কলেজের দোতলার গ্যালারীতে আমরা জুটেছি সকলে—সেদিন! প্রোফেসর বসু তাঁর নিজস্ব অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের কথা বলবেন! সামনের লম্বা টেবিলে সাজান রয়েছে সব যান্ত্রিক সরঞ্জাম! নাম ডাকা শেষ করে খাতাপত্র গুটিয়ে পাশের ছোট কামরায় গিয়ে বসেছেন বরদা-বাবু! এবার এসে উপস্থিত হলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র।

আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনে চলেছি। ম্যাক্সওয়েল তাঁর থিয়োরি থেকে অঙ্ক কষে বলে গেছেন, আলোক তরঙ্গ আসলে চুম্বক ও বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের জড়াজড়ি করে ইথরে যুগপৎ প্রসারণ! এতদিন আসর জুড়ে ছিল ইথরের কথা! বলা হত এটি বিশ্বব্যাপী [illegible]—আলোক তারই তরঙ্গ! তবে [illegible] বুঝাতে ইথরে আ[illegible] নানাগুণ যার সমন্ব[illegible] অসম্ভব ঠেক[illegible]

করলেন হাইনরিক হার্ৎস নিপুণ পরীক্ষা চালালেন, ১৮৮৫-৮৭ সালে। আলোক সহজে আয়নায় প্রতিফলিত হয়! ত্রিশির কাচে আমরা সূর্য-কিরণকে বিচ্ছুরিত করি—লাল থেকে বেগুনীর বর্ণালী ছত্রে বেরিয়ে আসে! এ সব পরীক্ষা আমরা নিজেরাই করেছি কলেজের পরীক্ষাশালায়! বর্ণালী - বিশ্লেষণ - ব্যতিচার-প্রতি-ফলন সবই চলে Specto-Meter এর উপর! ছোট যন্ত্রটি অনায়াসে এক-হাতে তুলে ঘরের এক কোণ থেকে অন্যখানে নিয়ে নতুন করে সাজান চলে! Collimeter Tellescope কাচের ত্রিশিরখণ্ড পকেটে নিয়ে বেড়ান চলে!

বিদ্যুৎ তরঙ্গে এইরূপ গুণাবলী প্রমাণ করতে হার্ৎসকে প্রকাণ্ড হলে বড় বড় যন্ত্র সাজাতে হয়েছিল। শিচের প্রকাণ্ড ত্রিশির ঢালাই করতে হয়েছিল যাকে ঘোরাতে-নাড়াতে তিন-জন লোকের দরকার হয়। তরঙ্গ যে সব, হার্ৎস উঠালেন—তার দৈর্ঘ্য ছিল কয়েক মিটর! আলোক তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অবশ্য [illegible] মাপতে এক মিলি-মিটরকে [illegible] ভাগ করে নিতে

[illegible] হলে

উঠলেন। ১৮
সোসাইটির সাম
—তাঁর পরীক্ষার
দেশের লা
বিশ্বৎমণ্ডলীর
—তাদের চমৎকৃত
অনেক দূরে
বেতারের সাহ
দাঁড়িয়ে চা
পিস্তলের বিস্ফো
নানাভাবে যন্ত্রের
শুনা যায় মাই
থেকে নিজের
সঙ্কেত পাঠাব
অবশ্য বেশী
ছোট চালের ত
প্রেরক যন্ত্রে
উৎপত্তি হতো
বিশেষ ধরনের
তাঁর নিজস্ব স
আলোকের
যে বৈদ্যুতিক
যন্ত্রের স
পারতেন
লণ্ডনে রয়্যা
দিয়ে বিজ্ঞান
ছিলেন। দেখে
পরীক্ষা
সঙ্কেত গ্রাহ

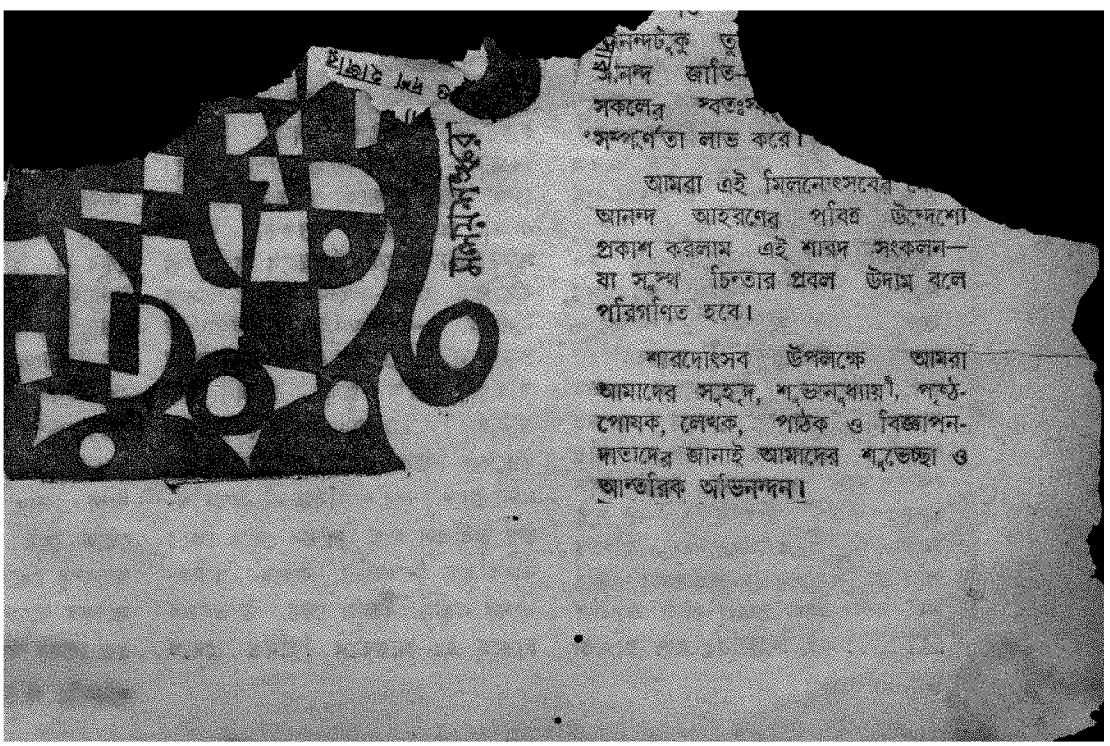

আনন্দটুকু তু
আনন্দ জাতি-
সকলের স্বতঃ
সম্পূর্ণতা লাভ করে।

আমরা এই মিলনোৎসবের
আনন্দ আহরণের পবিত্র উদ্দেশ্যে
প্রকাশ করলাম এই শারদ সংকলন—
যা সুস্থ চিন্তার প্রবল উদ্যম বলে
পরিগণিত হবে।

শারদোৎসব উপলক্ষে আমরা
আমাদের সুহৃদ, শুভানুধ্যায়ী, পৃষ্ঠ-
পোষক, লেখক, পাঠক ও বিজ্ঞাপন-
দাতাদের জানাই আমাদের শুভেচ্ছা ও
আন্তরিক অভিনন্দন।

আলোর প্র
রোপ করা হত
ও একত্র অবস্থান
বে! স্থিতি-স্থাপকতার
তকেও ছাড়িয়ে যায়, আবার
দিকে এত পাতলা, ক্ষীণভার—যে
জগতের গ্রহ-তারকা সবাই অবাধে
বিচরণ করে তার ভেতরে। এই সব
পরস্পর বিরোধী গুনের সহবাসের
ফলে আলোক সৃষ্টি। উদাহরণস্বরূপ
জলের ঢেউয়ের প্রসাররীতির
কথা উঠতো। ম্যাক্সওয়েল এবার
আনলেন সম্পূর্ণ নতুন ধরনের
কল্পনা। মহাকাশে বিদ্যুৎ শক্তি
ক্ষেত্রের দ্রুত পরিবর্তন, তারই ফলে
চুম্বক ক্ষেত্রের উৎপত্তি, ও এই দুই
মিলে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের অস্তিত্ব
প্রতিষ্ঠা করলেন—ম্যাক্সওয়েল। তাঁর
সমীকরণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রইল আলোর
রেখাচ্ছবি! এই থিয়োরির প্রাণ প্রতিষ্ঠা

হয়।
সারা বিশ্বের বিজ্ঞানী
হার্ৎসের সাফল্যে সারা বিশ্ব
বিজ্ঞানী মহলে সাড়া পড়ে গেল।
চেষ্টা চলতে লাগলো তরঙ্গের উৎপত্তি
ও তার আগমনের সংকেত, আরও
সন্তোষজনকভাবে কিভাবে করা বা
ধরা যায়, তারই ব্যবস্থা করতে আসরে
নামলেন — Lodge, Branley
প্রমুখ নানা দেশের নানা বিজ্ঞানী।
এদিকে হার্ৎস মারা গেলেন ১লা
জানুয়ারী ১৮৯৪। তখনি বৈদ্যুতিক
তরঙ্গের বিষয়ে নানা পরীক্ষা হয়েছে
নানা দেশে! তরুণ বিজ্ঞানী জগদীশ-
চন্দ্র কৃতবিদ্য হয়ে লণ্ডন থেকে ফিরে
কলকাতায় শিক্ষকতা করছেন কয়েক-
বৎসর নতুন বিজ্ঞান ক্ষেত্র উদ্ভাসিত
হয়েছে এর আকর্ষণে তিনিও মেতে

আজও তাঁর
শেষে অনুসন্ধি
জৈব ও অজৈ
সীমানায়।
বৈদ্যুতিক উ
বা উদ্ভিদের
সে বাঁচে—পরে
পড়ে—উপর্যুপ
—এসব জান
যন্ত্রে তার
তোলা যেত।
জড়বস্তু থেকে
সংকেত খুঁজে
হল সেসব কথ

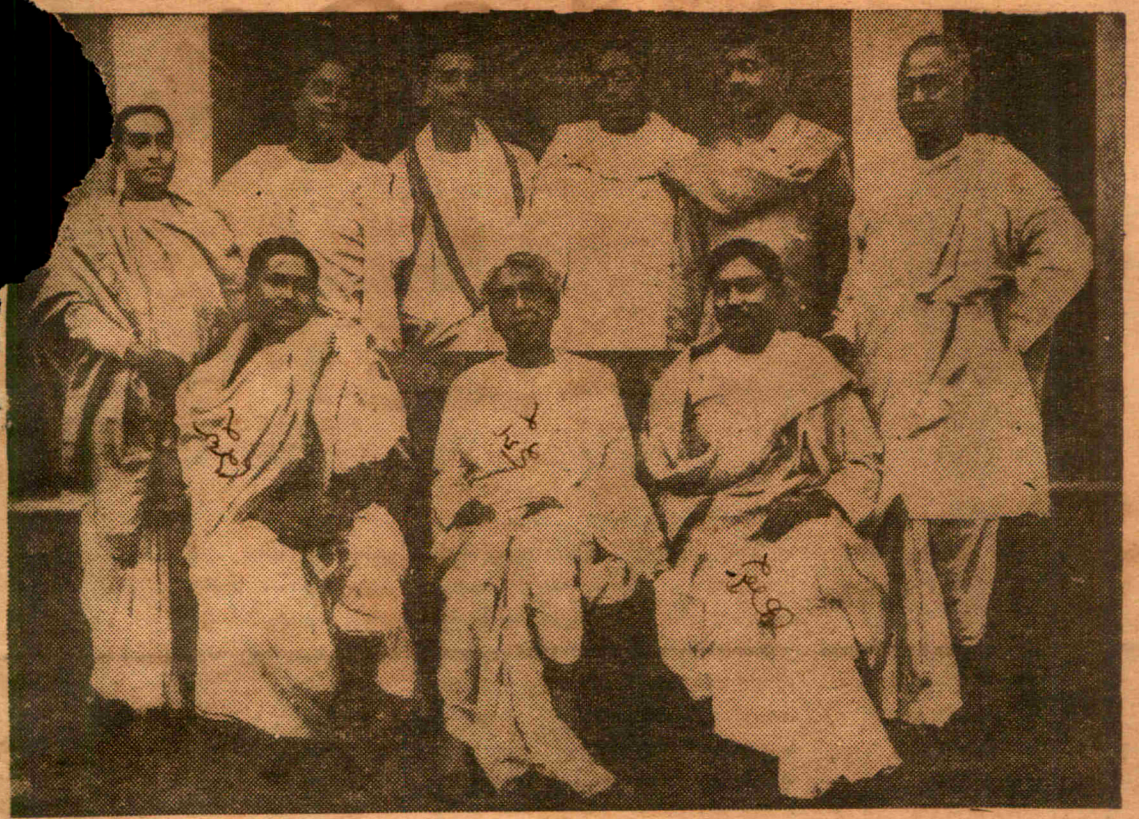

উপবিষ্ট বাঁ দিক থেকে ॥ মেঘনাদ সাহা, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ
দণ্ডায়মান। বাঁ দিক থেকে: শ্রীস্নেহময় দত্ত, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বোস, শ্রীদেবেন্দ্রমোহন বসু, শ্রীনিখিলরঞ্জন সেন, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ

(বিশ্বভারতীর সৌজন্যে)

রইলেন—ও ক্রমে ক্রমে পদার্থ বিদ্যার থেকে অনেক দূরে সরে গেলেন। আমরা যখন ছাত্র হিসাব কলেজে যোগ য়েছি—তখন তাঁর উদ্ভিদ নিয়ে রীক্ষার মরশুম চলেছে। তবু বিজ্ঞানের তরুণ ছাত্রদের কাছে প্রাথমিক আবিষ্কারের কথা বলতে তাঁর ভাল লাগতো। নানা কাজে ব্যস্ত থাকলেও ফিজিক্সের চতুর্থ বার্ষিকী শ্রেণী ছাত্রদের জন্য তিনি নিজের হাতে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের নানা গুণের ত্যক্ষ প্রমাণ দেখাতেন। সেই বক্তৃতার ছুহক আমাদের সম্মোহিত করতো। আজও তাঁর কথা খোদা

কিছুদিন আগে থেকে র মুখে মার্কণীর নাম শোনা দেশ থেকে দেশান্তরে— থেকে আমেরিকায় খবর প্রথমে পাঠিয়েছেন—বড় বড় বিজ্ঞানীরা কেউই এ সম্ভাবনায় তখন বিশ্বাস করতো না। তারপর অনেক উন্নতি হল তাঁর প্রেরকের—জাহাজে জাহাজে বসল সেসব যন্ত্র। ১৯০৯ সালে নোবেল প্রাইজ অর্জন করে সারা বিশ্বে বিখ্যাত হলেন মার্কণী। আমরা বসুর বক্তৃতার পর আলোচনা করছি—দেশে তখন স্বাদেশিকতার বিপুল বন্যা ডেকেছে। জগদীশ বোস ইচ্ছা করলেই মার্কণীর মত দেশ-বিদেশে বেতারে বার্তা পাঠাতে পারতেন। বিদেশী সরকার তাঁকে যদি একটু বেশী সুযোগ-সুবিধা দিত। অবশ্য এভাবে নিজের বিদ্যাকে অর্থাগমের উপায়ে পরিণত করার কোন প্রয়াস বা আকাঙ্ক্ষা ছিল না তাঁর—বোসের জীবনীকার এই কথার উপর বেশী জোর দিয়েছেন। নিপুণ বিজ্ঞানী যে সব যন্ত্র গড়ে তুলেছিলেন—পেটেন্ট নিয়ে—তার সর্বসত্ত্ব সংরক্ষণ করতেও তিনি ছিলেন বীতরাগ। শেষ বয়সে তাঁর মন চেয়েছিল জড় ও জীবের মধ্যে একই চৈতন্যের বিকাশের মূল সূত্র খুঁজে বের করতে। তাঁরই জন্য বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। তাঁরই নির্দেশে ও তাঁরই প্রস্থিত পথেই এখনো নানাভাবের পরীক্ষা চলেছে সেখানে। তাঁর শিষ্যেরা অনেক অমূল্য তথ্য সঞ্চয় করেছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আকস্মিক অগ্নির উৎপাতে অনেক দামী কাগজ, বই, নথিপত্র ও গবেষণার যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে গেল।

এর কিছুদিন আগে ছাত্রদের প্রগল্‌ভ তাণ্ডবে প্রেসিডেন্সি কলেজে যে সব কক্ষে গবেষণা চালাতেন জগদীশচন্দ্র—তারও অনেক ক্ষতি হয়েছে শুনেছি।

মানবিকী-বিদ্যার ভারতের জাতীয় অধ্যাপক, এবং তুলনামূলক ব্যাকরণের প্রাপ্তাবসর সম্মানিত অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

(৩—১১ জানুয়ারী ১৯৬৮ অব্দে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত তমিলবিদ্যার ২য় আন্তর্জাতিক সম্মেলনের পর্যালোচনাচক্রে, সভাপতির অভিভাষণরূপে প্রদত্ত ভাষণ, ইংরেজী হইতে অনূদিত

তমিলবিদ্যার দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন ভারতে ইহার প্রথম—অনুষ্ঠান হয় ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে; এই সম্মেলনে ভারত-তত্ত্বের বিভিন্ন দিক লইয়া, বিশেষতঃ ইহার একটি উপেক্ষিত দিক বা শাখা (তমিল এবং দ্রাবিড়বিদ্যার দিক লইয়া যে বিচার ও আলোচনা হয়, গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। ভারত-তত্ত্বের সর্ব-ব্যাপক পরিধির মধ্যে, তমিলবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ শাখাসহ দ্রাবিড়বিদ্যা বা তত্ত্ব বাস্তবিক যেন বড় রাজ্যের ভিতর আর একটি ছোট রাজ্য। তথাপি তবে, এবং জ্ঞানের অভাবজনিত শূন্যতা পূরণে কল্পনাশক্তির ব্যাপক ক্রিয়ায়, একদা ভারতের ইতিহাস এবং সংস্কৃতির উৎস ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভ্রান্ত, সিদ্ধান্তের ভিত্তি ছিল প্রমাদপূর্ণ—এখন আমরা এইরূপ মনে করি। তমিল ও অন্যান্য দ্রাবিড়ভাষী জনগণের সাংস্কৃতিক জগৎ ও সাংস্কৃতিক অবদান সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের অভাব ছিল, শুধু তাহাই নহে; ব্যাপক অজ্ঞতা (যাহা অবজ্ঞা-বিমুক্ত ছিল না) বশতঃ ভারতীয় সভ্যতার দ্রাবিড় ও অন্যান্য অনার্য পটভূমিকা সম্পর্কে যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গির সামগ্রিক অভাবও ছিল। ভারতীয় জীবন ও ভারতীয় জনগণের ভারতীয়তার ভিত্তিশিলার অন্যতম সংগঠক, যাহাকে ভারতীয় জীবন ও সভ্যতার আর্য-ভিত্তির পাশাপাশি প্রাক্-আর্যভিত্তি বলিয়া অভিহিত করিতে পারি, তাহাকে দৃষ্টির অন্তরালে হারাইবার জন্য এই সমস্ত কারণ দায়ী ছিল।

মিশর, এশিয়া মাইনর, মেসোপোটামিয়া ও নিকট প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের প্রাক্-ইন্দো-য়ুরোপীয় সংস্কৃতিসমূহ ক্ষীণবল হইলে, য়ুরোপ, নিকট প্রাচ্য ও ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে ইন্দো-য়ুরোপীয় বা আর্য-"রাজার-জাতি" প্রভুত্ব বিস্তার করে, এই ধারণা, এবং গ্রীস, এশিয়া মাইনর, ইরান ও ভারতে ইন্দো-য়ুরোপীয়গণের বসতি স্থাপন ও এই সকল দেশে খৃঃ পূঃ ১৫শ শতকের পরবর্তীকাল হইতে প্রাচীন মহা সভ্যতা-সমূহের প্রতিষ্ঠা—ইহাই ছিল ভারতের প্রাচীনতর প্রাক্-আর্য সংস্কৃতিকে অর্ধ শতাব্দীকালব্যাপী আমাদের উপেক্ষার মূলে। আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া ও ওশিয়ানিয়ার লোহিত, কৃষ্ণ, তাম্র ও পীত মানুষদের বিজেতা ও উন্নতি-বিধায়ক রূপে য়ুরোপের শ্বেত জাতিসমূহের বিগত পাঁচ শতাব্দী ব্যাপী বিস্তারের পূর্বাভাষ আর্য-প্রাধান্য-বিশিষ্ট ভারতীয় ইতিহাস বিবেচিত হইত এই শ্বেত য়ুরোপীয়গণকে তিন সহস্র বর্ষ পূর্বে ভারতে আগত শ্বেতকায় আর্য বিজেতৃগণের রক্তসম্পর্কিত বা, বড় জোর, তাহাদের নিকট জ্ঞাতি বলিয়া বিবেচনা করা হইত। বিশ্বাস করা হইত আর্যগণ ভারতে আসিয়াছিল শ্বেত সভ্যতা-সংস্থাপকরূপে। তাহারা ভারতের তাম্র, কৃষ্ণ ও পীত—দ্রাবিড়, অস্ট্রিক ও মংগোলীয় মানবগোষ্ঠীবর্গের শাসক-সম্প্রদায় হইল। অজ্ঞতা ও অবজ্ঞার ফলে ধরিয়া লওয়া হইত এই গোষ্ঠীবর্গের স্বকীয় কোন সংস্কৃতি ছিল না; আর এই জন্যই তাহাদিগকে উন্নততর আর্য সভ্যতা অবলম্বন করিতে হয়। তাহাদের আদিম ও অর্ধ-বন্য ভাবধারা ও প্রথাগুলি টিকিয়া রহিল প্রাক্-আর্য বর্বরতা ও যুক্তিহীনতার উত্তরাধিকাররূপে; আর ইহা হিন্দু বা আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির অন্তস্তল রূপে প্রচ্ছন্ন রহিল ফলে ভারতের দ্রাবিড়, অস্ট্রিক ও মোংগলীয় জগতের সামগ্রিক অবহেলা অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল।

কিন্তু ইহার সর্বতোভাবে পরিপরিবর্তন ঘটিয়াছে, ফলে অনার্য, বিশেষত দ্রাবিড় তার স্বাধিকার লাভ করিতেছে। এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তিনটি ঘটনা দায়ী। প্রথমত, নিম্নলিখিত এবং অন্যান্য তমিল পণ্ডিতগণের দ্বারা বিগত শতকের তৃতীয় পাদ হইতে আরম্ভ হইল প্রাচীন তমিল সাহিত্য ও তমিল সংস্কৃতির অবদানের গভীর অনুশীলন—রাও বাহাদুর স, দামোদরম্ পিল্লৈ (১৮৩২—১৯০১), (V,) চ, সূর্যনারায়ণ শাস্ত্রী (১৮৭১—১৯০৩), তিরুমলৈ যঙ্গমযম্ পিল্লৈ, অ, ক, অমৃতম্ পিল্লৈ (১৮৪৫—১৮৭১—ইনি ছিলেন সংস্কৃতের বিরুদ্ধে তমিলের একজন উৎসাহী, নির্বিচার সমর্থক); চেল্‌ব-কেশবরায় মুদলিয়র (+১৯২১), পণ্ডিত তৌরৈ দেবর (+১৯০১—নব তমিল সংগমের প্রবর্তক); জাফনার সভাপতি নবলব (+১৯০৩), ব, কনকসভৈ পিল্লৈ (+১৯০৩); জ, ম, নল্লস্বামী পিল্লৈ (১৮৬০—১৯২০), এবং সর্বোপরি, মহা মহোপাধ্যায় ক, স্বামিনাথ অয়ার্ (১৮৫৬—১৯৪২—বৃহৎসংখ্যক প্রাচীন তমিল সংগম ক্লাসিকের সম্পাদক, যেগুলির সম্পাদনায় তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও অনুরাগপূর্ণ পরিশ্রম প্রতিফলিত হইয়াছে এবং তমিল সুধীগণকে তাঁহাদের সাহিত্যের মহত্ত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিয়াছে); তাছাড়া, সুপণ্ডিত ইংরেজ মিশনারী জি, উ, পোপ (১৮২০—১৯০৭)-এর তমিল ভাষায় লিখিত ব্যাকরণ বিষয়ক ও অন্যান্য রচনাবলী ও তাঁহার কুরল, নালডিয়র্ ও তিরুবাচকম্-এর মত প্রাচীন তমিল ক্লাসিকসমূহের অনুবাদ ও সম্পাদনা প্রাচীন তমিল সাহিত্য সম্বন্ধে বহির্জগৎকে অধিকতর সুবিদিত করিয়াছে।

ইহার ফলে তমিলগণের দ্বারাই প্রাচীন তমিল সাহিত্যের গৌরব এক রূপ পুনরাবিষ্কৃত হইয়াছিল; অধিকন্তু ইহা তমিল ও দ্রাবিড় বিদ্যায় সত্যকারের পুনর্জাগরণ ঘটাইয়াছিল এবং প্রাচীন সাহিত্য ও সং

CWR-L405281-34-268353

ভিত্তে আগ্রহ ও অনুরাগ (এবং অনেক সময় আবেগময় আকৃতি) সঞ্চার করিয়াছিল। অনেক মহলে ইহাও অনুভূত হইয়াছিল যে সংস্কৃতের উপর অতিরিক্ত ঝোঁক দেওয়ার ফলেই তমিল পশ্চাৎপটে অপসারিত হইয়াছিল; যদিও ইহা বাস্তব সত্য ছিল না—দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, তমিলে রচিত "তেন্‌গলৈ" বা দক্ষিণের শাস্ত্র এবং সংস্কৃতে রচিত "বডগলৈ" বা উদীচ্য শাস্ত্র, উভয়কেই সমান মর্যাদা দেওয়া হয়, এবং এই দুইকে একসঙ্গে বলা হয় "উভয় বেদান্ত।"

দ্বিতীয়ত, ভারতের তথা বিশ্বের ইতিহাসের এক নূতন ব্যাখ্যা প্রচলিত হইতেছিল। তদনুসারে প্রাচীন সভ্যতার ক্রমবিকাশে ইন্দো-য়ুরোপীয়গণকে (এবং তাহাদের ভারতীয় বংশধরগণকে) অযথা প্রাধান্য প্রদান সংশোধিত হইতেছিল। হিন্দু ও অন্যান্য জাতির পরবর্তী ঐতিহাসিক যুগের সভ্যতার ভিত্তির অনুপূরক রূপে প্রাক্-আর্য সংস্কৃতির অবশেষগুলি স্বীকৃতিলাভ করিতে লাগিল, তাহাদের সভ্যকারের প্রকৃতিতে ও গুরুত্বে। দ্রাবিড় ক্রমে তাহার স্বকীয় মর্যাদালাভ করিতে লাগিল। (তমিলকম্ বা তমিলদেশ সহ সমগ্র ইংরেজি-জানা উচ্চতর শ্রেণীগুলি, যেমন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ এবং আর্য হইতে উদ্ভবের অন্যান্য দাবিদারগণ, গত শতকের ইংরেজ ও অপরাপর য়ুরোপীয় ভাষা-বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিকগণের নিকট হইতে ভারতীয় দৃশ্যপটে আর্য-উৎকর্ষের ধারণা বাস্তব বলিয়াই মানিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু জনসাধারণ, বিশেষত অব্রাহ্মণগণ, যাঁহাদের কিছু সংখ্যক হয়ত ইহাতে অস্বস্তি অনুভব করিয়াছিলেন, নীরব ছিলেন; কারণ তাঁহারা শিক্ষায় অগ্রসর ছিলেন না এবং এই বিষয়ের ঐতিহাসিক ও অন্যান্য তাৎপর্য উপলব্ধি করেন নাই। এই জনসাধারণ অবশেষে দ্রাবিড়ীয় (বিশেষত তমিল)-প্রাধান্য প্রচারে সোচ্চার হইল, প্রথমত, তমিলবিদ্যার উজ্জীবনের মাধ্যমে; দ্বিতীয়ত, প্রাচীন সভ্যতার বিকাশে অনার্য জাতিসমূহের অবদানের স্বীকৃতিলাভের মধ্য দিয়া (যাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে); তারপর অবশেষে, তৃতীয় কারণ বা অনুপ্রেরণা বলিয়া যাহা বর্ণিত হইতে পারে, ভারতের ভিতরে সেই তমিল বা দ্রাবিড় উজ্জীবনের মাধ্যমে।

এই তৃতীয় প্রেরণা আসিল ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সিন্ধু-পঞ্জাবের মোহেন্-জো-দড়ো, হরপ্পা ও ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে এক অতি উন্নত ধরণের সভ্যতার অবশেষ আবিষ্কার হইতে। (এই আবিষ্কার উক্ত বিভাগের সুপণ্ডিত সুনারিন্‌টেন্‌ডেন্টগণের অন্যতম পরলোকগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রচেষ্টা ও পরে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় স্যার জন্ মার্শাল্ এবং ননীগোপাল মজুমদার ও মাধবস্বরূপ ভাৎস্য প্রমুখ তাঁহার বিদগ্ধ সহায়কগণের পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণার ফল)। দ্বিতল বা তদধিকতল ইষ্টকনির্মিত গৃহশ্রেণী, প্রস্তর নির্মিত পয়ঃপ্রণালী, স্নানাগারসমূহ ও অন্যান্য সুখ-সুবিধায় পূর্ণ নগরসমূহ এই সভ্যতা অর্ধ-যাযাবর এবং প্রধানত গবাদিপশুপালক ভারতীয় আর্যগণের প্রগতিসীমার বহির্ভূত বলিয়া বোধ হইয়াছিল; এবং কিছু সংখ্যক পণ্ডিতগণ হরপ্পা-মোহেন্-জো-দড়ো গবেষণা পর্যালোচনার প্রারম্ভ হইতেই এই প্রাক্-আর্য সভ্যতাকে মূলত দ্রাবিড়ীয় বলিয়া বিবেচনা করিতেছিলেন। ইহা ভারতীয় সাংস্কৃতিক রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত—বিশিষ্ট চরিত্র ও লক্ষণযুক্ত যে তমিল এবং দ্রাবিড় সংস্কৃতি তাহাদের উত্তরাধিকারগণের মধ্যে নূতন উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার করিল এবং তমিল ও দ্রাবিড় বিদ্যার অনুশীলন মহোৎসাহে শুরু হইল।

অনুকূল অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়া এই আন্দোলনকে প্রতিশোধকামী চিত্তের অন্তর্প্রবাহ-প্রভাবিত যুযুৎসু প্রকৃতি প্রদানেও বিলম্ব ঘটে নাই। এ যাবৎ উন্নত ধীশক্তিসম্পন্ন, ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় শিক্ষাপ্রদত্ত সমস্ত শক্তি ও সহায়তার অধিকারী হইয়া ভারতীয় দৃশ্যপটে, বিশেষত দক্ষিণ ভারতে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহারা শাসনসংক্রান্ত সকল প্রতিষ্ঠা ও পদমর্যাদার একক অধিকার তাঁহাদের সংখ্যাগত গুরুত্বের অনুপাতে অতি অধিক পরিমাণে ভোগ করিতেছিলেন। দ্রাবিড়ভাষী রাজ্যগুলিতে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সংঘর্ষ, যাহা উত্তরোত্তর রাষ্ট্রনীতি ও সমাজে রূপ পরিগ্রহ করিতেছিল, তাহার অন্যতম প্রচ্ছন্ন কারণ নিহিত ছিল এখানেই। এই রাজ্যগুলিতে জনসাধারণ বহুক্ষেত্রেই আপনাদিগকে অবহেলিত ও উপেক্ষিত বোধ করিত। স্বাধিকার ও প্রতিষ্ঠা পুনরর্জনের জন্য সংঘর্ষের এই দৃশ্যপটে, সংস্কৃত ভাষাসহ যাহা কিছু ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল তাহা সমস্তই সংশয় ও অপ্রীতির দৃষ্টিতে দেখা হইত, এমন কি উহাদের নিষিদ্ধ করার চেষ্টা চলিল; উদ্দেশ্য ছিল তমিল দেশে (অন্য অনুরূপভাবে, ন্যূনতর পরিমাণে হইলেও, অন্যান্য দ্রাবিড়-ভাষী অঞ্চলসমূহে) তমিল ভাষার পূর্ণ একাধিকার প্রতিষ্ঠা।

তমিল ও দ্রাবিড়ের এই নব-নিরূপিত মূল্যায়ন সম্পূর্ণ সংগত। তমিলবিদ্যার অনুশীলনে এক নূতন প্রেরণা সঞ্চারিত হইয়াছে। ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে, আর্য সম্বন্ধে উৎকর্ষবোধ বেদ-পুরাণাদি অনুপ্রাণিত ও পবিত্র হিন্দুধর্মশাস্ত্রসমূহের ভাষা হিসাবে সংস্কৃতের মহামর্যাদার সহিত মিলিত হইয়া দ্রাবিড়বিদ্যার অনুশীলনে ভ্রান্ত দৃষ্টিকোণের সৃষ্টি করিয়াছিল। আর্য-দ্রাবিড়-অস্ট্রিক-মোগলীয় ধর্ম-সংস্কৃতি রূপী হিন্দুত্ব (ইহার ব্রাহ্মণ্য, জৈন ও বৌদ্ধ এই ত্রয়ী রূপে) উত্তর ভারতের সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকায় আর্য-অনার্য জাতি সংমিশ্রণে উৎপন্ন এক বর্ধমান জনসংখ্যার মধ্যে খৃঃ পূঃ প্রথম সহস্রকের মধ্যভাগের ভিতরেই প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত হইয়াছিল। ইহা দক্ষিণেও—অন্ধ্র, কর্ণাট এ দ্রমিড়ে (কেরল সহ) অগ্রসর হইয়াছিল এক মিশ্র ধর্ম-সংস্কৃতির অতি স্বাভাবিক প্লাবনরূপে; যাহা সৃষ্ট ও বিকশিত হইতেছিল, আর্য-নেতৃত্বে হইলেও, দ্রাবিড়ীয়, নিষাদ ও কিরাত জাতিপুঞ্জের দ্বারা। মহাকাব্যদ্বয়ে এবং পুরাণে, এমন কি কিছু পরিমাণে বেদেও বিবৃত ব্রাহ্মণ্যবাদের ক্রমবিকাশে, আর্য-দ্রাবিড় সংস্পর্শের প্রারম্ভ হইতে ভারতে (এবং বহির্ভারতে) আর্য ও দ্রাবিড়ীয় ভাবধারা, পূজা-উপাসনা ও আচার-পদ্ধতির অংগাংগি সংযুক্তি ঘটিয়াছিল। ব্রাহ্মণ্য পুরাণ ও লোক কাহিনী (জৈন ও বৌদ্ধ সাধুজীবন ও কাহিনী)-র চূড়ান্ত শিল্প-অভিব্যক্তি উৎসারিত হইয়াছিল দ্রাবিড় দেশসমূহে—অমরাবতী ও নাগার্জুনকোণ্ড-এ, মহাবলীপুরম্ ও কাঞ্চীপুরে, বাদামী ও পট্টদকদল্-এ এবং সেই সকল অঞ্চলে আর্য মহারাষ্ট্রে প্রসার অভিযানের পূর্বে যেগুলি খুব সম্ভব কন্নড় দেশ ছিল, যেমন, কারুলা (Karla) ও ভাজায়, অজন্টা ও এলোরা-য় এবং এলিফান্টা (ধারাপুরী) ও কণ্হেরিতে। দক্ষিণদেশীয় দার্শনিকগণ—কেরলের শঙ্কর, তমিয়ুকম্ (Tamizhakam)-এর রামানুজ এবং তুলু (Tulu) দেশের মাধব—উত্তর ভারতে তাঁহাদের সহযোগী ও সমর্থক চৈতন্য ও শঙ্কর দেব, রামানন্দ ও কবীর, বল্লভ চার্য ও তুলসীদাসের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সংগঠনের বিশাল বিস্ময়কর সৌধ নির্মাণ করিয়াছিলেন। উহাই আজও সমগ্র ভারতীয় হিন্দুজগতে চূড়ান্ত আধিপত্য করিতেছে। মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাব এই ভারতীয় হিন্দুজগতের রক্ষার্থে ও নবজীবনাবনে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও বীরগণের দুইজনকে প্রদান করিয়াছিল—তাঁহাদের নাম ছত্রপতি শিবরাজ বা শিবজী এবং গুরু গোবিন্দ সিংহ।

দেবর্ষিকুলের ভাষারূপে—সেই আর্য-দেবকুল যাহা দ্রাবিড় দেবতাগণের সহিত এক ও অভিন্ন এবং সহকালীন: এই উপলব্ধি হইতে সর্বভারতীয় (আর্য-দ্রাবিড়-অস্ট্রিক্-মঙ্গোলীয়) হিন্দু জগতে বিশ্ব-বন্দিত—সংস্কৃতের মৌন স্বীকৃতি-ই ইহাকে নিষ্ঠাবান হিন্দুর ধারণায় আদি বা প্রাচীনতম মানবভাষার মর্যাদা প্রদান করিয়াছিল। ইহা নির্বিচারে নীরব স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল, যদিও স্থানে স্থানে, বিশেষত তমিল দেশে, ইহার বিরুদ্ধে মৃদু প্রতিবাদ স্পষ্ট ধ্বনিত

হইল। যুগাতীত কালের আদি ভাষারূপে সংস্কৃত সর্বভাষার উৎস বলিয়া স্বতঃস্বীকৃত হইয়াছিল। তামিলসহ দ্রাবিড়ীয় ভাষাগুলি সংস্কৃতের রূপান্তর মাত্র, তথাকথিত 'দ্রাবিড় প্রাকৃত'-এর (নামটাই ছিল, কিন্তু বস্তু কিছু ছিল না) বিভিন্ন রূপ মাত্র বলিয়া পরিগণিত হইল। মীমাংসা-সূত্রের প্রাচীনতম ভাষ্যকার শবরস্বামী সংস্কৃত 'পিক' ('কোকিল' ল্যাটিন্ 'পিকুস্' হইতে), 'নিম' ('অর্ব' প্রাচীন পারসিক 'নেম' আধুনিক ফার্সিতে 'নিম্', 'সত' ('বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের দারুময় পাত্র'—মূল অজ্ঞাত) এবং 'তামরস' ('পদ্ম', সম্ভবত প্রাচীন তমিল 'তামরস/তামরয়', আধুনিক তমিল 'তামরৈ')—শব্দাবলী সংস্কৃতে পরিগৃহীত পরিভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পরবর্তী কালের কুমারিল ভট্ট, যিনি স্পষ্টত তমিল দেশে উদ্ভূত ও পূর্ব-পল্লব বংশের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন, একই মীমাংসা দর্শনের ভাষ্য রচনাকালে প্রাক্‌সংগম যুগের কয়েকটি তমিল শব্দের ব্যুৎপত্তি সংস্কৃত হইতে নির্ধারণের প্রয়াস করেন; শব্দগুলি এই—'চোর্' (cor), 'অতর্' (atar), 'পাপ্' (pap) এবং 'বৈর' (vair) বা 'বিরু' (vavir)। অবশ্যই তিনি ইহাতে অনধিকারী ছিলেন।

উত্তরকালে সরাসরি কোনও প্রাকৃত হইতে তমিলের উদ্ভব নির্ধারণের চেষ্টা করা হইয়াছিল এবং তমিল শব্দ ও পদের রূপ সংস্কৃতে সন্ধান করা হইয়াছিল। এখন কিন্তু এই অবৈজ্ঞানিক প্রয়াস অতীতের বস্তু। তমিলের অনুশীলনের এখন আধুনিক প্রণালী প্রবর্তিত হইয়াছে; আর তমিল ও অন্যান্য দ্রাবিড়ীয় ভাষার অনুশীলনে ডিয়াক্রনিস্টিক্, অর্থাৎ প্রচলিত "তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক" এবং সিন্‌ক্রনিস্টিক্ বা নূতন-বর্ণনা ও 'গঠন-মূলক'—উভয় পদ্ধতিই প্রযুক্ত হইতেছে। দ্রাবিড়ীয় ভাষা আজ, কি গঠনে, কি উচ্চারণে ও ধ্বনিতত্ত্বে, কি ইহার রূপতত্ত্বে, কি পদবিন্যাস-পদ্ধতিতে, কি শব্দসম্ভারে, কি শব্দার্থবিদ্যায়—স্বকীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহার নিজস্ব কক্ষে, এক ধ্বনি ভাষাগোষ্ঠীরূপে, সংস্কৃত বা অন্য কোনও গোষ্ঠীভুক্ত ভাষার লেজুড় না হইয়া।

এখানেই পাই তমিল ও অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষাবিজ্ঞানের বিমুক্তি। আমরা তমিলের স্বকীয় প্রকৃতি বা চরিত্রের সন্ধান করিতেছি। আমরা আবিষ্কার করিতেছি দ্রাবিড় ও তমিলের ভাষাবিজ্ঞানানুগ অবস্থিতি ও বিকাশের বিধানগুলি, যাহা এ যাবৎ আমাদের নিকট প্রচ্ছন্ন ছিল। এই কার্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতালাভে আমরা আনন্দিত। কেবলমাত্র ভারতীয় বিদ্বানগণ, বিশেষত দ্রাবিড়ীয় ভাষা-ভাষিগণের মধ্য হইতে, এই অনুশীলন ও অনুসন্ধানে জন্মগত অধিকার রূপে যোগদান করিতেছেন তাহাই নয়, তমিল ও অন্যান্য দ্রাবিড়ীয় ভাষার রহস্যোদ্ঘাটনে সহায়করূপে পাইতেছি দেশান্তরের পণ্ডিতগণকেও। পূর্বতন যুগের বৈদেশিক বিদ্বদ্‌গণ, যেমন রোবের্তো দে-নোবিলিস, কন্‌স্তান্তীন বেস্‌কি, বার্তোলোমেও, ঈসাগেবালগ এবং তারপর, কল্ড্‌ওয়েল্, গ্রুউল্, ব্রাউন, কিট্‌ল্, গুন্‌ডের্ট্, পোপ্, ভ্যাসি, স্টেন্ কনো, হান্, গ্রিয়ার্সন; এবং অবশেষে, প্রাক্তন যুগের বাল্ ব্লক, পি-মেইল্, অ্যালফ্রেড্ মাস্টর্, এফ-বি-জে. কয়পর্ এবং অন্যান্য; এ ছাড়া বর্তমানে আমাদের মধ্যে আছেন—ক্যামিল্ জ্বেলেবিল্, এম. এস. আন্দ্রনভ্, য়ুরি গ্লাসভ্, টি. বারো, এমেনো এম. বি. প্রমুখ পণ্ডিতগণ। ভাষা-বিজ্ঞান-সম্পর্কিত অন্য যে কোনরূপ এষণার মতই এই অনুশীলন আজ ফলপ্রসূ হইবার সম্ভাবনা বহন করিতেছে; ইহার ধর্মতত্ত্বের নিগড়ে বদ্ধ অবস্থা আজ দূর অতীতের বিষয়। ভারতীয় বিদ্বদ্‌গণের মধ্যে কাহারা ইহার পথিকৃৎ ছিলেন, কাহারাই বা এই কার্যে সুস্পষ্ট সাফল্যে বস্তুত ব্যাপৃত আছেন, তাহা উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই।

ভাষাগত প্রভাব ও অনুপ্রবেশের প্রশ্ন ব্যতীত দ্রাবিড়ীয় ও তমিলের ভাষা-বিজ্ঞানানুগ অনুশীলনকে অন্য যে কোন তত্ত্বগোষ্ঠী হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত ও বন্ধনহীন থাকিতে হইবে। কিন্তু তমিল ও দ্রাবিড়ীয় সংস্কৃতির অনুশীলনে, বিশেষত সেখানে ধর্মে ও দর্শনে আমাদের মহান্ সংগঠন এবং সাধারণ সর্বভারতীয় পটভূমিকা আছে, যাহা দ্রাবিড় ও অ-দ্রাবিড় উভয় জগতের সহিত সমভাবে সম্পর্কিত, সেখানে আমাদের সতর্ক পদক্ষেপ করিতে হইবে: কারণ এখানে, যাহাকে বিশিষ্টরূপে দ্রাবিড়ীয় বলি, তাহা অপেক্ষাও অধিক কিছু আছে। ভারতীয় সভ্যতা—ভারতীয় চিন্তা ও জীবন-যাত্রা, ভারতীয় ধর্ম ও সামাজিক আচরণ, এবং সত্যের রহস্য সন্ধানের ভারতীয় রীতি—এই সমস্ত কিছুতেই একটি ঐক্য পরিস্ফুট। ইসলাম ও খৃস্টধর্মের মতো বৈদেশিক ধর্মমত নূতন নৈয়া উপাদান প্রবর্তন করিলেও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে দেখা যায় যে এই নূতন উপাদান বহিস্তরে রহিয়াছে, ভিত্তিমূলে পৌঁছায় নাই। ভারতীয় সভ্যতা এক জটিল সত্তা—যেন এক রাসায়নিক সংযোগ যাহা আদিম আর্য ও আদিম দ্রাবিড়কে এক অভিনবরূপে রূপান্তরিত করিয়াছে: ইহা যান্ত্রিক মিশ্রণ মাত্র নয়। এক ধর্ম, আঞ্চলিক ও উপ-সম্প্রদায়গত বৈচিত্র্য সমেত ভারতীয় হিন্দুগণকে—তাহারা ব্রাহ্মণ্যবাদী, বৌদ্ধ বা জৈন যাহাই হউক না—অন্তত গত ২,৫০০ বৎসরব্যাপী এক জাতি রূপে বাঁধিয়াছে। কতকগুলি সাহিত্যিক প্রয়োজ-

বৈশিষ্ট্য যেমন মানসিক ভাবান্তরমণ্ডল ও তাহার কবিত্বময় অভিব্যক্তির সহিত যুক্ত, চক্রের ও দেশের ভৌগোলিক গঠনান্তর্গত বিভিন্ন ভূভাগের অন্বয়সাধন, যাহা প্রাচীনতম তমিল সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এবং যাহা অন্যান্য দ্রাবিড়ীয় সাহিত্যে দুর্লভ—সংস্কৃত ও সংস্কৃতেতর ভারতীয় সাহিত্যসমূহে অবশ্য-তব বিরল ব্যতীত, আর্য সাহিত্য ও দ্রাবিড় সাহিত্যের বাহ্যিক ও মানসিক ভাব-পরিমণ্ডল এক। রামায়ণ ও মহাভারত, চাণক্য নীতি ও কামন্দকীয় নীতি, মধ্যযুগের সংস্কৃত স্তোত্রকাব্য এবং দার্শনিক রচনাবলীর ন্যায় সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অবদানসমূহ অধ্যায়ের পর, পত্তুপ্পট্টু ও কুরুন্তোগই, নালাডিয়ার ও সিলপ্পদিকারম্, দেবারম্ ও নল-আয়িরম-প্রবন্ধম্ প্রভৃতি অগ্রসর হইলে, মনে হয় না আমরা দেশান্তরে আসিয়াছি। সংস্কৃত কাব্যের বিষয়মূলক, নীতিশিক্ষাপ্রধান ও ভক্তিভাব-প্রবণ শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহের প্রাচীন ও মধ্য তমিল (এবং মধ্যযুগীয় কানাড়ী ও মধ্যযুগীয় তেলুগু) ভাষায় অনুবাদ ও অনুসরণ অসংখ্য রহিয়াছে। তমিল সাহিত্যের মাধ্যমে প্রকাশিত তমিলত্বমের মানসিক ও আত্মিক সংস্কৃতি-জগতকে সংস্কৃতের সাহিত্যিক পটভূমিকা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না। ভারত সরকারের সংস্কৃত কমিশন (দিল্লী, ১৯৫৮, পৃ—৮৫)-এর বিবরণীতে উদ্ধৃত তোল্‌কাপ্পিয়ম্, একুত্তধিকারম্ ১, প্রথম সূত্রের ভাষ্যে শিবজ্ঞান-মুনিবর্ যাহা বলিয়াছেন তাহা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিতে পারি: 'যাহারা সংস্কৃত শিক্ষা করে নাই, তাহাদের নিকট তমিলের প্রকৃতি পরিস্ফুট হইবে না।'

অগস্ত্য (অকত্তিয়র্) দক্ষিণ ভারতে এই সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের, এই আর্য ও দ্রাবিড়ের একাত্মীকরণের প্রতীক। তিনি লোপামুদ্রা, পতি, মিত্র ও বরুণের পুত্র বলিয়া অভিহিত, ঋগ্বেদের ঋষি বা দ্রষ্টা হইতে পৃথক। তিনি সম্ভবত খৃঃ পূঃ প্রথম সহস্রকের কোন সময় জীবিত ছিলেন, যখন বৃহদাকারে দক্ষিণাভিমুখে আর্য সম্প্রসারণ আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বিন্ধ্যপর্বতমালা অতিক্রম করিয়া এই আর্য ঋষি বা মুনি উত্তর ভারত হইতে আগমন করেন এবং কুর্গের অন্তর্গত তুলু ও কোড়গু দেশে বসতি স্থাপন করেন। তিনি আর উত্তর ভারতে ফিরেন নাই। অগস্ত্য এখানে স্থানীয় প্রধান কবের-র কন্যা কাবেরীকে বিবাহ করেন। তিনি মুষ্টিমেয় আর্যগণের মধ্যে নিবদ্ধ দুর্লভ বেদবিদ্যা বা 'মরৈ' দ্রাবিড় দেশে আনয়ন করেন: এবং ব্যাকরণ রচনা করিয়া তমিলের উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হন। আমরা অগস্ত্য এবং তোল্‌কাপ্পিয়ম্ (Tolkappiyam)-এর লেখক, অগস্ত্যের শিষ্য তোল্‌কাপ্পিয়নকে (Tolka-

ppiyan) বাদ দিয়া তমিল ও দ্রাবিড় সংস্কৃতির কথা চিন্তা করিতে পারি কি? অগস্ত্য-অনুপ্রাণিত এই গ্রন্থ আমাদের সঙ্গম তমিলের অন্যতম মৌলিক গ্রন্থ। প্রাচীনতম তমিল সাহিত্যের 'পোরুল' (Porul) বা বিষয়বস্তু, 'এঝুত্তু' (Ezhuttu) বা লিখন উচ্চারণ ও ধ্বনিতত্ত্ব, 'চোল্ল' (Colla) বা রূপতত্ত্ব অনুশীলনে তোল্‌কাপ্পিয়ম কুঞ্জি (বোধিকা) স্বরূপ। সংস্কৃত ও তমিলের ভাবমূর্তি অগস্ত্যের ব্যক্তিত্বে এবং সমভাবে ক্লাসিক্ তমিল সাহিত্যে একাত্ম হইয়াছে। সেই ভাব-পরিমণ্ডল এবং সাহিত্য হইতে সংস্কৃত-ভাবমূর্তি অপসারণের প্রয়াসের অর্থ ইহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গচ্ছেদ বা খণ্ডীকরণ।

ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে ভারতীয় সভ্যতা, পুরাতন ভারতীয় ভাবে বলিতে গেলে, টাকায় আট আনারও অধিক পরিমাণে (শতকরা ৫০ ভাগ) দ্রাবিড়ীয়। এই দ্রাবিড় উপাদান প্রধানত বহিস্তরের নিচে এবং ইহার ক্রিয়া নীরব ও গভীর। স্বয়ং সংস্কৃত এবং ইহার উত্তরকালের রূপান্তরগুলি এরূপ প্রবলভাবে দ্রাবিড় (এবং অন্য অনার্য) ভাষার দ্বারা পরিপূরিত ও সমৃদ্ধ যে ইহা তাহার আদি ইন্দো-য়ুরোপীয় প্রকৃতি হইতে বহু দূরে অপসৃত হইয়া বহু পরিমাণে দ্রাবিড়ের সন্নিকটবর্তী হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার চারি-পাঁচশত অতি সাধারণ শব্দের ব্যুৎপত্তি তমিল হইতে। তাই দ্রাবিড় ও অন্যান্য অনার্যজাতীয় লোকেরা সংস্কৃতকে এত বিজাতীয় বোধ করে নাই। বাস্তবিক দ্রাবিড় ও আর্য এক সাধারণ ভারতীয় সংস্কৃতিতে সম্মিলিত হইয়া একাত্ম হইয়াছে; তমিল ও অন্য দ্রাবিড় সাহিত্য সেই এক সংস্কৃতিরই অভিব্যক্তি, যেমন সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত এবং আধুনিক ইন্দো-আর্য ভাষাগুলি। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণসমূহ, শিব ও উমা এবং বিষ্ণু ও শ্রীর কল্পনা মূলে ও আবেদনে সর্বভারতীয়, আর বেদান্তদর্শন বা বেদমৌলি—মরৈ-মুড়ি—ইহার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা, হিন্দুজগতের সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক ঐক্য বা বহুজাতিক ও বহুভাষিক ভারতের ভারতীয়তার ভিত্তিশিলা বা ভিত্তিভূমি গঠন করিয়াছে। ভারতের এই আর্য-দ্রাবিড় সংমিশ্র সভ্যতায় অন্তত সার্ধ-দ্বিসহস্র বর্ষব্যাপী সহযোগ ও সমন্বয়ের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় আমরা এমন কিছু লাভ করিয়াছি যাহা দেবত্বের দুই রূপের—প্রেম ও করুণার দেবতা বিষ্ণু এবং ধী ও জ্ঞানের দেবতা শিবের মিলনের সহিত তুলনীয়; ইহা আমাদের হরি-হর বা মাল্-শিবন্ (Mal-Sivan) মূর্তি প্রদান করিয়াছে—যেখানে দ্বয়ী সত্তা বিচ্ছেদ-সম্ভাবনার অতীত রূপে একাত্ম হইয়াছে—চরম ও পরম ঐক্য রূপে, পরাৎপর বা পরম-শিব রূপে, পেরুম্-পরব্ (Perum-parar) রূপে।

খৃষ্টোত্তর সপ্তম শতকে তমিল শৈব সাধু তিরুনরক্করসু Tirunavukarasu (স্বামিগল্ Swamigal)-এর বাণী এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়ঃ

আরিয়ন্ কণ্টাই, (Aryan Kantai)
তমিঝন্ কণ্টই, (Tamizhan Kantai)

তুমি আর্য, তুমি তমিলও।

আমাদের একাত্মীভূত সাংস্কৃতিক ও জাতীয় উৎসবের ভাবকল্পের প্রতি অনুগত থাকিয়া আমরা বলিবঃ

সংস্কৃতমুম্ বাঝক,
তমিঝুম বাঝক (Samaskirutamum Vazhka)
Thamizhum Vazhka)!

সংস্কৃত গৌরবান্বিত হউক, তমিলও গৌরবান্বিত হউক।

অনুবাদকঃ শ্রীঅক্ষয়কুমার চলু

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের
সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

প শ্চি ম ব ঙ্গ

এখন অনেক বেশী লোক পড়ছেন
বর্তমানে প্রচার-সংখ্যা ১২,০০০

বিক্রয়-সংখ্যা প্রতি সপ্তাহে			
অগস্ট, ১৯৬৬	...	...	৪৭৫
অগস্ট, ১৯৬৭*	...	...	৫,৫৯৫
অগস্ট, ১৯৬৮	...	...	১,২৭১
অগস্ট, ১৯৬৯*	...	...	৯,৩৯১

(*যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে)

আপনিও নিয়মিত পড়ুন
প্রতি সংখ্যা ঃ দশ পয়সা

'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকায় বিজ্ঞাপনও নেওয়া হচ্ছে
বিজ্ঞাপন প্রচারের একটি উপযুক্ত মাধ্যম 'পশ্চিমবঙ্গ'

বিশদ বিবরণের জন্য নীচের ঠিকানায় লিখুন
বা যোগাযোগ করুন ঃ

বিজ্‌নেস ম্যানেজার, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা—১

প· ব· (তথ্য ও জনসংযোগ) বি ৩২০৭/শা· ৬৯

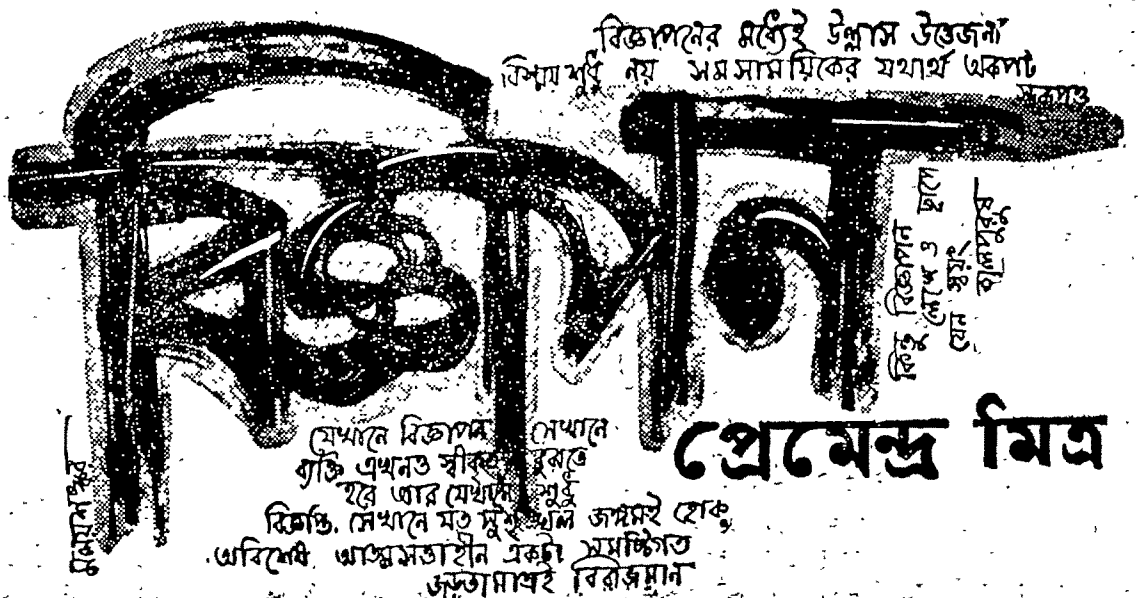

প্রেমেন্দ্র মিত্র

দৈনিক সাপ্তাহিক কি মাসিক, পত্রিকা হাতে পেলে আমরা প্রথমে কি পড়ি আগ্রহ ভরে ? বেশীর ভাগই গল্প উপন্যাস পড়েন নিশ্চয়। বিদেশী সচিত্র কাগজ হলে প্রথমেই পাতা উল্টে ছবিগুলো দেখে নেবার লোভ অনেকেই বোধহয় সামলাতে পারেন না। গল্প উপন্যাসের পর গুরুগম্ভীর প্রবন্ধকে সভয়ে পাশ কাটিয়ে অধিকাংশ পাঠকেরই সরল চুটকি লেখার দিকে নজর যায়।

আমার এক বন্ধুর কাগজ পড়ার আগ্রহের কারণ কিন্তু একটু অদ্ভুত। শুধু খবরের কাগজ নয় সব রকমের পত্রিকাই তিনি বিশেষ একটি আকর্ষণে পড়েন।

সে আকর্ষণ বিজ্ঞাপনের।

তাঁর মতে পত্র-পত্রিকা মাত্রেরই সারবস্তু হল বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন পড়ে যা পাওয়া যায়, বিশুদ্ধ খবর কি আলোচনা, কি কাহিনীতে তা দুর্লভ। বিজ্ঞাপনের মধ্যেই উল্লাস উত্তেজনা বিস্ময় শুধু নয় সমসাময়িকের যথার্থ অকপট স্বরূপও উদ্ঘাটিত।

পত্র-পত্রিকার সারাংশ বলে যা মনে করি তা লেখে সাহিত্যিক সাংবাদিক ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন লেখক। কিন্তু বিজ্ঞাপন লেখে ও ছাপে যেন স্বয়ং বর্তমানের কালপুরুষ।

শুধু ব্যবসায়িক ঘোষণা নয়, কর্মখালি, বাড়ি ভাড়া থেকে হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ কি পাত্র-পাত্রী সংবাদেও সময়ের সুস্পষ্ট পদচিহ্ন আমাদের সামনে মেলা।

পাত্র-পাত্রী সংবাদের পাতাগুলোই বছরের পর বছর উল্টে গেলে আমাদের সাম্প্রতিক সমাজের বিবর্তন কোন দিকে চলেছে তা বেশ কিছুটা ধরা পড়বে।

নেতারা যা-ই বলুন, সমাজ সংস্কারকেরা যা-ই নির্দেশ দিন কাহিনীকারেরা যে ছবি-ই আঁকুন, নর-নারী সম্পর্ক থেকে সুরু করে বর্তমানকালের জীবনযাত্রার প্রায় সমস্ত কিছুর নির্ভুল নিশানা ওই বিজ্ঞাপনেই দেওয়া আছে।

দেশের মানুষ কি খায়, কি পরে, কোথায় থাকে, কি চায়, কিভাবে কখন কোন সমস্যায় পড়ে বা কোন হুজুগে মাতে, তা জানবার জন্যে খবর খুঁজতে কি গুরুগম্ভীর কোনো প্রবন্ধ পড়তে হবে না, বিজ্ঞাপনে যা ছাপানো আর যা লুকানো তা ঠিকমত পড়তে জানলে এ সবকিছুই জলের মত পরিষ্কার।

বিজ্ঞাপন জিনিষটা আমাদের মত সাধারণ মানুষ চিরকালই তবু একটু সন্দেহের চোখে দেখে। বিজ্ঞাপন,—বিশেষ করে কেনা বেচার জিনিষ সম্বন্ধে সাউথুরি করা যার কাজ—তার একটু রং-চড়ানো আদিখ্যেতার ঝোঁক অবশ্য থাকে। নির্জলা সত্য তার কাছে আশা করা-ই ভুল।

কিন্তু সত্যের সঙ্গে মেশানো মিথ্যের ভেজালটুকুও আমার বিজ্ঞাপন-বিলাসী বন্ধু অবহেলার নয় বলে মনে করেন। বিজ্ঞাপনের ভুয়ো বড়াই থেকেই ক্রেতা-বিক্রেতা দুজনেরই মনের আশা আকাঙ্ক্ষা অন্ততঃ বোঝা যায়।

সত্যের ওপর স্বপ্নের পালিশ হিসেবে-ই ওই মিথ্যেটুকু দামী।

বিজ্ঞাপন নিয়ে এতটা বাড়াবাড়িতে মনের সায় পুরোপুরি না থাকলেও, বিজ্ঞাপন ছাড়া পত্র-পত্রিকার কথা আমরা এখন্যে ভাবতে পারি কি? পড়ি বা না পড়ি, পাঠ্য বিষয়ের আশেপাশে মেলার দোকানপাটের মত বিজ্ঞাপন না থাকলে যেন সবই কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

কলকাতার সারা শহরটাতেই রেড রোডের মত সভ্য সৌখীন রাস্তা বিছানো থাকলে কেমন হ'ত?

মানুষ আরও সভ্য উন্নত হবে আশা করতে দোষ নেই। আমাদের বর্তমান নোংরা বিশৃঙ্খল নগর জীবনের অনেক গ্লানি তখন হয়ত ঘুচে যাবে। কিন্তু সে যুগের সেই পরিচ্ছন্ন সব স্থাপত্যমহিমাময় নগরের প্রশস্ত রাজপথগুলিতে আদর্শ পণ্য কেন্দ্রের কল্যাণে রঙের বা আলোর অক্ষরে বিচিত্র শোভায় বিজ্ঞাপিত ছোট বড় দোকানপাটের মেলা কি আর দেখা যাবে না!

আমাদের পত্র-পত্রিকাগুলি অভিজাত ও বিশুদ্ধ হয়ে বিজ্ঞাপনের ইতর সম্ভব কি পরিহার করবে?

ভবিষ্যৎ এমনই যদি উজ্জ্বল হয়, তবু আগামীকালের সুখী ও সৌভাগ্যবান নাগরিক ও পাঠককে তেমন ঈর্ষা করতে বোধহয় পারব না।

একান্ত শিল্পসম্মত হ'লেও বিজ্ঞাপনের মধ্যে আত্মপ্রচারের অমার্জিত স্থূলতার একটু স্পর্শ যে থাকে তা অস্বীকার করবার নয়। তবু যত দোষই থাক, বিজ্ঞাপন কেমন করে যেন স্বাধীন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যভিত্তিক জগতেরই আশ্বাস দেয়।

(শেষাংশ ২৮ পৃষ্ঠায়)

শেষ পর্যন্ত একদিন রীতিমত গঞ্জনাই দিলেন মোনামামা। বললেন, তিন-তিনমাস হয়ে গেল চলে গেছি ওখানে, কতো লোক গেল বাড়ি দেখতে, তোমার আর সময় হলো না একদিন যাবার। আশ্চর্য!'

শুনে মরমে মরে গেলাম।

যাকে বলে লজ্জায় অধোবদন তাই হলাম। তবে টেলিভিশান তো নয়, টেলিফোন, তাই মোনামামাকে দেখাতে পারলাম না সে দৃশ্য। কিন্তু সত্যিই আমার কী অন্যায়! তিন তিনমাস হয়ে গেল নতুন বাড়ি বানিয়েছেন মোনামামা, লোকমুখে শুনছি পাতিপুকুরে ওর তুল্য বাড়ি ইতিপূর্বে নাকি আর হয় নি।

অথচ আমি এখনো—

ছি ছি!

আর পেন্টুর চাকরীটা করে দিয়েছেন ওই মোনামামাই। চাকরীটায় অবশ্য আয় এবং উন্নতি, কোনোটাই সন্তোষজনক নয়, কিন্তু মোনামামা বলেছেন, 'আজকের বাজারে কোনটা সন্তোষজনক শুনি?

'সন্তোষ' শব্দটাই উঠে গেছে এ যুগের অভিধান থেকে। দশটা-পাঁচটা যাওয়া আসা করছে প্যান্ট শার্ট পরে, এই ঢের !'

মোনামামার কথাটা যুক্তিযুক্ত।

কাজেই পেন্টর ব্যাপারে মোনামামার কাছে আমার চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত। অথচ আমি সেই কৃতজ্ঞতার সামান্য পরিচয়টুকুও দিতে পারছি না। মোনামামার নতুন বাড়িটা নতুন থাকতে থাকতে দেখে আসতে পারছি না।

নতুন বৌ দেখা নয় যে উপহার দেবার ভাবনাটুকুও আছে। শুধু একটা নতুন বাড়ি দেখা। শুধু একবার ঢাকুরিয়া থেকে পাতিপুকুর ঘুরে আসা।

মোনামামার গঞ্জনার পর আর উদাসীন থাকা চলবে না। তাছাড়া গঞ্জনাটা যখন টেলিফোনযোগে, তখন নিশ্চয়ই আবারও যোগাযোগ করবেন।

তখন ?

তখন কী উত্তর দেব ?

পথের দূরত্ব ?

শ্রীরামপুর থেকে এসে বাড়ি দেখে যায় নি মোনামামার শালার ছেলে ? রাণাঘাট থেকে ভায়রাভাই? এ খবর মোনামামাই দিয়েছেন।

অতএব একটা ছুটির সকালে ঢাকুরিয়া থেকে পাতিপুকুর পাড়ি দিলাম। ছুটির দিন ছাড়া তো মোনামামাকে পাওয়া যাবে না।

ঠিকানা এবং ডিরেক্‌শান এতো নিখুঁত করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন মোনামামা যে, অন্ধতেও চলে আসতে পারে। মোনামামা বলেও দিয়েছিলেন সে কথা, 'একটা অন্ধ লোকও চলে আসতে পারবে। পাতিপুকুরের বাসে চড়ে বলবি, টার্মিনাসের কাছ বরাবর 'মোজাইক হাউসের' সামনে নামবো। ব্যস! আর কিছুটি বলতে হবে না।'

হ্যাঁ, বাড়ির নাম মোনামামা ওইটিই রেখেছেন।

'মোজাইক হাউস।'

'মার্বেল প্যালেস' যদি হতে পারে 'মোজাইক হাউস'ই বা হবে না কেন? হতে বাধা কি ? ফুটপাথের ধার থেকে ছাদের আলসে পর্যন্ত ওই প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়িটা যখন আগাগোড়াই মোজাইক করিয়েছেন মোনামামা!

না, খুঁজতে সত্যিই বেগ পেতে হলো না।

মোনামামার কথাই সত্যি।

এ তল্লাটে এমন বাড়ি আর একখানাও দেখলাম না। মানে এমন মালটি কালার্ড! তিনরঙা গ্রীন, সাড়ে তিনরঙা দেওয়াল, দুরঙা দরজা-জানলা, যেন চমৎকার একটি বৃহৎ খেলনা। অথবা সৌখিন পাবলিশারের ঘরের বই।

দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন মামা, রাস্তা থেকেই আমায় দেখতে পেয়ে উদাত্ত আহ্বান জানালেন, 'আয় আয় উঠে আয়। ওই যে পাশেই নীল গেট, ...আচ্ছা না না, এই সামনের দরজা দিয়েই চলে আয়। ঢুকেই সিঁড়ি দেখতে পাবি, সো-জা উঠে আয়। দেখিস জুতোয় 'স্লপ' ধরে পড়ে যাস নি যেন। সিঁড়িটায় দুর্দান্ত পালিশ!... সময় হলো এতোদিনে? উঃ!'

শেষের কথাগুলো অবশ্য সিঁড়ির মুখ থেকে বললেন, কারণ ততোক্ষণে উঠেই এসেছি দুর্দান্ত সিঁড়িটা দিয়ে।

মোনামামা একটু পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, 'কেমন দেখছিস ?'

'ভালই তো!'

বলেই মনে হলো এই হোমিও-প্যাথিক ভোজের প্রশংসাবাণীতে যেন মন উঠলো না মোনামামার। তাড়াতাড়ি যোগ করে দিলাম, 'দুর্দান্ত!'

মোনামামা প্রসন্ন হলেন।

আত্মস্থ গলায় বললেন, 'কতো খরচ পড়লো বল দেখি ?'

কতো খরচ পড়লো!

কপালে হাত ঠেকিয়ে বলি, 'খোদা জানে আর তুমি জানো মামা, আমার ধারণার বাইরে।'

'তবু আন্দাজ ?'

মোনামামা একটি চোখ কুঁচকে মিটিমিটি হাসেন।

আমি অকপটেই স্বীকার করি, আমার আন্দাজ, অনুমান, কল্পনা, জল্পনা, কোনো কিছুই কাজে লাগবে না মামা। একখানা ইঁটের দামই জানি না, আর এই বৃহৎ অট্টালিকার ব্যাপার!'

মোনামামা হাসেন।

একদা মোনামামা বলেছিলেন 'সন্তোষ' শব্দটাই এ যুগের অভিধান থেকে উঠে গেছে— দেখলাম একেবারেই উঠে গেছে, একথা বলা চলে না। অন্ততঃ মোনামামার অভিধানে আছে।

সেই শব্দটির প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা মুখে মেখে মোনামামা বললেন, 'থাক তবে আর বলতে চাই না। হয়তো ভাববি মামাব্যাটা চাল ফলাচ্ছে। যারা বাজার জানে, তারা ঠিকই বোঝে।'

'বাজার-অনভিজ্ঞ আমি বলি,' 'তা তো বটেই।'

মোনামামা আবার একটু 'সেই' ব্যাখ্যাময় হাসি হেসে বলেন, 'শুধু মোজেকেই হাজার বাইশ-তেইশ পড়লো। একেবারে ফার্স্ট ক্লাশ মেটিরিয়ালস দিয়েছি তো! রোজ রোজ যখন বাড়ি করছি না—'

নিঃশ্বাস ফেলে বলি, 'কিন্তু মামা, বাড়িটা এমন চুপচাপ কেন ? মামী কই? বাপী কই?'

'বাপী ? সে তো বেরিয়েছে সাঁতার দিতে। সাঁতার ক্লাবে ভর্তি করে দিয়েছি তো! আর তোদের মামী ? মামী এ সময় যেখানে থাকে। ঠাকুর ঘরে। আজ আবার ছুটির দিন তো। মনের আনন্দে—ঠাকুর ঘরটি যা বানিয়ে দিয়েছি! চল না, দেখবি চল। আগে ঠাকুর ঘরেই চল। ঠাকুর দর্শন, মামী দর্শন দুই-ই হয়ে যাক।'

'না না, পুজোর সময় ডিস্টার্ব—'

মোনামামা সে ভাবনা নস্যাৎ করে দেন।

'ডিস্টার্ব আবার কি? তুই তো আর গল্প করতে বসবি না ? দরজা থেকে দেখে আসা মাত্র।'

অগত্যাই সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাই তিনতলায়।

যেতে যেতে মামা বলেন, 'তোর মামীর তো জানিস বরাবরই পুজো-পুজো বাতিক! তা দিলাম একখানা ঘরের মতো ঘর বানিয়ে! যতো পারো পুজো করো।...শুধু এই ঠাকুর ঘরটিতেই কতো একস্ট্রা খরচ পড়েছে জানিস ? ...না থাক্, তুই তো আবার দর দাম বুঝিস না। তবে হ্যাঁ দেখে বুঝবি।'

তা দেখে বুঝলাম।

বুঝলাম এই ছোট্ট ঘরখানিতে অনেক রাজকীয় ব্যাপার করেছেন মোনামামা। রাধাকৃষ্ণের মূর্তি আঁকা গ্রীন, পদ্ম-টদ্ম আঁকা মেজে, আরো সব কী যেন। তাছাড়া চকচকে ঝকঝকে ঠাকুরও দেখলাম সিংহাসনে।

ঠাকুর, ঠাকুর ঘর এবং মুদ্রিত নেত্র মামীকে দেখে নেমে এলাম। এবং এসে দেখলাম, মামার সবটাই রাজকীয়।

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রত্যেকটি কোণ পর্যন্তই দেখালো তো মোনামামা যত্ন করে।

'জানলা-দরজা সব আসল টিক্ উড্ বুঝলি? কন্ট্রাক্টর-কন্ট্রাক্টরের হাতে দিই নি, সব নিজে কিনেছি, নিজে দাঁড়িয়ে করিয়েছি। কোনোখানে ভেজালের কারবার নেই। দরজা-

জানলার হ্যাণ্ডেলগুলো দেখেছিস লক্ষ্য করে? বাজারের সেরা জিনিস!

আত্মতৃপ্তির মধুর মসৃণ মুখে মামা আমায় বোঝান, 'এই হচ্ছে বাপীর শোবার ঘর, এটা বাপীর পড়ার ঘর, এটা আমার ঘর, আর এর লাগোয়া ঘর-দুখানা তোর মামীর ঘর। ওঁর হুকুম ছিল কিনা দুটো ঘর চাই, মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে আসবে, একটা ঘরে অকুলান হবে।...গেস্টরুম গোছের একটা ঘর রাখার ইচ্ছে ছিল, এখন আর হলো না। পরে দেখা যাবে। ...ঘরে-ঘরে এটাচ্‌ড্‌ বাথ্‌ করাতে গিয়ে বিস্তর খরচ পড়ে গেল তো!'

ঘরগুলো দেখছিলাম, দেয়ালের অনেক উঁচু পর্যন্ত মেজের মতই বিচিত্র বর্ণের মোজাইক।

কারণটা কি!

মামা আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে বলেন, 'এতটা উঁচু পর্যন্ত মোজেক করেছি কেন বল দেখি? বলতে পারছিস না? দেয়াল ময়লা হবে না বলে। আমাদের বাঙালীর স্বভাব তো জানিস? দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে বসবে, দাঁড়াবে, তেল তেল হাত দেবে, দিলাম পাঁচ ফুট পর্যন্ত মোজেক মেরে। নে, কতো ময়লা করবি কর।'

কারণটা শুনে নিশ্চিন্ত হলাম।

দেয়ালের মধ্যে কোনো চোরা কুঠুরীর কারবার নেই, কেবলমাত্র 'বাঙালীর স্বভাব'ই এই অভূতপূর্ব ঘটনার কারণ।

'এইটা হচ্ছে ডাইনিং স্পেস্‌' ডাইনিং টেবিলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বোঝালেন মোনামামা, টেবিল-ফেবিল সবই নতুন করালাম। পুরনো ফার্নিচারের চিহ্নমাত্র রাখি নি, সব বেচে দিয়েছি। এই বাড়িতে বুঝলি, পুরনো ফার্নিচারগুলো যেন দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো।'

না বলে উঠে পারি না, 'সে সমস্ত তোমার বিয়ের পাওয়া না মোনামামা?'

মোনামামা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলেন, 'তোরও বুঝি তোর মামীর মতো সেন্টিমেন্ট? বিয়েতে পাওয়া তো কি? আরে বাবা, তোদের মামীকে তো আর বাতিল করছি না। দেখতে সামঞ্জস্য বলে একটা জিনিস আছে তো?'

'তা বটে।'

'রুচি সৌন্দর্যবোধ এসব থাকবে না মানুষের?'

'তাও বটে।'

'ওই তো।...আয় এদিকে রান্না-ঘর—'

বললাম, 'বুঝতে পেরেছি। পাশা-পাশি ওই দুটো রান্না আর ভাঁড়ারঘর তো?'

'ওখান থেকেই অমনি সব বুঝে ফেললি তুই?'

মোনামামা ধমকের সুরে বলেন, 'রান্নাঘরের সাজ-সজ্জাগুলো দেখবি তো!'

মোনামামার মুখে একটি বিজয় গৌরবের হাসি ফুটে ওঠে, ঘুটে কয়লা-আলাই-বালাই সব বিদেয় করেছি বুঝলি? স্রেফ্‌ কুকিং রেঞ্জ। এদিকে একটা গ্যাস স্টোভও রেখেছি, ব্যস! তাকিয়ে দেখছিস? এ ঘরের মাথা পর্যন্ত মোজেক! রান্নার ধোঁয়ায় ঝুল-কালি পড়বার পথটি রাখি নি।'

'কিন্তু মামা, তোমার রান্নাঘরে তো ধোঁয়াই নেই।'

মামা সন্তোষের গলায় বলেন, 'তা নেই বটে। তবে রান্নার একটা ঝুল-কালি তো আছেই! সে পথও মেরে দিয়েছি।'

ঘুরে ঘুরে মামার সব কিছুই দেখতে হলো।

ঠাকুরঘর থেকে কুকুরের ঘর।

মায় বাথরুম।

ঘরে ঘরে প্রত্যেকটি।

ওটা অবশ্য দেখবার ইচ্ছে বিশেষ ছিল না, কারণ তিনি তিনমাস বসবাস করছেন এখানে মোনামামা।

কিন্তু মোনামামা ছাড়লেন না।

'আয় না, আয় ঢুকে আয়! সব পরিস্কার।' বলে একরকম ঠেলেই ঢুকিয়ে দিলেন মামা আমায় তাঁর অতি আধুনিক বেসিন বাথটব শাওয়ার কমোড শোভিত বাথরুমের একেবারে অন্দরে।

দেখাবার সময় মামার মুখে যে দিব্যজ্যোতি ফুটে উঠতে দেখলাম, তাতে মনে হলো এইটিই মোনামামার বাড়ির সর্বাপেক্ষা দ্রষ্টব্য।

'কী? পছন্দ হলো?'

মোলায়েম একটু হাসির সঙ্গে এমন ভঙ্গীতে প্রশ্নটি করলেন মোনামামা, যেন কোনো পরমাসুন্দরী কন্যার পিতা, মেয়ে দেখিয়ে পাত্রের পিতাকে প্রশ্ন করছেন।

মোনামামার বাথরুম আমার পছন্দ না পছন্দয় কী এসে যাচ্ছে এবং পছন্দ হলেই বা তার উপকারিতা কি বোধগম্য না হলেও মহোৎসাহে বললাম, 'তা আর বলতে!

'বলতেই হবে।'

মোনামামা মহতী মহোৎসাহে বলেন, 'শুধু এই বাথরুমের ফিটিংসেই কতো খরচ পড়েছে জানিস? শুনলে মাথা ঘুরে যাবে।'

ব্যস্ত হয়ে বলি, 'তবে থাক মামা। শুনে কাজ নেই। আমাকে আবার রৌদ্রের মধ্যে অনেক দূরে যেতে হবে। পাতিপুকুর থেকে ঢাকুরে।'

'পাতিপুকুর নয়।'

মোনামামা এবার একটু গম্ভীর হাসি হেসে বলেন, 'বোঝানোর সুবিধের জন্যে অবশ্য পাতিপুকুরই বলেছি, তবে এই পাড়াটার আসল নাম হচ্ছে 'বিউটি পার্ক'। সেই নামেই চিঠিপত্তর আসবে।'

বাড়ি দেখে-টেখে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লাম একটু।

বসলাম মামার সেই বারান্দায়।

চেয়ার পাতাই ছিল দুটো।

মোনামামীও কি বসেন এসে? কে জানে।

মামা আর একবার গর্বিত হাসি হেসে বলেন, 'এ দিকটা কোন দিক বুঝতে পারছিস? পারছিসনা না? অন্য পাড়ায় গেলে আমারও দিক্‌ ভুল হয়ে যায়। এটি হচ্ছে দক্ষিণ দিক।'

এমনভাবে বলেন, শুনে মনে হলো 'দক্ষিণ' নামক দিক্‌টি মোনামামার নিজের আবিষ্কার।

বাধ্য হয়েই এই আবিষ্কারে উৎসাহ দেখাতে হয়।

বলতেই হয়, 'সত্যি? এই দিকে বারান্দা?'

যেন দক্ষিণ দিকে একটি বারান্দা থাকা প্রায় অলৌকিক ঘটনা।

মোনামামাও সেইভাবেই বলেন, সত্যি না-তো কি। দক্ষিণে এই বারান্দাটি রাখবার জন্যে প্ল্যানের সময় কম মাথা ঘামিয়েছি।...কিন্তু তোর মামী যে এখনো পুজোর ঘর থেকে নামলো না। তোর একটু চা-টা খাওয়া হলো না—।

বললাম, 'থাক্‌ থাক্‌ ব্যস্ত হবার কী আছে? আছি তো একটু। মামীর সঙ্গে দেখা না করে তো যাব না।'

মামা সকাতর নিশ্বাসে বলেন, 'দেখি তোর ভাগ্য। কখন নামে। মনের মতো পুজোর ঘর পেয়ে তোর মামী তো একেবারে—যা করে ওই চাকর ব্যাটা। তা ব্যাটা চা-ফা একেবারেই করতে পারে না। যদি করলো তো অখাদ্য।'

কৌতূহল আমার স্বভাব নয়, তবু একটা কৌতূহল অদম্য হলো, বলেই ফেললাম, 'তা হলে? ওই লোক তোমার কুকিং রেঞ্জ-টেঞ্জে রাঁধতে পারে?'

'ক্ষেপেছিস!' মামা প্রবল গলায় বলে ওঠেন, 'ব্যাটা বাপের জন্মে চোখে দেখেছে ওসব? যা শিখেছে, তাতেই করে। দুটো জনতা স্টোভ কিনে

উদ্দাম, ভয়ঙ্কর স্বরে কর্তব্য পালন শুরু করে দিয়েছে

দিয়েছি, ওতেই রাঁধে-বাড়ে। মাটিতে পাতা চিরকেলে উনুন হয় নি বলে রাগ করে তোদের মামী তো রান্নাঘরের ছায়া মাড়ায় না।'

বেলা বাড়ছিল।

মামীর পদধ্বনির আশায় অপেক্ষা করে করে হতাশ হয়ে বলি, 'মামা আজ তবে উঠি। আর একদিন বরং এসে মামীর সঙ্গে দেখা করবো। অনেক দূরে যেতে হবে তো।'

মোনামামা—অবিবেচক নয়।

মোনামামা দক্ষিণের বারান্দায় বসেও রোদের ওজন অনুমান করে দরদের গলায় বলেন, 'তবে না হয় তাই যা! আসিস কিন্তু আর একদিন বাপটীর সঙ্গেও দেখা হলো না। সে এলে তবু দুমদাম ছাতে উঠে ডেকে আনে। নচেৎ হুঃ!' তাই তো বলি তোর মামীকে, 'স্বর্গের টিকিটটা তুমিই কিনবে!'

মোনামামী স্বর্গের টিকিট কিনুন, আমার এখন অন্য টিকিটের চিন্তা। সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছি—দেখি সামনেই ভয়ঙ্কর দাঁত খিঁচোনো এক সারমেয় মূর্তি। আমায় দেখে উদ্দাম ভয়ঙ্কর স্বরে কর্তব্য পালন শুরু করে দিয়েছে।

বাড়ি দেখার সময় সিঁড়ির গায়ে কুকুরের ঘর দেখেছিলাম বটে, চকচকে ছিমছাম, —কিন্তু কুকুর দেখি নি। ভেবেছিলাম ঘরটা বাড়ির প্ল্যানের একটা অঙ্গ। যেমন আমি আপনি এবং আরো অনেক গাড়িবিহীন ব্যক্তি বাড়ি বানাবার সময় একটা গ্যারেজ বানিয়ে রাখে। প্ল্যানের অঙ্গ হিসেবে।

কিন্তু এ তা নয়, ঘরের মালিক আছে।

এবং ভীমনিনাদে আমার উপস্থিতিতে আপত্তি জানাচ্ছে।

আমি কুকুরের প্রীত লোক নই, বরং কুকুরে ভীত। অতএব এই ভীমনিনাদে দিশেহারা হয়ে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে 'কাঁধো বাঁধো' করে আর্তনাদ করতে থাকি।

মোনামামার আশ্বাসের কণ্ঠ, 'কিছু করবে না, কিছু করবে না—' কোনো কাজেই লাগে না।

বেশ কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর মোনামামার চাকর কুকুরটাকে বাঁধতে সমর্থ হয়। আমিও ঊর্ধ্বশ্বাসে নেমে আসি। কিন্তু তখুনি ছাড়ছে কে? মোনামামার শুধুই তিনতলা আছে, দোতলা আছে? একতলা নেই?

দেখেছি সেটা?

শুধু তো সোজা সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসেছি।

মোনামামাও আমার সঙ্গে তরতরিয়ে নেমে আসেন। বলেন, 'নিচতলাটা তো দেখলি না?'

বললাম, 'ও তাই তো। নীচতলাটায় কে থাকে?'

'নীচতলায় আবার কে থাকবে?'

মোনামামা অমোঘ সুরে বলেন, 'ভাড়াটে আছে। তুই যে দরজাটা দিয়ে ঢুকলি, সামনের বড় দরজা, আসলে ওটা ওদেরই 'এনট্রেন্স'। মেজেনাইন ফ্লোরটাও ওদের ভাগে কিনা। সিঁড়িটা চাই। তবে বাইরের লোক-টোক এলে ওই বড় দরজা দিয়েই উঠিয়ে নিই তাকে। কিছু বলে না ওরা। খুব ভদ্র। নন-বেঙ্গলী তো। তাছাড়া—'

মোনামামা একটু রহস্যের ব্যঞ্জনা মুখে বিকশিত করে বলেন, 'তাছাড়া ভাড়ার ব্যাপারে যা বলো 'না'-টি করে না। বাঙালী হলে ঠিক বলে বসতো, গলা কাটছেন মশাই!' ঘোট ধরে বসেছিলাম, ভাড়াটে না জোটে সেও ভালো, বাঙালী ভাড়াটে ঢোকাচ্ছি না। যতো সব ন্যাস্টি। এরা কী পরিষ্কার!—

(শেষাংশ ২৪৩ পৃষ্ঠায়)

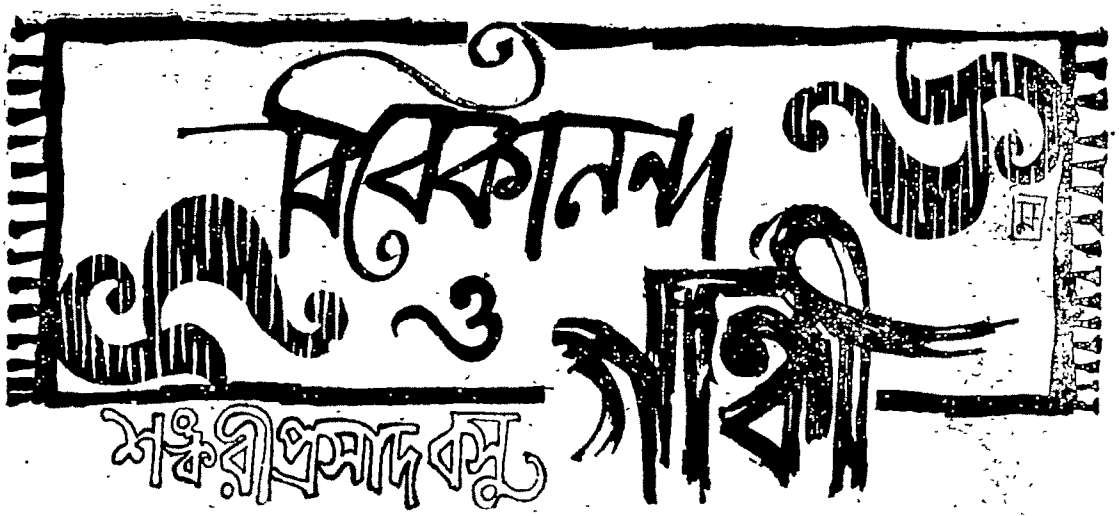

॥ ১ ॥

১৯০১ সালের শেষভাগে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান করতে কলকাতায় এসেছিলেন লোকমান্য তিলক। ঐ সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে বেলুড়ে গিয়ে তিলক সাক্ষাৎ করেন এবং তিলকের মনের উপরে এই সাক্ষাৎকার গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তিলক, পরবর্তী প্রায় কুড়ি বছর ভারতের রাজনৈতিক জীবনে নেতৃত্ব করেছেন।

একই সময়ে, অর্থাৎ ১৯০১-এর একেবারে শেষে বা ১৯০২-এর গোড়ায় স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আর একজন বেলুড়ে হাজির হয়েছিলেন, তিনি কিন্তু স্বামীজীর সাক্ষাৎ পান নি, কারণ স্বামীজী অসুস্থ অবস্থায় তখন কলকাতায় ছিলেন—যিনি সাক্ষাৎ করবার সুযোগ পান নি তাঁর নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী—তিলকের পরে পুনশ্চ কুড়ি বছর যিনি ভারতের রাজনৈতিক জীবনের প্রধান পুরুষ।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর সেই দ্বিতীয় কলকাতাবাস। এর আগে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি কলকাতায় কয়েকদিন কাটিয়েছিলেন। সেবারে কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। ১৯০১-এর কংগ্রেস উপলক্ষে কলকাতায় এসে তিনি সেই চেষ্টা করলেন। ক্রীশ্চান প্রচারক রেভারেণ্ড কালীচরণ ব্যানার্জি, বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তারপরে ব্রাহ্ম নেতাদের সঙ্গে যোগস্থাপন করলেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের রচনার সঙ্গে আগেই পরিচিত ছিলেন;—সাক্ষাৎ করলেন শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে। তারপরে—গান্ধীজীর আত্মজীবনীর অংশ উদ্ধৃত করছি—

"ব্রাহ্মসমাজের যথেষ্ট কিছু দেখার পরে, স্বামী বিবেকানন্দকে না দেখে সন্তুষ্ট থাকা সম্ভব ছিল না। সুতরাং বিপুল উৎসাহের সঙ্গে বেলুড় মঠে গেলাম। অধিকাংশ পথ, কিংবা হয়ত গোটা পথটাই, পায়ে হেঁটেছিলাম। লোকালয় থেকে দূরে মঠের নিভৃত পরিবেশটি আমার বিশেষ ভাল লেগেছিল। কিন্তু খুবই আশাহত ও দুঃখিত হলাম যখন শুনলাম স্বামীজীর দর্শন পাওয়া যাবে না কারণ অসুস্থ অবস্থায় তিনি তাঁর কলকাতার আবাসে রয়েছেন।"

'বিপুল উৎসাহের সঙ্গে' পায়ে হেঁটে বেলুড় মঠে গিয়ে যখন স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল না তখন দুঃখিত গান্ধীজী অগত্যা দেখা করলেন ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে।*১ এই সাক্ষাৎকার তাঁকে মোটেই খুশি করেনি। আত্মজীবনীতে এ সম্বন্ধে অত্যন্ত দায়িত্বহীন যে-মন্তব্য করেছেন, সে বিষয়ে কিছু মন্তব্য আমরা পরে করব, এখন তাঁর রচনাংশটুকু উদ্ধৃত করিঃ

"তারপরে আমি ভগিনী নিবেদিতার বাসস্থান খুঁজে বের করলাম—চৌরঙ্গীর এক প্রাসাদোপম বাড়িতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তাঁর চারপাশে জাঁকজমকের চেহারা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, এবং, আমাদের কথাবার্তার মধ্যেও বেশি কিছু ঐক্যের বিষয় ছিল না। সে সম্বন্ধে গোখলেকে আমি বলেছিলাম। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, এতে অবাক হবার কিছু নেই; নিবেদিতার মত অস্থিরচিত্ত (Volatile) নারীর সঙ্গে তোমার ভাবৈক্যের কোনো অবকাশ থাকতেই পারে না।"

॥ ২ ॥

স্বামীজীর সঙ্গে গান্ধীজীর সাক্ষাৎ হয় নি। হলে কি হত, সে বিষয়ে নানামুখী অনুমানের সুযোগ আছে। তেমন কিছু অনুমানের আগে যে-গান্ধী স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতে গিয়েছিলেন, তাঁর তৎকালীন মনের চেহারা এবং ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর অংশ সম্বন্ধে কিছু ভূমিকা করা দরকার।

ব্যারিস্টার গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় যান একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মামলায় সাহায্য করতে, ১৮৯৩ সালে। শ্রমজীবীরূপে অথবা ব্যবসায়ীরূপে পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রচুর ভারতীয়

*১ গান্ধীজীর লেখা থেকে মনে হয়, স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়ার অব্যবহিত পরেই তিনি নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করেন। তা কিন্তু ঠিক নয়। ১৯০২-এর ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষের দিকে নিবেদিতা পাশ্চাত্ত্য থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন। সুতরাং গান্ধীজী ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষে বা দ্বিতীয় সপ্তাহের গোড়ায় নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করেন। স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে গান্ধীজী কিন্তু জানুয়ারী মাসেই গিয়েছিলেন, কারণ, স্বামীজী জানুয়ারী মাসের গোড়ায় বারাণসী ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। একথা স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁর বিবেকানন্দ-জীবনীতে লিখেছেন। আত্মজীবনীর মধ্যে (প্রথম খণ্ড, ১৬ অধ্যায়) গান্ধীজী বলেছেন, কংগ্রেস শেষ হবার পরে তিনি এক মাস কলকাতায় ছিলেন। সেকথাও ঠিক নয়। কংগ্রেস ডিসেম্বরের শেষে সমাপ্ত হয়, গান্ধীজীর সঙ্গে নিবেদিতার সাক্ষাৎ হয় সম্ভবতঃ ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহের শেষের দিকে। সুতরাং তিনি কংগ্রেস শেষ হবার পরে অন্ততঃ প্রায় দেড় মাস কলকাতায় ছিলেন।

হাজির হয়েছিল। সেখানকার ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকরা আফ্রিকাবাসী বা ভারতীয় বসবাসকারীদের মানবিক অধিকার স্বীকারে রাজি ছিল না। ইউরোপীয়দের অমানবিক আচরণের প্রত্যক্ষ ফলভোগ গান্ধীজী করেন। অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও তিনি শুরু করেন। তাঁরই চেষ্টায় সেখানকার ভারতীয়রা সংঘবদ্ধ হন। এক বছরের শর্তে গান্ধীজী গিয়েছিলেন, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়রা তাদের এই নূতন বন্ধু ও নেতাকে তখনি আসতে দেন নি; গান্ধীজীর পক্ষেও আসা শক্ত হয়ে উঠেছিল কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার ভারতীয়দের উপর একটি অত্যন্ত অন্যায় কর চাপাতে মনস্থ করেছিলেন। তদুপরি ভারতীয়দের ভোটাধিকার না দেওয়ার ব্যবস্থাও হয়েছিল। গান্ধীজীর নেতৃত্বে গঠিত নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস এই করের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আংশিক সাফল্য লাভ করে।

দক্ষিণ আফ্রিকার ঘটনাবলী ভারতীয় সংবাদপত্রে, বিশেষতঃ দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের সংবাদপত্রে বড় আকারে স্থানলাভ করতে শুরু করে ১৮৯৬ সালের পর থেকে। তারও পূর্বে নিশ্চয় ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগ নিয়ে ভারতীয় পত্রিকায় কিছু লেখা হয়ে থাকবে। ভারতীয়দের 'ভোটাধিকার হরণ বিল'-এর (Defranchising Bill) প্রতিবাদে ১৮৯৪ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতীয়গণ যে গণ-আবেদন করেন, সে বিষয়ে বোম্বাইয়ের 'দি টাইমস অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকা 'এক প্রধান সম্পাদকীয় রচনায় ভারতীয় দাবির পক্ষে জোরালো সমর্থন জানায়।'*২

১৮৯৬ সালে ভারতে ফিরে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের সমস্যা সম্বন্ধে ভারতবাসীকে সচেতন করতে চেষ্টা করেন। বোম্বাইয়ে ও মাদ্রাজে তিনি এ-ব্যাপারে সমর্থন পান—সেখানে প্রকাশ্য সভাতে ঐ সম্বন্ধে বক্তৃতাও করেছিলেন—কিন্তু কলকাতায় সাড়া পান নি। এমন হবার একটা হেতু, বাংলাদেশ প্রত্যক্ষভাবে সমস্যাটির সঙ্গে জড়িত ছিল না—দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়গণ প্রধানতঃ পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী। গান্ধীজী তাঁর আত্মজীবনীতে কলকাতার অমৃতবাজার ও বঙ্গবাসী কাগজের অবজ্ঞার কথা জানিয়েছেন। সেইসঙ্গে 'বাংলার হৃদয়দেবতা' সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনতিউৎসাহের কথাও।*৩ অবশ্য কলকাতার দুই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র স্টেটসম্যান ও ইংলিশম্যান এক্ষেত্রে গান্ধীজীর বক্তব্যকে অত্যন্ত আগ্রহ ও সহানুভূতির সঙ্গে বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করেছিল। বোম্বাইয়ের টাইমস অব ইণ্ডিয়া আগে থেকেই গান্ধীজীর সহায়ক ছিল, এমন কি এলাহাবাদের অতীব রক্ষণশীল সাম্রাজ্যবাদী পায়োনীয়ারের নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতিও গান্ধীজী পেয়েছিলেন।

ভারত ভ্রমণ অসমাপ্ত রেখে গান্ধীজীকে ১৮৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে অকস্মাৎ দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে যেতে হয়। তখন সেখানকার পার্লামেন্টের অধিবেশন আসন্ন। গান্ধীজী যাত্রা করেন ১লা ডিসেম্বর; ২৩ দিন পরে ডারবানে অবতরণ করেন—তারপরেই ইতিহাসের চিহ্নিত ব্যক্তি হয়ে যান।

ইতিহাসের বহু বিস্ময়কর বিধানের সঙ্গে আমরা পরিচিত। এখানে অল্প-কিছুর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ১৮৯৩ সাল ভারত ইতিহাসের এক বিচিত্র বৎসর। এই বছরে একজন তরুণ সন্ন্যাসী ভারতের দুর্গতি মোচনের ইচ্ছায় আমেরিকার জাহাজ ধরেছিলেন। ঠিক এই বছরই একজন তরুণতর ব্যারিস্টার গ্রাসাচ্ছাদন ও নতুন দেশ দেখার আকর্ষণে আফ্রিকার জাহাজ ধরেছিলেন। এঁরা দুই-জনই আমেরিকায় ও আফ্রিকায় নিজেদের

আবেদন সম্পর্কে সমর্থন জানিয়েছিল। সেই রচনার কথা গান্ধীজী জেনেছিলেন কি না, কিংবা জানলেও যথেষ্ট মনে করেছিলেন কি না বলতে পারব না। রচনাটি এই:

"Mr. M. K. Ghandi's appeal on behalf of the oppressed Indians of South Africa was the subject of discussion at a recent meeting of the Bombay Presidency Association. The Hon. Mr. P. M. Mehta was in the chair. It was unanimously resolved that the Chairman should forthwith memorialise the Secretary of State for a redress of the grievances of the Indians of South Africa. We earnestly hope the whole country will take up the matter in right earnest. Bombay has set the example; other towns should follow it. Our suffering brethren of South Africa are entitled to as much sympathy and support as anybody living in this country. There should be one cry for th eredess of their grievances all over the country." (*Bengalee*, Oct. 17, 1896).

১৮৯৬ সালে কলকাতায় দেশীয় অভ্যর্থনা সম্বন্ধে গান্ধীজী লিখেছেন: "আমাকে অবশ্য বাংলার হৃদয়দেবতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে হয়েছিলই। তাঁর দেখা যখন পেলাম, তখন তিনি বহু বান্ধবান্ধব পরিবৃত। তিনি বললেন—'আমার আশঙ্কা হয়, লোকে আপনার কাজেকর্মে কোনো আকর্ষণ বোধ করবে না। বেরুতেই পারছেন, এখানে আমাদের নিজস্ব সমস্যার শেষ নেই। তবে আপনি যথাসাধ্য

২* গান্ধীজীর আত্মজীবনী দ্রষ্টব্য।

৩* সুরেন্দ্রনাথের বেঙ্গলী কাগজ কিন্তু ১৮৯৬ সালের ১৭ অক্টোবর বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত সভার উল্লেখ করে গান্ধীজীর

চেষ্টা অবশ্যই করবেন। মহারাজাদের সহানুভূতি আপনাকে সংগ্রহ করতে হবে। নিশ্চয় করে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করবেন। রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায় ও মহারাজা ঠাকুরের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করবেন কারণ তাঁরা দুজনেই উদার মনের এবং তাঁরা জাতীয় কাজে অংশগ্রহণ করেন।'

"ঐ ভদ্রলোকদের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করলাম, কিন্তু ফল হল না কিছু। উভয়েই খুবই শীতল অভ্যর্থনা পেলাম। তাঁরা বললেন, কলকাতায় প্রকাশ্য জন-সভার আয়োজন করা সহজ ব্যাপার নয়, আর সত্যই যদি কিছু করতে হয়, সুরেন্দ্রনাথ ছিন্ন উপায় নেই।

"দেখলাম, আমার কাজ ক্রমেই কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অমৃতবাজার পত্রিকার অফিসে গেলাম। যে-ভদ্রলোকের সঙ্গে সেখানে সাক্ষাৎ হল তিনি তো আমাকে প্রায় উদ্বাস্তু ইহুদী বলেই মনে করলেন। আর একঠাঁই এগিয়ে গেল বঙ্গবাসী। সম্পাদক এক ঘণ্টা আমাকে বসিয়ে রাখলেন। তাঁর দেখা-সাক্ষাতে অনেকেই উপস্থিত, বোঝা গেল। সকলের সঙ্গে কথাবার্তা সাঙ্গ হবার পরেও যে তিনি আমার বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেবেন তা মনে হল না। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে যখন আমি আমার বক্তব্য বলতে সচেষ্ট হলাম তিনি বললেন, দেখছেন না, আমার হাতে কত কাজ! আপনাদের মত আগন্তুকের তো আসার কামাই নেই। এখন আপনি আসুন। আপনার সঙ্গে বাক্‌চিত করার বিশেষ ইচ্ছা আমার নেই। শুনে তখন খুবই আহত বোধ করলাম, কিন্তু অবিলম্বে সম্পাদকের অবস্থাটা বুঝলাম। বঙ্গবাসীর খ্যাতির কথা শুনেছিলাম। নিজের চোখেই দেখলাম, কিভাবে দলে দলে লোক আসছে দেখা করতে। ঐ সকল লোকই সম্পাদকের পরিচিত। তাঁর কাগজের আলোচ্য বিষয়বস্তুর কোনো অভাব নেই এবং সাউথ আফ্রিকার বিষয়টি তখন প্রায় কারো জানা নেই।" (আত্মজীবনী)

প্রতিভা প্রকাশ করে, ভারতবর্ষের বাচার পথ খুলে দিয়েছিলেন।

১৮৯৭ খৃস্টাব্দে বিবেকানন্দ ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন, জন্মস্থান কলকাতায় এলেন ফেব্রুয়ারী মাসে। স্টেটসম্যান কাগজে তাঁর কলকাতা ফেরার খবর বেরিয়েছিল ২০শে ফেব্রুয়ারী। তার অল্পদিন পরে ৪ঠা মার্চ, ঐ কাগজে আর একটি সংবাদ বেরোয়—তার শিরোনামা ছিল নিম্নোক্তপ্রকার ঃ

INDIANS IN SOUTH AFRICA
Mr. Ghandi Mobbed

৭ই মার্চ তারিখে তিলক-সম্পাদিত পুণার ইংরাজি সাপ্তাহিক মারহাট্টায় প্রকাশিত শিরোনামাটি আরও পরিচ্ছন্ন ঃ

The Reception of Mr. Gandhi in Natal
Mr. Gandhi Ashore
Mobbed, Stoned and kicked
A narrow Scape—How he eventually disappeared

বিবেকানন্দ

স্টেটসম্যান ঐ সংবাদ-সূচনায় লিখেছিল—"বোম্বাইয়ের ব্যারিস্টার মিঃ গান্ধী, গত নভেম্বরে যিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়গণের পক্ষে সহানুভূতি সৃষ্টির জন্য ভারতভ্রমণ করেছিলেন—নাটালে ফিরে যাবার পরে জনতার প্রহারে মারা যেতে-যেতে বেঁচে গেছেন।" গান্ধীজী কিভাবে লিনচ্‌ড্‌ হচ্ছিলেন, স্টেটসম্যানে তার বিস্তৃত বিবরণ বেরিয়েছিল, মোটামুটি তা এই ঃ

কুরল্যান্ড এবং নাদেরি নামক দুটি স্টিমারে করে প্রায় ৬০০ জন ভারতীয় সঙ্গে গান্ধীজী নাটাল বন্দরে হাজির হন। কিন্তু ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকরা স্থির করে যে, তাঁদের অবতরণ করতে দেবে না। নাটাল সরকার অবশ্য অ্যাটর্ণি জেনারেল মিঃ এসকোম্বের মারফৎ জাহাজের ক্যাপ্টেনকে জানান, জাহাজের যাত্রীরা 'নিজ গ্রামে যেমন নিরাপদ, এখানে নাটাল সরকারের অধীনেও তেমনি নিরাপদ।' গান্ধী বিকাল সাড়ে চারটের সময়ে একটি পালকিতে করে জাহাজ ছেড়ে কূলের দিকে যাত্রা করেন, সঙ্গে ছিলেন সলিসিটর মিঃ ল্যাংটন। পাঁচটার সময়ে তাঁরা ঘাটে ওঠেন। স্টেঞ্জার স্ট্রীটে প্রবেশ করলে কতকগুলি ছোকরা গান্ধীকে চিনতে পারে। তারা মাছ ধরছিল। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে ভেঙাতে থাকে, হল্লা তোলে, তাতে অল্প সময়ের মধ্যে জনতা জমে যায়। মিঃ ল্যাংটন বিপদ বুঝে তাড়াতাড়ি রিক্সা ডাকেন, কিন্তু ছোকরারা রিক্সওয়ালাকে ভয় দেখায়। চিৎকার উঠছিল—'গান্ধী—বু-উ-উ—!' ঐ ধরনের হল্লার অর্থ কাফ্রীদের কাছে মারাত্মক, সুতরাং রিক্সাচালক রিক্সায় তাঁদের নিয়ে যেতে রাজি হল না। তার ফলে গান্ধী ও তাঁর বন্ধুকে পায়ে হেঁটে এগোতে হল—প্রতি মুহূর্তে হল্লাকারী লোকের সংখ্যা বাড়তে লাগল—তাদের উত্তেজনাও বাড়ছিল। যে কোনো মুহূর্তে ভয়াবহ কিছু ঘটতে পারে, এমনই পরিস্থিতি। গান্ধীরা যখন ওয়েস্ট স্ট্রীটে মেসার্স পার্কার উড এন্ড কোম্পানীর অফিসের কাছে পৌঁছলেন তখন ইউরোপীয় ছোকরারা গান্ধীর দিকে কাদা ছুঁড়তে লাগল। পুলিশকে খবর দেবার জন্য একজন ভারতীয় দৌড়ল। জনতা তারপর পাথর ও মাছ ছুঁড়তে লাগল। তাই দেখে এক মহিলা ছুটে এসে ছাতা খুলে সেগুলি আটকাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তাদের কেউ কেউ ছুটে গিয়ে গান্ধীকে মারবার চেষ্টা করতে লাগল। খবর পাবার কয়েক মিনিটের মধ্যে পুলিশও এসে গেছে। তারা গান্ধীকে পুলিশ থানায় যাবার জন্য বলল। গান্ধী বললেন, তিনি পাশী রুস্তমজীর বাড়িতেই যেতে চান, ওখানেই তাঁর থাকা স্থির আছে। তদনুযায়ী পুলিশ তাঁকে পাহারা দিয়ে সেই স্থানে নিয়ে চলল। রুস্তমজীর বাড়ির কাছে যখন তাঁরা পৌঁছেছেন তখন জনতার লোকসংখ্যা কয়েকশো হয়ে দাঁড়িয়েছে—তাদের মধ্যে অনেক কাফ্রীও জুটেছে। পুলিশ রুস্তমজীর দোকানে গান্ধীকে কোনোক্রমে ঢুকিয়ে দিল। দরজার সামনে মোতায়েন করে দেওয়া হল কয়েকজন স্থানীয় কনেস্টবল। পথ দিয়ে যাবার সময়ে গান্ধী খুবই শান্ত ছিলেন; বলেছিলেন, 'আমি এই ধরনের কিছু-একটা আশা করছিলাম।' পুলিশ-থানা থেকে এগিয়ে যাবার বিরুদ্ধে যখন তাঁকে সতর্ক করা হয় তখন বলেছিলেন, 'আমি নিজের বাসস্থানে যাচ্ছি—তাদের ধর্মে যা হয় তারা তা করুক।' এর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক কাণ্ড হল, ইউরোপীয়দের কেউ কেউ কুলিদের (ভারতীয়দের) বিরুদ্ধে কাফ্রীদের উত্তেজিত করছিল। স্থানীয় কনেস্টবলদের নির্দেশ দেওয়া হল, কুলি ও কাফ্রীদের মধ্যে মারামারি যেন তারা থামিয়ে রাখে। জনতা ইতিমধ্যে বুঝেছে, তাদের হাতের শিকার ফস্‌কে গেছে। সেই রাগে তারা বলতে লাগল, গান্ধীকে তাদের হাতে ছেড়ে না দিলে তারা বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেবে। ইতিমধ্যে পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট একটা বুদ্ধির কাজ করলেন। তিনি গান্ধীকে বলে পাঠালেন, তাঁর জীবন বিপন্ন, সুতরাং একজন কনস্টেবলের সঙ্গে পোষাক বদল করে এই গৃহ ত্যাগ করাই শ্রেয়। ডিটেকটিভ সার্জেণ্ট ম্যাকবেথের উপর ছদ্মবেশ ব্যাপারটাকে নিখুঁত করার ভার দেওয়া হল। তিনি ভিতরে প্রবেশ করবার কিছু পরেই একটা পাশের রাস্তা দিয়ে বেরুলেন—তাঁর মুখে কালো রঙ, যেন স্বয়ং ওথেলো, সঙ্গে ভারতীয় কোচম্যান-বেশী সার্জেণ্ট বল, এবং একজন তৃতীয় ব্যক্তি পিছনে—এক ভারতীয় কনস্টেবল।

জনতার পাশ দিয়ে ঐ তিনজন যখন এগিয়ে যাচ্ছেন, তখন পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট আলেকজান্ডার জনতাকে খুবই আমোদে রাখবার চেষ্টা করছেন। গান্ধী যখন নিরাপদ স্থানের দিকে এগোচ্ছেন, তখন মিঃ আলেকজান্ডার জনতাকে দিয়ে গাওয়াচ্ছেন—"We'll hang old Gandhi on a sour apple tree." গান্ধী নিরাপদ দূরত্বে গেছেন, এই সংবাদ পাবার পরে মিঃ আলেকজান্ডার সেকথা জনতার কাছে ভাঙলেন। তাদের কিন্তু বিশ্বাস করানো শক্ত হল, সত্যই গান্ধী পালিয়েছেন। তখন তাদের সন্তোষের জন্য কয়েকজনকে বাড়ি তল্লাস করতে দেওয়া হল। তারা ফিরে এসে যখন বলল, সত্যই গান্ধী নেই, তখন অনেকে অগত্যা তা বিশ্বাস করল এবং ফিরে যেতে আরম্ভ করল। ইতিমধ্যে বৃষ্টি পড়তেও শুরু করেছে, ফলে কেউই রইল না। রাত্রি এগারোটা নাগাদ জনতা সেখান থেকে একেবারে সরে গেল।

গান্ধীজীর আত্মজীবনীর পাঠকেরা স্টেটসম্যানের উপরের বিবরণীর বিষয়বস্তুর সঙ্গে মোটামুটি পরিচিত। স্টেটসম্যান গান্ধীর উপর অত্যাচারের কিছু কিছু অতি নিষ্ঠুর অংশ বাদ দিয়েছিল, তা আমরা গান্ধীজীর আত্মজীবনী থেকে পাই। ঐ বিষয়ে মারহাট্টা কাগজের ৭ মার্চের সংবাদ কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি:

"প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ

মিঃ গান্ধী পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যে অবতরণ করেন। ওয়েস্ট স্ট্রীটে পৌঁছবার কালে তাঁর সঙ্গে মিঃ ল্যাংটন ছিলেন। মিঃ ন্যামির দোকানের কাছ বরাবর হাজির হলে জনতা তাঁকে আক্রমণ করল—পাথর হাতে করে তারা তাঁর পিছনে আসছিল—নিক্ষিপ্ত পাথর তাঁর কপালে গিয়ে লাগল—তার ফলে রক্ত গড়াতে লাগল। প্রহার এক সময়ে এমন প্রচণ্ড হল যে, তিনি টলতে লাগলেন। পথের ধারে রেলিং ধরে যদি না সামলাতেন তাহলে ফুটপাতেই লুটিয়ে পড়তেন। সামলে নিয়ে তিনি আবার চলতে লাগলেন। তাঁকে চড়-চাপড় ও লাথি মারা হতে লাগল। একজন ঘুষি মেরে তাঁকে স্বচ্ছন্দে মাটিতে ফেলে দিল। একজন মহিলা তখন তাঁর উদ্ধারে এগিয়ে এলেন, ছাতা খুলে পাথর আটকাতে লাগলেন। ইতিমধ্যে জনতা বেড়ে ২০০ জন হয়ে গেছে—সবাই তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে। পুলিশ এসে গেল—তাদের সাহায্যে গান্ধী ফিল্ড স্ট্রীটে পার্শী রুস্তমজীর বাড়িতে পৌঁছতে পারলেন। জনতা বাড়ি আক্রমণের চেষ্টা করল, সুপারিনটেন্ডেন্ট আলেকজান্ডার অবশ্য তাতে বাধা দিলেন। বাড়িতে ইটপাটকেল ছোঁড়া হতে লাগল। কিছু কিছু উত্তেজক বক্তৃতাও হল। স্প্রাডব্রাউ নামে একজন বক্তা বলল: তার এবং মিঃ ডিনসেন্টের নির্দেশে কাফ্রীরা অতীব উত্তম ব্যবহার করেছে। ইউরোপীয় ও কাফ্রী—সকলেরই জানা আছে যে, ভারতীয়রা দক্ষিণ আফ্রিকায় অবাঞ্ছিত। তবে ঐ কুলিগুলো এমন ঘৃণ্য জীব যে, ইউরোপীয়দের হাতে মার খাওয়ার বা মারা পড়ার যোগ্য তারা নয়। কাফ্রীরাই তাদের শায়েস্তা করার উপযুক্ত লোক।"*৪

সারা ভারতের অনেক সংবাদপত্রেই উপরের সংবাদ বেরিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল,*৫ সেইসঙ্গে ঘোষিত হয়েছিল একটি নূতন তারকার অভ্যুদয়বার্তা—যদিও সেই অভ্যুদয় কোন্ বিরাট আকার নেবে তা তখনি বোঝা যায় নি।*৬

অসাধারণ সাহস ও অধ্যবসায় দেখিয়ে গান্ধীজী আফ্রিকায় ভারতীয়দের মর্যাদার লড়াই চালিয়েছিলেন। ১৯০১ সালে আবার তিনি ভারতে ফেরেন। কলকাতায় ঐ সময়ে কিভাবে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, তা কিছু আগে বলেছি।

এই ১৯০১ সালের গান্ধীও কলকাতায় গুরুত্বের সঙ্গে গৃহীত হন নি। ভারতের রাজনৈতিক জীবনে অবতরণের সময় তখনো তাঁর আসে নি। আরও প্রায় কুড়ি বছর পরে তিনি তাঁর অভিনব সংগ্রামের অস্ত্র—অহিংস সত্যাগ্রহ নিয়ে ভারতের রাজনৈতিক গগনে দেখা দেবেন।

১৯০১ সালের কংগ্রেসই গান্ধীজীর জীবনে প্রথম কংগ্রেস। এই কংগ্রেসে কিভাবে সকলের অবজ্ঞার মধ্যে তিনি তাঁর আফ্রিকা-সংক্রান্ত প্রস্তাব তুলেছিলেন, কিভাবে ক্ষীণকণ্ঠে, সভয় মনে বক্তৃতা করেন—তার বিবরণ তিনি আত্মজীবনীতে দিয়েছেন। এবার তাঁর বক্তৃতা কলকাতার দেশীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। বেঙ্গলী, তাঁর সংবাদ প্রকাশ করা ছাড়াও ক্ষুদ্র সম্পাদকীয় রচনা করেছিল,*৭ কিন্তু গান্ধীজীকে তাঁর যথার্থ স্বরূপে প্রকাশ করবার অসাধারণ গৌরব ইণ্ডিয়ান মিরার কাগজের। ইণ্ডিয়ান মিরার-সম্পাদকের জয়ধ্বনি দিয়ে আমরা বলব, ১৯০২ সালের সূচনায় কলকাতায় অপরিচিত একটি মানুষ

৪*মারহাট্টায় ৭ মার্চের সংবাদে পাই, চারজন কাফ্রীকে দাঙ্গা বাধাবার ও মারপিট করার জন্য আদালতে অভিযুক্ত করা হয়েছিল; তাদের অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ডও হয়েছিল। বলাবাহুল্য ইউরোপীয়দের কোনো শাস্তি হয় নি।

৫*মারহাট্টা ৭ মার্চ, ১৮৯৭ তারিখের সম্পাদকীয়তে তীব্র ঘৃণার সঙ্গে সাউথ আফ্রিকার ইউরোপীয়দের পাশবিক আচরণের উল্লেখ করেছিল। 'গান্ধী-ব্যাটাকে আপেলগাছে ঝুলিয়ে দেব'—তাদের সমবেত সঙ্গীতের এই সুমহান বক্তব্যের কথা জানিয়ে, মারহাট্টা, যেসব ইউরোপীয় হাজারে হাজারে ভারতীয়দের জাহাজ থেকে অবতরণে বাধা দেবার জন্য বন্দরে হাজির হয়েছিল, তাদের কঠোর নিন্দা না করে পারে নি। গান্ধীজীর সাহসের প্রশংসা করেছিল এই কাগজটি—"Mr. Gandhi's courage in landing and leaving everything to justice is admirable and does him immense credit." নাটাল পুলিশ যদিও কর্তব্যপালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, তবু নাটাল সরকার দায়িত্ব এড়াতে পারেন না: "The excitement was so intense that Mr. Gandhi had to suffer meekly the kicks and blows dealt by the filthiest street-boys. The bitterness of the feeling can be imagined from the burden of the song quoted above.... The inaction of the Natal Government in brining the offenders to justice will only give countenance to the charge against the Government itself, of having encouraged the conspiracy." মারহাট্টার সম্পাদকীয় শেষ হয়েছিল ভারত সরকারকে ঐ জঘন্য ঘটনার প্রতিবিধান করতে অনুরোধ জানিয়ে। ঘটনাটি, এই পত্রিকার মতে, 'ভারতীয় জাতির অপমান।'

৬*যে-লাঞ্ছনাকে বহন করতে হয়েছিল গান্ধীজীকে, যার বিবরণ আমরা কিছুটা দিয়েছি—তারই বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের সর্বাধিক প্রতিবাদ মানবদেহ গ্রহণ করে ভূমিষ্ঠ হবে অল্পদিনের মধ্যেই—১৮৯৭ সালের ২৩শে জানুয়ারী জন্ম নেবেন সুভাষচন্দ্র বসু।

৭*বেঙ্গলী ১৯ জানুয়ারী, ১৯০২-এর সম্পাদকীয় নোটে লেখে:

"We need hardly remind our readers that Mr. Mohandas Karamchand Gandhi, Bar-at-Law, will relate his experiences in South Africa at the Albert Hall, to-day, at

সম্পর্কে তিনি যা লিখেছিলেন, সেই কথাগুলি গান্ধীজী সম্পর্কে পরবর্তীকালে ইতিহাসের স্থায়ী বক্তব্য হয়ে দাঁড়াবে। কলকাতাবাসীর কাছে বিবেকানন্দ সম্পর্কে যেমন, গান্ধী সম্পর্কেও তেমনি প্রথম জ্যোতির্ময় রচনা মিরার-সম্পাদকেরই।

মিরারে ২১শে জানুয়ারী *'Mr. Gandhi on his Impressions in South Africa'* ২২শে জানুয়ারী *'The Self Effacement of Mr. Gandhi—An Example to the People of Bengal'* এবং ২৩শে জানুয়ারী *'The Gospel of Love for the Indians'*—পরপর এই তিনটি গান্ধী-বিষয়ে মুখ্য সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া ২৬শে জানুয়ারীতে গান্ধীজীর *Experiences in South Africa* বক্তৃতার সুদীর্ঘ বিবরণ বেরিয়েছিল, সভাপতি গোখলের বিস্তৃত বক্তৃতাসহ।*৮

প্রথম ও দ্বিতীয় রচনা থেকে আমরা কিছু কিছু অংশ উপস্থিত করছি—মূলেই উপস্থিত করছি—ওগুলির ঐতিহাসিক মূল্যের কথা মনে রেখে।—

"Mr. M. K. Gandhi's address on Sunday afternoon last was a revelation to all but a very few who had previously enjoyed the privilage of private friendship with him... There (at the meeting) they had a young man of thirty, short and seemingly weak of stature, and yet private and public report had magnified him into a hero. And he was all that. But his own discourse of the affairs of the Indian colonists in South Africa was a complete effacement of himself. The audience listened to the speech, spell-bound for a hour and a quarter. They were told of the abilities and disabilities of the indentured Indian coolies as well as of the free Indians, the traders and the artisans. As the story developed, the audience listened with bated breath to the simple language, stripped of all oratorical effort. The English of the speaker was unexceptionable, but still more so was the manner of the speech. He spoke direct from his heart, and in that the secret of his mastery over his audience lay. In Mr. Gandhi, the audience recognised the man with a mission, a great mission in India and beyond the seas... His had been no ordinary life, and Mr. Gokhale's narrative proved that in Mr. Gandhi, We have a man of whom India or, for that matter, any country, should be proud. Though young, Mr. Gandhi is, we verily believe, one of the very few of our truly great men. We have said, Mr. Gandhi has achieved much. He has done so by a total effacement of the self in him. His thoughts and his work have been for others—never for himself. That is what Mr. Gokhale said. Mr. Gandhi himself seems to be a deeply spiritual man, and he impressed upon his audience with all possible earnestness and power, two lessons, as he called them—the two lessons which he had served his countrymen in South Africa in very good stead indeed. His maxims have ever been: speak the truth and speak the truth under all circumstances: Return love for hate. Under Mr. Gandhi's direction, the Indians in South Africa returned good for evil and went on doing so undiscouraged by further gross evils that befell them till the hearts of their oldest and worst enemies were touched, and the last state of the Indians is certainly better than their first. Mr. Gandhi has been good and wise in his generation. But a far greater than he, even the Enlightened Lord Buddha himself, had centuries upon centuries ago preached and practised the maxim: 'Hatred ceases not by hatred at any time; hatred ceases by love! The practice of this golden maxim has so far proved the salvation of our downtrodden countrymen in South Africa. From being accounted as mere 'Coolies' they have risen in the estimation of their erstwhile traducers and perse-

গান্ধীজী

4 p.m. Mr. Gandhi is one of our most earnest patriots and his name is well-known in connection with his services to the Indian settlers in South Africa and he deserves the greatful thanks of his countrymen. We welcome him warmly in our midst, and we are sure our educated countrymen will not miss this opportunity of hearing him on a topic in which we all are vitally interested. We understand the Hon'ble Mr. Gokhale will also speak on the occasion."

এর পরে ২৮ জানুয়ারীতে *The Indian Ambulance Corps—M. K. Gandhi's Speech* নাম দিয়ে তিন কলম রিপোর্ট বেরোয়। এখানে উল্লেখযোগ্য, অমৃতবাজারে এ ব্যাপারে কোনো রিপোর্ট আমাদের চোখে পড়েনি।

৮*এই রচনাগুলির সন্ধান দিয়েছেন বন্ধুবর শ্রীসুনীলবিহারী ঘোষ। তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

cutors to be the 'Sons of the Empire after all'." (*The Indian Mirror*, Jan., 21.1901)

ইণ্ডিয়ান মিরারের তৎকালীন সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন, বিশ্বাসে থিয়জফিস্ট ছিলেন, ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার নবজাগরণের স্বপ্ন তিনি দেখতেন, যে কোনো ভারতীয়ের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বকে অভিনন্দিত করতেন উচ্ছ্বসিত ভাষায়—সুতরাং তাঁর পক্ষে ৩২ বছরের তরুণ গান্ধীকে বন্দনা করা সম্ভব হয়েছিল। গান্ধী বৃটিশ শাসনের অন্যায়ের প্রতিবাদ করেও রাজভক্ত ছিলেন, নরেন্দ্রনাথ সেনও তাই; গান্ধী বুদ্ধের অহিংসার পথ ধরেছেন, নরেন্দ্রনাথ সেন স্বয়ং বুদ্ধভক্ত থিয়জফিস্ট—গান্ধীকে তিনি ব্রতধারী পুরুষ হিসাবে দেখবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। অনেক ভাবোচ্ছ্বাস কাল গতে হারিয়ে গেছে, কিন্তু তরুণ গান্ধী বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজ প্রতিভায় ও সাধনায় মিরার-সম্পাদকের ভাবময় প্রশস্তিকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে পেরেছিলেন বলে তাঁর আর একটু রচনা আমরা উদ্ধৃত করছি:

"Returning to Gandhi, what do we find? Has he made riches out of South Africa? Has he worked for gain, while struggling to give or help to give their legitimate rights and privilages to the Indian settlers in South Africa's Has he craved pelf and place? No, as Mr. Gokhale testified with genuine feeling. Mr. Gandhi has made innumerable sacrifies of every imaginable kind, and it has invariably been the cause for which he has worked and never for himself or for any particular friend or clique. And the reward that comes of such spiritual tendencies, of such unselfish labours, has come to Mr. Gandhi unsought. He is today the leader of the Indian community in South Africa, and any and every Indian in those regions will sacrifice his life gladly, so that he may serve this truly good and great man. Our language is enthusiastic but there is no exaggeration in it." (*The Indian Mirror*, Jan., 22, 1901)

॥ ৩ ॥

আলোচনার গোড়ার দিকে একটা প্রশ্ন উত্থাপন করেছি—যদি বিবেকানন্দ ও গান্ধীর সাক্ষাৎ ঘটত, গান্ধী কিভাবে গ্রহণ করতেন বিবেকানন্দকে? একথা দ্বিধা না রেখে বলা যায়, বিবেকানন্দের অনেক অংশই গান্ধীর মনঃপূত না হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। একটা দৃষ্টান্ত গোড়াতেই দেওয়া যায়—গান্ধীজী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, তিনি কালীঘাটে বলি সহ্য করতে পারেন নি। অপরদিকে বিবেকানন্দ বলি-ব্যাপারটিকে সাধারণ ধর্মীয় প্রেম-করুণার দিক দিয়ে আদৌ বিচার করতেন না। সর্বজীবের প্রতি বিবেকানন্দের প্রেম অপরিমেয়—কিন্তু তিনি যে-মৃত্যুরূপা মাতার পূজা করতেন—যাঁর পূজার মধ্য দিয়ে ভারত শক্তিলাভ করবে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল—সেই মৃত্যুভয়ঙ্করীর মূর্তি সম্পূর্ণ করবার জন্য ঐ রক্তচিহ্নের প্রয়োজন ছিল। বিবেকানন্দ প্রথমতঃ শাক্ত অদ্বৈতবাদী—গান্ধী ভক্ত বৈষ্ণব।

গান্ধীজীর আত্মজীবনীতে দেখা যাবে, এই সময়ের পূর্ব থেকেই তিনি নিরামিশাষী। শুধু তাই নয়, আমিষ ভোজনের সক্রিয় বিরোধী। বিবেকানন্দ স্বয়ং মাংসাহারী, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে কখনো কখনো মাংসাহার ত্যাগের প্রয়োজনীয়তার কথা বললেও ভারতের সাধারণ মানুষের পক্ষে মাংসাহার করা যে নিতান্ত দরকার, সেকথা সদাপে বলেছেন বহুবার, এমন কি বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাবে নিরামিশাষী হয়ে উঠে ভারত শারীরিক শক্তি ও পরিণামে স্বাধীনতা হারিয়েছে—একথাও বলতে দ্বিধা করেন নি।

হিংসা ও অহিংসার বিষয়েও একই কথা। বিবেকানন্দ সন্ন্যাসীর পক্ষে নির্বৈর হওয়ার সাধনা-মূল্য স্বীকার করেছেন, কিন্তু গৃহীর পক্ষে উচিত কাজ হল অন্যায়ভাবে কেউ একটা চড় মারলে দশটা ফিরিয়ে দেওয়া—তাঁর খোলা কথা। অপরপক্ষে খ্রীস্টের একগালে চড় মারলে অন্য গাল ফিরিয়ে দাও—এই নীতিকে নিজ জীবনে ও অন্যের জীবনে স্থাপন করার ব্রত নিয়েছিলেন গান্ধীজী। বিবেকানন্দ প্রেমে বিশ্বাস করতেন, শান্তিতেও, কিন্তু সমাজজীবনে সাধারণ মানুষের মধ্যে সেই প্রেমের ছদ্মবেশে কাপুরুষতার প্রবেশকে সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না। আসলে সকল মানুষের পক্ষে অহিংস হওয়ার সম্ভাবনায় তাঁর বিশ্বাস ছিল না।

এইখানেই বিবেকানন্দ ও গান্ধীতে এক মূল পার্থক্য। গান্ধীজী রামরাজ্য অর্থাৎ আদর্শ পৃথিবীতে বিশ্বাসী। বিবেকানন্দের কাছে সৃষ্টির গতি তরঙ্গায়িত। তার ওঠা-পড়া আছে। মানুষ, সমষ্টি কল্যাণের জন্য চেষ্টা করবে—সেই চেষ্টায় নিজ মুক্তি পাবে—কিন্তু সমষ্টি সত্যই কোনোদিন নির্দোষ আদর্শে অবস্থিত থাকতে পারবে না। বিবেকানন্দ বহুবার বহুভাবে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন—কোনো এক আপাত ভালোর মধ্যে কত মন্দ আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

এই কারণেই বিবেকানন্দ সমাজতান্ত্রিক কিন্তু রামরাজ্যবাদী নন। রামরাজ্য ধনীরা সাধারণ মানুষের অছি হয়ে থাকবে—এই ছিল গান্ধীজীর অভিপ্রায়। বিবেকানন্দ ধনীদের শুভবুদ্ধির উপরে নির্ভর করার ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু তিনি সমাজতন্ত্রের সম্ভাব্য দোষের কথাও একই সঙ্গে বলে গেছেন। অর্থাৎ সমাজতন্ত্র-নীতি তাঁর মতে, একটা বিশেষ সময়ের একটি সংগ্রাম, অধিকসংখ্যক মানুষের অধিকার-প্রতিষ্ঠায়—তার বেশি কিছু নয়।

সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংগ্রামের ব্যাপারে বিবেকানন্দ অবশ্যই তখনি সংগ্রাম আরম্ভের উপযোগী অবস্থা ভারতে দেখেন নি, দেশের মানুষ একেবারেই প্রস্তুত নয়, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কোনোভাবেই অস্পষ্ট ছিল না, এবং তাদের সঙ্গে লড়াই যে সক্রিয়ভাবেই করতে হবে, সেকথাও তিলককে জানিয়েছিলেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি আনুগত্য তাঁর পক্ষে ঘৃণার জিনিস। অপরপক্ষে এইকালে সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে গান্ধীজীর কী ধারণা ছিল তা তাঁর নিজ কথা থেকেই উপস্থিত করছি:

"বৃটিশ শাসনতন্ত্রের প্রতি আমার যেরকম আনুগত্য ছিল, আমার জানা কোনো ব্যক্তির সে জিনিস ছিল কিনা সন্দেহ। এখন বুঝতে পারি, এই আনুগত্যের মূলে ছিল সত্যের প্রতি আমার প্রীতি। .....নাটালে যেসব সভায় যেতাম তার সব কটিতে (বৃটিশ) জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হত। আমি অনুভব করেছিলাম, ঐ সঙ্গীতে আমারও অংশ নেওয়া উচিত। বৃটিশ শাসনের ত্রুটি সম্বন্ধে যে আমি সচেতন ছিলাম না তা নয়, কিন্তু ভেবেছিলাম, সব জড়িয়ে এই শাসন গ্রহণযোগ্য। ঐসব দিনে আমার বিশ্বাস ছিল, শাসিতের পক্ষে বৃটিশ শাসন সাধারণভাবে কল্যাণকর।

"দক্ষিণ আফ্রিকায় যে বর্ণবিদ্বেষ

[শেষাংশ ২৪৪ পৃষ্ঠায়]

স্থান: কলকাতা ২৯ জুলাই ১৯৬৯

উত্তর-শহরতলীর নতুন এক অঞ্চলের রাস্তা।

কাল: বিকেলের শেষ প্রান্ত। আকাশ মেঘলা, বিষ্টি আসতেও পারে।

অনিমেষ বসুর সঙ্গে সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখা হোলো—পরস্পরের বিপরীত দিক থেকে হাঁটতে হাঁটতে এসে মঞ্চের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়ালো দুজনে।

অনিমেষ একটু বেঁটে, ভারিক্কি, ঈষৎ শ্রান্ত মনে হয়; বয়স চল্লিশ, পরনে টেরিলিনের হাওয়াই শার্ট, ট্রাউজার—রঙটা উগ্র নয়, নরম; চোখে চশমা নেই।

সরিৎ আর একটু বয়স্ক। ফর্সা, তীক্ষ্ণ, বুদ্ধিদীপ্ত, রোগাটে চেহারা,—পরনে মিহি আদ্দির পাঞ্জাবি, অল্প-চওড়া পাড়ের ধুতি; চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা।

আনন্দে পরস্পরের হাত কাঁকিয়ে দিয়ে দুজনে এক সঙ্গে বলে ওঠে—

সরিৎ-অনিমেষ [সমস্বরে] আ হা!

সরিৎ—সারাদিন, সর্বদা ব্যস্ত; আজকাল
এতো অদর্শন;
কোন্ ভোরে বেরিয়ে যাও;—
বাড়ি ফেরো জানিনা কখন।
বাঁচার রুক্ষতা বাড়ছে—সময়ের
ভারি বক্র গতি,
প্রাণের সমস্ত খেলনা কেড়ে নিচ্ছে
অবাধ্য সন্ততি।
কে বলে জন্মের হার নিয়ন্ত্রিত?
সমস্ত রাস্তায়
কী ভিড় সমস্ত দিন, ঘোরে লোক
বিচিত্র ধান্ধায়।
ধ্বংসের ফিকির এই সময়ের
নির্মম উচ্ছ্বাসে।
মনে হচ্ছে আছি যেন বহুক্লিষ্ট
দীর্ঘ পরবাসে।

অনিমেষ—কেন, ধ্বংসের ফিকির মনে হবে কেন, তোমার এই তক্‌তকে মসৃণ পাঞ্জাবিতে তো কোনো তেল-কালি-ধোঁয়ার দাগ নেই,—কোনো ছাই নেই, ধুলো নেই,—তোমার কাপড়ের পাড়টা চমৎকার—এই রঙটা আমার আজও ভাল লাগে—এই গাঢ় সবুজ, পরিপূর্ণ পুষ্টির রঙ,—যেমন দেখা যায় শ্রাবণের ধানক্ষেতে, ওতে কোনো সংঘাত নেই,—তোমাকে দেখলে মনেই হয় না যে জীবনে কোথাও কোনো দুর্বার বেগ আছে,—কোনো ভিড় কি তোমার গায়ে লাগে বন্ধু;—জামা-কাপড় এরকম নির্ভাজ মসৃণ রাখো কোন্ বিভূতির বলে?

সরিৎ—হাঁ, বিভূতিই বটে। আমাকে অনেকেই এই কথা জিজ্ঞেস করে আজকাল। ভিড়ে চ্যাপ্‌টা হয়ে যাচ্ছে অন্তরাত্মা, তবু বেঁচে আছি ঠিক। বিকেলে ফর্সা জামা গায়ে দিয়ে ফাঁকা রাস্তার খোঁজে রোজই বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু ফাঁক কোথায় এ জগতে? তবে তোমাদের এই পাড়াটা সত্যিই চমৎকার—এখানে মাঠ আছে, বড়ো বড়ো কটা পুকুর আছে,—রাত্রে ঘুম ভাঙলে নিশ্চয় বিছানায় শুয়ে শুয়েই আকাশের তারা দেখতে পাও; রজনীগন্ধা রাখো শোবার ঘরের ফুলদানিতে; রাখো তো?

অনিমেষ—[হাসতে হাসতে] না, আমার ঘুম ভাঙে সূর্যোদয়ের এক ঘণ্টা পরে। আমি মোটেই ভোরে উঠি না। তুমি তো বেশ বলে দিলে—'কোন্ ভোরে বেরিয়ে যাও!' তবে হাঁ, সময়ের 'উচ্ছ্বাস' ব্যাপারটা বুঝতে পারছি,—হাড়ে হাড়ে বোঝা যাচ্ছে। আর, সকালে বিকেলে, রাস্তায় যেন লোকের চল নামে। তবু রজনীগন্ধা রাখো বটে করবী। রজনীগন্ধা এক আশ্চর্য ফুল। তোমার সব কথা মনে থাকে দেখছি,—রজনীগন্ধা একটি বুর্জোয়া-সংস্কার!

সরিৎ—বিকেলে জোয়ার যেন, সকালেও
বন্যার মতন—
মানুষ মানুষ শুদ্ধু,— সভ্যতার
কঠিন কেতন
হাওয়ায় উড়তেই থাকে,—
সময়ের এ ঘোর দৌড়
কখনো দেখেনি আগে
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ গৌড়।
এবং বাইরে ওরা মহাশূন্যে
মানুষের মেধা
যেতে দিচ্ছে কী মসৃণ,—জয়
কাল-বদলের নেতা!

অনিমেষ—সময় বদলাচ্ছে বটে—
চাকা ঘুরছে মনে হচ্ছে যেন,
'ভাল আছি' বললেও তো লোকে
বলে—কেন? ভাল কেন?
দিল্লীতে নতুন ঝড়—ইন্দিরা ও
মোরারজী দেশাই—
সংঘর্ষের শেষ নেই,
সংঘাত ঘটছেই হামেশাই!

সরিৎ—ইতিমধ্যে মনে হচ্ছে এসে গেছি
প্রায় জাহান্নমে,
ছেলেরা মানছে না কিছু,
মেয়েরাই কি নীতিকথা শোনে?
শিক্ষিত বেকারে দেশ ভরে যাচ্ছে,—
মিছিলে মিছিলে
ঐতিহ্যের পক্ষিরাজ ঘটনার
নির্মম সলিলে
ডুবে যাচ্ছে দ্যাখো, দ্যাখো—
খাবি খাচ্ছে বনেদী বিশ্বাস,
আকাশে বর্ষার মেঘ,
নৈরাশ্যের দীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস!

অনিমেষ—বৃত্তিহীন, বিত্তহীন, দৃষ্টিহীন
জরুথ যৌবন,

অনিবার্য আমি তার একালের
কঠোর জবাব।
সামনে তার অন্ধকার, হাতে তার
প্রচণ্ড ক্ষমতা,
যদি বুকে থাকতো শুধু
আর একটু সজ্ঞান মমতা—
গণতন্ত্র, সংবিধান, পরমাত্মা
ইত্যাদি মিলিয়ে
দেশটা বাঁচতো,—মানে, ওরাই তো
দিতে পারতো ইয়ে—
অর্থাৎ আমরা যাকে বলে থাকি
নীরব বিপ্লব,
সবাই যা মেনে নিয়ে কিছুক্ষণ
চুপ থাকতো সব।
সরিৎ—কিছুক্ষণ, কিছুক্ষণ,—এ চেতনা
আজন্মই তাই;
কিছুই শাশ্বত নয়, সবই শুধু
কালের বুদ্বুদ।
সমস্তই মনে হওয়া, ভুলে যাওয়া,
কিংবা খুঁজে পাওয়া,
মুহূর্তে সর্বস্ব হারিয়ে পরিণামে
শুধু শূন্য হওয়া
তাই কাছে থাকতে চাই জীবনের
বিভিন্ন আবেগে
যতোদিন বেঁচে থাকি ততোদিন
আমরা একই স্রোত।
অনিমেষ—কতো কাছে আছি আহা,
একসঙ্গে দু'হাজার পাঁঠা
কশাইয়ের বশম্বদ যেমন
অনিষ্ঠ হয়ে হাঁটে,
মহাষ্টমী বেজে উঠবে অচিরে,
জানে না, জয়ন্তাকে।
কিংবা মুরগীর খাঁচা পাশে রেখে
হাসে আলিজান
মনে তার ভালো-মন্দ
সংসর্গের নিরন্তর স্রোত,
ওদিকে অবোধ মুরগী ঠোঁটে ঠোঁটে
জানায় সম্প্রীতি।
আমরা বড়ো কাছে আছি,—
এতো কাছে থাকার উত্তাপে
অন্তরের হিমস্তর মোটেই
আসে না চেতনাতে।
মেনে চলতে বাধ্য হই
সভ্য-ভব্য মাত্রারির ছাঁচ।
জন্মের দিগন্ত থেকে প্রকৃতিকে
খর্ব করে রাখা।
বন কেটে এ বসতি, রেলরাস্তা
পাহাড় উড়িয়ে।
ফ্ল্যাট-বাড়ি খাড়া-বস্তি
নৈকট্যের এ জাহান্নম।
সরিৎ—তবু কাছে থাকতে হবে, কারণ
এ যন্ত্রণা এক।
গণতন্ত্র, সংবিধান, সমভোগ ও
ঈশ্বর মিলিয়ে
একই খোঁয়াড়ার দুঃখ পেতে হবে,
নিতে হবে সব।
জীবন আশ্চর্য সত্য—
মনে হয় প্রায় অসম্ভব।

দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠলো। নিজেকে ধরলো। হঠাৎ চেঁচামেচি শোনা গেল। ওরা অনুভব করবার চেষ্টা করলো কোন্ দিক থেকে মিছিল আসছে। অন্যের জন দিক থেকে বেরিয়ে বাঁদিকে চলে গেল একটি মিছিল।

মিছিল—মার কা বদ্‌লা মার হায়
দেশ কা জনতা ভুখা হায়
খুন কা বদ্‌লা খুন হায়
ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ।

অনিমেষ—চলো, আমাদের ওখানে যাবে তো?

সরিৎ—চলো।

মিছিল যেদিকে চলে গেছে, সেই দিক থেকে একটি বুড়ো লোক বিড় বিড় করতে করতে এগিয়ে আসে।

বুড়ো—শুধু বদ্‌লা আর বদ্‌লা। অন্য দেশে লোকে চাঁদে যাচ্ছে, দিব্যি যাচ্ছে-দাচ্ছে, অভাব নেই, অশান্তি নেই—আর এই পোড়া দেশে অহোরাত্র শুধু বদ্‌লার হাঁক ডাক। যাঃ! [সরিৎকে] মশাই কটা বাজলো দেখুন তো।

সরিৎ—ছটা কুড়ি।

বুড়ো—আচ্ছা মৈনুদ্দীন মিস্ত্রীর লেন কি মহাত্মা গান্ধী রোড থেকে বেরিয়েছে?

সরিৎ—অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি জানি না।

বুড়ো—[অনিমেষকে] আপনি জানেন?

অনিমেষ—না!

অনিমেষ—[স্বগত] মহাত্মা গান্ধী রোড একটি আলাদা রোড। অকস্মাৎ গল্পা থেকে উঠে শেয়ালদার বাজারে হারিয়ে গেছে। তাতে কেউ মেলেনি—মেলবার উপায় নেই। [সরিতের প্রতি]—চলো, বাড়ি যাওয়া যাক্।

সরিৎ—দাঁড়াও না, বাড়ির তুলনায় এই খোলা রাস্তা তোমার কি খুব বেশি বিস্বাদ মনে হয়?

অনিমেষ—রাস্তার গুণগান তো তুমি নিজেই করলে:—'কী ভিড় সমস্ত দিন, ঘোরে লোকে বিচিত্র ধান্ধায়।' একটু দাঁড়ালেই দেখবে সেই ধান্ধাওয়ালাদের ঢেউ এসে তোমাকে একেবারে আছড়ে দেবে।

দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে লাগলো। দুটি মেয়ে আর তিনটি ছেলে—বয়স সকলেরই ২০-২৫—তর্ক করতে করতে চলেছে।

১ম যুবক—টয়েনবি কি বলেছেন?

১ম যুবতী—বলেছেন চাঁদে যাওয়াটা খুব বিহ্বল করে দেবার মতন ঘটনাই নয়—এই পৃথিবীতেই মানুষের সত্যিকার দাঁড়াবার জায়গা চাই—নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার প্রশ্নটি—এসব আগে দরকার।

২য় যুবক—বিপ্লব চাই, আগে বিপ্লব—বন্দুকের নলই শক্তির উৎস।

২য় যুবতী—দ্যাখো নারাণ, যা জানো না, তা নিয়ে কথা বলতে নেই। বিপ্লবের রক্তে সব ডুবে যাবে—এমন কি লক্ষ্যও ডুবে যেতে পারে। চাঁদে যেতে হলে মাথা চাই, আগে মাথা আর মন, শান্ত বিচক্ষণতা চাই—

অনিমেষ আর সরিৎ আস্তে আস্তে সিগারেট টানতে টানতে মঞ্চের বাইরে চলে যায়।

১ম যুবক—টয়েনবি যা বলেছেন, সেটা বেশ চিন্তাশীল প্রবীণ পণ্ডিতের কথা।

১ম যুবতী—অর্থাৎ, তোমার কথার সঙ্গে তার মিল নেই। এইবার তর্ক আরম্ভ করবে,—তারই ভূমিকা করছো তো?

২য় যুবতী—আমি আর হাঁটতে পারছি না—একটু বসা যাক্ এই বেদীটায়। রাস্তার ধারে এইরকম গাছ আর গাছের নীচে বাঁধানো বেদী—আমাদের এই গরমদেশে এইরকমই ভাল। সব সময়ে চলতে চলতে চলার চেতনাই চলে যাচ্ছে যেন... কোথায় যাচ্ছি বলো তো,...কোথায় যাচ্ছি আমরা?

১ম যুবক ছাড়া অন্যান্য সকলে—তাই হোক্। বসে বসে ভেবে দেখা যাক্ কোথায় যাচ্ছি আমরা।

১ম যুবক—না, এখন বসবার ফুরসৎ নেই আমার, আমি চললুম—

১ম যুবতী—কোথায় চললে? বোসো না, একটু বসলেই কী-ই বা হারাবে?

অন্যান্য সকলে—তাহলে সবাই চলি...

সমবেতকণ্ঠে গান

চলতে চলতে চলতে চলতে
দাঁড়িয়ে থাকার যন্ত্রণা
এই তো ভাগ্য, এই তো আইন
এই ছিল শেষ মন্ত্রণা
যা হোক্, তা হোক্, যা হোক্,
তা হোক্,
মন্দ না এ মন্দ না।

[নিষ্ক্রান্ত : প্রথম দৃশ্যের যবনিকা]

দ্বিতীয় দৃশ্য

অনিমেষের বসবার ঘর। বাঁয়ে কয়েকটি সোফা। ডাইনে তিনখানা চেয়ার। চেয়ারগুলোর সামনা-সামনি ছোটো একটা

টেবিল। বাঁদিকে সোফার পেছনে খোলা জানলা। জানলা দিয়ে রাস্তার ওপারের বাড়ি দেখা যায়,—আর আকাশও।

সরিৎ সিগারেট ধরিয়ে একটা সোফায় বসে একটা পত্রিকা দেখছে। ঘরে ঢুকলেন করবী দেবী—অনিমেষের স্ত্রী—হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে চেয়ারে বসলেন তিনি।

করবী—অনেকদিন আসেন নি যে?

সরিৎ—আপনারও তো সময় নেই। অনিমেষ কখন যে বেরিয়ে যায়,—ফেরে কতো রাত্রে!

করবী—বাঃ, সময় থাকবে না কেন? উনি অবিশ্যি এই কদিন খুব সকালে বেরিয়ে যাচ্ছেন, ফিরতেও দেরি হচ্ছে, কিন্তু আমি ফিরি ছ'টার মধ্যেই আরো আগে ফিরতে পারি—কিন্তু বাস ধরতেই দেরি হয়ে যায়..

সরিৎ—আপনার তো চারটেয় ছুটি?

করবী—হাঁ চারটেয়। কিন্তু কী জায়গায় যে ইস্কুল! কোনো বাসে ওঠবার উপায় নেই। তাছাড়া রাস্তায় কী কাদা, সব সময় প্যাচ্ প্যাচ্ করছে,—সেই কাদার মধ্যে পঁচিশ-তিরিশ জন যাত্রী সারা দিনই যেন দাঁড়িয়ে আছে! যেন অনেকের অনেক জায়গায় যাবার তাড়া ছিল, কিন্তু উপায় নেই। আপনার কি মনে হয়না সারা দেশটাই যেন নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে...

সরিৎ—যা বলেছেন, সব দাঁড়িয়ে আছে,—মানে প্রাণপণ চেষ্টা করছে শুধু কোনো মতে দাঁড়িয়ে থাকবার জন্যে।

করবী—কতোক্ষণ যে দাঁড়িয়ে থাকি,—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তবে একটা বাসের পাদানিতে পা দেবার জায়গা মেলে...

[বাইরের সাজ বদলে একটা ফর্সা শার্ট আর লুঙ্গি পরেছে অনিমেষ। ঘরে ঢুকেই সে কথায় যোগ দেয়—]

অনিমেষ—বাসের ভেতরে দাঁড়ানোর চেয়ে বাইরে দাঁড়ানো সুখের ব্যাপার,—রাস্তায় কাদায় খোলা আকাশের নীচে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, আর চলন্ত বাসের পাদানিতে অনেকের সঙ্গে যে-কোনো মুহূর্তে মৃত্যু ঘটতে পারে ভাবতে ভাবতে দাঁড়িয়ে—অর্থাৎ যাকে বলে ঝুলতে ঝুলতে এগিয়ে যাওয়া;—দুটোর মধ্যে 'দাঁড়ানো' শব্দটার অর্থঘটিত বিস্তর ভেদ—

সরিৎ—অথচ, দুটি পরিস্থিতিতেই 'দাঁড়ানো' একটি সামান্য ক্রিয়াপদ...

করবী—এতো বাজে বকতে পারেন আপনারা...মনে হচ্ছে যেন ব্যাকরণ নিয়ে ভাবছেন কিংবা অলংকার-শাস্ত্র...

অনিমেষ—কিংবা দর্শনশাস্ত্র

সরিৎ—কিংবা একটা ন্যায়ের কূট

করবী—বাঃ বাঃ, দুই বন্ধুর দেখা হলেই বাক্যবাণ

সরিৎ—আমার মা বলতেন বাক্যিবাণ, কিছুতেই বাক্যবাণ বলতে পারতেন না।

অনিমেষ—সময় বদলে গেছে ভাই, মেয়ে পুরুষ সবাই এমন শুষ্ক কথা বলছে, চলন্ত বাসের পাদানিতে পা দেবার জন্যে পরস্পরকে পদাঘাত করছে...

করবী—মোটেই না,—মোটেই না মশাই,—আপনি কী বলেন সরিৎবাবু, আমরা মেয়েরা কখনোই কাউকে পদাঘাত তো দূরের কথা,—হাত দিয়েও আঘাত করতে রাজী নই—অসুস্থ হলে অবিশ্যি অন্য কথা।—অসুস্থ একটি মেয়ের কথা হঠাৎ মনে পড়লো—জানেন সরিৎবাবু, আমাদের ইস্কুলে ক্লাস সেভেন-এর একটি মেয়ে প্রমোশন পায় নি বলে সে তো তার মাকে নিয়ে এলো বড়দির সঙ্গে দেখা করতে। বড়দি বললেন—সব সাবজেক্টে ফেল হয়েছে, ও থাক্ আর এক বছর ঐ ক্লাসেই। মা তাই শুনে বড়দিকে মারতে এলো টেবিলের ওপর একটা রুল পড়েছিল, সেইটে তুলে নিয়ে—সে কী কাণ্ড! আর কী গালাগালই দিলো আমাদের! আমাদের পণ্ডিতমশাই কালীচরণবাবু শান্ত বুড়োমানুষ—মেয়েদের মধ্যে একলা পুরুষমানুষ,—তিনি ঐ সব দেখেশুনে 'থ' হয়ে গেলেন—তিন দিনের ছুটি নিয়ে—[হাসতে হাসতে চোখে জল এসে যায়] পণ্ডিত বাড়িতে বসে রইলেন।

সরিৎ—সত্যি!

করবী—লোকে শুনলেও বিশ্বাস করবে না...ও মা...

অনিমেষ—বিশ্বাস করবে না কেন

সরিৎ—কারণ, মানুষ যে এরকম করতে পারে,—কোনো বর্ষীয়সী জননী তাঁর মেয়ে প্রোমোশন পায় নি বলেই যে ইস্কুলের হেড্ মিস্ট্রেস্কে মারতে পারেন,—আর সেই রণচণ্ডীকে দেখে প্রবীণ কোনো পুরুষ যে ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসে থাকতে বাধ্য হতে পারেন, এসব কি বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা?

অনিমেষ—তেনজিং যে এভারেস্টে উঠেছিলেন—ছেলে-মেয়েরা যে উপাচার্যকে ঘেরাও করে বিশ্রী শোনাচ্ছে,—ট্রেড ইউনিয়ন যে সরস্বতীর কোলে উঠে এলো,—মাস্টার যে চুরি-করে ছাত্রীর খাতায় উত্তর লিখছে—আমস্টং, কলিন্স্, অ্যান্ড্রিন যে চাঁদ থেকে ফিরলেন এরই মধ্যে,—এসব কি সত্যি নয়?

করবী—তার মানে?

অনিমেষ—মানে, মানবতা স্থূল বড়ো,—সূক্ষ্মতার যদিও তুরীয়।
সকলি বিশ্বাসযোগ্য—
একাধারে পার্থিব-স্বর্গীয়।
যতো অন্ধকার তা-ও, যতো
বিপরীত আলো, তা-ও।
বুদ্ধ, যীশু, নিউটন, প্যাসক্যা,
গান্ধী, গ্যালিলিও,—
হব্স্, রুশো, কার্ল মার্কস,—কিংবা
যতো পরমাণুবিদ্,
বেকেরেল, রাদারফোর্ড, উইল্সন
কিংবা ওপেনহাইম্,—
গ্যাগারিন, তেরেস্কোভা, বোরম্যান,—
বৃদ্ধ হো-চি-মিন্—
মানুষের যে মনীষা রক্তে মাংসে
রিপুতে মরে না,
ব্যাধিতে বন্ধনে শোকে প্রাণভয়ে
কিছুতে টলে না,
একদিকে জন্তু সত্য, অন্যদিকে
অমৃতের শিশু।
অহিংসা ও সত্যাগ্রহ,— তারই বুকে
হিংসা নিহিত।
মৃঢ় ম্লান মূক মুখই সন্ন্যাসী
ও বেলেল্লা বদমাস।

পরিচারক গোবিন্দ চায়ের ট্রে রেখে গেল। করবী দেবী কাপ এগিয়ে দিলেন দুজনকে। নিজের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে, জানলার বাইরে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন—

করবী—চাঁদ উঠেছে। বিষ্টি হোলো না, তাহলে।

সরিৎ—তার বিষ্টির তেষ্টা নেই, বৌদি; ছিল চায়ের তেষ্টা—চা-টা চমৎকার হয়েছে। আপনাদের গোবিন্দ একটি রত্ন। ভাল চায়ের ওপর মানুষের ভাল-থাকা কতো যে নির্ভর করে!

অনিমেষ—ঠিক বলেছ। সবই পারস্পরিক। অবস্থার সঙ্গে অবস্থার অকাট্য যোগ।

হঠাৎ বাইরে একটা বড়ো বাস থেমে গেল—ব্রেকের আর্তনাদ তুলে। একটা তীব্র কান্নার আওয়াজ উঠেই চুপ হয়ে গেল। অনেক লোকের চীৎকার, ছুটোছুটি, বিচিত্র শব্দ। বাইরে থেকে একটা ইঁটের টুকরো এসে পড়লো ঘরের একটা চেয়ারে।

হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলো গোবিন্দ।

অনিমেষ, সরিৎ, করবী তিনজনেই তখন জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

গোবিন্দ—মা, জানালা বন্ধ করে দিন। ভীষণ মারামারি হচ্ছে। বড়ো রাস্তার একটা লোককে চাপা দিয়ে একটা বাস এসে পড়েছিল আমাদের

রাস্তায়। মোড়েই যতীনবাবুর মেয়েটা চাপা পড়েছে—মরে গেছে, থেৎলে গেছে একদম। ড্রাইভারও মরো মরো দেখে এলুম। এখনো মারছে সবাই।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ওঁরা তিন জন। গোবিন্দ আস্তে আস্তে জানলাটা বন্ধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সরিৎ আর অনিমেষ নিজের নিজের চেয়ারে ফিরে গিয়ে বসলেন। করবী চলে গেলেন পাশের ঘরে ছেলে-মেয়ের কাছে।

একটু পরে পরে পর্দার ওপারে পাশের ঘর থেকে শ্যামল আর খুকুর গলা শোনা গেল।

শ্যামল—আমাদের গানটা তোদের চেয়ে অনেক ভাল।

খুকু—দাদা, আবার ঝগড়া করছো,—মাকে বলে দেবো?

শ্যামল—মা, এ কি ঝগড়া? একে কি ঝগড়া বলে?

করবীর কণ্ঠস্বর—না। ওতো ঝগড়া করে নি,—খুকু চুপ করো। খোকা, রেকর্ড-প্লেয়ারে হাত দিও না এখন।

সিগারেট ধরালেন অনিমেষ আর সরিৎ।

অনিমেষ—ইহাই জীবন।

সরিৎ—জীবন একটি ভয়ংকর নাটক।

অনিমেষ—অর্থাৎ, এক নির্বিশেষ দুর্ঘটনা।

সরিৎ—শিকারীর দিক থেকে রোমাঞ্চ, শিকারের দিক থেকে অন্ধকার, অন্ধকার, অন্ধকার...

অনিমেষ—ওরকম আলাদা করে ভাবা যায় না। আমরা সবাই শিকার। আবার মাঝে মাঝে প্রত্যেকেই শিকারী। কখনো তুমি শিকার করছো আর কাউকে,—কখনো আর কেউ শিকার করছে তোমাকে।

গান বেজে উঠলো পাশের ঘরের রেকর্ড প্লেয়ারে—নারী-পুরুষের দ্বৈত-সংগীত:

ফুল নয়, মালা নয়, ঘুম নয়,—
তবে
কী চেয়েছে এই মন—কে কবে?
কে কবে?
ফুল নয়, মালা নয়,
দূরে চলে যাওয়া নয়,
পাশে পাশে কাছে কাছে
হাতে হাতে পাওয়া নয়।
পলে পলে ক্ষণে ক্ষণে
ফুরোবে ফুরোবে।

অনিমেষ—এই সিগারেটগুলো বিস্বাদ।

সরিৎ—আমি আজ উঠলুম। একটা কথা ছিল বটে বৌদির সঙ্গে,—আজ থাক্। আর একদিন আসবো। তুমি বড়ো বেশি সিগারেট খাচ্ছ কিন্তু

খুকুর কণ্ঠস্বর [পাশের ঘর থেকে]—দাদা, তোদের গানটা শোন্ একবার।

করবীর কণ্ঠস্বর [ঐ]—বাবা, তোরা থামবি একটু? — গোবিন্দ, — ও গোবিন্দ, শোনো,—একবার বাজারে যেতে হবে—আলু নেই একেবারে।

পাশের ঘরে গান বেজে উঠলো সম্মিলিত পুরুষ-কণ্ঠে

গণহাত হাত নয়—সাঁড়াশি।
যা ধরে তা ছাড়ে না।
বুঝে নেয়, খুঁজে নেয়, কেড়ে নেয়।
কোনো খাতিরের ধার
ধারে না।

গণহাত হাত নয়,—হাতিয়ার।
লড়াই চলেই তার সারাক্ষণ—
ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্
ঝন্ ঝন্।

সরিৎ—আজ উঠি বন্ধু। এতোক্ষণে রাস্তা নিশ্চয় পরিষ্কার হয়েছে।

অনিমেষ—রক্তের দাগ এখনো দগ্‌দগে। পুলিশের গাড়ি এসেছে—কালো কালো গাড়ি সব। যতীনবাবুর মেয়ের সঙ্গে ড্রাইভারের মৃতদেহও চল্‌লো একই লাসকাটা-ঘরে—একই গাড়িতে উঠে। কিংবা হয়তো এখনো ওরা কেউই কোথাও যায় নি। হয়তো যতীনবাবু, তাঁর স্ত্রী, তাঁর শাশুড়ি,—তাঁদের আরো সব অনেকে দাঁড়িয়ে আছেন। একসঙ্গেই আছেন, কিন্তু প্রত্যেকেই আলাদা,—প্রত্যেকেই দূরে দূরে,—যেমন আমরা আর খোকা-খুকু,—আর গোবিন্দ,—আর করবীর ভাঁড়ারে আলু নেই...কী চেয়েছে এই মন কে কবে, কে কবে?

সরিৎ—গানটা চমৎকার। দুটো গানই চমৎকার।

[উচ্চকণ্ঠে] আজ চললুম বৌদি। দু-একদিনের মধ্যেই আসবো আবার। একটা খবর তৈরী হচ্ছে।

করবী দেবী ঘরে এলেন হাসি মুখে।

করবী—কী খবর? উলু দেবার জন্যে তৈরী থাকবো?

সরিৎ হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল। অনিমেষ দরজার দিকে তাকিয়ে নিচুগলায় বল্‌লে—ইডিয়ট

তৃতীয় দৃশ্য

সেই সন্ধ্যাতেই—বেলেঘাটার একটি ফ্ল্যাট। কলিং-বেলের শব্দ শুনে মহাশ্বেতা দেবী দরজা খুলে দিলেন। তাঁর কাঁচা-পাকা চুলের ওপর সরু-পাড় ধুতির ঘোমটা,—প্রশান্ত মুখশ্রী। সরিৎ ঘরে ঢুকে তাঁর পায়ে হাত রেখে প্রণাম করলে। তিনি সরিতের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন।

ঘরের যেদিকে সোফা, তার সামনের দেয়ালে একটিমাত্র বড়ো ছবিতে কোণার্ক সূর্যমন্দিরের দৃশ্য। জানলায় পুরু নীল পর্দা। বাইরের জগৎ অদৃশ্য।

আলোটা নীলাভ উজ্জ্বল।

মহাশ্বেতা—বোসো বাবা, অণুকে ডেকে দিচ্ছি আমি। ভাল আছ তো?

সরিৎ [সোফায় বসে]—ভাল আছি মাসি, তোমরা ভাল তো?

মহাশ্বেতা—এমনি ভালই,—তবে একটা-না-একটা চিন্তা তো আছেই—অণুর কাছে শুনবে সব।

মহাশ্বেতা ভেতরে গেলেন। একটু পরেই তাঁর মেয়ে অণিমা রায়ের প্রবেশ। অণিমার বয়স বছর-পঁয়ত্রিশ। সুশ্রী, শান্ত চেহারা,—মুখে ঈষৎ দুশ্চিন্তার ভাব। চেয়ার টেনে নিয়ে সরিতের সামনে এসে বসলো।

অণিমা—তুমি কি ভাবছো? দু-তিন দিন দেখা নেই কেন? কোনো খবর দাও নি কেন?

সরিৎ—ভাবনা স্বচ্ছ হয়ে আসছে ক্রমশঃ। আরো সত্য ক'রে বোঝবার জন্যে সময় নিয়েছিলুম। তারই মধ্যে খবর পেলুম তোমার চাকরিটা যায়-যায়। গেলুম আমাদের ইউনিয়নের পাণ্ডাদের কাছে—তাদের মধ্যে দু'জন আমার বন্ধু। তারাই বলে দিলে, বৌদি—অর্থাৎ অনিমেষের স্ত্রী যে-ইস্কুলে পড়ান, সেখানকার সেক্রেটারি যিনি, তিনিই তোমাদের গবর্নিং বডির ডাকসাইটে সদস্য। আমার একদিকে ইউনিয়নের শুভেচ্ছা এখন; অন্যদিকে করবী-বৌদির মমতা। নিঃসংশয় হয়ে তোমার কাছে এলুম।

অণিমা—আর কি ভাবছো?

সরিৎ—মেঘের পর্বতচূড়া ছুঁয়ে উঠছে প্রতি রাতে চাঁদ।

(শেষাংশ ২৫৮ পৃষ্ঠায়)

বিজ্ঞাপন

(১৪ পৃষ্ঠার পর)

বিজ্ঞাপনের সে হরেক গলার গোল থামিয়ে দিলে, তার জায়গায় বিজ্ঞপ্তির জবরদস্ত কণ্ঠই পাছে একেশ্বর হয়ে ওঠে, এই ভয়।

বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞপ্তি, এ দুটি তৎসম শব্দ প্রকৃতি প্রত্যয়ে প্রায় যমজ হলেও আমাদের কাছে তাদের ব্যবহারগত অর্থে ব্যবধান, মুক্তমনের স্বাধীন উদ্যোগ আর পালিতজনের শান্ত বাধ্যতার মত দুস্তর।

যেখানে বিজ্ঞাপন সেখানে ব্যক্তি এখনও স্বীকৃত বুঝতে হবে—আর যেখানে শুধু বিজ্ঞপ্তি সেখানে যত সুশৃঙ্খল জঙ্গম-ই হোক, অবিশেষ আত্মসত্তাহীন একটা সমষ্টিগত জড়তা-মাত্রই বিরাজমান।

বিপ্লবী জাতীয় আন্দোলনের স্মৃতিকথা

সতীন্দ্র পাকড়াশী

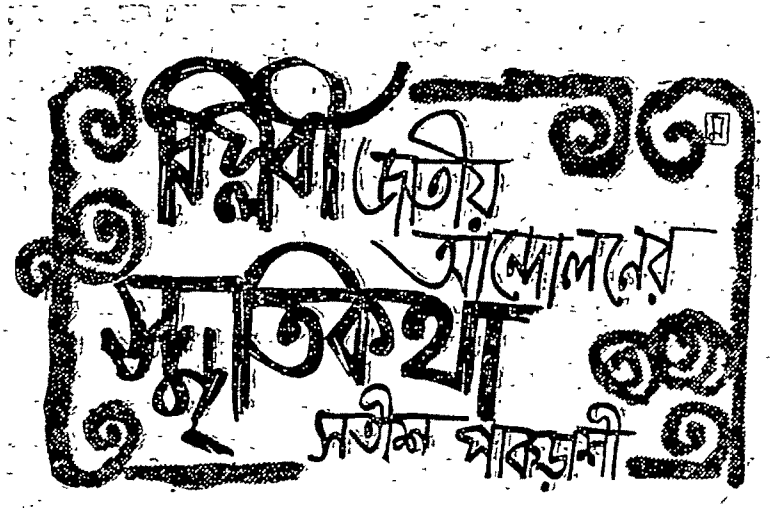

বিপ্লব আন্দোলনের স্মৃতিকথা লিখতে বসে জোয়ার-ভাটা বা শীত-বসন্ত ঋতু পরিবর্তনের প্রাকৃতিক নিয়মের কথা মনে হয়। মানবসমাজেও তেমনি পরিবর্তন আসে,—পুরাতন যায়, নতুনের উদ্ভব হয়। গতানুগতিক চলার পথে মানুষের চিত্ত-মানস উদ্বেল হয়ে ওঠে,—স্বচ্ছন্দ জীবনের তাগিদে, পরিবর্তিত অবস্থা সৃষ্টির প্রয়োজনে, নতুনের টানে, মানুষের মন যখন ব্যাকুল হয়ে পড়ে, তখন সমাজের অগ্রণী অংশে প্রাণ-চাঞ্চল্যের স্ফুরণ হয়, তাদের আগে চলার পথে গতিবেগ বৃদ্ধি পায়। ক্রমোবর্দ্ধিশীল কর্মপ্রেরণা ও কর্মোদ্যোগ সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে,—নতুনের ডাকে ব্যথিত জনসমাজে সাড়া পড়ে যায়। নতুনের এ অভিযানে পুরাতনের আভিজাত্য ও পরাক্রম প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তার ভোগ-দখলের অধিকারে নতুনের স্থান নেই।

এ শতাব্দীর গোড়া থেকেই জাতীয় মুক্তিসংগ্রামীরা স্বাধীনতার নব-অভিযানে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ আধিপত্যে উন্মত্ত তরবারি হস্তে রুখে দাঁড়ায়। কিন্তু গেল শতাব্দীর ছোট-বড় বহু বিদ্রোহের মত এবার আর নব-অভ্যুত্থিত বিপ্লবী শক্তি অত্যাচারের রক্তে নির্মূল করে দেওয়া সম্ভব হল না। এখন থেকে শুরু হল ভারতে রাষ্ট্রবিপ্লবের জয়যাত্রা।

ইংরাজের গুলী-গোলা, ইংরাজের শস্য-সম্পদ লুণ্ঠন ও শাসনদণ্ডের সঙ্গে বিদেশী ইংরাজের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও যন্ত্র-শক্তির আমদানীতে নব্য শিক্ষিত শ্রেণীর লোক অভিভূত হয়ে পড়লেন। বিলাতী সভ্যতায় মোহমুগ্ধ শিক্ষিতদের প্রভাবে দেশে সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রভাব ম্লান হয়ে পড়ে। ছলে ও পাশবিক বলে ইংরাজ ভারত অধিকার করে, ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের শিক্ষা বিস্তার করে শিক্ষিতদের সাংস্কৃতিক মন জয় করে।

কিন্তু মানুষের সংগ্রামী-চেতনা ভোলার নয়, জীবনের অভিযানে সে কখনো অনড়, অসাড় হয়ে থাকতে পারে না। অতীত বিদ্রোহের বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী দেশের কর্মী-মনে দোলা দিয়ে যায়। সেই পরাধীনতা, সেই দাসত্বের অপমান, সেই শাসন, পীড়ন ও শোষণের গ্লানি,—সবই আছে। থাকবে না কি শুধু মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্য বিদ্রোহ? সেই সশস্ত্র বিদ্রোহের বীরপনা, রক্তাক্ত সংগ্রাম ও জীবনদান আজকের দিনে শিক্ষিত যুবকদের প্রেরণা জাগায়—সাহস যোগায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রভাতেই নব্য শিক্ষিতদের এক অগ্রণী অংশ ইংরাজের সাংস্কৃতিক বিজয়-অভিযানে অভিভূত না হয়ে রুখে দাঁড়ালেন। ইংরাজ অধীনতার বিরুদ্ধে, ভারতের সভ্যতা, স্বাধীনতা ও নবজীবন প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামই একমাত্র পন্থা। তাঁরা অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিলেন;—মন্ত্রের সাধনা কিংবা শরীর পাতন'। ঊনবিংশ শতাব্দীর ছোট বড় বিদ্রোহগুলি ইংরাজ অভি নিষ্ঠুর অত্যাচারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। এবার নতুন বিপ্লবীরা আরো গভীরে, আরো সুসংগঠিত এবং ব্যাপকভাবে ভারতে রাষ্ট্রবিপ্লবের কল্পনা করেন। দেশে ও বিদেশে যত বিপ্লব ও বিদ্রোহ ঘটেছে—তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বাংলার শিক্ষিত তেজস্বী কর্মীরা বিপ্লবী সংগ্রামের পথে নেমেছেন।

জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের নেতা ও কর্মীদের মনে দেশের স্বাধীনতাটাই কাম্য। জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, উচ্চ-নীচ-নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর জন্যই ভারতের স্বাধীনতা—তাদের লক্ষ্য। ভারতমাতা আজ পরাধীনা, শৃঙ্খলিতা। ভারতমাতার মুক্তিসাধন দেশের সকল মানুষেরই করণীয় কাজ। আমরা ছোটবেলা এই চিন্তাধারা নিয়েই কাজ ব্রতী হয়েছিলাম। হিন্দুর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বা বাঙালীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কোন কল্পনাই ছিল না।

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের সঙ্কল্প নিয়েই বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলার কর্মী-নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়; তাদের কলকাতা কেন্দ্রে এনে সম্মিলিত আলোচনা-সভা করে বিপ্লব সংগঠনের ও বিপ্লবী সংগ্রামের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া হত। ১৯০৬ সালে কলকাতায় ভারতের জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসের অধিবেশন হয়; তিলক খাপার্দে প্রমুখ মহারাষ্ট্রীয় বামপন্থী জাতীয় নেতারাও এ-কংগ্রেসে আসেন।

এই নেতাদের সঙ্গে অনুশীলন দলের নেতা ও কর্মীরা গোপনে পরামর্শ করে ইংরাজের অধীনতার বিরুদ্ধে কাজ করার প্ল্যান করেন। মহারাষ্ট্র ও বাংলার বিপ্লবীরা একই লক্ষ্যে প্রীতির বন্ধনে মিলিত হয়ে নিজ নিজ রাজ্যে বিপ্লবী দল গঠন ও সংগ্রাম-পথে অগ্রসর হন।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ডে ভারতের প্রতিনিধিরা রাশিয়া ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগস্থাপন করে ভারতের আন্দোলন সম্পর্কে কথাবার্তা বলতেন। রাশিয়ার বিপ্লবীদের মত ভারতে সশস্ত্র সংগ্রামের পরামর্শ আসে ভারতের প্রতিনিধিদের নিকট থেকে। বোমা তৈরি করার পদ্ধতিও ওঁদেরই সাহায্যে পাওয়া যায়। জাপানের এক অধ্যাপক ভারতে এসে গুপ্ত সমিতি ও শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহারের পরামর্শই দিয়ে যান।

ধীরে ধীরে বাংলায় বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠছিল ও বিস্তার লাভ করছিল।

লর্ড কার্জন বাংলা বিভাগ করে দেওয়ায় বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলন গর্জে ওঠে। এ আন্দোলনের ফলে যে জাতীয়-চেতনা উদ্বুদ্ধ হয় তাতে বিপ্লবী দল গঠনের সুযোগ বেড়ে যায়, নতুন কর্মীরা এসে দল পুষ্ট করে। ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রশক্তির আঘাত ছাড়া আর পথ নেই, এ-ধারণা দেশে প্রবল হয়ে ওঠে।

বাংলার স্বদেশী আন্দোলন থেকে ভারতে জাতীয় আন্দোলনের সূচনা হয়। সরকারী নিষ্পেষণে তিন বৎসরের মধ্যেই স্বদেশী আন্দোলন নিস্তেজ হয়ে পড়ে। নিষ্ক্রিয় স্বদেশী আন্দোলনের ব্যর্থতা থেকে সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনের যৌক্তিকতা-বোধ প্রশস্ত হয়।

১৯০৬—৭ সালে অনুশীলন দলের যুব-সংগঠন, লাঠি-ছুরি খেলা (যা ছিল প্রকৃতপক্ষে বন্দুক, পিস্তল ও তরবারি চালনা শিক্ষা), কৃত্রিম যুদ্ধ (মক ফাইট) শিক্ষা, ড্রিল ও প্যারেড ইত্যাদি শুরু হয় পূর্ব ও উত্তর বাংলায়, ত্রিপুরায় ও আসামের কতকাংশে। সহস্র সহস্র যুবক এই বিপ্লবী দলের ভলান্টিয়ার সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। অনুশীলনের একটা অংশ কলকাতায় 'যুগান্তর' পত্রিকায় বিপ্লব ও বিদ্রোহের অনল বর্ষণ করে, যুবকদের বিদ্রোহে উন্মত্ত করে তোলে।

এমনি সময়ে ক্ষুদিরামের বোমা ফাটে—তার আওয়াজে সারা ভারত কম্পিত হয়ে ওঠে। উষার আলোক ছটায় নিদ্রিত মানুষ যেমন সহসা জেগে উঠে, নতুন দিনের আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে, পরে পরাধীনতার মোহতন্দ্রা ভেঙে ভারতের মানুষও বাংলার বিপ্লবী ক্ষুদিরামের বোমার শব্দে স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে উঠল। পূর্ববাংলার শহরে ও গ্রামে ক্ষুদিরামের ফাঁসির সংবাদ এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে—ইংরাজ বিরোধী ক্রোধাগ্নি বিক্ষুব্ধ মানুষের মনে বিদ্রোহের আশা-উদ্দীপনা নিয়া আসে।

আমরা ছাত্ররা তো দেশপ্রেমিক কর্মবীর ক্ষুদিরামকে আদর্শ কর্মীরূপে বরণ করে নিলাম। শহীদ ক্ষুদিরামের ফটো হাজারে হাজারে বিক্রী হয়ে গেল। আমরা বাড়িতে দেশহিতৈষী বিপ্লবীর ফটো গভীর শ্রদ্ধাভরে উচ্চমঞ্চে স্থাপন করলাম।

পূর্বে রেল-স্টীমার সংযুক্ত গোয়ালন্দ স্টেশনে অসংখ্য যাত্রীর ভিড়ের মধ্যে ঢাকা জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এলেন—সাহেবকে গুলী করে যুবকদের বীরদর্পে সরে পড়ার আমাদের মনে যে উৎসাহভরা চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়েছিল ক্ষুদিরামের বোমা আর ফাঁসিতে জীবনদান তার চেয়ে অনেক গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে আমাদের যুবমনে। সরকারের কয়েকজন অনুগত খয়েরখাঁ ছাড়া আর কেউ ভারতের উদ্ভিন্ন জাতীয় জীবনের প্রথম শহীদ ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগ ও মহান লক্ষ্যের প্রশংসা না করে পারেন নাই। কেউ বেসুরা কথা বললে আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ করতাম এবং তাকে বুঝাতে চেষ্টা করতাম যে, দেশে এমন দেশহিতৈষী কর্মীরই আজ প্রয়োজন।

মহারাষ্ট্রীয় নেতা তিলক পুণার 'কেশরী' পত্রিকায় ক্ষুদিরাম ও তার বোমার সমর্থনসূচক প্রবন্ধ লিখে ছয় বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। দেশের শাসনপদ্ধতির দোষেই বিপ্লবীর বোমা ফাটে। একথা লিখে তিলক ক্ষুদিরামের মুক্তির দাবি করেন। পরাঞ্জপে 'কাল' পত্রিকায় লিখলেন, "স্বরাজ্য অর্জনের জন্যই এরূপ অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে। এ-দেশের বোমা আর রাশিয়ার বোমা নিক্ষেপের তফাৎ এই যে, রাশিয়ার অনেক লোক জ্যার সম্রাটের স্বপক্ষে আছেন, আর আমাদের এ-দেশে ইংরাজ সরকারের সমর্থক নাই বললেও হয়।" এ-লেখার অপরাধে 'কাল' পত্রিকার সম্পাদক বোম্বাই হাইকোর্টে রাজদ্রোহের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হলেন।

ক্ষুদিরামের বোমার আওয়াজে সুপ্তিমগ্ন ভারতবাসী জেগে উঠেছে বুঝে আমাদের আনন্দ আর ধরে না। ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করে সারা পূর্ব ও উত্তর বাংলায়, ত্রিপুরায় ও আসামের কতকাংশে অনুশীলন বিপ্লবী সংগঠন প্রসার লাভ করে। ক্ষুদিরামের ফাঁসি ভয়-ভীতির পরিবর্তে বিপ্লব-দলের শক্তি বৃদ্ধি করে। বাংলার শান্তশীল যুবকগণ অশান্ত দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে। আমি স্কুলের ছাত্র থাকাকালেই অনুশীলন সমিতির সভ্য হয়েছিলাম। বিপ্লবের গুপ্তমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে কাজ করেছিলাম। শিক্ষা পেলাম বিপ্লব বা Revolution আনাই আমাদের কাজ—স্বাধীনতার জন্য Revolution চাই (অর্থাৎ রাষ্ট্রবিপ্লব চাই)। রোমাঞ্চকর 'রেভলিউসন' শব্দটিই ধমনীতে উষ্ণরক্ত-প্রবাহ সঞ্চার করে। আমাকে রোমাঞ্চিত করে দিল এই কথাটি। আমার অন্যান্য বিপ্লবী-বন্ধুদেরও তেমনি উদ্দীপনা দিয়েছে। তখনকার দিনে আমরা স্কুলের ছাত্ররাও বাংলার চেয়ে ইংরাজী কথা, ইংরাজী শব্দই বেশি পছন্দ করতাম। Revolution শব্দটির সঙ্গে জড়িত ছিল ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে গুপ্ত সমিতি, সশস্ত্র সংগ্রাম, বিদ্রোহ, সর্বোপরি রাষ্ট্রবিপ্লব। বিপ্লব, রক্ত-বিপ্লব।

স্বাধীন সোনার ভারতের স্বপ্নে আমরা বিভোর হয়ে যাই। ঘর-বাড়ি ছেড়ে, নাম যশের আকাঙ্ক্ষা অগ্রাহ্য করে আমরা কিশোর বয়সেই (১৯০৯—৮ সালে) সংকল্প নিলাম বিপ্লবী দলের কাজে আত্মনিয়োগ করব।

দেশে কতগুলি দুর্ধর্ষ জনপ্রিয় কাজ দিয়ে বিপ্লবীদের সংগ্রাম শুরু হয় এবং তার ফলেই আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে ও জনসমর্থনে শক্তিশালী হয়ে দাঁড়ায়। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাই দত্ত, সত্যেন, চারু, বীরেন্দ্র প্রমুখ প্রখ্যাত বিপ্লবী শহীদ হলেন। বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে আলিপুর জেলখানার ভিতর সিপাহী-সান্ত্রীর চোখের ওপর হত্যা করে নির্ভীকচিত্তে ফাঁসিকাষ্ঠে আরোহণ করেন কানাই ও সত্যেন। প্রফুল্ল চাকী শত্রুর হাতে ধরা পড়ার প্রাক্কালে রিভলবারের গুলীতে আত্মহত্যা করেন। এরূপ বীরত্বব্যঞ্জক কাজ দিয়ে বাংলার বিপ্লবীরা দেশের ও বিশেষ করে বিদেশের প্রশংসা অর্জন করেন। খ্যাতিপন্ন সুশিক্ষিত অরবিন্দ ঘোষ বোমার মামলায় অভিযুক্ত হয়ে বিপ্লবী-দলের মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক হন। পুণার মহারাষ্ট্রীয় যুবকদের ফাঁসি ও জাতীয় নেতা তিলকের কারাদণ্ড বাংলার মানুষকে জাতীয় আন্দোলনের দিকে বেশি করে আকৃষ্ট করে।

বাংলার বিপ্লবীর বোমা ফাটানো সমর্থন করে মহারাষ্ট্রের নেতা তিলকের কারাদণ্ড সারা ভারতে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধই একমাত্র জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাংলা ও ভারতবর্ষ সেদিনে সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনীতিতে অভিনিবিষ্ট। কংগ্রেসী নেতারা তখন ইংরাজ শাসনের মধ্যেই স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য বৈধ ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করছিলেন, ভারতের স্বাধীনতা কল্পনাতীত ছিল তাদের কাছে।

সশস্ত্র বিপ্লববাদী না হয়েও বিপিন পাল, তিলক, লাজপত রায় প্রমুখ বিশিষ্ট নেতারা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। স্বেচ্ছাচারী শাসকগোষ্ঠী দেশের সকল মুক্তিকামীকেই সশস্ত্র সংগ্রামের পথে ঠেলে দিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিপ্লবী জাতীয়তাবাদীরা ইংরাজ শাসন উচ্ছেদের জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করার আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। শত শত লোক ফাঁসিতে ও গুলীতে জীবন দেন, দ্বীপান্তরে ও কারান্তরালে ধুঁকে ধুঁকে মরেন। তাঁদের জন্য দরদ দিয়ে কথা বলার মত নেতা ছিলেন না; কোন সংবাদপত্রও তাঁদের বাঁচার জন্য লেখনী চালান নাই। সে কি দুর্দিন গিয়াছে। কিন্তু বিপ্লবী যোদ্ধারা অম্লান চিত্তে সব সহ্য করেছেন।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা তখন নীরব-নির্বীর্য। কংগ্রেস অধিবেশনে প্রেসিডেন্ট সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ তাঁর ভাষণে বলেন, 'ভারতে এখনো স্বায়ত্তশাসনাধিকার চাওয়ার সময় আসে নাই।' নেতা গান্ধীজী বিশ্বযুদ্ধে ইংরাজের জয়ের জন্য ভারতে সেনা সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তিলক, বিপিন পাল, লাজপত রায় প্রভৃতি বামপন্থী নেতারা হয় জেলে, নয় নির্বাসনে কালযাপন করছিলেন। আমরা সকল বিপ্লববাদী মুক্তিযোদ্ধারা এতে এতটুকু বিচলিত না হয়ে নিজেদের উৎসাহ, আত্মবিশ্বাস ও কর্মকুশলতা দিয়ে ব্যর্থতা, বিশৃঙ্খলা ও ইংরাজ শাসকদের রক্তচক্ষুর মধ্য দিয়েই সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলাম। দুটি পৃথক বিপ্লবী সংগঠন থাকলেও, অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা পরস্পর সহযোগিতা করে কাজ করেছে।

শিক্ষিত ও অশিক্ষিত দেশবাসীর নীরব সমর্থন আমরা পেয়েছি লোকের সক্রিয় সাহায্যবলেই একটা হত্যাকাণ্ডের পর বা অন্য কোন রকম সশস্ত্র কাজ করার পর আমরা নির্বিঘ্নে সরে পড়তে পেরেছি, অস্ত্রাদি নিরাপদ স্থানে রেখে যেতে পেরেছি, আশ্রয়স্থান পেয়েছি, অর্থসাহায্য পেয়েছি, যাতায়াতে পথপ্রদর্শক পেয়েছি। স্ত্রী-পুরুষের এমনি কত সাহায্য আমাদের সংগ্রামের শক্তি যুগিয়েছে। অনেক বিপদের ঝুঁকি নিতে দরদীরা পুলিশের বিরুদ্ধে আমাদের কাজ ও সংগঠনকে জোরদার করেছে। মা,

পুজোর সরঞ্জামে

বোরোলীন

লোকে বলে—ঘোড়ায় চেটে দিলে
কাটা-ঘা সেরে যায়। কিন্তু তাই বলে তো আর
ওষুধের দেরাজে ঘোড়া পোষা চলে না।
তার চেয়ে অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য,
অনেক বেশী ফলপ্রসূ অ্যান্টিসেপটিক
ক্রীম "বোরোলীন"। রাখতে সহজ,
সহজ ব্যবহারেও। কাটা ফাটা,
শুকনো কিংবা রুক্ষ ত্বকে "বোরোলীন"
অনবদ্য ফল নিশ্চিত।

বোরোলীন হাউস, কলিকাতা-৩

বোন, বৌদিদের দুঃসাহসিক সাহায্যও প্রচুর পেয়েছি।

সাহিত্য, ইতিহাস, নাটক, কবিতাতেও মুক্তিসংগ্রামের উদ্দীপনা জাগিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের গ্যারিবল্ডী, মাটসিনির স্বাধীনতার যুদ্ধ, সখারামের দেশের কথা, রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও প্রবন্ধ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক, রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্রের কবিতা সশস্ত্র সংগ্রামেরই ইঙ্গিত দিয়েগেছে।

ডি, এল, রায়ের নাটকে আছে ;—"তরবারি স্পর্শ করে রাণা প্রতাপ সিং আর রাজপুত সর্দাররা দেশ উদ্ধারের জন্য পবিত্র শপথ নিচ্ছেন, 'আমরা চিতোরের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত'।" এ অভিনয় পূর্ববঙ্গের লোকদের অনুপ্রাণিত করে। আমাদেব স্বাধীনতার স্বেচ্ছাসৈনিকদের মানসে রাণাপ্রতাপের দেশ উদ্ধারের স্বপ্ন মর্মস্পর্শী, ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমাদের উতলা করে তোলে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবধি এ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক দেশের লোকের চেতনা ছিল বিভ্রান্ত; পরাক্রান্ত বৃটিশ শাসকের বর্বর অত্যাচার আর শোষণের আঘাতে মানুষ ভীরুতায় ও স্বার্থপরতায় নিমজ্জিত। ভবিষ্যতের আশা-ভরসা সব উবে যায়। পণ্ডিতেরা কতক অতীত গৌরবের দেমাক নিয়েছিলেন, আর কতক বিলাতী শাসন ও বিলাতী সভ্যতার তারিফ করতেন। দেশের লোকের কল্যাণ বা উন্নতির চিন্তা বিস্মৃতির অতলে ডুবে গিয়েছিল। নৈরাশ্য হতাশা দিকে দিকে। 'ইংরাজ রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না' —সরকারী কর্তারা বসে বসে এ-ধারণটা বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেন। যাঁরাই এ অবনতির প্রবাহ রুখতে চেষ্টা করেছেন, পর্বতপ্রমাণ বাধা-বিঘ্ন তাঁদের পথরোধ করেছে। এ অবস্থায় একদল সর্বত্যাগী অসীম মনোবল সম্পন্ন রাজনৈতিক সন্ন্যাসী না দাঁড়ালে বৈপ্লবিক আন্দোলন ও সংগ্রাম পরিচালন করা সম্ভব হ'ত না। দেশের মুক্তি-সংগ্রামের জন্য তাঁরা নাম-যশের আশা পরিত্যাগ করে, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে সংসার সুখ ভোগের বাসনা ত্যাগ করে, ঘর-বাড়ী ছেড়ে 'আনন্দমঠের' সন্তান দলের কর্মীর মত বেরিয়ে এসেছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্রতে অনায়াসে হত্যা এবং নির্ভীক চিত্তে মৃত্যুবরণ রাজনৈতিক সন্ন্যাসী না হলে সম্ভব হওয়া কঠিন হ'ত। অধঃপতন যত গভীর, উন্নয়ন হবে তত তেজালো, তত উদ্দাম ও অগ্নিগর্ভ। এই বিপ্লবী রাজনৈতিক সন্ন্যাসীরা ছিলেন নিষ্ঠাবান ও মহান্ আদর্শবাদী। প্রথম যুগে বাংলার এই শ্রেষ্ঠ সন্তানরাই দেশের মানুষের চেতনা উজ্জীবিত করে তাদের চিন্তা ও কর্মের মোড় ঘুরিয়েছিলেন।

দুই

আন্দোলনের অগ্রগতি-পথে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের সাথে বিপ্লবীদের চিন্তাধারায়ও অনেক পরিবর্তন আসে। তারাই আবার নতুন চিন্তা, নতুন কর্মধারা দিয়ে জনমানস নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করে সমাজে রূপান্তর ঘটায়। সংগ্রামের শুরুতে আমাদের দেশে মধ্যযুগীয় চিন্তাধারাই প্রবল ছিল। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি ও সকল কর্মনীতিই সর্বজনস্বীকৃত নীতি ছিল ; এর বাইরে থাকা মানে লোকসমাজের বাইরে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা। সে-যুগের কল্পনা ছিল ইংরাজ রাজার স্থানে কোন দেশীয় জনপ্রিয় রাজাকে স্বাধীন ভারতের রাজসিংহাসনে বসাতে হবে। তবে বংশানুক্রমিক রাজা না হয়ে এক রাজার পর অন্য একজন ভাল রাজা নির্বাচন করতে হবে। দূর ভবিষ্যতের কল্পনা নিয়ে মাথা ঘামানো স্বপ্নবিলাস মাত্র, তাই এ-আলোচনা আর এগোয় নি। সেদিন রাজা-জমিদার, গুরু-পুরোহিত শাসন ছাড়া দেশ ও সমাজ চলতে পারে বলে ধারণা ছিল না।

পরবর্তীকালে আমরা সাধারণতন্ত্র ভারত (রিপাব্লিক) পছন্দ করতাম। ১৯১৫ সনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরাজের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ ঘোষণার আয়োজন হয়, তাতে আমেরিকার সাধারণতন্ত্রের মত ভারতে সংযুক্ত সাধারণতন্ত্র (ফেডারেল রিপাব্লিক অব ইণ্ডিয়া) ঘোষণা করাই স্থির হয়। ২১শে জানুয়ারী প্রত্যুষে লাহোরে যে বিদ্রোহ ঘোষণার পরিকল্পনা ও আয়োজন হয়েছিল, ওখানে স্বাধীন ভারতের ঘোষণাপত্রে ঐরূপ সাধারণতন্ত্র ঘোষণার ফেষ্টুন ও প্রচারপত্রই তৈরি ছিল। সংবাদ ফাঁস হয়ে পড়ায় মধ্যরাত্রে পুলিশ অস্ত্রাগার সময় বহু বোমা ও অন্যান্য অস্ত্রাদির সঙ্গে ঐ ঘোষণাপত্রও পেয়ে যায়। ঘোষণা আর হ'ল না ;—হ'ল গ্রেপ্তার, গুলী, ফাঁসি ও কারাদণ্ড।

তখন আমেরিকা পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কিছুটা প্রগতিশীল রূপে পরিগণিত ছিল। পরবর্তীকালে রাষ্ট্র গঠন চিন্তার নানারূপ পরিবর্তন ঘটে। গণতন্ত্রের কথা সকলেই বলতেন। সোভিয়েতের সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র আর পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র (বুর্জোয়া গণতন্ত্র)—এ দুই বিপরীত ধরনের গণতন্ত্র-চিন্তা ছাড়াও গান্ধীজীর দুর্বোধ্য গণতন্ত্র ছিল। সশস্ত্র বিপ্লবীরা অনাগত ভবিষ্যৎ নিয়ে বিব্রত হতে চায় নি। ইংরাজ শাসনের উচ্ছেদই তাদের আশু লক্ষ্য। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ করে বিপ্লবীরা "স্বাধীন সাধারণতন্ত্র" ঘোষণা করেন।

উত্তরপ্রদেশের বিপ্লবীরা শচীন সান্যাল ও যোগেশ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় "হিন্দুস্থান সাধারণতন্ত্রী সঙ্ঘ" (হিন্দুস্থান রিপাব্লিকান এসোসিয়েশন) নাম দিয়ে ওখানে গুপ্ত সমিতি পুনর্গঠন করেন। ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে একটা স্পষ্ট পরিকল্পনাও স্থির করেন ১৯২৪ সনে। 'ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্র' (ফেডারেল রিপাব্লিক অব ইউনাইটেড স্টেটস অব ইণ্ডিয়া)। এঁরা কিন্তু সশস্ত্র কার্যকলাপ দিন দিন প্রসারিত ও তীব্রতর করছিলেন। এই সমিতিই পরে পাঞ্জাবেও কাজ করতে থাকে। পরে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আইডিয়া এ দেশবাসীর মনেও রেখাপাত করায় ঐ বিপ্লবী দলটি পূর্ব নাম পরিত্যাগ করে 'হিন্দুস্থান সমাজবাদী সাধারণতন্ত্রী সঙ্ঘ' নাম গ্রহণ করে। আমাদের বাংলার অনুশীলন পার্টির কর্মীরাই উত্তরপ্রদেশে ও পাঞ্জাবে ঐ নামে সন্ত্রাসবাদী কার্য চালাতে থাকেন। ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন বর্জন আন্দোলনে বক্তৃতা দেওয়ার সময় পুলিশ পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপত রায়কে লাঠি দ্বারা অমানুষিক প্রহার করে। সভায় উপস্থিত বহু লোককে বর্বর লাঠিচালনা করে আহত করে।

লাহোরের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট (সহকারী) সাণ্ডার্স সাহেব এ আক্রমণ পরিচালনা করেন বলে ঐ বিপ্লব দলের পাঞ্জাবের নেতা ভগৎ সিং সাণ্ডার্সকে গুলীতে হত্যা করেন। ভগৎ সিং পরে ধরা পড়ে লাহোরে ইংরাজ-বিরোধী ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসিতে জীবন দেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ পরিত্যাগ করে বৃহত্তর বিপ্লবের চিন্তা আসে বাংলাদেশের পুরানো বিপ্লব দলে। যুদ্ধের সময় ভারতব্যাপী বিদ্রোহের চেষ্টা ব্যর্থ হয়, ইংরাজের সেনাবাহিনীর অনেক সেনা ও বিপ্লব সম্পর্কিত বহু লোক ফাঁসিতে ও গুলীতে মরেন। ভারতের সহস্র সহস্র কর্মী কারাগারে ও অন্তরীণে আবদ্ধ হলেন।

যুদ্ধের পর নতুন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বৃহত্তর বিপ্লবের কল্পনাই বিপ্লবী নেতাদের মনে আসে। গান্ধীর ভারতব্যাপী বিরাট জন-আন্দোলনের কাছে ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ অকিঞ্চিৎকর হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু একটি ছোট 'গ্রুপ' ঐ পুরনো পথই আঁকড়ে থাকেন। তাঁরা কয়েকটি ডাকাতি করেন। বীর যুবক গোপীনাথ সাহা অত্যাচারী পুলিশ কমিশনার কুখ্যাত টেগার্ট সাহেবকে মারতে যেয়ে ভুলক্রমে অন্য একজন সাহেবকে গুলীতে হত্যা করেন। গোপীনাথ ভুলের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন, এবং বীরের মত

ফাঁসিকাষ্ঠে আরোহণ করেন। আরো পুলিশ গুপ্তচর হত্যার চেষ্টা হয়। চট্টগ্রামেও ডাকাতি ইত্যাদি হতে থাকে। আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের হেড অফিসে তথাকার এক বিপ্লবী দল দুঃসাহসিক ডাকাতি করে হাজার হাজার টাকা নিয়ে যায়। গান্ধীর অহিংস আন্দোলন ব্যর্থ হলে তাঁকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। তখন বিভিন্ন বিপ্লবী দলের সংগঠন প্রচারকার্য ও বিদ্রোহাত্মক ইস্তাহার আবার বিলি হতে থাকে। ইংরাজ কর্তার দমনমূলক আইন পাশ করে আমাদের বহু বিপ্লবী দলের কর্মীদের কারারুদ্ধ করে। আমরা ১৯২৮ সালের প্রথম দিকেই কারামুক্ত হই। এবার কিন্তু ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদী কাজের ঝোঁক আর বড় একটা দেখা গেল না।

জেলে বসে নেতৃস্থানীয় রাজবন্দীরা পরামর্শ করেন,—'এবার বাইরে যেয়ে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করব। আমরা ঐক্যবদ্ধ হলে আর কোন শক্তি আমাদের কাছে দাঁড়াতে পারবে না। অহিংসপন্থী কংগ্রেস বাংলাদেশে আমাদের বিপ্লবীদের জোটের কাছে তিষ্ঠতে পারবে না।'

বিপ্লবী দলের কর্মীরা ত্যাগী এক-নিষ্ঠ দেশহিতৈষী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে অশেষ নির্যাতন ভোগ করেছেন বলে, তাঁরা জনসাধারণের আস্থা ও শ্রদ্ধা লাভ করে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। কংগ্রেসী নেতারা জমিদার, উকীল বা ধনী ব্যবসায়ী রূপে কিছুকালের জন্য জেল খেটে নাম-যশ পেয়ে কংগ্রেসের নেতা হয়ে বসেছেন। স্বভাবত বিপ্লবী দলের কর্মীরাই লোকের চিত্ত আকৃষ্ট করেছে।

সম্প্রতি কারামুক্তির পর বিপ্লবী দলের নেতা ও কর্মীরা ১৯২৮ সনে দেশে বিপুল অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন পেয়েছিলেন। তাঁরা সকল দল মিলে 'ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা সঙ্ঘ' গঠন করছেন জেনে লোকে খুবই উৎসাহিত ও আশান্বিত হয়। অজ্ঞাত কর্মীরা দীর্ঘকাল গুপ্তভাবে থেকে কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আজ তাঁরা প্রকাশ্যভাবে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের কথা বলে দেশে সম্বর্ধনা পাচ্ছেন। কংগ্রেসেও তাঁরা বিভিন্ন উচ্চ পদে স্থান পেলেন। এমন অপূর্ব সুযোগ এসে গেলেও বিপ্লবী নেতারা তার সদ্ব্যবহার করতে পারলেন না। তাঁদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি বুঝে প্রায় সকল কংগ্রেসী নেতারই ১৯২৮-২৯ সালে বিপ্লবী দলের এ নতুন ঐক্যবদ্ধ জাতীয় সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে কাজ করতে উন্মুখ হলেন। অনুশীলন-যুগান্তরের বিপ্লবী নেতারা অ-বিপ্লবী নেতাদের নানা স্বার্থে দলে গ্রহণ করার বিরোধিতা করতে পারলেন না। সুভাষ বসু, কিরণশঙ্কর রায়, আবুল কালাম আজাদ, জে, এম, সেনগুপ্ত প্রভৃতি কংগ্রেস নেতাদের নিয়ে যে দল হবে তা আর যাই হউক, সশস্ত্র বিপ্লবের দল হবে না। ফলে ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী সংগঠন গড়ার পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। আসলে বিপ্লবীদের কোন প্রকৃষ্ট নীতি ও কর্মপন্থা ছিল না। নতুনভাবে কৌশলপূর্ণ বৈপ্লবিক কর্মপদ্ধতি ও কর্মসূচী নিয়ে সংগ্রামের পথে এগুবার কোন ইচ্ছা, আগ্রহ ও কর্মী সংগ্রহের চেষ্টা ছিল না। কর্মীদের মধ্যে হতাশা দেখা দিল। ১৯২৯ সন থেকে পুরানো বিপ্লবী নেতৃত্ব একেবারে অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। কিন্তু ইংরাজের দুঃশাসনে তাঁদের বন্দী জীবনযাপনের অবসান হল না। সশস্ত্র সংগ্রামের পথ পরিহার করে কতক বিপ্লবী গান্ধীর অহিংস আন্দোলনে ভেসে গেলেন। আর সকলে 'এদিকও নয়, ওদিকও নয়'—অবস্থাতে রয়ে গেলেন।

ঐক্যবদ্ধ বিপ্লব দল গড়ার চেষ্টার ব্যর্থতা থেকে নতুন উদ্যমের উদ্ভব হল। ১৯২৮-২৯ সালে দুই পুরনো বনেদী দল থেকে বেরিয়ে এসে কতক কতক আগ্রহশীল বিপ্লবী যুবক এক নতুন সংগ্রাম পদ্ধতি নিয়ে কাজে নামেন; এরা ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ বিরোধী কিন্তু পুরনো নেতাদের ভারতব্যাপী হৎ বিপ্লবের গালভরা কথাও আজগুবী মনে করেন। এ-দুই অকেজো পন্থার মাঝামাঝি একটা সুষ্ঠু কার্যকর সংগ্রাম পদ্ধতি তারা গ্রহণ করেন। অল্প কয়েকটি স্থানে একই সময়ে সরকারী ঘাঁটি আক্রমণ করার জন্য তারা চেষ্টা করতে থাকেন। তারা অকস্মাৎ ঝড়ের বেগে আক্রমণ করার *Shock troops*-এর মতো সহসা দুঃসাহসিক প্রচণ্ড আঘাত (Bull shock) দিয়া শত্রুর শিবির ঘায়েল করতে চান। দিনে দিনে উৎসাহী যুবকগণ অনুশীলন ও যুগান্তরের দলের আনুগত্য ছেড়ে এ নতুন উদ্যোগে অংশগ্রহণ করার জন্য এগিয়ে আসেন।

এ নতুন সংগ্রামপন্থীরা মনে করেন, ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদী ঝোঁকের মোড় ফিরাতে হবে এরূপ কাজ করব। দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে যে দলাদলি চলছে এরূপ আক্রমণে একদল যুবকের রক্তদানে দেশের দলাদলিরও অবসান হবে। তখন কংগ্রেসে, শ্রমিক আন্দোলনে, ছাত্র আন্দোলনে দুই দলের বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে; বিপ্লবী দলের দলাদলি তো ছিলই। দলাদলির ফলে দেশের অগ্রগতি মন্থর হচ্ছে, আর একদিকে সাধারণ লোকের মনে সংগ্রামী মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ দলাদলি হানাহানির নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে বিপ্লবীর রক্তাক্ত সংগ্রামই আজ কাম্য। আমরা জেল থেকে আইরিশ বিপ্লবী 'লেলর'-এর বাণী অন্তরে গেঁথে নিয়ে এসেছিলাম। যতীন দাস, নিরঞ্জন সেন, গণেশ ঘোষ ও সতীশ পাকড়াশী মেদিনীপুর জেলে বিপ্লবী ইতিহাস পড়ে বাইরে এসে নতুনভাবে দাঁড়াবার কথা আলোচনা করতেন। লেলর বলেছেন, যে জাতি বহুদিন বুকের রক্ত দিয়ে স্বাধীনতার লড়াই না করে তাদের সংগ্রামশক্তি খর্ব হয়ে যায়। আমরা এতে অনুপ্রাণিত হয়ে এসেই নতুনভাবে কাজে ব্রতী হলাম। অতি গোপনে আমাদের কাজ,—ইংরাজ গুপ্তচর ছাড়া নিজের নিজের দল নেতারাও এরূপ কাজের বিরোধী।

আমরা ভেবেছিলাম Bull shock দিয়ে যদি আমরা দু-চারশ' যুবক শত্রুর গুলীতে মরেও যাই, তাতে জাতি জাগবে —সংগ্রামী রক্তপ্রবাহ দেশের যুবকচিত্তে উষ্ণপ্রবাহ বইয়ে দেবে। দেশের মধ্যে যত কিছু ভীরুতা, নিষ্ক্রিয়তা মত-পথের স্বল্প ও মালিন্য আছে, সব দূর হয়ে যাবে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ত্যাগ ও জীবন উৎসর্গের মহান দৃষ্টান্তে। জীবনের জন্য তখন আমরা পরোয়া করতাম না, সত্যিই কবির ভাষায় বলা যায়—'মৃত্যুর গর্জন শুনেছিলেম সঙ্গীতের মত।'

অনুশীলন দলের ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও উত্তর বঙ্গের কয়েকটি জেলার বিপ্লবীকর্মীরা যুগান্তর দলের বরিশাল ও চট্টগ্রামের বিপ্লবীকর্মীরা ও খুলনার দলের কিছুকর্মী পুরনো নেতৃত্বের প্রতি আস্থা হারিয়ে নিজেরাই নতুন উন্নত ধরণের সংগ্রামে নামার পরামর্শ করতে থাকেন। ১৯২৯ সালের রংপুরে প্রাদেশিক সম্মেলনে চাটগাঁ, ঢাকা ও কলকাতার প্রতিনিধিদের কয়েকজন নিভৃতে বসে বিদ্রোহাত্মক কাজ সম্পর্কে আলোচনা করে কর্তব্য স্থির করেন। এর পূর্বে ১৯২৮ সনের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সময় পাঞ্জাবের বিপ্লবী নেতা ভগৎ সিং ও দক্ষিণ কলকাতার যতীন দাস প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট বিপ্লবী তরুণ নেতা একত্রে মিলিত হয়ে বাংলার নতুন গ্রুপ এবং নতুন সংগ্রাম নিয়ে কথাবার্তা বলেন। ভগৎ সিং পাঞ্জাবে ও উত্তর প্রদেশে এ-ধরণের সশস্ত্রভাবে শত্রুর কেন্দ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুকে আঘাত দিয়ে দ্রুতবেগে সরে পড়ার কৌশল আয়ত্তে আনার চেষ্টা করবেন বলে গেলেন।

অনুশীলন ও যুগান্তর পার্টির পুরনো সংগঠন থেকে বেরিয়ে আসা তরুণ বিপ্লবীদের বলতো 'রিভোল্ট গ্রুপ' (Revolt group)। পুরনো দলের লোকের মুখে মুখে 'রিভোল্ট গ্রুপ' কথাটা এত প্রচার হয়ে যায় যে, পুলিশের এদের গতিবিধির উপর সন্দেহ-দৃষ্টি পড়ে। প্রস্তুতির পূর্বেই বিসর্জনের পালা এল। পুলিশ একযোগে বিভিন্ন জায়গা তল্লাসী করে ১৯২৯ সনের ডিসেম্বর মাসে বহুকর্মীকে গ্রেপ্তার করে

[শেষাংশ ১৩০ পৃষ্ঠায়]

॥ এক ॥

জীবনে, কোনোদিন, ওঁর সঙ্গে আর আমার দেখাই হত না—যদি হাতের ঘড়িটার কাচ হঠাৎ দু'টুকরো হয়ে ভেঙে না পড়ত। ঘড়িটার কোনো দোষ ছিল না। কাচে খানিক ফাটল ধরেছিল মাস-খানেক আগেই। কিন্তু বাঙালীর চরিত্রে যেমন হয়, চলছে, চলুক—কোনো এক সময় দোকানে ঢুকে বদলে নিলেই চলবে। কয়েক মিনিটের তো ব্যাপার।

এই কয়েক মিনিট মাস চারেকের মধ্যে আমি আর খুঁজে পাই নি। চাকরি করেছি, বাজার করেছি, ট্রামে-বাসে ওঠা-নামা করেছি, অন্ডা দিয়েছি, ময়দানের এক-আধটা 'ম্যামথ র‍্যালী'তে হাজির থেকেছি, সিনেমা দেখেছি, খেলার মাঠে গেছি আর ভেবেছি ঘড়ির কাচটা কালকেই বদলে নেওয়া উচিত—বিশ্রী একটা ক্ষত-চিহ্নের মতো দেখাচ্ছে। তা ছাড়া ঘড়িটা একটু বেশিমাত্রায় কুলীন, খাস সুইজার-ল্যাণ্ডের লোজান শহরে কোন্ এক 'দুবোয়া' কোম্পানির নিজস্ব লোক্যাল প্রোডাক্ট—আমার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ার দান, আমার হাতের পক্ষে অতিশয় বেমানান। এখন একটি ঘড়িকে এভাবে কলঙ্কিত করে রাখা কিছুতেই উচিত ছিল না, অথচ বাঙালী আলস্যে এই কর্তব্যটুকু কিছুতেই করে উঠতে পারি নি আমি।

খুব সম্ভব, সেই অভিমানেই, এক ছুটন্ত দক্ষিণী ভদ্রলোকের চামড়ার ব্যাগের সামান্য একটু ধাক্কা লাগতেই কাচটা একেবারে দু'টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল।

ভদ্রলোক লক্ষ্যও করলেন না, তাঁর সমস্ত আকাঙ্ক্ষা তখন অদূরের একটি বাসের দিকে। কিন্তু মুহূর্তের জন্যে আমি বিমূঢ় হয়ে গেলুম। তারপর আতঙ্কিত চোখে চাইলুম ঘড়িটার দিকে। না—ক্ষতিটা মারাত্মক নয়। ভায়াল অক্ষত, ঘণ্টা-মিনিটের কাঁটা, রয়েছে যথাস্থানে আর সেকেণ্ডের কাঁটাটা সরু একটা সোনালি ফড়িঙের মতো তার দ্বাদশ রাশি পরিক্রমা করে বেড়াচ্ছে।

তা হলে কাচটা এবার নিতান্তই দরকার। কলকাতা থেকে প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার দূরের এই শহরে প্রায় সবই আমার অচেনা, তেলুগু, তামিল আর ইংরিজি ছাড়া আর ভারতের সব ভাষা অচল, মাইল খানেক দূরে—সমুদ্রের ধারে সেই বাংলোটি ছাড়া পরিচিত মুখ আর কোথাও নেই। আমি এসেছিলুম বাজারে কিছু তাজা কফি কিনতে—দিন দুই পরে কলকাতায় ফিরে যাব, আর এমন সময় —এই বিপর্যয়।

কিন্তু বাজার যখন, এবং দু'ধারে যখন রেডিয়ো-রেকর্ডপ্লেয়ার, কাটলারি, জামা-কাপড় আর মণিহারী দোকান, তখন একটা ঘড়ির দোকান কাছাকাছি থাকবেই। দোকান পাওয়াও গেল: 'ডেকান টাইম-কীপার্স — ওয়াচেস — ক্লকস্ — ডীলার্স আণ্ড রিপেয়ারার্স'।

সারা দাক্ষিণাত্যের সময় রাখবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে পোষণ করে, তার দোকানের চেহারা সে পরিমাণে অতিকায় নয়—বরং নিতান্তই ছোটখাটো এবং 'ডীলার্স অ্যান্ড্ রিপেয়ারার্স'—এটাও গৌরবে বহুবচন বলে মনে হল। দোকানে একটিই ব্যক্তি—ভেতরে পা দিয়ে কাউন্টারের ও-ধারে একটি মাথাই আমি দেখতে পেলুম। মাথাটি নত হয়ে আছে, বড়ো বড়ো রুক্ষ চুল, কচিৎ দু-একটি কালোর আঁচড় ছাড়া বকের পাখার মতো শাদা, চোখে ঘড়িওলার চিরন্তন ম্যাগনিফায়িং গ্লাস—নিবিষ্ট মনে কিছু একটা কাজ করছিলেন।

আমার পায়ের শব্দে চোখ তুলে তাকালেন সামনের দিকে। পরচলা খুললেন চোখ থেকে। শীর্ণ মুখ। রাতদিন বসে থেকে কাজ করতে করতে যে ক্লান্ত অবসাদ দেহে-মনে ছড়িয়ে যায়, তারই সুস্পষ্ট চিহ্ন।

একটু হাসলেন। তারপর কিছু একটা বললেন তামিল কিংবা তেলুগুতে।

সবিনয়ে ইংরিজিতে জানালুম, 'ওই মধুর ভাষাটির সঙ্গে পরিচয় নেই বলে আমি দুঃখিত। আমার এই ঘড়ির কাচটা ভেঙে গেছে, যদি দয়া করে বদলে দেন, তা হলে বাধিত হই।'

ভদ্রলোক একটু চেয়ে দেখলেন আমার দিকে। কিন্তু বাঙালীর, বিশেষ করে বাঙালের চেহারা লুকোবার বোধ হয় রাস্তা নেই কোনো। আবার হাসলেন একটু।

'বাঙালী—না?'

পরিষ্কার বাংলা উচ্চারণ।

পুলকিত হয়ে বললুম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি বাঙালী?'

ছিলুম। এখন পুরোপুরি আছি কি না জানি না, পঁচিশ বছর তো হল এখানে। বাইরে সাইনবোর্ডে প্রোপ্রাইটরের নাম দেখেন নি? এস-কে ঘোষম্। ছিলুম ঘোষ—এখন ঘোষম্। যেখানকার যা রেওয়াজ।'

'পঁচিশ বছর রয়েছেন এখানে?'

'হিসেব করলে মাস কয়েক বেশি হবে হয়তো। আপনি কি এখানে নতুন? চাকরি নিয়ে এসেছেন? আরে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন—বসুন।'

কাউন্টারের বাইরে রেক্সিন মোড়া খান দুই চেয়ার ছিল, তারই একটাতে বসে পড়লুম আমি।

বললুম, 'আমি নতুনই বটে। তবে চাকরি নিয়ে আসি নি, এসেছি বেড়াতে।'

'কোথায় উঠেছেন?'

জানালুম।

'ও—নিশীথ মুখার্জির বাংলোয়? নিশীথবাবু কে হন আপনার?'

'পিসেমশাই।'

'তাঁর ঘড়ি আমিই সারাই।'—এস-কে ঘোষম্ একটু হাসলেন: 'আমাকে চেনেন তিনি।'

বললুম, 'স্বাভাবিক।' পিসেমশাইয়ের বাংলোর বাইরে এই ক'দিন বাদে বাংলা ভাষায় কথা বলতে পেরে আমি একটু প্রগল্‌ভ বোধ করলুম। সেই সঙ্গে কোথায়

একটা ক্ষীণ, সুদূর অস্বস্তি আমাকে স্পর্শ করছিল, এস-কে ঘোষম্ যখন হাসছিলেন তখন আমার মনে হচ্ছিল কোথায় একটা স্মৃতি—দুপুরের রোদে নদীর বালি যেমন অভ্রের পাতের মতো কাঁপে, তেমনি করে কেঁপে চলেছে একটু একটু। আমি হয়তো কখনো তাঁকে চিনতুম—অথবা কোনোদিন চিনতুম না—কোনো চেনা মানুষের অস্পষ্ট দুটো-একটা রেখার সঙ্গে কোথাও তাঁর মিল আছে হয়তো।

আমি বলে চললুম, স্বাভাবিক। এখানে তো বাঙালী খুব বেশি নেই।'

'না। সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্টের ক'জন কর্মচারী, নতুন রেয়ন ফ্যাক্টরীতে জন দুই অফিসার, রেলে বোধ হয় এক ভদ্রলোক আছেন আর সদাশিবম্ রোডে কর্নেল সেনগুপ্ত—খুব নামকরা ডাক্তার। আর আমি। আলাপ হয় নি এঁদের সঙ্গে?'

'বিশেষ নয়। পরশু এক মিস্টার গুপ্ত এসেছিলেন পিসেমশাইয়ের বাংলোয়।'

'ও—কুনাল গুপ্ত। ইলেক্‌ট্রিক এন্‌জিনীয়র—বুঝেছি। তা আছেন ক'দিন?'

'পরশু ফিরে যাব কলকাতায়।'

'সব দেখা হয়ে গেছে? মহাবলীপুরম্—পক্ষীতীর্থ—'

বললুম, 'যতটা পারা যায়। দেখবার তো শেষ নেই। কিন্তু আমারও থাকবার উপায় নেই আর। ছুটি ফুরিয়ে গেছে।'

'কী করেন?'

'মাস্টারি।'

'খুব ভালো প্রফেশ্যন। আমিও এক সময়—' বলতে বলতে থেমে গেলেন: 'দেখি ঘড়িটা?'

ঘড়িটা কাউণ্টারের ওপর রাখাই ছিল। তুলে নিয়ে বললেন, 'বাইরের ঘড়ি দেখছি—ভালো জিনিস। এ প্রকারের ঘড়ি ভারতবর্ষে কখনো আসে না।'

বললুম, 'আমার স্ত্রী কিনে এনেছিলেন সুইজারল্যাণ্ড থেকে।'

'বুঝেছি।'—তারপর একটা স্ক্রুয়ার খুলে কাচ তুলে দেখতে লাগলেন, কোন্‌টা ফিট করে।

আমি দেওয়ালের শো-কেস ভর্তি, ছোট ছোট লেবেল-লাগানো রিপেয়ারের ঘড়ি দেখছিলুম, ক'টা পুরোনো দেওয়াল-ঘড়ি দেখছিলুম, ক্যালেণ্ডারে মহালক্ষ্মীর ছবি দেখছিলুম, কার একটা সার্টিফিকেটের মতো কী বাঁধানো রয়েছে—তা দেখছিলুম। কিন্তু আমার মনের ভেতরে—দুপুরের রোদে যেন নদীর বালি অভ্রের মতো কাঁপছিল, একজন মানুষকে একদিন চিনতুম অথবা কোনোদিন চিনতুম না অথচ তার কয়েকটা অস্পষ্ট রেখা দেখা যাচ্ছে, এইসব অনুভব করছিলুম। একটা খুব সুন্দর স্মৃতি আসতে চাইছিল, খুব ভালো লাগার কয়েকটা দিন যেন ফিরে আসতে চাইছিল—আমি যেন তারার আলোয় ভরা একটা মাঠের ভেতর দিয়ে একা হেঁটে চলেছিলুম—না—একা নয়—আমার ঠিক আগে আগে কে আর একজন হেঁটে যাচ্ছিল—সে আমার চেনা, অথচ আমি তাকে মনে করতে পারছিলুম না, তার নামটা—

এস-কে ঘোষম্ কথা বললেন তখন।

'না—ঠিক এই মাপের গ্লাস নেই দেখছি। তৈরি করে দিতে হবে, সময় লাগবে একটু। বিকেলে আসতে পারবেন একবার?'

তখন—তখন—অন্ধকার ঠাণ্ডা মাঠের ভেতর দিয়ে যে আমার আগে আগে হেঁটে যাচ্ছিল, যাকে আমি চিনতুম অথচ চিনতে পারছিলুম না—সে আমার দিকে মুখ ফেরালো।

অস্বস্তিতে ছটফট করে আমি বলে ফেললুম, 'আমার মনে হচ্ছে, আপনাকে কোথাও—'

এস-কে ঘোষম্ চোখ তুলে আমার দিকে তাকালেন কিংবা আমার মাথার পাশ দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলেন, সে আমি ঠিক বলতে পারব না। তারপর খুব স্বাভাবিক আর শান্ত গলায় বললেন, 'হাঁ, আমাকে তুমি চিনতে। তোমার ছেলেবেলায়।'

চমকে বললুম, 'আপনি—আপনি—'

'আমি সুমন্ত ঘোষ—তোমার সুমন্তদা। তোমার বাড়িতে আমি থাকতুম, পড়াতুম তোমাকে, তোমার ছোট বোন দীপুকে।'—কেটে কেটে স্পষ্ট উচ্চারণে বলে চললেন, 'কিন্তু ত্রিশ বছর আগেকার কথা ভুলে যাও, মণ্টু। আমি এখন এস, কে ঘোষম্—অন্ধ্রের এই শহরে ঘড়ি সারাই।'

স্বরটা বদলে গেল তারপরেই। ঝুঁকে পড়লেন ঘড়ির ওপর। বললেন, 'বিকেলে ঘড়িটা রেডি করে রাখব। চারটে থেকে আটটার ভেতরে যখন খুশি এসে নিয়ে যাবেন।' তারপরেই রসিদ বই খুলে, পেনসিল তুলে নিয়ে বললেন, 'ইয়োর নেম অ্যাণ্ড অ্যাড্রেস স্যার—'

ত্রিশ বছরের পর্দা সরিয়ে, একবারের জন্যে দেখা দিয়েই—সুমন্ত ঘোষ আবার আড়ালে লুকিয়ে গেলেন।

একটু সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালুম আমি।

বললুম, 'আচ্ছা, বিকেলেই আসব। নমস্কার।'

রসিদটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে এস-কে ঘোষম্ বললেন, 'নমস্কার।'

রাস্তায় বেরিয়ে আমি রসিদটার দিকে চেয়ে দেখলুম। লেখা রয়েছে—'নো চার্জ।'

এতক্ষণে—এতক্ষণে আমার বুকের ভেতর থেকে কান্নার মতো কী একটা ফেটে পড়তে চাইল। কী দরকার ছিল এটুকুর, এ অনুগ্রহ কে চেয়েছিল সুমন্তদার কাছে? ত্রিশ বছর আগেকার দিনগুলোকে এত সহজে, এক কথায় যিনি মুছে দিতে পারেন, কে তাঁকে বলেছিল বিনা পয়সায় আমার ঘড়ির কাচ সারিয়ে দিতে?

ইচ্ছে করল ফিরে যাই দোকানে, বলি—আমার ঘড়ি ফেরৎ দিন, কাচ আপনাকে বদলাতে হবে না। কিন্তু বলা গেল না। আমি পরাভূতের মতো একটা সাইকেল-রিক্‌শায় উঠে পড়ে বললুম, 'নীলম রোড।'

॥ দুই ॥

সমুদ্রের দিকের বারান্দায় একটা ডেক চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে আমি পঁচিশ-ত্রিশ বছরের ওপারে চলে গেলুম। সামনে বাঁধের মতো উঁচু রাস্তাটা, তাল আর নারকেলের সারি দুলছে হাওয়ায়, সেখান থেকে খানিক পাথর-বালি মেশানো ঢালু ডাঙা নেমে গেছে সমুদ্রে। এই বারান্দায় বসে ডাঙাটা দেখা যায় না—শুধু চোখে পড়ে সমুদ্র ঢেউ ভাঙছে। নিবিড় নীলতার রঙ—দীঘার সমুদ্র, পুরীর সমুদ্রের চাইতে অনেক বেশি নীল, শাদা ফেনার ফুল ফুটছে—মাঝে মাঝে পাখির ঝাঁক। শরতের আকাশে কয়েক টুকরো মেঘ থমকে আছে প্রায়—দুপুরের রোদ ঝিমোচ্ছে, সাগরের নোনা হাওয়ায় তাল-নারকেলের মাথায় মাতলামো চলছে একটানা।

পিসেমশাই বেরিয়ে গেছেন অফিসে, রেডিয়োগ্রামের একটা চাপা আওয়াজ শোনা যায়, খুলে দিয়ে পিসিমা খুব সম্ভব দিবানিদ্রায় মগ্ন। ঝি-চাকরদের ছুটি এখন। বাড়ীতে আর কেউ নেই। পিসতুতো বোন রেবা কলকাতায় শ্বশুর-বাড়িতে ঘর-সংসার করছে, পিসতুতো ভাই ব্রতীশ বারো বছর প্রবাসী, ফ্রান্স কিংবা ইতালী—কোথাও সে এনজিনীয়ার, ঘরে তার বিদেশিনী স্ত্রী।

শুধু রেডিয়োগ্রামে থেকে থেকে বিলিতী গানের সুর বদল। সমুদ্রের শব্দের সঙ্গে, পাতার শব্দের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে তারা। নিরবচ্ছিন্ন ধ্বনির মধ্যেও যে নৈঃশব্দ্য সৃষ্টি হয়, তাই এখন ঘিরে ধরতে লাগল আমাকে। সামনের সমুদ্র তার ঢেউ, ফেনা, ওপরের কয়েক টুকরো মেঘ আর আকাশের মুক্তি বেয়ে আমাকে অনেক দূরে নিয়ে গেল, যেখানে আমাদের বাড়ির পাশে আত্রাই নদীর জলে নৌকোতে পাল উঠেছিল, আমাদের বাগান থেকে উঠে আসছিল বৃষ্টিভেজা কামিনী ফুলের গন্ধ।

তখন স্মৃতিরা ছবি হয়ে এল।

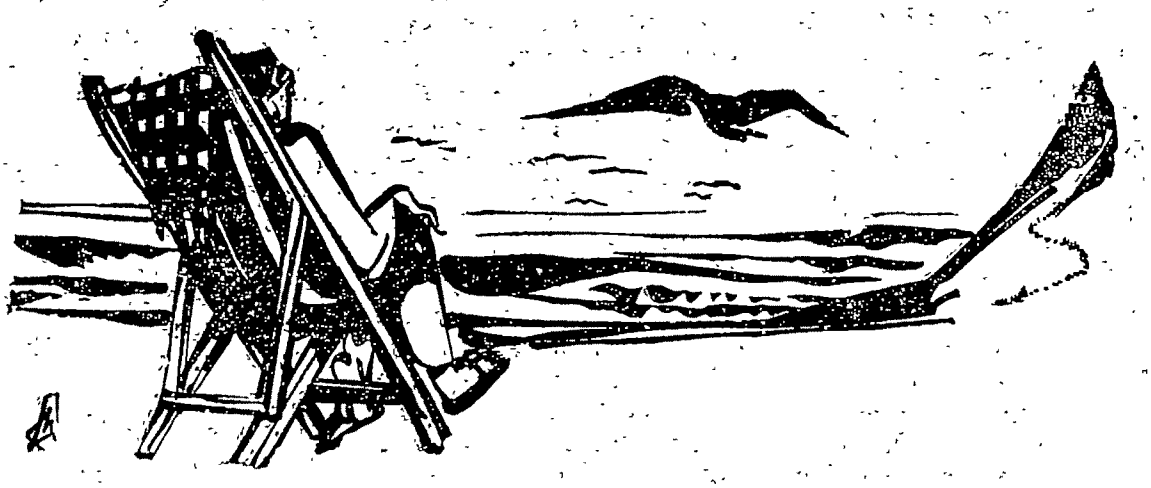

সমুদ্রের দিকের বারান্দায় একটা ডেক চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে আমি পঁচিশ-ত্রিশ বছরের ওপারে চলে গেলুম।

সমুদ্রের ওপর পাখিদের মতো সেই সব দিন।

সুমন্তদা কী করে আমাদের বাড়িতে এসে পৌঁছেছিলেন, সে আমি বলতে পারব না।

এইটুকু কেবল জানতুম, তিনি আমাদের দেশের লোক। বাবা না হয় চাকরির সূত্রে এসেছিলেন উত্তর বাংলার এই দূর অঞ্চলে, তাঁকে আসতে হয়েছিল, কিন্তু পূর্ব বাংলার সেই গ্রাম থেকে, স্টিমারে, ট্রেনে এতখানি পথ পার হয়ে, তারপর গোরুর গাড়িতে কুড়ি-বাইশ মাইল পাড়ি দিয়ে কী উপায়ে তিনি এখানে এসে পৌঁছুলেন, ভাবতেও আমার ধাঁধা লাগে।

কেবল এইটুকু জানতুম যে সুমন্তদার কেউ নেই। বাড়ির অবস্থাও ভালো নয়। ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছিলেন, পাশ করতে পারেন নি—কিংবা বোধ হয় পরীক্ষা দেওয়া হয় নি কোনো কারণে। সুমন্তদার বাবাকে আমার বাবা দাদা বলতেন, ভালোও বাসতেন, হয়তো সেই সূত্রে কোথাও থাকবার একটা জায়গা খুঁজতে খুঁজতে এসে পড়েছিলেন আমাদের কাছে। কিংবা বাবাই হয়তো তাঁকে আসবার জন্যে চিঠি দিয়েছিলেন।

কারণ যাই হোক, সুমন্তদা এসে পড়েছিলেন।

গোরুর গাড়ি থেকে নেমেছিলেন, এইটুকু আপসা মনে আছে। গায়ে ময়লা হাফশার্ট ছিল, পরণে মালকোচা করা ধুতি, খোঁচা খোঁচা দাড়ি ছিল গালে, এক মুখ হাসি ছিল।

সেই সময় বাড়ির সামনের কদম গাছটা ফুলে ফুলে ভরে গিয়েছিল। আমার ছোট বোন দীপু অর্থাৎ দীপিকা আমাকে বলছিল, 'দাদা, দুটো কদম ফুল পেড়ে দিবি—' আর আমি ভাবছিলুম, বাড়ির ভেতর থেকে পেয়ারা পাড়বার আঁকশিটা নিয়ে আসব, না বাস্টিভেজ্জা গাছটায় চড়বার একটু চেষ্টা করে দেখব, এই সময়—গাড়ি থেকে টুক করে নেমে পড়ল সুমন্তদা।

গাড়িতে বসেই দীপুর প্রার্থনা শুনেছিলেন, না নিজেই আন্দাজ করেছিলেন, বলতে পারব না। একবার তাকিয়ে দেখলেন দু' জনের দিকে। তারপর:

'কী খুকি, কদমফুল চাই? আচ্ছা, আমি দিচ্ছি—'

বলবার অপেক্ষা মাত্র। তারপরেই খাস বরিশালের নারকেল-সুপুরির গাছে ওঠার নৈপুণ্যে তড়াক করে উঠে পড়লেন কদম গাছে, ঝুপ-ঝুপ করে ডাল-পাতা শুদ্ধ একরাশ কদমফুল নেমে এল নিচে।

'চাই আর?'

আমরা ভাই-বোনে থ। এমন সময় মা বেরিয়ে এলেন দরজায়। তেমনি এক লাফে নেমে পড়লেন সুমন্তদা, তারপরে মা-র পায়ে একেবারে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম।

মা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। প্রণাম সেরে উঠে একগাল হেসে সুমন্তদা বললেন, আমাকে চিনতে পারছেন না খুড়িমা? আমি সুমন্ত, পিংলাকাঠির সুমন্ত।'

মা বললেন, 'ও—তুই? তোকে তো আমি কতটুকু দেখেছিলুম। আয়—আয়—ভেতরে আয়।'

'গাড়িতে বাক্স-বিছানা আছে খুড়িমা, নামাই।'

'সে নামাবার লোক আছে, তুই আয় ভেতরে।'

ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে সুমন্তদা বললে, 'সারা রাত্তির গোরুর গাড়ির ঝাঁকুনিতে সন্ধ্যেবেলায় যা খেয়েছি, তা কখন হজম হয়ে গেছে খুড়িমা। চিঁড়ে-গুড়ি-নারকেলের নাড়ু যা আছে, তাই একধামা এখন বের করুন আগে।'

দীপু এক চোখ অতল বিস্ময় নিয়ে তাকালো আমার দিকে।

'কে রে দাদা!'

'জানি না তো।'

'খুব মজার লোক না দাদা? কত ফুল পেড়ে দিয়েছে।'—ফুলগুলো কুড়োতে কুড়োতে দীপু হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল: 'আর ভীষণ পেটুক—না রে? এসেই একধামা চিঁড়ে-মুড়ি খেতে চাইল।'

'হুঁ।'

এই ভাবেই সুমন্তদার আবির্ভাব হল আমাদের বাসায়। আর কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা গেল, আমাদের এখানে সুমন্তদা একেবারে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ সে যে এতদিন এখানে ছিল না, এই কথাটাই আর ভাবা চলে না এখন। তার প্রধান কাজটা ছিল বোধ করি আমাদের পড়ানো।

এ পর্যন্ত আমাদের প্রাইভেট টিউটরের দরকার হয় নি। দীপুর ইংরিজি তখন এ বিগ ফিগ', এ ফ্যাট্ ক্যাট্' পর্যন্ত, আমি আর একটু এগিয়ে লেট লীভিফে'র সেই সব উপদেশপূর্ণ গল্প-টল্প পড়ি। খুব উৎসাহ নিয়ে আমাদের পড়ায় সুমন্তদা।

চড়-চাপড়ের কারবার নেই, বকুনি-টকুনিও না। আসলে আমরা দু' ভাই-বোনই ছিলুম সুশীল-সুবোধ, সুমন্তদাকে বিশেষ কিছু করতে হত না, আমরাই চেঁচিয়ে মাত করে রাখতুম।

বরং সুমন্তদাই উসখুস করত। অত পড়া ভালো লাগত না তার।

'এ স্লাই ফক্স অ্যাট এ হেন—স্লাই কি সুমন্তদা?'—দীপু জানতে চাইল।

'স্লাই? ধূর্ত। অ্যাকুশেয়ালগুলো ভীষণ পাজী হয়, তা জানিস?'

অঙ্কে আমার নিদারুণ অরুচি আর সেই মুহূর্তে হয়তো প্রকাণ্ড একটা গুণের অঙ্ক কষতে হচ্ছিল আমাকে। আমি অবশ্য বই থেকে মাথা তুললুম।

'আমি জানি। আমাদের হাঁস চুরি করে খেয়েছে।'।

'আরে হাস-মুরগী-ছাগলছানা এসব তো থাবেই। গাছ থেকে পাকা কাঁটাল পর্যন্ত নামিয়ে খায় ওরা।'

'দূৎ!'—দীপুর অবিশ্বাস : 'কাঁটাল নামাবে কী করে? ওরা কি বানর? ওরা কি গাছে উঠতে পারে?'

'গাছে ওদের উঠতে হয় না। অনেক সময় দেখেছিস তো খুব নিচু পর্যন্ত কাঁটাল হয় কোনো-কোনো গাছে। সেগুলো পাকলে এক দঙ্গল শেয়াল এসে যায় দল বেঁধে। তখন একটার কাঁধে আর একটা ওঠে, তার কাঁধে আর একটা, তার কাঁধে আর একটা—এমনি করে উঁচু হয়ে কাঁটালের কাছে পৌঁছে যায়। তখন ওপরের শেয়ালটা পাকা কাঁটাল টেনে নামায়, আর সবাই মিলে—'

তারপর পুরো দশ মিনিট শেয়ালের বুদ্ধি নিয়ে আলোচনা।

অমনোযোগী ছাত্রকে ধমক দিয়ে পড়ায় মন বসাতে হয় মাস্টারের। কিন্তু আমাদের বেলায় ঠিক উল্টো। আমরা ভাই বোনে চ্যাঁ চ্যাঁ করে একটানা এমন পড়ে যেতুম যে বিরক্তি ধরে যেত সুমন্তদার।

"সতীশেরা বড়লোক, কত টাকাকড়ি,
কত যে দালানকোঠা, দ্বারেতে প্রহরী।
সকলেই মানে গণে, ভালোবাসে সবে,
ভালো খায়—ভালো পরে, কত সুখ
তবে—'

বাংলা কবিতা হলে তো কথাই নেই, আমার চিৎকার গগনভেদী হতে থাকত। এখন বেশ বুঝতে পারি, অস্বস্তিতে ছটফট করত সুমন্তদা।

"জিজ্ঞাসিলা পিতা তবে সতীশের
কাছে :
বড় লোক হতে বাছা ইচ্ছা তব আছে?
শুন শুন কি হইলে বড় লোক হয়—
বড় লোক হওয়া বাছা সোজা কথা নয়।
মন দিয়া লেখো পড়ো
অতি অতিশয়—"

ওঃ, একটু থামতো মন্টু। কাণের পোকা বেরিয়ে গেল যে!'

'চেঁচিয়ে-না পড়লে যে মুখস্থ হয় না সুমন্তদা। আর মুখস্থ না হলে থার্ড মাস্টার—'

'আরে রেখে দে তোর থার্ড মাস্টার!' —সুমন্তদার মুখে তাচ্ছিল্য ফুটে বেরুত : 'এই কবিতা মুখস্থ হলেই যদি বড় লোক হওয়া যেত, তা হলে আর তোদের থার্ড মাস্টার কুড়ি টাকা মাইনের চাকরি করত না। আসলে কী জানিস,—বরাত—বরাত। জানিস, নবগঞ্জের পাল্লেদের কী হয়েছিল?'

রইল সতীশের পিতার উপদেশ। বইয়ের পাতা বন্ধ হল, ভালো ভালো কথা-গুলো চাপা পড়ল আপাতত। শুরু হল আর এক জগতের গল্প।

সে এক ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত। নবগঞ্জের পাল্লেরা দু' ভাই ফিরছিল হাট সেরে। ভারী গরীব তারা, তরী-তরকারী বেচে দিন যায় কি যায় না। কখনো-কখনো দু-একবেলা উপোস পর্যন্ত দিতে হয় তাদের।

আজ হাটে ভারী লোকসান গেছে। অর্ধেক দামে বেচতে হয়েছে কচু-কুমড়ো। এর পরে আর ব্যবসা চলবে না। দু' ভাই পদ্মার ওপর দিয়ে নৌকো বাইতে বাইতে ঘরে ফিরছিল আর ভাবছিল, কী হবে।

বড়ো পাল চোখের জল মুছতে মুছতে বললে, এ কষ্ট তো আর সহ্য হয় না। ইচ্ছে করছে পদ্মার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করি।

ঠিক সেই সময়।

ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় দু' ভাই শুনল ঝনঝন করে মোহরের শব্দ। যেন যক্ষের ভাণ্ডারে টাকা গুণছে কেউ।

কিন্তু যক্ষ নয়। উঁচু পাড়ি ভেঙে পড়ছিল ভরা বর্ষার পদ্মার স্রোতে—ভেঙে পড়ছিল পুরোনো আমলের বিক্রমপুর। পাল্লেরা দেখল, সেই ভাঙনের মধ্যে মাটির তলা থেকে ঝুর ঝুর করে মোহর পড়ছে পদ্মার জলে—যেন জ্যোৎস্নায় ঝকমক করছে সোনার কণা।

দু' ভাই প্রথমে কাঠ। ভাবল, ভূতুড়ে কাণ্ড। তারপর মনে করল, যা হওয়ার তা হোক। এমনিই তো না খেয়ে মরছি, না হয় ভূতের হাতেই মরব। আর যদি কিছু মোহর পাওয়া যায়—

তারা নৌকো ভিড়িয়ে দিলে সেই সোনার ঝর্ণার কাছে। নৌকো ভরে মোহর ঝরে পড়তে লাগল, এত বড়ো বড়ো আকবরী মোহর। তারপর—

তারপর যা হয় রূপকথায়। আকাশ-ছোঁয়া দালানকোঠা, জমিদারী—দেশজোড়া ব্যবসা, কী আর বাকী রইল?

এমনি করে সুমন্তদা আমাদের পড়া নষ্ট করত।

নষ্ট করত? না। পড়ার বইয়ের বাইরে সুমন্তদা আমাদের, অন্তত আমার মনকে অনেক দূর-দূরান্তের খবর দিত। কবে সে গিয়েছিল সুসংয়ের পাহাড়ে—দূর থেকে শুনেছিল বুনো হাতির ডাক; কবে কালাবদরের বিশাল কালো জলের ওপর নৌকো প্রলয়-ঝড়ে পড়েছিল—ডুবে যেত আর একটু হলেই—সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী; তালের ডোঙা নিয়ে ভরা বিলের জলে টাল খেতে খেতে কী করে পাড়ি দিত, তার গল্প; আড়িয়াল খাঁর চড়ায় কিভাবে কুমীর তার ছানাপোনা নিয়ে রোদ পোয়ায়, স্পষ্ট দেখতুম তার ছবি; শীত-কালে ভাটি অঞ্চলে গিয়েছিল মামাবাড়িতে —ও-সময় ওদিকে বাঘ আসে, সেই বাঘ কী করে বাড়ির কুকুরটাকে নিয়ে গেল তার শিহরণ জাগানো করুণ কাহিনী। একটা ছোট লাঠি নিয়ে কিভাবে চার হাত লম্বা 'খইয়া জাতি' (খরিশ গোখরো) সাপটাকে মেরেছিল, সেই বীরত্বের বিবরণ; রাজাপুরের মঠ, মাধবপাশার গড়; শিকার-পুরের তারা বাড়ি—সব জীবন্ত হয়ে উঠত তার বর্ণনায়। বর্ষার দিনে বাড়ির বারান্দা পর্যন্ত জল উঠে এলে কিভাবে

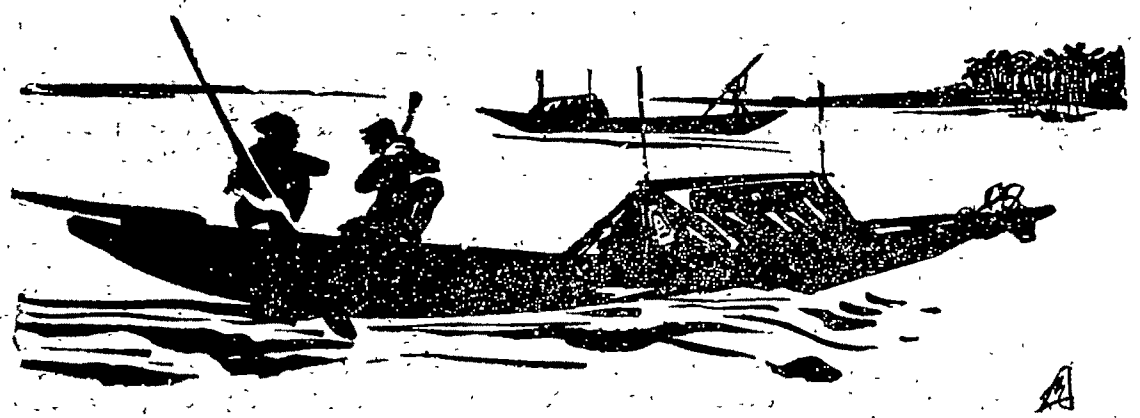

সে এক ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত। নবগঞ্জের পাল্লেরা দু' ভাই ফিরছিল হাট সেরে।

ফুলম ছড়ে বড়ো মাছ গেঁথে ফেলা হয়, সে কাহিনীও বাদ যেত না।

দীপু সব সময় এই সমস্ত গল্প যে শুনত তা নয়। পাশের বাসার ওভারশিয়াররাবুর মেয়েরা তার খেলার সঙ্গী, ওর মন পড়ে থাকত সেদিকে। দীপুর মনে, চিন্তায় সুমন্তদার কোনো ছায়া কোথাও আছে বলে আমি জানি না। আজ কলকাতায় ফিরে, দীপুর বাড়িতে গিয়ে যদি জিজ্ঞেস করি : 'সুমন্তদার সঙ্গে দেখা হল, মনে পড়ে তাঁকে?' ব্যস্ত গৃহিণী দীপু একবার কপাল কুঁচকে, আশ্চর্য হয়ে বলবে : 'সুমন্তদা? কে সে?'

ও আমার চাইতে তিন বছরের ছোট। কাজেই যে সুমন্তদা বছর তিনেক ধরে আমাদের বাসায় ছিল, তাকে স্মৃতিতে ধরে রাখবার বয়েস হয়তো ওর তখনো আসে নি। তা ছাড়া সুমন্তদা ওর কাছে একটা অংশ মাত্র, ওর সঙ্গিনীরা ছিল, পুতুলের সংসার ছিল, আর রাত দিন তো মা-র পায়ে পায়েই ঘুরত। কিন্তু সুমন্তদাকে আমি সর্বদা কাছে পেতুম, এক সঙ্গে থাকতুম, এক সঙ্গে ঘুরে বেড়াতুম। ছেলেবেলায় আমি বেশি মিশতে পারতুম না, একা-একা থাকবার অদ্ভুত নেশা ছিল আমার, আত্রাইয়ের ধারে, পলাশের বনে, মাঠের ওপারে পদ্মদীঘির ধারে ধারে নিঃসঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াতুম। সেই সময় সুমন্তদা আমাকে সঙ্গ দিয়েছিল, একাকার হয়ে গিয়েছিল জীবনের সঙ্গে। আমার স্মৃতিটাও খুব অস্বস্তিকর—কোনো জিনিসকে সে সহজে ছেড়ে দিতে চায় না—আজ ত্রিশ বছর পরে—ঝিমধরা দুপুরে—সামনের নিবিড় নীল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আমি আমার ছেলেবেলাকে টানা একটা ফিল্মের মতো দেখতে পাচ্ছি।

দেখতে পাচ্ছি, বাড়িতে সুমন্তদা অপরিহার্য। যে-কোনো কাজ-কর্মে আগে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

'কোনো ভাবনা নেই খুড়িমা, আমি আছি।'

চাকরের জ্বর? ঠিক আছে। ধামা মাথায় তুলে হাট করে নিয়ে এল। চালের ওপর থেকে কুমড়ো কেটে নামাতে হবে? ঠিক তিন মিনিটের ওয়াস্তা। মাইল চারেক হেঁটে একটা জরুরি খবর দিয়ে আসতে হবে এই রাত্রে? 'বহুৎ আচ্ছা—দিন আমাকে একটা লণ্ঠন আর একখানা লাঠি—আমি বেরিয়ে পড়ছি।'

আর দেখছি, ভোরবেলায়, আমরা চোখে জল দিয়ে পড়তে বসার আগেই চঠানে ইট পেতে সুমন্তদা হুশ-হুশ করে চন দিচ্ছে। তারপর বারান্দার লোহার ধাম ধরে গোটা কয়েক বৈঠকী।

'আয়—আয় ডন-বৈঠক লাগা। হেল্‌থ্ ইজ্ ওয়েল্‌থ—মানে স্বাস্থ্যই ঐশ্বর্য। সতীশের বাবার উপদেশে কিচ্ছু হবে না বুঝলি—যদি সারা জীবন রোগা টিঙটিঙে হয়ে থাকিস।'

ডন দিতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ি।

'ট্রাই ট্রাই এগেন। চেষ্টা করতে করতে হয়ে যাবে। কালই তো ইংরিজি কবিতা পড়ছিলি :

Standing at the foot boys,
looking at the sky,
How can you get up boys,
if you never try ?

চেষ্টা না করলে কিছু হয়?'

সিদ্ধিলাভ করতে একটু সময় লাগে অবশ্য। তবু এক রকম করে ডনটা আয়ত্তে এসে যায়।

'উঁহু, অত কষ্ট করে নয়। ঈজি—ঈজি। দু-বারের পরে তিনবারেই তো দেখছি ডানা ভেঙে পড়ে গেলি। আঁ-আঁ করে স্পীডে ডন দিয়ে যাবি। এই দ্যাখ্—ওয়ান-টু-থ্রী-ফোর—'

যেন একটা মেশিন চলতে থাকে সামনে।

সুমন্তদার উপদেশে আমি স্বাস্থ্যের ঐশ্বর্য লাভ করতে পারি নি, সতীশের বাবার কাছ থেকেও দালান-কোঠা দাস-দাসী লাভের বাণী কাজে লাগাতে পারি নি আমার জীবনে। তবু আমার প্রত্যেকটা দিন সুমন্তদার স্মৃতি দিয়ে গাঁথা তখন।

এক কথায়, মানুষটি ছিল সব দিক থেকে মুগ্ধ করবার মতো। রূপ কাকে বলে সেটা বোঝবার বয়েস আমার ছিল না, কিন্তু এটা বুঝতে পারতুম, স্বাস্থ্যে আর দীপ্তিতে মানুষটি ঝকঝক করছে।

কোন্ দিকে যে মাথা খেলত না, জানি না। কিছু কাঠ-কুটো, কাটা পেরেক আর একটা হাতুড়ী পেলেই যা হোক একটা বানিয়ে ফেলতে পারত। একটা বাতিল পুরোনো টাইমপীস ছিল, ইচ্ছে মতো বন্ধ হয়ে যেত—সেটাকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল একটা কুলুঙ্গির ভেতরে। সেটাকে টেনে বের করে কী কুটকাট করল, মা-র সেলাই কলের ফাবেল থেকে তেল ঢালল খানিকটা, বেশ টিকিস টিকিস করে চলতে লাগল ঘড়িটা। দীপুর 'মাঘ মণ্ডল' ব্রতের কয়েকটা পুতুল এমন নিটোল হাতে গড়ে দিলে যে মা স্তম্ভিত।

'তুই আগের জন্মে মেয়ে ছিলি নাকি রে?'

'আমি সব কাজ পারি' খুড়িমা কায়েতের ছেলে, হেঁশেল তো ছুঁতে দেবে না, নইলে একদিন এমন রান্না করে দিতুম যে খেয়ে বলতে—হ্যাঁ!'

এমন মানুষের ভক্ত না হয়ে কে থাকতে পারে?

বাইরের যে ঘরটিতে সুমন্তদা শুতো, সেখানে তার মাথার সামনে টাঙানো থাকত স্বামী বিবেকানন্দের একটা ছবি। রাত্রে যখন ঘরের বড়ো খাটে, জানলার ধারে শুয়ে—কদমগাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে একরাশ জ্বলজ্বলে তারা দেখতে দেখতে ঘুমে জড়িয়ে আসত আমার দু চোখ, তখন যেন অনেক দূর থেকে—সামনের এই সমুদ্রের গর্জনের মতো আমার কানে মন্ত্রোচ্চারণের শব্দ ভেসে আসত গম্ভীর আবেগভরা গলায় বিবেকানন্দের কবিতা :

"Say Sanyasin bold—
Om, Tat Sat Om"

॥ তিন ॥

বারোয়ারীতলার দুর্গাপুজোর যাত্রার আয়োজন।

যাত্রার দলের গরুর গাড়ি এসে পৌঁছুবার পর থেকেই আনন্দে এবং রোমাঞ্চে আমাদের উৎকণ্ঠিত প্রহর কাটছে। মাঝে মাঝেই বাসনা জাগছে আশপাশে গিয়ে এক-আধটু উঁকি-ঝুঁকি দিই, কিন্তু বাড়ির কড়া নিষেধ। সেজেগুজে মা-বাবার সঙ্গে যেতে হল সেই সন্ধ্যেবেলায়, যখন বেহালায় পড়েছে ছড়ের টান, প্যাঁ পোঁ করছে হার্মোনিয়াম, মাঝে মাঝে এক-আধটা রোল উঠছে ডুগী-তবলায়।

তারপর সেই মায়ামঞ্চের অদৃশ্য যবনিকা উঠে গেল। এলেন রাজা-রাণী, তলোয়ার ঝনঝনিয়ে এলেন সেনাপতি, দেখা দিল সখীর দল।

রাজা-রাণী কোথায় লাগে, গেরুয়া-রঙের পোশাক আর মাথায় পাগড়ী বাঁধা বিবেক এসে যে ছোটরাণীর দিকে আঙুল বাড়িয়ে গান গাইছে : 'ও যে মনমোহিনী কালনাগিনী কণ্ঠ যে ওর ভরা বিষে'—তাও কিছুমাত্র সিহরণ জাগাচ্ছে না। সখীরা এলেই আমি বিমোহিত হয়ে যাচ্ছি। গায়ে শলমা-চুমকির পোশাক, হাঁটু পর্যন্ত খাকী মোজা, তার ওপর ঘুঙুর। নেচে গেয়ে

তারাই মাতিয়ে দিচ্ছিল : 'আজি মধু-রাতে, ভরা জ্যোছনাতে'—

আর অপেক্ষায় আছি কখন যুদ্ধ বাধে।

বাধবেই যে তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। কারণ সেনাপতি দুর্জয় সিংহ যেভাবে চোখ পাকিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন এবং তলোয়ার ঝঙ্কার তুলছেন, তাতে একটা কিছু না ঘটেই যায় না। ওদিকে রুদ্র সিংহ বলে কান পর্যন্ত গোঁফওলা যে লোকটা ছোটরাণীর সঙ্গে সন্দেহজনক-ভাবে শলা-পরামর্শ করছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে, এই দুর্জয় সিংহ আর রুদ্র সিংহের মধ্যেই যুদ্ধটা বাধল বলে। আমি আগেও যাত্রা দেখেছি—বেশ বুঝতে পারছিলুম, যুদ্ধের বাজানা বাজতে বেশি দেরী নেই আর।

তারপর সড়াক সড়াক করে তলোয়ার বেরুবে। ঝাড়ের আলোয় বিজলী খেলতে থাকবে। একজন বলবে : 'আয় দেখি, কত শক্তি ধরিস বাহুতে'—আর একজন বলবে : 'ওরে রে পামর, মোর হাতে হবে তোর নিশ্চয় মরণ—।' তলোয়ার খেলতে খেলতে দুজনে বেরিয়ে যাবে আসর থেকে, বাজনা আরো ঘোরতর হবে, আবার ফিরে আসবে যোদ্ধারা—

দুর্জয় সিংহ গর্জন করে বেরিয়ে গেল, দু কান খাড়া করে আমি উঠে বসলুম। আর সেই সময় আমার পাশ থেকে হাই তুলে সুমন্তদা বললে, দূর, কোনো মানেই হয় না এর। শুয়ে পড়ি গে যাই।'

আমি শুনে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলুম না।

যাত্রার আসর ছেড়ে এমন সময় উঠে যেতে পারে কেউ, এই ঘোরতর মুহূর্তে? যখন আমাদের রক্ত প্রায় টগবগ করে ফোটবার উপক্রম, তখন কারো ঘুম আসতে পারে? আসা সম্ভব? যখন যুদ্ধের বাজনা প্রায় বাজে-বাজে, তখন বলতে পারে কেউ : 'দূর, কোনো মানেই হয় না—শুয়ে পড়ি গে?'

আমি চমকে বললুম, 'সে কি, এখনি যুদ্ধ শুরু হবে যে!'

'হুঁ, টিনের তলোয়ারের যুদ্ধ! তোরাই ওসব দ্যাখ্ বসে বসে, আমার ভালো লাগবে না।'

আমার স্তম্ভিত অবস্থা যখন কাটল, তখন সুমন্তদা মা-র কাছ থেকে চাবিটা চেয়ে নিয়ে বাসায় চলে গেছে। এদিকে সামনের আসরে 'রে-রে-রে পামর', ভয়ঙ্কর বাজনা আর ঘন ঘন তলোয়ারের ঝিলিক। সেই মুহূর্তে তখন সুমন্তদার রহস্য ভাববার আর সময় নেই।

সেটা বোঝা গেল পরদিন।

বেলা সাড়ে এগারোটায়, সারারাত জেগে থাকার ঘুমটা পুষিয়ে নিয়ে, চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে দেখি, উঠোনে সুমন্তদা বসে বসে ছোট ছোট কাঠের টুকরো দিয়ে কী একটা তৈরি করছে।

'কী ওটা সুমন্তদা?'

'খরগোসের খাঁচা।'

'খরগোস? কোথায় খরগোস?'—অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে তাকালুম চার-দিকে।

'আসবে, আসবে ব্যস্ত কেন? সাঁওতালেরা ধরে, ওদের বলে রেখেছি, কাল দিয়ে যাবে দুটো। সেইজন্যে করে রাখছি খাঁচাটা।'—হাতুড়ি, বাটালি, পেরেক—সব গুছিয়ে নিয়ে সুমন্তদা বললে, 'এখন এই পর্যন্ত থাক, বিকেলে শেষ করা যাবে বাকীটা। একটুখানি তারের জাল কিনে আনতে হবে পূর্ব কুণ্ডুর দোকান থেকে।'

তখন আমার রাত্রির কথাটা মনে পড়ে গেল।

'সুমন্তদা, কী ভীষণ যুদ্ধ হল, আপনি দেখলেন না। শেষ পর্যন্ত সেই পাজী সেনাপতিটা—'

'দূর—ও আবার যাত্রা নাকি! খালি ছেলেভুলোনো ব্যাপার।'

'ছেলেভুলোনো! কেন?'—আমার বিস্ময় অপার : 'সবাই তো বলছিল খুব ভালো যাত্রা। আজকে আছে "সুরথ উদ্ধার"—সে নাকি আরো ভালো।'

'সব বাজে—সব বাজে। আসল যাত্রা হল মুকুন্দ দাসের।'

'মুকুন্দ দাস!'

'নাম শুনিস নি তো? কী করে শুনবি? জিজ্ঞেস করিস কাকামণিকে (মানে, আমার বাবাকে)। সেই হল আসল যাত্রা। রক্ত-গরম হয়ে যায়, প্রাণ ধড় ফড় করে—মনে হয়, এখুনি একটা কিছু করে ফেলি।'

'কী করে ফেলবেন সুমন্তদা?'

'প্রাণ-বিসর্জন। আত্মদান।'

আমি হাঁ করে রইলুম।

কথা বলতে বলতে আমরা বেরিয়ে এসেছিলুম বাইরে। একটু দূরে আত্রাই দেখা যায়। আশ্বিনের ভরা নদীর জল এখন ঘন নীল। গ্রামের গঞ্জে মহাজনী নৌকোর ভীড়। দুপুরের রোদে মাথার ওপর শঙ্খচিলের পাখা।

সেই নদী, আকাশ আর রোদের দিকে তাকিয়ে সুমন্তদার চোখে ঘোর লাগল।

'মুকুন্দ দাসের যাত্রা আলাদা। এ-সব তলোয়ারবাজী আর মোজাপরা সখীদের নাচ নেই সেখানে। তাতে স্বদেশের কথা। পরাধীন ভারতবর্ষের কথা। আর সেই সব গান!'—হঠাৎ গলা খুলে গেল সুমন্তদার :

'জাগো জাগো জননী,
তুই না জাগিলে শ্যামা কেহ
জাগিবে না
তুই না জাগিলে শ্যামা
পোহাবে না রজনী—'

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলুম। এর আগে গুন গুন করে সুমন্তদাকে গান গাইতে শুনেছি বটে, কিন্তু তিনি যে এমন দরাজ গলায় গাইতে পারেন, সে আমি জানতুম না।

'ডেকে ডেকে হলেম সারা
কেউ সাড়া দিলে না মা,
বুঝে দেখলেম সবারি মন,
কেউ ফিরে তো চাইলে না।
তুই না নাচিলে শ্যামা
নাচিবে না ধমনী,
তুই না জাগিলে শ্যামা,
পোহাবে না রজনী—'

আমি স্তব্ধ। অদ্ভুত লাগছিল সুরটা। যেন থরথরিয়ে কাঁপিয়ে দেয় বুকটা।

গান শেষ করে সুমন্তদা বললে, 'মন্টু!'

'আ্যাঁ?'

'মানুষ হয়ে বেঁচে কী লাভ, যদি দেশের কাজ করা না যায়?'

এতক্ষণে ব্যাপারটা একটু স্পষ্ট চেহারা নিল আমার সামনে। খদ্দরের টুপি পরা কজন কংগ্রেসের ভলান্টীয়ারকে আমি দেখেছি—আমাদের এখানেই দেখেছি। তারা চার-পাঁচজন একদিন 'বন্দে মাতরম্—বন্দে মাতরম্' বলতে বলতে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়েই কোথায় চলে যাচ্ছিল।'

'তুমি কংগ্রেসের ভলান্টীয়ার হবে—না?'

'দূর, ভলান্টীয়ার হয়ে কী হবে? ও-সব নয়। চাই স্বামীজীর আদর্শ। বীর হতে হবে। শক্তি চাই। সেবক হতে হবে—দীক্ষা নিতে হবে মায়ের মন্ত্রে।

সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে
বাঁধে বাহুপাশে,
কালনৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপ
তারি কাছে আসে।

বুঝেছিস?'

কিছু যে স্পষ্ট করে বোঝা গেল তা নয়, কিন্তু আমি রোমাঞ্চিত হলুম। মনে হল, সুমন্তদা কেবল আমাদের বরিশাল জেলার লোক নন, শুধু যে ম্যাট্রিক পরীক্ষা না দিয়ে—বাড়ির অবস্থা খারাপ বলে ঘুরতে ঘুরতে আমাদের এখানে চলে এসেছেন তা নয়, আমাদের পড়াতে বসান—নিপুণ হাতে নানা রকম কাজকর্ম করতে পারেন—আমাদের বাসায় তাঁর এই সব গুণের জন্য মা-র একান্ত প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছেন, শুধু তা-ও নয়, সুমন্ত-

'ডেকে ডেকে হলেম সারা, কেউ সাড়া দিলে না মা,

না অনেক দূরের, অনেক বড়ো, ইতিহাসের রাণা প্রতাপের গল্পে যেমন পড়েছি, তেমনি করে দেশের জন্যে একদিন প্রাণ দেবেন তিনি।

একটু চুপ করে থেকে সুমন্তদা বললে, 'স্বামী বিবেকানন্দের কথা জানিস?'

বললুম, 'আমাদের বাসায় তো বাঁধানো ছবি আছে তাঁর।'

'আহা, ছবি তো থাকবেই। সেটা বড়ো কথা নয়। কিছু জানিস তাঁর সম্পর্কে?'

ভেবে ভেবে মনে করতে হল। বাবার মুখ থেকে যেন ক'টা কথা শুনেছিলুম একবার।

'স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় গিয়েছিলেন। সেখানে মস্ত একটা সভায় যোগ দিয়েছিলেন তিনি। বক্তৃতা করে বলেছিলেন—মাই ব্রাদার্স অ্যান্ড্ সিস্টার্স, আর—আর সবাই খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল।'

একটা চাপা হাসি ফুটল সুমন্তদার মুখে।

'অনেক জানিস দেখছি তা হলে। তারপর?'

মুশকিলে পড়া গেল। এর বেশি কিছু মনে এল না আর।

বললুম, 'খুব বড়ো সাধু হয়েছিলেন।'

'ব্যাস?'

আমি চুপ করে রইলুম।

'বোস এখানে।'

সবুজ নিবিড় পাতায় ছাওয়া প্রকাণ্ড নিমগাছ একটা। আত্রাইয়ের হাওয়ায় ঝির ঝির করে তার পাতা কাঁপছিল। আমি আর সুমন্তদা বসলুম তার তলায়।

সুমন্তদা একটু একটু করে বলে যেতে লাগল স্বামীজীর কথা। 'ভুলিয়ো না, মায়ের জন্য তুমি বলি প্রদত্ত।' 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' 'বলো, দরিদ্র ভারতবাসী আমার ভাই।' 'ছিন্নকণ্ঠ ছাগের রুধির, দেখে তোর হিয়া কাঁপে? কাপুরুষ—ভয়ের আধার—'

এই কথাগুলো সেদিন স্পষ্ট করে মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল তা নয়। পরে বড়ো হয়ে যখন বিবেকানন্দের লেখা পড়েছি, ভেবেছি সুমন্তদা-র কথা—সেদিন সব অস্পষ্ট রেখাগুলো একটু একটু করে ভরে উঠেছে। পড়েছি ইংরিজিতে 'কালী দ্য মাদার'—সত্যেন দত্তের বাংলা অনুবাদ, সুমন্তদার ছাড়া ছাড়া কথাগুলোর স্মৃতি নিয়েছে সম্পূর্ণ রূপ একটা। বুঝেছি, আত্রাইয়ের ধারে, শরতের রোদে সেদিন অমন করে কেন জ্বলে উঠেছিল সুমন্তদার চোখ, কেন আমার মনে হয়েছিল—সুমন্তদা অনেক বড়ো, আমাদের ছাড়িয়ে অত বড়ো হয়ে গেছেন তিনি।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে বসেছিলুম আমরা। তারপর সুমন্তদা আস্তে আস্তে বলেছিল, 'মন্টু!'

'আঁ!'

'তোকে একটা কথা বলব আজ। কাউকে বলবি না?'

দুজনের বয়সে অনেক তফাৎ। তবু সুমন্তদার মনের কথা বলবার জন্যে কাছে আমিই ছিলুম।

জবাব দিলুম, 'না—বলব না।'

'জানিস, তোদের এখানে কেন এসেছি আমি?'

'না।'

'ম্যাট্রিক তো দেওয়া হল না, আমি ভেবেছিলুম, সন্ন্যাসী হয়ে যাব।'

'সন্ন্যাসী!'—শুনে আমি হাঁ করলুম একটা।

'হুঁ, সন্ন্যাসী। কিন্তু ওই গাঁজাখোর ভিক্ষুক সন্ন্যাসী নয়, কিংবা হিমালয়ে গিয়ে তপস্যা করা সাধু—তা-ও নয়।

স্বামীজীকে কী বলেছিলেন পরমহংস দেব? শুধু স্বার্থপরের মতো নিজের মুক্তির কথাই ভাববি? দেশজোড়া এই দরিদ্র-নারায়ণের দিকে চেয়ে দেখবি নে? স্বামীজী তাই মানব সেবাকেই করে নিলেন জীবনের ব্রত। আমিও তাই বেরিয়ে পড়েছিলুম রামকৃষ্ণ আশ্রমে সাধু হবো বলে।'—একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল সুমন্তদার: 'হল না।'

'কেন?'

'বরিশাল থেকে স্টিমারে উঠেছি—খুলনা যাব। সেখান থেকে কলকাতায়—বেলুড় মঠে। স্টিমারে ঘুমিয়ে পড়েছি। তারপর কী হল জানিস?'—বলতে বলতে রোমাঞ্চিত হল সুমন্তদা: 'অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলুম একটা।'

'কী স্বপ্ন?'

কে যেন সামনে এসে দাঁড়ালেন। মানুষটাকে চেনাই যায় না এত তেজ তাঁর শরীরে। এই যে সূর্যটার দিকে তাকানো যাচ্ছে না এখন, ঝলসে যাচ্ছে চোখ, ঠিক সেই রকম। আমি চাইতে পারলুম না। সেই মানুষটি আমায় বললেন, তোর এখনো সময় হয় নি, আরো তৈরি হতে হবে। তা ছাড়া তোর মা যতদিন বেঁচে রয়েছেন, ততদিন পর্যন্ত সংসার ছেড়ে চলে গেলে অনিষ্ট হবে তোর। সাধু হওয়ার জন্যে ভাবনা নেই—যখন সময় আসবে, ডাক শুনতে পাবি নিজের বুকের ভেতরে। বলেই একরাশ আলোর মধ্যে মিলিয়ে গেলেন তিনি। আর ঘামে নেয়ে জেগে উঠলুম আমি।'

আমি শিউরে উঠে বললুম, 'সত্যি?'

'সত্যি না তো কী!'

ফস করে বলে ফেললুম, 'ভগবান এসেছিলেন—না সুমন্তদা?'

'দূর বোকা! ভগবান কি অত সহজে আসেন? কত জন্ম-জন্মান্তর সাধনা করলে তবে ভক্তেরা দর্শন পান তাঁর। এসেছিলেন কোনো মহাপুরুষ, তিনিই আমায় উপদেশ দিয়ে গেলেন।'

'তা হলে সন্ন্যাসী হওয়ার জন্যে আপনার ডাক আসবে সুমন্তদা?'

'আসবে বই কি।'

'তখন চলে যাবেন আপনি?'

'আমাকে যেতেই হবে।'

আবার আমরা দুজনে চুপচাপ। নিমগাছের পাতা ঝির ঝির করছে হাওয়ায়। ঝিক ঝিক করে জ্বলছে আত্রাইয়ের নীল জল। ওপারের ঘাট থেকে একটা বোঝাই খেয়া নৌকো আসছে গঞ্জের ঘাটে।

সুমন্তদা বললে, 'মধ্যে মধ্যে মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। বাল যাত্রা দেখতে গিয়ে ভাবছিলুম মুকুন্দ দাসের কথা। চোখের সামনে দেখা দিলেন স্বামীজী। যাত্রা থেকে ফিরে এসে ভারী কষ্ট হচ্ছিল। কবে যে সময় আসবে, কখন ডাক পড়বে, তাই ভাবছি কাল থেকে।'

'তখন চলে যাবে চিরদিনের মতো?' সুমন্তদা হাসল।

'ভুলে যাবেন আমাদের?'

এবারও হাসল সুমন্তদা, জবাব দিল না। তারপর বললে, 'অনেক বেলা হয়ে গেল, চল্—চান-টান করতে যাই। খুড়িমা রাগ করবেন এবার। কিন্তু যে-কথাগুলো তোকে বললুম, কাউকে বলবি নে সেগুলো।'

বললুম, 'না—না, কক্ষণো না।'

পিসিমার ঘরে যে রেডিয়োটা একটানা বেজে চলেছিল, হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল সেটা। ঘুমের আমেজে ব্যাঘাত হচ্ছিল বলে পিসিমাই বোধ হয় বন্ধ করে দিলেন। আমার সামনে সমুদ্র—তাল-নারকেলের সার। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার মতো অবিশ্রান্ত ঢেউয়ের শব্দ। সামনের নির্জন পথটায় ধীরে ধীরে নিঃসঙ্গ একা চলেছে একটা পাকা কলার বোঝাই। হাওয়ায় নোনা গন্ধ। এখান থেকে কত দূরে আত্রাই—কত দূরে আমার ছেলেবেলা!

জীবন এগিয়ে চলে মোহানার দিকে। সব নদী সমুদ্রে যায়—সামনের এই নীল-নীল-নীল সমুদ্রেও আত্রাইয়ের মেদিনের জল মিশে আছে কোথাও। বাজারে একটা ছোট ঘড়ির দোকান। প্রোপ্রাইটর এস কে ঘোষম্। মোহানার স্রোতে আমার আগে আগে ভেসে যেতে দেখছি সুমন্তদাকে। তারপর একদিন দুজনেই এসে মিশে যাব সমুদ্রে। যে সমুদ্রে সব নদী এসে মেশে, অথচ যে-সমুদ্রে কোনো নদীর জলকে আলাদা করে চিনে নেওয়া যায় না আর।

কিন্তু কোথায় বিবেকানন্দ? কোথায় মুকুন্দ দাস? এই ঘড়ির দোকানেই কি শেষ পর্যন্ত এসে মিলিয়ে গেল সন্ন্যাস? মুখস্থ পড়ছে: 'Say, Om Tat Sat om?' দেওয়ালের সারাই করা কুকগুলোতে থেকে থেকে যখন বেসুরো সময়ের ঘণ্টা বাজে, তখন তাদের মধ্যে কি আজও শোনা যায়:

'দয়াময়ী নাম ধরিস মা,
দয়া কি মা আছে তোর—
দয়া থাকলে মরে কেন
তেত্রিশ কোটি সন্তান তোর?
তুই না নাচিলে শ্যামা—'

সমুদ্রের একটানা দীর্ঘশ্বাস। ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ।

সব দিনগুলো পর পর দেখা দেয় না। সামুদ্রিক পাখিদের মতো ঝাঁক বেঁধে ওড়ে কখনো, কখনো নীল আকাশটা একেবারে ফাঁকা। তখন কিছুই নেই।

টুপ টুপ করে কয়েকটা পাখি নেমে পড়ল সমুদ্রে, দুলতে লাগল ঢেউয়ের মাথায়। কী বলে ওদের? পুফিন?

আমাদের বাসা থেকে খানিক দূরে ছোট্ট ঘাসের মাঠ একটা। তার দু ধারে বকুল গাছের সারি। এখন বকুলের সময়, অজস্র ঝরে আছে—গন্ধে ম-ম করছে হাওয়া। সেও ছুটির দিন। আমি ফুল কুড়িয়ে দিচ্ছিলুম দীপুর সাজিতে। ও মালা গাঁথবে।

এমন সময় দেখি, পাশের রাস্তা দিয়ে কোথায় যায় সুমন্তদা।

'সুমন্তদা, কোথায় চললেন?'

'একটু ঘুরতে যাচ্ছি ওদিকে।'

আমি যাব—সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহিত বোধ করলুম আমি।

কারণ ছিল একটু। ওই রাস্তাটা আমার কাছে চিরদিনের বিস্ময়। এদিকে বন্দরের গঞ্জ—ওধারে থানা, স্কুল, ডাক-বাংলো। আমার পরিচয়ের চৌহদ্দি এই-টুকুই। কিন্তু এই যে রাস্তাটা—ডাক-বাংলোর পাশ দিয়ে চলে গেছে—শুনেছি বালুরঘাটের রাস্তা—ও আমার অচেনা স্বপ্নের পথ। দেখি গোরুর গাড়িরা ধুলো উড়িয়ে কোথা থেকে কোথায় মিলিয়ে যায়—গঞ্জ ফেরৎ সাঁওতালদের মাদলের শব্দ মিলিয়ে যেতে থাকে ওই দিকেই, রাত্রে বিছানায় বসে জানলা দিয়ে কতদিন দেখি কতদূরে এক-আধটা টিমটিমে লণ্ঠনের আলো চলতে চলতে এক হয়ে যাচ্ছে এক আকাশ তারার ভেতরে। ওই পথটা রূপকথার দেশে যায়—গোরুর গাড়ির রাঙা ধুলো, মাদলের শব্দ, রাত্রের সেই লণ্ঠনের আলোগুলো আমাকে হাতছানি দিতে থাকে।

বললুম, 'আমাকে নিয়ে চলুন না সুমন্তদা।'

সুমন্তদা বললেন, 'বাড়ি থেকে জিজ্ঞেস করে আয় তা হলে।'

'আপনার সঙ্গে যাচ্ছি, মা কিছু বলবে না।'

বাবার জন্যে ভাবনা ছিল না। বাবা সকালে উঠেই, শাদা বড় আরবী ঘোড়াটায় চেপে কোথায় চলে গেছেন জরুরী কাজে। ফিরতে রাত হবে তাঁর।

বললুম, 'দীপু, মা-কে বলে দিস আমি সুমন্তদার সঙ্গে যাচ্ছি।'

'যা রে, ফুল কুড়িয়ে দিলি না আমাকে।'

'যা-যা—পুতুলের মালার জন্যে এর বেশি ফুল লাগে না—' বলে আমি সঙ্গ নিলুম সুমন্তদার।

সুমন্তদা বললে, 'অনেক দূরে যেতে হবে কিন্তু। হাঁটতে পারবি?'

'পারব, খুব পারব।'

'ঠিক আছে। কিন্তু যদি দেখি, একটুখানি হেঁটেই বলছিস পা ব্যথা

টিনোপাল
সবচেয়ে সাদা
ধবধবে করে

জামা কাপড় কাচতে শেষবারের মতো ধোবার সময় সামান্য একটু টিনোপাল দিয়ে দিন। দেখবেন, আপনার সাদা কাপড়গুলি, সার্ট, শাড়ি, চাদর, তোয়ালে সবই কেমন উজ্জ্বল ধবধবে সাদা হয়ে উঠবে।

আর এইরকম সাদা ধবধবে করতে কতই বা খরচ! এমনকি, প্রতি কাপড়ে এক পয়সাও পড়ে না। টিনোপাল বৈজ্ঞানিক উপকরণে তৈরী। এতে কাপড় চোপড়ের কোনও ক্ষতি হয় না।

এক বালতিতে এক প্যাকেট

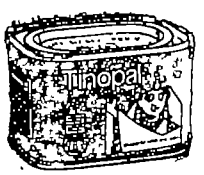

নতুন ইকনমি প্যাক

এক্স পাওয়া যায়

© টিনোপাল রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্কের অধিকারী কে. আর. পাবলিশ এস. এ. বাসল, সুইজারল্যাণ্ড। মুদ্রক গায়ত্রী লিমিটেড,

৪৬/P1&G 1A/69 Bengali

করছে, আর চলতে পারছি না, তা হলে কিন্তু ঠাস ঠাস করে চড় বসিয়ে দেব গোটাকয়েক।'

সম্পূর্ণ বাজে কথা। মধ্যে মধ্যে পড়ানোর সময় সুমন্তদার হাত কানের দিকে এগিয়ে এলে, কিংবা অঙ্ক কষবার খাতায় নারকেল গাছ আঁকবার পরে একটা চড় উঠে এলেও—সে হাত কখনো কানে এসে পৌঁছোয় নি, সে চড় গালে নামেও নি কোনোদিন। তাই নির্ভয়ে মাথা নেড়ে আমি বললুম, 'আচ্ছা—আচ্ছা।'

বেলা গোটানয়েক বোধ হয়। রোদে ধার ছিল না, আকাশে মেঘের আসা-যাওয়া। আমরা ডাক-বাংলো, তার সামনে ফুলে ভরা করবী ফুলের গাছগুলো পার হয়ে গেলুম। তারপরেই শুরু হল সেই পথটা, যে-পথে আমি কোনোদিন যাই নি, যে পথ আমার স্বপ্নের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়।

'আমরা কোথায় যাচ্ছি সুমন্তদা?'

'পাঠক-দেউলের বনে।'

পাঠক-দেউলের বন! চমক লাগল। এই দেউল, তাকে ঘিরে একটা জঙ্গল আছে সে কথা আমি জানি। সেই দেউলে অনেক কাল আগেকার ভাঙা একটা কালীমূর্তি আছে, তাও শুনেছি। কিন্তু কেউ তো সেখানে যায় না।

বললুম, 'সেখানে কেন সুমন্তদা?'

'ভয় করছে?'

'না—না, ভয় পাব কেন? কিন্তু সেখানে কী আছে সুমন্তদা?'

'শতমূলী। তাই আনতে যাব।'

'শতমুখী? সে আবার কী?'

'এক রকম ছোট ছোট গাছ। ওষুধে লাগে।'

'আপনি ওষুধ তৈরি করবেন নাকি?'

'দূর, আমি ও-সবের কী জানি? আনতে যাচ্ছি কবিরাজ মশাইয়ের জন্যে।'

ঠিক কথা! সুমন্তদা এখন গঞ্জের সকলের আপনজন, সকলের সঙ্গে তার খাতির। তাকে বসে থাকতে দেখা যায় জেলা বোর্ডের ডাক্তারখানায়, ডাক্তার অমূল্য দাসের সঙ্গে ভারী ভাব জমে উঠেছে তার। গঞ্জের সব চাইতে শৌখিন লোক শশীবাবু—যাঁর মতো টেরি এখানে কারুর নেই আর যিনি সোনার ফ্রেমের চশমা পরেন—তাঁর গুড়ের আড়তেও দেখা যায় সুমন্তদাকে। সুতরাং বুড়ো কবিরাজ মশাইয়ের জন্যে সে শতমূলী আনতে পাঠক-দেউলের জঙ্গলে রওনা হবে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

সুমন্তদা বললে, 'জানিস তো কবিরাজ মশাইয়ের দশা। বুড়ো হয়ে গেছেন, ভালো করে চলতে-ফিরতে পারেন না। যে ছেলেটা ওঁর কাজ-কর্ম করে, সেও গাছ-গাছালি চেনে না। বললেন, ওষুধ তৈরি করতে হবে, কাকে দিয়ে যে আনাই! আমি বললুম, আমি চিনি—এনে দেব। কবিরাজ মশাই বলে দিলেন, পাঠক-দেউলের জঙ্গলে পাওয়া যাবে।'

'আপনি চেনেন শতমূলী?'

'শতমূলী, অনন্তমূলী—সব চিনি।'

'কী করে চিনলেন?'

'আমাদের গ্রাম—জানিস না?'—বলতে বলতে চোখ গর্বে ভরে উঠল সুমন্তদার: 'কবিরাজী নিদান যিনি লিখে গেছেন—সেই মাধব করের গ্রাম। কত পণ্ডিত, কত কবিরাজের জায়গা। কী করেই বা জানবি? দেশে তো কখনো যাস নি।'

'না।'

'গেলে বুঝতে পারতিস। ওই যে গান আছে না? "ধনধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা"—ওই গানটা যে কত সত্যি দেশে গেলে তা দেখতে পেতিস।'

ওই একটা কথা সুমন্তদা কখনো ভুলতে পারে না। 'বরিশাল! তার মতো কি আর দেশ আছে রে? "নাম বরিশাল—পুণ্যে বিশাল"—বুঝলি? অশ্বিনী-কুমারের দেশ। বরিশালের মাটিতেই তো মুকুন্দদাসের গান। কালীশ পণ্ডিত মশাইয়ের কথা শুনেছিস কখনো? শুনেছিস জগদীশ মুখুজ্জের নাম? আর কী নদী, কত জল, কত নারকেল-সুপুরী—আর ধান! বরিশালের আর একটা নাম কী। জানিস? গ্র্যানারী অব্ বেঙ্গল। মানে জানিস? বাংলা দেশের শস্যভাণ্ডার।'

কিন্তু এ-সব কথায় বরিশাল সম্পর্কে আমার রোমাঞ্চ জাগে না। সে দেশ আমি দেখি নি, কখনো দেখব কি না তা-ও জানি না। আমার কাছে আত্রাই, বাড়ির সামনের কদম গাছ, মাঠের পাশে বকুলের সার, বাড়ির বাগানের ফুলেরা—যেখান থেকে কাঁটালী চাঁপার গন্ধ, আমের বাগান, আকের ক্ষেত, বারোয়ারী চণ্ডীমণ্ডপের পাশে বোধনের বেলগাছ, ওই প্রকাণ্ড বটের গাছটা—অসংখ্য ঝুরি নেমেছে যা থেকে—দিনের বেলাতেই যেখানে কালো কালো ছায়া আর মধ্যে মধ্যে পড়ে পৌরের শীর্ণি—এই সবের মধ্যেই ডুবে থাকে আমার মন। আর ওই পথটা—যে পথে আমি কোনোদিন যাই নি—সেই বালুর-ঘাটের রাস্তাটাই আমার শেষ স্বপ্ন।

আজ সেই অচেনা পথটা ধরেই চলেছি সুমন্তদার সঙ্গে। আমার চোখ ঘুরছিল দু'পাশে। একটা গোরুর পিঠে চেপে কিঙে লাফাচ্ছে, তাই দেখলুম; দুটো ডাহুক টিপ টিপ করে দৌড়ে গেল জলার দিকে, তা চোখে পড়ল; এক জায়গায় ছোট্ট একটা গাছের নিচে লালে লাল হয়ে গেছে—সেই পোকাগুলো—এক সঙ্গে চাপ বেঁধে থাকে—দূর থেকে জমাট রক্তের মতো দেখায়।

আমি সজাগ হলুম সুমন্তদার গানে।

"এমন শুভ্র নদী কাহার—
কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়,
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র—"

গানের মধ্যে বাধা দিয়ে বললুম, 'বরিশালে অনেক পাহাড় আছে, না সুমন্তদা?'

'দূর বোকা কোথাকার!'

'তবে যে আপনি বললেন, এটা বরিশালের গান?'

'মোটেই না। স্বদেশের গান। না—এসব বোঝানো যাবে না তোকে। এখন বিরক্ত করিস নি, গাইতে দে গানটা।'

সুমন্তদা আবার ধরল: 'কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশতলে মেশে—'

গোরুর গাড়ি করে লাল শাড়িপরা কাদের বউ যাচ্ছিল, একবার ঘোমটা সরিয়ে দেখে নিল সুমন্তদাকে, আমি তার নাকে রুপোর নথ দেখতে পেলুম একটা। একজন পাগড়ী মাথায় খালি গা মানুষ রোদ্দুরে কালো চিকচিকে পিঠটা মেলে দিয়ে—ঘোড়ার জন্যে জোলো ঘাস কেটে কেটে আঁটি বাঁধছিল—সে অবাক হয়ে আমাদের দিকে চেয়ে রইল—আমি তাকে চিনতে পারলুম, সে বাণেশ্বর, আমাদের ঘোড়াকে ঘাস দিয়ে আসে। আমার ইচ্ছে ছিল তাকে একবার নাম ধরে ডেকে উঠি, কিন্তু সুমন্তদার গান নষ্ট হবে বলে ডাকা গেল না।

আমি পথের পাশ থেকে গোটাকয়েক ভেরেণ্ডার ফল ছিঁড়ে নিয়ে, তার কষটে গন্ধে খুশি হয়ে, খোলা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে 'সায়েবের বাচ্চা'—অর্থাৎ শাদা শাদা পোকার মতো বিচিগুলো বের করতে লাগলুম।

'আমার এই দেশেতেই জন্ম, যেন এই দেশেতেই মরি—' গান শেষ করে সুমন্তদা বললে, 'মন্টু!'

'উঁ?'

'দেশকে কখনো ভুলিস নি।'

'সায়েবের বাচ্চাগুলোকে পর্যবেক্ষণ করতে করতে আমি সরল বিশ্বাসে বললুম, 'না—ভুলব না।'

'সর্বদা মনে রাখবি, বিবেকানন্দ বলেছেন—'

অশোক সেনের
চালি চ্যাপলিন
মূল্য ৭·৫০
বিশ্বের শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিকের
চলচ্চিত্র-জীবনী ও তাঁহার
সংগ্রাম-বহুল সুনিপুণ জীবন-বেদ।
॥ অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য ছবি ॥
শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

আমরা পৌঁছলুম পাঠক দেউলের জঙ্গলে

আর বিবেকানন্দ। আমি তখন দাঁড়িয়ে গেছি পথের ধারে জলের দিকে তাকিয়ে।

'কী হল? থামলি যে?'

আমি বললুম, 'সুমন্তদা—জলের ভেতরে চ্যাং মাছ।'

সুমন্তদা হেসে ফেলল।

'তোকে কিছু বলাই বিড়ম্বনা। বলছি স্বামীজীর কথা, তোর নজর গেল চ্যাং মাছের দিকে!'

মাথা চুলকে বললুম, 'কী করব, লাফিয়ে উঠল যে!'

'তাই তো—চ্যাং মাছ লাফিয়ে উঠলে আর কী করবি! তখন কি আর দেশের কথা মনে থাকে কারুর।'

আমার দোষ ছিল না। কালো জলের ভেতরে ছোট ছোট বেগুনে ফুল ফুটেছে। আর তাদের তলায় সাঁতরে বেড়াচ্ছে এক ঝাঁক চ্যাং—অর্থাৎ ন্যাটা মাছের ছানা।

'সুমন্তদা, কয়েকটা মাছ ধরলে হয় না?'

'হুঁ, বাড়িতে তো মাছ জোটে না তোমার। এখন জলে নেমে, পাঁক ঘেঁটে—গোটা চারেক চ্যাংয়ের বাচ্চা ধরে নিয়ে যাই. আর খুড়িমা তোকে আমাকে দুজনকেই তেড়ে আসুন। চল্-চল্—অনেকটা যেতে হবে এখনো।'

সুমন্তদা কবিরাজমশাইয়ের জন্যে শতমূলী আনতে যাচ্ছেন. চলতে চলতে ভাবছেন পুণ্যে বিশাল বরিশালের কথা—দেশের কথা—স্বামীজীর কথা। কিন্তু আমার তো তা নয়। আজ এক অচেনা পথে, অচেনা আকাশে আমার ছুটি। চেনা বকগুলোকে নতুন ঠেকছে. আড়াইয়ের ধারে যে মাছরাঙাদের দেখি এরা যেন তারা নয়. মস্ত পাকুড়গাছটার নীচে বসে যে তিনজন লোক হুঁকো টানছিল, তারা যেন আর এক জগতের মানুষ।

'সুমন্তদা, আমার ভীষণ ভালো লাগছে।'

'হঠাৎ?'

'বা-রে, কত দূরে হেঁটে এলুম।'

'কত দূরই বটে। পুরো এক মাইলও হয় নি'—সুমন্তদা হাসল।

কিন্তু আমার কাছে এই এক মাইলই কি কম? দূর-দূরান্ত। বললুম, 'সুমন্তদা, বালুরঘাট কত দূরে?'

'এইভাবে হেঁটে হেঁটে সেখানে যাওয়ারও ইচ্ছে আছে নাকি? সেও কাছেই, মাইল চল্লিশেক হবে বোধ হয়।'

তা হোক, বালুরঘাটে না গেলেও আমার চলবে। আমি যাই দেখি, তাতেই আমার চোখ ভরে যায়। এমন করে—এত দূরে হাঁটতে হাঁটতে আমি কখনো আসি নি।

'পা ব্যথা করছে নাকি রে?'

'না—না।'

একটা গ্রাম দেখা দিল। চোখে ঠুলি পরে ঘানি গাছে পাক খাচ্ছে কলুর বলদ। হাওয়ায় তেল আর খোলের গন্ধ। কিন্তু আমার চোখ পড়ল সামনের আর একটি দোকানে। সেখানে গরম গরম বোঁদে ভেজে—মস্ত কালো কড়াই ভর্তি রসের ভেতরে ছাঁক ছাঁক করে ঢেলে দিচ্ছিল। আবার দাঁড়িয়ে পড়লুম আমি।

'কি রে, দাঁড়ালি কেন? চলতে পারছিস না আর? তখনই তো বারণ করেছিলুম।'

'না, হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে না। আমি বলছিলুম, গরম বোঁদে ভাজছে।'

সুমন্তদা হাসল : 'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু তাতে তোর কী? চল্।'

আমি তেমনি দাঁড়িয়েই রইলুম। উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট।

'খেতে হবে গরম বোঁদে? কিন্তু রাস্তায় এ-সব যা খুশি খেয়ে অসুখ করলে কে কৈফিয়ৎ দেবে খুড়িমাকে?'

'না, অসুখ করবে না।'

গরম বোঁদে কিনতে হল সুমন্তদাকে। আমি যে একাই খেলুম, তাও নয়।

বোঁদে খাওয়ার লোভটাই বড়ো কথা নয়, এ-রকম লোভ আমার ছিলও না। আসলে দিনটাই আজ আলাদা। যে পথটা চিরদিন আমার স্বপ্নে মিশে কোন্ অজানা অদেখা বালুরঘাটের দিকে হারিয়ে গেছে, যে পথটার রাঙা ধুলো, গোরুর গাড়ি, লণ্ঠনের আলো, তালের সার, সাঁওতালের মাদল আমার রূপকথা—সেই পথে চলবার খুশিতে আমি তার সব কিছু দু' হাত ভরে কেড়ে নিতে চাইছিলুম। রাস্তার ধারে জলার ভেতরে চ্যাং মাছের ছানা-পোনাগুলো একেবারে নতুন ঠেকছিল, এ-রকম বোঁদের গন্ধ আমি বুঝি আর কোনোদিন পাই নি। যে টাটকা পদ্ম-পাতাতে আমাদের বোঁদে খেতে দিল, সেই পাতার গন্ধটাও বোঁদের সঙ্গে মিশে আর একটা নতুন স্বাদ নিয়ে এল মুখে।

'খাওয়া তো হল, চল্ এবারে।'

আরো আধ মাইল গোরুর গাড়ির রাস্তায় হেঁটে, একটা মাঠের আল দিয়ে যেতে যেতে কাঁটকারীর খোঁচা খেয়ে আর সুমন্তদার কাপড়ে বিস্তর চোরকাঁটা বিঁধলে, আমরা পৌঁছলুম পাঠক দেউলের জঙ্গলে।

জঙ্গল এখন আর এমন কিছু নয়। অনেকগুলো ঝুপ্সী গাছপালা জড়াজড়ি করে আছে, ঘন ছায়ায় ঢেকে আছে চারদিক। তা ছাড়া অজস্র ঝোপ ঝাড়। নানা রকমের পাখি ডাকছিল। একটা কয়েৎবেলের গাছ থেকে এক রাশ ফল ছড়িয়ে ছিল মাটিতে।

আর একটা মন্দির।

মস্ত বড়ো অশত্থের গাছ উঠেছে পাকে পাকে তাকে জড়িয়ে। ছড়িয়ে আছে কোথাও শ্যাওলা ধরা—কোথাও ঝোপে-ঝাড়ে ঢাকা ইটের পাঁজা। পড়ে আছে ক'টা বড়ো বড়ো পাথর।

মন্দিরের দরজা বলে কিছু নেই—হাঁ-হাঁ করছে যেন খানিক কালো অন্ধকার।

সেই অন্ধকারের সামনে দাঁড়িয়ে সুমন্তদা বললে, 'আগে প্রণাম করে নে মা-কে। সাধকের কালী, বুঝলি?'

প্রথমটা আমি কিছু দেখতে পেলুম না। তারপর চোখ সয়ে এলে অন্ধকারের ভেতরে চোখ পড়ল বিরাট এক আধভাঙা কালীমূর্তি। হাতগুলো ভাঙা। কিন্তু মাথা মুখ যেটুকু দেখতে পেলুম, তাতেই অন্তরাত্মা চমকে উঠল আমার। এমন ভয়ঙ্কর কালীমূর্তি এর আগে আমি কোনোদিন দেখি নি।

মন্দিরের ভাঙা বারান্দায় মাথা ঠেকিয়ে সুমন্তদা বললে, 'প্রণাম কর্—প্রণাম কর্।'

ভয়ে ভয়ে প্রণাম করে আমি সরে দাঁড়ালুম।

সুমন্তদা বললে, 'আয় এখানে, বোস এই পাথরটার ওপর। অনেকটা হাঁটা হয়েছে, জিরিয়ে নে একটু।'

দুজনে বসলুম একটা বড়ো পাথরে। চারদিকে বড়ো বড়ো বুনো গাছের ঘন ছায়া। পায়ের তলার ভিজে ভিজে কালো মাটি, এখানে-ওখানে শ্যাওলার ছোপ। একটা অদ্ভুত স্যাঁৎসেঁতে বুনো গন্ধ। পাখিদের একটানা কিচির মিচির। গাছ-পাতার ফাঁকে ফাঁকে মন্দিরের গায়ে রোদের জাফরি-কাটা।

একটু চুপ করে থেকে সুমন্তদা বললে, 'এই মন্দির কে তৈরি করেছিল জানিস? ভবানী পাঠক।'

সে বয়েসে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী-চৌধুরাণী' আমার কাছ থেকে অনেক দূরে। আমি বললুম, 'কে ভবানী পাঠক।'

'ডাকাতের সর্দার। কিন্তু মস্ত বড়ো কালী সাধক ছিলেন। নিজের জন্যে ডাকাতি করতেন না, অত্যাচারী বড়ো লোকদের টাকা-পয়সা কেড়ে এনে গরিব-দের মধ্যে দান করে দিতেন। আর—'

'আর।'

'সব পাষণ্ড লোকদের ধরে এনে মায়ের পায়ে নরবলি দিতেন। ওই যে ওখানে একটা উঁচু মতন জায়গা দেখছিস, যেখানে বুনো ওলের জঙ্গল উঠেছে, বলি দিয়ে তাদের রক্ত ওখানে ছিটিয়ে দেওয়া হত। এখান থেকে দেখতে পাচ্ছিস না, মন্দিরের পেছনে মজা ডোবা রয়েছে একটা। আগে ওটা ছিল গভীর পুকুর। ওর পাঁকের তলায় ঘাঁটলে যে কত নরমুণ্ড আর নর-কঙ্কাল বেরিয়ে আসবে—'

বলতে বলতে কেমন ফিসফিস করছিল সুমন্তদার গলা, গাছের পাতায় পাতায় শিরশিরানি জাগছিল, আর ভয়ে ছমছম করছিল আমার শরীর। আমি মন্দিরের সেই অন্ধকার গহ্বরটার দিকে তাকালুম একবার। ভেতরে মূর্তিটা দেখা যায় না —একটা কালো ছায়ার আভাস পাওয়া যায়—তার মধ্যে মনে হল দুটো ভয়ঙ্কর চোখ যেন ধক্‌ধক্‌ করে জ্বলছে ওখানে।

'সুমন্তদা, এ-সব বোলো না।'

'কেন রে, ভয় করছে? আরে সে সব তো কতকাল আগেকার কথা। তা ছাড়া আমরা তো মায়ের সেবক, বীরব্রত আমা-দের—মা তো আমাদের রক্ষা করেন রে!' —বলেই সুমন্তদা গান ধরল:

'চণ্ড মুণ্ড খণ্ড খণ্ড
মহিষাসুর ছিন্নতুণ্ড—'

কিন্তু আমার ভরসা হচ্ছিল না। চোখের সামনে যেন নরবলির রক্ত দেখতে পাচ্ছিলুম আমি।

বললুম, 'সুমন্তদা, এ-সব তোমায় কে বললে?'

'এতো এদিককার সবাই জানে।'

'মা কালীর পুজো হয় না?'

'ভাঙা মূর্তির পুজো করতে নেই—শাস্ত্রে নিষেধ আছে।'

'কে ভাঙল মূর্তি?'

'কে জানে—কালাপাহাড়-টাহাড় হবে বোধ হয়। ভারী পাষণ্ড লোক ছিল সে।'

বড়ো হয়ে জেনেছিলুম, সুমন্তদা ভুল বলেছিল। ভবানী পাঠকের জন্মের বহু —বহু দিন আগেই কালাপাহাড়ের হাড় ধুলো হয়ে গেছে কবরের তলায়।

'নতুন মূর্তি গড়লে পুজো করা যায় অবশ্য—' নিজে-নিজেই আবার বলল সুমন্তদা।

'করে না কেন নতুন মূর্তি?—আমি জানতে চাইলুম।

'বাপ্‌রে— সে বিষম ব্যাপার—' সুমন্তদা যেন ভয় পেয়ে গেল: 'সিদ্ধ সাধকের প্রতিষ্ঠা করা মূর্তি—কার সাধ্য সে মূর্তি সরায় ওখান থেকে? একবার এক জমিদার হাতী এনে, শেকল বেঁধে মূর্তি তুলতে চেয়েছিল, মূর্তি নড়ল না। বরং রাত্রে জমিদার স্বপ্ন দেখল—মা এসে তাকে বলছেন, খবর্দার, ও-সব চেষ্টাই করিস্ নি। আমি যেমন আছি আমাকে তেমনিই থাকতে দে। আর যদি বেশি বিরক্ত করিস, তা হলে দুদিনের মধ্যে তুই তো মরবিই, তোর বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না। ব্যাস্—তারপর থেকে কেউ আর নতুন মূর্তি গড়িয়ে পুজো করার কথা ভাবেই না।'

আবার আমার গা ছমছম করে উঠল। মন্দিরের ভেতর থেকে কী যেন আওয়াজ উঠল একটা—আমি দারুণ চমকে গিয়ে জড়িয়ে ধরলুম সুমন্তদাকে।

'দূর বোকা, ভয় পাচ্ছিস কেন? অনেকগুলো চামচিকে রয়েছে ভেতরে, সেইগুলো ঝটাপটি করছে।'

'আমার ভালো লাগছে না সুমন্তদা। শতমূলী তুলবে না?'

'হাঁ, ঠিক ঠিক। তুই একটু বোস এখানে, ওদিকে আছে—আমি তুলে আনি।'

'আমি একা বসতে পারব না।'

'মন্টু—ছিঃ!'

'আমি পারব না, সুমন্তদা।'

'মায়ের সেবককে এত ভয় পেলে চলে? তাকে সাহসী হতে হয়, বীর হতে হয়।'

'পরে হবে সুমন্তদা। কিন্তু এখন এখানে কিছুতেই একা বসতে পারব না আমি।'

'না মন্টু, এ-ভাবে চলবে না।'—সুমন্তদার স্বর গম্ভীর হল: 'এই তো সময়, এখন থেকেই তো চরিত্রকে তৈরি করতে হয়। তোর বয়েসে আমি একলা শ্মশানে যেতুম।'

'আমিও যাব।'—আকুল হয়ে বললুম, কিন্তু আজ নয়। আজ আমি কিছুতেই একা এখানে বসতে পারব না।'

সুমন্তদা হাসল: 'আচ্ছা, তবে আয় আমার সঙ্গে।'

মন্দির ছেড়ে একটু এগিয়ে গেলুম দুজনে। এলোমেলো ঝোপঝাড়ের মধ্যে কী সব খুঁজে পেতে দেখতে লাগল সুমন্তদা, তারপরে সঙ্গের ঝোলাটা থেকে একটা খুরপি বের করে ছোট ছোট ক'টা গাছ তুলে থলেয় পুরল।

'এবার যাওয়া যাক—বুঝলি? অনেকটা পথ ফিরে যেতে হবে আবার, ঢের বেলা হয়ে যাবে।'

যাওয়ার জন্যে আমি এক পায়ে খাড়া। পাঠক দেউলের বনে এই আদ্যি-কালের ক'টা গাছ, ওই ভাঙা মন্দির, হাত-ভাঙা বিকট মূর্তিটা, চারদিকে ছায়া, এই সব নরবলির গল্প—আমার শরীর মন ঝিমঝিম করছিল একেবারে। হাওয়ায় একটা পাতা নড়লেও রক্ত চলকে যাচ্ছিল মাথায়। এখান থেকে এখন বেরুতে পারলে আমি বাঁচি।

'সুমন্তদা—আপনি আগেও এখানে এসেছেন, না?'

'হুঁ—দুবার।'

'শতমূলী তুলতে?'

'না। দেখতে। আমি যেখানে থাকি, তার চারদিক তন্ন তন্ন করে না দেখলে আমার ভালো লাগে না। পাঠক দেউলের নাম শুনে আমি দেখতে এসেছিলুম। আর এসে কী মনে হল জানিস?'

কথা বলতে বলতে চলেছিলুম আমরা। কী মনে হল, জানবার জন্যে ওর মুখের দিকে চাইলুম আমি।

'মনে হল, একটা চমৎকার জায়গা পেয়েছি।'

'চমৎকার জায়গা!'

'নিশ্চয়। সিদ্ধ সাধকের পীঠ—জাগ্রত দেবতা। তুই যদি কাউকে না

চণ্ড মুণ্ড খণ্ড খণ্ড
মহিষাসুর ছিন্নশুণ্ড—

বলিস, তা হলে একটা কথা বলব তোকে।'

'বলব না কাউকে—' সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়লুম আমি।

'উঁহুঁ, মুখের কথায় হবে না, দিব্যি করতে হবে।'

'মা কালীর দিব্যি—কাউকে বলব না।'

'মায়ের নামে দিব্যি করলি, মনে থাকে যেন—' সুমন্তদার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল: দিব্যি ভাঙলে জাগ্রতা মা ভীষণ রাগ করবেন তোর ওপর।'

সেই অন্ধকার গহ্বরের ভেতরে ভয়ঙ্কর মূর্তিটা, হঠাৎ যেন জ্বলজ্বল করে ওঠা দুটো চোখ—আমার হাত-পা হিম হয়ে যেতে চাইল। বললুম, না—না, কখনো দিব্যি ভাঙব না।'

'আমি কি ঠিক করেছি—জানিস? অমাবস্যার রাত্রে যখন কেউ জানবে না, খুঁড়িমা না, কামামাসি না—তখন একা চলে আসব এখানে।'

'সে কি!—নিজের কানকে আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না।

'ওই তো সময়। অমাবস্যার মাঝ রাত্রেই মা-কে ধ্যান করবার সবচেয়ে ভালো সময়। আর এই সাধকের মন্দিরে—এই বনের ভেতর—এর চাইতে সুযোগ আর কী আছে?'

কয়েক সেকেণ্ড কথা খুঁজে পেলুম না আমি।

তোমার ভয় করবে না?'

'না।'

'আমি হলে তো মরেই যাব।'

'মরবি কেন? বুকে যার শক্তি, মুখে যার মায়ের নাম, তার কিসের ভয়? স্বামীজী কী বলেছেন?

"Who dares misery love,
And hug the form of Death,
Dance in Destruction's dance
To him the Mother
comes—"

ইংরিজিটা তখন ভালো বুঝতে পারি নি—ছাড়া-ছাড়া শব্দগুলো বড়ো হলে কুড়িয়ে নিয়ে মূল লাইনগুলোকে আবিষ্কার করেছি। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি হাঁ করে চেয়ে রইলুম সুমন্তদার মুখের দিকে।

'বলা যায় না—কিছুই বলা যায় না—' সুমন্তদা অন্যমনস্ক হয়ে গেল: 'কবে যে আমার ডাক আসবে সে জন্যে কিছুই বলতে পারি না। আর আগে আমায় তৈরি হতে হবে। একদিন সব ফেলে চলে যাব হয়তো—কাউকে কিচ্ছু বলব না—এই মন্দিরে এখানে—মায়ের পায়ে পড়ে থাকব।'

'একা?'

'একা।'

'কী খাবে এখানে?'

সকলকে যিনি খেতে দেন, সে ভাবনা তিনিই ভাববেন।'

আমি কী বলতে যাচ্ছিলুম, তার আগেই হঠাৎ সুমন্তদা একটা হাত টেনে ধরল আমার।

'দাঁড়া—একটুও নড়িস নি।'

অদ্ভুত স্বর, অদ্ভুত ভঙ্গি। কিন্তু আমিও দেখেছি তখন। 'নড়িস নি' বলবারও দরকার ছিল না, এমনিতেই আমি পাথর হয়ে গেছি।

ঠিক হাত তিনেক দূরে। এক রাশ শ্যাওলাধরা ভাঙা ইটের মধ্য থেকে মাথা তুলেছে সে। ছাই রঙের এক বিরাট গোখরো—বয়স্ক মানুষের ছড়ানো হাতের পাতার মতো ফণা, লিকলিক করে উঠছে জিভ, একটা রোদের ঝিলিক লেগে চকচক করছে গলার শাদা আঁশগুলো। অত বড়ো প্রকাণ্ড গোখরোকে সাপুড়েদের ঝাঁপি থেকেও আমি বেরুতে দেখি নি কখনো।

ডাইনে বাঁয়ে অল্প অল্প দুলছে ফণাটা। চাপা হিস্‌হিস্‌ শব্দ করছে। আর সেই নিষ্ঠুর কুটিল চোখ দুটো। স্থিরভাবে চেয়ে আছে আমাদের দিকে।

'নড়িস নি—একটুও না।'—সুমন্তদা যেন বাতাসে স্বর মিলিয়ে দিলে, ঠোঁট দুটো কাঁপল কি কাঁপল না: 'চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক—আপনিই সরে যাবে।'

গেলও, কিন্তু প্রায় মিনিট পাঁচেক পরে। কিন্তু আমার হৃৎপিণ্ড ততক্ষণে প্রায় থমকে পড়েছে। পা বেয়ে যে ঘামের ফোঁটা মাটিতে গড়িয়ে পড়ছে, তাও আমি টের পাচ্ছিলুম তখন।

ধীরে ধীরে ফণা নামিয়ে বিশাল সাপটা সর সর করে চলে যেতে লাগল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত দূরে শুকনো পাতার ভেতরে আমরা তার যাওয়ার শব্দ শুনতে পেলুম।

'চলে গেছে, চল্‌ এবার।'

কিন্তু আমি তখন ধপ করে বসে পড়েছি মাটিতে।

সুমন্তদা দু' হাতে তুলে নিলে আমাকে। একেবারে কাঁধের ওপর।

ক্ষীণ স্বরে বললুম, 'নামিয়ে দাও—নামিয়ে দাও আমাকে। আমি যেতে পারব।'

'দেব নামিয়ে। এই বনটা পার করে।'

আমার আর প্রতিবাদ করবার শক্তি নেই তখন। দু হাতে সুমন্তদার গলা জড়িয়ে ধরে চোখ বুজে রইলুম আমি।

'ভয় কি রে!'—সান্ত্বনার কোমল গলায় সুমন্তদা বলতে লাগল: 'কিসের ভয়? ওতো বাবার সাপ। মা যেখানে থাকেন, বাবাও সেখানে থাকেন। মা-র ভক্তদের কি কখনো বাবার সাপ কিছু বলতে পারে?'

যে বাবা, তাঁর সাপ কেন এত নিরীহ, ও সব ভাববার মতো আমার অবস্থা নয় তখন। আমি কেবল কাতরভাবে বললুম, 'সুমন্তদা—এর পরেও আর এখানে আসবেন আপনি?'

'কেন আসব না রে? অমাবস্যার রাত্রে একা আলো না নিয়ে চলে আসব, বাবার সাপ এমনিতেই আমায় পথ ছেড়ে দেবে।'—বিহ্বল মন নিয়ে আমি শুনতে লাগলুম সুমন্তদা গান ধরেছে:

'অভয় পদে ঠাঁই পেয়েছি যে মা—
কোন্‌ ভয় আর মিছে ভয়
দেখাবে?
মরণময়ীর শরণ নিয়েছি মা—
মরণ আমায় কোথায় খুঁজে
পাবে?'

॥ চার ॥

স্মৃতির ছবিগুলো ছিঁড়ে গেল হঠাৎ। সমুদ্রের হাওয়ায় গানের সুর।

চোখ মেলে তাকালাম। জেলে-নৌকোর বহর আসছে কূলের দিকে। কোন্‌ ভোরে মাছ ধরতে গিয়েছিল দূরের সমুদ্রে, ফিরে আসছে এখন।

কালো কালো লম্বা নৌকোগুলো ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলছে। মাথায় টুপি পরা নিকষ কালো গাঁয়ের মানুষ একদল। তারাই গান গাইছে। গানের শব্দগুলো ঠিক শোনা যায় না—শুনলেও বুঝতে পারতুম না। সমুদ্র আজ খুশি হয়ে দু' হাত ভরে দিয়েছে, তার গান? নিরাপদে আজও বাড়ি ফিরে আসছি আমরা—তার গান? কিংবা কোনো জেলের মেয়ের কালো চোখ সাগরের দিকে কার আশায় আকুল হয়ে চেয়ে আছে—সেই গান?

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আত্রাইয়ের নীল জল আবার ফিরে এল—এই সাগরে যে জলের কণা মিশে আছে; কালো কালো জেলে-নৌকোগুলো মিশে যাচ্ছে বন্দরের মহাজনী নৌকোর সঙ্গে। নৌকো থেকে কে যেন জলে ছিপ ফেলেছিল, রোদে চকচক করতে করতে একটা বোয়াল মাছ উঠে এল—

'মন্টু!'

মা ডাকছেন। আমার কাঁধে গামছা, দীপুর হাতে ছোট একটা ঘটি।

'সুমন্তকে সঙ্গে না নিয়ে নদীর ঘাটে যেয়ো না।'

'না মা, জলে নামব না আমি।'

'তবু দাঁড়িয়ে যাও। সুমন্ত গঞ্জে গেছে, আসবে এক্ষুণি।'

'বলছি তো মা, জলে নামব না। ঘাটে বসে, ঘটি দিয়ে জল ঢালব মাথায়।'

'বিশ্বাস নেই তোমার কথায়। নদীতে এখন ভরা জল। রামধারী, সঙ্গে যা।'

রামধারী বাড়ির চাকর। আদেশ পাওয়া মাত্র দাঁতন করতে করতে রওনা হল সঙ্গে।

খিড়কি দরজা থেকে একটু এগিয়েই আত্রাই। টলমল করছে নীল জল। বড়ো হয়ে ভারতবর্ষের কত নদীই তো চোখে পড়ল, কিন্তু আত্রাইয়ের মতো মিষ্টি নদী বুঝি কখনো দেখি নি। বর্ষায় যখন ঘোলা জল ফেনার ফুল নিয়ে ডাকতে ডাকতে ছুটে যায়—ডাঙা ছাপিয়ে প্রায় আমাদের ঘোড়ার আস্তাবল ছোঁয়-ছোঁয়, তখন তার এক মূর্তি। তখন কত শুশুক হুশ হুশ করে ডিগবাজী খেতে থাকে। শরতে একেবারে ভরা—মহাজনী নৌকোয় ছেয়ে যায় গঞ্জের ঘাট, আর কী বড়ো বড়ো চিতল ধরা পড়ে জেলেদের জালে। শীতে শুকিয়ে এতটুকু—বালির ডাঙায় কাদাখোঁচা চরে বেড়ায়, তারপরেই দেখি কারা যেন অসংখ্য রাঙা প্রদীপ জেলে দিয়েছে স্রোতে—শিমুলের ফুলগুলো আত্রাইয়ের জলে ভাসতে ভাসতে কোথা থেকে কোথায় চলে যায়!

গঞ্জের ঘাটে দেখি, ছেলে-বুড়োরা নদীর জল নিয়ে তোলপাড় করে; নৌকোর তলায় তলায় ডুব দিয়ে লুকোচুরি খেলে, সাঁতরে এপার থেকে ওপারে চলে যায়। আমরা ছোট, সাঁতার জানি না—আমাদের বেশির ভাগ দিনই স্নান চলে বাড়ির ইঁদারায়। শুধু যেদিন বাবা সঙ্গে আসেন, সেদিন অন্যরকম—আমরাও নদীতে আসি, জলে নামতে পাই, অজস্র চ্যালা মাছ এসে গায়ে কুটকুট করে ঠোকরায়—গামছা মেলে সেগুলোকে ধরি, আবার জলে ছেড়ে দিই। দীপু বাবার হাত ধরে টুপ টুপ করে ডুব দেয়, আর আমি যাতে দূরে না যাই—বাবা সেদিকে কড়া নজর রাখেন।

সুমন্তদা আসবার পরে সব অন্যরকম হয়ে গেছে। ইস্কুল থাকলে অবশ্য হয় না, নইলে ছুটির দিনে নদীতে স্নান আমাদের বাঁধা। সুমন্তদার হাতে আমাদের ভার দিয়ে মা নিশ্চিন্ত।

আজ নদীতে যাওয়ার আগে যখন সুমন্তদা উঠোনের পেয়ারা গাছটার তলায় বসে খুব করে গায়ে তেল মাখছে, তখন মা-র কী একটা জরুরী কাজ পড়ল।

গামছাটা কাঁধে ফেলে সুমন্তদা বললে, 'আমি এক ছুটে চলে যাচ্ছি খুড়িমা। যাব আর আসব।'

আমরা ভাই-বোনে রওনা হয়েছিলুম ঘাটের দিকে। মা বললেন, 'খবর্দার, সুমন্ত না আসা পর্যন্ত জলে নামবি না।'

আর রামধারী দাঁতন করতে করতে চলল আমাদের পাহারায়।

দু' ধারে খুঁটি গেড়ে, কয়েকটা কাঠ ফেলে ঘাট। আমরা দু জনে ঘাটে নামলুম।

একটু ওপরে, বালির মধ্যে বসে, নিমের দাঁতন ঘষতে ঘষতে রামধারী বললে, 'দাদাবাবু, পানি মে উতারবে না। মাইজী বোলে দিয়েসে।'

'হয়েছে, হয়েছে, তোকে আর মোক্তারী করতে হবে না।'

সুমন্ত দাদা আসলে তখন উতারবে।'

শুনে, রামধারীকে আমি ভেংচি কাটলুম।

রামধারী বললে, 'এখুন তো ভেংচি কাটো। ফের যখন ঘুড্ডি বানিয়ে দিতে হোবে, কি পাকা আম পাড়িয়ে দিতে বোলবে, তখুন দেখা যাবে।'

আমরা দুজনে জলের মধ্যে পা মেলে দিয়ে বসে রইলুম, পায়ের পাতায় টুক-টুক করে ঠোকর দিচ্ছিল চ্যালা মাছ—ভারী মজা লাগছিল। দীপু তার ছোট ঘটিটা দিয়ে এক এক বার জল তুলে মাথায় ঢালছিল।

আমার বিরক্তি ধরে গেল। ওদিকে গঞ্জের ঘাটে আমার বয়সী ছেলের দল নদী তোলপাড় করছে—নৌকোয় উঠে জলের ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে কেউ-কেউ। হাসি-চিৎকারের আওয়াজ আসছিল সমানে। আর থাকতে পারলুম না। টুপ করে নেমে পড়লুম জলে, তারপর ঘাটলা আঁকড়ে ধরে পা ছুড়তে লাগলুম।

রামধারীর বোধ হয় দেশোয়ালী জুটেছিল কেউ, ব্যাপারটা সে লক্ষ্য করে নি। কিন্তু দীপু চেঁচিয়ে উঠল সরু গলায়। 'ও রামধারী—দাদা জলে—নামল!'

রামধারী বললে, 'দাদাবাবু উঠো।'

কিন্তু রামধারীর কথায় কান দিলুম না আমি, চট করে একটা চড় লাগিয়ে দিলুম দীপুকে।

'দাদা জলে নামল। নামবই তো। রামধারীকে ভয় পাই নাকি আমি?'

চড়টা দীপুর হাতে লাগল, হাত থেকে ছিটকে পড়ল ঘটিটা। আর স্রোতের টানে সঙ্গে সঙ্গে অনেকখানি এগিয়ে গেল সেটা।

'দাদা, ঘটিটা চলে যাচ্ছে।'

তারপরে কী যে ঘটল, ঠিক বলতে পারি না। আমি তৎক্ষণাৎ ঘটি ধরতে গেলুম, হাতের ধাক্কায় আরো দূরে সরে গেল সেটা, আরো একটু এগিয়ে গেলুম আমি, আর—

আর পায়ের তলা থেকে সরে গেল মাটি, মাথার ওপর থেকে মুছে গেল আকাশ। আমি ডুবে গেলুম। প্রাণপণে ভেসে উঠতে চাইলুম, মাথা তুললুম কয়েকবার, আবার নেমে গেলুম জলের তলায়। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে—জল গিলছি—চোখ অন্ধকার হয়ে আসছে। একবার যেন মনে হল—দীপু ডাকছে: 'দাদা—দাদা—', যেন রামধারী ঝাঁপিয়ে পড়ে আমায় ধরতে চাইছে, অথচ ধরতে পারল না। তারও দোষ নেই, সেও সাঁতার জানত না।

সব ভাবনা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল, তবু তার মধ্যে বুঝতে পারছিলুম, আমি ডুবে যাচ্ছি, মরে যাচ্ছি আমি। সেই আশ্চর্য সুন্দর—নীল, নীল নদী আজই আমাকে তলিয়ে-ভাসিয়ে টেনে নিয়ে চলেছে, আমি আর কখনো মা-কে দেখতে পাব না, বাবাকে না, দীপুকে না—কাউকে না।

অথচ আজই সেদিন আমাকে নিতে পারল না, নইলে আজ এতদিন পরে, কলকাতা থেকে এত দূরে নীলম রোডের এই বাংলোয় বসে—সমুদ্রের দিকে চোখ মেলে দিয়ে সুমন্তদার কথা আমি ভাবছি কী করে। সামনে থেকে ঢেউয়ের একটানা শব্দে—যার মধ্যে সেদিনের আজাইয়ের জলও মিশে আছে, আমি যেন একটা মৃদু ফিসফিসানি শুনতে পাচ্ছি: 'ছেলেবেলার সেই ঘুম-ঘুম দিনগুলোর ভেতর থেকে আমি তোমায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলুম, বেঁচে যেতে তা হলে। অনেক গ্লানি, অনেক দুঃখ, অনেক নিরুপায় যন্ত্রণা, অনেক হৃদয়ছেঁড়া আর্তির হাত থেকে মুক্তি পেতে তুমি, সোনালি রঙে দেখা জীবনটা তা হলে এমন করে কালো হয়ে যেত না।'

'হ্যাঁ, সুমন্তদাই।

চেতনার শেষ স্ফুলিংগটা নেবার আগেই জল থেকে টেনে তুলেছিল আমাকে। সেই সময় সে ঘাটে এসে পৌঁছেছিল।

পরদিন সুমন্তদাই কথাটা পেশ করল বাবার কাছে।

'কাকামণি, মন্টুকে আমি সাঁতার শেখাব। বরিশালের ছেলে হয়ে ডুবে যাবে এইটুকু একটা নদীর জলে? মান-ইজ্জত থাকে আমাদের?'

মা অবশ্যই প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু বাবা বললেন, 'খুব ভালো কথা। শিখুক সাঁতার।'

'যা দুরন্ত—হঠাৎ যদি ভেসে-টেসে যায়—' মা-র গলা ধরে এল।

'আমি আছি কী করতে? আড়িয়াল খাঁ সাঁতরে এপার ওপার করেছি খুড়িমা, দু ব্যাটা কুমিরের সঙ্গেও দেখা হয়ে গিয়েছিল। এ আবার নদী নাকি? এতো বাবুগঞ্জের খালের চেয়েও ছোট।'

আমাকে সাঁতার শিখিয়েছিল সুমন্তদা। স্রোতের জলে সাতটা দিনও লাগে নি। কিছু জল খেয়েছি, মাথা ডুবিয়ে হাত-পা ছুঁড়েছি দু দিন, তারপর যখন জলের ওপর গলা তুলে হাঁসের মতো এগিয়ে চললুম, তখন নিজেকে মনে হল সম্রাটের মত। নদীর জল যতই অথই হোক—এখন তার ওপর দিয়ে সম্রাটের মহিমায় আমি যেখানে খুশি, যতদূরে খুশি চলে যেতে পারি।

সুমন্তদা বলেছিল, 'মন্টু, বেঁচে থাকতে হবে। শক্ত হয়ে, বীর হয়ে, বেঁচে থাকতে হবে আমাদের।'

এসব অনেকবার শুনেছি। বললুম, 'হুঁ।'

'হুঁ নয়। কাল থেকে আরো বেশি করে ডন-বৈঠকি দেওয়াব তোকে। তারপর

আর থাকতে পারলুম না। টুপ করে নেমে পড়লুম জলে, তারপর ঘাটলা আঁকড়ে ধরে পা ছুড়তে লাগলুম

আর একটু বড় হলে বাকামাণ্ডর ওই শাদা আরবী ঘোড়টার চড়তে শেখাব।'

শুনে দারুণ খুশি হলুম আমি।

আমাদের সহিস রামবশ বলে, 'বাবু যদি একটা ছোট ঘোড়া মাঙিয়ে দেন, তা হলে তুমি চড়তে পারো।'

'দূর—দূর, ওই সব খোঁড়া টাট্টু! ওগুলো কি আর ঘোড়া নাকি—রামছাগল বললেই হয়। বরিশালে আমরা কী করতুম, জানিস? ওই টাট্টুগুলো যখন মাঠে ছোলা কিংবা মটর শাক চিবুতে আসত, তখন ওগুলোর পিঠে চেপে সপাসপ চালাতুম খেজুরের ডাল। তাও কি নড়তে চায়? বেতো রুগীর দল যত।'

'সুমন্তদা, আমি বরিশাল যাব।'

'যেতে হবে বইকি। অশ্বিনীকুমারের দেশ। পুণ্যে বিশাল। গ্যানারি অব বেঙ্গল—' বলতে বলতে সুমন্তদা উদাস হয়ে গেল: 'কিন্তু কিছু করতে পারছি না। সেই বরিশালের ছেলে হয়েও। শুধু সময়ই চলে যাচ্ছে।'

'তুমি তো বলেছিলে, ডাক আসবে।'

'হুঁ।'—সুমন্তদার ভুরু কুঁচকে এল একবার: 'কিন্তু কবে যে আসবে! সব ছেড়ে দিয়ে তো বেরিয়েই পড়েছিলুম। কিন্তু কী যে হয়ে গেল! স্টিমারে ওই স্বপ্নটা যদি না দেখতুম—'

কিছুক্ষণ চুপ। সুমন্তদা উদাস চোখ মেলে চেয়ে রইল মাথার ওপরে কদম গাছটার দিকে। সেখানে কতগুলো শালিক আর বুলবুলি মিলে কিচির-মিচির জুড়ে দিয়েছিল।

'মন্টু?'

'আঁ?'

'সামনের অমাবস্যায়।'

একটা কুটিল সন্দেহে ভরে গেল আমার মন।

'সামনের সন্ধ্যায়—কী?'

'সবাই ঘুমুলে আমি চলে যাব পাঠক দেউলে।'

'ওরে বাবা!'

সুমন্তদা বিরক্ত হল।

'এত করে তোকে বোঝালুম কী? মায়ের মন্দির—সাধকের পীঠস্থান। দেখলি নে, বাবার সাপও ফণা তুলে কেমন সুড় সুড় করে সরে গেল, একটা কথাও বললে না।'

সাপ কখনো কথা বলে কি না, আমি জানি না। কিন্তু বললেও যে খুব মিষ্টি করে কিছু সে বলত, এ-রকম মনে হল না আমার। আমি বললুম, 'তা বটে, তা বটে। কিন্তু সুমন্তদা—'

'আবার কিন্তু কী?'

'মা তো সব জায়গাতেই রয়েছেন। বাড়িতে বসেও তো তাঁর ধ্যান করা চলে।'

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল সুমন্তদা।

'হুঁ, কথা তো শিখেছিস দেখী।

আমার কৃতিত্ব ছিল না। ওটা সুমন্তদার সঙ্গগুণে।

সুমন্তদা বললে, 'ঠিক, মা সব জায়গাতেই রয়েছেন। তবে কী জানিস, স্থান-মাহাত্ম্য বলেও তো একটা ব্যাপার আছে। ঘরে বসে অনেক চেষ্টা করে মা-কে ডেকে আনতে হয়, কিন্তু মা ওখানে জেগেই বসে রয়েছেন, ভক্ত গিয়ে একটু মন দিয়ে ডাকতে পারলেই দেখা দেবেন।'

'কিন্তু সুমন্তদা, মা এত কষ্ট করে ওই জঙ্গলের ভেতরে একটা বিচ্ছিরি ভাঙা মন্দিরে থাকেন কেন? বন্দরেও তো নতুন কালীবাড়ি রয়েছে, কত ভোগ দেয়, রোজ পুজো হয়, সেখানে এসে থাকলেই পারেন।'

সুমন্তদা একটু চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে, যেন কী বলবে ভেবে পেলো না। তারপর বললে, 'চুপ কর বোকা কোথাকার। এ-সব তুই বুঝতে পারবি না।'

'সুমন্তদা, তোমার কিন্তু ওখানে না যাওয়াই ভালো। বাবা যদি জানতে পারেন—'

চোখের দৃষ্টি সন্দিগ্ধ হল সুমন্তদার।

'কেন, তুই বলে দিবি নাকি?'

'না—না, আমি বলতে যাব কেন?'—আমি তটস্থ হলুম। সেদিন যে আমি সুমন্তদার সঙ্গে পাঠক দেউলের বনে চলে গিয়েছিলুম, সেটা জানলেও বাবা খুশি হতেন কি না তাতে প্রচুর সন্দেহ আছে আমার। তার ওপরে আবার সেই 'বাবার সাপ!' সুমন্তদার যত ভরসাই থাক, আমার বাবা একবার তা জানলে সুমন্তদার কপালে বকুনি তো নির্ঘাত, আমাকেও আর কখনো বেরুতে দেবেন না ওর সঙ্গে—সে সুমন্তদা আমাকে যতই সাঁতার শেখাক আর 'বীর বাণী'ই শোনাক।

'মা কালীর নামে কী দিব্যি করেছিলি, মনে আছে?'

'মনে নেই আবার।'

সুমন্তদা বললে, 'কিছু ভাবিস নি। ক'দিন বাদেই তো অমাবস্যা। আমি চলে যাব ওখানে।'

'তারপর?'

'তারপর সারারাত মন্দিরের চাতালে বসে ধ্যান করব।'

'কিসের ধ্যান?'

'আঃ—জ্বালালি। কিসের ধ্যান আবার, মায়ের ধ্যান।'

'তোমার ভয় ধরবে না?'—ভাবতেই আমার রোমাঞ্চ হল: 'কত নরবলি দিয়েছে ওখানে। নিশ্চয় ভূত আছে।'

'ভূত তো থাকবেই, না থাকলে চলবে কেন? তারা সব বাবার অনুচর।'

'কী সর্বনাশ!'

'কার সর্বনাশ?'—সুমন্তদা ব্যাজার হয়ে বললে, 'যারা ভীতু, যারা অকর্মা, ভূত তাদেরই ঘাড়ে চাপে। কিন্তু যারা মায়ের সেবক, ভূতেরা তাদের কখনো কিছু বলে না।'

'সুমন্তদা—ওরা যদি তোমাকে চিনতে না পারে? যদি হঠাৎ দাঁত খিঁচিয়ে—'

'ঘ্যাম্—চুপ কর, গাধা কোথাকার। তোর সঙ্গে কথা বলাই ধাপ্পামো। সাহস থাকে তো চল্ আমার সঙ্গে। দেখবি, মায়ের নামে ভূত-প্রেত-বাঘ-ভালুক ত্রিসীমানাতেও ঘেঁষবে না কেউ।'

মায়ের নামের ওপর অতখানি ভরসা করতে পারলুম না আমি। চুপ করে রইলুম।

সুমন্তদা আবার বললে, 'খবরদার কিছু বলবি নি কাউকে।'

'না—না।'

অমাবস্যা কবে সে খেয়াল আমার ছিল না। কারণ স্কুলে এক নতুন সেকেন্ড মাস্টারমশাই এসেছেন। পাতলা ছিপছিপে চেহারা, হাসি-হাসি মুখ, দেখলেই মনে হবে এখুনি একটা মজার গল্প বলবেন। কিন্তু মজার গল্প তিনি বলেন না। পাটীগণিতের যত বেয়াড়া অঙ্ক তিনি কষতে দেন এবং না পারলে—

'আহা বাছাধন—' প্রায় হাসতে হাসতেই বলেন, 'মাথায় ঢুকছে না বুঝি? জমাট বেঁধে গেছে মগজের ভেতর? তা বেশ বেশ, একবার এসো এদিকে, মগজটায় একটা নাড়াচাড়া দিয়ে দিই।'

নাড়া-চাড়া ভালোই দেন। বেতের কারবার করেন না, হাতই তাঁর যথেষ্ট। পটাপট চাঁটি মারেন মাথায়। রোগা রোগা লম্বা আঙুলে অত জোর যে কোথা থেকে পান, তিনিই জানেন, কিন্তু সে চাঁটি যে একবার খেলো আধঘণ্টা ভোঁ হয়ে বসে থাকতে হয় তাকে। পেটানোর জন্যে এতদিন হেড পণ্ডিতমশাইয়ের নাম ছিল, কিন্তু হাসি-হাসি মুখ সেকেন্ড মাস্টার এক মাসেই তাঁর খ্যাতি তলিয়ে দিলেন।

সেই সেকেন্ড মাস্টারের ভয়ে তটস্থ হয়ে প্রাণপণে অঙ্ক কষে যাই। কিন্তু অঙ্কে আমার মাথা নীরেট, আর প্রশ্নের অঙ্ক হলে তো চোখে অন্ধকার দেখি। সে দিন এই রকম কয়েকটা অঙ্কের সমস্যায় আমি বিব্রত ছিলুম। যদিও সেকেন্ড মাস্টারের চাঁটি এখনো আমার মাথায় পড়ে নি, কিন্তু অঙ্কগুলো কষতে না পারলে আজ আর নিস্তার নেই।

সুমন্তদা বেশ টকাটক অঙ্ক কষতে পারে। অন্যদিন সাড়ে ছ'টা বাজতে না বাজতে সে মাদুর পেতে আমাদের পড়াতে বসে যায়, অথচ আজ সাড়ে সাতটা বাজল, এখনো তার দেখা নেই।

মা আমাদের সকালের খাবার মুড়ি, পাটালী গুড় আর নারকেল-কোরা নিয়ে এলেন। বললেন, 'সুমন্তর আজ কী হল? সেই কোন্ ভোরে উঠে ডন-বৈঠক দেয়, আজ এখনো উঠল না! শরীর-টরীর খারাপ হল নাকি? মন্টু, দেখে আয় তো একবার।'

দীপু হেসে উঠল খিলখিল করে।

'জানো মা, সুমন্তদা হাঁ করে খুব ঘুমুচ্ছে। আর কুর-কুর করে আওয়াজ বেরুচ্ছে নাক দিয়ে।'

মা বললেন, 'তুই থাম, তোকে আর জ্যাঠামো করতে হবে না।'

হঠাৎ একটা কথা মনে হল আমার, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ চমকে উঠল।

'মা, কী তিথি আজকে?'

'কেন, ভট্‌চায্যির মতো তিথির খবরে তোমার কী দরকার? কাল অমাবস্যার লুচি খেলি, মনে নেই? আজ প্রতিপদ।'

অমাবস্যা, পূর্ণিমা, একাদশীতে রাত্রে লুচি হতই, বাড়ির বাঁধা নিয়ম। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সব বুঝতে পারলুম আমি। কাল রাত্রে নিশ্চয় পাঠক দেউলে গিয়েছিল সুমন্তদা। স্বয়ং ডাকাতের সর্দার ভবানী পাঠক, কিংবা মা কালী, কিংবা বাবার ভূত-পেত্নী—কাদের সঙ্গে দেখা করে এসেছে, কে জানে।

আমি ছুটে চলে গেলুম সুমন্তদার ঘরে।

মশারির ভেতরে চিৎ হয়ে পড়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে সুমন্তদা। দীপু ঠিকই বলেছিল। গরু গুর করে নাক ডাকছে সুমন্তদার।

'সুমন্তদা!'

সাড়া নেই। এবার গায়ে হাত দিয়ে ডাকলুম: 'ও সুমন্তদা!'

সুমন্তদা চমকে উঠল ভয়ানকভাবে। দুটো লাল টকটকে চোখ মেলে এমনভাবে আমার দিকে চাইল যে মনে হল সে আমাকে চিনতে পারছে না।

ভয় পেয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললুম, 'সুমন্তদা, আমি মন্টু।'

জড়ানো গলায় বললে, 'ডাকছিস কেন?'

'বা-রে, কত বেলা হয়ে গেল যে। উঠবেন না? মা জলখাবার খেতে ডাকছেন।'

'খুড়িমাকে বলিস, কাল রাতে ভালো ঘুম হয় নি, জেগে কাটিয়েছি—তাই উঠতে একটু দেরী হবে আজ।'

'সুমন্তদা—' গলা আরো নামিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'কাল রাত্রে আপনি পাঠক দেউলে গিয়েছিলেন—না?'

সুমন্তদার টকটকে রাঙা চোখে অদ্ভুত আতঙ্ক ফুটে উঠল একটা। চুপ করে রইল কয়েক সেকেণ্ড।

'তোকে বলব বিকেলে, এখন নয়। কিন্তু তুই এ-সব কাউকে—'

'না—না, মা কালীর দিব্যি।'

সুমন্তদা পাশ ফিরতে ফিরতে বললে, 'তা হলে যা, আমি আর একটু ঘুমুই।'

মা-কে এসে বললুম, 'সুমন্তদার রাতে ঘুম হয় নি বলল। পরে উঠবে।'

'জ্বর-টর হয় নি তো?'

'না, আমি গায়ে হাত দিয়ে দেখেছি। একেবারে ঠাণ্ডা।'

নিশ্চিন্ত হয়ে মা রামধারীকে বকতে চলে গেলেন। সে কাঁটা চায়ের পেয়ালা ভেঙে ফেলেছিল। কিন্তু এ-সব বকুনিতে রামধারীর কিছু হয় না, সে তৎক্ষণাৎ বাড়ির বাইরে গিয়ে গান জুড়ে দেয়: 'কাঁহা রহলে হো রামা—'

সেকেণ্ড মাস্টারের হাতে যে কী দশা হবে, সে তো বুঝতেই পারছি। প্রাণপণে যা পারি, তাই কষতে লাগলুম। কিন্তু সমস্ত মন আমার অন্য চিন্তার মধ্যে ডুবে রইল। দুটো রাঙা টকটকে চোখ সুমন্তদার। অদ্ভুত একটা ভয়ের ছায়া পড়েছে সেখানে।

কী দেখেছে সে? কী দেখেছে পাঠক দেউলের জঙ্গলে?

ইস্কুলে গিয়ে অবশ্য খোশ খবর মিলল একটা। সেকেণ্ড মাস্টার কী কাজে গেছেন বালুরঘাটে। আজ-কাল তিনি আসবেন না। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল আমাদের।

তাঁর জায়গায় ক্লাসে এলেন ড্রয়িং স্যার আলিম সাহেব। ভীষণ ভালো মানুষ, কাউকে বকেন না। তিনি এসে আমাদের অঙ্ক দিলেন না। ঈশ্বরের মহিমা' সম্পর্কে একটা বাংলা রচনা আমাদের লিখতে দিয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন আর রচনার বদলে স্লেটের ওপর কাটা-কাটি খেলা শুরু করলুম আমরা।

মনের ভেতরে ঘুরছে সুমন্তদা। কী দেখেছিল পাঠক দেউলের জঙ্গলে? কেন তার চোখ দুটো ওই রকম টকটকে লাল?

বিকেলে বাড়ি ফিরে দেখি, খাঁচার খরগোস দুটোকে ঘাস দিচ্ছে সুমন্তদা। আমার দিকে একবার আড়চোখে চেয়ে চাপা গলায় বললে, 'জলখাবার খেয়ে চল একবার নদীর ধারে। তোর সঙ্গে কথা আছে।'

বইপত্র রেখে, কোনো মতে হাত-পা ধুয়ে গোগ্রাসে গিলে নিলুম দুধ-রুটি। আজ ইস্কুলের মাঠে ফুটবল খেলার কথা ছিল, কিন্তু তার চাইতেও বড়ো প্রলোভন সামনে। নিশ্চয় জঙ্গলে গিয়ে ভয়ানক কিছু দেখেছে সুমন্তদা। ভূত-পেত্নী না দেখলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু ওই কালী-মূর্তির দিকে চাইলেই তো প্রাণ চমকে ওঠে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দেখি, সুমন্তদা বাইরের সেই কদম গাছটার তলায় পায়চারী করছে। আমাকে বললে, 'চল্।'

ফুটবল পেটানোর আওয়াজ আসছিল একটু দূরে থেকে। কে যেন ডাকল—'মন্টু, এই মন্ট-উ-উ।' কিন্তু আমি কান দিলুম না সেদিকে। কালকে রাত্রের যে দুর্বোধ্য একটা রহস্য সুমন্তদাকে ঘিরে রয়েছে, তারই টানে চলতে লাগলুম ওর সঙ্গে।

বেলা পড়ে এসেছে। ওপারের গাছ-পালায় ঘন হয়ে আসছে ছায়া, রাঙা রোদ জ্বলছে আত্রাইয়ের নীল জলে, সেই রোদে সোনার ঝলকের মতো উলটে যাচ্ছে চিতল। চুনী-পান্নার রঙ দেখে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে মাছরাঙা। বাড়ির ঘাট থেকে খানিক এগিয়ে—গঞ্জের উলটো দিকের একটা আঘাটায় এসে পৌঁছুলুম দু' জনে। জেলে-নৌকো বাঁধা ছিল একটা, তার ওপরে নেমে বসলুম আমরা।

'সুমন্তদা, কী হয়েছে?'

জবাব দিল না। নদীর স্রোত নৌকোটা তিরতির করে কাঁপছিল, হাওয়ায় চুলগুলো উড়ছিল সুমন্তদার। আমি দেখতে পেলুম—সুমন্তদার চোখের কোণে কালি, মুখ শুকনো—নিজের ভাবনার মধ্যে ডুবে রয়েছে সে।

'কী হয়েছিল সুমন্তদা?'

চমকে সুমন্তদা বললে, 'অ্যাঁ?'

আমার ভয় করতে লাগল। মনে হল নিশ্চয় কাল পাঠক দেউলের জঙ্গলে একটা ভয়ঙ্কর কিছু দেখেছে—হয়তো ভবানী পাঠক একদিন ওই মন্দিরে যাদের বলি দিয়েছিলেন—তারা দল বেঁধে উঠে এসেছিল সামনে, নইলে 'বাবা'র অনুচরেরা এসে তাঁকে ভেংচি কেটেছে হয়তো। সেই স্যাঁৎসেঁতে মাটি, ঠাণ্ডা ছায়া, বিকট মন্দিরটা, পুরোনো গাছের সার—সব রাত্রের অন্ধকারে একসঙ্গে কল্পনা করতে গিয়ে দম আটকে এল আমার।

হোমিওপ্যাথিক
ও
বায়োকেমিক ঔষধ
সরবরাহের শ্রেষ্ঠতম প্রতিষ্ঠান
হাওড়া হ্যানিম্যান হল
১০১, জি. টি. রোড
(হাওড়া ময়দান) হাওড়া-১

আমি ফিসফিস করে বললুম, সুমন্তদা, আমার ভয় করছে।'

সুমন্তদা শুকনো হাসি হাসল: 'কেন, তোর ভয়ের কী আছে?'

'কাল রাত্রে কি ভূত-টুত—'

'দূর পাগলা! মায়ের সেবকের কাছে কখনো ভূত আসে?'

'তবে—তবে কি মা নিজেই এসেছিলেন?'—সেই হাতভাঙা ছায়ামূর্তিটার কথা ভাবতেই আমার রোমাঞ্চ হল: দর্শন দিয়েছিলেন আপনাকে?'

একটু বিরক্ত হল সুমন্তদা।

'আমি কি রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব না সাধক রামপ্রসাদ যে কথায় কথায় সামনে এসে দাঁড়াবেন? ওর জন্যে মহাপুরুষ হওয়া চাই—বুঝলি, জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা চাই।'

'তা হলে কি ওই সাপটা—'

'দুত্তোর সাপ!'

ধমক খেয়ে আমি চুপ করে গেলুম। সুমন্তদা নৌকোর এক পাশে ঝুঁকে পড়ে, নদীতে হাত ডুবিয়ে আঁজলা-আঁজলা জল মাথায় ছিটিয়ে দিতে লাগল।

'বলুন না, কী হয়েছিল—' আমি মিনতি করলুম আবার।

কাপড়ের খুঁটে মাথা মুখ মুছে নিয়ে সুমন্তদা পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকালো। বাঙা আলোয় কয়েকটা জলের বিন্দু জ্বলতে লাগল চোখের পাতায়—ঠিক মনে হল কাঁদছে।

'বুঝলি—' নিজেই কথা শুরু করল এবার: 'কাল খেতে খেতে—সেই যেখানে আমরা বোঁদে খেয়েছিলুম, সেই পলাশপুর ছাড়িয়ে একটু এগিয়েছি, এমন সময়—'

'এমন সময়?'

'একটা মস্ত পাকুড় গাছের তলায় গোঁ গোঁ করে কাতরানির আওয়াজ। চমকে চেয়ে দেখি, শাদা মতন কী একটা পুঁটলি পাকিয়ে পড়ে আছে সেখানে। সঙ্গে দেশলাই ছিল, কাঠি জেবলে দেখি গাছতলায় একটা বুড়ী, কুষ্ঠরোগী।'

মনে মনে নিরাশ হলুম। একটা ভয়ঙ্কর কিছুর কল্পনা জাগছিল, সেটা নৈতিযে গেল। কুষ্ঠরোগী এমন একটা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। আমাদের এই গঞ্জেই তো হাটের দিনে একটা কুষ্ঠরোগী রাস্তার ধারে বসে থাকে—থকথকে ঘা-ওলা বেঁটে বেঁটে হাত বাড়িয়ে ভিক্ষে চায় সকলের কাছে।

বললুম, 'ও!'

'দেখলুম, বুড়ীটার হাত-পাগুলো প্রায় খসে পড়বার জো। তাকানো যায় না—এমন অবস্থা। দেশলাইয়ের আলোয় চমকে একবার আমার দিকে চাইল, দেখলুম ঝাপসা চোখের কোণা দিয়ে জল গড়াচ্ছে। আমার দিকে তাকিয়েই চোখ বন্ধ করল, আবার গোঁ গোঁ করে আওয়াজ বেরুতে থাকল গলা দিয়ে।'

আমি আর দাঁড়ালুম না—চলে গেলুম। কী করতে পারি বল? সারা শরীর বোধ হয় পচে গেছে—কী বিশ্রী দুর্গন্ধ যে উঠছিল, তোকে কী বলব! আজ হোক—কাল হোক—দু দিন বাদে হোক, ও তো মরবেই। ওর কাছে দাঁড়িয়ে থাকলেই তো আমি আর ওর কষ্টের লাঘব করতে পারব না!

চলে এলুম মায়ের মন্দিরে। ভক্তিভরে মাকে প্রণাম করে উঠে বসলুম মন্দিরের চাতালে, শুরু করে দিলুম ধ্যান। ধ্যানের নিয়ম কী, জানিস তো? সমস্ত মনকে গুছিয়ে এনে দুটো ভুরুর মাঝখানে দাঁড় করাতে হয়, ভাবতে হয় ইষ্টদেবতাকে—আর এমনি করে ধীরে ধীরে বাইরের জগৎ লুপ্ত হয়ে যায়। তারপর জ্যোতিঃদর্শন—'

আমার বিরক্তি ধরে গেল। এ-সময় জ্যোতিঃদর্শন কে শুনতে চায়?

'তুমি যে সেই বুড়ীটার কথা বলছিলে।'

'আহা—থাম না! ধ্যান করতে যতই চেষ্টা করি, মন কিছুতেই স্থির হয় না—দুটো ভুরুর মাঝখান থেকে বার বার ছিটকে ছিটকে পড়তে থাকে। পাতার শব্দ পাই, হাওয়ার শব্দ আসে—ভাঙা মন্দিরের ফাঁকে-ফুকরে টিকটিকি-গিরগিটি ডাকে, তা শুনি। দুত্তোর, এ কি রকম হল? বাড়িতে শোওয়ার আগে মশারির মধ্যে বসে ধ্যান করি যখন, তখনও তো ঢের বেশি তন্ময়তা এসে যায় এর চাইতে।

তারপরে বুঝতে পারলুম। মনে পড়ে গেল, স্বামীজীকে ঠাকুরের আদেশ। দরিদ্র নারায়ণের সেবাই তোর ব্রত—সেই তোর তপস্যা। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল বুড়ীর চেহারা—দেশলাইয়ের আলোয় সেই যেটুকু দেখতে পেয়েছিলুম। ভাবী একটা কষ্ট হল রে! কোথায় ওর বাড়ি, কোথায় ঘর কে জানে—দ্যাখ কি-ভাবে গাছতলায় পড়ে পড়ে মরছে। হাঁটতেও আর পারে না বোধ হয়—কোনো মতে হয়তো হামাগুড়ি দিয়ে এসে পৌঁছেছে এখানে। এখন যদি একটু জলও ওকে খেতে হয়, তা হলে কত কষ্ট করে ওকে নেমে যেতে হবে নযান-জুলিতে—জানোয়ারের মতো মাথা নামিয়ে জল খাবে, তারপরে মুখ থুবড়ে ওখানেই পড়ে যাবে হয়তো; আর উঠতেও পারবে না!

আমার কানে যেন বেজে উঠল মায়ের আদেশ, স্বামীজীর বাণী। যা—যা—চলে যা এখান থেকে। আর তোকে এভাবে ধ্যান করতে হবে না স্বার্থপরের মতো। পথের সামনে একটা অসহায় মানুষকে মরতে দেখেও তুই চলে এলি? তোর লজ্জা করল না? তুই আবার রাত জেগে সুর করে "বীর বাণী" পড়িস? ছি—ছি!

আমি উঠে দাঁড়ালুম তক্ষুনি। পা চালালুম পলাশপুরের দিকে। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছিল রে।'

'কিসের দেরি সুমন্তদা?'

সুমন্তদা একটু চুপ করে রইল, যেন আমার কথাটা শুনতে পায় নি সে। তারপর আবার আস্তে আস্তে বললে, 'সত্যি বলতে কী—ওই কুষ্ঠরোগীর সেবা করব—এ কথা ভাবতেই আমার গা একটু ঘিন ঘিন করে উঠল গোড়াতে। আর তাইতেই আমি বুঝতে পারলুম—কেন স্টিমারে সেই মহাপুরুষ আমাকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন—কেন বলেছিলেন, আমার সময় হয় নি। আমি তৈরিই হতে পারি নি। কুষ্ঠরোগীকে সেবা করতে আমার ঘেন্না! মাতৃসেবকের মনে এসব সংস্কার!

তাড়াতাড়িই চলে এলুম—রাত তখন দুটো হবে। পাকুড় গাছটার কাছে আসতেই যেন খানিকটা খ্যাঁচোর-ম্যাচোর শব্দ—শেয়ালে ঝগড়া করছে বোধ হল। আমি এসে দাঁড়াতেই দু-তিনটে শেয়াল পাকুড়তলা থেকে বেরিয়ে মাঠের দিকে দিলে দৌড়। আর আমি দেশলাইয়ের কাঠি জেবলে দেখি—'

আত্রাইয়ের ওপারে সূর্য ডুবল। নদীর এদিকে ছায়া নেমেছে, ওদিকে এখনো শেষ বেলাকার রঙ। একটু থেমে আবার বলতে লাগল সুমন্তদা, গলা কাঁপতে লাগল তার: 'কাঠি জেবলে দেখি—সে বীভৎস ব্যাপার কল্পনাও করা যায় না। রক্তে মাখামাখি, বুড়ীর হাত-পাগুলো আর নেই—কয়েকটা হাড়ের টুকরো ছড়ানো, বুক-পেটের অনেকটাই খেয়ে ফেলেছে, আর — আর — বুঝলি — সেই খাওয়া-বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ড না ফুসফুস কে জানে, তিরতির করে অল্প কাঁপছে তখনো—ঠোঁট দুটো একটু একটু নড়ছে!'

আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলুম।

'শেয়াল?'

'হ্যাঁ, শেয়াল। জ্যান্ত ছিঁড়ে খাচ্ছিল মানুষটাকে। পচা রক্ত-মাংসের গন্ধে চলে এসেছে, ওদের আর দোষ কী! আর ওই মরো-মরো মানুষটাই বা ওগুলোকে কি করে ঠেকাবে, তাই বল। আমি আর একটু দেরি করে এলে সবটাই খেয়ে ফেলত।' আমার মাথা ঘুরতে লাগল।

'দেশলাইয়ের আলোয় যা দেখলুম—তাতে মনে হল, ছুটে পালাই। এমন কদর্য আর ভীষণ জিনিস জীবনে আমি আর দেখি নি। আমি আর কী করতে পারি এর পর—যা করবার, সে তো মিটেই গেছে। মনের মধ্যেটা যেন পচে যেতে লাগল। আমি যদি তখন অমনি করে

[শেষাংশ—১৩১ পৃষ্ঠায়]

মেঘ

জসীম উদ্‌দীন

ওগো কালো মেঘ এসো এসো তুমি দারুণ নিদাঘ দিনে
জ্যৈষ্ঠ রোদের আগুন লেগেছে তোমার মাঠের তৃণে।
ফাটলে ফাটলে ফাটিতেছে মাটি ছাড়িয়া উষ্ণ শ্বাস,
আকাশধনুতে সতত স্ফুরিছে প্রখর রৌদ্র ত্রাস।
ঘরের লাঙল ঘরে যে চাষির, ডোলের বেহন ডোলে,
আথালে কাঁদিছে হালের বলদ তীব্র দহনে জ্বলে।

ফাটিক জলের আশায় চাতক ফুকারে আকাশ জুড়ে,
মহাশূন্যে যে গুমরি উঠিছে শুষ্ক ধুলোয় ঘুরে।
জলহাঁসগুলি কাঁদে জল জল শূন্য দীঘির তীরে
কাদায় পড়িয়া হাঁপাইছে মাছ রৌদ্র দগ্ধ নীরে ;
ঘরে ঘরে কাঁদে শূন্য কলসী বাতাসের নিশ্বাসে,
পাখিরা দাপায় শুষ্ক শাখায় তৃষ্ণার জল আসে।

এসো এসো মেঘ গলায় পরিয়া কদমফুলের মালা,
অঙ্গে মাখিয়া কেতকির রেণু ওগো শ্যামলিয়া বালা।
বক্ষে দোলায়ে রামধনুকের সাত নরি হারখানি
এসো এসো ওগো সুন্দরী মেঘ সব রূপসীর রাণী।
ধ্বংসোন্মুখ সৃষ্টিরে আজি বাঁচাও তোমার দানে,
আকাশ ঢাকনী ঝজরী করিয়া এসো গো কাজরী গানে।
এসো এসো তুমি দামিনী ঝলকে কামিনী কুসুম দলি,
দু'হাতে ধরিয়া অর্ধ-স্ফুট লীলা কমলের কলি।

দূর অতীতের উজ্জয়নীর মেঘমন্দির থেকে
আন আবর্ত আর সাবর্ত সহচরীগণে ডেকে।
আসিতে আসিতে তমাল শাখায় কিছুখণ দোল দিও,
যদি মনে লয় কিছু রঙ তার, অঙ্গে মাখিয়া নিও।
চলিতে চলিতে শ্রীঅঙ্গ হতে ছাড়াইও রূপ কিছু,
শ্যামল শস্যে ভরিবে ধরণী তব চলা পিছু পিছু।
ডাহুকির ডাকে ভরিবে কানন হিজল শাখার থেকে,
রাশি রাশি ফুল তলায় ঝরিয়া কি শোভা দেখাবে এঁকে।
যদি মনে লয় এক মুঠি তার খোপায় পরিও হেসে,
নতুবা তাহারা অভিমান ভরে জল ধারে যাবে ভেসে।

ঘন পাটক্ষেতে ক্ষণেক দাঁড়ায়ে শুনিও কোড়ার গান,
বউ টুবাণীর সলাজ কুসুমে শিহরি উঠিবে প্রাণ।
হে কাজলী মেঘ! এসো এসো তুমি মস্ত দাদুরী ডাকে,
কাহার চিত্ত ফাটিয়া যাইছে সান্ত্বনা দিও তাকে।
গুরু গুরু গুরু নূপুর ধ্বনিতে বাজাও আকাশ-বীণ,
ফলজল ধারে পথ ঘাট আজ হারাক সকল চিন।

এ বড় রঙ্গ তো

বিষ্ণু দে

অকালে দেয়ালির এ কী লাল বাহার!
গলিতে কোঠাতে ট্রামরাস্তাতেও
লাল বাহারে দেখ স্বতস্ফূর্তি কার
বাঁধানো শানে চলে, শত নাচ তাতেও!
আশাভঙ্গ ক্ষান্ত কি? প্রাণের বিস্তার
ছড়ায় দুই হাতে লাখো কণ্ঠে তার।

এ বড় রঙ্গ তো, বৃদ্ধ হাড়ে হাড়ে
তালিতে তালি বাজে, আকাশে দীপাবলী।
কে হারে কেবা জেতে কে কমে কেবা বাড়ে
গোণে হয়, যায় শতেক দলাদলি।
জ্বালায় কারা আশা স্রোতের পাড়ে পাড়ে
চেনায় অচেনায় আশার গলাগলি।

এ যেন দেশজোড়া বিরাট এক ঘর,
আরোগ্যোৎসবে আকাশও হরষিত,
ভোজ্যে নরনারী সকলে তৎপর।
এ যেন মেনকার পরম সমাদৃত
গৌরী উন্মুখ, কোথায় আসে বর!
সকলে উদ্‌গ্রীব, লগ্ন সমাহৃত ॥

নিয়ন-আলোর ভিতরে

অরুণ মিত্র

নিয়ন-আলোর ভিতরে ঘরবাড়ী নটনটী, আমার সঙ্গের ভাবনাচিন্তাগুলো আমি পায়ের নীচে মাটিতে চেপে ধরেছি এবং চোখের সামনে এই নীলকে অপার্থিব সত্য হ'য়ে জ্বলতে দিয়েছি। কারো কোনো চেনাচিনির ধাঁধা নেই, সাজসজ্জা রং আসবাবপত্র উষ্ণ ঘনিষ্ঠ হ'য়ে আছে।

আপাদমস্তক সমঝদার ব্যবহারে রাত ঘোরালো হয়। আর দেরি সয় না। চলো এবার ভারহীনতার চূড়ান্তে উঠে যাই। শিকড়গুলো কাটা হ'য়ে গেছে, আমাদের বুকের মধ্যে আর কোনো অভিকর্ষ নেই। আমাদের মেদমজ্জা একশো কোটি যন্ত্রণার বাইরে রয়েছে। এসো এইবার তাদের মহাশূন্যে বাজাই।

গূঢ় আলাপের যতখানি নিকটে আসা যায়, আমি এসে পড়েছি। এখন বানানো দিগন্ত সূর্য ওঠার খাতিরে আমাকে একটু ঘুমিয়ে নিতে হবে।

আমার অস্থির আছি স্বদেশ আমার

দিনেশ দাস

অন্ধকারের কালো চোয়াল দেখা যায় ঃ
অন্ধকার দাঁতে দাঁত ঘষছে
আমাদের জীবন্ত কবর দেবে ব'লে।
বাতাস বধির ঃ
অসহ্য যন্ত্রণায় দেশের জিভ
টাক্‌রার সঙ্গে আট্‌কে আছে।

জীবনের মধুর ওপর ওড়ে দুর্যোগের মাছি,
দুঃসময় করে পদ্মপালের মত,
দাবার ঘুঁটির মত মানুষ হাঁটে,
দুর্ঘটনা আসে কখনো শাদা পোষাকে
কখনো বা ছদ্মবেশে ঃ
সবই ভাঙে, কিছুই গড়ে না।

রাত্রিদিন শুধু ভেসে আসে দীর্ঘশ্বাসের নৌকো
যার কোনো পাল নেই ঃ
উড়ে আসে এলোমেলো ভাবনার পাখি
যার কোনো পাখা নেই।
হয়তো কোথাও হাসির গুঁড়ো ওড়ে
চিতার ছাইয়ের মত।

হে দেশ! কবে রাত্রির চিতাভস্ম থেকে
ভোরের আলোয় নবজন্ম নেবে!
হে স্বদেশ, আমার অস্থির অস্তি
হে আমার প্রাণের প্রাণ
হে আমার আত্মার আত্মা
প্রয়োজন হ'লে আমার রক্তের ফেনায়
আমি তোমায় স্নান করাব
আমার মসৃণ চামড়ায় তোমার অঙ্গ ঢেকে দেব,
আমার হাড়ের মালায় তোমাকে সাজাব,
আমার পালক-হৃদয় হবে তোমার শয্যা ঃ

কবে তুমি ঝক্‌ঝকে তলোয়ারের মত
ভোরের আলোয় জ্বলে উঠবে,
অন্ধও দেখতে পাবে সেই আশ্চর্য আলো।
আমার জানলাও খুলে যাবে আমের থোসার
দেখা যাবে ছাড়ানো ফলের মত
একটি টস্‌টসে নিটোল সকাল।

রক্তে ভাসা মানুষ

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অন্ধকারে পথের মাঝে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি
রক্তে ভাসা মানুষ
শিকল পরা হাত দুটি তার ঊর্ধ্বে তুলে বলেছিলেন ঃ
ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসীর আইন মানি না।

যেন নিশির ডাকে গভীর রাত্রে জেগে ওঠা...
কিন্তু তিনি শোকহরণ, সূর্যডোবা ভোরের কুয়াশায়!

পালাবো কোথায়?

মনীশ ঘটক

মন উড়ে চললো,
ঘূর্ণি হাওয়ার ঘুরে নাচে
খড়কুটোর মতো নয়,
য়াইফেলের স্পাইরাল মুক্ত
তির্যক বুলেটের মতো,
সোজা আকাশ মুখো।

ক্লান্ত,
দিক্‌ভ্রান্ত
কাক চিল সে নয়
সে যেন বাচ্চা ঈগল। সে তার ডানার বল জানে!
মেঘের ওপর মেঘ
ফুঁড়ে সে উঠতে লাগলো
টাইফুন রিহার্ড
ছাড়িয়ে সে উঠতে লাগলো
ওপরে, আরো ওপরে, অনেক ওপরে।

অনির্দেশ্য অলক্ষ্য থেকে
নজরবন্দী করে রাখলো আমাকে,
অস্বস্তি, কী ঘোর অস্বস্তি!
কিন্তু
পালাবো কোথায়?

ল্যাং

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ডান কানটা বিগ্‌ড়ে গেলেও
বাঁ কানটা আছে
তাইতে ধরছি কে এবং কী
ছাড়ছে ধারে কাছে—

আপনি, মশাই, গেছেন বদ্‌লে
বদ্‌লে গেছেন, ছি ছি!
আগে গলায় বাজ ডাকাতেন
এখন করেন চিঁ চিঁ।

ইনাম পেয়ে জাহান্নামে
গেছেন, বলব কী আর—
প্রগতির লোক ছিলেন আগে
এখন প্রতিক্রিয়ার।

ফুল্‌কি ছেড়ে ফুল ধরেছেন
মিছিল ছেড়ে মেলা
দিন থাকতে মানে মানে
কাটুন এই বেলা।

হেই গো, দাদা, ছাড়ুন ঠ্যাং—
চলে যাচ্ছি ড্যাড্যাং ড্যাং ॥

আজই চৈত্রমাস

গোবিন্দ চক্রবর্তী

নোনা-ধরা ইটের দেয়ালে
খুশি-খুশি মেজাজ
চুণ-বালি খসায় দখিণ বাতাস;
জানলাগুলি দিয়ে যায়—
চৈত্রকে তাস।
আজই চৈত্রমাস।

মাঝে-মাঝে,
জগতের মধ্যে কিছু—
দুশ্চিন্তার জরুরী অধিবেশন:
এই লে-অফ, ধর্মঘট, গণ-অনশন,
এই সব আর কি—
তাছাড়া, তোফাই আছি।

কখনো এক-আধ রাউণ্ড টুইস্ট নাচি।

নন্তুর দোকানে কিনি
খিলি দুচ্চার জর্দাপানও
চিক করে পিক ফেলি
চকচকে পীচের রাস্তায়।
আহা, এ রকম অনির্বচনীয় অবস্থায়
সন্ত্রাস—
আর কি করা যায়!

বাংলার যৌবন
কফি-হাউসের সিঁড়িতে মাথা কোটে।
চারমিনারটা ঠোঁটে—
মনে পড়ে,
যেমন সেনেটের অবলুপ্ত থার্ড
সেই, কী যেন মেয়েটির নাম,
যে আমায়—
হ্যাঁ, আলবিকা দাস।

আজই চৈত্রমাস।

মোড়ে মোড়ে রক্তচক্ষু শিওন-সাইন:
বসন্তের টিকা নিন।
আপাতত, যেদিকেই চান
রবীন্দ্র-সংগীতের গায়ে গ্রাম-
রেকর্ডে কি রেডিয়োয়,
ক্যান্সারের দুরারোগ্য ঘা
পেটিকোটের মনমাতানো গান।

শুধু আহ্বান:
মেয়ে পা বাড়ান।
রাজভবনে অশোক ফুটেছে,
লালদীঘিতে পলাশ।
চৈত্রমাস, আজই চৈত্রমাস।

গন্তব্য আলোর পথে

বিনয়শঙ্কর সেনগুপ্ত

যেখানে পৌঁচেছি দেখি সেখানে এখন
অতল শূন্যতা ছাড়া কিছু নেই। সারাক্ষণ
কী ভীষণ শূন্যতার বিমর্ষ প্রাসাদ
ভাঙে গড়ে দুরন্ত সময়। শিশুর হাতের
খেলনা যেন নিমেষে ছড়ানো
চতুর্দিকে; যে-কেউ এখন

আকাঙ্ক্ষার খেলনাগুলো চুরমার হ'তে দেখে
অধোমুখ। এখন নিমেষে
উন্মোচিত হ'তে পারে অতল গহ্বর
দু'পায়ের নীচে। অথচ আমার

গন্তব্য আলোর পথে উজান নদীর দিকে
নগরের পথে। আমি শূন্যতার
ভীষণ পাথর চাপা বুকে বয়ে বয়ে
লাফিয়ে লাফিয়ে পার হবো
অতল শূন্যতা ॥

তিনি হাসলেন পথে দাঁড়িয়ে এবার

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

তিনি হাসলেন পথে দাঁড়িয়ে এবার। শুধু পায়ের তলায়
জমিটুকু ছাড়া আর এক ইঞ্চি জমিও তো বর্তমানে তাঁর
দখলে কোথাও নেই; যখন যেখানে তিনি তখন সেখানে।

না, তিনি সম্রাট কিংবা সন্ন্যাসী কি বিকৃত মস্তিষ্ক,
কিংবা বাউণ্ডুলে নন; রীতিমতো সংসারী মানুষ, মনে হয়।
কিন্তু এই হাসি? একি প্রাপ্তির আশায় কোনো নির্বোধের,
নাকি বিজ্ঞতমের, না প্রেমিকের, নাকি শয়তানের?

তাঁর মুখ হাসিতে সমুদ্ভাসিত;—নিশ্চিন্ত নির্ভরতার
হাসি নয়, কিন্তু কী যেন তৃপ্তির,—গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গুমোটে
পর, সহসা আকাশে কৃষ্ণ মেঘের পুঞ্জের আবির্ভাবে,
কিংবা তৃষ্ণায় উৎকণ্ঠ সামনে বিশাল বিমল জল
হ্রদ কিংবা নদী দেখে, দুর্গম পথের শেষে দেবতার
মন্দির সামনে দেখে, কিংবা বহু অন্বেষার পর ঈপ্সিতার
সহসা সন্ধান পেয়ে, মানুষের মুখ যে-হাসিতে উদ্ভাসিত,
সেই হাসি? আমি জানি, তিনি সদ্য অবসরপ্রাপ্ত করণিক।

রামা হে
দুর্গাদাস সরকার

রাত-বেরাতে আছে জেগে চৌকিদারের চোখ :
গভীর রাতে অন্ধকারে ঠকঠকাঠক শুনি,
মিনিট-মিনিট সাত সকালের প্রহর শুধু গুণি,
জাগছে জাগছে নীল জামাদার আরো একটি লোক।

গৃহস্থদের সে চেনে না, দ্যাখে নি সিন্দুক,
দেখলে তাকেই হয় ছেলেরা থ,
তার মতো নেই দুর্ভাগা বা তেমন দুস্থ,
সুমন্ত সব ঘরে ঘরে নিমন্ন কোন্ সুখে?

স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙলে মুখ থুবড়ে কী গোঙানি
টপকে প্রাচিল কে মেরেছে থাবা!
রতি যখন তুঙ্গে খেলে দাবা
অবচেতন মন থেকে মন করে কানাকানি।

তখন আঁধার কোথাও নেই, শব্দ বা নীল জামা।
চলছে বাজার কোটি টাকার, আমদানি, লেনদেন ;
বাজলো হঠাৎ ডাকাত পড়ার সঙ্কেতে সাইরেন,
তখনো কি খঞ্জনিতে রামা হে, হে রামা।

যেখানে শব্দেরা
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আবার প্রবেশ করি অমোঘ অগ্নির বেড়াজালে,
বলি, হে পাবক, নমোনমঃ,
আবার ঝাঁপিয়ে পড়ি পূর্ণিমার গর্জিত কোটালে,
বলি, হে তরঙ্গ, প্রিয়তম,
দ্যাখো, আমি তোমারই আশ্লেষে ধরা দিয়েছি আবার।
শব্দেরা যে দীপ্তি পায় উজ্জ্বল অনলজ্বালে, আর
শব্দেরা যে খেলা করে তরঙ্গমালায়,
ভুলে গিয়ে ইতিমধ্যে কয়েক বৎসর আমি কাটিয়েছি ঘরে।
অথচ শব্দই লক্ষ্য, শব্দ ছাড়া নেই অন্য গতি,
শব্দই নিয়তি।
এখন আবার তাকে খুঁজে নিতে ছুটে যাই দাহনজ্বালায়
ভয়ংকর জলের মোচড়ে।

চিত্ররেখা
শক্তিব্রত ঘোষ

শ্লোগানের সন্ধ্যা থেকে সরে এলে অবকাশ শিল্পের মতন
জীবনবিরোধী :
পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ত্যাগ কার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে
স্তম্ভিত প্রতিমা :
সুস্ত একটা মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে স্বগত গ্রামরেখা।

যে জন নিরশ্রু তার চেয়ে চের আততায়ী কোন
নিজের রক্তের থেকে ছুটে এসে মাঠময় জটিল মমতা :
গ্রামে হাটবার, অথচ ফেরার পথে সন্ধ্যা নেই,
এবং ক্লান্তিও বোধহীন।

দারুণ নাছোড়
শান্তনু দাস

রাতে মশা দিনে মাছি এই নিয়ে কোলকাতায় থাকলে
বেঁচে যেতাম,
বেঁচেই যেতাম,
কিন্তু বাপু শরীর নামক এই মহাশয় বড্ড জ্বালায়
খাঁচার মধ্যে আছাড় পিছাড় সমস্ত রাত বেদম নাছোড়
হায়না হয়ে ঘোরে ফেরে, আমি যেন মস্ত চকোর
শিরায় শিরায় পদধ্বনি রাত বিরেতে খাচ্ছি তাড়া।

খাচ্ছি তাড়া খাচ্ছি তাড়া...কোথায় যাবো?
কোন্ পুকুরে ডুববো গিয়ে রাত থেকে ভোর?
হায়না হয়ে দারুণ শাসায় আছাড় পিছাড় দারুণ নাছোড়
শিরায় শিরায় পদধ্বনি সত্ত বিরেতে দ্যায় পাহারা।

আহত পাখির মত
অপরাজিতা গোস্বামী

ফাগুনের ধুলোভরা কোন এক দুপুরে
আহত পাখির মত
এ মন কেবলি আশ্রয় খোঁজে
সীমাহীন আকাশের বুকে।
ওখানে ঝড়ের শব্দ।
দুরন্ত আঘাতে বাতাস ভেঙে পড়ে
তোর্ষার বুকে—ছড়ায় আর্তনাদ
উত্তপ্ত বালুর বুকে ;
ও বুকে মুখ রেখে
ফাগুনের দুপুর হোলি খেলে
ধুলো-বালি—আর
আবিরের রঙ মেখে।
তবু আহত পাখির মত
এ মন আশ্রয় খোঁজে
উত্তপ্ত বালুর বুকে মুখ গুঁজে।
একটি তৃষিত হৃদয়
দূর নক্ষত্র-পানে চোখ রেখে
ঘরের বন্ধ দুয়ার দিয়েছিল খুলে—
প্রাণভরে নিতে চেয়েছিল ঘ্রাণ
তোর্ষার ভেজা মাটি থেকে,
নিতে চেয়েছিল স্বাদ,
ধুলো-বালি—আর
আবিরের রঙ গায়ে মেখে...
তবু আহত পাখির মত
এ মন আশ্রয় খোঁজে
উত্তপ্ত বালুর বুকে মুখ গুঁজে।
ওখানে জীবনের স্বাদে
একটি মন উঠেছিলো জেগে।
বহু বাধার প্রাচীর ডিঙিয়ে
মৃত নগরীর অভিশপ্ত বুকে
জেগে উঠেছিলো সে,
সীমাহীন দিগন্তে—রাত্রি অন্ধকারে
মুক্ত বিহঙ্গের মত, ডানা দুটি মেলে
প্রাণভরে নিয়েছিলো ঘ্রাণ
জীবনের.....মুক্তির.....
আর.....অফুরন্ত ভালবাসার।

চাকা সুশীল জানা

তামাকের নেশায় যেন বিভোর হয়ে গেছে তমিজ মিঞা। দুই পাশে দুই দাঁড়ি, রাখাল আর হোসেন তামাকের আশায় বসে আছে হাঁ করে—কখন সুযোগ আসে। কিন্তু তমিজ মাঝির সেদিকে হুঁস নেই। তামাক টানছে তো টানছেই। পারে নোঙর করা নৌকো দোল খাচ্ছে একটু একটু।

হঠাৎ নজর পড়ে গেল বোধকরি—বসে আছে দুজন দাঁড়ি। খেঁকরে উঠলো, "হেই দেখ—বসে রইচিস তোরা! ইদিকে বেলা হয়ে গেল একপালা। বলি উপরে যেয়ে মাল-টাল ধরবি তো!"

দুই দাঁড়িও খেঁকরে উঠল সমানে, "বলি তামুকটা খেয়ে যাবো তো—নাকি! তুমি টানছ তো টানছই, সেই তোমার শেষ রাত থেকে বেয়ে আসছি—একদণ্ড বসেছি।"

"মুখ ফুটে বলবি তো।" তমিজ মাঝি তামাক এগিয়ে দিলে, "লে—খা চট্‌পট্।"

রাখাল বললে, "যেমন ভোম্ হয়ে খাচ্ছ তুমি—"

আসলে তামাকে নয়—তমিজ মিঞার মন পড়ে আছে ডাঙার ওপরে যেখানে মাল বোঝাই হচ্ছে লরীতে, সাইকেল রিক্সায়। সার সার দাঁড়িয়ে আছে লরী—সাইকেল রিক্সা। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে তমিজ মাঝি বিড়বিড় করে উঠল, "গেল এক ইবলিসের বচ্চা—গেল। যাস্ শালা জাহান্নামে।"

সহসা ভটভট করে প্রচণ্ড একটা যান্ত্রিক শব্দ বিস্ফোরিত হয়ে তমিজের বুড়োটে ক্ষীণ কণ্ঠকে ডুবিয়ে দিলে। এত অগাধ নিঃশব্দতার মধ্যে শব্দটাকে যেমন বিকট তেমনি অপ্রত্যাশিত মনে হয়। নদী-নালার নাবাল দেশ। ওদিকে গঙ্গা—এদিকে রূপনারায়ণ, এখানে দুইয়ে মিলে নদী তো নয়—দরিয়া। তার ওপর বর্ষার শেষ। এপার-ওপার অগাধ জলরাশির গম্ভীর নিঃশব্দতা, নির্জন তীরভূমি-সংলগ্ন নিঃসাড় সবুজ প্রান্তর আর বৃষ্টি-ভেজা শান্ত স্নিগ্ধ এই ভোরের নীরবতা নিঃসীম মহাশূন্যের তলায় যেন ধ্যান-মৌন। হঠাৎ পেট্রোলের পোড়া গন্ধ, মবিলের কালচে ধোঁয়া আর মোটরের দুরন্ত গর্জন তাকে যেন ভেঙে খান্ খান্ করে দিলে।

মাল বোঝাই একটা লরী স্টার্ট নিয়ে চলে গেল।

আরও একটা গজরাচ্ছে। বোঝাই তারও শেষ।

তমিজ তাড়া দিয়ে বললে, "লে বাপ—উঠে পড় চটপট। শালা ইবলিসের বাচ্চারা বোঝাই সেরে চলে যাচ্ছে।"

হোসেন বললে, "তো উ সব মাল কি তোমার লায়ে এসে পড়বে মনে কর!"

হোসেন টিপ্পনি কাটল। কেমন মস্করা মস্করা ভাব।

তমিজ মিঞার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। খেঁকরে উঠল। শণের মত শাদা গোঁফ-দাড়ির ফাঁকে হল্‌দে হল্‌দে দাঁতগুলো খিঁকিয়ে উঠল। বললে, "পড়ত। দশ বিশ বছর আগে সাধাসাধি করত। সে তুই জানিস নি। তোর বাপ জানত। তোর দাদাজান জানত।" একটা কোণঠাসা জন্তুর মত তমিজ মাঝি গর্‌র্ গর্‌র্ করতে লাগল।

সেদিন আর নেই।...

হুই চলে গেছে রূপনারায়ণে—তমলুক, ঘাটাল। হুই চলে গেছে গঙ্গা উত্তরে কঞ্চবঙ্গ-কলকাতা। দক্ষিণে সাগর। পশ্চিম পারে এ অঞ্চলের মস্ত গঞ্জের বাজার গেওখালি। উঁচু খাড়ির ওপরে ঘেঁষাঘেঁষি বাজারের টিনের চালা, হোটেল, ইস্টিমার ঘাট। নদীর ঢেউয়ে অবিশ্রাম দোল খাওয়া ভাসন্ত জেটি। ইস্টিমার ঘাটের দক্ষিণে একটা ধানভানা কল। রেললাইন নেই—ছিল জমজমাট জলপথ। প্যাসেঞ্জার, পাইকার, ফড়িয়া, ব্যবসায়ী—গম্ গম্ করছে বাজার। হরেক রকমের ছোট-বড় নৌকোয় ঠাসা হিজলী টাইডাল ক্যানেলের মুখ। নৌকোয় মাল ওঠা-নামা, কুলি-কামিনের হল্লা, মাঝি-মাল্লার কলহ। সেদিন গেছে। বিশ বছরে খুলে গেল বড় বড় পাকা সড়ক। আর হিজলী টাইডাল ক্যানেলের মুখে পলি জমে পাহাড় প্রমাণ হয়ে গেল। পাট গুটিয়ে চলে গেল ইস্টিমার কোম্পানী—নিঃসঙ্গ জেটি মুখ থুবড়ে পড়েছে জলে। সে-সব কথা রাখালও জানে না—হোসেনও জানে না। ওরা দেখছে সড়কে ধোঁয়া উড়িয়ে ছুটন্ত লরী, বাস, সাইকেল-রিক্সা। বাঁই বাঁই ওদের চাকা ঘুরছে।

"ইবলিসের বাচ্চা...ইবলিসের বাচ্চা।"...

মাথায় গামছা জড়াতে জড়াতে রাখাল বললে, "চল বে হোস্না।"

হঠাৎ খুব নরম গলায় তমিজ বললে, "যা বাপ্ যা—যেমন করে হোক পেটের ভাতটা তো জোগাড় করতে হবে রে বাপ্।"

খাড়ি বেয়ে ওরা দুজন ওপরে উঠে গেল।

তমিজ নৌকোর সাজ-সরঞ্জাম গোছ-গাছ করতে লাগল। যেন এক্ষুণি কোনো গাঙুলি পাইকার তার মালপত্তর থলে-ছালা নিয়ে হাজির হয়ে যাবে। তারপর হাঁপিত্যেশ করে বসে রইল। দাঁড়ি দুজন

সেই যে বাজারে ঢুকেছে—আর দেখা নেই।

ওদিকে আর একটা লরী ছেড়ে চলে গেল। ছোটখাট দোকানী পাইকারের মাল নিয়ে ভেঁপু বাজিয়ে সাইকেল-রিক্সা অবিরাম চলেছে তো চলেছেই। প্যাসেঞ্জার বাসটাও হাঁক-ডাক করে ছেড়ে চলে গেল।

ঘাড় উঁচু করে বাজারের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখল তমিজ—আর লরী নেই। এবার নৌকোর পালা। নৌকোয় দাঁড়িয়ে, পলিতে লগি গুঁজে দিয়ে সে হাঁক পাড়তে লাগল: "হেই মহিষাদল...ইটাসগরা...তেরপেখিয়া...আ..."

হিজলী টাইডাল ক্যানেল বেয়ে আরও দক্ষিণে: রায়াপাড়া...ঘোলপুকুর,...গোলাবাড়ি...ইড়িগিঙ...কালিনগর।"

ক্যানেলের দু'পাশে গহন গ্রাম-গ্রামান্তরের সব হাট বাজার আড়ৎ। কিন্তু সাড়া-শব্দ কোনোদিক থেকেই এল না।

দু'জন দাঁড়িরও দেখা নেই।

উদ্‌গ্রীব দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল। নৌকোর গায়ে অশ্রান্ত জলস্রোত শুধু ছল্ ছল্ শব্দ করে বয়ে গেল। দূরে ভাঙা জেটির কাছে শুশুকগুলো টুব্ টুব্ করে ডুবছে আর ভাসছে।

বিশ বছর আগে এমন হাঁক-ডাক করতে হতো না।

নৌকো তারা ছোটই—"হাটুয়া পাউকা"—হাটুরে নৌকো। তবু এ নৌকো তার একদিনের জন্য বসে থাকে নি। মাল বয়েছে—প্যাসেঞ্জারও বয়েছে হাট থেকে হাটে—নদী আর ক্যানেলের ঘাট থেকে ঘাটে। ভাড়া খাটতে খাটতে কেথাকার লোক কোথায় চলে গেছে তারা ঠিক-ঠিকানা নেই।

আর অজ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল বাজারের দিকে। নোনা-পোড়া নিকষ কালো মুখে তুলিতে আঁকা ছবির মত শাদা ধবধবে গোঁফ আর দাড়ি, দুটি শাদা ভুরু, নেড়া মাথা। পিঠের চামড়া কুঁচকে ঈষৎ ঝুলো পড়েছে কোমরের কাছে, চওড়া কাঁধ—চওড়া বুকের পাটা কিন্তু একটুও টস্‌কায় নি। দুলছে অলতরঙ্গে—চেয়ে আছে উদ্‌ভ্রান্তের মত। পাইকার, ফড়ে, গাঁউলি, দোকানীর অভাব নেই। কিন্তু কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না, খালের মুখে।

ব্যাকুল কণ্ঠে আবার একবার হাঁক পাড়ল: "হেই হল্‌দিয়া...তেখালি...নর থা-আ-টা..."

এ পথেও কোনো সাড়া এল না।

সাড়া দেবে কে! পাকা আধ-পাকা সড়কের শিরা-উপশিরায় গেঁথে গেছে হাট-বাজার গ্রাম-গঞ্জ। সবাই ছুটেছে সেই পথে।

এমন সময় হঠাৎ বুড়োর বুকের রক্ত যেন ছলকে উঠল। রাখাল আর হোসেন কাকে সঙ্গে করে নৌকোর দিকে আসছে। চেহারায় মালুম—লোকটা গাঁউলি ব্যাপারী হবে।

"আল্লা মেহেরবান!"...তমিজ বিড়-বিড় করে উঠল।

রাখাল নৌকোর কাছে এসে বললে, "হেই লাও মিঞা—ধরে আনলম মাইতি মশয়কে, তেরপেখিয়া যাবে।"

"মাল?"

"হেই দোকানে আছে। দরদস্তুর করে লাও।"

দরদস্তুর রাখালের চোখ মটকানিতে অল্পে-সল্পেই হয়ে গেল। তমিজ মিঞা গাঁই গুঁই করে বললে, "তো যা, মাল তোল। লরী ভাড়া আপনার চার ডবল দিতে হত।"

মাইতি মশায় বললে, "তেমন যে ঝট-পট চলে যেতম। এ তোমার কতটা সময় লাগবে যে!"

সময়—সময়—সময়! বুড়ো তমিজ মাঝি বোঝে না—লোকগুলো এত সময় নিয়ে করবে কি' জাহান্নমে যাক।—

মাইতি মশায় বললে, "ভুতু সা'র লরীতে মাল যাবে কাল সব ঠিকঠাক করে বেরিয়েছি—আজ দেখ, এতটা বেলা হয়ে গেল, তার দেখা নাই।"

"হাই দেখ—ভুতু সা'র গাড়ি!" তমিজ হি হি করে হেসে বললে, "শালার গাড়ি না গাধা বোট। সে আপনার দাঁত ছর-কুটে পড়ে আছে কোথায় রাস্তায়।"

"কাল যে আমার সঙ্গে সব ঠিকঠাক হয়ে গেল!"

"তবে সে আপনার কাল কি পরশু আসবে।" বলে এক ধরণের হাসির ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে দিলে তমিজ। চোখ মটকে দিলে রাখাল আর হোসেনকে।

দেখতে দেখতে ধপাধপ্ মাল এসে পড়তে লাগল নৌকোয়। ঝপাঝপ্ মাল টেনে আনতে লাগল রাখাল আর হোসেন। লংকার বস্তা, হলুদের বস্তা, সরষে তেলের টিন, তামাক। কোনো রকমে বোঝাই দিয়ে নৌকো ছেড়ে দিতে পারলে—বাস্।

এমন সময় ঝড়র ঝড়র করতে করতে ভেঁপু দিয়ে ভুতু সা'র গাড়ি এসে হাজির।

মাইতি মশায় বগলের ছাতা শূন্যে তুলে পাড়ে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়তে লাগল, "হেই থামাও—মাল থামাও।"

ভ্যাবা চ্যাকা খেয়ে বস্তা মাথায় থমকে দাঁড়াল রাখাল আর হোসেন খাড়াইয়ের ঢালে।

মাইতি মশায় হুকুম দিলে, "লরীতে মাল যাবে—মাল তোলো।"

নৌকো থেকে তমিজ বুড়ো হাঁকড়ে উঠল, "খবদ্দার! ফেল মাল নৌকোয়! এক বাং—এক দাঁত।"

"বটে!" মাইতি মশায় রুখে দাঁড়াল। বললে, "ফেরেপবাজী বার করে দেবো! ফাঁড়ি দূরে নয়।"

তমিজও গরম হয়ে বললে, "তো যাও ফাঁড়ি। আর দাঁড়ি দুটোকে এতক্ষণ খাটিয়ে বলে—মাল লরীতে যাবে-এ।" দাঁত খিঁচিয়ে মুখ ভেঙাল তমিজ। রাখাল আর হোসেনকে ডাক দিয়ে বললে, "এ্যাই—ফেল নৌকোয় মাল। তুলে নিয়ে যাক এখান থেকে। দেখি কোন শালা আসে।"

লগি বাগিয়ে তমিজ মিঞা নৌকোর পাশে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল।

গোলমাল হ্যাঙ্গাম দেখে ড্রাইভারের সীট থেকে তড়াক করে নেমে এল ভুতু সা। বুক চওড়া জোয়ান। চোখে কালো চশমা, গায়ে আধময়লা চেক সার্ট—বুকের সব-গুলো বোতাম খোলা। পরণে খাকি ট্রাউজার। সিগারেট টানতে টানতে এসে বললে, "কি হলো?"

"আরে এই দেখ কাণ্ড।" মাইতি মশায় সবিস্তারে ঘটনাটা বললে। বললে, "আরে সেই প্রথম থেকে ভাংচি লাগাচ্ছে। বলে—লরী না গাধাবোট। কাল আসবে না পরশু আসবে। এই সব ভুজং ভাজং দিয়ে মাল টেনে তুলেছে নৌকোয়।"

"যেতে দিন।" ভুতু সা বললে, "গাড়ি আমার বিগড়ে ছিল ঠিক—তাই একটু দেরি হয়ে গেল।" তারপর সমস্যার সমাধান করে দিয়ে বললে, "এক কাজ করুন—দাঁড়ি দুটোকে মাল বইবার পয়সা ধরে দিন—ওরাই লরীতে তুলে দেবে। আমার ক্লীনার থাকলে লেগে যেত। তা সে ব্যাটাও আজ আসে নি।"

ভুতু সা'র টোপে কাজ হলো। বউনির পয়সা কবুল করার সঙ্গে সঙ্গে রাখাল আর হোসেন ঘুরে দাঁড়াল। তমিজ মিঞার কটমটে দৃষ্টির সামনে ফিরে গিয়ে মাথার বোঝা তুলে দিলে লরীতে। আবার ফিরে নৌকোর মালে এসে হাত দিতেই তমিজ হুংকার দিয়ে উঠল, "খবদ্দার! হাত দিবি নি বলছি।"

রাখাল বললে, "যার মাল—তার কথা শুনবো নি!"

তমিজ চোখ রাঙা করে বললে, "তোরা মোর দাঁড়ি। সময় নাই।"

"রাখ তোমার সরম। কাম করবো—পয়সা লিব, সরম কিসের!" হোসেন বললে, "চালের কলসী তোমার ঠং ঠং করছে বড় মিঞা—ইদিকে মোদের পেটে নাড়ি-ভুঁড়ি জ্বলে যাচ্ছে। বয়ে দিলে তবু দুটো মোরা পয়সা পাব।"

"তো মোর ভুখ্ নাই—বেসরম!" রাগে তমিজ মিঞার বুড়ো গলা কাঁপতে লাগল।

"তোমার সরম আর ইজ্জৎ নিয়ে বসে থাক বড় মিঞা—অতে মোদের পেটের জ্বালা থামবে নি!" বলে একটা বস্তা ধরে টান মেরে হোসেন বলে উঠল, "ধর রে রাখাল।"

"হুঁশিয়ার হোস্‌না।" একটা দাঁড় তুলে নিয়ে তমিজ শক্ত হয়ে দাঁড়াল।

হোসেন জোয়ান ছোকরা—গ্রাহ্যও করলে না। রাখালকে বললে, "ধর।"

হঠাৎ ধাঁই করে এসে হোসেনের মাথায় পড়ল দাঁড়ের বাড়ি। নৌকোর পাশে মুখ থুবড়ে পড়ল হোসেন। রক্তে রাঙা হয়ে উঠল পলিমাটি। একটা মরিয়া হিংস্র জানোয়ারের মত হুমড়ি খাওয়া লোকটার দিকে চেয়ে রইল বুড়ো তমিজ।

লরী থেকে হড়াম্ করে স্টার্টার হ্যাণ্ডেলটা টেনে নিয়ে তর্‌তর্ করে পাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে এল ভুতু সা। কথা নেই—বার্তা নেই, এলোপাথাড়ি পেটাতে লাগল রডের বাড়ি সর্বাঙ্গে। সাঁ করে একটা গিয়ে লাগল তমিজ মিঞার কপালের সিধে।

রাখাল হতভম্ব। হতভম্ব তমিজ মিঞা। ফাটা কপালের রক্তের ধারায় লাল হয়ে গেল শাদা দাড়ি। কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল বুড়ো।

হৈ হৈ করে বাজারের লোক জুটে গেল মেলা। হুমড়ি খাওয়া হোসেনকে তুলে নিয়ে গেল পাড়ের ওপরে।

রাখাল যাচ্ছিল সঙ্গে সঙ্গে। লোহার রড হাতে চেপে ধরে ভুতু সা ধমকে উঠল, "এ্যাই—মাল তোল শালা লরীতে। দেখি ব্যাটার রোয়াবি।"

কয়েকজন নৌকোয় উঠে লেগে গেল বুড়ো তমিজের সেবায়। কয়েকজন ভুতু-সাকে ঠেলে ঠুলে পৌঁছে দিলে একেবারে লরীর কাছে। নীরবে মাল তুলতে লাগল রাখাল—একা।

গোলমাল হ্যাঙ্গামা ওইখানে শেষ। বস্তার পর বস্তা উঠে চলে গেল লরীতে। নৌকো ফাঁকা। যেমন ছিল আবার তেমনি। তেমনি একপাশে উবু হয়ে বসে বুড়ো তমিজ। পরাজিত অসহায় একটা পশুর মত চেয়ে রইল নির্বোধ দৃষ্টিতে। কপালে ভিজে গামছা বাঁধা। ধীরে ধীরে ছুবিয়ে উঠছে রক্তে।

সেদিকে একবার চোখ বুলিয়ে-নিয়ে মাইতি মশায়ের সামনে রাখাল হাত পেতে দিয়ে বললে, "দেন পয়সা।"

ভুতু সা খানিক চোখ পিট্‌পিট্ করে রাখালের দিকে চেয়ে শেষে বললে, "আমার আজ ক্লিনার নেই—যাবি গাড়িতে? পয়সা দেব।"

"কি করতে হবে?" রাখাল শুধোলে।

ভুতু সার গাড়ি আজ বিগড়েছে। আবার বিগড়াতে পারে। বললে, "দরকার হলে মাঝরাস্তায় গাড়ি ঠেলতে হতে পারে।"

রাখাল আর খালের মুখের নোঙর করা হাটুরে নৌকোটার দিকে একবার ফিরেও তাকাল না। বললে, "যাব।"

"তবে উঠে পড় ঝট্‌পট। উঠে পড়ুন মাইতি মশায়।" বলে ভুতু সার ড্রাইভারের সীটে লাফ দিয়ে উঠে দড়াম্ করে দরজা লাগিয়ে দিলে।

মাথায় ভিজে গামছার ফেট্টি বাঁধা হোসেন রাস্তার ধার থেকে উঠে এসে বলল, "মোকে তেরপেখিয়ায় লাবিয়ে দিবেন? ও শালার নৌকায় আর যাব নি—মোকে গাঙে টেনে ফেলে দিবে।"

ভুতু সা বলল, "তো ওঠ।"

হোসেনকে হাতে ধরে রাখাল পেছনে টেনে তুলে নিলে।

গাড়ি স্টার্ট দিল। সশব্দে গর্জন করে ঘুরতে লাগল চাকা। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েছিল বুড়ো তমিজ মিঞা যাওয়ার সময় রাখাল তার চোখের সামনে দুটো বুড়ো আঙুল তুলে নাচিয়ে দিয়ে গেল।

ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। এবার বুড়ো তমিজ একা। আর ঘরে ফেরার পথ—গাঙ খাল পেরিয়ে সে অনেক দূরে।

কাল সারারাত বৃষ্টি গেছে পশলায় পশলায়। শেষ রাত থেকে সকালটুকু কাটল ভালোয় ভালোয়। আবার ঘন ঘোর হয়ে এল সারা আকাশ। দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে উঠে এল পাহাড় প্রমাণ কুচকুচে কালো মেঘের দল আর দমকা হাওয়া। বেলা বাড়বার

সঙ্গে সঙ্গে চারদিক যেন অন্ধকার হয়ে এল। বৃষ্টি নামল জোরে।

তারই মধ্যে ছাতা মাথায় দিয়ে জনা-দুই লোক এসে নৌকোর খোঁজ-খবর করতে দেখা গেল। খালের মুখে যত ছোট বড় ডিঙি ছিল—তাদের লোকজন খোঁজ-খোঁজ ক'রে ডেকে এনে সব কটাকে একে একে লক-গেট খুলে ক্যানেলে ঢুকিয়ে নিলে। বাকি ছিল দুটো বড় বোট—ভড়। একটা খড়ের নৌকো। তারা যাবে কলকাতা। শেষ এসে দাঁড়াল তমিজের নৌকোর কাছে।

"কার নৌকো? হেই মাঝি!"—

চালার ভেতর থেকে তমিজ উঁকি মারল।

"চলো।"

তমিজ অবাক হয়ে তাকাল। বললে, "কোথায় যাবে?"

"এখন ফাঁড়ির সামনে। তারপর বি-ডি-ও সাহেব যেখানে পাঠায়।"

"মানে! কি বলছ বুঝলম নি।" তমিজ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

লোক দুজন বোধ করি বি-ডি-ও অফিসের কেরানী চাপরাশি হবে। ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলে। বানে কোথায় সব ভেসে গেছে। এখন নৌকোর খোঁজ পড়েছে।

তমিজ মুখের ওপরে সাফ জবাব দিয়ে দিলে, "যাব নি।"—

"যাবে নি কি হে!" একজন বেশ বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বললে, "কত লোক আটক পড়ে গেছে। কত লোক দুমুঠো খাওয়ার জন্যে হাঁ করে বসে আছে।"

তমিজ গরগর করে বললে, "মোর দাঁড়ি নাই।"

"সে আমরা ব্যবস্থা করে দেবো।"

"আমি যাব নি—যাব নি—যাব নি।" হঠাৎ খ্যাপা গলায় চিৎকার করে উঠল বুড়ো তমিজ, "যাও—এখন লরী চালাও। রিক্সা চালাও।"

উত্তেজনায় বুড়ো উঠে দাঁড়িয়েছে খাড়া হয়ে—কাঁপছে থর্ থর্ করে। ঘোলাটে দুই চোখের কোণে নেমে এসেছে জলের ধারা।

কেরানীবাবু অবাক হয়ে তাকে দেখতে লাগল অদ্ভুত লোকটাকে।

চাপরাশি বললে, "চলুন। ও থানার গুতো খেলে আপনি যাবে।"

তমিজ তেমনি চিৎকার করে বললে, "যাও—যাও তোমরা থানায়।"

"বটে!" চাপরাশি শাসিয়ে গেল, "লক-গেটে ঢুকবি না? ক্যানেলে ঢুকবি না? তখন হবে।"

কি করতে আর ক্যানেলে ঢুকবে তমিজ? পাইকার নেই—প্যাসেঞ্জার নেই। দাঁড় নেই—মাল্লা নেই—সঙ্গী নেই। গুণ টানবে কে! ক্যানেলে গুণ না টানলে চলবে না।

লোক দুটো চোখের আড়াল হতে না হতে হিড় হিড় করে টেনে তুলল নোঙর। লগি মেরে বেরিয়ে গেল খালের মুখ ছেড়ে। নদীতে দুরন্ত ভাটার টান। সেই টানে পড়ে নৌকোর মুখ সাঁ করে ঘুরে গেল দক্ষিণে। তর্‌তর্ করে এগিয়ে চলল নৌকো। শক্ত মুঠোয় হাল চেপে ধরল তমিজ।

বোটের মাঝি চোখ মট্‌কে বললে, "পালাচ্ছ?"

"পালাব কেন!" গর্ গর্ করে উঠল তমিজ। বললে, "ঘরে ঘুরে যাচ্ছি।"

খড়ো নৌকোর মাঝি বললে, দিনটা বড় খারাপ গো।"

"কি আর খারাপ।"

জ্বলছে তার কলিজা—হেথা আর এক দন্ড নয়। নিজের মনে বিড় বিড় ক'রে উঠল, "ইব্‌লিসের বাচ্চা...চালাও রিক্সা... চালাও লরী—বানের জলে ঘুরুক তোমার চাকা...হে হে!"

অট্টহাসিতে নদীর ফাঁকা বুক ভরে তুলতে ইচ্ছে করছে তার।

"বেঁচে থাক—বেঁচে থাক মা জননী আমার।"

ছল ছল কল কল করছে বর্ষার নদী। ভাটি বলে বোঝাই যায় না।

খারাপ দিন? এর চেয়ে ঢের নোংরা দিনে এই পথে পাড়ি জমিয়েছে তমিজ। একলা—নিঃসঙ্গ। সাগর-মুখো ভাটির টানে ছেড়ে দিয়েছে নৌকো—তর্ তর্ করে ছুটে চলে গেছে দক্ষিণে। নোঙর করেছে গিয়ে ভুতুনির চড়ার খালের মুখে। আবার জোয়ার এসেছে যখন—সাগর-মুখো স্রোত ঘুরে ঠেলে এসেছে নদী-নালায়, কূল ছাপিয়ে উঠেছে ভুতুনির খাল—সুড়ুৎ করে ঢুকে গেছে হলদি নদীতে। এমনি ভাটা আর জোয়ার ধরে ধরে বহুদিন ফিরে গেছে সে ঘরে।

আজও তেমনি লক-গেটের খালের মুখ থেকে পালিয়ে এসে নোঙর ফেললে ভুতুনির চড়ায়—খালের ভেতরে নৌকো ঢুকিয়ে দিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল জোয়ারের।

জলের মানুষ—চাঁদের হিসেব আঙুলে। হিসেব কবে দেখলে—জোয়ার সেই সন্ধের পরে।

এক পশলা জোরে বৃষ্টি নামল।

উদ্দাম বাতাসের এক-একটা ঝট্‌কা ঝাঁপিয়ে পড়ছে নৌকোর ওপরে—তমিজের ফাটা কপালে, রডের বাড়ি খাওয়া বুকে—সর্বাঙ্গে। গা যেন জুড়িয়ে যায়। ঠান্ডা আঙুলের পরশে চোখ যেন জুড়িয়ে আসে। সমস্ত দিনের উত্তেজিত স্নায়ুগুলো ঝিমিয়ে আসে ধীরে ধীরে। শিথিল হয়ে আসে সর্বাঙ্গ। ঢুলতে ঢুলতে চমকে জেগে ওঠে লোকটা। হাল চেপে ধরে। আবার ঢুলুনি আসে। এক সময়ে হালের ডান্ডিতে মাথা ঠুকে সারাদিনের ক্ষুধার্ত দেহটা তন্দ্রায় ডুবে যায়। তারই মাঝখানে কেমন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা যেন গুমরে গুমরে ওঠে আচ্ছন্ন চেতনায়।

মেঘে বৃষ্টিতে কখন দিন শেষ হয়ে গেল বোঝাও গেল না। গাঢ় অন্ধকারে একাকার হয়ে গেল দিক দিগন্ত। নদীর গৈরিক জলধারায় কে যেন কালি মিশিয়ে দিলে। ঝিম-কালো গভীর গম্ভীর জল-ধারা।

হঠাৎ প্রচন্ড একটা ঝাঁকানি খেয়ে তন্দ্রা ছুটে গেল বুড়ো তমিজের। অভ্যাস বশে শক্ত হাতে হাল চেপে ধরল খপ্ করে। বিমূঢ় দৃষ্টি মেলে দেখলে—নৌকোর চালা উড়ে গেছে কখন। চড়চড় করছে নোঙরের কাছি। মনে হলো—নোঙর সমেত নৌকোটাকে একটু একটু করে কে যেন সবলে ঠেলে বের ক'রে দিচ্ছে খালের মুখ থেকে। মাটি কেটে ঘষটে আসছে নোঙরের কাঁটা।

এ কী জোয়ার এল?

তাহলে খালের মুখ থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসছে কেন নৌকো! ভুতুনির চড়ায় ও কিসের শব্দ! ছল ছল কল কল করছে যেন বিপুল জলরাশি। উছলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে যেন খালে। ডুবে গেল ভুতুনির চড়া? তবে কি বান! হলদি ছাপিয়ে এল!

পুরনো কাছি—যেন ক্ষীণ আর্তনাদ করে ছিঁড়ে গেল হঠাৎ।

নৌকোটাকে কে যেন তুলে আছড়ে দিলে বিপুল জলরাশির মধ্যে। ঝন্‌ঝন্ করে উঠল হালে বাঁধা লোহার শেকল। বুড়ো তমিজ ছিট্‌কে পড়ল নৌকোর পাটাতনে। দেহের শেষ সমস্তটুকু শক্তি দিয়ে হালের কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করতে লাগল সে বার বার। কিন্তু নৌকোটা যেন দমকে দমকে উত্তাল ঢেউয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে তাকে ছিটকে ছিটকে ফেলে দিচ্ছে দূরে। তবু অন্ধকারে আকুল আগ্রহে হাত বাড়াবার তার বিরাম নেই। বহু-দিনের অভ্যস্ত, শক্ত মুঠোয় চেপে ধরা সেই মসৃণ সুডৌল হালের ডান্ডিটা শুধু এক-বার চাই তার। তারপর দেখে নেবে সে ঝড় তুফান বন্যা। কোথায়—সেটা কোথায়?

টলতে টলতে একবার খাড়া হয়ে দাঁড়াল সে, খুঁজতে লাগল—হাতড়াতে লাগল ব্যাকুল ভাবে। পেল না।

চলে গেছে—হাতের বাইরে চলে গেছে সব—হাল, নৌকো, জীবন—চেনা পথ।

আবার গড়িয়ে পড়ল পাটাতনে। গোঙিয়ে উঠল: "খোদা হাফেজ...খোদা হাফেজ।"...

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

তিন-তিনবার কাগজে-কলমে ওয়ার্নিং খাবার পর লোকটা আজ বরখাস্ত হয়ে গেল।

বরখাস্তের নোটীশ হাতে করে লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে ক্লান্ত শরীরটা টেনে-টেনে চোখের আড়াল হয়ে গেল—ঘরের তিনটি প্রাণী তখনো নির্বাক বিমূঢ় যেন। বিশেষ করে হেনা মিত্তিরের ফর্সা মুখখানা বিবর্ণ একেবারে। কেউ বুঝি একটা যন্ত্র বসিয়ে তার দেহের সমস্ত রক্ত নিঃশেষে টেনে নিয়ে গেল।

চাকরিতে জবাব হয়ে গেল হাসপাতালের একটা ব্লকের ওয়ার্ডকীপার ভোলা সরকারের। তার বয়েস এখন সাতচল্লিশ। স্যাদাসিধেভাবে তার কাজটুকু করে গেলে আরো এগারোটা বছর তো নিজের অধিকারেই বহাল তবিয়তে থেকে যেতে পারত। আর, ওপর-অলার একটু সুনজরে থাকলে আরো দুই-এক বছরের মেয়াদও অনায়াসেই বাড়তে পারত।

কিন্তু সুনজরে থাকা দূরে থাক, তার ওপরের নিচের আর সমপর্যায়ের সমস্ত পরিচিত মানুষেরই চক্ষুশূল ওয়ার্ডকীপার ভোলা সরকার। তিন-তিন বার শুধু যে ওয়ার্নিং খেয়েছে তাই নয়। তার মধ্যে শাস্তি-স্বরূপ দুবার বছরের ইনক্রিমেন্টও বন্ধ হয়েছে। ডক্টর চ্যাটার্জী পিছনে না থাকলে সুপারিনটেনডেন্টের কোপে গত বছরই তার চাকরি খতম হয়ে যেত। দ্বিতীয়বারেও তার ইনক্রিমেন্টের ওপর দিয়ে কৌশলে ঝড়টা কাটিয়ে দিয়েছিল রেসিডেনশিয়াল সার্জন ডক্টর চ্যাটার্জী। তারপর ওকে ধরে এই মারে তো সেই মারে। শেষবারের মতই তাকে শাসিয়ে দিয়েছিল, ফের ওর নামে যে-কোনো নালিশ এলেই সে নিজে তাকে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দেবে।

এবারের নালিশটা যে-কোনো নয়, সব থেকে গুরুতর নালিশ। ওর সেই অবিশ্বাস্য ধৃষ্টতা এখানকারই একজন স্ব-চক্ষে দেখেছে। সকালের মধ্যেই ওয়ার্ডে সাড়া পড়ে গেছে একটা। সুপারিনটেনডেন্টের কানেও যাবে জানা কথাই, আর তখন ডক্টর চ্যাটার্জীর নামেও প্রশ্রয়ের অভিযোগ আসবে। অতএব কাগজে-কলমে ভোলা সরকারের বরখাস্তের ব্যবস্থা করে তার ফাইল সহ সুপারিনটেনডেন্ট-এর কাছে গিয়ে নিজেই আগে রিপোর্ট করেছে। ডক্টর চ্যাটার্জী

নার্সের মুখে ঘটনাটা শুনেছিল সকাল সাতটায়। তক্ষুণি ভোলা সরকারকে ডেকে একবার জিজ্ঞাসা করেছে, যা শুনেছে ঠিক কিনা। অপরাধ করলে মুখের দিকে চুপচাপ যেমন গোঁ-ভরে চেয়ে থাকে তেমনি চেয়ে ছিল। ঠিক তেমনি নয়, সে চাউনি হিংস্র মনে হয়েছিল। তারপর বেলা দশটায় ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা এসে যা জানবার জানিয়েছে। মারমুখী ভদ্রলোককে ঠান্ডা করতে সময় লেগেছিল।

সব শুনে সুপারিনটেনডেন্ট খসখস করে বরখাস্তের নোটীশ সই করে দিয়েছে।

নিজের ঘরে এসে ডক্টর চ্যাটার্জী ভোলা সরকারের খোঁজ করেছে। কিন্তু সে তখন নিপাত্তা। বেয়ারাকে বলে রেখেছিল ও এলেই যেন তার ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলল, ওর দেখা নেই।

...কি হবে, বুঝেছে বোধহয়। তাই ডিউটি ফেলে গা-ঢাকা দিয়ে আছে। যাক, দূর হোক। মায়ের কথায় অনেক সহ্য করেছে ডক্টর চ্যাটার্জী, অনেকবার বাঁচিয়েছে ওকে। মা মারা যাবার আগে দেড় মাস ভয়ানক ভুগেছিল, এক ডিউটির সময়টুকু ছাড়া ভোলা সরকার দিন-রাত সেবা করেছিল তার। মা বলেছিল, ওটা বোধহয় আমার আর জন্মের ছেলে ছিল ...ওর যাতে ভালো হয় দেখিস বাবা।

সেই দেখতে গিয়েই ডক্টর চ্যাটার্জীর মাথা গরম। চেষ্টা-চরিত্র করে ওয়ার্ড-বয় থেকে ওয়ার্ড-কীপার করে দিয়েছিল ওকে। অন্যায় কিছু করে নি। অল্প-স্বল্প লেখা-পড়া জানে, কাজের লোকও বটে, দায়িত্ব দিলে নিঃশব্দে অসুরের মতো খাটতে পারে। কিন্তু সব তেতো ওর স্বভাবের জন্য। ওর নামে কেবল নালিশ নালিশ নালিশ। ওর নিচে যতগুলো লোক আছে তাদের সকলের নালিশ। দেড় বছর আগে যুবতী বয়সের একটা ঝাড়ুদারণী এসে কেঁদে পড়েছিল, তার সঙ্গে কজন মারমুখী জমাদার। অভিযোগ, মেয়েটাকে এমন চড় মেরেছে ভোলা সরকার যে গালে পাঁচ আঙুলের দাগ বসে গেছে।

ডক্টর বোস চেয়ে দেখে সত্যিই মেয়েটার গাল লাল তখনো। ভোলা সরকারকে ডেকে কৈফিয়ত তলব করতে ও চাপা আক্রোশে বিড়বিড় করে জবাব দিল, ওর যা চরিত্তির ওকে খুন করা উচিত।

যেন দুনিয়াশুদ্ধ মেয়ের চরিত্র সংশোধন করাই ওর কাজ।

মুখে যতদূর সম্ভব ওকে তুলোধুনো করে ওই মেয়েটাকে আর লোকগুলোকে ঠান্ডা করেছে ডক্টর চ্যাটার্জী।

ওর নিচের যারা শুধু তাদের নয়, অনেক ওপরের যারা তাদেরও নালিশের বিরাম নেই। বিশেষ করে অল্প-বয়সী নার্সদের নালিশের।...লোকটা তাদের দিকে বিচ্ছিরিভাবে তাকায়, কিছু জিজ্ঞাসা করলে রুঢ় জবাব দেয়, ইত্যাদি। ঝাড়ুদারণীকে মারার দুমাসের মধ্যেই এক নার্স তো চোখ-মুখ লাল করে এসে ফেটে পড়েছিল ডক্টর চ্যাটার্জীর কাছে। ভোলা সরকার মুখের ওপর যাচ্ছেতাই করে অপমান করেছে তাকে, অভদ্র-রকমের সব কথা বলেছে।

তক্ষুণি ডাক পড়েছে। নার্সের সামনেই ভোলা সরকার মুখ গোঁজ করে জবাবদিহি করেছে, উনি ছোকরা ডাক্তারদের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করছেন—করুন, তা বলে আমার সঙ্গে লাগতে আসেন কেন—আমি সব্বক্ষণ গোম মুখ করে বসে থাকি তাতে ওঁর কী?

আর এর ছমাস বাদে যে কান্ড করে বসেছিল ভোলা সরকার, ওর চাকরি বাঁচাতে হিমসিম অবস্থা ডক্টর চ্যাটার্জীরই। কোনো ক্যাবিন-পেশেন্টের সঙ্গে ভিজিটিং আওয়ার্স-এ এই দেখা করতে এসেছিল একটি সম্ভ্রান্ত মহিলা। পরনে হাল্কা পোশাকী শাড়ি, গায়ে কাঁধ-কাটা টেপ-ব্লাউস। তারও স্কুলের পরিমিতি চোখে পড়েই। মহিলা পেশেন্টের ঘরের হদিস জানত না। হাসপাতালের ছাপ-মারা পোশাক-আঁটা ওকে সিঁড়ির মুখে একটা কাঠের চেয়ারে বসে থাকতে দেখে মহিলা বার-তিনেক ডেকে ওর মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু লোকটা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েই আছে দেখে বিরক্ত হয়ে ধমকে উঠেছিল, কালা নাকি। এতবার ডাকছি শুনতে পাও না?

ভোলা সরকার মুখ না ফিরিয়ে জবাব দিয়েছিল, শুনতে পাচ্ছি, বলুন—

আরো রেগে গিয়ে মহিলা বলেছিল, শুনতে পাচ্ছ তো তাকাচ্ছ না কেন?

আর তেমনি কঠিন স্বরে ভোলা সরকার জবাব দিয়েছিল, তাকাবো কি করে, শাড়ির আঁচলটা আগে ভালো করে গায়ে জড়ান। আর তারপরেও বিড়বিড় করে বলেছিল, এটা সিনেমা হল নয়, এটা হাসপাতাল।

মহিলার পেশেন্টের মারফৎ নালিশটা সুপারিনটেনডেন্টের কানে গেছে। কিন্তু ডক্টর চ্যাটার্জী আগেই তার শাস্তির ব্যবস্থা করে অর্থাৎ ফের এক বছরের জন্য তার ইনক্রিমেন্ট আটকে চাকরির ফাঁড়া কাটিয়েছে। সুপারিনটেনডেন্ট সেটা সই করার আগে তাও বলেছিল, এবারে ওকে স্যাক্ করছ না কেন?

ডক্টর চ্যাটার্জী জবাব দিয়েছে, এই শেষ বারের মতো ওকে ওয়ার্নিং দেওয়া হয়েছে, বলা হয়েছে এর পর আর তার বিরুদ্ধে কোনো রিপোর্ট এলেই চাকরি থাকবে না।

সেই চাকরিই গেল আজ। গেল যে লোকটা এখনো জানে না। সকাল থেকে গা-ঢাকা দিয়ে আছে।

ওর এবারের অপরাধ মাত্রা ছাড়িয়েছে। লোকটা পাগল হয়ে গেছে কিনা ডক্টর চ্যাটার্জীর সেই সন্দেহও হয়েছিল একবার। কিন্তু পাগল হোক আর যাই হোক আর ওকে রাখা বিপজ্জনক। তারপর আজই সকালে হেনা মিত্তিরের স্বামী বরেন মিত্তিরের মুখে ওর ব্যাপারটা শোনার পর ডক্টর চ্যাটার্জী স্তব্ধ। লোকটা যে এই গোছের মুখোশপরা শয়তান, কোনদিন কল্পনাও করে নি।

...দুশ্চিন্তায় আধ-পাগল হয়ে রাতারাতি এই স্পেশাল ক্যাবিনের ব্যবস্থা করে ছেলে নিয়ে এসেছিল বরেন মিত্তির আর হেনা মিত্তির। সুপারিনটেনডেন্ট তাদের সুপরিচিত। সে-ই এই ব্যবস্থা করে দিয়েছে। বরেন মিত্তিরের টাকার অভাব নেই। তাই ব্যবস্থারও ত্রুটি নেই। এখন ছেলে বাঁচে কিনা মাথার ওপর সেই সঙ্কটের খড়্গ উঁচিয়ে আছে ওদের।

একমাত্র ছেলে। বছর পনের-ষোল বয়েস। ফুটফুটে চেহারা কিন্তু অকালে ঝরে যাবে বুঝি। ভাইরাস এনকেফালাইটিস। ষোল আনার চোদ্দ আনা মৃত্যুর দখলে। কমই বাঁচে।

বিকেল তখন পাঁচটা। হেনা মিত্তির ছেলের শিয়রের কাছে বসেছিল। শুকনো মুখ। ঘড়ি দেখছে। ছেলের বাপ এক্ষুণি আসবে আশা করছে। তার কাঁধে ব্যবসার বোঝা। দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও সে-দিকে একটু-আধটু না দেখলে চলে না।

দরজার দিকে চোখ পড়তে আচমকা প্রচন্ড একটা ঝাঁকুনি খেল হেনা মিত্তির। পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন বিদ্যুত খেলে গেল একটা। কয়েক মুহূর্ত কাঠ যেন একেবারে। তারপর সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল থরথর করে। কাঁপতেই লাগল। নার্স ওদিকে কি কাজে ব্যস্ত। ইচ্ছে হল তাকে চিৎকার করে ডাকে। কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরোল না।

...দরজার বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটা লোক। নিষ্পলক তার দিকেই চেয়ে আছে। হেনা মিত্তিরের দিকে।

ওয়ার্ড-কীপার ভোলা সরকার।

বরেন মিত্তির ঘরে ঢুকতে হুঁশ ফিরল যেন। লোকটা আর দাঁড়িয়ে নেই। হেনা মিত্তির কি হঠাৎ দুঃস্বপ্ন দেখে উঠল একটা?

স্ত্রীর এই মুখ দেখে বরেন মিত্তির ঘাবড়েই গেল। ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার, খারাপ নাকি কিছু।

বিবর্ণ মুখে হেনা মিত্তির মাথা নাড়ল একটু। খারাপ নয়। তারপর

অস্ফুট স্বরে বলল, আরো ভালো অন্য কোনো হাসপাতালে ব্যবস্থা করা যায় না?

বরেন মিত্তির অবাক হয় নি। দুঃশ্চিন্তায় এরকম বলছে ভেবে আশ্বাসের সুরে জবাব দিল এ-ই সবথেকে ভালো ব্যবস্থা হয়েছে। ডাক্তার তো বলেছে আশা আছে.....

সন্ধ্যার মুখে হেনা মিত্তির একেবারে অবুঝের মতো হয়ে উঠল। রাত্রিতে সে ক্যাবিনে থাকবেই ছেলের কাছে। তিন শিফটের তিনজন ট্রেন্ড নার্স ঠিক করা হয়েছে, ডাক্তাররা এসে এসে দেখে যাচ্ছে। দরকার হলেই টেলিফোনে বাড়িতে খবর দেবে কথা হয়েছে। কিন্তু কিছুতে তাকে বোঝানো গেল না। সুপারিনটেন-ডেন্টের অনুমতি নিয়ে রাত্রিতে সে ক্যাবিনে থাকার ব্যবস্থা করল।

রাত্রি।

হেনা মিত্তির ছেলের পাশে নিশ্চল বসে আছে বলেই অদূরের চেয়ারে বসে বই হাতে নার্স ঝিমুচ্ছিল। আবার সেই চমক। আবার সেই কাঁপুনি। সেই লোকটা নিঃশব্দে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। তাকেই দেখছে। পায়ে পায়ে ঘরে ঢুকলো। ছেলের শয্যার সামনে দাঁড়ালো। ছেলেকে নির্নিমেষে দেখলো খানিক। তারপর আবার হেনা মিত্তিরের দিকে তাকালো। ওই বিবর্ণ পাংশু মূর্তি দেখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভরা মুখে হাসির আভাস চিকিয়ে উঠল একটু। তারপর যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দে চলে গেলো।

এমনি করে একে একে তিনটে দিন তিনটে রাত্রি কাটলো। হেনা মিত্তির ভয়ে ত্রাসে যেন অর্ধেক হয়ে গেল। স্নান খাওয়ার জন্যেও ক্যাবিন ছেড়ে নড়তে চায় না সে। স্বামী এসে ছেলের পাশে বসলে তবে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্নান খাওয়া সেরে আসে সে। অবস্থা দেখে বরেন মিত্তিরের ভয় ধরল ছেলের দুর্ভাবনায় স্ত্রীরই বুঝি মাথা খারাপ হয়ে যায়।

কিন্তু এরই মধ্যে নার্সরা কেউ কেউ লক্ষ্য করল, ওই বারান্দায় বা ঘরে একটা লোককে দেখলেই মহিলা কেমন যেন হয়ে যায়। ভয়ে ত্রাসে বুঝি দম বন্ধ হবার উপক্রম হয় তার। দিন-রাতের মধ্যে লোকটা অনেকবার এসে ঘরের সামনের ওই বারান্দায় দাঁড়ায়, ঘরেও আসে।... ওয়ার্ড-কীপার ভোলা সরকার। মহিলার এই ব্যতিক্রম লক্ষ্য করে তারা ওকে দেখলেই বকে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু তাদেরও কৌতূহল বাড়ছে। চুপি চুপি তাদের একজন বরেন মিত্তিরকেও জানিয়েছে ব্যাপারটা। শুনে বরেন মিত্তির অবাক। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছে, লোকটা কে?

স্ত্রীকে বিষম চমকে উঠতে দেখেছে বরেন মিত্তির। তারপর অস্ফুট জবাব শুনেছে, ও কিছু না, পরে বলব খন...

জীবনের যে গোপন নাটকের ওপর যবনিকা-পাত হয়ে গেছলো এতকাল বাদে এমন নির্মমভাবে তাতেই আবার নাড়া-চাড়া পড়বে এ-কি স্বপ্নেও ভেবেছিলো হেনা মিত্তির?

না, সে সময় হেনা নামে কোনো মেয়ের অস্তিত্বও তার জানা ছিল না। পঞ্চাশোর্ধ্ব সেই ঊনিশ বছরের মেয়েটার নাম ছিল পাখি। ওই নামের সার্থকতা ও একটু বড় হতে বোঝা গেছে। জ্ঞান বয়সের আগেই বাপ-মা খুইয়েছে। মামা-মামীর কাছে মানুষ। তাদের ছেলে ছিল পাঁচটা, মেয়ে ছিল না—পাখিই তাদের আদরের মেয়ে। কিন্তু মেয়ের পনের বছর বয়েস না হতে মামা-মামীর দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। তার পড়াশুনা কেমন হবে বোঝা গেছে, কেবল নাচ আর গানের দিকে ঝোঁক। ঘুগের হাওয়া এমনিই পালটেছে যে, মামাতো ভাইয়েরাই তাদের বাবা-মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে ওকে নাচ-গানের স্কুলে ভর্তি করেছে। গানের গলা সত্যিই ভালো, নাচেও নাম করেছে। কিন্তু বয়েস ষোল না গড়াতে ওর স্তাবক-

দের আনা-গোনার বহর দেখে মামা-মামী প্রমাদ গুণেছে। এদিকে তাদের অবস্থা তখন বেশ ভালো রকম পড়ে এসেছে, বড় দুটো ছেলে বাইরে সরে গেছে। পরেরগুলোও বলতে গেলে কিছুই করে না। ভাগনীর নাচ-গানের খরচা টানবে কি করে? কিন্তু তার জন্যেও কিছুই আটকায় নি। বরাবরই সকলের উঁচু মাথা যার-তার চোখে পড়ার ঝোঁক পাখির। নাচ-গানের স্কুলের আধবয়সী কর্তাব্যক্তিটিরও বেশ স্নেহের পাত্রী হয়ে উঠেছিল ও। ফুটফুটে সপ্রতিভ মেয়ে, সকলে প্রশংসা করে—এই স্নেহটুকু প্রাপ্যই ওর। সোজা তার কাছে গিয়ে অনটনের কথা বলতে সেই ভদ্রলোক মাইনে নেওয়া দূরে থাক, উল্টে আরো সাহায্য করেছে।

মামা-মামীর কি মতলব পাখি জানত। বিনে পয়সায় ওই গোঁয়ার-গোবিন্দ ভোলা সরকারের হাতে গছাতে চায় ওকে। তার অনেক জমি-জমা, তাইতেই মামা-মামীর কাছে মস্ত লোক সে। কিন্তু পাখি ওকে দুচক্ষে দেখতে পারে না। ছেলেবেলায় হাড়-ভাঙা পিটুনি খেয়েছে ওর। এই গত বছরের কথা, পনেরো বছরের ধাড়ী মেয়ে তখন ও, বাড়ি থেকে মাইলটাক দূরের এক মাঠে বসে গপ্প করছিল। সন্ধ্যার ঠিক আগে একটা গান গাওয়ার জন্য ছেলেগুলো ধরল ওকে। তারপর একটার জায়গায় তিন-চারটা গান হয়ে গেল। অন্ধকারে কোথা থেকে ভূতের মত এসে হাজির ওই ভোলা। ডানা ধরে টেনে তুলল ওকে, তারপর হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল। তারপর এই নিয়ে রাগারাগি আর তর্কাতর্কি, ভোলা ঠাস করে ওর গালে বেড়িয়ে এক চড়।

অবশ্য পাখিও কম শোধ নেয় নি তারপর। দু-তিন বছরের মধ্যে ওর সঙ্গে কথা বলে নি, অনেক সাধাসাধি অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও ওকে চিনতে পর্যন্ত চায় নি। ওদিকে দু-বেলা মামা-মামীর কাছে যাওয়া-আসা করছে, আর মনে মনে রসগোল্লাটির মতো ওকে গেলার জন্য হাঁ করে আছে। ভাগ্যে এক গণৎকার ওর ঠিকুজি দেখে বলে রেখেছিল কুড়ি বছরের আগে কক্ষনো যেন এ-মেয়ের বিয়ে না দেওয়া হয়—দিলে ওর বৈধব্য কেউ ঠেকাতে পারবে না।

ঠিকুজির ওপর মামা-মামীর অন্ধ বিশ্বাস। এই ফাঁড়ার খবর ভোলাও জানত। অতএব কুড়ি পর্যন্ত পাখি নিশ্চিন্ত।

...কিন্তু এক বছরের মধ্যে দেশে রক্ত বন্যা বয়ে গেল। শান্তি গেল, আনন্দ গেল। অনেক জীবন মাটিতে লুটলো, অনেক যৌবন ধুলোয় গড়ালো।

নিজের জীবন বিপন্ন করে হায়নার মুখ থেকে ওকে ছিনিয়ে এনে কি-ভাবে কেমন করে ভোলা সরকার পদ্মা পাড় দিয়েছিল সে এক বিভীষিকা। এখানে এসেও দেখে সেই নরক। নারী-মাংস লোভী পশুর উল্লাস। নোংরা বস্তি-ঘরে প্রথম ক'টা রাত ভোলার বুকে মুখ গুঁজে থরথর করে কেঁপেছে পাখি। ঠেলে সরালেও সরতে চায় নি। ভোলার অস্বস্তির একশেষ। লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্য ওর কপালে সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে বস্তিঘরে তুললেও বিয়ে তো সত্যিই এখনো হয় নি। না, যত লোভই হোক অনাচার করতে পারবে না ভোলা সরকার। অনাচার করবে না। এতবড় বিপদের মধ্যেও পাখিকে নিয়ে প্রাণে বেঁচে এসেছে যখন ভগবানের ওপর ভক্তি আর বিশ্বাস বেড়েছে তার। আশ্বিন-কার্তিক এই দুটো মাস কাটলেই চুপি চুপি কালীঘাটে গিয়ে বিয়েটা সেরে ফেলবে।

এক মাসের মধ্যে পাখির ভয়-ডর অনেকটা কমেছে। পুঁজি ভেঙে ভোলা সরকার কিছু চালু মাল কিনে ফেরিঅলা সেজেছে। সকাল-সন্ধ্যা পরিশ্রম করে। দুপুরে এক সময় ছাতু গুড় খেয়ে নেয়। তাতেও মনে আনন্দের অভাব নেই। এমন দিন থাকবে না। পাখিকে ও সুখেই রাখবে।

ওদিকে পাখিও তখন রোজগারের কথা ভাবছে। ভয় কাটতে জীবন বিষময় লাগে এক-একসময়। জীবনে কত সাধ ছিল ওর। প্রথমে শেলাই শেখার কথা মনে হয়েছিল ওর। দুপুরে আধ মাইল দূরের এক শেলাইয়ের ইস্কুলে দিন কয়েক ঘোরাঘুরি করল। যদি বিনা পয়সায় সুযোগ-সুবিধে মেলে। সেখানে একজনের মুখে শুনল এক কার্ড-বোর্ড প্যাকিং বক্স-এর কারখানায় অনেক ভদ্রঘরের উদ্‌বাস্তু মেয়ে কাজ করে। ভালো কাজ করতে পারলে দিনে দু'টাকা আড়াই টাকাও নাকি নগদ মেলে।

পাখি সেইদিনই ছুটেছিল সেখানে। দিনে দু'টাকা আড়াই টাকা তো স্বপ্ন তার কাছে।

সেই কার্ড-বোর্ড কারখানার তরুণ মালিক বরেন মিত্তির।

...হ্যাঁ সেইদিনই কাজ হয়েছিল তার। কেন হয়েছিল মালিকের মুখের দিকে চেয়েই বুঝেছিল পাখি। পুরুষের এই চোখ সে ভালোই চেনে। ওর বস্তি-ঘরের আশে-পাশে কত লোক ঘুর ঘুর করে এবং কেন করে তাও ভালই জানে। সেই পদ্মার ওপারে থাকতেই নিজের কদর সম্পর্কে সচেতন ও।

মালিক নাম জিজ্ঞাসা করতে বলেছিল, হেনা ঘোষ। পাখি নামটা ভদ্রলোকের কাছে বলার মতো মনে হয় নি ওর।

মালিক তারপর স্বামীর প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসা করেছে। সেই মুহূর্তে বিনা প্রস্তুতিতে হঠাৎ এক অদ্ভুত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিল সে। আর তার ফলে প্রত্যাশিত পরিবেশ যে সৃষ্টি হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। গম্ভীর মৃদু অথচ স্পষ্ট করে জবাব দিয়েছিল, স্বামী নেই।

অথচ তার কপালে সিঁথিতে জ্বল-জ্বল করছে সিঁদুর! মালিক ফ্যাল-ফ্যাল করে মুখের দিকে চেয়েছিল।

পরে মাথা নিচু করে হেনা ঘোষ জানিয়েছে, স্বামী নেই কারণ তার বিয়েই হয় নি। নিরাপত্তার জন্য এইভাবে থাকতে হয়।

কাজ হয়েছে। আনকোরা নতুন হলেও দিনে তিন টাকা মাইনে। মাইনেটা অন্য মেয়েদের যেন না বলে মালিক সে-সম্বন্ধেও সতর্ক করে দিয়েছিল। আর সেই দিনই অন্য মেয়েদের মুখগুলো একে একে দেখে নিয়ে নিজের জোরের দিকটার সম্পর্কে ও নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

...সেদিন বাতাসে ভেসেই বস্তি ঘরে ফিরেছে পাখি। এই পরিবেশে আবার নতুন করে গা ঘিনঘিন করেছে তার। দিনে তিন টাকা মাইনের চাকরির কথা শুনে ভোলা সরকার হতভম্ব প্রথম। তারপর আনন্দ ধরে না। যে দুর্যোগ একসঙ্গে কাটিয়ে উঠেছে দুজনে, সংশয়ের এতটুকু ছায়াও পড়ে নি ভোলা সরকারের মনে। ওরা যেন অবিচ্ছেদ্য হয়েই গেছে।

পাখি ওর কাছে কতটুকু বলেছে আর কতটুকু বলে নি, সে শুধু ও-ই জানে।

মালিকের মতি-গতি বোঝা গেছে পনের দিন না যেতে। কারণে অকারণে তার ঘরে ডাক পড়েছে। ফলে এখানকার হেনা ঘোষ আরো ঠাণ্ডা নির্লিপ্ত আবরণে ঢেকেছে নিজেকে। কারখানার তরুণ মালিকের কাছে সেটুকুও বাড়তি আকর্ষণ। সেদিন বরেন মিত্তির ওকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিল, লেখা-পড়া কতদূর করেছে। অর্থাৎ ও-দিকে যদি কিছুটা এগিয়ে থাকে তো আরো কিছু ভদ্রস্থ কাজে লাগাবে ওকে।

ঘরে তখন তৃতীয় কেউ ছিল না। ওর ডাক পড়লে থাকেও না সচরাচর। হেনা ঘোষ জানিয়েছে, নানা ঝামেলায় পড়াশুনায় বাধা পড়েছে, ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিল, দুর্যোগে সব ধুয়ে-মুছে গেছে, নিজের নামটাও এখন শুদ্ধ করে লিখতে পারবে কিনা সন্দেহ। আর তারপর নিছক আবেগের ঝোঁকেই যেন আরো ক'টা কথা ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছল, বলে ফেলেছিল, এই জীবনে এসে দাঁড়াব কি করে জানব...নইলে যত্ন করে অন্য কিছু তো শিখেছিলাম...

থেমে গেল। বোকের মাথায় একেবারে অবান্তর কিছু বলতে যাচ্ছিল যেন।

[শেষাংশ ১৬০ পৃষ্ঠায়]

সুশীল রায়

আদি ককলার লেন নিছক একটা গলি নয়—এ হচ্ছে একটা পল্লী। অনেক বনেদি লোকের বাস এখানে। এককালে সকলেই ছিল বিত্তে বনেদি; এখন বিত্ত অনেক কমে গিয়েছে, কিন্তু বনেদিত্ব যায় নি। এখন সকলে বুদ্ধিতে ও রুচিতে বনেদি। এই ব্যাপারটাই অনেক কায়দা ক'রে বলেন, "বিত্ত এখন নেই বটে আমাদের, কিন্তু একটা জিনিস এখানে আমাদের আছে, তার নাম চিত্ত।"

সুতরাং, বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, আদি ককলার লেন এখন চিত্তের দিক থেকে বনেদি।

এ-পল্লীতে ভাড়াটে ছিল না কোনো বাড়িতে। ভাড়াটে রাখার কোনো দরকার কারো কখনো হয় নি। কিন্তু এখন অযোধ্যাটাই আছে, কিন্তু সে রাম আর নেই।

রামহীন সেই আদি ককলার লেন এখনও তার বনেদিত্ব বজায় রাখার জন্যে ব্যগ্র।

মুরারিবাবু বলেন, "ধন গেছে—যাক। কিন্তু মান যেন বজায় থাকে, এই শুধু এখন চেষ্টা।"

সেই চেষ্টাই চলেছে আদি ককলার লেনে। ঘরে ঘরে।

অর্থের প্রয়োজন আছেই, তার সংস্থান করার জন্যে ঘরে ঘরে চেষ্টাও আছে রীতিমত।

বিপিনবিহারী হাজরা এ-অ্যাটের নামকরা বনেদি মানুষ। দুই ছেলে তাঁর, এবং কন্যা একটি।

এই কন্যাটিকে নিয়েই আজকের এ কাহিনী।

কয়েক বছর হ'ল বিপিনবিহারী মারা গিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পর ক্রমশ বাড়ির অবস্থা একটু অচল হয়ে উঠেছে। ছেলে-দুটি সজ্জন সপ্রতিভ ও ছিমছাম। কিন্তু বিশেষ কাজের না।

মেয়েটি ভালো। চেহারায় যেমন সুন্দরী, গানে তেমনি সুন্দর গলা।

যখন সে বেশ ছোট ছিল, তখন গানে-গানে সে পল্লীটা মাত্ করে বেড়াত। এখন, একটু বড় হয়েছে সে, গলাও সাফ হয়েছে আগের চেয়ে, গায়ের রঙ সাফ হয়েছে তার চেয়ে বেশি।

এমন মেয়ের কদর হবেই। হয়েওছে। তাই এখন সে কেবল এই পল্লীটাকেই মাত করে না, ক্ষেত্রটা এখন অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। এখন সে গান গায় জলসায়-জলসায়। বিপিনবিহারী হাজরার বাড়ির অবস্থা এখন একটু সচল। এ কৃতিত্ব মালতী হাজরার।

এম্ভার গাড়ি আসে ঐ বনেদি বাড়ির গেটের সামনে।

অল্পদিনের মধ্যে বেশ নাম ক'রে ফেলেছে মেয়েটা। খুবই নাম করেছে। অনেকে মনে করে, কেবল গলার জন্যেই তার এত কদর সম্ভবত না, বাড়তি গুণও নিশ্চয়ই আছে। অমন গান, কিংবা ওর চেয়েও ভালো গান, আরও অনেক মেয়ে নাকি গাইতে পারে, এবং এই আদি ককলার লেনেই হয়তো তেমন মেয়েও আছে। যেমন স্বিজেনবাবুর মেয়ে মণিকা। কিন্তু তার চেহারা তেমন খোলতাই না, সেই জন্যে লোকের দৃষ্টি টানতে পারে নি। আগে তো দর্শনধারী হতে হবে, গুণবিচারী তার পরে।

মালতী মেয়েটা সত্যিই বড় দর্শন-ধারী। জলসার আসরে বসা মাত্রই দর্শকরা ঐ চেহারা দেখেই কাত হয়ে যায়, তার পরে তাদের মাত করার জন্যে মালতী ধীরে ধীরে খুলতে থাকে তার গলা।

আগে মাখত না, কিন্তু আজকাল গালে-মুখে-নখে খুব রঙ মাখছে মালতী। সাজের ঘটাও বেড়ে চলেছে ক্রমশ।

সুন্দরী মেয়েটা আরো সুন্দর হবার জন্যেই এসব করে বটে, কিন্তু, মনে হয়, ওর নিজের রূপ যেন বাইরের রঙের চাপে চাপা পড়ে যায়। একটা আটপৌরে শাড়ি পরে সাধারণ ভাবে সেজে ও যদি দাঁড়ায় তাহলেই যথেষ্ট।

কিন্তু তা হয় কী ক'রে? নানা ধরনের আসরে তাকে যেতে হয়। নানা ধরনের লোকের সঙ্গে উঠাবসা করতে হয়। সকলের রুচিই যে আটপৌরে এমন কী কথা আছে?

ভেক না হলে যেমন ভিখ মেলা ভার, জাঁক না হলেও তেমনি তাক লাগানো যে দায়।

সত্যি কথা বলতে কি, মালতী হাজরা সত্যিই তাক লাগিয়ে দিয়েছে সকলকে। এমন কি ডেলি প্যাসেঞ্জাররা ট্রেনে-ট্রেনে চেঁচিয়ে তার গানের আলোচনা করে।

চন্দননগরের আসরে এমন গান নাকি গেয়েছিল যে, তার পরে ক্লাসিকাল গাইয়েরা আর নাকি তানপুরা পর্যন্ত ধরল না।

আদি ককলার লেনের মেয়ে এই মালতী। দুনিয়া সুদ্ধ লোক তাকে মাথার মুকুট করে তুলেছে। কিন্তু এই পল্লীতে এখনো আগের মতই সে মালু। এই নামেই এখানে তার পরিচয়।

তার চালচলন অনেক বদলেছে। এখন সে অনেক স্মার্ট। এখন ভয়ভীতি তার কম। জড়তা বলতে এখন কিছু নেই। কোনো জলসায় যাবার সময় তার মেজদা সঙ্গে যায়, কিন্তু কখনো মেজদার যদি অসুবিধে থাকে তবে একা যেতেও আজকাল বাধে না মালতীর।

কিন্তু এসব নিয়ে কারো কোনো মাথাব্যথা নেই। সকলেই তাকে দেখছে সেই ছোটটি থেকে, তাই তারা তাদের মালুকে তার খ্যাতির জন্যে প্রশংসাই করে, কোনোরকম অখ্যাতি করে না।

কিছুদিন হল নতুন লোক এসেছে পাড়ায়। ভাড়াটে। এই পল্লীতে এই প্রথম এল এই জিনিস।

মালতীদের বাড়ির ঠিক পাশের বাড়ি হচ্ছে অজিতনাথ শ্রীমানির। বিরাট বাড়ি। ব্যবসায়ী লোক। কিন্তু কাজে-কারবারে মন্দা দেখা দিয়েছে কিছুকাল থেকে। এই বয়সে খেটে-খুটে কারবারটিকে জাগিয়ে তোলা কষ্ট। অগত্যা তিনি তাঁর বাড়ির একটা অংশ ভাড়া দিয়েছেন।

এ পল্লীতে এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা। এই প্রথম ভাড়াটে এসেছে এ পাড়ায়।

ভাড়াটের নাম জগদ্বন্ধু চক্রবর্তী। বেশ অমায়িক আর মিশুক লোক। সকলেই তাঁকে বেশ পছন্দ করল। বয়স হয়েছে। কিন্তু বৃদ্ধ হয়ে তফাত তফাত থাকা তাঁর পছন্দ নয়। তিনি সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চান।

জগদ্বন্ধুবাবুর বাড়ির পোষ্য অনেক আছেন, অনেকগুলি ছেলে, আর মেয়ে মাত্র একটি। তাঁর এ মেয়েটিকে অবশ্য আমাদের এই কাহিনীতে লাগবে না; একেবারেই ছোট সে—পাঁচ-ছয় বছর মাত্র তার বয়স।

তাজা তাজা অনেকগুলো ছেলে জগদ্বন্ধুবাবুর। একজন ইঞ্জিনীয়ার, একজন ডাক্তার, একজন কাজ করে এয়ার-ফোর্সে। আর সকলে পড়াশুনা করছে।

জগদ্বন্ধুবাবু লোকটার টাকা মাকি মেলাই। তা না হলে শ্রীমানিদের বাড়ির অত বড় অংশটা ভাড়া নেওয়া সহজ না। তার উপর ছেলেরাও তো বেশ উপযুক্ত।

কিন্তু তবু আক্ষেপ করেন জগদ্বন্ধুবাবু, বলেন, "ছেলেরা আমার মত হল না, এ আমার কম দুঃখের কথা নয়, হৃদয়বাবু। বুড়ো-বাপকে একটা কানা-কড়ি দেয় না। তা না দিক, ভগবান আছেন আর আছে এই জগদ্বন্ধু—চলে যাবেই নিশ্চয়।"

হৃদয়বাবু হেসে বলেন, "ভগবান না থাকলেও জগদ্বন্ধু আছেন, চলা আটকায় কে। কি বলেন?"

এই কথা শুনে হেসে ওঠেন জগদ্বন্ধু চক্রবর্তী। বলেন, "মোদ্দা কথাও কিন্তু তাই।"

পাড়ার প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গে ভাব করে নিয়েছেন তিনি। বেড় অমায়িক লোক, বড় আলাপী। মুখে হাসিটা লেগে থাকে সর্বদা। কাঁচা-পাকায় মেশানো গোঁফ-জোড়া কাঁচি দিয়ে ছেঁটে রেখে করা। সেই গোঁফের নিচে সহাস্য দুটি ঠোঁট সব সময় কথা বলছে।

গায়ে মোটা একটা আধ-ময়লা জামা, পরনে সাধারণ ধুতি। কখনো রাস্তায় দাঁড়িয়ে, কখনো কারো বাড়ির গেটের উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে তিনি অনর্গল কথা বলতে থাকেন। তাঁর সে সব কথা কখনো-কখনো বেশ মজাদার লাগে, কখনো আবার রসিকতার মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে তা একটু তেতোও ঠেকে।

লাঠি ঠুকতে-ঠুকতে হৃদয়বাবু সান্ধ্যভ্রমণে চলেছেন। জগদ্বন্ধুবাবু তরতর করে এগিয়ে এসে বললেন, "এই যে, কত দূর?"

"একটু ঘুরে আসি। আছেন কেমন?"

একথা শুনেই জগদ্বন্ধু আর একটু এগিয়ে এলেন, যেন, বেশ উৎসাহিত হলেন তিনি, বললেন, "আছি বেশ। আপনার মত প্রতিবেশী পেয়েছি, ভালো না থাকব কেন। কিন্তু মশাই—"

হৃদয়বাবু যেন বেকায়দায় পড়ে গেলেন, এই মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে তাঁকে এখন কিসের বিস্তৃত বিবরণ শুনতে হবে তা তিনি বুঝতে পারলেন না, জগদ্বন্ধুকে কাটিয়ে যাবার জন্যেই বুঝি বললেন, "আচ্ছা চলি।"

"যাবেন তো বটেই। কিন্তু কি জানেন মশাই? পাড়ায় তো টেকা দায়।"

"কি হল আবার?"

জগদ্বন্ধুবাবু একটু চাপা গলায় বললেন, "আপনাদের মালু। উঃ, অতিষ্ঠ!"

"কেন, কি করল সে?"

জগদ্বন্ধুবাবু আর একটু এগিয়ে গিয়ে প্রায় কানেকানে বলার মত করে বললেন, "একেবারে যা-তা মেয়ে। কী সাজ, আর কী চালচলন। মাঝরাতে বাড়ি ফিরছে। ভোঁ-ভোঁ করে গাড়ির হর্ন বাজছে, ঝকমক করে নেমে এসে বেরিয়ে যাচ্ছে কার সঙ্গে—"

গলা সাফ করে নিয়ে হৃদয়বাবু বললেন, "যেতে দিন। তাতে আপনার কী। ও তো থাকে পাশের বাড়িতে।"

"ওই তো মুশকিল মশাই, ওই তো মুশকিল। আগুনটা তফাতে আছে বলেই তো দায় চুকিয়ে দিলেন, কিন্তু আঁচটা তো গায়ে এসে লাগেই!"

আরও হয়তো কিছু বলতেন জগদ্বন্ধুবাবু, কিন্তু হৃদয়বাবু লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে গেলেন।

হৃদয়বাবুর চলে-যাওয়ার এই ধরণ দেখে মনে হল, তিনি যেন জগদ্বন্ধুবাবুর ঐ মন্তব্যগুলি বিশেষ পছন্দ করলেন না। এগিয়ে যেতে-যেতে সামান্য একটু ফিরে তিনি যখন তাকালেন তখন হৃদয়বাবুর মুখে একটু বিরক্তির ছাপ যেন দেখা গেল।

কিন্তু জগদ্বন্ধুবাবু ওসব লক্ষ্য করার লোক নন। তিনি হাসি-হাসি মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এই রাস্তা দিয়ে আরো অনেকে অবশ্যই গিয়েছেন, ওই একই কথা জগদ্বন্ধুবাবু তাঁদেরও বলেছেন।

এই ভদ্রলোকের রকম-সকম দেখে কলকাতা শহরের পাকা বাসিন্দারা একটু হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। মালতী হাজরাকে নিয়েই তিনি আন্দোলন আরম্ভ করেছেন বেশি, অথচ তাঁর মন্তব্য আরও অনেকের বিষয়েও অবশ্য চলেছে। বিজেনবাবুর মেয়ে মণিকা গান গায় কেন, সুকুমার বোসের বউ মাস্টারি করেন কেন,—প্রায়ই নাকি জগদ্বন্ধুবাবু লক্ষ্য করেন—এ দিকের সদর রাস্তা দিয়ে না গিয়ে ওপাশের ওই নতুন রাস্তাটা দিয়ে মুখে রুমাল চেপে চট করে পালিয়ে যাবার মত করে তিনি যাচ্ছেন। ব্যাপার কি? সুকুমারবাবুর কি এতই দুঃখ?

হঠাৎ সুকুমারবাবুকেই এই প্রশ্ন একদিন সরাসরি করে বসলেন জগদ্বন্ধুবাবু, বললেন, "ও মশাই। শুনুন। বউ হচ্ছে ঘরের লক্ষ্মী। তাকে দিয়ে চাকরি করান কেন? ছাড়িয়ে দিন, ছাড়িয়ে দিন।"

এই ভদ্রলোক সম্বন্ধে সুকুমারবাবুর সবই জানা আছে, এবং মনে মনে একটু বোধ হয় তপ্ত হয়েই ছিলেন, এই প্রশ্ন শুনে তিনি উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন, কিন্তু তাপটা চেপে বললেন, "আপনি যখন বলছেন তখন দেব ছাড়িয়ে। তার আগে কথা দিন—আমার সংসারটা আপনি চালিয়ে দেবেন।"

অপ্রস্তুত হবার লোক না জগদ্বন্ধু চক্রবর্তী। তিনি ফিক ফিক করে হাসতে লাগলেন।

সুকুমারবাবু বললেন, "কেউ স্ত্রীকে মনে করে জীবনসঙ্গিনী, কেউ কেবল মনে করে শয্যাসঙ্গিনী—এই হচ্ছে তফাত। আপনার ছেলেমেয়েরা সব ভালো আছে তো?"

উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে সুকুমার বসু চলে গেলেন। কথাটা বলতে পেরে যেন অনেক আরাম পেলেন তিনি।

সন্ধ্যার সময় তাসের আড্ডায় বসে সুকুমার কথাটা তুললেন। সব শুনে

অজয়, বিভূতি, অনিল, যোগেন সকলেই বেশ তারিফ করল সুকুমারকে।

অজয় বলল, "আমাদের পাড়ার যে এত গ্লানি আছে তা আমরা জানতামই না। ভাগ্যিস উনি এসেছেন তাই ক্রমেই সব জানা হয়ে যাচ্ছে।"

যোগেন বলল, "নতুন এসেছে। টের পায় নি পাড়াটা ঠিক কেমন। হয়তো ক্রমশ টের পাবে।"

একটু অধৈর্য গলায় বিভূতি বলল, "টের শিগগিরই পাওয়া দরকার। নইলে ক্রমশ টেরর হয়ে উঠবে।"

অনিল বলল, "মালুর পিছনে জোর লেগেছে লোকটা। এমন-সব বিশ্রী কথা বলে যা উচ্চারণ করা যায় না। মালু নাকি ভদ্রপাড়ায় থাকার উপযুক্ত মেয়েই না। চাক্ষুষ কি সব নাকি দেখেছে ওই জগদ্বন্ধুটা।"

আসলে, মালতী ঘোষালের গলা বা গলার গান নাকি কিছুই না, রহস্য নাকি আরো গভীরে। তা না হলে, অমন গান কে আর না গাইতে পারে? যে-কোনো মানুষ একমনে চেষ্টা করলেই নাকি ওরকমের চুটকি গান গেয়ে আসর মাতিয়ে দিতে পারে। কিন্তু তা পারে না কেন তারা? কেন না, তাহলে নামতে হবে অনেক, অনেক তলায় তলিয়ে যেতে হবে। যারা তা পারে না, তাদের বরাতও তাই খোলে না।

জগদ্বন্ধু চক্রবর্তী প্রায় সকলের সম্বন্ধেই অল্পবিস্তর এই রকম মন্তব্য করে থাকেন, কিন্তু তাঁর প্রধান টারগেট যেন বিপিনবাবুর কন্যা ঐ মালতী হাজরা।

মালতী সাচ্চা ও সৎ—এমন দাবি কেউ করছে না। কিন্তু সে যে বুটা ও বানু—এ কথাও কেউ বলতে পারে না। কেন না, তার কোনো প্রমাণ কারও কাছেই নেই।

কি করে যেন জগদ্বন্ধুবাবুর কানে কথাটা যায়, তিনি হাসেন, বলেন, "মেয়েটা যে সত্যিই বানু—এইটেই তার প্রমাণ। কাঁচা মেয়ে হলে কবেই ধরা পড়ে যেত।"

হৃদয়বাবু বাধা দেন, বলেন "চুপ করুন। যার-যার উচিত নিজের-নিজের ঘর সামলানো। অন্যের ঘরের দিকে চোখ না দেওয়াই ভালো। আসলে আমরা কিন্তু কেউই পাড়ার পাহারাওয়ালা নই। কি বলেন?"

এ কথা শুনেও হাসতে লাগলেন জগদ্বন্ধুবাবু। তিনি বললেন, "কি আর বলব। বলার আর আছে কী!"

একটু থেমে বললেন, "এভাবে তো চিরকাল চলবে না। আর, চলবে না'ই-বা বলি কী ক'রে? শেষ পর্যন্ত বোধহয় চলতেই হবে। অমন মেয়েকে কেউ ঘরে তুলে নেবে না।"

"সে কথা ওরা ভাববে," হৃদয়বাবু একটু বোধহয় ক্ষুণ্ণ হয়েই বললেন, "অন্যের কথা ভেবে আমরা আমাদের ঘুম নষ্ট করি কেন।"

কিন্তু থামে না লোকটা। শ্রীমানিদের বাড়ির এই ভাড়াটে লোকটি তবু বলে চলেছে নানা রকমের কথা। মালতীর কথা ছাড়া তার যেন আর কোনো-কিছুই বলার নেই।

পাড়ার ছেলে-বুড়ো সকলেই যেন বেশ দুশ্চিন্তায় পড়েছে। যাদের মেজাজ একটু গরম তারা মনে-মনে ঠিক করল—লোকটাকে যদি ঠেকানোই না যায় তা হলে শেষ পর্যন্ত তাকে ঠেঙানো হবে কিনা।

এ কথা শুনে প্রবীণরা বললেন, "ছি।"

তাদের শান্ত করতে লাগল বড়রা। মাথা গরম ক'রে কোনো কাজ করতে নেই—এই রকম উপদেশ দিতে লাগল।

কিন্তু ধৈর্য রাখা যেন দায় হয়ে উঠেছে। ছেলেরা বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তাদের বুঝি আর রোখা যায় না।

তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়ে ছেলেরা জটলা করছে। তাদের সম্মুখে যেন মস্ত-বড় এক সমস্যা। তারা তার সমাধানের জন্যে বিশেষ ব্যস্ত।

তাদের ইচ্ছে যে, তারা বৃদ্ধ অজিতনাথ শ্রীমানির কাছে গিয়ে আর্জি করবে যে, এ পাড়ায় ভাড়াটে রাখা চলবে না। কিন্তু একান্তই যদি রাখতে হয় তাহলে তিনি যেন অন্য ভাড়াটে আনেন।

কিন্তু তাদের এই জল্পনা জল্পনাতেই শেষ হয়ে গেল। ঐ বৃদ্ধ মানুষটির সম্মুখে গিয়ে তারা হাজির হতেই ভরসা পেল না শেষ পর্যন্ত। সুতরাং তাদের আর্জি করাও আর হয়ে উঠল না। অথচ তারা যেন তাদের ধৈর্যও আর চেপে রাখতে পারছে না।

দিন কেটে চলেছে এইভাবে। যাকে বলে জ্বালা-যন্ত্রণা নিয়ে দিন কাটানো সেইভাবে কেটে চলেছে আদি ককলার লেনের জীবন।

যে খবরটা এতদিন চাপা পড়ে ছিল, যার দিকে কেউই নজর দিতে পারে নি, তা জানাজানি হয়ে গেল।

জগদ্বন্ধুকে নিয়েই বিভোর হয়ে ছিল প্রত্যেকেই। প্রত্যেকের চোখে এভাবে ধুলো যে দেবে ঐ অপরেশ আর ঐ মালতী—তা কেউ ভাবে নি।

মালতীকে নাকি বিয়ে করবে জগদ্বন্ধুর ছেলে। কথা নাকি একেবারে পাকাপাকি, একেবারে ঠিক।

কথাটা অবিলম্বে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

মালতীকে গিয়ে সকলে জিজ্ঞাসা করল। মেয়েটা বড় ফ্র্যাঙ্ক ও ফ্রী, সে বলল, "হ্যাঁ। তাই ঠিক করেছি আমরা। কেন, আপত্তি আছে নাকি?"

সুকুমার বসু বললেন, "এ তো সুখের কথা রে মালু। কিন্তু—"

মালতী একটু হেসে বলল, "বুঝেছি। সব জানি।"

"জেনে-শুনেও—"

মাথার কাঁটা দিয়ে দাঁত সাফ করতে-করতে মালতী বলল, "জানি বলেই তো!"

কাঁটা সরিয়ে সে যেন দাঁতের উপর দাঁত রাখল।

তার পরেই সে হেসে ফেলল, বলল, "বেশ মজাই হল কিন্তু। তাই না?"

শ্রীরামচরিত-মানস

ভক্তকবি তুলসীদাস

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ

শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের বহু গুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। সেই সকল অমর লেখনীর প্রতিভা-নির্ঝরে ভারতবর্ষের মহাকাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাস তন্মধ্যে অন্যতম—যিনি সহজ সরল ভাষায় পতিতপাবন সীতা-রামের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন সুমধুর সঙ্গীতের মাধ্যমে। তুলসীদাসের জীবনসর্বস্ব মহামানব শ্রীরামচন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুললিত বাংলা অনুবাদ এই প্রথম—বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের অপূর্ব কীর্তির নূতন এক পরিচয় এই শ্রীরামচরিত-মানস। বহু রঙীন চিত্রে সুশোভিত।

মূল্য—১ম খণ্ড তিন টাকা, ২য় খণ্ড তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

উইয়াকিলবীরা আসে

সমীর মুখোপাধ্যায়

বুঝলেন, জলে বাস ক'রে', কথাটা আর ও ফুট থেকে বলা হ'ল না—আমার বাড়ির দোতলার ভাড়াটে জয়দেবের, কেন না তখন যে ফুটে জয়দেব আর তার বিপরীত ফুটপাত—যেখানে আমি, তার মাঝখানের কুড়ি ফুট মসৃণ রাস্তা দিয়ে বত্রিশ নম্বরের স্টেট বাস বিকট শব্দে চলে গেল, ফলে, আমার ফুটপাতে এসে জয়দেবকে আবার গোড়া থেকে সবটা আরম্ভ করতে হল, 'বুঝলেন, জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা চলে না। তা, কথাটা হচ্ছে গিয়ে, ঐ আপনার তেতলার ভাড়াটে, পুলিশের লোকটি, আঙুল ফুলে কলাগাছ কিসের পয়সায় তা কি জানি না, ওর মশাই খুব গ্যাস, তা' আমিও মশাই জাত কায়েতের বাচ্চা'.....

আমি জয়দেবের কথা, তড়পানি শুনছিলাম না। মাসে একবার হুগলী থেকে কলকাতায় আসি ভাড়া আদায় করতে। ও ওইরকমই। এ. জি. বেঙ্গলে কাজ করে। উপায় ভালোই। তেতলার পুলিশ ভাড়াটেকে ঠুকলে কি হয়, ও-ও দু'পয়সা বাঁয়ে কামায় ভালোই, ওই এক-রোগা, লোকটা আড়ম্বর ছাড়া কথা বলতে পারে না।

ঠিক সেইজন্যেই যে জয়দেবের কথা আমি শুনছিলাম না ঠিক তা' নয়, অন্য একটা ব্যাপার...মানে একটা অস্বস্তি... যত্তেই বাড়িটার কাছাকাছি আসি ততোই, ...অথচ করবার কিছুই নেই...তবু কি যে করি...যেন নিতান্ত সাধ করে একটা ঘুপচি, অন্ধকার, চোরাকুঠরির মধ্যে সেঁধিয়ে গেছি আর কারা যেন সেই বন্ধ ঘরে তালা ঝুলিয়ে চলে গেছে অনেকদিন, ...কিন্তু.....

অতএব জয়দেব যখন তার আসল কথাটা খুঁজে পেয়ে হাঁকপাক ক'রে

আমাকে কি বলতে এলো তখন আমি কোনরকমে 'আচ্ছা, আচ্ছা' বলে ওকে কাটিয়ে সামনের দিকে পা ফেলতে লাগলাম।

ভাড়া আদায়ের মত ছ্যাঁচড়া কাজ আর নেই। কিন্তু সেজন্যে নয়। আমার বাড়ির নীচুতলার ভাড়াটেরা একের নম্বরের—, সে যাক, যেমন নোংরা তেমনি বিশ্রী, সেও যাক, কিন্তু একটা ব্যবস্থা না করলে...অথচ জিনিষটা এমনি যে কোন ব্যবস্থা করার কল্পনা পর্যন্ত অসম্ভব... এটা একটা যাকে বলে মনের ব্যাপার,... একটা অস্বস্তি...কতোদিন ভেবেছি আমার কি, আমি পৃথিবীতে ভাড়া আদায় করবার জন্যে জন্মগ্রহণ করেছি। চুটিয়ে ভাড়া আদায় করে যাবো, কিন্তু..., ঐ কিন্তুটাই একটা পেরেকের মতো খোঁচা মারে...যেমন প্রতিবারই হয়, যেমন এখনো হচ্ছে ..যতোই বাড়ির কাছাকাছি আসছি, কি রকম যেন হয় .., ভয়ে ভয়ে থাকি... যদি ফের দেখে ফেলি.. জানি, না দেখেও উপায় নেই ..আমার এই চোখ দুটো বড় বেশি নির্লজ্জ...

'আসুন।' নির্ঘাৎ পরিতোষ সাহার চাঁচা, অবর্ষ গলা। আমার বাড়িরই ওপর-তলার শাঁসালো ভাড়াটে। এখানে, এই ঘুপচি মতন ঘরেই শুর অপিস। এটা ভাড়া নিয়েছেন। আসল দোকান কাঠের হুড়কোটা সরালেই একেবারে মাটির নীচ অবধি। ওখানে থরে থরে চিটেগুড়ের টিন সাজানো। আমি তাকালাম পরিতোষ সাহার দিকে। একদিকের ভুঁড়ি হেলিয়ে পরিতোষ সাহা তিনটে ফোন নিয়ে লোফালুফি করছেন। জানি সারা বাংলা জুড়ে শুর খেলা।

ফোনে কথা বলতে বলতেই 'নিন, চা-টা খেয়ে নিন', এইটে পরিতোষ সাহার নিজস্ব, ভাড়া চাইতে এলেই সাহা মশাই-এর চা খেতেই হবে। উনি বলেন, 'আপনি আমার মালিক। আপনাকে চা খাইয়ে আমার পুণ্যি। তার ওপর আপনি হচ্ছেন জাতে বামুন। একটু এদিক-ওদিক হলেই ওরে বাপরে, আপনার মুখ দিয়ে ভক্ ভক্ করে আগুন বেরুবে না? তখন কি আর রক্ষে আছে। এই ব্যবসা যা আপনার দয়ায় করে খাচ্ছি, তাও লাটে উঠবে। গণেশ ওল্টাবার আগে আমিই উল্টে যাবো।'

উত্তরে বিনয়ে গলে গিয়ে 'এসব কি বলছেন, এসব কি বলছেন' বলে খোশা-মুদে রামপ্রসাদে হতে পারি না। এসব ক্ষেত্রে অন্য অন্য দিন যা করি, একটু হাসি শুকনো মুখে সাজিয়ে তুলি, তাই করলাম, আর বাস, উঠে পড়লাম, কেন না সেই অস্বস্তিটা...সেটা তাড়াতাড়ি মিটে যাওয়াই ভালো..,অন্যের কাছে বাড়াবাড়ি মনে হলেও কার যে মনে কখন কি লেগে যায়...কি বিশ্রী আর বেয়াদপ...যেন ঘুমন্ত মানুষের কানকে লক্ষ্য করে একটা কেন্নাই তার শরীরের সমস্ত কলকব্জা নিঃশব্দে বাজাতে বাজাতে ধীরে ধীরে কিন্তু অভ্রান্ত গতিতে এগিয়ে আসছে... এগিয়ে আসছে...এগিয়ে এলো, অথচ তার বিরুদ্ধে কিছুই করা যায় না। এসব ক্ষেত্রে বাড়ির মালিকের স্বপক্ষে কোন যুক্তিই বিশেষ নেই, কিন্তু তার জন্যে অস্বস্তিটা ত' নাকচ হয়ে যাচ্ছে না। ব্যাপারটা অবশ্য ভাড়া-টাড়া ফেলে রাখার ব্যাপার নয় কিছু, আর ফেলে রাখলেই বা কি, আজ-কাল তা' আবার সবেতেই পার্টি, শালা চা খাচ্ছি তাতেও পার্টির আরশোলা ভাসছে, ভাড়াটে দোষী কি নির্দোষ তা কেউ দেখবে না, লোকে চায় ফেনা, উত্তেজনা, ঐ ত' দেখলাম, একবার সেলামি নিয়েছিলাম, অমন কতোবারই ত' নিয়েছি, কে না নেয়, সব শালা ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির-দের আমার জানা আছে, বাস, উপলক্ষ্য জুটে গেল, কেউ চুল ছাঁটছিলো, কেউ ছেঁটে দিচ্ছিলো, সব ফুটপাতে দুদ্দাড় জুটে গেল। সেলামি দিয়েছে। নিয়েছি। ব্যাপার ত' এই। কথাটা যেই না চাউর হয়ে গেল, সে কি রে রে কান্ড, 'শালাকে পিটিয়ে লাস বানিয়ে দে', বাপ মা তুলে বিকট অংগভংগী সহ চীৎকার আর সিটি আর ধুনুচি নৃত্য, তা ছাড়া সোডার বোতল, রড, স্তূপাকার ইট, বোম-টোমও দু-চারটে যার নাম পাবলিক ধোলাই, তবু যে কিভাবে বেঁচে গিয়েছিলাম সেদিন...সে যাক, কিন্তু এটা মানে যার কথা বলছি, যতোই বাড়ির কাছাকাছি আসছি...ততোই বেড়ে যাচ্ছে... চোখে না দেখলেই হয়...সেই দুঃস্বপ্নের মতো যা প্রতিরাত্রেই হানা দেয়, তার বিরুদ্ধে ঘুমন্ত মানুষের যেমন কিছুই করার থাকে না, জেগে থেকেও না, অথচ দুঃস্বপ্নটা আসে...প্রতিরাত্রেই আসে..., আসে...

সাহা মশাই-এর গোলা পেরিয়েই বাড়ি। হ্যাঁ, আর একটা বাঁক পার হলেই আমার বাড়ি। পেনে তিনকাঠা জমির ওপর প্রকান্ড সিন্দুকের মত একটা জবর-জং দাদুর আমলের বাড়ি। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়া, মাথার দিকে বেশ উঁচু, ধ্বসের গম্ভীর রঙের বাড়ির মধ্যে পঞ্চাশ বছরের পুরোনো অতীত আর কাদের যেন অহংকার বংশপরম্পরায় আজো টিকে আছে। আমার বাড়ি। এখানে এখন ভাড়া বসাই আমি। ভাড়া আদায় করি আমি। বাড়ির জন্যে টেক্স দিই আমি। বাড়ি মেরামত করি আমি। এ বাড়ির সমস্ত ইঁটে, পাথরে, লোহা-লক্কড়ে আমি ছড়িয়ে আছি। এ বাড়িটা আমার। এ কথাটা ভাবতে আমার আনন্দ।

রূপ আর ব্যবহারের জন্যে নানা মডেলের আলাদা ধরনের চোখ ঝলসানো বাড় আছে। আমার সে সব ভালো লাগে না। বৃদ্ধ চেহারার, স্বাভাবে গম্ভীর আমার পিতামহের বয়সী এই বাড়িটাই আমার গর্ব।

বাড়িটাকে ভালোবাসি, তবু একথা-টাও না ভেবে পারি না, কার এমন মতিচ্ছন্ন হয়েছিলো এমন একটা বদখত জায়গায়, একদিকের ফুটপাতে হাইড্রেন্ট থেকে ঘোলা গংগার জল উপচে পড়ছে, রাস্তার আর এক মোড়ে চিরস্থায়ী খুটির মত সর্বদাই দু-তিনটে দশাসই মোষ, অন্টগ্রহর একটা বাড়ি থেকে কান-ফাটানো 'রামা হো রামা হো' তারস্বরে চীৎকার আর কোথা থেকে ঝন্‌ঝন্ করে কাদের খঞ্জনী বেজেই চলেছে, বেজেই চলেছে বিশটা হাতে, গলির এখানে-সেখানে থ্যাবড়া থ্যাবড়া এ্যাতোখানি গোবর, আর এসবের মাঝখানে এই প্রকান্ড, পরিকল্পনাহীন, জবরং জং বাড়ি, কার এমন মতিচ্ছন্ন হয়েছিলো এখানে, এই পরিবেশে এ বাড়ি তৈরি করার!

চোদ্দ ঘর ভাড়াটে ওপর নিচে মিলিয়ে। নানাধরনের তারা। কেউ বেরুচ্ছে ভোর চারটেয়। কেউ বেরুচ্ছে ন'টায়। যার যেমন ধান্দা। কেউ রেলের ইঞ্জিনে বেলচা ঠেলে। কেউ অপিসে কলম। কেউ রাস্তায় দৌড়ুর ঝান্ডা নিয়ে। কেউ ডান্ডা নিয়ে তাড়া করে। সব আছে ওরা এক মৌচাকে, একই মধুচক্রে।

ওপরে যারা থাকে তাদের ঘরগুলো মোটামুটি ভালো এরকম একটা বাড়ির পক্ষে যতোখানি ভালো হওয়া সম্ভব। ইউনিভার্সিটির মাস্টার, দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক, পুলিশের ওপর মহলের কর্মচারী, এমনি সব ভারি ভারি লোক ওপরে। নিচুতলার ঘরগুলো মোটামুটি খারাপ এরকম একটা বাড়ির পক্ষে যতো-খানি খারাপ হওয়া সম্ভব। এখানে থাকে ট্রাম কন্ডাক্টর, নোতুন বাজারের তরকারীঅলা, রং-মিস্ত্রী, বিড়ি-মজুর, ফুটপাতের ফেরিঅলা.... এই সব। এমন একখানি বাড়ির মালিক হয়ে অনেক দৃশ্য আমাকে দেখতে হ'ল। অনেকেরই এক-একটা জেনারেশন এখানে কেটে গেছে। যাবেই ত'। কে কোথায় যাবে এ বাজারে? ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই। সুতরাং যে যেখানে মাথা গুঁজেছে সে সেখান থেকে আর নড়ে না। ঐ যে গীতাদি। হাতে একটা কাটা টিন। মাড়োয়ারীরা কোথায় যেন খিচুড়ি খাওয়াবে। চল্লু এখন গীতাদি। অথচ দশ বছর আগেও কি এসব ভাবাও যেত। সেদিন ওদের কতো লোকজন, কতো বন্ধুবান্ধব, কতো বোতলের ছড়াছড়ি, কতো রেসকোর্সের গল্প, তারপর যেই কাকাবাবু চোখ বুজলো, বাস, সব ফুটে গেল, তা আমি...আমি কি করবো, আমি এদের

একেবারে তাড়িয়ে দিতেও পারি না, হাজার হোক এদের অবস্থা একদিন ভালোই ছিলো, ওদের ভাই নাবিয়েও দিই নি নিচেতে, ওরা বেশি ভাড়া দিতে আর পারছে না বলে নিজেরাই একদিন ওপরতলার ঘর খালি ক'রে নিচুতলায় চলে গেল, অবশ্য আমি কিছু বলি নি, কেন না আমার হাত-পা বাঁধা, ওরা যখন সিঁড়ি দিয়ে নেবে গেল, তখন আমি সেখানে ছিলাম, আমি শুধু মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম।

কিন্তু মুসকিল হয়েছে দ্বিজদাসকে নিয়ে। দ্বিজদাস অবশ্য এখন আর কর্তব্যের মধ্যেই নয়। নোতুন বাজারে তরকারী ওজন করতে গিয়ে বাটখারা সমেত ওজনদাড়ি দ্বিজদাসের হাতে যেই পড়লো তারপর থেকেই ওর প্যারালিসিস। একদিকের অংগ নড়াতেই তেমন পারে না। ওদের সংসারটা এখন ওর বৌ-ই চালায়।

একটা ছেলে নাকি একদিন মিছিলে বেরিয়ে ছিলো। তারপর টিয়ারগ্যাসের ধোঁয়ায় সে যে কোথায় হারিয়ে গেল আর তার খোঁজ পাওয়া যায় নি। আর একটা, বড়োটা, সেটা চোর। এই সেদিন কার বাড়িতে বাল্ব চুরি করতে গিয়ে বেষড়ক ধোলাই খেয়ে এসেছে।

পরে 'মহামায়া আর্ট' সেলুনের লোক আমাকে গলা নাবিয়ে একদিন চুপি চুপি বলেছিলো, 'কাউকে বলবেন না। ও বাল্বচুরির গ্যাং-এ ভিড়েছে অনেকদিন। আমি মশাই জেনেও বলি নি। পাছে আমাকেই একদিন না একদিন হাফিজ করে দেয়। ওরা মশাই সব পারে।'

ঠিক যে ওরা দিনের পর দিন ভাড়া ফেলে রাখে তা' নয়। সত্যি বলতে কি, দু-চারদিন দেরি করলেও ভাড়া যাকে ফেলে রাখা বলে তা' ওরা কখনো করে নি। কিন্তু বরাবরই, আমার কেমন যেন মনে হয়েছে একসঙ্গে বেশ ক'মাসের ভাড়া গোঁথে ওরা একদিন আমার অজান্তে, সেটা খুবই সম্ভব, কেন না আমি ত' আর এখানে থাকি না, থাকি হুগলীতে, মাসে একবার আসি, তা'ও ঘণ্টাখানেকের জন্যে, পিট্টান দেবে, তখন হাজার কোর্ট-ঘর করেও আমি কিছু করতে পারবো না, যদি বা এ্যাতো বড়ো কোলকাতার মধ্যে কোথাও ওদের খুঁজে পাই, শেষ পর্যন্ত ওদের সম্পত্তি বলতে ত' ছেঁড়া তোষক, তুলোওঠা বালিস, দুটো একটা ফুটো বালতি, একটা কানা ফাঁসা কলসী আর রং-ওঠা একটা টিনের তোরঙ্গ, এই সম্পত্তি ক্রোক করেই বা কি ফায়দা উঠবে?

আমার বাড়ির ঐ যে ঘরটা নিচেকার, এক কোণে একঘরে হয়ে রয়েছে, সাতজন্মে যে ঘরের মধ্যে আলো ঢোকে না, দু-চারটে কি ইঁদুরের গর্ত নেই, এর ওপর দোতলার পাইখানার জল চুইয়ে চুইয়ে পড়ে ঠিক ও-ঘরটার সামনে, কাঁচা কয়লার ধোঁয়া থম মেরে থাকে অনেকক্ষণ, যাও বক্সে শুনতে পায় না, যেন বোবা-কালা, একটা জানলা ফোটারও জায়গা নেই, শুধু একটা দরজা, তা'ও কোনদিন ভেজানো দেখি নি, সর্বদাই হাট করে খোলা, হা হা করছে দারিদ্র, ঐ ঘরটাই যেদিন বেছে নিলো দ্বিজদাস আর তার বৌ আর ওদের পেছন পেছন হাফ-ল্যাংটো, হাত-পা কাঠি কাঠি, গায়ে খড়ি, মাথায় পোড়া খড়, কুচ্ছিত একপাল যখন সেই অন্ধকূপের মত ঘরটায় ঢুকলো, তখন সত্যি বলছি, উৎকট ঘেন্নায় বমি করে ফেলতে ইচ্ছে করছিলো আমার।

কিন্তু আমারও উপায় নেই। আমি যে এ বাড়ির মালিক। আমার এ ঘরটা যতোই বাজে হোক, ভেতরটায় যতো গুমোটই হোক, কোণে কোণে ঝুলুক যতো মাকড়সার ঝুল আর অন্ধকার, এর একটা গতি হলে আমার খারাপ লাগার কথা নয়। বাড়ির মালিক যখন হয়েছি তখন বাড়ির মালিকের নিয়মটা আমাকে মানতে হয়। বাড়ির মালিক হিসেবে আমি শুধু দেখবো আমার কোন ঘর খালি পড়ে আছে কিনা। সব ঘর ভরে গেলে আমার ত' খুশি হবারই কথা।

আমি তবু চাই নি এইসব লোক, এই ট্রাম কণ্ডাক্টর, গাড়ি রং করার লোক-জন, কোথাকার কোন্ ফেরিঅলা...এরা নিচেকার ঘরগুলো ভরিয়ে তুলুক। দ্বিজদাস ঠিক এসব লোকদের সঙ্গে করে আনে নি। তবে আমার কেমন যেন মনে হয় ওরা দ্বিজদাসকে দেখেই এ বাড়িতে ঢোকার সনদ পেয়েছিলো।

ট্রাম কণ্ডাক্টর বা রং-মিস্ত্রী ওরা নিচুতলায় থাকলেও ওদের ঘরগুলো ততো খারাপ নয় আর তা' ছাড়া ওদের অবস্থাও দ্বিজদাসদের থেকে কিছু ভালোই মনে হয়, যদিও ওদেরও আমি ঠিক পছন্দ করি না। সবই বলতে গেলে এক ক্লাসের, যাকে বলে ছোটলোক। কথা বলে চড়ে চড়ে, আজকাল এদের যা' বাড় বেড়েছে, সে আর কহতব্য নয়।

দু' টাকা ভাড়া বাড়িয়েছিলাম ঘরটা হোয়াইটওয়াশ করে ফুটোফাটা মেরামত করে দিয়েছিলাম বলে। তা' ঐ কণ্ডাক্টরটা, বেটা আবার কানা, শুনেছি ও আবার ইউনিয়ন করে, যতসব ইনক্লাব জিন্দা-বাদের দল, আমাকে এই মারে ত' এই মারে, এমন রুখে এসেছিলো চোখমুখ লাল করে যে সমস্ত ভাড়াটেদের সামনে সে এক ফ্যাসাদ, কিন্তু তবু ওদের দেখে গাটা ঘিন্‌ঘিন্ করে না কখনো। গম্ভীর হয়ে নিজের মর্যাদা নিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াই। ওরাও গম্ভীর হয়ে ভাড়া মিটিয়ে দেয়। কিন্তু দ্বিজদাসরা, এমন জন্ম-হায়রে আমি কখনো দেখি নি। একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমি অনেকদিন দেখেছি। সকাল দশটায় গিয়ে তখনো যা' দেখেছি, দুপুরে একটায় অবিকল সেই দৃশ্য। বিকেল পাঁচটায় সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি।

দ্বিজদাস ওর কাঁকরা, জংধরা চেহারা নিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়েছে। যেন অনেকটা পথ ওকে বস্তা ঘাড়ে করে আসতে হয়েছে, তাই কুঁজিয়ে গেছে। যেন একটা বুড়ো ইঁদুর। উবু হয়ে বসেছে। সামনে ভাতের থালা। সেদিকে তার চোখ দুটি শুধু জ্যান্ত। ভন্ ভন্ করে সামনে খাটা নর্দমা থেকে উঠে আসছে মাছি। ঘিরে ফেলেছে ভাতের থালা একপাল শকুনের মত। ও হাত দিয়ে তাড়াচ্ছে না, পাছে সময় চলে যায়। গোগ্রাসে খেয়ে চলেছে, খেয়েই চলেছে।

দ্বিজদাসের বৌকেও দেখেছি অমনি-ধারা। ঘোমটা-খোলা মুখ। মুখের ওপর মরচে পড়া রেললাইন গেছে শিরা উপ-শিরার। আধোয়া মেঝের ওপর ব্যাটা-ছেলের মত বসে একটা মূর্তিমান দুঃস্বপ্নের মত ক্রমাগত খেয়েই চলেছে, খেয়েই চলেছে।

কখনো এও দেখেছি সিঁড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে, ওদের মেয়েটা, আদলে গা, দ্বিজদাসের বৌটা ওর চুলের উকুন মেরে দিচ্ছে আর মেয়েটারও মা-বাপের মতই কোনদিকে চোখ নেই, চোখ দুটো শুধু ভাতের থালার দিকে ড্যাব ড্যাব করে জেগে আছে, ও ক্রমাগত খেয়েই চলেছে ওর রাক্ষুসে খাওয়া। নোংরা দেয়াল থেকে ঝুপ ঝুপ আস্তর খসে পড়ছে। মুখের সামনে ঝুলছে মাকড়সার জাল। কড়িকাঠে জমে আছে ঝুল। আরসোলা ছোটাছুটি করছে। আর এরই মাঝখানে ওরা খেয়ে যাচ্ছে কখনো পালা করে, কখনো একা একা। সকাল, দুপুর, বিকেল আর রাত্তির যখনই আসি, যখনই আমার সময় হয় তখনি দেখি অনবরত, অফুরন্ত সেই খাওয়া, ইতর আর অশ্লীল সেই খাবার ভংগি, যেন পৃথিবীতে খাওয়া ছাড়া আর কিছু নেই ওদের ছেঁড়া-ন্যাকড়া-পরা, তালিমারা জীবনে। যখনই ভাড়া নিতে গেছি ততোবার এ দৃশ্য আমাকে দেখতে হয়েছে। বাদও গেছে হয়তো অনেকবার। সেটাই ত' স্বাভাবিক। তবু যখনি আসি, যে কোন সময়ে, তখনি আমাকে প্রস্তুত অন্ততঃ থাকতে হয়েছে এইবার বুঝি দেখবো সেই দৃশ্য, হঠাৎ দেখে ফেলে মাথাটা কিরকম ঝিম ঝিম করে উঠবে, মনে হবে গলায় আঙুল দিয়ে বমি করে ফেলতে পারলে ভালো হত।

এমন কি, এই সেদিনো, যেদিন থেকে দ্বিজদাসের প্যারালিসিস হল, ও অবশ্য এখন একটু ভালো, ভালো মানে একটু

ইতর বিশেষ, কোনরকম চালাকিরা করতে পাচ্ছে অতিকষ্টে, কিন্তু আমি সেই রোগের প্রথম দিনের কথাই বলছি, গেছি ভাড়া আনতে, ভেবেছি ওদিকে তাকাবো না, কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ ডানদিকে আমার মনের প্রবল ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ঘুরে গেছে মাথা, দেখেছি, দ্বিজদাস আর উবু হয়েও বসতে পারছে না, চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে, ডান হাতখানা আড়ষ্ট, তুলতে পারছে না, বাঁ হাতখানা কোনরকমে থালা থেকে ভাত মুখের কাছে আনতে গিয়ে বুকে, নাকে, মাথায়, চোখে ছড়িয়ে পড়ছে ভাত, কয়েকটা দানা হয়তো মুখে যাচ্ছে, অতো কষ্টের মধ্যেও মুখ নেড়েই চলেছে দ্বিজদাস, মুখ নেড়েই চলেছে। আমি অনেকদিন এদের সম্বন্ধে ভাববার চেষ্টা করেছি। এসব কথা ত' কাউকে জিগ্যেস করতে পারি না। ফস্ করে কে কি মনে করে বসে। তা' ছাড়া প্রায় সবাই 'কে জানে মশাই' বলে মুখের সামনে বিকট একটা হাই তুলে ফেলবে। তাই কাউকেই জিগ্যেস না করে একা একা ভাববার চেষ্টা করেছি এরা এ্যাতো ভাত জোটায় কি করে। বড় ছেলেটা ত' চোর, চোরাই মাল চালান করে বা জমা রাখে, এখন নাকি রাত্রে চুরির ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছে, পার্ক স্ট্রীটে মদ-পাড়ার বাবুদের মোটর, মোটর সাইকেলের পার্টস চুরি এখন ধরেছে, তা' ধরুক, তাতে আর কতো আয়, রোজ রোজই ত' আর দু' দশটাকা ঘরে আসছে না, তাছাড়া পুলিশের সঙ্গেও একটা বন্দোবস্ত, সেটাও রাখতে হয়, মাস গেলে চুরি ছেনতাই-এর পয়সা কতোই বা হাতে থাকে, তা'তে কতোটুকু হয়, বাপটা ত' মরাই বলতে গেলে, আয়ের পথটা কোথায়, শুধু আছে মা, হ্যাঁ, সে তিন বাড়ি ঝিগিরি করে, ব্যস, হয়ে গেল, কোথা থেকে আসে এ্যাতো ভাত, এ্যাতো সকাল, দুপুর, বিকেল আর রাত্তিরে খাবার ধুম, অবশ্য আমি শুধু ওদের ভাতই খেতে দেখেছি, না একটু ডাল, না একটু তরকারী, ভিজে সিঁড়ি দিয়ে ওদের ঘরের ঝাপসা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে যতোটা দেখা যায়। পরে অবশ্য জেনেছি অন্য কথা। আমি ত' আসি এ বাড়িতে একবার। কখনো সকাল। কখনো দুপুর। কখনো বিকেলে। ঐ একবারই ওরা খায়। যখন যে সময় জোগাড় করতে পারে। আর সমস্তটা ভেবে কি রকম যেন হয়েছে মনের ভেতর।

একটা অস্বস্তি, ঠিক সেই দুঃস্বপ্নের মত যা প্রতিরাত্রেই হানা দিয়ে ফেরে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যার বিরুদ্ধে কিছুই করবার নেই, জেগে থেকেও না, অথচ যে আসে...আসে...প্রতিরাত্রে আসে..., সেই কেষ্টাইটা...মস্তবড় শরীর, শরীরে অনেক কলকব্জা...আমার কানটাকে লক্ষ্য করে... ধীরে কিন্তু অভ্রান্ত গতিতে এগিয়ে ...এগিয়ে...আরো এগিয়ে...না। উঠিয়ে দিতে হবে এদের। এরকম অলক্ষুণে ভাড়াটে কিছুতেই রাখা চলবে না। কিন্তু কি যে করি, কোন একটা কারণ, যে কোন ধরনের একটা কারণ আমার খুবই দরকার, কেউ যদি দিতে পারতো এদের উঠিয়ে দেবার একটা কারণ, ভাড়া ফেলে রাখে না, ঠিক ঠিক দিয়ে দেয় অথচ ওদের এই খাওয়া, ওঃ, অমানুষিক, এ আমি সহ্য করতেই পারছি না আর।

...কিন্তু আমার বাড়ির সামনে এতো ভীড় কেন? কি আশ্চর্য, পুলিশ! পুলিশ কেন? আরো ত' সব অন্য লোকেদের বাড়ি আছে। তাদের বাড়ির সামনে ত' পুলিশ থাকতে পারে। কিন্তু বেছে বেছে আমার বাড়ির সামনে কেন? কি ব্যাপার? পাশ কাটিয়ে দ্রুত ভেতরে ঢুকলাম। আমি ত' কারুর পাকা ধানে মই দিই নি। কি হল ব্যাপারটা? উঠোনের ওপর ডাঁই করে রাখা ওরেলার এঁটো, বাসি বাসন। কলের সামনে পর পর রাখা কাটা টিন, বালতি, মগ। রেলিং থেকে ঝোলানো ভিজে সাড়ি। খোপে খোপে পায়রা। ঘরে ঘরে মানুষ। এসব ঠিকই আছে। মাঝখান থেকে সবাই বেশ চুপচাপ হয়ে গেছে। সমস্ত বাড়িটা যেন ইলেকট্রীক শক্ খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ছোটরা পর্যন্ত দাপাদাপি করছে না। শুধু দ্বিজদাসের ঘর থেকে একটা কচি ছেলের বুকফাটা কান্নার রেশ উঠছে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে।

ঐ কান্নার রেশ অনুসরণ করতে গিয়ে হঠাৎ ভূত দেখার মত দ্বিজদাসকে দেখলাম হাঁটুর ওপর থুতনিটা রেখে যেন একগলা জল থেকে কোনরকমে মাথাটা ভাসিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে। চোখ দুটিতে এক অস্বাভাবিক দৃষ্টি। অন্ধকূপের মত ঘরটার পাতলা অন্ধকার ভেদ করে সে দৃষ্টি যেন চলে গেছে অনেকদূরে। আমার দিকে যখন তাকালো দ্বিজদাস, তখন আমাকেও সেই তীব্র, অস্বাভাবিক চাউনি যেন বিদ্ধ করলো, অনেকটা যেন আমার কাছে, সকলের কাছে কি একটা কৈফিয়ৎ দাবি করছে, যেন বিশেষ কোন অপরাধ আমাদের নিষ্করুণভাবে ওর কাছে ধরা পড়ে গেছে। শুনলাম, আজই, বেলা দশটার সময় দ্বিজদাসের বৌ আত্মহত্যা করেছে। কিভাবে ব্যাপারটা ঘটে, এতোগুলো লোকের সামনে ঘটলো কি করে, এসব জেনে কি হবে? তবু যেটুকু জানা গেল তা হচ্ছে—অনেকদিন থেকেই দ্বিজদাস নাকি তার বৌকে পরের বাড়িতে কাজ করবার জন্যে কুবুদ্ধি খোঁটা দিত। নোংরা ইংগিত করতো কারণে অকারণে। কিন্তু তরুণ কাদের বাড়ির একটা ছেলেকে জড়িয়ে যখন খারাপ কথা বলল দ্বিজদাস, যে ছেলেটা আবার দ্বিজদাসের বৌ-এর বড়ছেলের সমবয়সী, তখন আর ওর বৌ সহ্য করতে পারলো না।

সমস্ত সংসারটা যে মাথায় করে এ্যাতোদিন রাখলো সে আর মাথা ঠিক রাখতে পারলো না। হঠাৎ মাথা খারাপ করে বসলো।

ঝঞ্ঝাট এমনি করেই জোটে। একেই বলে বরাত। মাঝখান থেকে আজ আমার ভাড়াটা নির্ঘাৎ মারা গেল। আর একবার যদি ভাড়া না দিতে পারে ত' সে ভাড়া আর উদ্ধার হবে না। মাস শেষ হয়ে আজ দু'তারিখ। ভাড়া দেবার দিন পার করেই এসেছি। এদিকে দিতে না পারলে চাওয়াই যাবে না। সবাই ভাববে, দ্যাখ, কি চামার। বাড়িঅলা হলেই কি কসাই হতে হয়। লোকটার কি চক্ষুলজ্জারও বালাই নেই? দুকান কাটা? তাছাড়াও আরও কত রসালো ব্যাখ্যান।

এরকম বিশ্রী, বিরক্তিকর অবস্থাতেও, আশ্চর্য, মনটা হঠাৎ মোমের মত গলতে শুরু করেছে। হ্যাঁ, নির্ঘাৎ, সেই অস্বস্তি, সেটা আর থাকবে না। কেন না ঠিকমতো বলতে গেলে বৌটাই ছিল রোজগেরে, বড়ছেলেটা ত' চোর, যেদিন জোটাতে পারলো সেদিন দেড়মুষে এমন খেল যে চৌয়াড়েকুর উঠিয়ে ছাড়লো, আর যেদিন জোটাতে পারলে না, সেটাই বেশি, সেদিন পেটে কিল মেরে উপোস যাবে। দ্বিজদাস ত' থেকেও নেই, অধিকাংশ সময়ই শুয়ে থাকে, ঐ বৌটাই তিন তিন বাড়ি গতরে খেটে, এগলি ওগলি গোবর জোগাড় করে, বাচ্চাটার সঙ্গে রাতভোর ঠোক্কা তৈরি করে ঠিক ঠিক ভাড়া গুণে যাচ্ছিলো, আর সেই যখন গত হল তখন কি আর ওরা এ-বাড়িতে থাকতে পারে, নিশ্চয়ই কোন বস্তি ফস্তিতে উঠে যাবে, মনে মনে এ সম্ভাবনাটা যতো উজ্জ্বল হতে লাগলো ততোই সেই দৃশ্যটা সেই মুহূর্তে আসি না কেন সকাল, দুপুর অথবা বিকেলে কি রাত্তিরে, ঐ অস্পষ্ট, ঝাপ্সা, কালিঝুলি মাখা অন্ধকূপটায় বসে ওদের সেই ভয়ংকর খাওয়া, মাছি উড়ছে ভন্ ভন্, ইঁদুর ছোটাছুটি করছে, মুখের সামনে কড়িকাঠ থেকে নেমে এসেছে মাকড়সার জাল, উঃ, অমানুষিক, কোনদিকে ওদের চোখ নেই, শুধু ডালা ডালা, শুকিয়ে খরখরে হয়ে যাওয়া ভাত, না একটু ডাল, না একটু তরকারী, ওরা আকণ্ঠ খেয়েই যাচ্ছে, মাঝখানে কোন কথা নেই, কোন হাসি নেই, কোন চীৎকার নেই, শব্দ যদি কিছু থাকে সে শুধু ভাত খাবার শব্দ, দেহের সমস্ত শক্তি, মনের সমস্ত একাগ্রতা চোখের ভেতর দিয়ে ভাতে এসে পড়ছে, ওরা বড় একটা কলাই-চটা থালাকে কেন্দ্র করে উবু হয়ে বসেছে, এ দৃশ্যটা ক্রমে ক্রমে আমার মন থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে, আর সেই অস্বস্তি যা রোজই থাকে, একটু

আগেও যা ছিল, এখন সেটা মনে হচ্ছে নেই, আঃ, আমি বেঁচেছি।

যে ঘটনাটা ঘটবেই তাকে একটু আগে থেকে দেখতে পেয়ে মনটা বেশ চাংগা হয়ে উঠলো। এ্যাতোক্ষণ পুলিশ-টুলিশ দেখে মনমরা হয়েছিলাম। এইবার যেন চোখ রোগড়ে উঠে বসলাম। কিন্তু গোটা বাড়িটা যেন কেমন হয়ে গেছে। সব স্ফূর্তি গা থেকে ঝরে গেছে। একটা ঘরে ঢুকেছে শোক, কিন্তু তার ছায়া পড়েছে সব ঘরে। শোক ঝুলে আছে হ্যাংগারের মত প্রত্যেকের রাঁকানো ভুরুতে। ঠোঁটে শোকের তীব্র গন্ধ। শোক ফাটা গলায়। নুয়ে পড়া কনুই-এর খাঁজে শোক। ছোট ছোট, কুচি কুচি কথায় শোক। এ্যাতো শোক, শোকে যেন সমস্ত বাড়িটা শূন্য চোখে তাকিয়ে আছে। আর আমি, আমার বুকে কিছুই জমে নি। কি জমবে? আমি যে বাড়িঅলা। বুকের ভেতরে বুক ছাড়া ত' আর কিছু নেই। আমার চোখেও কিছু জমে নি। কি জমবে? চোখের ভেতরে চোখ ছাড়া ত' আর কিছু নেই। আমি যে বাড়িঅলা।

এ রকম একটা শোকের বাড়িতে আমার খালি হাই উঠছে।

এ শোকের সঙ্গে আমার যে কোন সম্বন্ধ নেই এটা আমি সুনিশ্চিত জেনে গেছি। আমি পৃথিবীতে ভাড়া আদায় করতে এসেছি, চুপচাপ ভাড়া আদায় করে যাবো। পরের জন্য শোক করা আমার কাজ নয়। তবে হ্যাঁ, সৌজন্য আছে, ভদ্রতা আছে, কিন্তু সেগুলোও যতোটুকু না করলে নয় ততোটুকুই, সেটুকু করতে হবে বৈকি, কিন্তু তাতেও আছে রিকস্, যদি অতোটুকু ভদ্রতা আর সৌজন্যের সুযোগ নিয়েই মাথা চুলকে সামনে এসে দাঁড়ায়, 'এ মাসে ভাড়াটা দিতে পারলাম না, আসছে মাসে দু'মাসেরটা একসঙ্গে আর জামার আস্তিনের ভাঁজে চতুর হাসিটা গোপন করে, এরকম যদি অনেকেই একসঙ্গে মাথা চুলকোতে আরম্ভ করে, কেন না ও বাড়ির তলাকার ভাড়টে মানেই ত' আসলে জানোয়ার, 'কি কাজ করি, না, তরকারী বেচি', 'কি কাজ করি, না হাওড়া স্টেশনের বাইরে কাটা কাপড় বিক্রী করি আর পুলিশ দেখলে চোঁ চোঁ দৌড় মারি', 'কি কাজ করি, না লরীতে রং মাখাই', কি সব কাজ, যতো সব কুট ঝামেলা, সব ক'টা জুটেছে আমার বাড়িতে, কাজের যেমন ছিরি তেমনি যারা মানুষ সব...জানোয়ার...জানোয়ার সব...

সুতরাং যেমন প্রত্যেকবার করি, দোতলার পাশে একটা ছোট বারান্দা, সেখানে গিয়ে বসলাম রসিদ বইটা খুলে। পৃথিবীতে শোক আছে সত্যি, কিন্তু আমার কাজটাও ত' আছে।

চারদিক রডহ চুপচাপ, নিস্তব্ধ। চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলাম। এমন কতো অসংখ্যবার চেয়ার টেনে নিয়ে বসেছি, চেয়ার কখনো শব্দ করে নি। আজ, এখন চেয়ারটা শব্দ করে উঠলো। আমি চেয়ারটার দিকে তাকালাম।

'কই, নিয়ে আসুন।' আমার আবার বেশি সময় নেই।'

দু'একজন ভাড়াটে, যারা কাছে ছিল, তারা আমার কথা শুনে এমনভাবে চমকে তাকালো যেন এ ধরণের কথা এই তারা প্রথম শুনছে।

'কই?'

ওরা বিকেলের পড়ন্ত আলোয় কেমন অদ্ভুত ভাবে আমার দিকে তাকালো। দু'জন ভাড়া আনতেই গেল বোধহয় ভেতরে। একজন জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইলো একটা কুকুরের দিকে। আমি ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে, কুকুরটাকে দেখতে পেলাম। নর্দমার ভেতরে মুখ ডুবিয়ে কুকুরটা কি সব খাচ্ছে, এই দৃশ্যটির দিকে অমন নির্বিকার ভাবে লোকটার তাকিয়ে থাকার কি মানে তা খুঁজে পেলাম না।

'যান, ভাড়া আনুন।' একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠলাম।

'যাচ্ছি।' লোকটা চলে গেল, শুনতে পেল কিনা জানি না।

বারান্দার দিকে তাকালাম। বারান্দাটাকে অনেক বেশি শূন্য আর বিস্তীর্ণ মনে হচ্ছে। আসছে এক একজন করে ভাড়া দিতে। ওপরতলার ভাড়াটেদের কাছে ভাড়া নিতে আমি আসি না। ওরা মণিঅর্ডার করে ভাড়া পাঠিয়ে দেয়। আমাকে আসতে হয় এদেরি জন্যে।

যারা ভাড়া দিতে আসছে তাদের মণিবন্ধের ঠাণ্ডা শিরগুলো যেন দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট। উঁচু গোড়ালির জুতো পরে যে আরেকজন এলো ভাড়া দিতে সে তার বিশাল, নির্জীব চোখ দিয়ে আমাকে স্তম্ভিত করে দিলো। ক্রমশঃ আমার মনে হচ্ছিলো শোকটাই যেন এদের সকলের কাছ থেকে শক্তি সঞ্চয় করে করে নিজেই আমার এক অদৃশ্য অথচ অনিবার্য প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছে আর আমি প্রতি-মুহূর্তে একটু একটু করে হীন হয়ে যাচ্ছি, ছোট হয়ে যাচ্ছি। ওরা আসছে নীরবে। যাচ্ছে নতমুখে। তিন ভাঁজ লোহার পাতে ঢাকছে মুখ। সবাই যেন একদিকে। ওরা শোক পেয়েছে। আর একা আমি একদিকে। আমি শোক পাই নি। আর সেইজন্যেই শোকটাকে মনে হচ্ছে আদিম এক বিশাল, অদৃশ্য, নির্মম প্রতিদ্বন্দ্বী, আর ক্রমশই একটা হীনতা বোধ করছি, ঠিক কি কি কারণে যে তখনো ঠিক বুঝি নি, কিন্তু কি রকম যেন লাগছিলো, একটা যেন কূট ষড়যন্ত্র কোথাও যেন চলেছে, তার জালে একটু একটু করে জড়িয়ে যাচ্ছি, ক্রমশই জড়িয়ে যাচ্ছি...ক্রমশই...

ভাড়া নেওয়া একরকম হয়ে গেছে, দু'একজন পরে দেবে বলেছে, বেশ, তাই দিক, উঠলে হয় এইবার, বসে থাকতে কিরকম যেন লাগছে, ভালো লাগছে না, ভালো লাগছে না, এমন সময় ঘং ঘং, ফের আবার ঘং ঘং, পুরনো একটা কাশির প্রতিধ্বনি উঠলো নিচেকার নোনাধরা সিঁড়িতে, দোতলার জানলা দিয়ে দেখলাম একটা প্রেতের মতন একহাতে বুক চেপে, আস্তর-খসা দেয়াল হাতড়াতে হাতড়াতে সেই অন্ধকূপের গর্ভ থেকে উঠে আসছে দ্বিজদাস।

সিঁড়ির বাঁকে দ্বিজদাস অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি উদগ্রীব হয়ে শুনছি সেই কাশি ঘং ঘং ঘং সারা সিঁড়িতে যার প্রতিধ্বনি, ধীরে ধীরে একটা কোঁয়াং এর মত উঠে আসছে দ্বিজদাস, পায়ের অ-মান শব্দটা এবার স্পষ্ট হল, চোখের ফ্রেমে সমস্ত শরীরটা ওর ধরে গেল, একটু কুঁজো হয়ে যন্ত্রণায় কেনরকমে পা ঘস-টাতে ঘসটাতে, মুখের একদিকটা বেঁকে গেছে, সেদিকের চোখটায় এক অসম্ভব ক্রোধ, আর অন্য চোখে যেদিকটায় মুখটা স্বাভাবিক সেখানে এক অসম্ভব ঘেন্না, সামনে এসে দাঁড়ালো দ্বিজদাস, তারপর একটু থেমে কংকালসার হাতখানা সামনে প্রসারিত করে দিলো। সেই হাতের ফাঁকে তখনো কাঁপছিলো চড়ুই পাখির মত দু'খানা ময়লা দশ টাকার নোট।

সর্দিবসা, ঘড়ঘড়ে গলায় ভয়ংকর-ভাবে দ্বিজদাস যেন এ পৃথিবীর শেষ রায় আমার নীতিহীন, বিবেকবর্জিত, লোভী মুখটার দিকে চাবুকের মত ছুড়ে মারলো, 'আমারা গরীব হতে পারি, কিন্তু ভাড়া মেরে দিই—না কখনো।'

যে শংকাটা আমার একটু আগে শুরু হয়েছিলো, বুঝতে পারলাম, এইবার তার চরম মুহূর্ত এসে গেছে, আমি যেন এটার জন্যই এতোক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম। নিজেকে কখনো এর আগে এতো ছোটো মনে হয় নি। এতো হীন মনে হয় নি। আজ সকালেই না ওর বৌ গলায় দড়ি দিয়েছে? কাল দ্বিজদাস কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে, দ্বিজ-দাস তা জানে কি? সে নিজেও প্যারা-লিসিসের রুগী, থেকেও এই, এখনো কথা বলার উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে বুকে হাত চাপা দিয়ে, এতো শক্তি ও পেল কোথায় আমাকে ছোট করার, হীন করার?

আমার আর কিছু ভাবার মত তখন অবস্থা ছিল না আর শুধু এইটুকু বুঝতে পারছিলাম, যতো শিগগির সম্ভব আমাকে যেতে হবে, এখানে আমি অতিরিক্ত, অবান্তর, অনধিকারী, আমি যেন সিঁদ কেটে

[শেষাংশ ১২৯ পৃষ্ঠায়]

বনস্পতির মৃত্যু

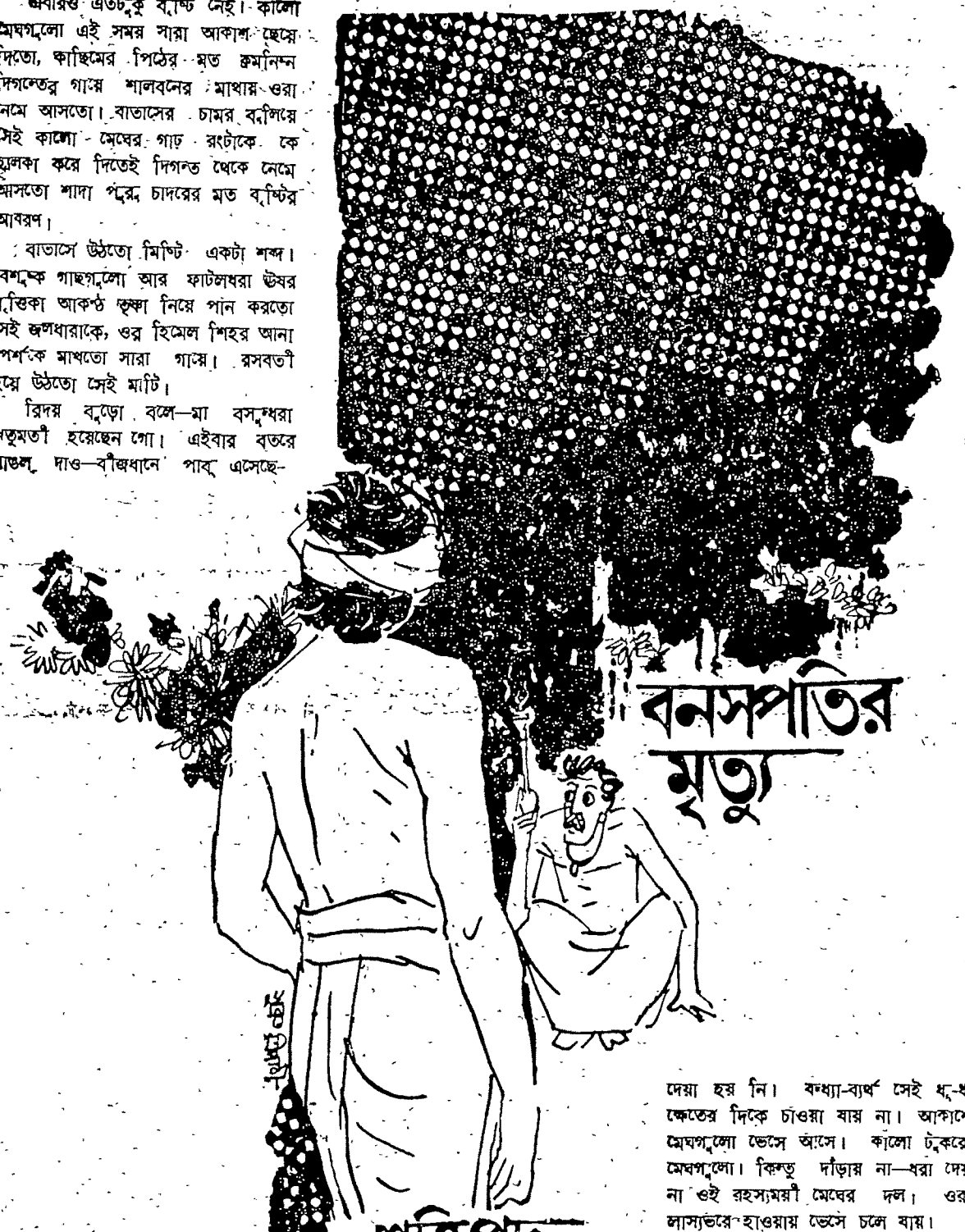

শক্তিপদ রাজগুরু

এবারও এতটুকু বৃষ্টি নেই। কালো মেঘগুলো এই সময় সারা আকাশ ছেয়ে দিতো, কাছিমের পিঠের মত ক্রমনিম্ন দিগন্তের গায়ে শালবনের মাথায় ওরা নেমে আসতো। বাতাসের চামর বুলিয়ে সেই কালো মেঘের গাঢ় রংটাকে কে হালকা করে দিতেই দিগন্ত থেকে নেমে আসতো শাদা পুরু চাদরের মত বৃষ্টির আবরণ।

বাতাসে উঠতো মিষ্টি একটা শব্দ। বিশুষ্ক গাছগুলো আর ফাটলধরা ঊষর মৃত্তিকা আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে পান করতো সেই জলধারাকে, ওর হিমেল শিহর আনা স্পর্শকে মাখতো সারা গায়ে। রসবতী হয়ে উঠতো সেই মাটি।

রিদয় বুড়ো বলে—মা বসুন্ধরা ঋতুমতী হয়েছেন গো। এইবার বুতরে লাঙল দাও—বীজধানে পাবু এসেছে-পাখনা দিয়ে জমিতে জল বেঁধে রুয়ে দাও পেত্থম আষাঢ়েই, দেখবা ধানের বাহার।

কিন্তু এবার সেই মেঘগুলো কোথায় হারিয়ে গেছে। আষাঢ় শেষ হয়ে গেল। ক্ষেতে বীজধানগুলোও বড় হয়ে গেছে; ষাঁড়িয়ে যাচ্ছে। বেশী বড় হয়ে গেলে তার তেজও কমে যাবে।

ওদিকে বৃষ্টি নেই। জমিগুলো সবই পড়ে আছে। সার-গোবর ছিটিয়ে লাঙলও দেয়া হয় নি। বন্ধ্যা-ব্যর্থ সেই ধূ-ধূ ক্ষেতের দিকে চাওয়া যায় না। আকাশে মেঘগুলো ভেসে আসে। কালো টুকরো মেঘগুলো। কিন্তু দাঁড়ায় না—ধরা দেয় না ওই রহস্যময়ী মেঘের দল। ওরা লাস্যভরে হাওয়ায় ভেসে চলে যায়।

রোদে ধুঁকছে গরুগুলো। মাঠ থেকে রোদের তাড়ায় ওরা বাগানের ছায়ায় এসে জুটেছে। যতদূর চোখ যায় ওই নিষ্করুণ শূন্যতাই ফুটে ওঠে। তেঁতুলগাছের ঘন পাতার আড়ালে একটা বক বার বার ডেকে চলেছে কি ব্যর্থ আবেদন নিয়ে।

—জল হোক! জল হোক!

কিন্তু কোথাও সেই শীতল স্পর্শ নেই। নেই পূর্ণতার সম্ভাবনা। মানুষগুলো এরই মধ্যে খাওয়ার অভাবে দড়ি

শুকিয়ে গেছে। রৌদ্রদগ্ধ তামাভ মৃত্তিকার মত তাদের চোখে অপরিসীম হতাশা আর বেদনার কালো ছায়া। কাজ নেই—কে কাজ দেবে। ধানও যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

—বাবা!! চান করবো না?

বুড়ো রিদয় কমলার কথায় মুখ তুলে চাইল।। হুঁকোটা অভ্যাসমতই টানছিল।। তামাকও নেই। তখন নিজের চাষেই তামাক করতো রিদয়। বোড়ের ধারের মাঠে তামাক লাগাতো। জলের অভাব ছিল না। সবুজ ঢোলা ঢোলা তামাকপাতা হোত। এখন বোড়ের নিচে বাঁধ দিয়ে বিরাট জলাধার করেছে। অবশ্য জল নেই তাতে, আর জলের সেই ক্ষীর-প্রবাহও শুকিয়ে গেছে সেই জলের টানে।

দোকান থেকে দু-চার পয়সার তামাক এনে চালাতে হয়। তাতে মন ভরে না। সেই স্বাদ—তার নেই।

দুপুরের রোদে ধুঁকছে সারা গ্রামখানা। তবু রিদয়ের বাড়িতে এখন সবুজ স্নিগ্ধ ছায়া এতটুকু টিকে আছে এই রুক্ষতার মাঝেও।

তার বাবা লাগিয়েছিল ওই মহানিমের গাছটা, রিদয় এইবার ষাট পার হয়েছে, তার জন্মেরও বহু আগে ওই গাছটা বড় হয়ে উঠেছিল।

রিদয় বলে—বাবার বয়সী রে, গাছ মন উনিও দ্যাবতা। বনোস্পতি।

ওরই নীচে তুলসীমঞ্চ করেছিল রিদয়। একমাত্র ছেলে নকুলের বিয়ের পর বৌমাকে বলে—ওনার নিচেই সন্ধ্যা পিদীম জেলো বৌমা। মাড়ুলি দিয়ো। উনিও দ্যাবতা।

এত গ্রীষ্মের দাবদাহেও গাছটা তেমনি সবুজ সতেজ হয়ে আছে। বিরাট গুঁড়িটা সোজা উঠে গেছে, দীর্ঘ মসৃণ কাণ্ডের বহু উপর থেকে বড় বড় ডাল বেরিয়ে উঠানের অনেকখানি ঠাঁই ছায়াস্নিগ্ধ করে রেখেছে। ওই দাবদাহ এখানে পৌঁছে না। বিরাট ওই বনস্পতি, কি নিবিড় স্নেহছায়ায় তাদের সব সন্তাপ—ওই নিদারুণ শুষ্কতা থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

রিদয় মেয়ের দিকে চাইল। কমলার দিকে চাইলেই তার জীর্ণ বুকের ভেতরটা কেমন করে। খরচ করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল ভাল করে। কিন্তু মেয়েটার ঘরাত মন্দ।

ক'বছর যেতে না যেতেই সব হারিয়ে গেল ওর। একমাত্র মেয়েও বিধবা হয়ে এইখানেই ফিরে এল।

সেদিন নকুল বলেছিল।

—ওর স্বামীর ঘরেই তবু থাকুক। মায়ে মাঝে খপর নোব।

কথাটা অবশ্য নকুলের ঠিক নয়। কথাটা বলেছিল নকুলের বৌ বিন্দীই। নকুল দিনরাত চাষের কাজ নিয়েই পড়ে থাকে। বিন্দীর উপরই সংসারের ভার। মেয়েটা এমনিতেই কেমন অগোছালো। কোন কিছুই তার মনে ধরে না। প্রায়ই বলে—শহরে এর চেয়ে অনেক ভালো বরেই বিয়ে হতো তার।

কাদা ঘাঁটা তার পোষায় না।

ওর বাবা শহরে কোন কাঠগোলায় খাতা সরকারি করে। কিন্তু তারই গপ্পে সে পঞ্চমুখ। বিজলী বাতি—সিনেমা—বৈকালে সেজেগুজে বেড়াতে বেরুনো। এইসব বন্ধ হয়ে গেছে, তাই খোঁটা দেয় নকুলকেই।

আবার ওই বিধবা ননদ সব হারিয়ে পাকাপাকিভাবে এখানে আসছে শুনে নকুলকে সেই কথাটা জানায়। এতো সব জোটাবে কোত্থেকে! নকুলও তাই বাবাকে বলেছিল। রিদয়ও বুঝেছে, চিনেছে তার বৌমাকে। মেয়েটাকে তারা ভালো লাগে না। ও আসার পর থেকেই সংসারের সেই লক্ষ্মীশ্রী কেমন চলে যাচ্ছে, উবে যাচ্ছে সব কিছু। নকুলের কথায় রিদয় মোড়ল অবাক হয়েছে। ওর কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে ওঠে।

—কমলা, এখানেই থাকবে।

নকুলের হয়েছে বিপদ। এদিকে বাবার মুখের ওপর কথা বলার সাহস নেই, অন্যদিকে বিন্দীর সেই হাড়-জ্বালানো কথাগুলোও সইতে হয়। নকুল অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

সংসারের আয় নেই। ব্যয় আছে। দু'তিনটে ছেলেপুলে নিয়ে নাজেহাল হয়ে গেছে নকুল। সেই জ্বালা বাবাকে পোয়াতে হয় না। তার ওপর আবার কমলার খরচও বাড়লো। মনের রাগ ওর মুখে-চোখে ফুটে ওঠে।

রিদয় মোড়লের ছানিপড়া চোখেও সেটা ধরা পড়ে। মুখ বুজে সরে এল নকুল।

রিদয়ের বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বের হয়। মেয়েটাকে দেখলে। বেশ জানে—কমলা এ-সংসারে অবাঞ্ছনীয় একটি জীবমাত্র।

মেয়ের কথায় রিদয় বলে—নকুল ফিরেছে?

মাথা নাড়ে কমলা। রিদয় চুপ করে রইল। জানে নকুল গেছে গদারডির চট্টরাজদের বাড়ি, যদি কিছু ধান বাড়ি মেলে। সুদ দিয়ে ধান ধার করে তাদের দিন চালাতে হচ্ছে। কিন্তু পর পর এই অজন্মায় ঘরায় ধানও আর নেই। থাকলেও দিতে চায় না কেউ।

আগেকার দিনগুলো কোথায় হারিয়ে গেছে। তখন দুর্গাপুরেও হয় নি। পুলিশ, পাহারা পার হয়ে কোন রকমে রাতারাতি নদী পার করতে পারলেই এখন চালের দর পাবে নগদ তিন টাকা সের। সে কাজের লোকও অনেক হয়ে গেছে। তাই ধান আর ধার-দেনা দেবার রেওয়াজ নেই। ধান না পেলে কি হবে তা জানে না রিদয়। শেষ বয়সে এমনি শূন্যতা আর অভাবের জ্বালা সইতে হবে তা ভাবে নি। সব ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

হঠাৎ বিন্দীর কর্কশ গলার শব্দ ওঠে। একটা ছেলেকে ধরে বেদম পিটছে।

—মর! মর! আপদগুলোর মরণ নাই। হাড়জ্বালাতে এসেছিস। দিনরাত পিণ্ডি জোটাবো কোত্থেকে তোদের? ছাই খা—

রিদয় মেয়ের দিকে চাইল। ওরা জানে সংসারের অবস্থার কথা। কিন্তু তাই নিয়ে ওই বেচারাদের নির্দয়ভাবে গালাটা সহ্য করতে পারে না রিদয়।

একদিন তার ওই উঠানেই বাঁধা থাকতো কড়কড়ে দু' মরাই ধান। বিরাট মন্দিরের মত মরাই থেকে যেন ধানগুলো ফেটে পড়বে। ওদিকের গোয়ালে ছিল কয়েকটা দুধেল গাই, চাষের দু'জোড়া বলদ। ওদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়তো। রিদয় তাদের নিজের হাতে খাওয়াতো—যত্ন করতো। তার মত চাষী তখন এ তল্লাটে ছিল না। তাই তাকে সেরা জমি ভাগে চাষ করতে দিতে আসতো অনেকেই। নিজের কয়েক বিঘে জমি—আর বাকী ভাগে চাষ করত সে। তাই ফিরিয়ে দিতো।

—আর জমি নিতে পারবো না দত্ত-মশায়। জমি নিয়ে যদি সার-গোবর দিয়ে হেপাজত করে ফসল আর্যাতে না পারি—তাতে চাষীরই বদনাম। ওটি সইতে লারবো আজ্ঞা।

ধান! গাড়ি গাড়ি ধানে খামার ভরে ওঠতো। সেদিন নকুলের মাও বেঁচেছিল। সেই-ই ছিল ঘরের লক্ষ্মী।

আজ!...শূন্য ব্যর্থ দিনগুলোর মাঝে রিদয় কেমন দিশাহারা হয়ে পড়েছে। কোন রন্ধ্র পথে সব চলে গেল। সেবার স্ত্রীর অসুখের সময়ও নিজের দু' বিঘে জমি বেচেছিল রিদয়। বাসিনীও বাধা দিয়েছিল।

—ওগো, এ অসুখে কেউ বাঁচে না। শুধু শুধু কেন জমি বিচতে যাচ্ছো। যা হবার হবে। এটুকু তুমি ঘুচিয়ো না।

বিন্দীও কথাটা ভেবেছিল। ওই সার জমি চলে গেলে তারই সমূহ ক্ষতি।

আড়ালে শ্বশুরকে শুনিয়েই কথাটা বলেছিল।—কি হবে ওইটুকু বিচে। যা হবার তাতো হবেই।

বিদয় কথা শোনে নি। ওর মন বিষিয়ে ওঠেছিল বিন্দীর ওপর।

—ও কথা বলো না বৌমা!...তোমাদের অদৃষ্টে যা আছে হবে। তাই বলে বিনা চিকিৎসায় ওকে মরতে দিতে পারি না।

বিপদের মাঝে রিদয় সেদিন ওদের চরম স্বার্থপর রূপটাই দেখেছিল। তবু জোর করেই জমি বিচেছিল। কিন্তু বাঁচাতে পারে নি তার স্ত্রীকে।

এই শূন্যগর্ভ জ্বালাময় দিনগুলোর মাঝেই তবু অতীতের কথা বার বার মনে পড়ে।...চালে খড় নেই। পর পর দু' বছর অজন্মা গেছে। তা ছাড়া দেশে দেশে কেমন গুজব ছড়িয়ে গেছে। জমি যে ভাগে করবে—তারই হয়ে যাবে। রিদয় কথাটা শুনে অবাক হয়। এতকাল চাষী আর জমির মালিকের মধ্যে ছিল একটা মধুর সম্পর্ক। বিপদ-আপদে তারা পাশে দাঁড়িয়েছে। আগে জমির ফসল পেয়েছে চাষী—তারপর নিয়েছে জমির মালিক। কিন্তু দিনবদলের সঙ্গে সঙ্গেই সব কেমন পালটে গেল।

মুখুয্যেরা এক লপ্তে ষোল বিঘের সোল জমি নিজেরাই চাষ করছে তার হাত থেকে নিয়ে, দত্তদের সাত বিঘের বাকুড়িও চলে গেল মায় সেচের পুকুর সমেত। ক'বছরেই রিদয় মোড়লের চোখের সমনে এতবড় বিপর্যয় ঘটে গেল। সারা গ্রামের উৎপন্ন ধানই কমে গেছে, আর আখ—সোনা সফল—রবিখন্দ চাষ সব ওঠে গেছে। সারা বছর ধরে মাঠগুলো শস্যরিক্ত—শূন্য পড়ে থাকে।

বলেছিল রিদয়—মা, বসুমতীকে নিষ্ফলা করে দেবা নাকি গো মুখুয্যেমশায়, অ'গ দত্তবাবু? ওরা হাসে—তবু জমির দখল তো থাকবে।

দুপুর গড়িয়ে গেছে। রোদের তেজ সূর্যের তাপকেও হার মানায়। শুনা মাঠে ওই দহনে লি-লি করে রোদের শিখা। মেঘগুলোও হারিয়ে গেছে, কালো বাদল মেঘ। ছাউনি অভাবে দাওয়ার জীর্ণ বাঁখারির বেষ্টনী ভেদ করে এসে পড়েছে ওই রোদের আভা। পিঠ জ্বালা ধরায়। রিদয় এসে সেই উঠানের মহানিমের স্নিগ্ধ ছায়াতলে দাঁড়াল। এইটুকু যেন পরম শান্তির ঠাঁই। গাছটার বিশাল গুঁড়িতে লালচে বাকলগুলো যেন রসে ভ— গেছে। দু'একটা শুকনো পাতা দমকা হাওয়ায় ঝরে পড়ে।

তব বাবার হাতে লাগানো গাছ. এ যেন পিতৃপুরুষের মত অদৃশ্য শান্তির আশ্বাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পরম যত্ন ভরে রিদয় ওরই কাণ্ডে হাত বুলোয়।

দত্তবাবুদের মেজকর্তা বহুবার গাছটাকে দেখে গেছে লুব্ধ দৃষ্টিতে। বাঁকুড়ায় তার মস্ত কাঠের কারবার। দুর্গাপুরেও কারখানা আছে। তিনিই বলেন—জাত মেহগিনি রে রিদয়। খুব দামী কাঠ। পাঁচশো টাকা—

রিদয় কঠিন হয়ে ওঠেছিল—দেবতা গো উনি। উ-কথা বলবেন না।

ঠাণ্ডা একটু স্পর্শ বিদয়ের মনের হু হু তাপকে জুড়িয়ে দেয়।

কমলা ফিরে এসেছে। ক'বছরেই দেখেছে তাদের সংসারের অবস্থা। ধাপে ধাপে কি অতল অন্ধকারের দিকে চলেছে তারা। নিজের জীবনেও অমনি নিরিড় অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।

বিন্দী কর্কশ কণ্ঠে ধমকে ওঠে—এ্যাই যে! একগাদা ক্ষারকাচা কাপড় পড়ে আছে আর উনি কি ভাবছেন। এতো কিসের ভাবনা লো? ঘরে মন বসে না—উড়ু উড়ু ভাব। তা ঘোমটার তলে থ্যাম্‌টা নাচ কেন?

কমলা চমকে ওঠে বৌদির কথা শুনে চুপ করে কাপড়ের বোঝাটা তুলে ঘাটের দিকে গেল।

জল নেই। পুকুরের একপাশে পাথরের ওপর আছড়াতে থাকে সেই কাপড়গুলো।...কমলার ব্যর্থ জীবনে কোথাও কোন সঞ্চয় নেই। তবু যৌবনের সেই সাড়াকে সে ভোলে নি।...তার অজানেন্তই দেহের অনুপরমাণুতে তার প্রাচুর্য এখনও রয়ে গেছে প্রকৃতির নিষ্ঠুর বিদ্রূপের মতই।

হঠাৎ মুখ তুলে চাইল কমলা। নিজেরই লজ্জা করে। ছোট কাপড়খানায় তার এই অফুরান যৌবন যেন বাঁধন মানে না।

—এযে ভাটিখানা বসিয়েছিস কমল?

কমল ওকে দেখছে। তার শূন্য ব্যর্থ রিক্ত জীবনে কোথায় এতটুকু সাড়া জাগে।

দত্তদের নিবারণ এতদিন গ্রামেই ছিল, যাত্রার দলের মোশন মাস্টারী করে কলকাতায়। বাবরি চুল। ওর সারা দেহে কেমন একটা শ্যাম সজীবতা। কমলের মনের জমাট পাথরটা গলে যায় ওর সান্নিধ্যে। হালকা হাসির আভাস জাগে ওর মুখে।

কমলা বলে—এতো মরলা তবু কেচে সাফ করতে পারছি না গো!

হাসে নিবারণ—তাই তো তোমাকেই বলি, মনের ময়লা একটু সাফ করে দাও। গুনগুনিয়ে গেয়ে ওঠে নিবারণ দু'কলি।

কমল কৃত্রিম কোপে ধমক দিয়ে ওঠে।

—কি হচ্ছে?

নির্জন দুপুরে। ছায়ানামা ঘাটের ধারে হঠাৎ বিন্দীর চোখে পড়ে ঘটনাটা। কমলা যেন বদলে গেছে। কাপড়-চোপড় অগোছালো—ওর দুচোখে কি কামনার আভা।

নিবারণও মেয়েটাকে কেমন অন্য চোখে দেখেছে। দু' জনের ব্যর্থ জীবনের কোথায় একটা মিল রয়ে গেছে। তাই নিভৃতে ওদের দুটি মন কি স্বপ্ন রচনা করে। কমলার মনে কি সাড়া জাগে।

সেও বাঁচতে চায়। এই নিঃস্বতা অভাব আর বেদনার মাঝে বেঁচে থাকার কোন দাম নেই। নিবারণের কথাগুলো ভাবছে সে। কি চঞ্চল্য জাগে সারা মনে। ও তার কাছে এনেছে কোন অন্য জগতের আহ্বান।

—এই যে ফিরলেন এতক্ষণ চলানি শেষ করে।

বিন্দী খাপ্পা হয়ে ওঠে। কমলা ওর দিকে চাইল। আজ সে কঠিন হয়ে ওঠেছে।

বিন্দী বলে—এতেই যদি পিরীত ছহুল্ল আর ভাবনা কি! মাগো মা—ঘেন্নায় মরে যাই। গলায় দড়ি জোটে না?

কমলা চুপ করে থাকে। বিন্দী তাই গলা খুলেছে। রিদয় চুপ করে বসেছিল। এখনও নকুল ফেরে নি। ধান না পেলে উপোসই দিতে হবে ওদের। এখনই একবেলা অর্ধপেটা জুটছে কোনরকমে। অনাহার—এই বুভুক্ষার জ্বালা কতখানি তীব্র তা বুঝেছে সে। দেহ-মনে একটা অসাড় বেদনা।

হঠাৎ বিন্দীর কথাগুলো শুনে চীৎকার করে ওঠে রিদয়।—কি যা তা বলছো বৌমা! থামবে?

বিন্দী আজ সামনেই আসে, দারিদ্র, অভাব আর জ্বালা ওর মনের সব শ্রী-সুন্দরকে পুড়িয়ে আঙরা করে দিয়েছে। কমলার মুখের গ্রাসটুকু জোগাতে আজ তাদের কষ্ট হয়। তাই চরম অপবাদ দিতেও দ্বিধা করে না সে।

শ্বশুরের মুখের ওপরেই বলে—এত কাণ্ড দেখে থামবো কি করে? মেয়ে তো নয় ও যে কালসাপ।

কমলার দুচোখে জল নামে।...অসহ্য যন্ত্রণায় সে যেন কুঁকড়ে ওঠে। কি এত অপরাধ তার জানে না সে।

বিন্দী বলে চলেছে।—কেলেঙ্কারীর আর বাকী রইল কি?...দিনদুপুরে—

নকুল তেতেপুড়ে ফিরছে। কোথাও কোন পথ পায় নি। শেষ দু' বিঘে জমি বন্ধক রেখেই যদি কিছু ধান পায় সেই চেষ্টাতেই গিয়েছিল। এতক্ষণ ধর্ণা দিয়ে পড়েছিল। এই ক'দিন একমুঠো করে জুটেছে—এইবার তাও জুটবে না। কিন্তু চট্টরাজমশায় সাফ্ কথা জানিয়ে দিয়েছে। নগদ টাকা ফেল, ধান নিয়ে যাও—টাকা সের দর। ওসব জমি-টমি নোব না।

...বোদে তেতেপুড়ে শূন্য হাতে ফিরছে নকুল। কোথাও এতটুকু শান্তি নেই—বিন্দীই বলেছিল তাকে, শহরে গেলে তবু একটা কাজকম্মো পাবে। এখানে পড়ে থেকে মরতেই হবে। ছেলেগুলোর দিকেও চাইতে পারে না। ক্ষুধা ধ্বংসছে। ওদের সেই খিদের জ্বালায় চীৎকার তাকে উন্মাদ করে তোলে। বার বার কথাটা ভেবেছে নকুল। মাটির মায়া তার নেই।

ওই বুড়োটা ধুঁকছে, তবু মরে গেলে নকুল নিশ্চিন্ত হতো। আর ওই বোনকে এনে চাপিয়েছে তার ঘাড়ে। সবদিক দিয়ে তাকে যেন কোণঠাসা করে টিপে মারবে ওরা! মুক্তির পথ খোঁজে নকুল। অভাবের তাড়নার কাছে—শুধুমাত্র বাঁচার তাগিদের তুলনায় ওদের অস্তিত্ব মূল্যহীন, অর্থ-হীন।

...তেষ্টায় গলা শুকিয়ে আসছে। তামাভ ডাঙার বুক থেকে ওঠছে হু-হু মাটির উত্তাপ। ঘাম ঝরছে। টলতে টলতে ফিরছে নকুল। হঠাৎ বাড়ির কাছে সে কমলার ওই কথাগুলো শুনে তার মাথায় রক্ত ওঠে যায়।

লাফ দিয়ে এসে ওর সামনেই কমলাকে দেখে তার চুলের মুঠি ধরে সজোরে লাথি কসে দেয় নকুল। গর্জন করে। —মরতে পারিস না? মর—মর তুই।

বৃদ্ধ রিদয় অসহায় বেদনাহত কণ্ঠে আর্তনাদ করে।—নকুল! ওরে মারিস না মারিস না ওকে।...কি করছিস?

নকুলের দু'চোখের দৃষ্টিতে আগুন ঝরছে—ঠিকই করছি। পাপ—ওই পাপেই সব যাবে।

বৃদ্ধ রিদয় আর্তনাদ করছে। নিষ্ফল করুণ আর্তনাদ। কমলার কপালটা কেটে গেছে। সর্বহারা বঞ্চিত একটি নারী আজ কি জ্বালায় কঠিন হয়ে ওঠেছে। অনাহার-যন্ত্রণা-অপমান সয়েও এতদিন পড়েছিল সে। কোথায় একটা নীতিবোধ তার সব কামনাকে কঠিন শাসনে বেঁধে রেখেছিল। সেই অদৃশ্য বাঁধন-ভয় ওই নির্মম আঘাতে খসে পড়েছে। রুদ্ধমুখ আগ্নেয়-গিরির মত ফুঁসছে একটি নারী।

নকুল আর বিন্দী গর্জন করছে—হাড়জিলজিলে ছেলেমেয়েগুলো ভয়ে-খিদেতে চীৎকার করছে। রিদয় বুড়ো কপাল চাপড়ে আর্তনাদ করছে ওই জীর্ণ খড়বিহীন চালের ফাঁক দিয়ে তেতে ওঠা সূর্যের আগুন-আভা ওই ছোট সংসারের সব নগ্নতাকে প্রকট করে তুলেছে।

...রিদয় তবু আশা করে হয় তো মেঘগুলো আবার আসবে। বৈকালের দিকে ওই মহানিমগাছের নিচে ক্লান্ত মানুষটা কি স্নিগ্ধতার খোঁজ করে।

কিন্তু ব্যর্থ সে আশ্বাস। নকুল কোথায় বের হয়ে গেছে। ছেলেগুলো ঘ্যান ঘ্যান করে কাঁদছে। কমলাও সামনে আসে নি।

পরদিন ভোরেই দেখা যায় মেয়েটা নেই। কমলা কোথায় চলে গেছে কেউ জানে না। কাল সারাদিন কোন কথাই বলে নি। খাবারও জোটে নি।...

বিন্দীও সুরু করেছে—মরতে গেছে আপদ। মুখ পুড়িয়ে বেইরে গেল।

এমন হবে তা জানতাম। ছিঃ ছিঃ—

নকুল নিষ্ফল গর্জন করে চলেছে। —দেখতে পেলে এইবার কেটেই ফেলবো পাপকে। কালসাপ পুষেছিলাম।

তবু রিদয় বুড়ো বিশ্বাস করতে পারে না।

মা আমার একাজ কখনই করতে পারে না, তোরাই তাকে তাড়িয়েছিস।

ওই শূন্য রুক্ষ মাঠ বেয়ে রিদয় বের হয়ে চলেছে, কমলা ফিরে গেছে তার শ্বশুর বাড়িতেই। তবু খবরটা নিয়ে আসবে। ক্ষমা চেয়ে আসবে মেয়ের কাছে —তাকে এরা অকথ্য অত্যাচার করেছে, আর বুড়ো বাপ—মেয়েকে সেই অপমানের হাত থেকে বাঁচাতে পারে নি।

লাঠি ঠুকে ঠুকে চলেছে সে ওই শস্যরিক্ত ফাটলধরা আলপথে।

কিন্তু প্রচণ্ড আঘাতে আর অভাবের তাড়নায় প্রকৃতি মানুষ সেইদিনগুলো সব বদলে গেছে। নিজের মেয়েকেও চিনতে পারে নি। কমলা ওখানে ফিরে যায় নি। ওর শ্বশুররাও বেশ দু'চার কথা শুনিয়ে দিয়েছে। রিদয়ের জীর্ণ বুক কাঁপছে—হাঁটবার সামর্থ নেই। ধুঁকতে ধুঁকতে ফিরছে সে।

...হঠাৎ বাড়ির কাছে এসেই চমকে ওঠে।...সেই ছায়ামেলা ঘন সবুজ মহা-নিমের গাছটা নেই। জীর্ণ খড় বের করা চালাটা ওই নির্মম রোদে ধুঁকছে, শেষ-দিন গুণছে কবে ধসে পড়বে। বাড়ির সামনে ভারি টায়ারের দাগ। ছিটিয়ে পড়ে আছে টুকরো ডাল—শুকনো বিবর্ণ পাতাগুলো।

দু'দিনের মধ্যেই ওই ছায়াঘন বনস্পতিকে নকুল শহরের কাঠের গোলায় বিক্রী করে দিয়েছে। ওরাও নির্দয়ভাবে তার বাবার হাত লাগানো গাছটাকে কেটে নিয়ে গেছে।

—নকুল! একি করলি তুই? সর্বনাশ করলি? ওরে শেষ করে দিলি দ্যাবতাকে?

নকুলও তৈরি হয়েছে। শহরেই চলে যাচ্ছে সে। বিন্দী, ছেলেমেয়েগুলো চলে গেছে আগেই। নকুল বৃদ্ধ রিদয়ের সামনে দলামোচা পাকানো নোট ক'খানা ফেলে দিয়ে বলে—আগো বাঁচো, তারপর ওসব ভাবরে। শহরে কাজ পেয়েছি আমি চল্লাম।

...লি-লি করছে রোদ। কোথাও এতটুকু ছায়া নেই—স্নিগ্ধতা নেই। শূন্য আকাশ যেন ধু-ধু করছে কি নিঃস্বতায়। বনস্পতির সেই স্পর্শটুকুকেও বিক্রী করে দিয়েছে ওরা।

কমলা নেই। নিবারণের সঙ্গে সে কোথায় হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেল নকুল, নাতী-নাতনীগুলো। বুড়ো রিদয় আজ নির্বাক স্তব্ধ হয়ে গেছে। জীর্ণ চোখের কোণ বেয়ে জল নামে। আকাশে জল নেই, সেই জল নেমেছে চোখে। ছিন্নমূল বনস্পতির কাটা কাণ্ডটা থেকে জমাট চাপ চাপ আটা বের হয়েছে, যেন তাজা রক্ত জমে গেছে।

ওরা সব কিছুকেই এমনি নির্মম-ভাবে হত্যা করেছে—হারিয়েছে।

তবু বাঁচার আশ্বাস কোথাও মেলে নি। বসুন্ধরা বন্ধ্যা হয়ে গেছে—বাদল মেঘগুলোও হারিয়ে গেছে কেন অসীমে। দিকজোড়া শুধু নিঃস্বতা আর জ্বালা।

বুড়ো রিদয় জানে না এখনও কেন সে বেঁচে আছে! এ বাঁচার সার্থকতা কি—সে প্রশ্নেরও জবাব মেলে নি।

বেকার সমস্যার সমাধান ?

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে !!

বাংলা দেশে বেকার সংখ্যা নাকি আনুমানিক এক কোটি। এই ভয়াবহ বেকার সমস্যার সমাধানে ক্ষুদ্র মূলধনের ব্যবসা হিসাবে মুর্গী উৎপাদন বা পোলট্রি ফার্মিং অধুনা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় রূপান্তরিত হয়েছে—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে। বেকার ব্যক্তিদের পোলট্রি ফার্মিং ব্যবসা পরিচালনার বিশদ নির্দেশলাভের সুবিধার জন্য বসুমতী থেকে আত্মপ্রকাশ করলো।

রয়েজ পেডিগ্রী পোলট্রি ফার্মের অধিকর্তা

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রায়

জি, পি (আমেরিকা), এফ, এস, পি, আই, পি, এইচ (লণ্ডন)

লিখিত সচিত্র

আধুনিক পোলট্রি ফার্মিং

মূল্য মাত্র চার টাকা। ডাকমাশুল এক টাকা।

অবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২

কবরী বিচিত্রা

সুভাষ সমাজদার

বলুন, আপনার কি রকম খোঁপা হবে? মেয়েটির চোখে চিন্তার ছায়া পড়ে। ও, ভাবছেন কি ধরনের খোঁপা আপনার মানাবে? পান খোঁপা, জলতরঙ্গ খোঁপা, চালতাফুল খোঁপা, গঙ্গা-যমুনা খোঁপা, অজন্তা খোঁপা আরও অনেক রকমের খোঁপাই অবশ্য হয়, বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল বিউটি পারলারের মালিক অরুন্ধতী দেবী। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালো কাস্টমারের মুখের দিকে। ওয়াং—এদিকে এস—

একটি চীনা তরুণী এক হাতে চিরুণী আর এক হাতে কতগুলো চুল বাঁধার কাটা নিয়ে বিড়ালের মত ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে এল।

দেখ, এঁর মুখের ও গলার গড়ন লম্বা। মাথার মাঝখানে সিঁথি করে দু'পাশে চুল অল্প অল্প ফাঁপিয়ে রেখে পিছনে নিচু করে ঘাড়ের কাছে বড় করে চাটাই খোঁপা করে দেবে বুঝেছো?

ওয়াং ঘাড় নেড়ে মৃদু হেসে মেয়েটির হাত ধরে গদী আঁটা চেয়ারে বসিয়ে দেয়। ইন্টারভিউ না ম্যাট্রিমনিয়াল?

মধ্যবিত্ত ঘরের সাদামাঠা চেহারার মেয়েটির চোখে ব্যথার ছায়া ফুটে ওঠে। ক্লান্ত অবসন্ন গলায় বলে, এই বয়সে আর দেখতে আসবে কে, হঠাৎ থেমে যায়। নিজেকে সংযত করে একটু কঠিন গলায় বলে, চাকরীর ইন্টারভিউ আছে—বিদেশী ফার্ম। রিসিপসানিস্টের চাকরী, অনুগ্রহ করে ভাল করে খোঁপা করে দিন—

নিওন আলোয় ঝলমল করছে বিউটি পারলার—'কবরী বিচিত্রা'র বিশাল তল-ঘর। চেয়ারে চেয়ারে সুবেশা তরুণীরা গায়ে গাউন চাপিয়ে বসে আছে। রুক্ষ চুলে ভরা মাথাটা সমর্পণ করে দিয়েছে কারিগরের কাছে। কেউ বাঁধছে এলো খোঁপা, কেউ বাঁধছে 'পিয়ারলেস' প্যাটার্নের খোঁপা। সামনে দীর্ঘ ঝকমকে আয়নায় ফুটে ওঠা সজ্জাবিলাসীনীদের সুঠাম মূর্তিগুলো প্রতিফলিত হয়েছে উল্টোদিকের দেওয়ালে টাঙানো আয়নায়। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, নানা প্রসাধন-সামগ্রীতে সাজানো অত্যুজ্জ্বল আলোয় ভরা সেই সুদূর পঞ্চদশ শতাব্দীর মোগলহারেমের কোন সাজকক্ষে এসে পড়েছেন।

পারলারের রঙীন ও পুরু কার্পেট-মোড়া মেঝের ওপর দিয়ে সম্রাজ্ঞীর মত পায়চারী করে অরুন্ধতী। প্রত্যেক কাস্টমারের মাথার দিকে তার খর নজর।

উঁহু উঁহু হচ্ছে না—কিচ্ছু হচ্ছে না মঞ্জু—অরুন্ধতী ধমকে ওঠে তার কারিগরাকে, 'চালতাফুল' প্যাটার্নের খোঁপা হবে তো, তাহলে এত মোটা মোটা বিনুনী করছো কেন? বলতে বলতে নিজেই এগিয়ে এসে নিপুণ হাতে দ্রুতগতিতে সরু সরু বিনুনী করে ফেলল। তারপর এক-একটি বিনুনী আঙুলে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে এক-একটি ফুলের মত করে পাকিয়ে পাকিয়ে যেতে লাগল বিচিত্র ছন্দে।

কবরী বিচিত্রা

শহরের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত অভিজাত ও শিক্ষিত মহিলাদের মুখে মুখে এই ব্রিউটি পারলারের নাম। এই 'গুডউইল'—এই প্রতিষ্ঠার মূলে আছে অরুন্ধতী লাহিড়ীর আশ্চর্য অধ্যবসায়, প্রত্যেক কাস্টমারের প্রতি নিবিড় যত্ন, মিষ্টি ব্যবহার আর আছে রূপতত্ত্ব সম্বন্ধে তার গভীর জ্ঞান। করসন রিচার্ডের লেখা "ফ্যাশানস্ ইন হেয়ার ইন দি ফার্স্ট

আইজ হাণ্ড্রেড ইয়ারস", ম্যাকফ্যাডেনের 'হেয়ার কালচার' এবং কেশচর্চা সম্বন্ধে আরও অনেক বিদেশী বই তার কণ্ঠস্থ।

ইন্টারন্যাশানাল এ্যাসোসিয়েশান অফ লেডীস হেয়ার ড্রেসারের সভ্য সে। লণ্ডনের পত্রিকা 'হেয়ার ড্রেসারস' উইকলিতে তার ছবিও ছাপা হয়েছে বহুবার।

এইসব—এইসব কারণেই 'কবরী-বিচিত্রা'য় মেয়েদের ভীড় অত্যন্ত বেশি। তিন-চারদিন আগে থেকে 'বুকিং' করে কাস্টমাররা আসে।

সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। সেলুন বন্ধ। কাজের তাড়া নেই। একটি মেয়েদের পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লিখছে অরুন্ধতী লাহিড়ী...কবি, দার্শনিকরা যতই বলুন, 'বিউটি আনএ্যাডোরনড' ইজ এ্যাডোরনড মোস্ট অর্থাৎ নিরাভরণ সৌন্দর্যই সকলের প্রিয়। তবুও বিধাতার দান যে স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আরও একটু বাড়িয়ে তোলা যায় আরও মনোহর—আরও প্রখর করে তোলা যায়, তাহলে তা না করার কি হেতু থাকতে পারে?

সেই সুপ্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর দেশে দেশে রূপসজ্জার প্রচলন ছিল।

রোমের সম্রাট নীরোর পত্নী পাপিয়া গাধার দুধে স্নান করতেন। সে যুগের ভদ্রপল্লীরা গায়ের রঙ ফরসা করার জন্য গাধার দুধ ব্যবহার করতেন। আধুনিক-কালের রমণীরা যেমন ভ্যানিটিব্যাগে একটু কাজল-পাউডার-লিপস্টিক এবং প্রসাধনের টুকিটাকি বয়ে নিয়ে বেড়ান, রোমের সম্ভ্রান্তা তেমনি অঙ্গরাগের সামগ্রী হিসেবে সঙ্গে কি রাখতেন জানেন?

দেড়শো গাধা! তাদের দুধ দোয়ানোর জন্য থাকতো প্রায় দুশো মিল্কগার্ল। শুধু গাধার দুধ?

কপালের বলিরেখা ঢাকবার জন্য হাড়ের গুড়ো, দেহত্বক মসৃণ করার জন্য বার্লি—

মাসীমা—সুলগ্নার পায়ের দিকের শাড়ির পাড়টা পর্দার আড়ালে দেখা গেল। সে এ বাড়ির আশ্রিতা। মা-মরা মেয়ে। প্রফেসার লাহিড়ীর একমাত্র বোনের মেয়ে। রীতিমত এম-এ পাশ। কিন্তু কেন যেন এড়িয়ে চলে জাজীকে।

কি রে সুলো, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে আয়—কলমের ক্যাপ বন্ধ করে লেখাটাকে সরিয়ে রাখল অরুন্ধতী।

মামা তোমাকে আজ বিকেলে বাড়িতে থাকতে বলেছেন—নিভু নিভু গলায় বলল সুলগ্না।

মুহূর্তে কঠিন হয়ে উঠল অরুন্ধতীর হাসি হাসি মুখখানা। নিশ্চয়ই ম্যাথেম্যাটিক্সের কোন বিদেশী প্রফেসার এদেশে এসেছেন। তাঁকেই হয়তো আপ্যায়ণ করে উনি বাড়িতে নিয়ে আসছেন—এ বিরাহুতে ভরে গেল তার মন। কিন্তু নিজেকে সংযত করে শান্ত মৃদু গলায় বলল, আমার জরুরী এ্যাপয়েন্ট আছে। বিউটি কম্পিটিশানে আমাকে জাজমেন্ট দিতে হবে—

আর একটিও কথা না বলে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সুলগ্না। তার মনটা খুব ভারি হয়ে উঠল। যত দিন যাচ্ছে, যত 'কবরী বিচিত্রা'র খ্যাতি বাড়ছে, ততই মামা ও মামীমার ভেতরে সেই অদৃশ্য ব্যবধানটা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। সে স্পষ্ট যেন দেখতে পাচ্ছে, উন্মত্ত ঢেউয়ে ভরা বড় বড় নদীর পাড়ে পাড়ে যেমন ফাটলের সৃষ্টি হয় তেমনি এই সংসারটার দিকে দিকে ফাট ধরেছে; একদিন ধ্বসে পড়বে নদীর বুকে। সর্বনাশা স্রোতে ভেসে যাবে, তলিয়ে যাবে একদা সুখের সংসারটি।

শোন, একথা জেনে রাখবে, মানুষের সভ্যতার মতই প্রাচীন হলো এই ম্যাথেম্যাটিক্স অর্থাৎ গণিতশাস্ত্র, ম্যাথেম্যাটিক্সের এম-এ ক্লাসের ছাত্র দীপককে পড়াচ্ছে অধ্যাপক সুরেন লাহিড়ী। কাঁচামাটির রাস্তার মত তার এবড়ো খেবড়ো মুখে চিন্তার ছায়া নামল। মাথার কাঁচাপাকা অবিন্যস্ত চুলগুলোর ভেতরে আঙুল চালাতে চালাতে যেন অনেক দূর থেকে থেমে থেমে বলল, অঙ্কের সাহায্যেই মানুষ রহস্যময় সৌর-জগতের ভেতরেও একটা নিয়মকে আবিস্কার করেছে! নিয়ম মানে একটা 'ডিসিপ্লিন', লজিক, প্রুফ ছাড়া আমরা এক পা—

কিং-কিং-কিং-টেলিফোন বেজে উঠল। হ্যালো—ও হ্যাঁ, আমার মনে আছে—আমার ডায়েরীতে নোট করা আছে। আমি যাচ্ছি এখুনি—

দীপক, এক্সজামিনারস্ কমিটি মিটিং আছে আমার—তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল লাহিড়ী। তার নিজের ঘরে যেতেই নজরে পড়ল বারান্দার এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে সুলগ্না।

কি রে বিকেলে থাকার কথা বলেছিস তোর মামীকে? বলেই দ্রুত পাঞ্জাবীটাকে গায়ে গলিয়ে নিল। অরুন্ধতী কি বলেছে তা শোনার দরকার নেই তার। বাড়ির লোক। তাকে জানানো দরকার। জানিয়ে দিয়েছে। বাইরে যেতে যেতে দরজার কাছে থেকে ফিরে এসে বলল, শোন সুলো—তুই মন খারাপ করিস না মা, আমি নিজে তাদের সঙ্গে করে পাঁচটার সময় আসবো—

...কুয়াশাচ্ছন্ন সুদূর অতীতে খৃষ্টের জন্মের প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেও মিশরে সুগন্ধী প্রসাধন সামগ্রীর প্রচলন ছিল। মিশরীয়রা ফলের রস থেকে, মশলা থেকে নানারকমের তীব্র সৌরভে ভরা আতর তৈরি করতো। কে জানে—কে বলতে পারে। এই রকমই কোন উগ্র মিষ্টি গন্ধে ভরা 'এসেন্স' ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সুলতান তু-তেন খামেনের কফিনে।

কিছুদিন আগে তার সমাধিস্থান উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার আগের সেই আশ্চর্য মিষ্টি গন্ধে ভারি হয়ে উঠেছিল বাতাস...অরুন্ধতী রূপ-সজ্জার ওপরে প্রবন্ধ লিখে চলেছে—শুধু মিশরীয়রা নয় পুরাকালে গ্রীকবাসীরা তেলে গাধার পায়ের খুর, আর খেজুর ফুল গরম করে কেশসজ্জার সহায়ক লাক্ষাসব প্রস্তুত করে...

ঢং-ঢং-ঢং-চারটে বাজল। অরুন্ধতী লেখা বন্ধ করে উঠে পড়ল। বিউটি কম্পিটিশানে যেতে হলে এখন রেডী হওয়া দরকার।

কিন্তু সুলগ্নার মারফৎ কর্তার নির্দেশ এসেছে বিকেলে বাড়িতে থাকার! ভাগ্নীকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছে। নিজের মুখে বলতে সম্মানে বেধেছে! অরুন্ধতীর মাথার ভেতরটা চিন্‌চিন্ করে জ্বলে যেতে লাগল।

তার মনে হল, যেন অনেক—অনেক দিন অনেককাল থেকে সে প্রতিকূল স্রোতের বিরুদ্ধে দু' হাতে লড়াই করতে করতে চলেছে। নিজেকে খুব ক্লান্ত এবং অবসন্ন মনে হয়। যতক্ষণ 'কবরী বিচিত্রা'র কাজের ভেতরে ডুবে থাকে ততক্ষণ বেশ থাকে। কিন্তু বাড়িতে পা দিলেই তার সমস্ত চেতনা তীব্র অস্বস্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তবুও—

তবুও সে তার কর্তব্য করে যায়। ধীর পায়ে রান্নাঘরে যেয়ে ঠাকুরকে বলে, শোন, বিকেলে বাবুর বন্ধুবান্ধব আসবেন। যা করতে বলবেন তা ঠিক ঠিক করে-টরে দেবে কিন্তু—

ঠিকে বি হরির মাকে বলল, হরির মা আজ কিন্তু ঘড়ি ধরে গেলে হবে না—একটু বেশিক্ষণ থাকতে হবে বাপু—বাড়িতে লোকজন আসবে—

হ্যাঁ বৌদি জানি। কিন্তু কারা আসবে গো, বাবুর বসার ঘরে গালিচা পাতা হয়েছে—

গালিচা! অরুন্ধতীর চোখের দৃষ্টিটা ছট্‌ফট করে ওঠে। না, তাহলে তো অঙ্কের কোন বিদেশী অধ্যাপক নয়—তার চেয়েও অনেক বেশি সম্মানিত অতিথি, অনেক প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার!

সে দ্রুতপায়ে এল ড্রইংরুমে। শুধু মেঝেয় গালিচা পাতা হয় নি! সোফার পাশে ছোট তক্তাপোষে বেশ সুন্দর একটি ফরাসও করা হয়েছে! বিদ্যুৎচমকের মত মনে পড়ে গেল সুলগ্নার বিষণ্ণ এবং সঙ্কুচিত মুখখানা! আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটা মুহূর্তে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল!

কিন্তু বিউটি কম্পিটিশানে যাওয়ার

উৎসাহটা নিভে গেল। এই সংসারের মালিক তাকে যত অবাঞ্ছিতই মনে করুক না কেন, সে জানে—সে বুঝতে পারে ওই কালো কুরূপা মা-মরা মেয়েটির জন্য তারও মনের কোণে কোণে একটু দরদ আছে—মমতা আছে—

সু—লো—চেঁচিয়ে ডাকল অরুন্ধতী। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না। শুধু দূর থেকে ভেসে এল নিঃসঙ্গ একটি ইঞ্জিনের সান্টিং-এর হিস্ হিস্ শব্দ।

সে জানে। জানে সুলগ্না সাড়া দেবে না। এ তো নতুন নয়। এই নিয়ে সাতবার।

এম-এ পাশ করার পর থেকে সুলগ্নার বিয়ের চেষ্টা করছে তার মামা—নির্জন ঘরে দাঁড়িয়ে পুরানো দিনের স্মৃতির ভেতরে মগ্ন হয়ে যায় অরুন্ধতী—খুব কম করে না হলেও সাতটি জায়গা থেকে দেখতে এসেছে সুলগ্নাকে। পাত্রের অভিভাবকদের পছন্দ হয় না তাকে। কেউ কেউ মুখের ওপরেই কট্‌কট্ করে শুনিয়ে দেয়—গায়ের রঙটা বড্ড কালো। মুখেরও কোন ছিরি ছাঁদ নেই...

বলা বাহুল্য, এসব কথা সুলগ্নার কানে পড়ে। ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে মাটির সঙ্গে একেবারে মিশে যায়। সে দূর থেকে দাঁড়িয়ে কুরূপা মেয়েটির দুঃখ দেখে। দেখে নিরপেক্ষ দ্রষ্টার মত। তার করুণার অনেক কিছু আছে। কিন্তু এ বাড়িতে তার ইচ্ছার টুঁটিগুলোকে চেপে রাখা হয় সব সময়। তার স্বাধীনসত্তার কোন মূল্যই নেই এই সংসারে। কিন্তু যদি—নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার অধিকার থাকতো তাহলে—তাহলে—অসহ্য অস্থিরতায় তার হাত দুটো নিসপিস করে উঠল।

মাসীমা—তুমি ডাকছো? আস্তে আস্তে পা ফেলে সুলগ্না এল। দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকালো—সাড়ে চারটা। তার গোল মুখে ভয়ের ছায়া পড়ল।

অরুন্ধতী স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কি দেখছো মামীমা—মামা আবার আমাকে—যন্ত্রণায় চোখ ফেটে জল এসে পড়ল।

আশ্চর্য! তার কান্না দেখেও অরুন্ধতীর অপলক দৃষ্টি একটুও চঞ্চল হলো না। একটা সান্ত্বনার কথা বলল না। শুধু নিষ্প্রাণ শিলীভূত মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। ভেতরে ভেতরে অসহ্য যন্ত্রণায় পুড়ে যেতে লাগল। গত চার বছর ধরে কবরী বিচিত্রায় যত বিয়ের কনে সাজিয়েছে যত কুরূপা ও হতশ্রী মেয়েকে তারা নিপুণ হাতের রূপসজ্জার গুণে অপরূপা করে তুলেছে তারা সবাই যেন তার চোখের সামনে দিয়ে শোভাযাত্রা করে যেতে শুরু করল।

অমন করে আমার দিকে তাকিয়ে কি ভাবছো মামীমা?

অরুন্ধতীর মাথার ভেতরে আগুনের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। কি আশ্চর্য! কেউ বিশ্বাস করবে, একটা মানুষের কণ্ঠার একনায়কত্বে তাদের মত দুটি উচ্চ-শিক্ষিতা মেয়ে বন্দী হয়ে রয়েছে? কেউ বিশ্বাস করবে, যতবার ভাগ্নীকে দেখিয়েছে, ততবার তার মামা তাকে একটুও সাজগোছ করতে দেয় নি! আমি যুক্তিবাদী—তোমাদের ওই প্রসাধন অর্থাৎ মেক আপ্ করে লোক ঠকাতে আমি দেব না—দিতে পারি না, অঙ্কের অধ্যাপকের সেই এক কথা!

তাহলে যুগ যুগ ধরে যে মেয়েদের ভেতরে রূপচর্চা চলে আসছে, পতিগৃহে যাত্রার সময় শকুন্তলাকেও সাজিয়েছিল সখীরা! গোবিন্দলীলামৃতেও আছে শ্রীরাধাও তাঁর ঘন কালো চুলে সুরভি বিষ্ণু তেল ব্যবহার করতেন! মহাভারতে আছে দ্রৌপদীর কবরী রচনার ইতিবৃত্ত—চুলের প্রসাধনের কথা আছে শুশ্রুতে—রাখো রাখো ওসব কবিদের অলস এবং অসার কল্পনা—ওসব আননেসেসারী সুপারফ্লুয়েস, অকারণ কাব্যময়তার কোন মূল্যই নেই—

এই রকম তর্কে তর্কে ঝগড়া পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে; কত মনোমালিন্য হয়েছে। কিন্তু কখনো তিনি নিজের জেদ ছাড়েন নি। যুক্তি-প্রমাণ-তথ্য-নিয়ম দিয়ে লোহার মত শক্ত করে গড়া অঙ্কের অধ্যাপকের মনটাকে একটুও শিথিল করা যায় নি। তাই বলে একটা মানুষের জেদের জন্য মেয়েটির জীবন নষ্ট হয়ে যাবে! সে ভেতরে ভেতরে মরিয়া হয়ে উঠে বলল, তুই একটু দাঁড়া তো সুলো—আমি আসছি—বলেই ঝড়ের বেগে ছুটে গেল অরুন্ধতী। গেল নিজের ঘরে। নিয়ে এল একটি মোটা রোলার, কালো ফিতে আর অনেকগুলো কাঁটা। এ কী মামীমা, তুমি কি করছো—কী লাভ—তোর গোল মুখ, মাথায় চুল বেশি, আক্রমণ শিল্পীর মত অরুন্ধতী তার মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বিড় বিড় করে বলল, —বলেই রোলারটি অর্ধচন্দ্রাকারে ঘুরিয়ে নিয়ে যেই তার মাথায় বসাতে গেল অমনি যন্ত্রণায় গলা চিরে চীৎকার করে উঠল সুলগ্না—মামা এসব টান মেরে খুলে দেবে মামীমা—কেন—কেন তুমি—আমাকে সাজাতে এসেছ—ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং বাইরে কলিং বেল বেজে উঠল। জুতোর তীক্ষ্ণ মস্‌মস্ শব্দ শোনা গেল।

মামা এসে পড়েছেন—মামা এসে পড়েছেন—ভয়ে আতঙ্কে ফিস্‌ফিস্ করে বলল সুলগ্না—তোমার পায়ে পড়ি মামীমা! আমাকে সাজাতে চেষ্টা করো না—খুব—খুব অশান্তি হবে—

কোন কথাই যেন শুনতে পাচ্ছে না অরুন্ধতী। দ্রুতহাতে সুলগ্নার মাথার মাঝখানে সিঁথি কেটে সামনের চুল পিছনের দিকে সরিয়ে আঁচড়ে ডানদিকের কাঁধের ওপর দিয়ে সামনের দিকে নিয়ে এল। নিচ থেকে রোলারে চুলটি ভেতরের দিকে জড়াতে লাগল—

আশ্চর্য! আবার তুমি ওকে সাজাচ্ছো? অঙ্কের অধ্যাপক সুরেন লাহিড়ী ঘরে ঢুকল। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলল, তুমি জানো অরু ওসব আমি পছন্দ করি না—

অনেকবার বাধা দিয়েছ, দয়া করে একটিবার আমাকে ভাল করে ওর চুল বাঁধতে দাও। দেখবে অজন্তা খোঁপা বাঁধলে ওর ওই মুখশ্রীই কত সুন্দর দেখাবে, উত্তেজনায় ভেঙে পড়ল অরুন্ধতী। সুলগ্নাকে আড়াল করে সামনে এসে দাঁড়ালো।

চুল খুলে পিঠে ছড়িয়ে দিয়ে, যে শাড়ি পরে আছিস সেই শাড়ি পরেই বাইরের ঘরে চলে এসো সুলগ্না, বিচারকের রায় দেওয়ার মত করে গম্ভীর আর কঠোর গলায় বলল সুরেন লাহিড়ী। বাইরে যেতে যেতে তিক্ত গলায় বলল, আর্টিফিসিয়েল কোন কিছুকে আমি বরদাস্ত করি না—

অপমানে ক্ষোভে যন্ত্রণায় নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অরুন্ধতীর দিকে যেন কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে জুতোয় মস্ মস্ শব্দ তুলে চলে গেল প্রফেসার লাহিড়ী।

তারপরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত।

মেয়ে দেখানো হলো। বরাবরের মত এবারও পাত্রপক্ষ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। আরও একবার ঘরের দূর অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে সুলগ্না নিজের হতশ্রী রূপের জন্য গোপনে চোখের জল ফেলল। আর অরুন্ধতী—

অরুন্ধতীর মনে হল, কে যেন তার রোমকূপের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আগুনের ফুলকি ছিটিয়ে দিয়েছে। সে নিঃশব্দে দাবাগ্নির মত জ্বলে যেতে লাগল! স্বামীর মতের বিরুদ্ধে মা-র কাছে টাকা ধার করে 'কবরী বিচিত্রা' প্রতিষ্ঠা করেছিল; ফিলজফিতে এম-এ পাশ করে স্কুলের প্রধানা শিক্ষিকার চাকরী ছেড়ে দিয়ে সেলুন খুলেছিল—অনেক অনেক বিরুদ্ধাচারণ করেছে কিন্তু কখনো তাঁকে অসম্মান করে নি। বরং বরাবর সে আপোষ করে চলতে চেয়েছে। কিন্তু ভিন্নভিন্ন দুটি দূর গ্রহে তাদের মনের বাসা! তাদের ভেতরে কোটি কোটি মাইলের ব্যবধান!

দিন কাটে। মাস যায়। বছর ঘুরে আসে। লাহিড়ী পরিবারের জীবনযাত্রা এক ছন্দে বয়ে চলে। তিনটি প্রাণী তিনটি পৃথক পৃথক জগতে বাস করে। একজন ইনটিগ্র্যাল ক্যালকুলাস আর ইকোয়েশান নিয়ে ডুবে থাকে, আর একজন

'আর্ট এ্যান্ড ক্র্যাফ্‌ট অফ মডার্ন হেয়ার ড্রেসিং' নিয়ে মেতে থাকে অহরহ। তাদের মাঝখানের সেই সেতু—সুলগ্নার অস্তিত্ব বাড়িতে পাওয়া যায় না বললেই হয়। সেই ঘটনার পর থেকে সে যেন তার নিরবচ্ছিন্ন হতাশা আর দুর্ভাগ্যের রাজ্যে নির্বাসিত হয়ে গিয়েছে।

ম্যাথমেটিক্সের প্রফেসার কিন্তু কাজের ফাঁকে ফাঁকে লক্ষ্য করে সব। লক্ষ্য করে—আর দুটো প্রাণী আরও—আরও যেন দূরে সরে যাচ্ছে ক্রমাগত। যাক্! ম্যাথমেটিসিয়ান এবং ফিলসফার বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন, এমোশানস অর্থাৎ ভাবাবেগ মানবিক গুণ নয়—এগুলো প্রিমিটিভ ইনস্টিংক্ট.....

ভাগ্নীটাকে এম.এ. পাশ করিয়ে বসিয়ে রেখেছো কেন? সহকর্মী বিনয়তোষ বলে, হয় বিয়ে দাও—না হয় চাকরিতে ঢুকিয়ে দাও—আইডল্ ব্রেন হলো ওয়ার্কশপ—

কোন কথা বলল না লাহিড়ী। পরের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে মানুষ এত কৌতূহলী! তার হঠাৎ মনে হল, সে-ই সুলগ্নার জীবনটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে না তো। আধুনিককালের ধ্যানধারণা, অপ্রতুল বেশবাস, ব্যবহারে, কথায় কৃত্রিমতাব এই সর্বনাশা স্রোতের মুখ থেকে তাকে বাঁচাতে গিয়ে হয়তো তারই ক্ষতি করছে।

তাই দেব না দেব না করেও সিমলার পাত্রপক্ষকে মেয়ে দেখতে আসতে অনুরোধ করেছে। ছেলেটি 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজে' হিমালয়ের গিরিশৃঙ্গ' নিয়ে গবেষণা করে। জিওলজির ছাত্র। হিমালয়ের গিরিশীর্ষের পাথরে পাথরে স্তব্ধ হয়ে আছে পুরাকালের যে গর্জিত সমুদ্রের কলরোল, স্তরে স্তরে অদৃশ্য কালিতে লেখা আছে যুগযুগান্তরের যে ইতিহাস—সেইসব দিকেই তার খর নজর—এসব জানিয়েছে ইনস্টিটিউটের এক অধ্যাপক বন্ধু! আরও জানিয়েছে, রূপসী নয়। স্বাস্থ্যবতী মেয়ে চাই! পাহাড়ে পাহাড়ে বিভিন্ন ক্যাম্পে থাকতে হতে পারে—

তবু দেয় নি চিঠি। আবার বন্ধু তাড়া দিয়ে লিখল—কি হে চুপ করে আছো কেন? বেশি লেখাপড়া জানা মেয়েদের স্বাস্থ্য প্রায়ই ভাল হয় না—তোমার ভাগ্নী তার ব্যতিক্রম—নির্ঘাত পছন্দ হয়ে যাবে—

চিঠি দিয়ে দিয়েছে। আজ কি কালের ভেতরে ছেলে এসে পড়বে—

পরদিন প্রফেসারস রুমে পা দেওয়ামাত্র বিনয়তোষ ছুটে এল অধ্যাপক লাহিড়ীর কাছে। বলল, তোমাকে আজ বিকেলে আমার বাসায় একটু যেতেই হবে ভাই—

কেন?

আমার মেয়েটিকে দেখতে আসবে। ছেলেটি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার—

বিনয়তোষের মেয়েও কুরূপা। কিন্তু অটুট স্বাস্থ্য। বিজ্ঞানের ছাত্র স্বাস্থ্যবতী স্ত্রীকে পছন্দ করে কি না—শুধু সেই কৌতূহলেই মেয়ে দেখার আসরে এল লাহিড়ী!

ধীর পায়ে মেয়ে এল। এল রাণীর মত লঘুছন্দে। সবুজ রঙের লাইলনের ফিতে জড়ানো দীর্ঘ কালো বেনীটি পিঠের সীমানা ছাড়িয়ে অনেকখানি নিচে নেমে এসেছে। কপালে ময়ূরকণ্ঠী রঙের টিপ জ্বলজ্বল করছে।

পাত্রের অভিভাবক এবং পাত্রের চোখে মুগ্ধ দৃষ্টি। লাহিড়ীর চোখে বিস্ময়! এ কে? এ কি বিনয়তোষের সেই কালো রেঁটে কদাকার মেয়েটা!

পাশের ঘরে মেয়েরা ফিস্‌ফিস্ করে—পছন্দ হতেই হবে—কবরী বিচিত্রা থেকে মেয়ে সাজিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে—

কবরী বিচিত্রা! লাহিড়ীর কান দুটো ঝাঁঝাঁ করে উঠল। ঝড়ের মত সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অন্ধকার রাস্তা ধরে চলেছে লাহিড়ী। কানের পাশে রগ দুটো দপ্ দপ্ করছে। তীব্র উত্তেজনার জোয়ার বয়ে চলেছে তার মাথার ভেতরে। হঠাৎ নির্জন অন্ধকার রাস্তায় পাউডার-পমেড-লিপস্টিক মাখা, ফলস চুল দিয়ে বেনী দোলানো বিনয়তোষের সেই মেয়েটা যেন তর্জনী উঁচিয়ে বলতে লাগল—স্বাস্থ্যের স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে একালে কেউ পছন্দ করে না; কেউ চায় না।

না চাইতে পারে। তাই বলে সে ঘৃণ্য কৃত্রিমতাকে, মেক-আপকে, প্রশ্রয় দেবে? না—সে কিছুতেই তা হতে দেবে না। সে সারা দেশের ভেতরে একজন গণ্যমান্য গণিতবিদ্। তার লেখা পাটিগণিত দেশের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তের স্কুলের ছেলেমেয়েরা পড়ে। সে একজন যুক্তিবাদী হয়ে এত বড় মিথ্যাকে, এত বড় শঠতা সে কেমন করে মেনে নেবে

শ্যাম্পু।

ল্যানোলিন বিউটি ক্রীমস।

টয়লেট লোসানস।

কবরী বিচিত্রার পাশ দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল লাহিড়ী। রাস্তা থেকে অরুন্ধতীর চেম্বারটা এবং সেলুনের ভেতরের খানিকটা দেখা যায়।

একজন কর্মচারী বলছে অরুন্ধতীকে—কি কি টয়লেট ফুরিয়ে গিয়েছে—

তোমরা আগে থেকে বলতে পারো না, অরুন্ধতী বিরক্ত হয়, দেখছো না রোজ কি প্রচণ্ড ভীড় হচ্ছে—যাও কাজে—

লাহিড়ীর নজরে পড়ে সারি সারি চেয়ারে বসে রয়েছে মেয়েরা। কারিগরেরা নিপুণ হাতে প্রত্যেকের মাথায় নানা প্যাটার্নের খোঁপা বাঁধছে। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে আলোকোজ্জ্বল সেই সেলুনের দিকে তাকিয়ে হিংস্র একটা অভিসন্ধির মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে অধ্যাপক লাহিড়ী। ফ্যাশানের বিষাক্ত জীবাণু ছড়ানোর এই ডিপোটাকে যদি বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যেত!

এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই ঘটে গেল কাণ্ডটা। এক বিদেশী ম্যাথম্যাটিসিয়ান এসেছিলেন স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে। তাঁর সংবর্ধনা সভা থেকে ফিরতে বেশ রাত হলো লাহিড়ীর।

গলির মোড়ে পা দিয়েই থমকে দাঁড়ালো। এ কি। তার বসার ঘরে নিওনের শাদা আলো ঝলমল করছে!

তাহলে কি হেড এক্সজামিনার এসেছেন! হয়তো খাতা দেখার কোন ত্রুটি হয়েছে! আর একটা পেপারের প্রশ্নও তো করেছে—হয়তো সেটাই আউট হয়ে গিয়েছে! এখনকার ছাত্রদের অসাধ্য কোন কাজ নেই! বুকের ভেতরে স্নেহ হাতুড়ি পিটছে। দরজার আড়াল থেকে উঁকি দিয়েই বিদ্যুৎপৃষ্টের মত সরে দাঁড়ালো। নিজেকে আড়াল করে দেখল, একটি রঙীন মরীচিকার মূর্তির মত জ্বলছে সুলগ্না। মাথায় কালো গম্বুজের মত মস্ত খোঁপা। তাতে বেড় দেওয়া বেলীর মালা যেন হাসছে। কপালে চন্দনের লবঙ্গতিলক। হাল্কা নীলাভ বেনারসীর আড়ালে তার সুঠাম তনুর ছায়াময় লোভানি!

তার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে অরুন্ধতী বিজয়িনীর মত দৃপ্ত ভঙ্গীতে। আর—

আর বহু ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও সুলগ্নাকে দেখতে আসা কোন ছেলের চোখে যা দেখে নি—তাই দেখতে পেল। স্পষ্ট দেখল—জিওলজিস্টের তরুণ চোখে লোভের ছায়া!

কি করছো তুমি অরু—সুলোর এত বড় খোঁপা কখন হতে পারে না—তুমি! আরও অনেক কথা বলে চিৎকার করে উঠতে চেয়েছিল লাহিড়ী। কিন্তু কিছু বলল না। বলতে পারল না। যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি চলে গেল।

অন্ধকার পথে নামল সে। চোখের সামনে সব ঝাপসা হয়ে আসছে। তার মনে হল, কালো জলের স্রোতে তার সত্যনিষ্ঠা, যুক্তি-তর্ক, প্রমাণ-নিয়ম সব—সব ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দিকপ্লাবী সেই বন্যার জলে সে-ও ডুবে যাচ্ছে। ডুবন্ত অধ্যাপক শেষবারের মত দেখল—তীর সরে গিয়েছে বহু—বহু দূরে। শুধু দিক্‌প্রান্তে জেগে রয়েছে একটি হাস্যপ্রদীপ্ত মুখ। সুলগ্নার মুখ। তার বিষণ্ণ ও করুণ সেই চোখে পরিতৃপ্তির হাসি।

ইনটারভিউ সুরু হতে তখনও দেরি আছে। নিশিকান্ত হাতের সোনা বাঁধান রোলেক্স ঘড়িটার দিকে তাকালো। তারপর বাইরে পেতে রাখা বেঞ্চিটার ওপর বসে ভাবতে লাগলো-ছোট কাকার কথা। তাঁর সঙ্গে যেন ইনটারভিউ বোর্ডের কার কার জানা আছে। ইনটারভিউ-এর চিঠি পেয়ে অবশ্য সে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই কার কার সঙ্গে যেন দেখাও করেছে। পকেট থেকে একটা দীর্ঘ নামের ফর্দ বের করলো নিশিকান্ত। তাতে ইনটারভিউ বোর্ডে যাঁরা যাঁরা আছেন সকলেরই নাম এবং ঠিকানা সযত্নে লেখা। কোথাও কোথাও আবার নামের পাশে নোটও দেওয়া আছে। কেন্দ্রায় কীভাবে কাকে পাওয়া যাবে এবং ধরা যাবে। কার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে কার কাছে যেতে পারা যাবে—তাদের নাড়ি-নক্ষত্রের বিস্তারিত বিবরণ। কিন্তু নিশিকান্ত দেখলো প্রায় সবাইকেই তার ধরা হয়ে গেছে, বড়দা বড় চাকুরে। তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তিও খুব বেশি; ভাই-এর চাকরির ব্যাপারে তিনিই সচেষ্ট বেশি এবং ছোট ভাই-এর জন্য ধরা করার ব্যাপারটা তিনি যথাসাধ্য শেষ করে ফেলেছেন।

অবশ্য এবার এই ধরাধরির ব্যাপারে বড়দার খুবই অসুবিধা হয়েছিল। বাড়িতে অবশ্য দুটো গাড়ি কিন্তু একটার স্লাইভার এ সময়ে মেয়ের অসুখ বলে ছুটি নিয়েছে। নিশিকান্তের রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল।—দাঁতে দাঁত ঘষে সে বললো: যত সব ছোটলোকের পাল্লায় পড়া গেছে। মেয়ের অসুখ করবার আর যেন সময় পেল না।

আর একটা গাড়ি অবশ্য বড়দা নিজেই চালায়। তারও—অসুবিধা কত। গাড়ি বড়দা সব সময়েই প্রায় নিয়ে বেরোয়-আর নিশিকান্তকে হয় ট্রামে না হয় বাসে কুমড়োর মত ঝুলতে ঝুলতে যেতে হয়; নয় ট্যাক্সি করে যেতে হয়। আর ট্যাক্সি করে না গিয়েই বা কি করবে—ট্রামে-বাসে কখনও ভদ্রলোক যেতে পারে? জামা-প্যান্টের ক্রিজ নষ্ট হয়ে যায়, লোকের ময়লা হাত গায়ে লাগে, ঘামের দুর্গন্ধ লেগে যায়—সে ভারি বিশ্রী। নিশিকান্ত উঠে দাঁড়ালো বেঞ্চিটার থেকে। দামী প্যান্টের ভাঁজ-

টাইগুলো একবার পরীক্ষা করে নিলো সে। তারপর টাই-এর নট ঠিক আছে কিনা একবার বেশ করে দেখে আবার বেঞ্চিটার ওপর বসলো।

কতলোককে এরা ইনটারভিউ-এর জন্যে ডেকেছে কে জানে? হয় তো দশ-জন, হয়তো পনেরো জন। ভারি তো একটা ক্লার্কের চাকরি, নিশিকান্ত ভুরু কোঁচকালো। বড়দা বলেছিল : যা নিশিকান্ত, একটু কাজে-কর্মে মন দে। সারাদিন বসে থাকবি আর গল্প করবি নইলে খেলে বেড়াবি—। এমনি করে কি দিন কাটায়? তবু কর একটা কাজ, যাই পাস। জন্তে ড্রাইভারের মাইনেটাও তো ঘরে আসবে। কিছু করবি না, শুধু শুয়ে-বসে সময় কাটাবি আর মোটা হবি। এর পরে তো আর নড়তেই পারবি না। তা ছাড়া ওই অফিসের হেড ক্লার্ক আমার বন্ধু। চাকরি যে করছিস তা তোর একবারও মনে হবে না।

নিশিকান্ত পকেট থেকে এক তাড়া চিঠি বের করে পড়তে লাগলো কোনোটা অনুরোধ করে বড়দাবাবুকে—কোনোটা বা ম্যানেজিং কমিটির ডাইরেক্টরকে ঘায়েল করবার জন্যে কোন রাঘববোয়ালের পত্র। কোনোটা বা কোন খ্যাতনামা ব্যক্তির নিশিকান্তের গুনপনা ব্যাখ্যান করা সার্টিফিকেট।

একটা হালকা জুতোর শব্দ শুনে, খড়মড় করে দলামোচড়া করে কাগজ-গুলো পকেটে ভরে ফেললো নিশিকান্ত। নিশ্চয়ই তার প্রতিদ্বন্দ্বী, না হয়ে যায় না।

একটি রোগা ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। পরণে আধময়লা একটা নয়-হাতি লাল পাড় ধুতি। জামায় রিপু করা। তৈলহীন উস্কো-খুস্কো কাকের বাসার মত চুলের শরশয্যা যেন মাথায়। পায়ে ছেঁড়া চটি। লোকটা ধপ করে নিশি-কান্তের পাশে বসেই হাঁপাতে লাগলো।

: যা ছুটে এসেছি কি বলবো। ভাবলাম আজ আর ঠিক সময়ে পৌঁছুতেই পারবো না। যাক কোন রকমে এসে তো পড়েছি, কটা বাজলো স্যার—?

নিশিকান্ত রোলেক্স ঘড়িটার দিকে তাকালো—সাড়ে চারটে। এখনও আধ ঘণ্টা বাকি আছে।

: পাঁচটায় তো ইনটারভিউ আরম্ভ। যাক আধ ঘণ্টা বিশ্রাম করা যাবে। হাঁপারের মত বুক ভরে খানিকটা নিঃশ্বাস নিয়ে নিলো লোকটা, তারপর খানিকটা দম নিয়ে বললে : মশায়ের নাম? বলেই ঠোঁট দুটো ফাঁক করে নিকেলের চশমার ওপর দিয়ে কোটরগত চোখ দুটো মেলে ধরলো লোকটা নিশি-কান্তের মুখের ওপর।

: নিশিকান্ত সাহা।

: ও! আর বেশ, আ রেশ। মশায়ের থাকা হয় কোথায়? আবার দ্বিতীয় প্রশ্ন।

সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল নিশিকান্তের এ ধরণের খেজুরে আলাপে। সংক্ষেপে সে উত্তর দিলো : কাছেই।

: ছেলে-পুলে কি মশায়ের? বলেই আবার নাক কুঁচকে তাকালো নিশি-কান্তের দিকে।

: বিয়ে করি নি। নিশিকান্ত ঘুরে বসলো বেঞ্চিটার ওদিকে। অপরিচিত লোকের সঙ্গে এ ধরণের বাজে কথা বলতে সে মোটেই পছন্দ করে না। আর তার ওপর লোকটার যেমন ময়লা কাপড়—তেমনি তার সঙ্গে ম্যাচ করে পায়ের ছেঁড়া জুতো। তার ফাঁক দিয়ে আঙুলগুলো বের হয়ে গেছে। লোকটা একেবারে জংলা। না জানে ভদ্র ব্যবহার, না আছে কথাবার্তা বলবার কোন ছিরি-ছাঁদ। নিশিকান্ত ভারি বিরক্ত বোধ করলো। কতক্ষণ এই বাজে লোকটার সঙ্গে তাকে কাটাতে হবে? যত সব যন্ত্রণা।

কিন্তু লোকটা এবার আর যেন কী একটা বুঝতে চেষ্টা করলো খানিকক্ষণ। তারপর আর প্রশ্ন না করে নিজেই বলে চললো : বিয়ে করেন নি বেঁচে গেছেন। কি বলবো মশাই—আমি তো বিয়ে করে মাটি খেয়েছি। সাত-সাতটা মেয়ে—

: তা বেশ! নিশিকান্ত এবার ঘুরে বসলো।

: বেশ বলেছেন। একটু বাঁকা হাসি দেখা গেল লোকটার মুখে, তা আপনি বলতেই পারেন। ব্যাচেলার লোক। বলবেন বৈকি ও কথা। কিন্তু আমি তো ও সপ্তরত্ন নিয়ে না খেয়ে মরি এই দুর্দিনের বাজারে। বাড়ি ছিল পাকি-স্তানে—সব ফেলে এক কাপড়ে চলে আসতে হয়েছে। সাত মেয়ে, গিন্নি ওদের হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে এলো। সে কি দৃশ্য।

: সাত মেয়ের হাত ধরে এলেন, পেছনে স্ত্রী! বলুন মহাসমারোহে শোভাযাত্রা করে এলেন!

: ঠাট্টা করছেন?—সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে আসতে কলজেটা ফেটে যেন চৌচির হয়ে গেল। বাড়িতে একটা ছোট্ট স্কুল ছিল—ছাত্র পড়াতাম। আসবার সময় ছেলেদের কী কান্না। কি করবো বলুন—বারো বছর কামড়ে পড়ে থেকেও সব ছেড়েই চলে আসতে হলো। আসবার সময় রহিমটা আমার পা জড়িয়ে ধরলো। তখন আর আমি স্থির থাকতে পারলাম না। ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম; বললাম : তোকে বিনা দোষে বহু মেরেছি রে। কি করবো বল। অভাব—অনটনে মাথা ঠিক থাকতো না। তার ওপর তোরাও দুষ্টুমি করতিস। যাক্‌গে তুই আমায় ক্ষমা কর।—ছেলেটার চোখের জলে আমার পা ভিজে গেল; বললে : মাষ্টার সাহেব আমার কসুর মাফ করুন। বলতে বলতে কানে সুতো বাঁধা নিকেলের চশমাটা একবার কাপড়ের খুঁট দিয়ে মুছে খানিকটা প্রেমে বললো : আজ যখন এখানে চাকরির জন্যে দরজায় দরজায় ঘুরি তখন আমার রহিমের কথা মনে পড়ে। সে বলতো : মাষ্টার সাহেব, আপনি দেশ ছেড়ে যাবেন না। কোথায় যাবেন আপনি? আমরা তো আছি আপনার। আমি বাবাকে বলে আপনার জন্যে গ্রামে বড়ো স্কুল করিয়ে দেব। আপনি হবেন হেড মাষ্টার—, আপনার কষ্ট কিসের।

: বেশ তো পড়াশুনা জানেন বলেই মনে হচ্ছে। তবে আর এ কেরাণীর চাকরির চেষ্টায় এলেন কেন?—নিশি-কান্ত জিজ্ঞেস করলো।

: কেন এলাম? এখানেও এখনও দু'বেলা টিউসনি করি। ছেলে পড়াই, সারা জীবন মাষ্টারী করেছি। ছেলে পড়াবার ঝোঁক তো ছাড়তে পারি না এখনও। কিন্তু তাতে কী সংসার চলে। বস্তিতে থাকি একটা ঘর নিয়ে। বড় মেয়েটা বিধবা; জেটাকে বিয়ে দিয়েছি। এখনও পাঁচটা মেয়ে—কাকের বাচ্চার মত খাবার জন্যে হাঁ করে আছে। তারপর তাদের স্কুলের খরচ, জামা-কাপড়।

: উঃ, তবে তো আপনি বিরাট ব্যাপারের মধ্যে পড়েছেন। নিশিকান্ত বললো : একটা মোটা মাইনের চাকরি না পেলে আপনার চলবে কী করে? দেখি আমি যদি কিছু—

: করবেন চেষ্টা? সত্যি বলছেন? বুড়ো লাফিয়ে উঠলো : জানেন, বড় বিধবা মেয়েটা পালিয়েছে একটা দোকানদারের সঙ্গে। তার জন্যে কাঁদবো কি। দোকানদারের দস্যি-বৌটা আমার পাশের ঘরেরই ভাড়াটে। সব সময় গালাগালি আর শাপসাপান্ত দিচ্ছে। গিন্নি বড় ভালো মানুষ। সে আর সহ্য করতে পারছে না। এ সব বলে : আমায় বিষ এনে দাও—আমার আর সহ্য হয় না—ভদ্রলোকের মেয়ের এমন হয়? কি যে বিপদে আছি কি বলবো। আপনি আমার যে উপকার করলেন—

: উপকার আর করলাম কোথায়?—নিশিকান্ত পকেট থেকে গোল্ডফ্লেকের টিন বের করলো।

ভদ্রলোক অনেকক্ষণ ধরে নিশিকান্তের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলো। তারপর বললো : স্যার আপনাকে দেখে তো বড়-লোকের ছেলেই মনে হচ্ছে। আপনি কেন এই ছোট একটা কেরানীর কাজের জন্য

ইণ্টারভিউ দিতে এলেন? এ কাজ কি আপনার মানায়?—

: না—মানে—নিশিকান্ত বললো: মানায় না। বড়বাবু আমার দাদার বন্ধু। তিনিই বললেন, নিশিকান্ত একটা কাজ কর না—ঘরে বসে আছ। তবু তো ড্রাইভারের মাইনেটা ঘরে আসবে।

: ও তাই বলুন। এতক্ষণে সব আমার কাছে পরিষ্কার হলো। বাইরের দামী গাড়িটা—, এটা আপনারই? তা যেমন দামী পোষাক—দেখেই বুঝেছি এ সব কাজ—

লোকটার চোখে-মুখে গ্রামের সরলতা। শহরে এসেছে তবু গ্রামের সরলতা এখনও মুছে যায় নি মন থেকে। এখনও মানুষকে কত সহজে বিশ্বাস করতে জানে। এখনও সরলভাবে মানুষকে ভালবাসে।

সামনে দিয়ে একজন জুতো মস্‌মস্‌ করতে করতে চলে গেল। পেছনে ফাইল নিয়ে বেয়ারার সঙ্গে আরো একজন, আরো একজন। ইতিমধ্যে আরো লোক এসে গেছে। তারাও উক্ত পদপ্রার্থী। বুড়ো এর-ওর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো। মনে হলো এরা ইতিপূর্বে অনেক জায়গায়ই ইণ্টারভিউ-এর জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়েছে।

কারু সঙ্গে কথা বলবার আর সুযোগ না দেখে বুড়ো বাইরের বারান্দায় পায়চারী করতে লাগল।

এখুনি ইণ্টারভিউ সুরু হবে। বুড়ো নিশিকান্তের দিকে এগিয়ে এলো: আপনার ঠিকানাটা একবার দেবেন স্যার। —দরকার হতে পারে ভবিষ্যতে। এখানের চাকরিটা তো আপনারই হবে। তাই ভাবছিলাম। পরে যদি আপনি আমার জন্যে একটু চেষ্ট করেন—

: অবশ্য।—গন্ধভরা রুমাল নিয়ে মুখ মুছলো নিশিকান্ত, তারপর হাতের হীরের আংটিটা একবার ঘুরিয়ে সোজা করে নিয়ে ঘস ঘস করে ইংরিজিতে নাম ঠিকানা লিখে দিল।

: বাঃ হাতের লেখাটি তো ভারি সুন্দর।—আমি খুব খুশী হলাম: গলায় যেন ঠিক মাস্টারমশায়ের ছাত্রের প্রতি সস্নেহ উৎসাহের স্বর।

নিশিকান্ত একবার তাকালো বৃদ্ধের দিকে। বয়সের চাইতেও দারিদ্র্যের ছাপ বেশি সর্বাঙ্গে। তবু মুখখানায় কোন মালিন্য নেই। এখনও পরের কিছু ভালো দেখলে অকৃপণভাবে খুশি হতে জানে।

: থাক এটা আমার কাছে। আপনার এ চাকরীটা হলে আপনি আমার কথা কিন্তু ভুলবেন না। আমার জন্যে একটু চেষ্টা করবেন।

: নিশ্চয়ই—নিশিকান্ত বললো।

এদিকে ইণ্টারভিউ চলেছে। এবার বুড়োর ডাক এলো। হরেকৃষ্ণ রায়!

—হ্যাঁ আমি! যাচ্ছি স্যার—ডাকছেন। যাচ্ছি—হবে তো নাই।—শিথিল অলস পায়ে বুড়ো চলে গেল।

কিন্তু ফিরতে তার বেশিক্ষণ লাগলো না। তেমনি প্রসন্ন মুখেই সে বেরিয়ে এলো।—ডাক এলো নিশিকান্তের।

: কি জিজ্ঞেস করলো আপনাকে? নিশিকান্ত জানতে চাইলো। চট করে বলুন তো!

: কি আর জিজ্ঞেস করবে বলুন তো। এই ছেঁড়া ময়লা কাপড়—দারিদ্র্যের চেহারা দেখলে কি কারুর চাকরী দিতে ইচ্ছে করে। বড়বাবুর বিরক্তি ভরা মুখের ভাব দেখেই বুঝলাম আমার হবে না। কিন্তু স্যার আমি আপনার জন অনুরোধ করে এসেছি—বলেছি: আমি চিরকাল মাস্টারি করেছি; লোক চিনি। বেশ ছেলে ঐ নিশিকান্ত সাহা। যেমন চেহারা—বেশ পোষাক-আসাক, ইয়ং ম্যান। ফুল এনার্জি নিয়ে কাজ করবে। আমরা বুড়ো—পঙ্গু। আমাদের নিলে কি ওদের মত এনার্জি নিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো। ওকেই নিন স্যার। আমি মাস্টার—মানুষের জহুরী—। আমার চোখ ভুল করে না। বড়বাবু আমাকে ধমক দিলেন। বললেন: যান, চলে যান। আমাকে আপনার সাজেসন দিতে হবে না। যাই স্যার। প্রার্থনা করি আপনার হোক।

নিশিকান্ত একবার দাঁড়ালো। কি মনে করে চোখটা আনত করলো। একবার দ্বিধা করলো। এক পা এগোলোও। তারপর সোজা পেছনে ফিরে চলে গেল ইণ্টারভিউ দিতে।

* * *

সাত দিন পর বুড়ো হরেকৃষ্ণ রায়কে ডেকে পাঠিয়ে চিঠি দিয়েছেন বড়বাবু দেখা করতে।

বুড়ো হরেকৃষ্ণ রায় দেখা করতে গিয়ে জানলেন নিশিকান্ত তার চাকরীটা অনেক চেষ্টা করে তার মাস্টার মশায়কে দিয়ে গেছে। ছাত্রের এটা নাকি কর্তব্য।

হতভম্ব হয়ে খানিকটা তাকিয়ে থেকে বুড়ো হরেকৃষ্ণ রায় বললে: ছাত্র? কি করে হবে বলুন তো। আমার বাড়ি ঢাকা। আমি বরাবর ওখানেই। আর ওরা এখানকার লোক। আমি ওদের চিনিও না। এখানেই প্রথম দেখা।

: ভুলে গেছেন—। বয়স হয়ে গেছে, ভুলে গেছেন। অফিসের হেড ক্লার্ক বললো: ও ওর দাদাকে দিয়ে ধরিয়ে চাকরীটা করে দিয়েছে আপনার। ছাত্র না হলে কি এতটা কেউ পরের জন্য করে?—নিন—এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার। কাল থেকে জয়েন করবেন।

হরেকৃষ্ণ ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন: ছাত্র?—মনের মধ্যে পাকা জহুরী হরেকৃষ্ণ রায় খুঁজতে লাগলেন নিশিকান্তকে। মনের স্নেহের সমুদ্র মন্থনে যেন তলিয়ে গেলেন মনর অতলে। পেলেন কি হাজার চেনা মুখের মধ্যে নিশিকান্তের মুখ?

সদ্য প্রকাশিত হইল!

বাঙলা সাহিত্যের অদ্বিতীয় হাস্যরসিক

শিবরাম চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত

(১) মনের মত বৌ
(২) মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি
(৩) প্রেমের পথ ঘোরালো
(৪) প্রেমের বিচিত্র গতি
(৫) রক্তের টান
(৬) যখন তারা কথা বলবে

পৃষ্ঠা ২৪০

মূল্য মাত্র চার টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা-১২

রেখা অসময়ে হাসিমুখে এসে বললে, কী খাওয়াবি বল?

করুণা শুয়ে শুয়ে 'এ্যানাটমি'র পাতা উল্টাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি উঠে বললে, আমার চিঠি?

—হ্যাঁ গো! যে চিঠির জন্যে তোর ঘুম হচ্ছিল না!

করুণা ওর হাত থেকে খামখানা ছিনিয়ে নিল।

—কী করে জানলি সেই চিঠি?

—পূর্বস্থলীর ছাপ রয়েছে স্পষ্ট।

করুণার মুখটা একবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন দুর্ভাবনার ছায়া পড়ল।

এত বড় চিঠি কেন? আবার কোনো কম্প্লিকেসান দেখা দিল নাকি?

রেখা বললে, কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসও হতে পারে!

করুণা খামখানা ছিঁড়ে ফেলল। ভেতরে দু-তিনখানা এক্সারসাইজ খাতার পাতা। বোঝা যাচ্ছে অধৈর্য আবেগে পাতাগুলো ছেঁড়া হয়েছে। হাতের লেখাটা পুরুষের নয়। বড় বড় গোটা গোটা অক্ষরে ফাঁক ফাঁক করে লেখা বলেই চিঠিখানা বড় মনে হয়েছিল।

এক নিশ্বাসে করুণা চিঠিখানা পড়ে ফেলল। পত্রলেখিকা বলছেন—আমার স্বামী অবশ্যই আপনাদের দয়ায় জীবন ফিরে পেয়ে এসেছেন। এর জন্যে আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। কিন্তু এর পরেও কি আপনাদের চিঠি লিখে খবর নেবার দরকার আছে? তাও যদি ডাক্তার লিখতেন বুঝতাম। আপনি একজন নার্স। আপনার কি এইভাবে ব্যক্তিগত চিঠি লেখা উচিত? যে চিঠির জবাব পান নি তার কৈফিয়ৎ চেয়ে বারে বারে আমার স্বামীকে বিচলিত করা কি উদ্দেশ্যমূলক নয়? তা ছাড়া পল্লীগ্রামের কোনো ভদ্রপরিবারে এইভাবে নার্সের চিঠি আসা কেউ পছন্দ করে না।...

এমন চিঠি অপ্রত্যাশিত। করুণার মুখখানা লজ্জায় অপমানে বিবর্ণ হয়ে গেল।

রেখা বললে, কী হয়েছে?

করুণা কোনো কথা না বলে চিঠিখানা এগিয়ে দিল।

চিঠি পড়ে রেখা বললে, বেশ হয়েছে। তুই যেমন পাগল। তোরা এই রকমই পাওনা ছিল।

করুণার দু চোখ জলে ভরে গেল। চিঠিখানা আর ছুঁলো না। ধীরে ধীরে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। যেন আত্মগোপন করতে চাইল।

করুণাও মফস্বলের মেয়ে। পড়াশোনা বেশিদূর হল না। অথচ সাত পাকে বাঁধা পড়াও এ কালে খুব সহজ ব্যাপার নয়। তার ওপর বাপের আর্থিক দুর্দশা তো আছেই।

আর কোনো পথ নেই। তাই করুণা মেডিকেল কলেজে নার্সিং পড়তে এল।

এ এক বিচিত্র জগৎ। একদিকে রুগীর আর্তনাদ, অপারেশান-থিয়েটারে ডাক্তারের কর্তব্যকঠিন মুখ আর একদিকে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা—পাশের প্রতিযোগিতা—আর তারই মধ্যে নীরবে-নিভৃতে ছাত্র-ছাত্রীতে, ডাক্তারে-নার্সে প্রণয়গুঞ্জন। শুধু প্রণয়গুঞ্জনেই সীমাবদ্ধ থাকলে খারাপ লাগত না—কিন্তু ব্যাপার গড়িয়ে যায় অনেক দূর। করুণা আসবার কিছু দিন আগে এই হোস্টেলেই নিবেদিতা সরকার নামে একটি মেয়ে ঘুমের ওষুধ খেয়ে চিরদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়েছিল।

এমন যে ঘটে করুণা এখানে আসবার

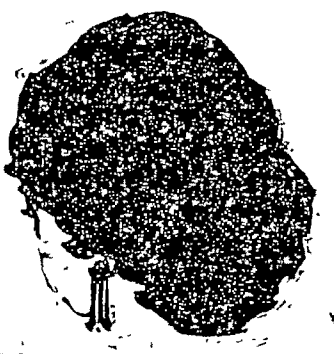

ক্যামেরার সামনে

মানবেন্দ্র পাল

আগে তা শুনেছিল। মন প্রস্তুত ছিল বলেই অভিভূত হয় নি। দর্শকের মতো দূর থেকে সব দেখে যেত।

কিন্তু দূর থেকে দেখবারও উপায় ছিল না। তার যারা একেবারে কাছের মানুষ তাদের চেহারাও তো দিন দিন স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। এখানে এসে প্রথম আলাপ রেখার সঙ্গে। পাতলা ফর্সা ছটফটে মেয়েটি। করুণার সঙ্গে তার সবদিক দিয়েই পার্থক্য। তবু তাকে ভালো লেগেছিল। কিন্তু কয়েকদিন পরেই রেখার স্বরূপ ধরা পড়ল। ঘন ঘন তার ঘরে ভিজিটার্সের আবির্ভাব। কেউ নাকি তার পিসতুতো দাদা, কেউ মামাতো দাদা, কেউ বা খুড়তুতো ভাই। কিন্তু এ কি রকম ভাই যে চোখের ইশারায় হাসি? করুণার মতো মেয়েরও বুঝতে কিছু বাকি রইল না। সেই থেকে রেখার ঘরে যেতে তার ইচ্ছে করে না। কিন্তু কাকে রেখে কাকে বাদ দেবে? দীপা, রীণা, শিবানী সবই একদলে। ব্যতিক্রম বোধ হয় শুধু সে একা। এ কথা তারাও বুঝত। তাই তারা তাদের মধ্যে করুণাকে ডাকত না। তারা যখন নিজেরা চুপি-চুপি কথা বলত, নিজেদের মধ্যে হাসা-হাসি করত কিম্বা স্টাফ, ওয়ার্ড-সিস্টার এমন কি হাউস সার্জেনদের নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠত তখন তাদের মাঝে হঠাৎ করুণা গিয়ে পড়লে তাকে ঠাট্টা করে সরিয়ে দিত। ভাব গম্ভীর মুখ দেখে বলত—করুণা, তোর নার্স না হয়ে ইস্কুলের হেডমিস্ট্রেস হওয়া উচিত ছিল।

করুণা রাগত না। কিন্তু ঠাট্টার উত্তরে ঠাট্টার ভাষা যোগাত না। সে বলত —সে আমার কপাল!

সহজ সুরেই কথাটা বলতে চাইত, কিন্তু কথাটা বড় গম্ভীর শোনাতো।

হেডমিস্ট্রেস হলে কি রকম হত বলা যায় না, কিন্তু নার্সিং লাইনটা তার খারাপ লাগত না। তার মনে হত, মানুষের সেবা করার মত ধর্ম নেই। একমাত্র নার্সদেরই মানুষের সেবা করার সুবর্ণ সুযোগ। শুধু সেবার প্রেরণাই নয়, চিকিৎসা-শাস্ত্রের ওপরেও তার দারুণ কৌতূহল—বিশেষ করে কোনো বড়ো অপারেশানের কেস এলে সে অ্যাটেন্ড করতে চাইত। দায়িত্ব প্রথম প্রথম তেমন কিছু পেত না—তবু সাহায্য করার সুযোগ পেত। কখনো ইন্‌স্ট্রুমেন্ট রেডি করত, কখনো গ্লাভস, অ্যাপ্রোণ বা মাস্ক স্টেরিলাইজ করে সাজিয়ে দিত, কিম্বা নেলব্রাস ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখত।

এই সঙ্গে তার আর একটা বিষয়ে কৌতূহল দেখা দিল। সে দেখত পেসেন্টরা দীর্ঘদিন রোগভোগের পর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যেত, কিন্তু তারপর আর তাদের খবর পাওয়া যেত না। এটা তার ভারী আশ্চর্য লাগত। বেড়ে থাকাকালীন যে-নার্সদের সঙ্গে আলাপ হত—সে কি শুধুই মুখের আলাপ? সেবার মধ্যে দিয়ে আন্তরিকতায়, উৎকণ্ঠায় কি একটা গভীর আত্মীয়তা গড়ে উঠত না? তা হলে সেই রুগী চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কী করে তার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকে যায়? সে কেমন আছে এটুকু জানবার আগ্রহও কারো হয় না? নতুন নতুন পেসেন্টের ভিড়ে পুরনো মানুষ এত শিগ্‌গির হারিয়ে যাবে?

করুণার তাই ইচ্ছে করত তার কোনো পেসেন্ট ভালো হয়ে চলে গেলে সে নিজেই চিঠি লিখে খোঁজ নেবে।

সেবার একটা ডি অ্যান্ড সি কেসে অ্যাটেন্ড করতে হয়েছিল। এই কেস-গুলোয় তার আনন্দের সীমা থাকত না। এগুলো বন্ধ্যা নারীকে মাতৃত্ব দান। ভাবতেও আনন্দে রোমাঞ্চিত হত।

অপারেসান হয়ে গেল। পেসেন্ট সুস্থ হয়ে উঠল। চলে যাবার সময় করুণা নিজে থেকেই তার ঠিকানা চেয়ে নিল। তারপর হিসেব করে সাত-আট মাস পর চিঠি লিখেছে—বাচ্চাকাচ্চা কিছু পেটে এসেছে কি না।

এ তার একটা অদ্ভুত কৌতূহল। রেখারা এ নিয়ে তাকে ঠাট্টা করত। সেই চিঠির উত্তরের আশায় সে এমনি ব্যাকুল হয়ে উঠত যে বন্ধুরা বলত—এও এক রকমের মানসিক বিকার!

শুধু ডি অ্যান্ড সি কেসেই নয়, যে পেসেন্টেরই ভার তার ওপর পড়ত, করুণা তার ঠিকানা চেয়ে রাখত। এই সব পেসেন্টদের কাছ থেকে যে চিঠি সে পেত সেগুলি অতি যত্নে একটা ক্রিমক্যাকারের বাক্সয় নম্বর দিয়ে সাজিয়ে রাখত।

রেখারা ঠাট্টা করে বলত, প্রেমপত্র তো জুটল না, রুগীর চিঠি পড়েই জীবন কাটাও।

মাস তিনেক আগে পূর্বস্থলী থেকে একটি ডিওডিন্যাল আলসারের পেসেন্ট এসেছিল। অনেকদিন তারই তত্ত্বাবধানে ছিল। চলে যাবার সময়ে করুণাই বারে বারে বলেছিল, কেমন থাকেন একটা খবর দেবেন। এই আমার ঠিকানা রাখুন।

খবর কিন্তু আসে নি। তাই ব্যাকুল হয়ে করুণাই চিঠি লিখেছিল। তারও উত্তর এল না। তখন দ্বিতীয় পত্র।

এবার পূর্বস্থলী থেকে সে চিঠির উত্তর এল।

রেখারা চলে গেলে করুণা চোখের জল মুছে প্রতিজ্ঞা করেছিল আর কখনো এভাবে চিঠি লিখবে না। এই তো মানুষের মন! এদের জন্যে ভেবে কিছু লাভ আছে? কিন্তু সে কিছুতেই কাউকে বোঝাতে পারে না—এটা কেবল মাত্র একটা ব্যক্তির জন্যে আগ্রহ নয়, রোগটা সারল কিনা, অপারেশানটা সাকসেসফুল হল কিনা এইটে জানারই কৌতূহল।

কিছুদিন পরেই ইমার্জেন্সি ডিপার্ট-মেন্টে একটা কেস এল। বাচ্চা একটি ছেলে। জ্বর, গলায় ব্যথা। কিছু খেতে পারছে না, লাল ঝরছে। দেখেই বোঝা গেল ডিপথেরিয়ার কেস। সঙ্গে সঙ্গে ট্র্যাকিয়োস্টমি করা হল। শ্বাস-নালী কেটে টিউব বসানো হল। খুবই সাকসেসফুল অপারেশান। করুণার ওপরই এই পেসেন্টের ভার পড়ল। ডাক্তার বুঝিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। শ্লেষা জমে উঠলে মাঝে মাঝে টিউব খুলে পরিষ্কার করে দিতে হবে। কিন্তু খুব সাবধানে।

এ দায়িত্ব তার পক্ষে অপ্রত্যাশিত। সারা রাত কী গভীর আগ্রহে রুগীর পাশে বসে বারে বারে অতি সাবধানে টিউব খুলে পরিষ্কার করে দিয়েছে।

ছেলে সুস্থ হয়ে উঠল। মা হাসতে হাসতে সকলকে কৃতজ্ঞতার নমস্কার জানিয়ে চলে গেল। যাবার সময় করুণা তার খাতাটা খুলে বললে, ঠিকানা?

ঠিকানা নেওয়া হল। চিঠিও চলে গেছে। আর কিছুই নয় শুধু একটি ব্যাকুল জিজ্ঞাসা—'মঙ্গল' ভালো আছে তো?

একদিন সন্ধ্যের সময়ে ইমারজেন্সি ডিপার্টমেন্টে অ্যাম্বুলেন্স এসে ঢুকল। ইমারজেন্সিতে পেসেন্ট এলেই কেমন যেন কৌতূহল হয়। সকলেই দেখতে গেল। সর্বাগ্রে রেখা, পিছনে করুণা।

এক ভদ্রলোক বাস্ ঝুলতে ঝুলতে আসছিলেন, লাইটপোস্টে ধাক্কা লেগে পড়ে গিয়েছিলেন। বাঁ হাতটা জখম হয়েছে। রক্তে শার্টের খানিকটা ভিজে গিয়েছে। তাঁর কাঁধ থেকে ঝুলছে একটা ক্যামেরা, আর হাতে একটা ছোটো ব্যাগ। ভদ্র-লোকের তখনো পর্যন্ত জ্ঞান ছিল। কিন্তু যখন দেখলেন নিরাপদ জায়গায় এসে পৌঁছেছেন তখনই তাঁর মাথাটা হেলে পড়ল—ভদ্রলোক জ্ঞান হারালেন।

রেখা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। সেখানে বসেই তাঁর পালসটা দেখল। তারপর উঠে গিয়ে সোজা সিনিয়র ও ডিউটি অফিসারকে অনুরোধ করল পেসেন্টটিকে তার কেয়ারে ভর্তি করে নিতে। আর ভদ্রলোকের ক্যামেরা ব্যাগ নিয়ে গিয়ে রাখল নিজের কোয়ার্টারে। দীপাও ছিল। সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল—কী ব্যাপার! একেবারে তোর নিজের কেয়ারে? চেনা কেউ নাকি?

রেখা সংক্ষেপে উত্তর দিল, হ্যাঁ। আমার ছোড়দার বন্ধু।

অসম্ভব কিছুই নয়। তবু দীপা বা করুণা কেউই সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করল না। কারণ রেখার স্বভাব তারা জানে। একটু সুন্দর চেহারার ভদ্রলোক হলেই অসম্ভব পরিবেশেও গায়ে পড়ে তার সঙ্গে আলাপ করবে। তারপর দিনকতক চলবে বন্ধুদের কাছে তার গুণকীর্তন।

স্যুটপরা ছিমছাম কাউকে ড্রাইভ করতে দেখলেই রেখার মন ছলছল্ করে ওঠে।—কী লাভলি চেহারা ভদ্রলোকের! আমাকে নিয়ে একটা লিফ্‌ট দিতে পারে না?

দীপা হয়তো ধমক দিয়ে ওঠে—তুই মরবি কোন্ দিন।

রেখা সেই মৃত্যুকে সর্বান্তঃকরণে কামনা করে হেসে ওঠে।

আঘাতটা খুব গুরুতর হয় নি। চোটটা বাইরে দিয়েই গেছে। তাই খানিকটা চামড়া উঠে আর কিছু রক্তপাত হয়েই থেমেছে। ভেতরে কোনো ক্ষতি হয় নি।

সার্জিকাল ওয়ার্ডে রাখা হয়েছিল ভদ্রলোককে। সেদিন ভিজিটিং আওয়ার্সে দেখা গেল রেখা এসে ভদ্রলোকের সঙ্গে খুব গল্প করছে। করুণার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই রেখা ইশারায় ডাকল। করুণা কাছে এলে বেশ গম্ভীরভাবেই পরিচয় করিয়ে দিল—এঁর নাম অনুপম চৌধুরী। আমার আত্মীয়। একটু লক্ষ্য রাখিস।

রেখার ছিল অন্য ওয়ার্ডে ডিউটি। করুণার হাতে তার 'আত্মীয়'টিকে সঁপে দিয়ে যেন নিশ্চিন্ত হয়ে সে চলে গেল।

করুণার গা জ্বলে উঠল। কাল বললে 'ছোড়দার বন্ধু'—আজ হয়ে গেল আত্মীয়।

ভিজিটিং আওয়ার্স ওভার হয়ে গেল। পেসেন্টের পার্টিরা একে একে চলে গেল। নিস্তব্ধ হয়ে গেল হল ঘরখানা। শুধু কর্তব্যসচেতন নার্সদের জুতোর শব্দ আর মাঝে মাঝে যন্ত্রণাকাতর রুগীদের চাপা আর্তনাদ।

রেখার 'আত্মীয়' হোক-না-হোক—রেখার পেসেন্ট বলেই করুণা ঠিক করেছিল একটু বিশেষ লক্ষ্য রাখবে। তেমন পেসেন্ট হলে সে হয়তো দু-তিন বার তার কাছে ঘুরে আসত। কিন্তু এক্ষেত্রে তার কেমন সংকোচ হচ্ছিল। একটা খারাপ উপমাই মনে হচ্ছিল—ঐ রক্তাক্ত পুরুষটি যেন রেখার হাতের নতুন শিকার। রেখা সেই শিকারটির ওপর লক্ষ্য রাখার ভার করুণাকে দিয়ে আড়াল থেকে যেন তারই ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছে।

এই রকম ভাব মনে আসায় করুণা পেসেন্টটির কাছে যাচ্ছিল না, কেমন সংকোচ হচ্ছিল; কিন্তু দূর থেকে লক্ষ্য রাখছিল।

হঠাৎ তার মনে হল কে যেন কাতরে উঠল। দেখল অনুপম চৌধুরীই ছট্‌ফট্ করছে। করুণা আর দূরে সরে থাকতে পারল না। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল।

—সিস্টার!

—বলুন।

পেসেন্ট যেন হাঁপাতে লাগল।

—কী অস্বস্তি হচ্ছে আপনার?

—মাথায় বড়ো যন্ত্রণা।

করুণা কপালে হাত দিয়ে দেখল, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। তখনই থার্মোমিটার দিল। রুগী চোখ বুজে রইল।

জ্বর ঠিক একশো তিন পয়েন্ট ছয়।

রুগী চোখ বুজেই বলল, জ্বর কি খুব বেশি?

করুণা তাড়াতাড়ি বললে, না না, বেশি নয়।

—কত?

—একশোর একটু ওপরে। ওটুকু জ্বর তো হবেই।

এই পর্যন্ত বলে একটু ভেবে করুণা আবার বললে, এক কাজ করুন, মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে—মাথাটা ধুয়ে ফেলুন।

এই বলেই করুণা তখনই তার মাথা ধোয়ানোর ব্যবস্থা করল। নিজে হাতেই অতি যত্নে অনুপমের মাথাটা ধুইয়ে দিল, শুকনো একটা তোয়ালে দিয়ে ভিজে মাথা মুছিয়ে দিল—চুলগুলো জলে ভিজে বড়ো বিশ্রী লাগছিল, আঙুল দিয়ে চেপে চেপে চুলগুলো ঠিক করে দিল।

অনুপম চোখ বুজেই বললে, থ্যাঙ্ক ইউ সিস্টার! খুব আরাম পেলাম। এতে যদি মরি তাতেও সুখ।

করুণা মৃদু ধমক দিয়ে বললে, মরবেন কেন? কী এমন হয়েছে আপনার?

বলেই চলে যাচ্ছিল, অনুপম বললে, আর একটু বসুন না সিস্টার। খুব ভালো লাগছে আপনাকে।

করুণা জানে পেসেন্টের মুখে এই ভালো লাগাটুকুর কোনো বিশেষ তাৎপর্য নেই। তবু রেখার এই পেসেন্টের মুখে কথাটা অন্ধকারে চোখের ওপর হঠাৎ টর্চ ফেলার মতো তাকে চমকে দিল। করুণা যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করল। গম্ভীরভাবে বলল, এক জায়গায় বসে থাকলে কি আমাদের চলে? এই ঘরেই রইলাম দরকার হলে ডাকবেন।

ভিজিটিং আওয়ার্সে রেখা আসে তার 'আত্মীয়'টির সঙ্গে দেখা করতে। করুণা দূর থেকে লক্ষ্য করেছে সেই সময়ে অনুপমের মুখখানা কেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। রেখাও খুব যত্ন করে কপালে হাত দিয়ে জ্বর দেখে। কখনো লেবু ছাড়িয়ে দেয়, কখনো নিজের কোয়ার্টার থেকে নিয়ে আসে গল্পের বই।

ভিজিটিং আওয়ার্সে সব রুগীরই কেউ-না-কেউ খবর নিতে আসে কিন্তু এই ক'দিনের মধ্যে কেউ একবারও অনুপম চৌধুরীর খবর নিতে এল না। করুণা আশ্চর্য হল। ভদ্রলোকের কি স্ত্রীও নেই? স্ত্রী যদি না-ই থাকে আত্মীয়স্বজন কেউ তো আছেই।

একদিন করুণা সে কথা জিজ্ঞেস করেই ফেলল।—আপনাকে তো কেউ দেখতে আসে না?

ম্লান হেসে অনুপম চৌধুরী বললে, এক বুড়ি মা ছাড়া আমার আর কেউ নেই। তাও মা থাকে দেশে।

—আর কেউ নেই?

অনাবশ্যক প্রশ্ন করল করুণা।

অনুপম চৌধুরী এবার হেসে বললে, আপনারা আছেন।

করুণা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, আপনার মাকে খবর দেবার ব্যবস্থা রেখা করেছে তো?

—খবর দিতে চেয়েছিল। আমিই বারণ করেছি।

—কেন।

—খবর পেলে ভেবে ভেবেই মরে যেত। এতদূর এসে দেখে যাবার ক্ষমতা তো নেই।

—এখানে আপনি কোথায় থাকেন? রেখাদের পাড়াতেই?

অনুপম যেন একটু চমকে উঠল। তার বিবর্ণ চোখে-মুখে যেন এককলক আলো এসে পড়ল।

—ও বুঝি আপনাকে সব কথাই বলেছে?

করুণা গম্ভীরভাবে বলল, সব কথা বলেছে কিনা জানি না। বন্ধুদের কাছে যতটুকু বলা যায় সেটুকু বলেছে। নইলে ওদের পাড়াতেই আপনি থাকতে পারেন এ অনুমান করব কী করে?

করুণা এই কথা বলেই চলে যাচ্ছিল। ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, আপনি যে ওর কেয়ারে ভর্তি হয়েছেন তা তো জানেন?

অনুপম চৌধুরী মাথা নাড়ল। যেন বেশ খুশি হয়েই বললে, না জানতাম না। তবে আমার ব্যাগ আর ক্যামেরাটা যে ওঁর কাছে আছে সেটা উনি বলেছেন।

কথা বলতে বলতে অনুপম উৎসাহিত হয়ে বালিশে ঠেসান দিয়ে খানিকটা উঠে বসল।

—আচ্ছা সিস্টার, মিস রায় আপনাকে আর কিছু বলেছেন?

করুণার রাগ হল। কোনোরকমে রাগ সামলে নিয়ে বললে, হ্যাঁ। আপনার যে র‍্যাপিড ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে সে কথাও বলেছে।

অনুপম চৌধুরী একথা শোনবার জন্যে মোটেই আগ্রহী ছিল না।—সে তো

পারছে। বলে হেসে করুণার দিকে একবার তাকালো।

—আমি বলছিলাম, উনি কি আর কিছু বলেছেন?

করুণা ঈষৎ বিরক্তি প্রকাশ করে বললে, আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার যদি কিছু থাকে তা কেন সে আমার কাছে বলবে?

করুণা আর দাঁড়াল না। দু'জনকেই তার মনে হল যেন বড্ড ন্যাকা। মেয়েদের ন্যাকামি তবু সহ্য হয়—কিন্তু একটা পুরুষের পক্ষে?—দুঃসহ।

করুণা ঠিক করল এবার থেকে রেখার এই পেসেন্টকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলবে।

কিন্তু অনুপম ছাড়ে কই? সে তো 'সিস্টার' 'সিস্টার' করে করুণাকে ব্যস্ত করে মারল।

—সিস্টার, কাল কি আপনার অন্য ওয়ার্ডে ডিউটি ছিল? কেবল খুঁজেছি আপনাকে।

—আচ্ছা সিস্টার, আপনাকে খুব বিরক্ত করি তাই না? কী করব বলুন। এমন হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকা আমার স্বভাব নয়। তা ছাড়া দেখুন, নার্স মাত্রেরই তো হৃদয় থাকে না। আপনার কাছ থেকে যে আন্তরিকতা পাই—

আর শুনতে পারে না করুণা। অনুপমের মুখে এই প্রশস্তি নিঃসন্দেহে তার মনে দোলা দিচ্ছিল, কিন্তু তবু তার মনে হচ্ছিল হয়তো বা এ উচ্ছ্বাস ঠিক প্রাণের আবেগ নয়।

—মিস দত্ত, চলে যাচ্ছেন?

করুণাকে ফিরে দাঁড়াতে হয়।

—আচ্ছা, মিস রায়ের খবর কী বলতে পারেন?

করুণা মনে মনে হাসল।—ও এই জন্যেই এত স্তোকবাক্য!

মুখে বললে, দেখা হলে আপনার কথা বলব।

—তাহলে আপনি দয়া করে বলবেন, আমার ব্যাগের মধ্যে একটা নোটবুক আছে সেটা দিয়ে যেতে। আমার কয়েকজন বন্ধুকে চিঠি লিখব।

করুণাও অবশ্য লক্ষ্য করেছে, ইদানিং রেখা যেন বেশি আসে না। ওর শখ কি ফুরিয়ে গেল? না সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছে?

সেই দিনই রেখার সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞেস করলে—ভদ্রলোকের খোঁজ-খবর নিস না কেন রে? ভদ্রলোক খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। অবশ্য তোর জন্যে, কি ওঁর নোট বইটার জন্যে তা আমি জানি না।

রেখা যেন লজ্জিত হয়ে বললে, আজই দেখা করব।

করুণার আবার রাগ হল। রাগ হবারই কথা। রেখার এটা কি উত্তর হল? সব তাতেই খেয়ালীপনা। একটা পেসেন্টকে নিজের ক্রেয়ারে উদ্বুদ্ধ করে হয়ে ভর্তি করালে, কখনো ছোড়দার বন্ধু কখনো আত্মীয় বলে না হয় পরিচয় দিলে, তারপর কদিন ভিজিটিং আওয়ার্সে সে কী গল্পের ঘটা! আর এখন তার খবর নেবার কথাটাও মনে করিয়ে দিতে হবে।

বিশেষ করে সেদিন ভিজিটিং আওয়ার্সে করুণা দূর থেকে কেবলই এই ঊনিশ নম্বর বেডটির দিকে তাকিয়ে রইল। কখন রেখা আসে। রেখা এলে ওদের দু'জনের কার কেমন চোখ-মুখের চেহারা বদল হয় দেখার আগ্রহ। কিন্তু আধঘণ্টা কেটে গেল—রেখার দেখা নেই। ওকি আবার ভুলে গেল? আহা বেচারি ভদ্রলোক।

করুণা বারে বারে তার মুখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু অনুপম সেই যে খবরের কাগজখানা মুখের সামনে ধরে নির্বিকারচিত্তে শুয়ে রয়েছে—এতটুকু চঞ্চলতা নেই।

মনে মনে করুণা প্রশংসা না করে পারল না। এই তো পুরুষ মানুষ! সামান্য একটা মেয়ের জন্যে, বিশেষ রেখার মতো হাল্কা প্রকৃতির মেয়ে—

করুণা যেন নিজের অজ্ঞাতেই ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল অনুপমের কাছে।

—কী পড়ছেন এত মনোযোগ দিয়ে?

অনুপম তাড়াতাড়ি উঠে বসল।

—আসুন—আসুন! বলে কাগজটা ভাঁজ করে সরিয়ে রাখল।

—খেলার খবরটা দেখছিলাম।

—আপনি বুঝি খেলায় খুব ইন্টারেস্টেড?

—হ্যাঁ, খেলা দেখতে গিয়েই তো আমার এই অ্যাকসিডেন্ট!

করুণা ভাবল, রেখার কথাটা এখন বলবে কিনা। কিন্তু বললে না। ওই না হয় জিজ্ঞেস করুক।

—আপনি খেলা দেখতে যান না?

করুণা মাথা নাড়ল।

—কেন, ইচ্ছে করে না?

—ইচ্ছে করলেও উপায় নেই। সারাদিন রুগী ঘেঁটে ঘেঁটে মনটাই যেন কেমন রুগ্ন হয়ে গেছে।

—আচ্ছা, আপনার হবি কী?

—হবি! না, আমার কোনো হবি-টবি নেই।

—একেবারেই নেই?

করুণা এবার একটু ভেবে বললে, হবি বলবেন কিনা জানি না, তবে আমার একটা অভ্যেস আছে—পুরনো পেসেন্টদের চিঠি লেখা।

অনুপম উৎসাহিত হয়ে বললে, চমৎকার হবি! আশা করি পেসেন্টদের কাছ থেকে যে চিঠিগুলি পান তা সযত্নে রাখেন?

—নিশ্চয়ই।

—যদি আপত্তি না থাকে, আমায় একদিন সেগুলো দেখাবেন?

করুণার তখনি ছুটে গিয়ে চিঠিগুলো এনে দেখাতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু সামলে নিল। মনে মনে নিজেকে ধমকে দিল—রেখার রোগ-না-সেরে আত্মীয়কে খুশি করার জন্যে এত ব্যস্ত কেন? মুখে বললে, সে আর কী দেখবেন! নিতান্তই সাদামাটা কতকগুলো চিঠি। আপনার কোনো হবি নেই, খেলা দেখা ছাড়া?

—খেলা দেখাটাকে নেশা বলতে পারেন, কিন্তু হবি অন্য জিনিস। আমি ছবি তুলতে খুব ভালোবাসি। ভালো হয়ে উঠি, তারপর একদিন আমার ছবির এ্যালবাম আপনাকে এনে দেখাব।

করুণা উৎসাহ দেখাল না। কে জানে এখান থেকে রিলিজড্ হলেও কোনদিন হয়তো এ্যালবাম দেখাবার ছুতো করেই আবার এসে হাজির হবে। বাজে ঝামেলায় কাজ কী!

করুণা প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যে এদিক-ওদিক দেখতে লাগল। চোখ পড়ল লকারে গোটা তিনেক কমলালেবু রয়েছে।

দিনান্তে রুগীর আত্মীয়-বন্ধুরা যখন দেখা করতে আসে তখন নিতান্তই শূন্য হাতে কেউ বড়ো একটা আসে না। ঊনিশ নম্বর বেডের এই হতভাগ্য রুগীটার জন্যে কাউকে আসতে দেখা যায় নি। তবু কেউ হয়তো এসেছিল এরই মধ্যে—কয়েকটা লেবু রেখে গেছে। কিংবা হয়তো নিজেই আনিয়ে রেখেছে। এমনও হতে পারে রেখাই কিনে পাঠিয়ে দিয়েছে!

—কী দেখছেন সিস্টার?

—লেবুগুলো যে শুকোচ্ছে। খাচ্ছেন না কেন?

নির্লিপ্ত উদাস সুরে অনুপম বললে, মনে থাকে না।

কিন্তু করুণার মনে হল, আসল কারণ তা নয়। এই রুগী শয্যায় শুয়ে শুয়ে দেখেছে কোনো রুগীকেই নিজে হাতে ফল ছাড়িয়ে খেতে হয় না। তাদের যারা প্রিয়জন তারাই সস্নেহে মাথার কাছে বসে খাইয়ে দিয়ে যায়। এ খাওয়ায় পেট ভরে না ঠিকই, কিন্তু মন ভরে যায়।

অনুপম চৌধুরীরও যে মন বলে একটা পদার্থ আছে তা করুণাও বুঝেছে মর্মে মর্মে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত আত্মীয়তা করতে আর তো কাউকে দেখে নি।

তখন করুণা অনুমতির অপেক্ষা না করেই লকার থেকে একটা লেবু বার

করে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিতে লাগল অনুপমের হাতে।

এমনি সময়ে রেখা এল। একমুহূর্ত দুজনের উপর দৃষ্টিপাত করল। তারপর খুব ব্যস্তভাবে করুণাকে বললে, এই যে তুই রয়েছিস! আমি একটু ওঘরে আছি। পরে আসছি।

এই বলে অনুপমের দিকে লক্ষ্যমাত্র না করেই তার নোটবইটা শুধু বিছানার ওপর ফেলে দিয়ে চলে গেল।

কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল করুণা। রেখার ওভাবে চলে যাওয়াটাও ঠিক স্বাভাবিক মনে হ'ল না।

অনুপমের মুখের হাসি হঠাৎই যেন মিলিয়ে গেল। সে এখন হঠাৎ ডায়রিটার ওপর যেন সমস্ত মন নিয়ে পড়েছে।

করুণা ভাবল উঠে যায়। কিন্তু পাছে রেখা ফিরে এসে তাকে না দেখে কিছু ভেবে নেয় তাই করুণা জোর করে মুখ বুজে বসে রইল। রেখাকে দেখে সেই যে লেবু ছাড়ানো বন্ধ রেখেছিল—এখন একেবারেই ভুলে গেল। আধখানা ছাড়ানো লেবু বেডের একপাশে পড়ে রইল।

ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হয়ে গেল। ঘন্টা পড়ল। পেসেন্টদের পার্টি শেষ মুহূর্তের কথাটি বলে পেসেন্টের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল। কিন্তু রেখা এল না।

করুণা কেমন যেন নিজেকে অপমানিত বোধ করতে লাগল। তখনই উঠে দাঁড়ালো। অনুপমকে ভদ্রতা করে একটি কথাও বললে না। হঠাৎ যেন কী মনে পড়েছে এমনি ছল করে নিজের জায়গায় চলে গেল।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত তার ঘুম এল না। এতদিন পর্যন্ত কখনো সে কোনো পুরুষের সঙ্গে নিজেকে এমন সূক্ষ্ম গ্রন্থিতেও জড়ায় নি। অনুপমের ওপরেই কি তার কোনো আসক্তি দেখা দিয়েছে?

করুণা মনে মনে গর্জে ওঠে—না, কখনোই না।

বরঞ্চ তার মনে হয় ভদ্রলোককে দয়া করতে গিয়ে একটু বেশি প্রশ্রয় দিয়ে ফেলছে। রাগ হ'ল অনুপমের ওপর।

তখনই মনে হল, ও বেচারির আর কী দোষ! হাসপাতালে পড়ে থেকে থেকে একটু স্নেহ-ভালোবাসার জন্যে কল্পনা—অস্বাভাবিক কিছু নয়।

তখন রাগটা হ'ল রেখার ওপর। এত ঈর্ষা! রেখার বোঝা উচিত করুণা দত্ত তার মতো মেয়ে নয়। পেসেন্ট তার কাছে পেসেন্টই!

পরক্ষণই মনে হ'ল, বিশেষ এই পেসেন্টটির ওপর তার নিজের আগ্রহও কম নয় (হয়তো রেখার আত্মীয় বলেই)। না ডাকতেই সে গিয়ে বসেছিল অনুপমের কাছে—কী দরকার ছিল লেবু ছাড়িয়ে দেবার? ঘনিষ্ঠতা সে তো নিজেই করেছে। রেখার তা চোখ এড়ায় নি। মেয়েমানুষের চোখ যে।

অল্পদিনের মধ্যেই অনুপম চৌধুরী সুস্থ হয়ে উঠল। যাবার সময়ে একমাত্র করুণাই সামনে এসে দাঁড়াল। দেখল অনুপম কার জন্যে যেন অপেক্ষা করছে। করুণাকে দেখেই বলে উঠল—এই যে সিস্টার! ভাবছিলাম, বোধ হয় দেখা আর হ'ল না!

করুণা তবু কিছুতেই ভাবতে পারল না, অনুপম কেবল তারই সঙ্গে দেখা করার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

হেসে বললে, দেখা আমায় করতেই হত।

এই বলে নিজের ঠিকানার খাতাটা খুললে।

—আপনার ঠিকানাটা? হাসতে হাসতেই বললে, জানেনই তো আমার হবি!

অনুপম ঠিকানা দিল।

করুণা খুব সহজ হবার চেষ্টা করে বললে, রেখার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

অনুপম ঠিকানা লিখতে লিখতে শুধু মাথা নাড়ল।

—সে কী, আপনি তার আত্মীয়! অথচ যাবার সময়ে একবার দেখাও করল না! ভারি অন্যায়।

অনুপম অস্ফুট স্বরে বললে, না, না, উনি তো সকালে এসেছিলেন।

—সে তো ব্যাগ আর ক্যামেরা দিয়ে গেল। টাকাগুলো আবার গুণে গুণে বুঝিয়ে দিল।

অনুপম হেসে বললে, এও লক্ষ্য করেছেন? আচ্ছা, উনি কি আপনাকে আর কিছু বলেছেন?

করুণা বললে, আপনার সম্বন্ধে? কই না তো।

অনুপম কেমন একরকমভাবে হাসল একটু।

—রেখাকে কিছু বলব?

অনুপম তাড়াতাড়ি বললে, না—না, ওঁকে কিছু বলতে হবে না। আচ্ছা, চললাম। নমস্কার।

অনুপম চৌধুরী কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে, হাতে ব্যাগ নিয়ে হস্‌পিটালের গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল।

করুণা আশা করেছিল অনুপম শীগ্‌গিরই একদিন আসবে। কেন এমন আশা তা সে নিজেও জানে না। এমন কি ভদ্রতা করে তাকে আসতেও বলে নি। তবু প্রতিদিনই আশা করেছে। দারোয়ানকেও বলে রেখেছে। হোস্টেলে ঢুকেই প্রতিদিনই আড়ালে দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করেছে—কেউ এসেছিল?

এমনিভাবে যখন প্রায় দেড় মাস কেটে গেল তখন অগত্যা তার সেই খাতাখানি খুলে ঠিকানা নিয়ে তার অভ্যাসমতো চিঠি লিখল। সে চিঠিতেও আসার কথা উল্লেখমাত্র করল না। শুধু কেমন আছে—আর কোনো ট্রাবল নেই তো ইত্যাদি জিজ্ঞাসা।

চিঠিখানা যেদিন পোস্ট করল সেই দিনই বিকেলে দীপা বললে, তোর সেই উনিশ নম্বর পেসেন্টকে দেখলাম গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

এ কথা শুনে করুণা এত চমকে উঠেছিল যে মনে হ'ল সে বুঝি দীপার কাছে ধরাই পড়ে গেল। গলার স্বরে উত্তেজনা ফুটে উঠল—কখন? কতক্ষণ আগে?

বলতে বলতে তখনই ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, দীপা হেসে বললে, এখন যাচ্ছিস কোথায়? দেখেছিলাম চারটের সময়ে।

করুণা আশ্চর্য হ'ল সে যদি এলই, তবে ভেতরে এল না কেন? সে তো জানে তার হোস্টেলের ঠিকানা।

করুণা আবার বোকার মতো জিজ্ঞেস করল, আমায় খবর দিলি না কেন?

দীপা বললে, আমি দূর থেকে দেখেছি। কাছে এলে পাছে লজ্জা পান তাই এলাম না।

—লজ্জা?

—হ্যাঁ গো! গোপনসাক্ষাৎপ্রার্থী যে! চোখের চাউনি দেখলেই বোঝা যায়। হয়তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল কারো সঙ্গে—নয় তুমি, না হয় রেখা!

বলে দীপা ভ্রু নাচিয়ে হাসল।

রেখা!

করুণা কেমন অস্বস্তি বোধ করল। অধৈর্য করুণা সেই রাত্তিরেই রেখার ঘরে গিয়ে দেখা করল। গল্প করতে করতে বলল, হ্যাঁরে, তোর সেই পেসেন্টের খবর কী?

—কোন্ পেসেন্ট?

—উনিশ নম্বর—

—ওঃ অনুপমবাবু? কী জানি, কোনো খবর পাই নি।

করুণার পুরনো রাগটা দপ্ করে উঠল। কষ্টে সামলে নিয়ে বলল, সে কী, তোর আত্মীয় বলে পরিচয় দিস অথচ খবর পর্যন্ত নিস না! ভদ্রলোক যাবার সময়ে তোর জন্যে কতক্ষণ অপেক্ষা করলেন—

রেখা ঠোঁটের ওপর একটা অবজ্ঞার ভঙ্গি করে বললে, বাদ দে তো। অমন কত আত্মীয় রোজ জুটছে—সকলের খবর রাখতে হলেই তো গেছি! নিতান্ত অ্যাকসিডেন্ট করে চোখের সামনে এসে পড়ল, তাই।

একটু থেমে সূক্ষ্ম হেসে বললে, তোর তো চিঠি লিখে পেসেন্টদের খবর

নেওয়ার বাতিক আছে, ইচ্ছে করিস তো লিখে দেখ। আমার আপত্তি নেই।

এই শেষ কথাটা গুণ্ডচরের মতো বিঁধল করুণাকে। 'আপত্তি নেই!' যেন সে তার কাছে অনুমতি চাইতে গিয়েছিল!

করুণা আর কোনো কথা না বলে নিজের ঘরে ফিরে এল। ভাবল, চিঠি না লিখলেই হত। যদি সে সত্যিই এসে পড়ে তা'হলে ওরা মনে করবে কী! যা নীচ ওদের মন!

কিছুদিন ধরে পায়ের একটা ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিল করুণা। আর, এম, ও কে দেখালো। তিনি বললেন, এ তো নিউরো অ্যালারজিক এডিমা। ভর্তি হয়ে পড়ুন।

ভর্তি হ'ল এজরা ওয়ার্ডে। কোনো কাজ নেই। হাঁটা-হাঁটি করতে কষ্ট। তাই চুপচাপ শুয়ে থাকা। শুয়ে থাকতে থাকতে কেবল দু'জনের কথা মনে পড়ত। একজন অনুপম চৌধুরী, আর একজন রেখা রায়।

অনুপমের কথা মনে হলেই তাড়াতাড়ি সে ভাবনা কেড়ে ফেলতে চেষ্টা করত। অকারণে বড্ড বেশি ভদ্রলোকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। তাকে এই সব নিয়ে কেউ ঠাট্টা করুক, বিদ্রূপ করুক তা সে চায় না। এসব রেখারই শোভা পায়।

আচ্ছা, রেখাটা দিন দিন কী হয়ে যাচ্ছে? লাজলজ্জা তো বিসর্জন দিয়েছে অনেক দিনই—ভয়ডরও নেই! এখন তো নিত্যই নতুন নতুন ভিজিটার্সের ভিড়। তারা সাহস করে হোস্টেলে ঢুকতে পারে না, কিন্তু হসপিটালের যাতায়াতের পথে অপেক্ষা করে থাকে। রেখা এদের কারো-না-কারো সঙ্গে চলে যায়।

নার্স-জীবনের অভিজ্ঞতা করুণার সবে শুরু। নানা কথাই শুনে এসেছে। আজ স্বচক্ষে অনেক কিছুই দেখছে। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারে না, এই বয়েস থেকেই যদি এত পুরুষসংসর্গ অভ্যাস হয়ে যায় তা'হলে ভবিষ্যতে কোনো একজনের বন্ধনে ধরা দিয়ে থাকবে কী করে এরা?

সঙ্গে সঙ্গেই অনুপম চৌধুরীর কথা মনে হল। রেখার সঙ্গে সম্পর্কটা কি রকম বোঝা গেল না। অত আদর করে রেখা ভর্তিই বা করল কেন, আবার একান্ত অপরিচিতের মতো ত্যাগই বা করল কেন? ওকে হসপিটালে নিজের কেয়ারে ভর্তি করাটা কি নিছক অনুগ্রহ?

আর অনুপম?

এইখানটাতেই করুণার কেমন গোলমাল হয়ে যায়। সে কি রেখারই পথ চেয়ে থাকত? তার অনুগ্রহটুকু লাভ করে ধন্য হত?

কিন্তু তা তো মনে হয় না। ওর ঐ দীর্ঘ পৌরুষদীপ্ত চেহারাটা একেবারেই ব্যক্তিত্বশূন্য ছিল না। রেখা সম্বন্ধে তার যেটুকু আগ্রহ সেটা তার কৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এমনি সময়ে একদিন অনুপম চৌধুরী এসে হাজির।

করুণা আনন্দে চমকে উঠে বললে, এ কী আপনি! এখানে খোঁজ পেলেন কী করে?

রোগমুক্তির পর অনুপমকে আরও তাজা মনে হল। সে হাসির হিল্লোল তুলে বললে, হোস্টেল পর্যন্ত এসে পৌঁছতে পারলে এটুকুর জন্যে আটকায় না। আপনাদের দরোয়ানটিই দেখিয়ে দিলে।

—এখানে আপনাকে কোথায় বসতে দিই বলুন তো!

—বসবার দরকার নেই। আপনার কী হয়েছে বলুন। ডাক্তারের অসুখ, নার্সের হসপিটালে বেড নেওয়া আর পুলিশের হাজতবাস তিনটেই আমার কাছে বেশ তাজ্জব লাগে।

করুণা হেসে বললে, মজার ব্যাপারই বটে। হাঁটতে পারছি না। কেবল শুয়ে শুয়ে—

—ডাক্তার কী বলছে?

করুণা সংক্ষেপে ডাক্তারের কথা বললে। উনি আবার ডাক্তারের ওপরেও ডাক্তারি করতে লাগলেন।

—সাবধানে থাকবেন। একবার না হয় এক্স-রেই করিয়ে নিন। আচ্ছা রে নিয়ে দেখুন না।

এসব কথায় করুণার রাগও হচ্ছিল, হাসিও পাচ্ছিল। তার কথায় বিন্দুমাত্র গুরুত্ব না দিয়ে অন্য প্রসঙ্গ তুলল, এত দিন ছিলেন কোথায়?

—একটু বাইরে গিয়েছিলাম। পরশু ফিরে আপনার চিঠি পেলাম।

করুণার বুঝতে বাকি রইল না কথাটা ডাহা মিথ্যে। কারণ দীপা ভুল দেখেছিল, বিশ্বাস হয় না।

দীপার কথা মনে হতেই করুণা ভাবল, রেখার সঙ্গে দেখা হয়েছে কি-না জিজ্ঞেস করে। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল না। তার বুঝি এখনো সংশয় অনুপম রেখার সঙ্গে দেখা করবারই জন্যে আসে। ওখানে পাত্তা পায় না। তাই—

অনুপম হেসে বললে, কী ভাবছেন?

করুণা তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললে, কিন্তু আমার এখানে হঠাৎ আসার কারণ?

নিজের গলার রুক্ষ স্বর নিজের কাছেই খারাপ লাগল। উপায় কী?

অনুপম ঘাবড়ালো না। হেসে বললে, আপনিই দেখা করার প্রেরণা জুগিয়েছেন।

করুণার কানের দু' পাশ গরম হয়ে উঠল।

—না, চটবেন না। আপনিই তো চান পেসেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে। আমি না হয় চিঠিপত্রে যোগাযোগ না রেখে স্বয়ং এসেছি।

করুণার মনটা নরম হ'ল। বললে, অ্যালবাম দেখাবেন বলেছিলেন, ভুলে গেছেন তো?

অনুপম হেসে বললে, না ভুলি নি। অ্যালবামটা একটু অসম্পূর্ণ আছে তাই আনি নি। ওটা আগে সম্পূর্ণ করা চাই।

করুণা বললে, তাতে আর অসুবিধে কী? ক্যামেরা তো কাঁধেই ঝোলে, ছবির জায়গারও অভাব নেই।

অনুপম বললে, দরকার এখন শুধু একজনকে।

—বিশেষজন নিশ্চয়ই?

যদিও হাসতে হাসতে বলল, কিন্তু বুকটা কেঁপে উঠল। এই বিশেষজন নিশ্চয়ই রেখা।

এতক্ষণ অনুপম দাঁড়িয়েছিল। এবার সাহস করে বিছানার ওপর বসে বললে, তাহলে আসল ইচ্ছেটা খুলেই বলি। আপনার একটি ছবি চাই।

—আমার ছবি!

করুণা চমকে উঠল।

—হ্যাঁ।

—আপনার কি এতটুকু শিল্পবোধও নেই?

—কেন?

—আমার এই চেহারার ছবি! আমি সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় কোনোদিন ছবি তুলি নি।

—সজ্ঞানে মানে?

—অর্থাৎ নিজের সম্বন্ধে যেদিন থেকে জ্ঞান হয়েছে।

অনুপম হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। একটু চুপ করে থেকে বললে, দেখুন সিস্টার, ছবি কি কেবল নিজের রূপের বিজ্ঞাপন? তার কি অন্য মূল্য নেই?

অনুপমের এ কথায় করুণা খুব লজ্জা পেল। তাড়াতাড়ি বললে, হয়েছে বক্তৃতা! বেশ, আমার ছবি না পেলে যদি আপনার অ্যালবাম অসম্পূর্ণ থাকে তাহলে না হয় দাঁড়াব আপনার ক্যামেরার সামনে। কিন্তু খোঁড়া পা নিয়ে নিশ্চয় নয়?

—অবশ্যই নয়। আপনার সুস্থ হওয়া পর্যন্ত আমি ধৈর্য ধরে থাকব। তবে একটা অনুরোধ—সে ক'দিন আপনাকে দেখতে আসার অনুমতি দেবেন।

নিঃসন্দেহে এটা একটা আনন্দদায়ক প্রস্তাব। তবু করুণার মনটা কেমন খচ্ খচ্ করতে লাগল।

সম্পূর্ণ সেরে উঠতে আরও প্রায়

একমাস গেল। এর মধ্যে অনুপম প্রায়ই এসেছে। ছবি তোলার প্রসঙ্গ ছাড়াও ও যেন আরও কি বলতে চায়। একদিন বলেই ফেলল, সিস্টার, আপনার সঙ্গে আমি কিন্তু একদিন প্রাইভেটে কিছু কথা বলব।

করুণার এই কেবিনেই যথেষ্ট প্রাইভেসি। স্বচ্ছন্দে সেখানেই বলা চলত। কিন্তু ঐ যে মুখে বললে 'প্রাইভেটে বলব' এতেই করুণার বুক কেঁপে উঠল। না জানি কি কথা বলবে। যদি তেমন কোনো প্রস্তাব সরাসরি করে বসে?

করুণা তাড়াতাড়ি বলেছে, আচ্ছা, আচ্ছা, পরে শুনব।

কিন্তু শোনা আজ পর্যন্ত হয় নি, শুনতে চায় নি, সাহস হয় নি।

ছবি তুলতে যাওয়ার জন্যে একটা দিন স্থির হল। রিকেল চারটে নাগাদ—না, হসপিটালে তুলবে না। অনুপমের মতে হসপিটালে নাকি কেবল মৃতের ছবিই ভালো যায়। ঠিক হল চারটের সময়ে অনুপম এসে তাকে নিয়ে যাবে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের কাছে। ওই ব্যাক গ্রাউন্ডেই ভালো ছবি উঠবে।

যেমনটি ঠিক তেমনিভাবেই ছবি তুলতে গেলে হত, কিন্তু করুণার কী খেয়াল হল সে যা নয় তার চেয়ে বেশি করে অনুপমের ক্যামেরার সামনে নিজেকে তুলে ধরার চেষ্টা করল। সাজ-সরঞ্জাম তার কিছুই ছিল না, একবার ভাবল অন্য কারো কাছ থেকে চেয়ে আনে, কিন্তু কেমন যেন লজ্জা করল। তাই নিজেই কিনে আনল।

করুণার দেহটা একটু বেশি লম্বা বলে বেছে বেছে পরল বড় বড় ছাপের শাড়ি আর তার সঙ্গে কনট্রাস্ট কালার-এর ব্লাউজ। কানে দিল লম্বা ঝাড়। চোখ দুটি ভালো, তাই দাঁত আর থুতনির খুঁত ঢাকবার জন্যে চোখ দুটিকেই প্রমিনেন্ট করে তোলবার চেষ্টা করল। চোখের পাতার ওপরে-নিচে সুর্মা দিল। তারপর আইব্রাউ পেন্সিল দিয়ে ভ্রূদুটি টেনে দিল চোখের চেয়েও লম্বা করে।

মুখটা ওর একটু লম্বাটে ধরণের। তাই ভ্রূদুটিকে যতটা পারল টিপে টিপে সরু করে দিল। ঠোঁটে বুলিয়ে দিল একটু ঘোর রঙের লিপস্টিক।

কপালটা একটু চওড়া বলে ঠোঁটের রঙের মতোই ঘোর রঙের টিপ একে দিল। বাস্! আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দু-তিনবার ফিরে ফিরে দেখল। এতক্ষণ ধরে এমন করে সে ইতিপূর্বে কখনো আয়নার সামনে দাঁড়ায় নি।

ঠিক সময়েই অনুপম এসেছিল। কিন্তু অনুপমের সঙ্গে সকলের সামনে দিয়ে আসা করে সেজে যেতে পারল না। যদি রেখারই সঙ্গে দেখা হয়ে যায়?

তাই অনুপমকে দাঁড়াতে হল গেটের বাইরে।

তারপর করুণা চলল মাথাটি নিচু করে। যেন এই প্রথম চলেছে গোপন অভিসারে।

ছবি তোলা নির্বিঘ্নেই হল কিন্তু অঘটন ঘটল তার পরেই।

যদিও এই সাজসজ্জা করে করুণা স্বেচ্ছায় এসেছিল তবু তার ভীরু মন বারে বারে বিদ্রোহ করছিল। তার কেবলই মনে হচ্ছিল সে যেন ক্রমশ ঐ লোকটার কাছে আত্মসমর্পণ করতে চলেছে। কিন্তু কে এই লোকটা? কী এর পরিচয়? করুণা জানে এইভাবেই কত মেয়ে বিভ্রান্ত হয়ে সর্বস্ব খুইয়ে নিঃস্ব হয়ে ফিরে এসে চোখের জলে প্রায়শ্চিত্ত করেছে। চোখের সামনেই রেখাকে দেখছে। সেও তো এমনি করেই চুপিচুপি পুরুষসঙ্গীর সঙ্গে বেরিয়ে যায়। তাহলে রেখার সঙ্গে তার কি কোনো তফাৎ থাকবে না?

ঠিক এমনি সময়েই অনুপম প্রস্তাব করলে, সিস্টার, আজ কিন্তু আপনাকে আর একটু সময় দিতেই হবে। চলুন নিরিবিলিতে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসি।

করুণার মাথায় রক্ত চড়ে উঠল। তার মনে হল অনুপমের স্পর্ধা যেন সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। হয়তো ভেবেছে রেখা আর করুণায় কোনো তফাৎ নেই। রেখাকে পাচ্ছে না বলেই তাকে দিয়ে স্বাদ মিটিয়ে নিতে চাচ্ছে।

—আজ কিন্তু আমার কথাটা আপনাকে শুনতেই হবে।

করুণা তীক্ষ্ণস্বরে বললে, কী এমন কথা বলুন তো? আমাকে বার বার অমন করে বলেন কেন? আপনার কথা আমি শুনতেই বা যাব কেন?

অনুপমের মুখটা শুকিয়ে গেল। ইতস্তত করে বললে, আপনি কি কিছু মনে করছেন? তাহলে থাক্।

করুণা বললে, আপনার সঙ্গে ভদ্রভাবে মেলামেশা করতে পারি, কিন্তু তার চেয়ে বেশি আশা করবেন না।

এই বলে চলন্ত একটা ট্যাক্সিকে দাঁড় করিয়ে, অনুপমকে ফেলে রেখেই করুণা গাড়িতে উঠে পড়ল।

সে রাত্রে তার ভালো করে ঘুম হল না। কেমন যেন নিষ্ঠুর আনন্দে মন ভরে রইল। হ্যাঁ, ঠিক সময়েই নিজেকে সংযত করে নিতে পেরেছে। নিজেকে অনেক দিন পর মনে হল যেন শুচিস্নাত হয়েছে। তার দূর গ্রামে মায়ের কথা মনে পড়ল, বাবার কথা মনে পড়ল। মনে মনে তাদের প্রণাম করে আশীর্বাদ চাইল।

অনুপম আর আসে নি। রেখা দিব্যি তার রঙ্গলীলা চালিয়ে যাচ্ছে। দাদার নাকি বিয়ে?

ছটফট করতে লাগল করুণা। অনুপম কি সত্যিই আসবে না? এটা কি সম্ভব?

তখন আবার সে তার ঠিকানার খাতা নিয়ে বসল—সেই খাতা যাতে পেসেন্টদের নাম অতি যত্নে অতি আগ্রহে লিখে রাখত।

চিঠির উত্তর আসতে দেরি হল না। সপ্তাহ এল একটা পার্শেল।

চিঠিতে অল্প কয়েকটি কথা—সাক্ষাতে বলব ভেবেছিলাম, কিন্তু সে সাহস আর নেই। তাই চিঠিতেই লিখি—রেখা কি আমার কথা কিছু বলে? একেবারেই কিছু না? যদি কিছু বলে দয়া করে আমাকে জানাবেন।

বিরক্তিতে করুণার মুখ থমথম করতে লাগল। অতি অবজ্ঞায় একবার পার্শেলটা খুলল। দেখল ছবিভরা একটা অ্যালবাম। সেটা তাকেই উপহার দিয়েছে অনুপম।

নির্লিপ্তভাবে করুণা পাতা ওল্টাতে লাগল। সব ছবিই অচেনা। তাদের নিয়ে অবশ্য অনুপম নিজের হাতে পরিচয় লিখে দিয়েছে।

একটা পাতায় এসে করুণা থেমে গেল। এখানে তার ছবিটি দেওয়া। মন্দ ওঠে নি। নিচে লিখেছে 'সিস্টার'। হ্যাঁ, শুধুই 'সিস্টার' আর কিছু নয়।

এইটেই কি শেষ ছবি? না, আর একটা যেন আছে।

করুণা পাতা ওল্টালো। হ্যাঁ, নবদম্পতির একটি যুগল-ছবি।

চোখ আটকে গেল করুণার। একজন তার চেনা—সে অনুপম চৌধুরী। আর একজন? ঘোমটা আর রঙ্গনচন্দনের আড়ালে ঠিক যেন চিনতে পারা যাচ্ছিল না। কিন্তু না, চোখের ভুল নয়, রেখাই। ছবির ওপরে দুজনেই মনের আনন্দে সেদিন স্বাক্ষর করেছিল। তারিখটা আজ অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

তখনও ঠিক ফর্সা হয়নি। রাধা ঘুম থেকে উঠে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ কোন দিকে যাবে। দু দিন আগে কানাই-এর সঙ্গে কথা হয়েছিল শাঁখুরের বনের দিকে যাবে। এখন কি করবে রাধা। যে বনে কেউ যায় না সেখানে একা যাবে কেমন করে। আজ কিছুতেই সঙ্গে পাবে না কানাইকে। মরতে ঝগড়া করতে গিয়েছিল ওর সঙ্গে। যাকে ছাড়া চলে না তার সঙ্গে বিবাদ করা কেন?

কালকের কথা মনে হতেই চাঙ্গা হয়ে ওঠে রাধা। কি হয়েছে! ঝগড়া করেছে তো বেশ করেছে। অন্যায় কিছু বলে নি। একজন পুরুষমানুষকে একটা মেয়ে এ রকমই বলে থাকে। এর জন্য কোমর বেঁধে ঝগড়া করেছে যে মানুষ তারই লজ্জা পাওয়া উচিত। আপশোস করবে সেই মরদ। কি কথাই না বলতে চেয়েছিল রাধা। পুরুষগুলো অমনই হয়। শুধু কথাটার মানে নিয়ে মারামারি করে। মানেরও যে একটা মানে আছে তা বুঝবে না।

তবু নিজের নির্বুদ্ধিতাকে দোষ দিল মনে মনে। কাজ-কাম নেই কোথাও। চাষের কাজ সব মিলিয়েও তিন-চার মাসের বেশি নয়। বছরের বাকি সময়টা তাদের মতো 'মুনিষ' খাটাদের চলে কি করে।

ক'দিন আগে ভাবতে ভাবতে বুদ্ধিটা কানাই-এর মাথায় এসেছিল—রাধি, একটা জায়গায় যাবি, অঢেল কাট! যাবি?

কানাই অধীর আগ্রহে রাধার পাথর-প্রতিমার মতো কঠোর মুখের দিকে চেয়েছিল। তার আগ্রহের তাপে সম্মতির করুণাধারা নামে কি না দেখছিল একদৃষ্টে!

—কোতায়!

—শাঁখুরের বনে গাছে-গাছে কাটের গাদা! যতো বয়ে আনতে পারিস!

—দূর! ওখানে মানুষ যায় নাকি!

—সেই জন্যেই তো যাব! ভয় কি রে! আমি গাছে উঠে ভাঙবো, তুই নিচে কুড়িয়ে জড়ো করবি। আদাআদি ভাগ।

—না রে, ওখেনে গেলে আর ফিরতে হবে না!

কানাই একটু যেন রসিকতা করার সুযোগ পেয়েছে। উদাসীন রাধার এই অবস্থাটাই হচ্ছে, করবে কি করবে না সেই ভাবনার ক্ষণ। এই সময়ে একটা-দুটো আলগা কথা বলে নেওয়া যায়। তাই কানাই সুযোগ বুঝেই বলে—ফিরতে না চাস, দু'জনাই একসঙ্গে থাকবো! কি বলিস—

মুকপোড়ার সক কত? মুখ ঝামটা দিয়েছে রাধা ছদ্ম কোপে এবং তারপরে আর যা বলেছে তাতে তেলে-বেগুনে রেগে উঠেছে কানাই। অনুরাগ থেকে রাগ আর তা পরিণত হয়েছে আগুনে। রাগারাগিতে বীতরাগ এসেছে পরস্পরের প্রতি।

তবু সকাল হতে সব ভুলে দু'জনকেই বেরুতে হয়েছে জীবন আর জীবিকার সন্ধানে। রাধা একবার চেয়েছে কানাই-এর বাড়ির দিকে। কানাই কি সব ভুলে অন্য দিনের মতো দা-টা হাতে নিয়ে এসে ডাকবে—রাধি! রাধি! নে তাড়াতাড়ি কর! সুয্যি উটে পড়ল যে—

রাধা একটু ভাবল। সেই-ই যাবে নাকি কানাইকে ডাকতে। বলবে—কানাই। ও কানাই! চল চল, সুয্যি উটে পড়ল যে।

না, রাধা তা পারে নি। মান খুইয়ে ডাকতে পারবে না কানাইকে। তাহলে কি আসল থাকবে কিছু। এমন পেয়ে বসবে যে একাকার হয়ে যাবে সব।

তার চেয়ে একা একা যাওয়াই ভাল। যেদিকে হোক যাবে। মাঠে নামলেই কারও-না-কারও সঙ্গে দেখা হবে। আজকাল অবশ্য সব সময় পাড়ার ছেলেমেয়েগুলো জমি জমি করে পাগল। দিনরাত সলাপরামর্শ করে নিজেরা।

অন্ধকার কেটে গিয়ে সবে আলো

দেখা দিয়েছে। একা একা চলেছে। হঠাৎ কার পায়ের শব্দ। কানাই নাকি!

এত সকালে ভানুমতীকে দেখে অবাক হল রাধা। ভানুমতী হাসল একটু। তারপর রাধার দিকে এগিয়ে গিয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে চুপিচুপি বলল—রাইধনী একা কেন গো। মান করেচ বুঝি!

রাধা ঠোঁট উল্টে এড়িয়ে গেল ও প্রসঙ্গ।

ভানুমতী ছাড়বার পাত্রী নয়।—কানুর সঙ্গে এত পিরীত, তবু একা!

—কার? তোর না আমার? রাধা বাঁকা কথায় জবাব দিল।

—আমরা কি আর সে কপাল করে এয়েচি! খাটতে খাটতে জীবনটা গেল গো রাধারাণী! পিরীত করার সময় পেলাম না!

—তুই চাইলে কিন্তু আমি ছেড়ে দিতে পারি! নিবি?

—না ভাই, দরকার নেই, কতায় বলে—পরের সোনা দিও না কানে, টেনে নেবে হেঁচকা টানে।

রাধা কথা বাড়ায় না। জঙ্গলটার ওপাশে কে যেন কথা বলছে। দু'জন মানুষের গলা। তারপর রাধার কানে এলো সেই মিষ্টি সুর।

—আমি কি কোন্ শালা-শালীর ধার ধারি।

হাঁ, এমন সুন্দর কথা আর কার হবে! কে বোধ হয় শুধিয়েছে একা কেন?

রাধার হাসি পেয়েছে। বাবু রাগে ভিতরে ভিতরে ফুটছে টগবগ করে। কিন্তু যাবে কোথায়। ঐ বনের দিকেই নাকি? গোঁয়ারগোবিন্দ মানুষটা যদি বনের দিকেই যায় সে কি করবে। সঙ্গে তো যেতে পারবে না। তাহলে সে বেরিয়েছে কেন? মাঠে ঘাস কুড়োবে! কুড়ি আনেনি তো! তাহলে—

মাঠে তো যেতেই হবে। খুঁটে খুঁটে যা পাবে তা না আনলে দিন চলবে না। মাঠে এখন কিছু নেই। কানাই-এর বনে যাবার প্রস্তাবটাই সবচেয়ে ভাল। ভানুমতীকে সঙ্গে আনতে পারলে আরো ভালো হতো। দু'জনে বনে ঢুকতো। কিন্তু ভানুমতীরা আসে না তার কথায়। তারা ধরে নিয়েছে কানাই তার একমাত্র সঙ্গী। ঘুরে-ফিরে কানাইকেই তার সঙ্গে দেখে তারা। এ ছাড়া অন্য কি ভাবতে পারে মানুষ। একটা মেয়েমানুষ মেয়েদের ছেড়ে ঘোরে মরদের পিছু পিছু।

এখনও সেই অবস্থাই হলো। অজ্ঞাতে পায়ে পায়ে কোন সময় চলে এসেছে বনের ধারে। কানাই বেশ কিছুটা আগে। সে পিছন ফিরে রাধাকে দেখেছে আর ব্যঙ্গের হাসি হেসেছে। মনে মনে বলেছে—কেমন আমার সঙ্গে ঝগড়া করার ফল! আমাকে ছাড়া তোমার চলবে? আমি জানি তোমার কত সাহস! সেই তো আমার পিছনেই আসতে হলো।

কানাই হাসতে হাসতে বনে ঢুকল। ঢুকেই স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এ কি নির্জনতা। জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই। কেবল বন আর বন। শুধু গাছে-গাছে পাখিদের কলকাকলি। বুঝি এই পাখিরাই ঘুম ভাঙায় এই নির্জন বন-ভূমির। এখানে আলো নেই, বাতাস এখানে স্তব্ধ হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। ঘন বনের শাখা-প্রশাখা ভেদ করে সূর্যের আলোও মাটিতে পৌঁছায় না। মাটির সোঁদা গন্ধ তাই প্রকট করে তোলে নির্জনতাকে।

কানাই যেন অন্য মানুষ হয়ে গেল এই বনে ঢুকে। মনে হলো এখানে যদি থেকে যায় সারাটা দিন। দিন শেষ হলে একসময় সন্ধ্যা নামবে ধীর মন্থর পায়ে। নৈঃশব্দের অন্ধকারে থম্‌থম্ করবে এই গহীন অরণ্য। শ্বাপদ হিংস্র প্রাণীদের নৈশবিহার সুরু হবে। পাখিরা তখন আতঙ্কে ডালে বসে নিঃশব্দে ঘুমোবে।

রাধাকে দেখে চমক ভাঙল কানাই-এর। আবার মাটির পৃথিবীতে ফিরে এল। গাছে উঠে শুকনো ডাল ভাঙতে লাগল খুঁজে খুঁজে। শুকনো ডালটায় লাথি দিয়ে ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে সাড়া জাগল। পাখিরা ভয় পেয়ে ডানা ঝটপট করতে করতে এ গাছ থেকে অন্য গাছে উড়ে গেল।

—কে রে? সাবধান। রাধা চীৎকার করে নিজের উপস্থিতির জানান দিল অর্থাৎ কে তুমি! যেই-ই হও মানুষ দেখে কাঠ ভাঙ, যেন গায়ে না পড়ে।

গাছের ডাল থেকে কানাই হেসে ওঠে হো-হো করে। ওর অট্টহাসিটা প্রতি-ধ্বনিত হয়ে বনের ফাঁকে ফাঁকে গানের সুরের মতো একটানা হো-হো-হো আওয়াজে গম্‌গম্ করে। বনের মধ্যের জলাশয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে যে শেয়ালটা জলপান করছিল ভয় পেয়ে চমকে উঠে মুখ তুলে চায়।

রাধা অন্য গাছের তলায় আপন মনে পড়ে-থাকা কাঠ কুড়োনোয় ব্যস্ত। হঠাৎ বন কাঁপানো হাসিতেও সে মুখ তুলে চায় না গাছের দিকে। আড়চোখে দেখার চেষ্টা করে একবার। তারপর নিজের কাজে মন দেয়।

রাধা কাঠ কুড়োবে কি—গাটা ছম্‌ছম্ করে। কথা বলবে না কানাই-এর সঙ্গে। তবু কানাই তো ভরসা। মানুষটা গাছের মাথায়। যেন মনে হয় অনেক অনেক দূরে। যদি কিছু একটা হয় কানাই-এর নাগালও পাবে না। এই নির্জন অরণ্যে সে ছাড়া আর দ্বিতীয় জনমানব নেই। এই রকম কবে কাঠ কুড়োতে এসে এই বন থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল কামিনী। অনেকদিন পরে বনের পাশে কোন পুকুরের ধারে এক কঙ্কাল আবিষ্কার করেছিল তাদেরই পাড়ার লক্ষ্মণ সর্দার। তারপর থেকে এই ভয়ানক বনে কেউ আসে না কাঠ ভাঙতে।

সেও আসতে চায় নি। কানাই কেমন করে যেন টেনে এনেছে। যখন কোথাও কাজকর্ম নেই, একসন্ধ্যা একবেলা খাওয়া জুটছে না তখন নিশ্চিত ভরসায় এই বনে না এসে উপায় কি! বুড়ি মা-টা আজকাল ক্ষিধে সহ্য করতে পারে না। বুড়ো হলে ছেলেমানুষ হয়ে যায় মানুষ। নাকেকান্না সুরু করে—খেতে দে রাধি! খেতে দে! আর থাকতে পারচি না।

কোথা থেকে খেতে দেবে রাধা। মাঠে-ঘাটে ঘুটে কুড়িয়ে, শাকপাতা তুলে দু'টা মানুষের পেট ভরে কখনও। তাও খরায় শাক পাতা শুকিয়ে নিঃশেষ। চাষের সম্ভাবনা নেই। সেখানে যদি একটু সাহস করে এই রকম বনে ঢুকলে এক টাকার কাঠ ভাঙা যায় তাহলে বুড়ি মাটার মুখে দুটো ভাত তুলে দেওয়া যায়। এ পরামর্শ তো কানাই-ই দিয়েছিল। ভালই করেছিল সে। রাধা সে ভালটুকু বজায় রাখতে পারে নি। সে আঘাত দিয়েছে কানাইকে। ঝগড়া করেছে তার সঙ্গে। কানাই-এর সঙ্গে মিলেমিশে কাঠ সংগ্রহ করলে এতক্ষণে কত কাঠ হয়ে যেতো দু'জনার। এই যে ভয়ে ভয়ে মরে আছে—এত ভয়ও থাকত না।

কানাই কাঠ ভাঙে আর হাসে মনে মনে রাধাকে দেখে।

রাধা কাঠ কুড়োবে কি—এদিক-ওদিক চায় কেবল। ভয়ই কাঠ। কানাইও ওকে দেখে মজা পেয়েছে বেশ। সে আজ সহজে ছাড়বে না। হাতে পেয়েছে গরবিনীকে। কানাইকে গ্রাহ্যই করতে চায় না সময় সময়। বলে—কেমন মরদ! জমিজমা করে মানুষের মত চাষবাস করে ঘরে ফসল তুলবে তা নয়! পরের ভুয়ে 'মুনিষ' খেটে নিজের পেট ভরাতে পারে না, তার আবার বেশি বেশি কতা কেন?

—জমিও আমাদের জন্য নয়, তাছাড়া কার জন্য জমিজমা করব? কানাইও ছেড়ে দেবার পাত্র নয়।

—কেনে আমার জন্যে! আমার জন্যেই তো বলচি! রকম দেক না মুকপোড়ার!

—তা তুই বললে মরতেও পারি—

রাধার আর কথা সরে নি মুখে। কথাটা যেভাবে বলতে গিয়েছিল তা বলা হয় নি। বরং মানেটা উল্টো দাঁড়িয়েছে। অন্তত সে রকমই বুঝেছে কানাই। আর কানাই-এর জবাবে চোখ-মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে লজ্জায়। এখন যাই-ই বলতে যাক খণ্ডন করা যাবে না অন্য অর্থটা। তার চেয়ে চুপ করে থাকাই ভাল। রণে ভঙ্গ দেওয়া আরও নিরাপদ।

কিন্তু পালাবেই বা কেন? এ মানুষটার দশা দেখলে সবাই এক কথাই বলবে। পাড়ার আর পাঁচটা ছেলের থেকে ও সত্যিই আলাদা। অন্যদের মতো নেশা-ভাঙ করে না কোনদিনও। স্বাস্থ্য-চেহারা সব ভাল। পড়াশুনা করেছিল ইংরেজী স্কুল পর্যন্ত। চিঠি পড়তে পারে যে লোকটা সে কেন 'শুনিষ' খেটে, কাঠ কুড়িয়ে, কখনও কাজ না পেয়ে উপোষ করে কাটাবে আর পাঁচজনের মতো! সে কেন দুই ভাগ করে মাঠের লক্ষ্মীকে ঘরে তুলে আনবে না। সে কেন ঘুরে বেড়াবে ছন্নছাড়ার মতো এখানে-ওখানে।

তাই কানাই-এর ওপর রাধার রাগ। আর সেই রাগ বুঝি কানাই-এর কাছে অনুরাগ। কিন্তু সময় সময় কেমন যেন মনে হয় কানাই-এর। মেয়েটাকে বুঝতে পারে না। অনেক সময় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। তাই রাগে পেলে চটাতে চায় মেয়েটাকে। জব্দ করতে পারলে ছাড়ে না। আজ যেন হাতে পেয়েছে ভালভাবেই। বলে—এত ভয় যাব বললেই তো হয়। একা থাকতে না পারলে নেমে যাই!

অন্য পক্ষ থেকে সাড়া নেই। সে কাঠ কুড়োনোয় ব্যস্ত। কানাই-এর ভাল লাগে না। ওকে রাগাতে চায়। রাগিয়ে কথা বলাতে চায়। রাগলে খুব সুন্দর দেখায়। এ রাগ আগেও দেখেছে কানাই। বলে—সেই তো মল খসালি, তবে কেন লোক হাসালি? মুখ ফুটে বললেই তো হয়, কানাই আমার ঘাট হয়েচে। আমায় মাপ কর।

রাধা যেন কানে কালা। কোন কথা সে শুনছে না। শুধু আপন মনে কাঠ কুড়িয়ে চলেছে। এতক্ষণ কানাই যে গাছে উঠেছে তার কাছাকাছি ছিল, এখন সরে গেল একটু দূরে।

'দূরে গেলে কি হবে। কানাই সহজে ছেড়ে দেবে না'—আমার কাট কি হলো? আমি এত কাট ভাঙলাম, এখন দেখছি মাত্তর কখানা!! কে নিল আমার কাট।

রাধাকে দেখা যায় কিন্তু রাধা কানাইকে দেখতে চায় না। তাই দূরে সরে যায়। আবার ভয় ভয়ও করে। কোথাও বিপদ ওৎ পেতে লুকিয়ে আছে। 'মুখে ক'রে তুলে নিয়ে গেলেই হলো'।

রাধা ভয় পেয়ে পিছিয়ে এলো। রাধা নিজের কাঠগুলো জড়ো করে ফেলেছে একজায়গায়। আর তাই দেখে কানাই বলেছে—আমার চেয়ে আর এক-জনার কাট বেশি ঠেকচে! শালার দুনিয়াটাই হয়েছে এই রকম!

রাধাকে তবু কথা কওয়াতে পারে নি কানাই। শুধু একজোড়া জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি কানাইকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছে।

—ওরকম করে তাকালে কি হবে! আমার কাট দা-কাটা। আমি অন্য কারও কাটের মধ্যে আমার জিনিস পেলে হয়! সোজায় ছাড়ব না।

—খ্যাঁক্—খ্যাঁক্—খ্যাঁক্—

হঠাৎ দুটো জন্তুর কামড়া-কামড়ির শব্দে চমকে উঠল দুজনেই। রাধা নিচে। এতক্ষণ যে সাহসে ভর করে সে ছিল তা এক নিমিষে উড়ে গেল। দারুণ ভয় পেয়ে একবার চাইল কানাই-এর দিকে গাছের ওপরে। কানাই তখন নিজেও ব্যস্ত জন্তু দুটোকে ঠাহর করতে। কানাই দেখতে পেল সব গাছের ডগা থেকে। তারপরেই রাধাকে খুঁজল। রাধাকে কি বলবে। রাধাকে উঠে আসতে বলবে। ও মেয়ে কি গাছে উঠতে পারবে। কি করবে কানাই। সাবধান করে দেবে রাধাকে।

কানাই চীৎকার করে উঠল—সর্বনাশ! শালা কি জন্তুরে। গায়ে পাকড়া পাকড়া চিতির-বিচিতির দাগ। কি হবে রে রাধা!

কানাই-এর কথায় রাধার সারা শরীর ভয়ে রোমাঞ্চিত হয়। একটা অদ্ভুত কাঁপুনি ওঠে। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে শরীরের কাঁপুনি বাড়ে আরো। রাধা আশ্রয় খোঁজে। চোখ অন্ধকার হয়ে আসছে। কামিনীর এই বনের শেষে পড়ে-থাকা কঙ্কালটা চোখের সামনে নাচানাচি করছে। রাধা হাতড়ে হাতড়ে যে গাছটাকে সামনে পেয়েছে তার গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে। কাঁপুনি থেমেছে, সারা শরীর অবশ হয়ে এসেছে। যেন হৃদ্‌স্পন্দন থেমে যাবে এবার।

—হুঁশিয়ার? হুঁশিয়ার—

যেন অনেক দূরে থেকে কার একটা ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর কানে আসছে। সে সমস্ত ভয় আর সন্ত্রাসের অতীতে চলে গিয়েছে। অজানা জগতের পরপার থেকে রাধা এই পৃথিবীকে দেখছে।

—খ্যাঁক্—খ্যাঁক্—খ্যাঁক্—

আবার জন্তুদের তীক্ষ্ণ চীৎকার ভেসে এল কানে। পাখিরা ডানা ঝটপট করে এক গাছ থেকে অন্য গাছে গিয়ে বসল। তারপর আর কিছু শুনতে পেল না রাধা। কান ভোঁ-ভোঁ করছে। সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এল। আর ঝুপ করে শব্দ হলো একটা।

—রাধি! রাধি রে! রাধি!!

গাছের মাথা থেকে আর্ত চীৎকারে সারা বনভূমি কাঁপিয়ে তুলল কানাই। পড়ি-কি-মরি করে বাঁদরের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে নামতে শুরু করল। এ কি করল কানাই! তামাসা করতে গিয়ে এ কি সর্বনাশ করলো সে। রাধাকে মেরে ফেলল নাকি? নিজেই ভয় পেয়ে চীৎকার করতে শুরু করল।

—ভয় নেই, ভয় নেই রে রাধি! ভয় নেই! মিচে কতা! সব মিচে কতা! শেয়াল, বাঘ নয় রে! শেয়াল!

হাতের দা-খানা পিছনে গুঁজে নিচের ডাল থেকে লাফ দিল মাটিতে। তারপর ছুটে এসে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল রাধার পাশে।

—রাধি রে! রাধি!

হুঁস নেই মেয়েটার। কি করবে কানাই। তাড়াতাড়ি ওর মাথাটা তুলে নিল কোলে। চোখ বুজে মাটিতে পড়ে আছে রাধা। কি করবে এখন কানাই। জ্ঞান নেই মেয়েটার। একটু জলের ঝাপটা দিতে পারলে হয়তো জ্ঞান ফিরত। জল পাবে কোথায়। কাছেই পুকুর আছে নিশ্চয়ই। জল আনবে নাকি গামছা ভিজিয়ে। কিন্তু ওকে ফেলে গেলে যদি ঐ শেয়াল দুটো এসে ছিঁড়ে খায়। না তার চেয়ে ওকে গামছা নেড়ে হাওয়া করবে।

—রাধি! রাধা! ও রাধা!

ওর মুখের ওপরে ঝুঁকে পড়ে আস্তে আস্তে ডাকতে লাগল কানাই।

বনের ঝিরঝিরে হাওয়ায় রাধা চোখ মেলে চাইল একসময়। এদিক-ওদিক কি যেন খুঁজে ফিরতে লাগল রাধার হরিণের মতো টানা টানা দুটি চোখ। কানাই একদৃষ্টে চেয়ে রইল ওর মুখের দিকে। মেয়েটা শুধু ভয়েই অজ্ঞান হয়ে গেল, না দুর্বলতায়। হয়তো কাল ভাত পড়েনি পেটে। না খেয়ে খেয়ে দুর্বল হয়ে-ছিল।

কানাই উদ্বেগে ঝুঁকে পড়ল—রাধি আমি! ভয় কি! কিছু ভয় নেই!

রাধা উঠে বসে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল একদৃষ্টে কানাই-এর মুখের পানে। তারপর উঠে দাঁড়াল নিজে নিজেই।

—ওকি! বস বস, উঠলি কেন?

কানাই বসিয়ে দিল ওকে জোর করে। পরমুহূর্তে আবার উঠে দাঁড়াল রাধা।

—ঠিক আছে তুই দাঁড়া তবে, আমি কাটগুলো সব গুছিয়ে নিই তারপর চল বাড়ি যাই। যেতে পারবি তো!

ঘাড় নাড়ল রাধা।

—উঃ! কি ভয় ধরিয়ে দিইছিলি তুই! আমি কি না মিচে কতা বলে ভয় দেকালাম তোকে আর তুই...

কানাই-এর কথার ঘোর কাটল রাধার। শক্তি সঞ্চয় করে রাধা চোখ পাকিয়ে চেয়ে রইল আবার কানাই-এর মুখের দিকে। দ্রুত শরীরের রক্ত যেন মাথায় উঠে এল। লাল হয়ে উঠল চোখ-মুখ। নাসারন্ধ্র স্ফীত হলো। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। মত্ত হস্তীর বল এল রাধার দেহে।

—মিচে কতা! মিচে কতা বলে তুই ভয় দেখিয়েছিলি। তুই মানুষ! তুই

আমার শত্তুর। তুই শত্তুর—রাধা কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়ল কানাই-এর ওপর। দু'হাতে কিল-চড় মেরে, খামচে দিয়েও রাগ পড়ল না যখন, কানাই-এর ডান হাতটা টেনে কামড় বসিয়ে দিল।

কানাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাধার সব অত্যাচার নীরবে সহ্য করল। তারপর রাধা যখন শান্ত হলো ওর দিকে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল—বাড়ি গিয়ে ওষুদ লাগাতে হবে, তোর দাঁতে আবার যে বিষ!

রাধা মুখ ভেঙচে বলল—বিষ আছে আমার আছে—দেখবো তোর বৌয়ের দাঁতে কত মদ থাকে।

—কামড়ে দেবে এমন মেয়ে বিয়ে করতে বলছিস রাধি।

—হাঁ, তা নইলে তোকে জব্দ করতে পারবে না কেউ।

—কিন্তু আমার যে জমি নেই। আমি কাঙাল, অপদার্থ মানুষ। আমায় বিয়ে করবে কে? কথা বলতে বলতে কেমন হয়ে যায় কানাই। যেন অন্য মানুষ। দূরে মাঠের দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টে। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে এক একসময়। অনেক দূরে কিসের যেন ঘ্রাণ পাচ্ছে কানাই।

ওর চোখের দিকে চেয়ে থাকতে পারে না রাধা। চোখ নামায়। পুরুষমানুষের মনের মধ্যে বুঝি অতৃপ্তির দোলা লেগেছে। তাই মুখের ওপর কঠোরতার ছাপ। কি যেন চেপে যাবার চেষ্টায় বিব্রত। বেদনায় টনটন করছে বোধহয়।

রাধা কানাই-এর হাতের ওপর হাত রাখল। তার কামড়ে দেওয়া জায়গাটায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল—খুব ব্যতা করচে নয় রে?

কানাই ঘাড় নাড়ল।

—আমার মরন হয় না, তোকে এমনি করে যন্তণা দিলাম।

যন্ত্রণা কানাই-এর সর্বাঙ্গে। শুধু দেহে নয় মনে। যন্ত্রণা ভুলতে তাড়াতাড়ি রাধা আর তার কাঠের বড় বোঝাটা মাথায় চাপিয়ে নিয়ে বন থেকে দ্রুতপায়ে মাঠে নামে।

—ও কানাই! অত ছুটলে আমি মেয়েছেলে তোর সঙ্গে যেতে পারি।

—আমার যে মাথায় বোঝা!

—আমায় অর্ধেকটা দে না!

—বস্ত ভারি! তুই পারবি নে রাধি! এ তুই বইতে পারবি নে!

রাধার ঝাড়া-হাত-পা তবু মানুষটার সঙ্গে ছুটে পেরে উঠছে না। আলের ওপর দিয়ে মানুষটা ছুটছে ঝড়ের বেগে। আশ্চর্য! এত বড় মাঠটা ধু-ধু করছে ফাঁকা। একটা মানুষজন নেই। ছুটে কুড়ানো তাদের পাড়ার মেয়ে-পুরুষগুলোর একটাকেও দেখা যাচ্ছে না। মানুষগুলো গেল কোথায়?

—ও কানাই! মাঠে যে মানুষজন দেখা যায় না! ব্যাপারটা কি?

—মানুষ সব জমির লড়াইতে নেমেচে!

—জমির লড়াই! কোতায়?

—শুনছিস নে, গোলমালের শব্দ! জমি দখল করতে নেমেচে যতো জমিতে-খাটা 'মুনিষ'-মজুর।

—মারামারি করে জমি নিতে হবে?

—নইলে অমাদের মতো 'মুনিষ'খাটা লোক জমি পাবে কোতায়?

—না না, ও জমিতে আমাদের দরকার নেই।

কানাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে একেবারে রাধার মুখোমুখি। নিজের জ্বলন্ত চোখ দুটো রাধার উদ্বেগাকুল চোখের ওপর নিবদ্ধ রেখে বলেছে—জমি চাসনে তুই বলচিস। তুই-ই আমায় জমির লোভ দেখিয়েচিস। বেশ ছিলাম, 'মুনিষ' খেটে, কাট কেটে খেতাম। জমিজমার স্বপ্ন দেখি নি কোনদিন। কোন পুরুষে জমি ছিল, কেমন করে মহাজন দেনার দায়ে তা কেড়ে নিল সব ভুলে ছিলাম। কিন্তু আজ। আজ যে জমি আমার চাই-ই। আর জমিওয়ালাদের ভাগ্যের দোয়াই মেনে বসে থাকব না।

রাধা বাধা দিয়ে বলে উঠল—কিন্তু বিপদ—

—না, না কোন কতা শুনব না। জমি নেই বলেই তো তোর মতো মেয়েমানুষের কতা হজম করিচি। জমি নেই বলেই শুনতে হয়েচে আমি অপদার্থ, আমি মাগিরও অধম। আমি ভেরুয়া, আমি কাপুরুষ।

কানাই উত্তেজনায় আর রাগে কথা বন্ধ করে আবার ছুটতে শুরু করেছে আলের ওপর দিয়ে।

—ও কানাই ফের! যাসনে অমন করে—আমি ঝগড়া করেছিলাম, কটু কাটব্য বলেছিলাম। আমার ঘাট হয়েছে কানাই! আমি জমি চাইনে রে—মরণ চাইনে! আমি বাঁচবার জন্যে জমি চেইছিলাম।

কানাই ছুটছে। গোলমালটা এগিয়ে এসেছে। যুগ যুগ ধরে জমির ক্ষুধা নিয়ে জমিহারা কানাই-এর দলের পুঞ্জীভূত রোষ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে।

—কানাই! কানাই!

লাঠি সড়কি হাতে উত্তেজিত জনতা এগিয়ে এলো কানাই-এর দিকে! তাদেরই পাড়ার সব জোয়ানের দল। সে ছাড়া আছে আর সবাই।

—কানাই, 'মুনিষ' খেটেই কি মরবি সারাজীবন। জমি চাইনে তোর! জমি!

—চাই! জমি আমার চাই!—কানাই জোরের সঙ্গে জবাব দিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে।

—তবে আয়! জোতদার হটে গিয়েচে একদফা! আবার আসবে বলেচে! বন্দুক নিয়ে আসবে! আসুক! এ প্লটের সব জমি গরীবদের! এ জমি গবরমেন্টের হাতে এসেচে! এ জমি একদিন আমাদের ছিল—এর দকল নিতে হবে জান দিয়ে! কানাই পারবি নে!

কাঠের বোঝা ফেলে দিয়ে কানাই দম নিতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু সময় পেল না। বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে জোতদারের দল নতুন করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের ওপর হিংস্র পশুর মতো। সটাসট লাঠি আর সড়কি-বল্লমের ফলা ঝল্‌সে উঠেছে। জখম হয়েছে দু'-চারজন দু'পক্ষেরই। বন্দুকধারীকে বন্দুক তাক করতে দেখে কানাই-এর কাঠ-কাটা দা-খানা ঝল্‌সে উঠেছে সূর্যকিরণে। তারপর সেই দা কানাই-এর হাত থেকে ছুটে গিয়ে জোতদার চৌধুরীর গলায় বসেছে।

—বাপস্। চৌধুরীবাবুর হাত থেকে খসে পড়েছে বন্দুক মাটিতে। রক্তের স্রোত বয়েছে।

জমি দখলে এসেছে ভূমিহীনদের। জখম হয়েছে দু-চারজন। ফেরারী আসামী কানাই সর্দারকে খুঁজছে পুলিশ আর খুঁজছে রাধা। গভীর অরণ্যে রাধা একাই চিৎকার করে খুঁজছে—কানাই রে! কানাই।

রাধার চিৎকারে নির্জন বনভূমির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হয়েছে। পাখিরা ডানা ঝাপটিয়ে এ গাছ থেকে অন্য গাছে উড়ে বসেছে। রাধার আকুল কণ্ঠের আওয়াজ অরণ্যের শাখা-প্রশাখার ফাঁক দিয়ে হো-হো-ও-ও ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরেছে। আর নিবিষ্ট মনে হাড় চিবোনোয় ব্যস্ত কয়েকটা শ্বাপদ হিংস্র প্রাণী বিরক্তি-ভরে রাধার দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছে।

—কা-না-ই।

কানাইকে খুঁজে পাচ্ছে না রাধা। আদিম মানবী ঈভের মতো প্ররোচনা দিয়ে আজকের আদমকে নিষিদ্ধ ফল জমির স্বাদ পাইয়েছে। রাধা জমি চেয়েছিল যে কানাই-এর কাছে সে কানাই এখন শতেক রাধার জমির লড়াইতে নেমে পড়েছে। সারা মাঠের ডাক এসেছে। ডাকে কি আর রাধা তেমন করে খুঁজে পাবে কোনদিন!

ঘুম ভেঙেছে। কিন্তু ক্লান্তি দূর হয় নি। বারান্দায় দাঁড়িয়েছে সুপর্ণা।

শিউলি ঝরছে। সাদা সাদা ফুল। বোঁটার লাল আভা উঁকিঝুঁকি মারছে। হাসি ঝরছে, শুভ্র-সাদা হাসি। লাল ঠোঁট আর ধবধবে দাঁত।

হ্যাঁ, পঁচিশ বছরই হবে। এখন?—পঁয়তাল্লিশ পেরল প্রায়। বাইশ-তেইশই হবে! মনে মনে এলোমেলো চিন্তা আর প্রশ্ন। নিজের দেহের দিকে তাকায় সুপর্ণা। নাঃ। বাঁধনটা কেমন যেন শিথিল হতে চলছে।

টুকটুকে লাল ঠোঁটের ফাঁকে সাদা-সাদা দাঁত। তারও মাঝে শিউলির আভা দেখেছে অজয়। মরতে বলেছিল সুপর্ণা। —ওই শিউলির গোছা ভাল লাগলেও টেনে নিতে পারে নি সুপর্ণা।

ভেঙে গেছল তার স্বপ্ন! এ কি হল? ভেঙে পড়েছিল সুপর্ণা। আশে-পাশের লোকজন,—বন্ধু-বান্ধবী! কেমন স্বপ্ন-ঘেরা জীবন,—দৌড়ঝাঁপ। সব যেন থেমে গেল। কলেজে পা দেবার স্বপ্ন! স্যোসাল ফাংশন। গাইছে সুপর্ণা। সব মন্ত্রমুগ্ধ।

কৈশোর ডিঙিয়ে আর একধাপে পা ফেলার যে রঙিন মাদকতা! তাতে বাদ সাধল কে? অজয়?—সেই অজয় আজ কোথায়? যাকে নিজেরই একটা অঙ্গ বলে মেনে নিয়েছিল একদিন! হাসিও পায়! সবই চলে যায়,—নিজেও এগিয়ে চলেছে। নিজেতে সে আর আগের সে সুপর্ণা নেই,—আজই তো যেন মনে পড়ল। সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিল সে, শুধু চলার আনন্দে।

সৃষ্টি!—সৃষ্টির জন্যই জীবন। জড় পৃথিবীকে তাই ত সাজিয়ে রাখতে ভালবাসে মানুষ। বেঁচে থাকার জন্যও বটে, আর সৃষ্টির ক্ষুধা মেটাবার জন্যই আদিম মানুষ ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে। যৌবন! এগিয়ে যাবার আনন্দেই চলে। পাতায় পাতায়, ফুলে ফুলে, ফলে ফলে তার প্রতিফলন। তার জীবনকে আরো ছড়িয়ে দিতে চায়। যৌবনকে দলিয়ে-মাড়িয়ে নিঙড়ে নিঙড়ে তার গভীরের রসের সন্ধান। এরই নাম সৃষ্টি।

বেশ বড়ো বড়ো কথা বলত অজয়। শেলির কবিতা বুঝাতে গিয়ে সুন্দর সুন্দর ফিলোজফির বাণী আওড়াত অজয়। মুগ্ধ হয়ে শুনত সুপর্ণা। আবার রবীন্দ্রনাথের কবিতাও আওড়াত, —গতি! এ গতি রোধ করবার সাধ্য কারো নেই।—

"জীবনেরে কে রাখিতে পারে।
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে
তাহারে।"

হাসত অজয়! ওদিকে শিশিরদা মাঝে মাঝে যে চমক দেয়, তার দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগই নেয় অজয়। কলকাতার গল্প, সংস্কৃতির সঞ্চারগতি,—কত কথা। গাঁয়ের স্কুলমাস্টারের মেয়ে সুপর্ণা। আর তার বাবা রামগতিবাবু তাঁদের প্রিয় ছাত্রের গুণমুগ্ধই ছিলেন। গ্র্যাজুয়েট হতে চলেছে। যোগাযোগের সুযোগই নিলেন রামগতিবাবু। স্বপ্ন-মুগ্ধ কিশোরী সুপর্ণা। নতুন করে শুভদৃষ্টি হল শঙ্খধ্বনির মধ্যে। কিন্তু সুপর্ণা যে মনে মনে বিদ্রোহী ছিল,—অজয়ের কাছেই শেখা—বন্ধনহীন গ্রন্থি।

আজ যে কিছুই বুঝতে পারছে না সুপর্ণা!

অতীতের পাতা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে সুপর্ণা। কবি আর দার্শনিক আপনভোলা অজয়। বন্ধুরা তাই বলত। কিন্তু সেই দার্শনিক কবির গতি রোধ করতে পারে নি সুপর্ণা। শাজাহান কবিতা আবৃত্তি করত অজয়। তার পংক্তিগুলো মনে পড়ে যায়।

এতদিনে বুঝেছে সে। তাজের স্বপ্নবিভোর অজয় যেন গতি চায়। শুধু শিউলিতে তার মন ভরে না। চামেলী, যুঁই, মল্লিকা, বেল—তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কবির মন! সাধ্য কি তাকে বেঁধে রাখে সুপর্ণা। আর ওই শিউলির ডেলা!—শিশু। দেখেছে সুপর্ণা। মা বলেন, তারই মুখের আদল। গলায় জ্বর্ল—লাল। নাঃ, নাঃ, সুপর্ণা ত এসব চায় নি। কাঁদত সুপর্ণা! কানে আসত,—ডাক্তার বলছেন, এরকম হয়, প্রথম সন্তান হবার পর, কোনো কোনো মেয়ের এরকম মানসিক বিকার দেখা দেয়।

নাঃ। এ মেনে নিতে পারে নি সেদিনের সুপর্ণা। সেই শিশুটিকেও সহ্য করতে পারত না। এরই মাঝে শিশিরদা এসেছে। এক সময় এই শিশিরের সঙ্গেই সুপর্ণার বিয়ের কথা হয়েছিল। চক্রবর্তী বাড়ির মেজোগিন্নির ছেলে শিশির। এই অজ পাড়াগাঁকে মেনে নিতে পারে নি মেজোগিন্নি। কলকাতার মেয়ে—কলকাতায়ই মানুষ হয়েছে শিশির। মাঝে মাঝে আসত। ভালই লাগত শিশিরকে। কিন্তু মাঝখান থেকে কি যে হয়ে গেল!—শিশিরই কলকাতার

স্বপ্নে ভরিয়ে দিয়েছিল সুপর্ণার মন। কিন্তু মেজোগিন্নি ক্লাশ সেভেনে-পড়া এই স্কুলমাস্টারের মেয়েকে মেনে নিতে পারেন নি।

সেই শিশির এসেছে অনেকদিন পর। কত বড়ো হয়েছে শিশিরদা। সিনেমার ছবিতে পার্ট করে শিশির। নাম করেছে। সে এখন উদীয়মান চিত্রতারকাদের অন্যতম। কলকাতার দেওয়ালে-দেওয়ালে তার ছবি। সুপর্ণা ভাবে এই ত' জীবন! —নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়া। ভুল করেছো সুপর্ণা! গেঁয়ো রুচি,—কবে যে এর থেকে দেশ নিষ্কৃতি পাবে,—ভেবেই পাই নে।

এর ওপর অজয়ের সম্পর্কে অনেক কথা শুনল সুপর্ণা। অজয় স্ক্রিপ্ট করে। পলিটিক্স, পার্টি! আরো কতো কি? চামেলী, ঘুই কত কি জুটেছে। এরই মাঝে একদিন অজয় এল। কি রুক্ষ মূর্তি!—এলোমেলো রুঢ় কথা। কবি-দার্শনিকের এ কি মূর্তি! টাকা চাই! এরই মাঝে মায়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটি,—কবির মুখের যে-সব কথা সুপর্ণার কানে গেল, তাতে শিউরে উঠল সুপর্ণা।—শাজাহান!

তারপর সুপর্ণার কাছে—সে এক রুদ্রমূর্তি। শিশিরের কথা তোলে আবোল-তাবোল, কত কি বলে চোখ রাঙালে। সুপর্ণাও কি বলতে গিয়েছিল। ধাক্কা কি লাথি,—বলতে পারে না সুপর্ণা। তারপর দেখেছিল শিয়রে বসে তার মা! হাতের বালা দুগাছি নেই। এখানেই শেষ!

মাকে লুকিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল সুপর্ণা। শিশিরদা বলেছিল,—তোমার পার্টস আছে সুপর্ণা। সব ভুলে যাও। এগিয়ে চলো। দেখবে, ধন্য ধন্য পড়ে যাবে।—তারপর পাতার পর পাতা, দৃশ্যের পর দৃশ্য। শিশিরও মুছে গেছে,—সেই স্কুলমাস্টারের মেয়েও নেই। এ-এক নতুন সুপর্ণা! বাংলাদেশ ছেড়েছে, কলকাতা ছেড়েছে।

সুপর্ণা আজ চিত্রতারকা। বম্বে!—খ্যাতি! বান্দ্রা অঞ্চলে সুন্দর বাড়ি। শিউলি ঝরছে। বাংলার শরৎ! মনে পড়ল হঠাৎ। সেই শ্যামলিমায় ভরা বাংলার মাঠ-ঘাট। ফুটেছে স্থলপদ্ম। বাগানে-বাগানে জবার বাহার। দশদিক হাসছে।—দশভুজা!

নিজেকে বিকাশ করো। নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়াই আনন্দ। পৃথিবী বন্ধ্যা নয়। তার বুক চিরে বেরিয়েছে গাছ-পালা, শ্যামল শস্য। ফুল-পাতায় ভরা সুন্দর রূপ! এখানেই তার সার্থকতা।—অজয় তা-ই বলত। শিশিরেরও মর্ম-কথা এ-ই। কিন্তু সবই ভুল। ভুল বুঝিয়েছে তারা আর ভুল বুঝেছে সুপর্ণা।

এগিয়ে চলেছে! বিরাম নেই। কিন্তু তার কোনো প্রতীক,—কোনো চিহ্ন, কোন ছাপ কি রেখে যেতে পেরেছে?—প্রেম? ভালবাসা!—সবই ত' অভিনয়! অভিনেত্রী সুপর্ণার কাছে সবই ত' অভিনয়।

"প্রেমের করুণ কোমলতা
ক্ষুটিল তা,
সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে
প্রশান্ত পাষাণে।"

তার বেলায় একথাও খাটবে না।

বারবারই রূপ পাল্টেছে। রঙ্গমঞ্চের অভিনয়।—স্টুডিয়োর ফ্লোরে ভোল বদল আর রূপ বদল। সবই কৃত্রিম। অথচ তার অভিনয়ে দর্শক মন্ত্রমুগ্ধ! চোখের জল ঝরাতে পারে সুপর্ণা আর হৃদয়েও দোলা লাগাতে পারে। শুনেছে, চণ্ডীদাসে তার রামীর ভূমিকার অভিনয় দেখে কে এক বড়লোকের ছেলে বিবাগী হয়ে গেছে! হাসিও পায়, কেউ কেউ আবার সুপর্ণার দরজায় ধর্ণাও দিয়েছিল। হ্যাঁ,—মৃৎপাত্রের মতই সব ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল সুপর্ণা।

এতোদিন ভাবে নি,—বেশ ত' জীবন! গতি শুধু গতি,—শুধু এগিয়ে যাওয়া,—অজয়ের এই কথাটাই তার মনে আঁকা হয়ে গিয়েছিল। ছবিতে ছবিতে নায়ক পাল্টায়, সম্পর্কও পাল্টায়। বেশ লাগে!—বুড়ি কি আলোকমণি মাঝে মাঝে কি যেন মনে করিয়ে দেয়! দেশে আমার ছেলে আছে মা! নাতিটা বোধ হয় এগারোয় পড়ল। ইস্কুলে যায়। বড় দুষ্টু, ছোট-বেলায় দিদিমাকে ছেড়ে থাকতে পারত না। সবই সইতে হ'ল। টাকা চাই মা! টাকার জন্যই সব।

আলোকমণির কথা শুনে হাসত সুপর্ণা—"ছেলে? নাতি! এদের আবার জীবন! আগাছার মতো জন্মাবে, আবার মরে যাবে।" কিন্তু এক-একবার আলোকমণির মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠত সুপর্ণা। নিজের মনোজগতে কেমন যেন আলোড়ন উঠত।

নতুন বই!—হিস্টোরিক্যাল কাহিনী! বৃদ্ধ অথর্ব রাজা! উচ্ছৃঙ্খল যুবরাজ! রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। রাণী অসহায়! কিন্তু হঠাৎ এল পরিবর্তন। রাণীর চরিত্র বড়ো জটিল। আর এই উচ্ছৃঙ্খল ছেলেকে সংহত করতে গিয়ে দেখা দিয়েছে জটিলতা।

চাই নতুন হিরো!—যারা আছে, মানানসই হচ্ছে না। কাহিনী এমনি যে হিট্ করতে পারে! দশ-বিশ লাখ খরচ করতেও পেছপা নয় কোম্পানী!

রাজীবপ্রসাদ বাংলা মুল্লুক ঘুরে এসেছেন। সুখবর আছে। উপযুক্ত লোক পাওয়া গেছে। নতুন হলেও ঠিক নতুন নয়। দু-একখানি ছবিতে ছোট পার্ট করলেও বেশ উৎরেছে। বরং বেশ প্রশংসা পেয়েছে। মিঃ ভবানী মুখুজ্যে বলেছেন,—প্রোসিজিং বয়! আমার কথা মনে রাখবেন। যেমন চেহারা, তেমনি ভঙ্গী, তেমনি মুখের বুলি। ঠিক ক্যামেরার উপযোগী। সুন্দর কণ্ঠস্বর!

পরিচালক আর প্রযোজকের ঘরেই দেখা হয়েছিল। সুপর্ণারও পছন্দ হয়েছিল। সুন্দরই বটে,—যেমন ভদ্র ও নম্র! হামেসা যে-রকম দেখে সে-রকম নয়!—হঠাৎ একটা ঘটনা মনে পড়তে মনে মনে হেসে উঠেছিল সুপর্ণা।—সেখানেও মায়ের পার্ট ছিল তার, আর আহত ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছিল মা। কিন্তু ছেলে?—মাতাল ছেলে সেই সুযোগে মাকে বুঝি নিজের প্রেমিকা ভেবেছিল! —এইত অভিনয়ের জগৎ! মা ও ছেলে! শুধু ক্ষণিকের অভিনয়।

পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন রাজীবপ্রসাদ—এই যে সুজয় রায়—ইনি আমাদের নতুন ছবির নায়কের পার্টে অভিনয় করবেন। মিঃ ভট্টাচারিয়া রিহার্সেল নিয়ে দেখেছেন। ক্যামেরায়ও পরীক্ষা করা হয়ে গেছে। —আর মিঃ রায়, ইনি সুপর্ণা দেবী।

নমস্কার করেছিল ছেলেটি,—হ্যাঁ, নিতান্তই ছেলেমানুষ, হুড়ত সবে কুড়ি পেরিয়েছে। এরই মাঝে বাংলা ছেড়ে বোম্বেতে। যা কোনোদিন হয় নি—আজ তা হল। হঠাৎ সুপর্ণার বুকটা কেঁপে কেঁপে উঠল,—এই মুখ। আর এর পরিণাম! নাম-যশের আড়ালে,—থরথর করে বুকটা কেঁপে ওঠে সুপর্ণার।

তারপর দৃশ্যে,—ক্যামেরা ফিট করা হয়েছে। ইঙ্গিত পড়বে। কিন্তু এ কি হল! রাণীর দৃষ্টি যুবরাজের গলার দিকে—লাল জরুল! আদলটা?—আর ভাবতে পারে না সুপর্ণা।

কেঁপে উঠল সুপর্ণা! কি যেন মনে পড়ে গেল। সবই অন্ধকার!—হৈ-চৈ! সকলে ছুটে এল। অচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়েছেন রাণী—সুপর্ণা। মিঃ ভট্টাচারিয়া বললেন, হ্যাঁ, কয়দিন ধরেই কেমন যেন লাগছিল সুপর্ণা দেবীকে। হার্টের গোলমাল হবে!

ছবি তোলা স্থগিত রইল।—সুপর্ণা শয্যাশায়ী। স্ট্রোক হয়েছে। ডাক্তার বলেছেন, হঠাৎ মনের ওপর চাপ পড়েছে। রাজীবপ্রসাদ বললেন,—এরকম হবার ত' কথা নয়। হার্টের কোনো গোলমাল ছিল বলে ত' মনে হয় না।

এদিকে সুজয়!—জীবনে নতুন সুযোগ। হয়ত এই যোগাযোগ তাকে

[শেষাংশ ১০০ পৃষ্ঠায়]

"আ" "আ" ডাক দিলেই টুপটুপ করে এক-একটি পায়রা ডানা ছড়িয়ে ন্যাড়া ছাদের আলিসা থেকে নেমে আসে। আর ওদের মধ্যে লক্কার জোড়টাই ইন্দিরার স্নেহ টানে বেশি। নবাবী মর্যাদায় গর-র করছে সর্বদা। দু'পায়ে পালকের সালোয়ার। যেন গৌরবর্ণ রাজপুত রাজ-পুতানী। ছিম ছাম। শরীরে সমৃদ্ধির ঘোষণা। রাজপুত বীর পুতনীকে প্রদক্ষিণ করে সাত পাকে বাঁধে। চঞ্চুতে চঞ্চু ঠুকে দেখ-না-দেখ আদর জানায়। আহ্লাদে নিচু হয় সোহাগী পুতনী; আর তখন পড়ন্ত সূর্যের হাতে ছড়ানো সিঁদুরের মতো রাঙা হয়ে ওঠে ইন্দিরার মুখশ্রী। সে হাসে। মনে মনে বলে, বেহায়া! অসভ্য!

ছোট বোন রুম্পির কিন্তু পক্ষপাত ঐ ডিগবাজি-খাওয়া খেলোয়াড় খয়েরীটার ওপর। ইন্দিরা রাগায় রুম্পিকে, তোর একটা সার্কাসের ক্লাউন ধরে বিয়ে দেব রুম্পি; বেশ ডিগবাজির খেলা দেখবি বিনে পয়সায়।

রুম্পি চটে। নালিশ করে। মা তখন মুখ বাড়িয়ে তাড়া দেন, ফের ওর পেছু লেগেছিস ইন্দু। আজ বুঝি অফিসের তাড়া নেই?

অফিস!

শব্দটা কাণে বাজামাত্র ভোর সকালের ফুরফুরে বাতাস থমকে দাঁড়ায়। হেমন্তের মিঠে রোদে তেমন আর স্নিগ্ধতা থাকে না। ভাতের ফ্যানের মতো ভ্যাপসা আর চটচটে হয়ে ওঠে চতুর্দিক। পাল্টা আঘাত হানার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় সর্বাঙ্গে ঝাঁকি দিলে আত্মগত অস্ফুট কণ্ঠে ইন্দিরা বলে: ভয় নেই, মনে আছে। কিন্তু ঐ মনে মনেই গজরায়, মুখে শব্দ ফোটে না। উঠান পেরিয়ে ধীরে ধীরে ঘরে ফিরে আসে ইন্দিরা।

পাশের ঘরে দাড়ি কামাচ্ছেন বাবা। হাতে খবরের কাগজ। ইন্দিরার সাড়া পেয়েই পরিচিত সুরে বলেন: ইন্দু, কলকেটা ফিরিয়ে দিবি মা, দেখিস হুঁকোয় জল পাল্টানো হয় নি। বদলে দিস।

নিঃশব্দে এগিয়ে আসার সময় জানলার গরাদে চোখ পড়ে। জবাকুসুম-সংকাশ সূর্য বাইরে থেকে ইন্দিরার সংসার দেখছে। ভেঙচি কাটতে ইচ্ছে করে ইন্দিরার। 'এই আমার দিবাকরম্'; ঘড়ির কাঁটা অফিস-টাইমে বিঁধিয়ে দেওয়া ছাড়া আমার সঙ্গে যার দ্বিতীয় সম্পর্ক নেই। বাবার কলকে ফিরিয়ে জানলায় এসে দাঁড়াল ইন্দিরা। নিজের বলতে সময় বড় কম। বড় কম সময় ইন্দিরার। তবু জানলায় দাঁড়ালেই মনে হয়, বিপুল জনস্রোতের মধ্যে সে যেন কার প্রতীক্ষায় স্থবির হয়ে আছে। সে কে? প্রতীশ? কে জানে, সঠিকভাবে কাউকে ভাবতেও ভয় করে। শুধু ভাবতে পারে, তার দেহ রোমশ, বুক চওড়া, দু' চোখে আশ্বাস।

অন্তত তাই ভাবতে ভালো লাগে। এই বয়সটা ভাবায়। না ভেবে ইন্দিরার উপায় কি? আর এ পর্যন্ত একটি পুরুষকেই যখন জানে, জানে ঘনিষ্ঠভাবে, তখন সামনে এসে প্রীতীশই দাঁড়াবে। না হলে আর কেউ দাঁড়াত। এখন প্রীতীশের জন্যই মন কেমন করে ইন্দিরার, যদিও প্রীতীশের বুকের ছাতি অপ্রশস্ত, চোখের দীপ্তি স্তিমিতপ্রায়। ইন্দিরার মতোই ঘর্মাক্ত দিন সে-ও সন্ধ্যার সঙ্কীর্ণ অবকাশে শুকিয়ে নেয়। রাস্তার ট্রাম-বাস হট্টগোলের মধ্যে কয়েকটি নিটোল মুহূর্তে ময়দানের বাতাসে শ্বাস টানে, অল্পক্ষণ। কেন-না ঝুরকনো পাতা মাড়িয়ে সন্ধ্যা বড় দ্রুত হাঁটে। আয়ানের স্ত্রীর মতো ত্রাস্ত শঙ্কাতুর। যেন ব্যভিচারের অপবাদের চেয়ে ব্যভিচারী বিছানায় এসে চুপ করে শুয়ে পড়া। ইন্দিরা ঘুরে দাঁড়িয়ে আয়নায় নিজের মুখ দেখতে চায়। অনেক দিন থেকে একটা ভালো ক্রীম আর কেনা হয়ে উঠছে না। অথচ মুখটা কেমন অমসৃণ আর খড়িওঠা ভাব নিচ্ছে। মাংসের দোকানে টাঙানো রক্তহীন খাসীর লাসের মত কোথাও কালচে কোথাও মরা সাদা রঙ। বাবার এদিকে খেয়াল না থাকতে পারে, কিন্তু মা-ও একবার মেয়ের মুখ তাকিয়ে দেখে না। কী নিঃসঙ্গ আর একা হয়ে পড়ছে ইন্দিরা রোজদিন।

প্রীতীশেরও খবর নেই আজ সপ্তাহখানেক। ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা কাছিয়ে এসেছে। সময় করে উঠতে পারছে না। তারও সময় বড় কম।

প্রীতীশ, আমার যে কিছু ভালো লাগে না। সন্ধ্যার ট্রামে আসতে আসতে ময়দানের গাছগুলো নজরে পড়ে। ওরা একইভাবে অনেক সুখী-জোড়ের শরীরে বাতাস দেয়। শুধু আমাকে একা ফিরে আসতে দেখে কেমন যেন বোবা আর আহত চোখে তাকায়। আমি তখন মাঠের ওপর চোখ পাতি। মানুষজনের অভাব নেই। কিন্তু আমার মনে হয়, আদিগন্ত ধূসর শূন্যতায় খাঁ-খাঁ করছে। প্রীতীশ, তুমি কেমন করে সময়ের মধ্যে বুঁদ হয়ে যাচ্ছ! আমার সময় যে কাটে না।

দিদি, এই দিদি!—টুটুল জানলা দিয়ে ডাকছে। বেশ একটু বিরক্ত অধৈর্য কণ্ঠস্বর।

বিরক্তির সঙ্গে জানলার বাইরে দালানের ওপর তাকাল ইন্দিরা।

টুটুল চোখ মটকালো। তারপর হিপ পকেট থেকে একটা নীল খাম তুলে ধরে নাড়তে লাগল। মাছ ধরা ছিপের ফাতনার মত এপাশে ওপাশে খামটা নড়ছে।

আয় না। অসভ্য!—ইন্দিরা মৃদু ধমক দিল টুটুলকে।

টুটুল তার রুক্ষ চুল ঝাঁকিয়ে মাথা নাড়ল।

টুটুল। এই, কি হচ্ছে? বাবা দেখতে পাবেন না?—ফিস্‌ফিস্ করে বললে ইন্দিরা। বুকটা তার দ্রুত স্ফুরিত হচ্ছে। দরজার কাছে এগিয়ে এসে বলল: এই দে।

দিতে পারি, পায়রাটার দাম দে। খুব কম, পাঁচ সিকে। সীমাদির বাড়ি থেকে একদৌড়ে চিঠিটা আনছি, মজুরী আছে না?

চিঠিটা হাতের মুঠোয় নিয়ে আশ্বস্ত হয়ে এতোক্ষণে ইন্দিরা ভায়ের মুখের দিকে তাকাল। দৌড়কাটা উড়ুখুসু চেহারা। এখনো হাঁপাচ্ছে। এরপর নজর করল টুটুলের মুঠিতে বন্ধ খয়ের রঙের অসহায় পায়রাবতটির দিকে। গোল-গোল চোখে তাকিয়ে আছে।

পায়রাটার ডানা সেলাই করে দিবি? চল না।—টুটুল আগ্রহীকণ্ঠে ডাকল।

না, টুটুল, না। কতদিন বলেছি, ডানা সেলাই আমি করতে পারব না।—সবেগে মাথা নাড়ল ইন্দিরা: তোর পায়রাটার দাম বরং দিয়ে দেব। আসছে মাসে।

ইল্লি! অতদিন দাম ফেলে রাখবে নাকি? আজই চাই।

তখন আর কথা বাড়াবার স্পৃহা নেই। আচ্ছা বলেই ঘরে এসে খামটা খুলে ফেলল ইন্দিরা। এক নজরেই আদ্যোপান্ত পড়ার বাসনা। পরে ধীরে সুস্থে সবটা, প্রতিটি শব্দ পড়বে।

পোস্ট অফিসের মোহর বলছে, চিঠিটা সীমার ডাকবাক্সে গত দুদিন পড়ে আছে। সীমাটা স্বার্থপর। দিয়ে যেতে পারে নি একটিবার। অথচ ও'র বিয়ের ব্যাপারে কম করেনি ইন্দিরা। রেজিস্ট্রীতে সাক্ষীও হয়েছিল সে-ই। দুনিয়ায় কোন লোকটাই অপরের অন্তর আবেগ এসব অনুভব করে না। চেতনা-ভারী একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে ইন্দিরা চিঠি পড়তে বসল। প্রীতীশের ভুল হয় না। ইন্দিরাই মিথ্যা অভিমান করছিল। স্বার্থপর সে নিজেও কম নয়। কেবল নিজের কথাই ভেবেছে। আর এক-জনও যে ভাবে, ভাবতে পারে তা একটি-বার মনেও পড়েনি।

প্রীতীশের কমল ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক কথাই লিখেছে। তবু প্রতিটি কথাই পড়ামাত্র মুখস্থ হয়ে যায়। মন থাকলেই মুখস্থ। এ তো আর পরীক্ষার পড়া নয়। তবু কী আশ্চর্য, প্রশ্নপত্র প্রাপ্তির আগে বুক যেমন দুপ-দুপ করে, আজকাল প্রীতীশের নাম স্মরণের সঙ্গে সঙ্গেই তেমন হয়। চিঠির তাপে আঙুল কাঁপে।

মঙ্গলবার? সে তো আজকেই। আজকেই প্রীতীশ দেখা করতে বলেছে। স্টেশনের সামনে দিয়ে হেঁটে যেও সমবায়িকার দিকে। রাস্তায় দেখা হলে ভালই, না হ'লে সমবায়িকায়।'

রুশ্টি ঘরে ঢুকতে চিঠিটা ভাঁজ করে ব্লাউজের মধ্যে গুঁজে দিল ইন্দিরা।

রুশ্টি বললে: এই দিদি, টুটুকে টাকা দিচ্ছিস, আমাকে একটা ব্যাগ দিবি বলেছিলিস।...

দেব!

আজই চাই!

হাসল ইন্দিরা। আজ সে সরাইকে সব দেবে, দিতে পারে। বললে: বেশ, আজই।' বলে রুশ্টির চুলটা নেড়ে ত্বরিত পায়ে উঠানে নামল। টুটুল পায়রাটাকে এক ডানায় পা চেপে বাঁধবার চেষ্টা করছে।

ছিঃ, ছিঃ, টুটু; পায়রাটার প্রাণ নেই।—ইন্দিরা এগিয়ে গেল: দে বেঁধে দিচ্ছি। এতো কষ্ট দিতেও পারিস ওগুলোকে।

কষ্ট কি, ওরা তো গৃহপালিত। অবুঝ, তাই ডানা বাঁধা। পোষ মানলেই আকাশে ওড়াবো।—বিজ্ঞের মতো জবাব দিল টুটুল। আর তাই শুনে ফিক করে হেসে ফেলল ইন্দিরা।

সূর্য তেরছাভাবে ইন্দিরার বাঁ গালে পড়েছে। হেমন্তের রোদ, সুড়সুড়ি দিচ্ছে যেন। ইন্দিরার মনে হ'ল, কলকাতায় তাদের মতো আলো-বাতাস অনেক বড়-লোকের বাড়িতেও নেই। বাবা ঠিকই বলেন। আহা, বাবার জন্য মায়া হয়। দুটো পয়সা বেশি আনার জন্য পরিশ্রম তো কম করেন না! আর মা-ও তো আজীবন হেঁসেল সামলেই কাটাল। এবার একটা সত্তর মিলিমিটারের ছবি দেখিয়ে মাকে অবাক করে দেবে। অতবড় স্ক্রীনে মা এপর্যন্ত একটাও ছবি দেখে নি।

অফিস মানে রাধাবাজারে দু'তালার এক-কামরা ফ্ল্যাট। মিঃ লাহিড়ীর কণ্ট্রাক্টরী অফিস। ইন্দিরা লাহিড়ীর পি-এ কাম টাইপিস্ট কাম একমাত্র কর্মিণক। অন্য প্রাণী নিতাই। চাবি খোলে, ঝাড়পোঁছ করে, চা বানায়। এক আধদিন লাহিড়ী বলেন: ঘোষ, নিতাই-এর চা খেয়ে তো অম্বলের অসুখ ধরে যাবে। ইন্দিরা বোঝে মুখে হাসি টেনে তখন সে-ই চা বানায়। বোঝে লাহিড়ীর চল্লিশোত্তর সুঠাম শরীরে রোগ ভোগের যদিও কোনো লক্ষণ নেই। আসলে মেয়েলি হাতে তৈরি চা তার পছন্দ। এতোটা বয়স গেল বিয়ে করল না লাহিড়ী। রমলা চৌধুরীকে মন দিয়ে বসে আছে। মিসেস্ রমলা চৌধুরী। দু' জনের কারও অভাব নেই, তবু উপায় নেই। শুধু অঢেল স্বাধীনতা আছে প্রেম করার। ব্যাপারটা ইন্দিরার চোখে সহ্য হয়ে গেছে, তবু রমলা

চৌধুরাকে কেমন বিশ্রী লাগে। ফরসা টুকটুকে চেহারা। জীবন্ত পেন্ট বক্স। মেপে হাসে, ওজন করে টিপে-টিপে কথা বলে। দুটো বছর পরে সে-ও চল্লিশে পা দেবে। এক ছেলে বিলেতে পড়ছে। স্বামী ব্যারিস্টার।

এই রমলা চৌধুরীর আসা মানেই অফিস ঘরে সাড়ে চারটের মধ্যে তালা পড়া। আর তালা যদি না-ও পড়ে, লাহিড়ী দরাজ হয়ে ওঠেন। ছুটি পেয়ে যায় ইন্দিরা। কিন্তু আজ ঘড়িতে তিনটে বাজতেও রমলা চৌধুরীর ফোন এলো না। অথচ আজই রমলা চৌধুরীর জন্য লাহিড়ীর চেয়েও অধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করছে ইন্দিরাই। মহিলার যেন আজকেই খেলানি বেড়ে উঠেছে। আজ বাদে কাল চল্লিশে পড়বে, এখনো লাহিড়ীকে নিয়ে এতো খেলানি কিসের! সেই তো আসবি! দয়া করে আজ চারটের মধ্যে এসে পড় না খুকী! নিজে অকাল বসন্তে মজেছ, আজ আর একজনের সুযোগটুকু করে দাও না! সওয়া পাঁচটায় বে'র হয়ে সামনে একটা ট্যাক্সি পেলেও সাড়ে পাঁচের মধ্যে পৌঁছানো যায়। অফিস আসার পথে ইন্দিরা মা কালীর নাম নিয়েছে অনেক-বার, আজ যেন রমলাদি ঠিক চারটের মধ্যে এসে পড়েন! কিন্তু মা'য়ের প্রসন্না হওয়ার কিছুমাত্র লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। টাইপরাইটারে ভুল চাবিতে আঘাত পড়ছে। আশ্চর্য, আজই কি রমলা চৌধুরী আর বিদ্যুৎ লাহিড়ী ষড়যন্ত্র করে ইন্দিরাকে আটকেছে! লাহিড়ী অভাবনীয়ভাবে সুস্থির। যেন রমলা নামে কোনও মহিলার জন্য উসখুস প্রতীক্ষায় সে কোনও গোধূলি বেলা অতিক্রান্ত হ'তে দেখে ব্যগ্র হয় নি। হুমদো বেড়ালের মত পিঠে ধামা বেঁধে বসে আছে।

সাড়ে চার। লাহিড়ী প্যাস্ট্রী আর সন্দেশ আনালেন।

দিদিমণিকে দে'!—দরাজ কণ্ঠে অর্ডার দিলেন নিতাইকে।

না, না, আমি...ব্যস্ত কণ্ঠে বাধা দিল ইন্দিরা।

খাও, খাও! তোমাদের মতো বয়সে আমি সেবটাক রসগোল্লা!—লাহিড়ী একটা সন্দেশ মুখে ফেলে নেকটাইর নটটা যথাস্থানস্থ করলেন।

ইন্দিরা প্রতিবাদ না করে টপ ক'রে খেয়ে নিল সন্দেশটা। কথা বাড়ালেই বাড়বে। লাহিড়ীকে অসন্তুষ্ট করলেও কাজ হাসিল হবে না। একবার বলবার চেষ্টা করল: আজ আমার একটু...

কথাটা লাহিড়ী শুনতে পেলেন না। পূর্ব জের টেনে বললেন: রসগোল্লার কথায় ছেলেবেলার একটা স্মৃতি মনে পড়ে। বললে হয়ত বিশ্বাসই করবে না।—লাহিড়ী আত্মতৃপ্তভাবে হাসলেন। আর সর্বাঙ্গ চিড়বিড়িয়ে উঠল ইন্দিরার। মনে মনে বললে, খুব বিশ্বাস করব; এখন দয়া করে ছেড়ে দিলে বাঁচি।

ছেলেবেলায় ভোরে ঘুম থেকে উঠেই একটা বড় সাইজের রসগোল্লা না খেলে, বুঝলে, আমার কোষ্ঠ পরিষ্কার হ'ত না।—লাহিড়ী হা-হা করে পুরোনো স্মৃতির দমকে হাসলেন: এমনি বদ অভ্যাসটার জন্য বাবাই দায়ী ছিলেন। অভ্যাসটা ছাড়াবার চেষ্টাও করেন নি কোনদিন।

ইন্দিরা দেখল বাইরে রোদ পড়ে গেছে। নিতাই অনেকক্ষণ ঘরের আলো জেলে দিয়েছে। ইন্দিরার সামান্য শীত শীত করছিল। তবু নাকের ডগে ঘামের বিন্দু ফুটে উঠছে। ইন্দিরা উঠল। বলে গেল। লোকটার যদি কোনো চৈতন্য থাকে, নিজেই ছুটি দেবে। কিন্তু ফিরে এসে দেখল, দুটো হাত জোড় করে পাঁচ জোড়া আঙুল ধীরে ধীরে টেবিলের ওপর ঠুকছেন লাহিড়ী। অর্থাৎ উনি এখন আত্মমগ্ন। চিন্তিত।

ইন্দিরা সামান্য শব্দ করে মোসনে ঢাকা বসালো। অন্যমনস্ক চোখে ফিরে তাকালেন লাহিড়ী: হাতের কাজগুলো শেষ করে ফেলেছ নাকি?

এই সুযোগ ইন্দিরা চট করে বললে: কখন হয়ে গেছে! আজ একটু তাড়াতাড়ি যাব ভেবে অনেকক্ষণ সেরে রেখেছি।

ও, তাই নাকি? তা এতোক্ষণ বলতে হয়!—লাহিড়ী নিরাসক্ত সহৃদয়তায় কাৎ হলেন: বাড়িই যাবে?

না, না, বাড়ি নয়। একটু মার্কেটে যাব। ছোট বোনটা একটা ব্যাগের জন্য রোজ পাগল করে মারছে। তাছাড়া এক বন্ধু বাড়ি একটা নেমন্তন্ন...আহ্লাদি মনভুলানো হাসিতে কৃপাপ্রার্থীর মতো তার সাজানো দাঁতগুলো মেলে ধরল ইন্দিরা। এ সমস্ত অভ্যাসমত রপ্ত করে নিয়েছে আজকাল। পরের চাকরি করতে হলে অমন একটু নির্দোষ মিথ্যা এবং মনোহারিণী হাসি হাসতে হয়। মালিকের কাছে মানুষের মুখ কখনো সুখী কুকুরের মতো প্রত্যাশী, কখনও বা টুটুলের পায়রার মতো অসহায় আর সন্ত্রস্ত দেখায়। এই মুহূর্তে দর্পণে নিজের মুখ দেখলে টুটুলের সেই খয়েরী কবুতরের জলজলে প্রার্থনা-সজল দৃষ্টিটার কথাই মনে পড়ত ইন্দিরার।

লাহিড়ীর পক্ষে তত্রাচ কোনও সাড়া না পেয়ে ইন্দিরা হঠাৎ বলে ফেলল: আজ রমলাদি আসবেন না?

লাহিড়ী পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন: কেন বলত? আসবে বলেছিল না কি?

: না, তা নয়। মানে উনি এলে চারটের মধ্যেই আসেন।—ইন্দিরা মনে মনে নিজেকে শাসন করল। ছিঃ ছিঃ, এই অনধিকার প্রশ্নটা উত্থাপন করাই তার পক্ষে অনুচিত হয়েছে।

কিন্তু লাহিড়ী কিছুমাত্র বিচলিত বোধ করলেন না। যেন রমলা সংক্রান্ত প্রশ্নে এতোকাল তাঁর যে স্পর্শকাতরতা ছিল এই মুহূর্তে তা আর নেই। জিভে করে সিগারেট ধোঁওয়ার রিং ছুঁড়ে-দেওয়ার মতো একটা তালব্য আওয়াজ ঠুকে বললেন: রমলা আর আসবে না।

আসবেন না!—নিষ্পলক, কিছুটা ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকাল ইন্দিরা।

না! লাহিড়ী অনায়াসে শব্দটা উচ্চারণ করে ধীরে ধীরে সিগারেট ধরালেন: অবশ্য তাতে তোমার কোন অসুবিধা হবে না। ইনক্রিমেণ্টটা পাবে। রমলা নিজে যখন মঞ্জুর করেছেন, আমার অন্য উপায় নেই তাকে আটকাবার। কী, খুশি?—লাহিড়ী উজ্জ্বলভাবে হাসলেন।

ইন্দিরা ফ্যাল-ফ্যাল করে বোকার মতো কথাগুলো শুনছিল। এতোগুলি দুর্বোধ্য কথা একসঙ্গে পরিপাক করতে অসুবিধা হচ্ছে। রমলা না এলেও কেন যে ইন্দিরার কোনো অসুবিধা হবে না, রমলার সঙ্গে ইন্দিরার এহেন কোনও সম্পর্কই বা কবে কখন গড়ে উঠল বুঝে ওঠা ভার। তাছাড়া ইনক্রিমেণ্ট! সব ব্যাপারটাই কেমন গোলমেলে।

কী ব্যাপার, এ্যাঁ! মুখটা অমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল কেন? আগামী মাস থেকেই পাবে। ঘাবড়াবার কিছু নেই। এ্যামাউণ্টটা যা-ই বলো একটু বেশি নয় কি, এক লাফে ত্রিশ টাকা ইনক্রিমেণ্ট! কিন্তু রমলা ঐ এ্যামাউণ্টই মঞ্জুর করেছে তোমার জন্য। আমি তো কিছুই বুঝলাম না। কবে যে ওকে মুরব্বি পাকড়ালে তুমি। সো ভেরী ক্লেভার এ গার্ল য়ু আর, এ্যাঁ!—লাহিড়ী উদারভাবে হাসতে লাগলেন।

ইন্দিরার সন্দেহ হ'ল, হয় লাহিড়ীর মগজে আজ কিছু একটা গোলমাল হয়েছে, নয় সে-ই সকাল থেকে একটা প্রহেলিকার মধ্যে অর্ধজাগ্রত অবস্থায় আছে। কিছু বলতে চাইল, কিন্তু কণ্ঠস্বর শঙ্কিত হয়ে বাইরের বাতাসে বার হতে চাইল না। শুধু একটা অস্ফুট 'কিন্তু...' শুনতে পেলেন প্রফুল্ল হর্ষোজ্জ্বল মিঃ লাহিড়ী। প্রশ্ন করা হল না। ইনক্রিমেণ্ট কেন? রমলা চৌধুরীই বা এমন দয়াবতী হলেন কেন?

আচ্ছা, এইবার ঝাঁপ ফেল। উঠে পড়া যাক।—লাহিড়ী ঘড়ি দেখলেন।

ওরা নিচে এলো। ইন্দিরা ঘড়ি দেখল, পাঁচটা সাত। হ্যাঁ, এখনো সময়

আছে। আগামী মাসে ত্রিশ টাকা একসঙ্গে বাড়বে। কেমন অবিশ্বাস্য! প্রীতীশকে আজ কিছু একটা প্রেজেন্ট করবে নাকি। প্রীতীশ খুব অবাক হবে। ইনক্রিমেন্টের কথা অবশ্য ভাঙবে না ইন্দিরা। আপত্তি করলে, ঠোঁট ফুলিয়ে বলবে: যে এটুকু নিতে পারে না, সে যে আর কিছুও নিতে পারবে না, তা জানি। দূর, মেয়েদের মুখে 'নাও' কথাটা কেমন কেমন শোনায়। না তা অবশ্য বলা যাবে না। বলবে: এটুকু ভার যদি না বইতে পার, কোন ভারই নিতে পারবে না। হ্যাঁ, এ কথাটা বলে প্রীতীশের মুখ সে বন্ধ করতে পারবে। আর প্রীতীশ যখন উত্তর খুঁজবে ইন্দিরা তখন খুব একটা মাতব্বরী ভেজাজে ব্যাপারটা উপভোগ করতেও পারবে।

ইন্দিরা লাহিড়ীর গাড়ির পাশ কাটিয়ে দাঁড়াল: তাহলে আমি এখন যাই?

লাহিড়ী গাড়ির কাচ নামিয়ে দোরটা খুলে দিলেন: যাবে কোথায়। এসো এসো। নু মার্কেটে তো আমিও যাচ্ছি। তুমি থাকলে সুবিধেই হবে। মেয়েদের পছন্দ মেয়েরাই করতে পারে। তাছাড়া তোমার বোনের ব্যাগটা। এসো, ভেতরে এসো!

ইন্দিরা পাথর হয়ে গেছে যেন। নিজেরই হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে। কেন যে বলতে গেল মার্কেটিং-এর কথা। কী মুখ্যু, ডাহা, মিথ্যেই এখন পাকে পাকে জড়াচ্ছে।

আরে এসোই না!—তাড়া দিলেন লাহিড়ী।

বন্ধ ঘর থেকে বাইরের হাওয়ায় পা দিয়ে বেশ ভাল লেগেছিল। ট্যাক্সি সে আজ অনায়াসেই করতে পারতো। এক কথায় ত্রিশ টাকা। রমলাদির টয়লেট-টকটকে মুখের আড়ালে এমন একটা স্নেহ সজল মন ছিল ইন্দিরার জন্য কে জানত। ইন্দিরা তো একবারও তাকে কোনো টাকা-পয়সার কথা বলে নি। সংসারের গল্প অবশ্য রমলাদিই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিয়েছিলেন। হঠাৎ লাহিড়ীকে দিয়ে ত্রিশ টাকা মঞ্জুর করিয়ে দিলেন। মানুষ আশ্চর্য, বিচিত্র। বিচিত্র এই লাহিড়ীও। যা তিনি কোনোদিন করেন নি আজ তাই করছেন, গাড়ির দোর খুলে আহ্বান জানাচ্ছেন। অথচ আজ ইন্দিরার অবস্থাটা, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। কিন্তু গাড়িতে উঠে বসতেই হ'ল। আজই লাহিড়ীর আহ্বান ঠেলতে সংকোচ হ'ল তার। মানুষের কৃতজ্ঞতা বলেও একটা কথা আছে। না চাইতে ত্রিশ টাকা, কেমন রহস্যজনক মনে হচ্ছে ব্যাপারটা। একটা অদম্য কৌতূহল, লাহিড়ীর বক্তব্যের সত্যাসত্য নির্ণয়ের ইচ্ছা, এসব কারণও ইন্দিরার হাত ধরে তাকে লাহিড়ীর পাশে বসিয়ে দিল।

স্টীয়ারিং-এ হাত রেখে রাস্তার ওপরই তাকিয়েছিলেন লাহিড়ী।

অপসৃয়মাণ ভিড়ের মধ্যে অনেক যুবককেই পেছন থেকে প্রীতীশ বলে ভুল করছিল ইন্দিরা। আজকাল ওর মনে হয়, প্রীতীশের সঙ্গে ওর যেন হঠাৎ-ই যেখানে সেখানে দেখা হয়ে যেতে পারে। ও তাই রাস্তাঘাটে প্রীতীশের সম-আকৃতি বিশিষ্ট যুবকদের দূর থেকে লক্ষ্য করার জন্য ব্যস্ত হয়।

ইন্দিরা শুনতে পেল লাহিড়ী লঘু কণ্ঠে বলছেন: ঘোষ, তুমিও সেদিন আমাদের সঙ্গে থাকতে পার। তোমার রমলাদি খুশিই হবেন।

আমি! কোথায়!—অকারণে কেমন একটা আতঙ্কিত বিস্ময় ফুটে উঠল ইন্দিরার কণ্ঠস্বরে।

লাহিড়ীও অবাক হয়ে মুখ ফেরালেন। তবে কিছু অনুমান করলেন বলে মনে হ'ল না। ইন্দিরা সামান্য লজ্জিত হ'ল।

পঁচিশ তারিখে। আমরা ঐ দিনই রেজিস্ট্রী করব। রমলার ডিভোর্স মঞ্জুর হয়ে গেছে।

গাড়িটা এই সময় লিণ্ডসে স্ট্রীটে মোড় নিয়েছে। ইন্দিরা মূক বিস্ময়ে লাহিড়ীর দিকে তাকিয়ে আছে। লাহিড়ীর মুখে পরিতৃপ্ত হাসি।

গাড়িটা পার্ক করে লাহিড়ী নামলেন। ইন্দিরার চঞ্চল চোখের তারায় গ্লোব সিনেমার গাড়িবারান্দায় প্রীতীশের কায়াটি স্পষ্ট হয়ে উঠল। সে ঘড়ি দেখছে। জনস্রোতের মধ্যে ইন্দিরাকে খুঁজছে। চোখে-মুখে প্রতীক্ষা-বিধুরতা এতোদূর থেকেও স্পষ্ট অনুভব করল ইন্দিরা।

ইন্দিরা তাড়াতাড়ি গাড়ির দরজা খুলেই নেমে পড়ল।

লাহিড়ী দোরটা চেপে বন্ধ করে চাবি দিলেন, তারপর বললেন: এসো!

আমি!—অস্ফুট আর্তনাদের মতো শোনালো ইন্দিরাকে।

আরে হ্যাঁ! তুমি ছাড়া রমলার জন্য একটা শাড়ি আর কিছু অন্যান্য জিনিষ করবে কে? জানই তো আত্মীয়া আমার কেউ বিশেষ নেই। তাছাড়া তোমার পছন্দের ওপর আমাদের যথেষ্ট বিশ্বাসও আছে।

কিন্তু আমি!

ডোন্ট ওয়ারী, তোমার পছন্দ রমলারও পছন্দসই হবে। তাছাড়া তোমার বয়সও আমরা অনেকদিন পার হয়ে এসেছি। সুতরাং তোমারটা চাই কি আরও ভালোই হবে। কি বল, এ্যাঁ!—লাহিড়ী বেশ গলা ছেড়েই হাসলেন। ফলত দু-একজন পার্শ্বচারী ওদের দিকে ফিরেও তাকাল। ইন্দিরা তাদের দৃষ্টিতে সচেতন হ'ল।

না, এখানে একটা সীন ক্রিয়েট করা যায় না। সে-ও লাহিড়ীর সঙ্গে পায়ে পায়ে হাঁটতে লাগল। এই মুহূর্তে ইনক্রিমেন্টের সংবাদটা একটা বিরাট পরিহাসের মতোই তার জৌলুষ হারিয়ে ফেলেছে।

গ্লোবের ঠিক নিচে প্রীতীশ তার হাত-ঘড়ি দেখছে।

ইন্দিরা চীৎকার করে ডাকতে চাইল: প্রীতীশ!

লাহিড়ী বললেন: আজকের সন্ধ্যেটা বস্তুত চমৎকার, তাই না?

অভিনেত্রী

[১৬ পৃষ্ঠার পর]

চিত্রজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে। সুজয় রায়ের ছবিতে ভরে যাবে শহর-নগরের দেওয়ালগুলি। কাগজে-কাগজে তার ছবি!—এগিয়ে যাবে সুজয়! পেছনে তাকাবার কোনো প্রয়োজনই তার নেই। বাবার খবর জানে না। মা-ত' সেই কোন ছোটবেলায়,—কত কি শুনেছে সুজয়! দিদিমার কোলে মানুষ! —সুপর্ণা দেবী? ভালই লেগেছিল, তারই ছেলের পার্ট করবে। মনে মনে কত পুলক! আরো ত' মেয়ে দেখেছে। আরো অনেকের সঙ্গে নেমেছে। কিন্তু মা?

সুপর্ণা দেবীকে দেখতে চায় সুজয়। দেখেছেও। কিন্তু সুপর্ণার মূর্ছা ভেঙেছে। এখন নিষেধ—ডাক্তার নিষেধ করেছেন সুজয় যেন সামনে না আসে। জ্ঞান হওয়ার পর কয়েকঘণ্টা ভুল বকেছিল সুপর্ণা। কি বলেছিল?

সারারাত ঘুমোতে পারে নি,—ছুটে এসেছে। সুপর্ণা বারান্দায় দাঁড়িয়ে—"মা!" চমকে উঠল সুপর্ণা।

এ কি অভিনয়, না স্বপ্ন!

মনোরঞ্জন হাজরা

শিমুলের চরে

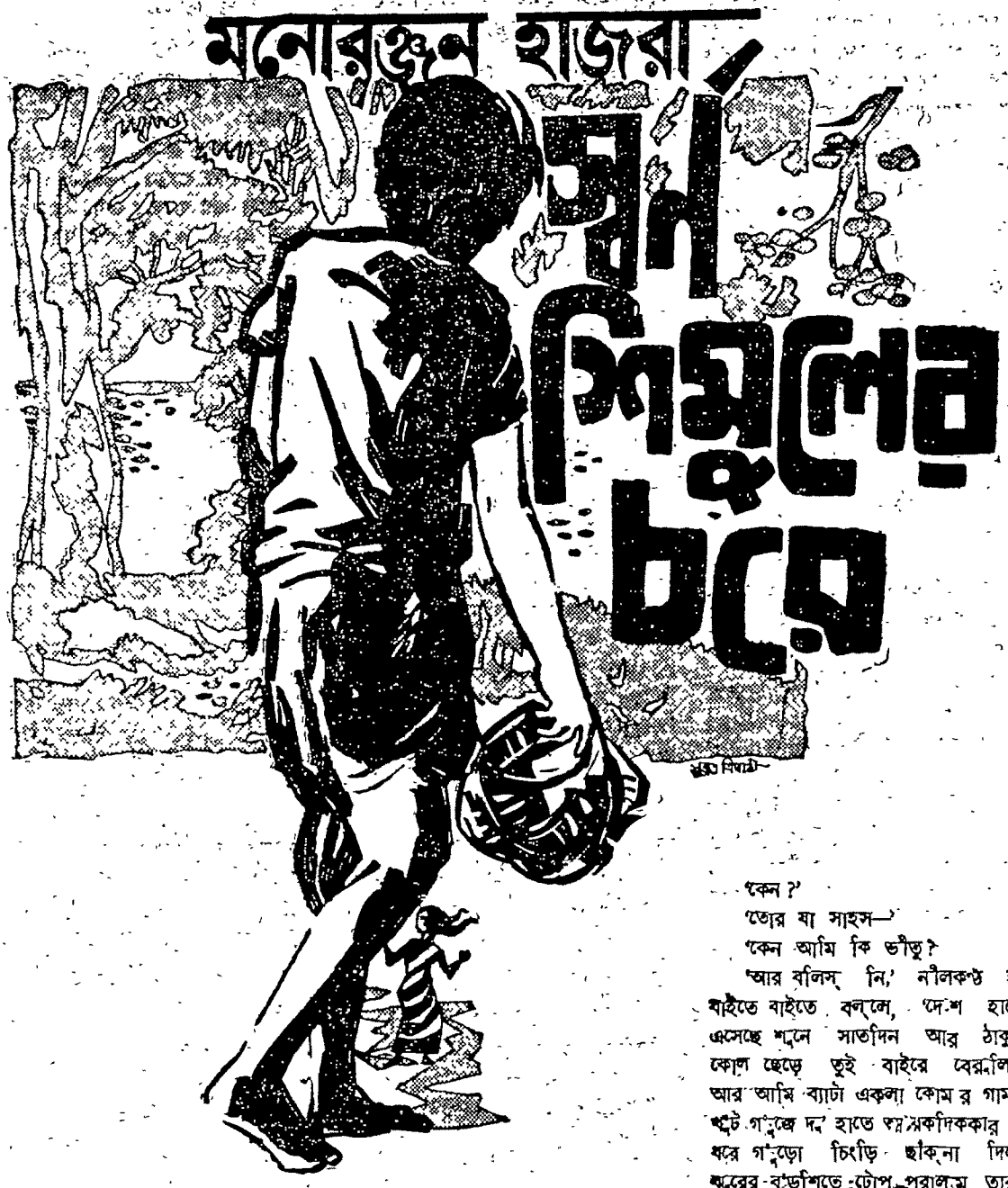

নীলকণ্ঠ হেঁকে উঠল, 'রাখাল এই রাখাল—ওঠ্ ওঠ্ শিগগির ওঠ। নইলে ডুবে মরবি।' রাখাল নদীর ঠাণ্ডা বুকে বেশ গভীরভাবেই নৌকোর ওপর ঘুমোচ্ছিলো। হঠাৎ ডাক শুনতে পেয়েই সে ধড়মড় করে উঠে বসে বল্‌লে, 'কিরে কি হয়েছ?'

'উঠে পড়্ বিপদে পড়ে গেছি।'

নক্ষত্রখচিত আকাশের নিচে জ্যৈষ্ঠ-রাতের পৃথিবী যেন ধ্যানমগ্না। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে জলের অপরূপ দ্যুতিতে উজ্জ্বল নদীর বুকে ছোট্ট একখানা মাছ-ধরা নৌকো। নৌকোর ওপর দুটি কিশোর প্রাণী—নীলকণ্ঠ আর রাখাল। বয়স ষোল-আঠারোর বেশি নয়। নীলকণ্ঠ হাল ধরে নৌকোখানাকে বার জলের দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল আর রাখাল নৌকোর খোলে বাঁধারির মাচায় নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোচ্ছিলো। ঘুম ভাঙতেই নীলকণ্ঠর মুখে বিপদের কথা শুনে সে বিস্ময় বিস্ফারিত চক্ষু মিলে বলে উঠ্‌ল, 'বিপদ—কিসের বিপদ!'

নীলকণ্ঠ বল্‌লে, 'একবার চারদিকটা চেয়ে দ্যাখ্ না!'

রাখাল ভাল করে চারিদিকটায় তাকিয়ে নিলে বটে কিন্তু কিছু বুঝতে পারল না। তাই সে বলে উঠল, 'এ কোথায় এগিচি বল্‌দিকি নীলু?'

'জায়গার নাম করলে এখুনি তো অজ্ঞান হয়ে যাবি!'

'কেন?'

'তোর যা সাহস—'

'কেন আমি কি ভীতু?

'আর বলিস্ নি,' নীলকণ্ঠ হাল বাইতে বাইতে বল্‌লে, 'দেশ হায়েনা এসেছে শুনে সাতদিন আর ঠাকুমার কোল ছেড়ে তুই বাইরে বেরুলিনি। আর আমি ব্যাটা একলা কোমর গামছার খুঁট গুঁজে দু' হাতে দুই সকদিককার খুঁটি ধরে গুঁড়ো চিংড়ি ছাঁকনা দিলুম, ঝড়ের বড়াশিতে টোপ পরালুম, তারপর সাঁতরে সাঁতরে বুক ফেললুম আবার তা তুললুম—এমন কি টাট্‌কা তাজা তপ্‌সে মাছগুলো নিয়ে গিয়ে তোকে ভাজাও খাইয়ে এলুম—'

'সে কি করব, ঠাকুমা বুড়ী যে কিছুতেই ছাড়ত না!'

'ঠাকুমার দোষ দিচ্ছিস কেন—নিজেই ভয়ে মরতিস্ বল্ না!'

'কিন্তু সে যাক্। এখন এ কোথায় এসিচি বল্ দিকি?'

'মহাযোগীনির মহাশ্মশানে।'

'এ্যাঁ, বলিস কিরে!' রাখাল সভয় যেন আর্তনাদ করে উঠল। বুকখানা তার ঢিপ-ঢিপও করে উঠল বোধ করি। মনে-মনে সে কয়েকবার রামনাম পর্যন্ত উচ্চারণ করে ফেলল। কিন্তু সদ্য তার

সাহস ও ভয় নিয়ে নীলকণ্ঠ অমন একটা আলোচনা করে ফেলেছে, কাজেই ভয় পেলে চলবে না। তাই সাহসে ভর করে সর্বাগ্রে সে তার কণ্ঠস্বরটাকে বশে রাখার চেষ্টা করল।

নীলকণ্ঠ বললে, 'কিরে অমন আঁৎকে উঠলি কেন?'

'কই না তো!'

মহাযোগীনির মহাশ্মশানে এসে পড়ার ঘটনাটা কিন্তু এক অদ্ভুত। সন্ধ্যে রাতে খেয়ে দেয়ে এসে নীলকণ্ঠ ও রাখাল দু'জনে কুরে ফেলে নৌকোখানাকে নদীর চড়ায় নোঙর করে শুয়ে ছিল। অনেক রাতে কুরে তুলে আরও একবার যাতে ফেলা যায় তারই মতলব ছিল তাদের কিন্তু এদিকে যেমন তারা ঘুমিয়েও পড়েছিল, অন্যদিকে তেমনি নদীতে জোয়ারও এসেছিল। জোয়ারের জল বাড়তে বাড়তে এক সময়ে এত উঁচু হয়ে গেছে যে নৌকোর নোঙর আর ধৈ পায় নি—ভাসতে ভাসতে চলে এসেছিল মহাযোগীনির মহাশ্মশানে।

রাখাল ঘুমিয়ে ছিল নৌকোর খোলের একেবারে নিচে যে মাচাটা—সেখানে। নীলকণ্ঠ ঘুমিয়েছিল তার ওপরে কাঠের বিটের সঙ্গে দুদিকে যে দুটো বাঁখারি দেয়া মাচা, তারই হালের দিকটায়। হঠাৎ এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে তার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুমের ঘোরে অনেকক্ষণ ধরেই সে অনুভব করছিল কারা যেন তার বুকের ওপর হাত বুলোচ্ছিল। মাঝে মাঝে যেন খোঁচাও মারছিল তাকে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার একথাও মনে হচ্ছিল সে যেন কোন নাগরদোলায় চেপে দোল খাচ্ছিলো। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার ঘুমটা যেন তার কিছুতেই ভাঙছিল না। হঠাৎ তার মনে হল সে যেন একটা প্রকাণ্ড দোলা খেলো এবং দোলা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় বর্ষাফলকের মত তার বুকে কে যেন একটা প্রচণ্ড খোঁচা মারল। যন্ত্রণায় চমকে উঠল সে—আর তারই ফলে ভেঙে গেল তার ঘুম।

কিন্তু ব্যাপার কি?

তার মাথায় গলায় হাতে কতকগুলো কাঁথা মাদুর জড়িয়ে গেছে। আর সে দোল খাচ্ছেও জোরে জোরে। এ তারা কোথায় এসে পড়েছে? ভাল করে চোখ মিলে চেয়ে দেখল—হ্যাঁ, এইতো সে শুয়েছে নৌকোর ওপরে! ঐ তো খোলের ওপর ঘুমিয়ে রয়েছে রাখাল। ঢেউয়ের দোলায় নৌকোখানা খুবই দুলছিল তখন। হঠাৎ দূরে লঞ্চের সার্চলাইট পড়তে দেখে সে বুঝে নিলে কিছুক্ষণ আগে ওটা নিশ্চয়ই এখান দিয়ে গেছে, আর তারই জন্যে এই ঢেউ। কিন্তু কাঁথা-মাদুরে সে জড়িয়ে পড়ল কি করে?

জলের বুকে অন্ধকারের মধ্যেও চারিদিক দেখতে আদৌ অসুবিধা হয় না। নীলকণ্ঠ ভাল করে তাকিয়ে দেখল। আশ্চর্য, এ যে তারা এসে পড়েছে মহাযোগীনির মহাশ্মশানে! শ্মশানের চতুর্দিকে হুমড়ি খাওয়া বট আর অশ্বত্থ, শাল-শিরীষ আর শিশু, নিম আর ঘোড়ানিমের ঠাস বুনন। অন্ধকারের অবাধ রাজত্ব শুধু রাতের পরিবেশকেই এখানে ভয়াবহ করে তোলে না—দিনের বেলাতেও লোকের অন্তরাত্মাকে খাঁচা ছাড়া করে দেয়। ক্বচিৎ কদাচিৎ লোকের গরু-বাছুর যদি বা এদিকে এসে পড়ে তবে সঙ্গীসাথী না নিয়ে কেউ সেগুলোকে খুঁজে নিয়ে যেতে পারে না। গাছগুলোর শাখা-প্রশাখা নদীগর্ভের দিকে শাসন-বারনহীন দুরন্ত কিশোর ছেলের মত হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। সেই ডালপালায় জড়িয়ে আছে দিনের পর দিন মৃতদেহের পরিত্যক্ত কাঁথা-মাদুর। হয় তো শবদাহ-কারীরা সেগুলো নদীর বুকে ছুঁড়ে ফেলতে গিয়েছিল কিন্তু তা নদীগর্ভে না পড়ে গাছের ডালে আটকে গেছে। সেগুলোই ঘুমের ঘোরে নৌকোর দোলায় দোলায় তার গায়ে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি সে তা থেকে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করতে লাগল।

নদীগর্ভের ওপরে ডাঙায় তখন কতকগুলো শিয়াল খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করতে করতে ছুটোছুটি করছিল। বোধ করি শ্মশানে সদ্য প্রোথিত কোন শিশুর মৃতদেহ মাটি থেকে তুলে ফেলে ওদের ভাগ-বাঁটোয়ারা হচ্ছিল। গাছের ঝোপে ঝোপে রাতচরা পাখিদেরও সাড়া পাওয়া যাচ্ছিলো। একটা কালপেঁচাও ডেকে উঠল সানন্দে, 'উ-হু-উ!' সর্বোপরি নদীতীরে ঢেউয়ের আছড়ানি শোনা যাচ্ছিলো, ছলাৎ-ছল—ছলাৎ ছল!

সমস্ত ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পেরে নীলকণ্ঠ হালে বসার জায়গাটায় গিয়ে পাশে লোহার বালাটায় হাত দিয়ে দেখল—আশ্চর্য সে যা ভেবেছিল তাই। দড়িবাঁধা নোঙরটা ঠিকই আছে। নোঙর ছেঁড়েনি, জল বেড়ে যাওয়ার দরুণই এটা ঘটেছে। কিন্তু এ যে তারা এসে পড়েছে অনেকখানি পথ! কোথায় স্বর্ণশিমুলের চর আর কোথায় এই মহাযোগীনির মহাশ্মশান—অন্ততঃ পাঁচ মাইল পথের ব্যবধান। কিন্তু ইতিমধ্যে মৃত নরনারীর পরিত্যক্ত কাঁথা-মাদুরের সান্নিধ্যে তার সর্বাঙ্গ যেন ঘিন ঘিন করে উঠছিল। কোনরকমে গাছের ডালপালার হাত থেকে তার মুক্ত হওয়ার দরকার। একবার মনে হল তার সে রাখালকে ডাকে। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল—না ওকে ডেকে দরকার নেই। হয়তো ভয়েই রাখাল অজ্ঞান হয়ে যাবে। তখন সে হবে তার আরেক জ্বালা! তার চেয়ে সে নিজে নিজেই চেষ্টা করুক। তাই একহাতে সে গাছের ডালপালাগুলোকে সরিয়ে দিতে লাগল এবং আরেক হাতে জলের বুকে হালের চাপ দিয়ে বার জলে চলে আসতে লাগল।

আঃ বার জলে এসে নীলকণ্ঠ যেন বাঁচল। মুক্ত বাতাস এখানে। যতদূর তাকানো যায় ততদূর যেন এক রহস্যময় বর্ণে আবৃত। দূরে দক্ষিণে নদী যেখানে বাঁক খেয়েছে সেখানটায় সারি সারি চটকলের আলো। এখান থেকে মনে হচ্ছে নদীটা যেন ওখানেই শেষ হয়ে গেছে। আলো জ্বলছে এপার থেকে ওপারে। কে জানে রাত এখন কত। ওপারে ইট-খোলার চিমনিতে কালো ধোঁয়া উড়ছে বিস্তৃত অন্ধকারের মধ্যে নদীর জলে ছায়া ছড়িয়ে।

এখন রাখালকে ডাকতে পারা যায়। অন্ততঃ সে আর ভয় পাবে না। তাছাড়া শ্মশানের কাঁথা-মাদুরে মনটা তার এমনই এক অস্বস্তিতে ভরে উঠেছিল যে, সে যেন চান না করলে আর স্থির থাকতে পারছিল না। কে জানে হয়তো এটা সংস্কার, নয়তো নিছকই নির্মল মনের শুচি-শুভ্র তাগিদ। কিন্তু নীলকণ্ঠের মত ছেলে গভীর রাতে মহাশ্মশানের পরিবেশে ভয় না পেয়ে যে ধীর মস্তিষ্কে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, সে ছেলে আর যাই হোক্, কোন সংস্কারের দাস যে হবে না, সেকথা জোর করেই বলা যেতে পারে। তাই সে একবার ভাবল, যদি নদীতে কয়েকটা ডুব দিয়ে নিতে পারে তবে মন্দ কি! তারপর গামছা পরে কাপড়টা নৌকোয় মিলে দিলেই হবে। কিন্তু তা করতে গেলে রাখালকে না ডেকে উপায় নেই। কেন না, জলে নামতে গেলেই নৌকো একপেশে হয়ে উল্টে যেতে পারে আর তার ফলে ঘুমন্ত রাখালের সমূহ বিপদ হতে পারে।

ঠিক এই জন্যেই সে রাখালকে অমন তাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলেছিল।

নদীর বুকে সেই অনন্ত জলরাশি আর উজ্জ্বল অন্ধকারময় পরিবেশে রাখাল যদিও নীলকণ্ঠের 'কিরে আঁৎকে উঠলি কেন' প্রশ্নের উত্তরে বলে উঠেছিল 'কই না তো'। কিন্তু সে মনে মনে জানে ভয় সে রীতিমত ভাবেই পেয়েছিল। তবে সেই ভয়ের মধ্যেও তার সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা ছিল—তার চেয়ে বড়জোর বছর দুয়েকের বড় নীলকণ্ঠের অপূর্ব সাহসিকতা। তার কথা ভেবেই সে নিজের ভয়কে ভুলতে পেরেছিল। এমনিতরো অবস্থায় অবাক বিস্ময়ে সে বলে উঠল, 'আমাকে ডাকার আগে তুই ভয় পাস্‌নি একদম?'

'ভয়—ভয় কিসের?'

'যদি ভূত-প্রেত কেউ—'

'আর ঘরে। ওহ শুনেছ তুই ভেবে মরীচস্?'

'কেন—আরও কিছু হয়েছিল নাকি?'

নীলকণ্ঠ একটু হাসল। তারপর বললে, 'সে সব শুনলে তুই টাঁসপুরের টিকিট কাটতিস!'

'বলিস কি!'

'হ্যাঁ,' বলে নীলকণ্ঠ শ্মশানের গাছ-পালার নিচে আটকেপড়া কাঁথা-মাদুর আর শিয়াল ডাকা, রাতচরা পাখিদের ডানার ঝাপটা আর কালপেঁচার অদ্ভুত কণ্ঠস্বর সবকিছু একে একে বর্ণনা করে গেল। সব শুনে রাখালের বুকখানা যেন কেমন দ্রুততালে টিপ্ টিপ্ করতে লাগল। কাঁটা দিয়ে উঠল তার সর্বাঙ্গ, নিঃশ্বাসও কেমন যেন ভারি হয়ে উঠল। ভয়ে বিস্ময়ে নীলকণ্ঠের দুঃসাহসের বাস্তব পরিচয়ে রাখাল মুগ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'তুই রামনাম করিস নি?'

'না।'

'রামনাম ক-রি-স্-নি!'

'দূর রামনামের কি আজকাল তেমন পাওয়ার আছে?'

'তবে?'

'তবে আর কি, আত্মারামের জোরেই গাছের ডালপালা ঠেলে বেরিয়ে এলুম।'

রাখাল সভয়ে ভবিষ্যৎ বিপদের কল্পনা করে বলে উঠল, 'কিন্তু যদি কিছু ঘটত?'

নীলকণ্ঠ হাসতে হাসতে বললে, 'তাহলে তুই বাড়ী ফিরে গিয়ে বলতিস—নীলু কি করে মরে গেল আমি তার কিছুই জানি না—'

'না না নীলু ওকথা আমি বলতে পারতুম না!'

'ইঃস্,' নীলকণ্ঠ ঠাট্টা করে বললে, 'আমি মরে গেলে তুই যেন বেঁচে ফিরতিস! ভয়েই তুই অক্কা পেতিস্!'

রাখাল বললে, 'সেরকম কিছু ঘটলে আমি বাঁচতেই চাইতুম না।'

রাখালের শেষ কথাটায় নীলকণ্ঠ কেমন যেন একটু অভিভূত হয়ে গেল। হ্যাঁ, সত্যিই রাখাল তাকে ভালবাসে। যত বড় ভীতুই সে হোক, নীলকণ্ঠ জানে, বন্ধুর জন্যে সে প্রাণ দিতেও পারে। তার ক্ষুদ্রজীবনে বন্ধুত্বের এ মর্যাদা সে অনেকবার দিয়েছে। এখানে সেখানে দুষ্টুমি করার জন্য বাবা যখন তাকে গরুচেঙানো করে ঘরে চাবি দিয়ে রেখে কারখানায় চলে গেছে, তখন মেটে ঘরের পোরোল গলা (ঘরের চালা ও দেয়ালের ব্যবধান) রাখাল তাকে খাইয়ে গেছে। সারা গায়ে তেল মালিশ করে দিয়ে গেছে। অবশ্য সে বিষয়ে রাখাল নীলকণ্ঠর মায়ের কাছে সাহায্য পেয়েছে খুবই। কিন্তু সাহায্য পেয়েই বা কজন এমন করে অপরের ঘরের পোরোল গলে বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখতে আসে? এসব কথা আপাততঃ মন থেকে সরিয়ে রেখে নীলকণ্ঠ রাখালকে বললে, 'যাক এখন অন্য সব কথা। এখন নৌকোটাকে তুই ব্যালেন্স করে রাখ দিকি—আমি টুক্ করে নদীতে গোটাকতক ডুব দিয়ে নিই।'

রাখাল সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'এত রাতে জলে নাববি?'

'কি হয়েছে?'

'যদি কোন জন্তু-জানোয়ার—'

'আরে তাদেরও তো ভয় আছে। আমাকে জলে নাবতে দেখে তারাও তো ভয়ে মরতে পারে।'

'আশ্চর্য!'

আশ্চর্য নীলকণ্ঠ নিজেও। করে কখন মানুষ ভয় পাবে বলে আগে থাকতে সাহস সঞ্চয় করে রাখে? পরিস্থিতিই তো মানুষকে পরীক্ষা করে। মানুষের কর্তব্য শুধু যে কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াতে শেখা। সাহস তো একেই বলে। বছর আঠারো বয়সের ছেলে নীলকণ্ঠ কেমন করে যেন জীবনের প্রথম প্রভাতেই এই সহজ কথাটা উপলব্ধি করে ফেলেছে। পাছে নৌকোর মাঝখান থেকে জলে নামতে গেলে নৌকোটা একপেশে হয়ে যায় তাই দাঁড়ের দিকটার অগ্রভাগে গিয়ে নীলকণ্ঠ টুক্ করে কুলো পড়ল জলে। বেশ ভাল করে গোটা কয়েক ডুব দিয়ে নিয়ে সে আবার অগ্রভাগাদ্যাকে ধরে ওঠবার সঙ্কল্প করল। নৌকোর নিচে ধু-ধু করা দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি—দূরে তাকালে অসহায়ের মত বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে যেতে হয়। একদিকে মাথার ওপর রাত্রির নক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশ, আরেকদিকে নদীর বুকে জলের এই বিরামহীন গতি—সমস্ত পরিবেশটা হৃদয়ঙ্গম করে সাহসের সঙ্গে জলের বুকে ভেসে থাকা যে কত কঠিন, তা একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ অনুভব করতে পারবে না। তার ওপর আবার নৌকো থেকে জলে নামা যত সোজা, জল থেকে নৌকোয় ওঠা ঠিক ততখানি সোজা নয় বরং একেবারে উল্টো। হাতের যদি খুব জোর না থাকে এবং সমস্ত শরীরটার ওপর যদি খুব কন্ট্রোল না থাকে তবে জল থেকে নৌকোয় ওঠা খুবই মুস্কিল।

রাখাল বললে, 'উঠতে পারবি, না, ধরব?'

'ধরতে এলে আর দেখতে হবে না—নৌকো জলের তলায় তলিয়ে যাবে', নীলকণ্ঠ উদ্বেগ প্রকাশ করে বললে, 'বরঞ্চ তুই হালের কাছে টাল সামলাবার জন্যে বোস্—আমি ঠিক ওঠে পড়ব।'

ঠিক তাই-ই হল। নীলকণ্ঠ প্রচণ্ড একটা ঝাঁকানি দিয়ে নৌকোর ওপর ওঠে পড়ল। নৌকোয় ওঠে গামছাটা দিয়ে গা-হাত মুছে এবং সেটাই পরে নিয়ে কাপড়খানা নুয়ে নৌকোর ওপর মিলে দিলে। তারপর নিজে হালের কাছে বসে বললে, 'রাখাল এবার তুই ঝুপ্ ঝুপ্ করে দাঁড় টান দিকি—জোয়ারের বেগ কমে এসেছে, যত-খানি পারি এগিয়ে নিই। তারপর ভাটা সুরু হলে একেবারে সন সন করে বেরিয়ে যাব। অনেকটা পথ, কাজেই বসে থাকলে হবে না—'

রাখাল দাঁড় টানতে লাগল। নীলকণ্ঠ বললে, 'জানিস এই ভেসে এসে যে কি সর্বনাশ হল, তা আর বলার নয়।'

রাখাল বললে, 'সর্বনাশ—কিসের সর্বনাশ!'

'ঘর ফেলে আসা হয়েছে, মনে নেই?'

'কিন্তু সে কি আর এতক্ষণ আছে? সেই কখন জোয়ার এসেছে—'

'সেই কথাই তো ভাবছি। যাক্ গিয়ে তো দেখা যাক্।'

ঘন কালিতে জল ঢেলে দিলে যেমন তা ফিকে হয়ে আসে, তেমনি করে রাতের অন্ধকার আলোর স্পর্শে ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসতে লাগল। ওপারে সারি সারি ইটখোলার পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজতে লাগল। কাজ আরম্ভ হওয়ার ঘণ্টা। চটকলগুলোর ভোঁ বেজে উঠল—কোনটা আগে কোনটা পরে। দূরে শোনা গেল মসজিদ থেকে আজানের সুর। নদীর এপারে গাছে গাছে পাখি-পাখালির কল-কাকলী। কোথায় যেন কে গান গাইছে—'অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া।'

ভাটার অনুকূল স্রোতে নীলকণ্ঠদের নৌকো সত্যিই সন্ সন্ করে এগিয়ে আসছিল। স্বর্ণশিমুলের চর আর বেশি দেরি নেই। দূর থেকে ছাতার মত একরাশ অন্ধকার জড়ানো স্বর্ণশিমুলের গাছটা চোখে পড়ে। আশ্চর্য গাছ কিন্তু। কতদিন, কতকালের গাছ। বছর বছর ফুল হয়। অদ্ভুত সে ফুল। সাধারণতঃ শিমুল গাছে লাল ফুলেরই সমারোহ দেখা যায় কিন্তু এ এক বিপরীত ধর্মী ফুল। কাঁটালি চাঁপার মত চওড়া চওড়া পাপড়ি মিলে ঠিক শিমুলেরই মত ফুলটা হয় কিন্তু তা স্বর্ণাভ। ধীরে ধীরে কবে ফুল থেকে শুটি হয়—শুটিও দিনে দিনে ঝিনুকের মত কপাট এঁটে বেড়ে ওঠে। তারপর ফাল্গুনের স্পর্শ লেগে চৈত্রদিনের এলোমেলো হাওয়ায় শুটিগুলো ফেটে ফেটে সোনালি তুলো আকাশে উড়ে বেড়ায় অসংখ্য প্রজাপতির মত। গাছের তলায়ও বিছিয়ে থাকে কত। স্তব্ধ দুপুরে গোপালপুর গ্রামের মেয়েরা স্বর্ণশিমুলের চরে এসে কোঁচড় ভরে সে তুলো নিয়ে যায়—কবে কাদের জামাই আসবে রাজপুত্তুরের মত কিংবা আসবে কাদেরো ঘরে পরম আদরের নাতি ও

মাতৃশি তাদের সবাইকে শুতে দেবে এই তুলোর বালিশে। এ তুলোর নাম স্বর্ণশিমুল। তাই স্বর্ণাভ তুলোর বালিশে মাথা দিয়ে সোনালি স্বপন দেখবে তারা চাঁবনের। এ গাছের যখন জন্ম হয়েছিল তখন এখানে চর ছিল না। চরের চেয়ে গাছের বয়স অনেক বেশি। তাই স্বর্ণশিমুলের নামানুসারেই চরের নাম হয়েছে স্বর্ণশিমুলের চর। সুদূর দক্ষিণে এই চরের ধু-ধু করা বিস্তৃতির শেষ। এখানে আজকাল চাষ হয়। চাষের জমির বুক চিরে গেছে অসংখ্য খাল আর খাড়ি। সেখানে কিছুদিন পূর্বে মাঠে মাঠে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য মেহোঘেরী।

নদী এককালে এখানে খরস্রোতা ছিল বলেই মনে হয়। গোপালপুরের পোদ্দার-বাবুদের পূর্বপুরুষরা এখানে ঘাট তৈরি করে দিয়েছিলেন লোকের সুবিধার জন্যে। বছরে একটি দুর্গাপুজো হত, অবশ্য সে পোদ্দারবাবুদেরই বাড়িতে। এই ঘাটে জনারণ্যের মধ্যে দিয়ে সেই দুর্গা প্রতিমাকে জোড়াবাঁধা নৌকোয় তোলা হত। তারপর নৌকো করে ঢোল-কাঁসি বাজিয়ে সেই প্রতিমাকে নদীর বুকে ঘোরানো হত। অবশেষে বিসর্জনের বাজনা বাজিয়ে ঘরে ফিরত শতসহস্র নরনারী। বাবার মুখে এসব কাহিনী কতবার শুনেছে নীলকণ্ঠ। আজ সে ঘাটও নেই আর পোদ্দারবাবুদেরও সে জমজমাট নেই। ঘাটটা কবে মুখ থুবড়ে পড়েছিল তা আজ আর কারো মনে নেই বা জানেও না—শুধু উল্টে পড়া ঘাটের চাতাল আর পোস্তাচড়ার ওপর পলি পড়ে পড়ে এখানে সেখানে কয়েক জায়গায় কচ্ছপের পিঠের মত উঁচু হয়ে আছে। তবু গোপালপুরের নরনারীরা নদীতে নামে এই দিয়েই। পালে-পার্বণে, গ্রহণে-যোগে এই স্বর্ণশিমুলের চরে এসেই তারা পুণ্যস্নান সারে।

চরের কাছাকাছি নীলকণ্ঠরা যখন এসে পৌঁছুল তখন পূর্ব গগন রক্তিম হয়ে উঠেছে। নদীর বুকে হাত তিনেক পরিমিত একখানা বাঁশের টুকরো দেখতে পেয়ে নীলকণ্ঠ আনন্দে চিৎকার করে উঠল, 'পেয়েছি পেয়েছি—আমার ঝুর পেয়েছি!'

রাখাল বলে উঠল, 'তাইতো রে! চল্ চল্ দেখি তাড়াতাড়ি!'

রাখাল জোরে জোরে দাঁড় টানতে লাগল। নীলকণ্ঠ হালের চাপে সোঁৎ সোঁৎ করে এগিয়ে যেতে লাগল। কাছে এসেই নীলকণ্ঠ উপুড় হয়ে বাঁশের টুকরোটাকে তুলে নিল নৌকোয়। তার সঙ্গে গাব দেয়া দাঁড় বাঁধা—দাঁড়িতে এক হাত অন্তর হাতখানেক পরিমিত সুতোয় ঝোলা বঁড়শি। যতই দাঁড় টানে ততই বঁড়শি দেখা যায় আর প্রায় বঁড়শিতেই ওঠে এক-একটা তপ্‌সে মাছ। তিন-চার শো গজ এমনি দাঁড়িতে প্রায় সাত-আটশো বঁড়শি। দাঁড়ির গোড়াতেও যেমন বাঁশের টুকরো বাঁধা তেমনি শেষপ্রান্তেও আরেকটা টুকরো। প্রথম বাঁশটার আলাদা একটা দাঁড় ছিল—সে দাঁড়টা বাঁশ থেকে একেবারে স্বর্ণশিমুলের চরে একটা পোঁতা লগিতে বাঁধা ছিল। এরকম দাঁড় বাঁধার অর্থ ঝুরটা নদীর স্রোতে ভেসে না যায়। ঝুর তোলা শেষ করে দেখা গেল প্রায় তিন-চারশো মাছ ধরা পড়েছে—অধিকাংশ তপ্‌সে, কিছু গলদা আর কিছু ভোলা।

ঝুরটা নৌকোর ওপর বিছিয়ে রেখে তারপর একখানা গামছায় মাছগুলো বেঁধে নিয়ে ওরা যখন তীরে এল তখন সূর্য উঠে গেছে।

সে সময় ঘাটে স্নান করতে এসেছিলেন গোপালপুরের অনেকগুলি মহিলা। যেমন বাঁটুল-সাঁটুলের মা সর্বজন পরিচিতা বিন্দুপিসী প্রভৃতি। পিসীর দিকে নজর পড়তেই নীলকণ্ঠ বলে উঠল, 'এই রে সেরেচে!'

'কিরে?'

নীলকণ্ঠ আঙুল দিয়ে বিন্দুপিসীর দিকে দেখালো। রাখাল বললে, 'চ-ট পালাই চ'—

পালাবার কথা বলতে না বলতেই বিন্দুপিসী বলে উঠল, বলি অ নরিন্দরের ছেলে! আমার আবার ছোঁড়াগুলোর বাপু নাম মনে থাকে না। বলি অ নরিন্দরের ব্যাটা—বাবা গামছা ভরে কি মাছ নে যাচ্ছিস রে—?'

সত্যিই বিন্দুপিসী চট করে ছেলেদের নাম মনে করতে পারেন না। সেজন্যে তিনি ছেলেপিলেদের বাপ-ঠাকুরদার নাম ধরেই ডাকেন। বিন্দুপিসী এক অদ্ভুত লোক। বয়স তাঁর সত্যিই বেশি, কিন্তু কত তা অনুমান করা খুবই মুস্কিল। এককালে বোধ হয় লম্বাই-চওড়াই চেহারা

যতই দাঁড় টানে ততই বঁড়শি দেখা যায় আর প্রায় বঁড়শিতেই দেখা যায় এক একটা তপ্‌সে মাছ

ছিল তার। এখন কিছুটা ক্ষীণ হয়ে এসেছে। মাথায় কাঁচাপাকা চুল। বিন্দু-পিসীর সুবাদে পিসেমশাইকে কেউ কোন-দিন প্রত্যক্ষ করে নি, পিসী কিন্তু এখনও সিঁদুর পরেন। তাই কাঁচাপাকা চুল-ভর্তি মাথাটার সুমুখ দিকটায় অসম্ভব রকমের চওড়া একটা সিঁথি। বোধ হয় চুল উঠে উঠেই এতটা চওড়া হয়েছে। সিঁথিটা দগ্‌দগ্‌ করছে সিঁদুরে। পিসী আমাদের যে যাই বলুক, পাছে পিসে-মশায়ের কোন অকল্যাণ হয়, এখনও কিন্তু মাছটা-আঁশটা খেয়ে থাকেন। আর বোধ হয় সেই জন্যেই নবেন্দুর ছেলে নীলকণ্ঠের হাতে গামছায় বাঁধা মাছ আছে বুঝতে পেরে সুযোগটা তিনি ছাড়তে চান নি।

নীলকণ্ঠ সে কথা জানে। তাছাড়া সে এও জানে বিন্দুপিসীকে মাছ না দিয়েও তার নিস্তার নেই। এমন সব কটু কথা বলবে যা কস্মিনকালেও সুবল মিত্র বা রাজশেখর বসু মহাশয়রাও অভিধানগ্রস্ত করতে পারেন নি। তবু সে রীতিমত বিরক্তভরেই বললে, 'কি মাছ সে তো তুমি জানো পিসী—আমরা যখন ঝুর ফেলি, তখন বুঝবে কি মাছ ওঠে সে কি তোমার অজানা?'

'বাবা ঝুরে আর পাঁচরকম মাছও তো পড়ে?'

'কিন্তু সে সব মাছ তো তুমি চাও না—তুমি খালি চাও তপ্‌সে মাছ!'

'কি করব বাবা', বিন্দুপিসী এবার অনেক অতীতে ফিরে গেলেন এবং বললেন, 'আমার ঠাকুমা আর আমার মা আমাকে আশীর্বাদ করে বলত, বিন্দু তুই জন্মো এয়োস্ত্রী থাকিস মা। তা বলতে নেই, তেনারা ছিলেন সতীলক্ষ্মী, সগ্গে গ্যাচেন সজ্ঞানে, তেনাদের কথা কি নড়চড় হবার জো আছে—সত্যি সত্যিই ফলে গ্যাচে। সেই সাত বছর বয়েসে মাথায় সিঁদুর দিয়িচি—আর আজ আমার চার কুড়ি পাঁচ হয়ে গ্যালো, এখনও বাবা সিঁদুরে কেউ আমার মাথা থেকে পুঁছে দিতে পারে নি। তাই বলছিলুম বাবা সিঁদুরেটা যখন এখনও সিঁথেয় রয়েছে তখন কি আমি সোয়ামীর অকল্যেণ করতে পারি?'...কথা-গুলো বলতে বলতে বিন্দুপিসীর গলাটা কেমন যেন একটু ঘড় ঘড় করে উঠল, একটু কান্নার সুরও সে গলায় নেমে এল এবং কান্নামিশ্রিত কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন, 'পোড়াকপাল আমার—আমার কপাল যদি না পুড়বে তবে তিনি বাড়ি ছেড়ে সাধু-সন্নিসি হয়ে যাবেন কেন? তাই হাতে আমার না আছে দু'ভরি সোনা না আছে দুটো নয়াপয়সা। বাপের ভিটেয় পড়ে আছি—ইচ্ছে মত যে দু-দশ আনার মাছ কিনব তারও উপায় নেই। কিন্তু কাঁহাকের আর সধবা অবস্থায় সোয়ামীর অকল্যেণ করে যাবো—আমি তো বাবা বিধবা নই—'

নীলকণ্ঠ, পতিগতপ্রাণ পিসীর স্বামী-অকল্যাণভীতির কথা শুনে বললে, 'তা এ অবস্থায় তোমাকে রোজ-রোজ মাছ যোগাবে কে পিসী?'

'কে আর যোগাবে বাবা, তোরাই যোগাবি। তোরা থাকতে আর আমি যাব কোথায়?' ঘাটে নাইতে আসার আগে আমি তোদের বাড়িতেও গেসলুম বাবা—'

'তা সোজাসুজি সেই কথাটাই তো বললে পারতে—এমন ধানাই-পানাই করতে গেল কেন?'

'ধানাই পানাই কি দেখলি তোরা', বিন্দুপিসী বলতে লাগল, 'দেবার হয় দিবি, না দেবার হয় চলে যাবি। বিন্দু বামুনি কি কারো ধার ধারে না কারো আটচালায় বাস করে?'

নীলকণ্ঠ ও রাখাল মুখ চাওয়া-চায়ি করল। এর অর্থ—তারা বুঝে ফেলেছে বিন্দুপিসী এবার চটেছে। এরপর আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই—এখুনি হয়তো পিসী তাদের ঊর্ধতন চৌদ্দ-পুরুষকে উদ্ধার করতে লেগে যাবে। তাই গামছা থেকে গোটা চারেক তপসে মাছ বের করে বুড়ীকে দেবার উদ্দেশ্যে বললে, 'এই নাও—'

বিন্দুপিসী তাড়াতাড়ি কোঁচড় পেতে বললে, 'আহা-আ মাছ নয়তো যেন পাকা সোনা। তেল খর-খর করে ভাজলে যেন একেবারে মচ্‌মচ্‌ করবে।'

'তাই ভেজো', বলে নীলকণ্ঠ রাখালকে বললে, 'নে নে চল—সকালবেলাতেই পিসীর দাঁতঝাড়া। কে জানে দিনটা কেমন যাবে!'

দিনটা যে ভাল যাবে না নীলকণ্ঠ সেটা বুঝতেই পেরেছিল।

সারারাত নদীর বুকে থেকে, মহা-যোগীনির মহাশ্মশানে আট্‌কা পড়ে যে ছেলের ভয়ডরের লেশমাত্র দেখা যায় নি—সেই ছেলে যতই বাড়ির কাছাকাছি যেতে লাগল ততই তার ভয়ে বুক দুর্‌ দুর্‌ করতে লাগল। পথে একবার মাত্র সে থেমেছিল—থেমে রাখালের কাপড়ের খুঁটে অর্ধেক মাছ বেঁধে দিয়েছিল। রাখালের বাবা নেই। তাকে বকবারও কেউ নেই। কিন্তু নীলকণ্ঠর বাবা আছেন। বাবা যদি কাজে না বেরিয়ে থাকেন, তবে তার আর নিস্তার নেই। চটকলে ভাইসম্যানি করা হাতুড়ী পেটা হাত বাবার—একটি চড়ে একেবারে মুণ্ডু ঘুরে যাবে। চোখে অন্ধকার দেখতে হবে। ডানপিটে দুষ্টু-ছেলে বাবার কাছে যে কত অসহায় এবং তা যে কত করুণ তা তার চেয়ে বেশি আর কে জানে। মনে মনে সে প্রার্থনা জানায়, হে ভগবান বাবা যেন কারখানায় যায়। শরীর খারাপ বলে যেন বাড়ি না থাকে।

খুবই ভয়ে ভয়ে নীলকণ্ঠ বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল। মাটির দেয়াল দেয়া খড়ের ছাউনি করা খান দুই ঘর। একটি উঠোন সামনে। উঠোনসহ বাড়ির চৌহদ্দীটা মনসা আর রাংচিতার বেড়া দিয়ে ঘেরা। এরই মাঝে দু'দিক ফাঁক করে বাঁশের খুঁটিতে আগড় দেয়া একটা প্রবেশ পথ। সামান্য পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় তপশীলভুক্ত জাতির খেটে খাওয়া একটি পরিবারের এর চেয়ে ভাল ঘর আর কি করে হবে? আগড় ঠেলে বাড়ি ঢুকতেই দেখল দাওয়ার উপুড় হয়ে বসে মা নন্দরাণী ছোটভাই চন্দনকে মুড়ি খেতে দিচ্ছে। চন্দন বছর সাতেকের ছেলে। দাদাকে দেখতে পেয়েই বলে উঠল, 'দাদা এসেচে দাদা এসেচে—মাছ এনেচে দাদা!'

চন্দন আর মাকে দেখে কেমন যেন একটু ভরসা হল নীলকণ্ঠর। সে জিগ্যেস্‌ করল, 'বাবা কোথায় মা?'

নন্দরাণী মুখভার করে বলে উঠল, 'জানি না।'

বুকটা ধড়াস করে উঠল নীলকণ্ঠর। তবে কি বাবা কারখানায় বেরোয় নি? কিন্তু পরক্ষণেই মায়ের ফেটে পড়া রাগত মূর্তি আর অভিমানক্ষুব্ধ ভাষা শুনে সে বুঝে নিলে যে বাবা বাড়ি নেই, কিন্তু তাই বলে মা যে তাকে ছেড়ে দেবে সেরকম কোন সম্ভাবনাও নেই। নন্দরাণী বলে উঠল, 'তোর ছেলের খোঁজ করার দরকার কি? সে তোর কতটুকু খোঁজ রাখে? কপাট যত তো আমারই—'

নীলকণ্ঠ মাছের পুঁটুলিটা দাওয়ায় রাখতেই চন্দন মুড়ি ফেলে ছুটে গিয়ে গামছার বাঁধন খুলতে গেল। কিন্তু সে খুলতে পারবে না দেখে নীলকণ্ঠই তা খুলে ধরল তার সামনে। চন্দন মাছ দেখে হাততালি দিয়ে বলে উঠল, 'ও তপ্‌সে মাছ—দাদা অনেক মাছ এনেচে মা!' তারপর দু-তিনটে মাছের শোঁয়া ধরে এক সঙ্গে তুলে ধরে বলতে লাগল, 'মা দাদা খাবে, আমি খাব, তুমি খাবে, বাবা খাবে—সব্বাই খাব!'

নন্দরাণীর তখন অভিমানিনী মূর্তি। সে বলে উঠল, "ফেলে দে ও মাছ—ও মাছ আমি ছোঁব না!'

সাত বছরের ছোট ছেলে চন্দন বাঁ হাতের আঙুল মুখে পুরে দিয়ে অবাক হয়ে তাকালো মায়ের দিকে। সে বুঝতে পারল না কেন মা মাছ ফেলে দেবে। তাই সে মায়ের কাছে গিয়ে পিঠ ধরে বলে উঠল, 'ফেলে দেবে কেন মা—মাছ ছোঁবে না কেন মা?'

ধমক দিয়ে নন্দরাণী বললে, 'জানি না।'

চন্দন কাঁচুমাচু হয়ে দাদার মুখের দিকে তাকালো। নীলকণ্ঠ-চন্দনের ওপর সমবেদনায় মায়ের উদ্দেশ্যে বলে উঠল, 'ও ছোট ছেলে—ওকে অমন করে ধমকে কষ্ট দিচ্ছো কেন মা? যদি কিছু বলার থাকে

ফুলেশ্বরে ও মাছ ও মাছ আমি ছোব না

তো আমাকেই বলো। মাছ তো আমি প্রায়ই ধরতে যাই কিন্তু—"

'কিন্তু কি', নন্দরাণী এবার যেন ফেটে পড়ে বললে, 'আমি যদি তোর আপন মা হতুম—তুই সন্দেবেলা আমার কথা ঠেলে পালাতে পারতিস্? তুই পালাকি—তোর ছেলে আমাকে যা তা বলবে, সকালবেলায় পাড়ার লোকও ছেড়ে কথা বলবে না। সৎমা আমি—আমি নাকি ছেলেকে পর করে দিচ্ছি!'

'বাবা, যদি ওকথা বলে তবে বাবার সেটা বাড়াবাড়ি। কিন্তু পাড়ার লোক ওসব কথা বলতে আসে কি করে? কোন এক্তিয়ারে? আমার সৎমা—সে আমি বুঝব—"

'আর কবে বুঝবি', নন্দরাণী কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললে, 'সেই এতটুকু মা-মরা ছেলেকে গু-মুত ঘেঁটে আমি এত বড়টা করলুম, আর আমি ছেলের মর্ম বুঝি না। কথায় কথায় লোকে আমাকে খোঁটা দিয়ে যাবে আমি সৎমা—আমার স্বধম্মো ছেলেকে পর করে দেয়া!'

নীলকণ্ঠ মায়ের কথায় বেশ বুঝতে পারল বাড়িতে নিশ্চয়ই একটা কিছু ঘটে গেছে তাকে কেন্দ্র করে। আর সেটা এমন যে নন্দরাণী তাতে রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়েছে। হ্যাঁ একথা ঠিক নীলকণ্ঠ নন্দরাণীর আপন সন্তান নয়। সে যখন দু' বছরের তখন তার মা মারা যায়। তারপর তার ঠাকুরমা বাবার আবার বিয়ে দিয়ে নন্দরাণীকে ঘরে নিয়ে আসেন। সে কথা নীলকণ্ঠর মনে থাকার কথা নয়। তবে ঠাকুরমার মুখে শুনেছিল বুড়ীর মৃত্যুর আগে। নন্দরাণী এ বাড়িতে এসে ছোট্ট একটি দু' বছরের শিশুকে পেয়ে তার কৈশোরের সমস্ত স্বপ্ন-মাখা আগ্রহ সবটুকু স্নেহ-ভালবাসা উজার করে দিয়েছে। তাকে কখনও কোনদিন কেউ নীলকণ্ঠকে অনাদরে থাকতে দেখে নি। ছেলে জলে নাইয়ে-ধুইয়ে, খাইয়ে-দাইয়ে ঘুম-পাড়িয়ে তার শৈশবকে উত্তীর্ণ করে দিয়ে তাকে মানুষ করে তোলার স্বপ্নে সে সর্বদা মগ্ন থেকেছে। সেই ছেলেকে নন্দরাণী দেখতে পারে না বললে তার কতখানি লাগবে তা বোধ করি না বললেও চলবে। অথচ সেটাই ঘটে গেল গত রাত থেকে সকালের মধ্যে।

...কারখানা থেকে ফিরে নরেন খাওয়া-দাওয়া সেরে প্রতিদিনই সন্ধ্যেবেলা পাড়ার বারোয়ারী তলায় বেড়াতে যেত। সেদিনও যথারীতি যখন যাব-যাব করছিল, এমন সময় সাদা একগোছা পৈতে গলায় বিপদ-ভঞ্জন চাটুয্যে মশাই বাঁ হাতে লণ্ঠন আর ডান হাতে একখানা লাঠি নিয়ে তাদের আগড় ঠেলে একেবারে উঠোনে এসে হাঁকলেন, 'নরেন আছিস নাকি—নরেন?'

নরেন বিস্ময়ে অবাক। সোজা দাওয়া থেকে উঠোনে ছুটে এসে যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে বললে, 'প্রণাম হই জ্যাঠামশাই।'—তারপর বিস্ময়ের ঘোরেই বলে উঠল, 'কিন্তু আপনি হঠাৎ?'

'হঠাৎই এলুম বাবা!'

নরেন ছুটে দাওয়ায় উঠে গিয়ে হোগলা কাঠিতে বোনা মাদুরখানা বিছিয়ে দিয়ে বললে, 'আসুন জ্যাঠামশাই—'

'বসব?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ বসবেন বৈ কি। পায়ের ধুলো যখন দিয়েছেন—'

অগত্যা দাওয়ায় গিয়ে বসলেন বিপদ-ভঞ্জন। প্রকাণ্ড ভুঁড়িওয়ালা গোলগাল চেহারা। সারা গায়ে লোম। গোঁফজোড়া বুরুশের মত। মাথায় একমাথা টাক। মাদুরে বসে কথাটা নিজেই পাড়লেন, 'তোর কাছে এসিচি বাবা নেহাৎই বিপাকে পড়ে। কি বলব বাবা, এই বুড়ো বয়েসে জানটা বোধ করি বেঘোরে যাবে।' কথা-গুলো বলতে বলতে বিপদভঞ্জন গলার স্বরটা একটু নিচু করে আবার বললেন, 'খেতে পাই না বাবা—দু'বেলা দু'মুঠো। আমার অপোগণ্ড ছেলে-গুলোর দুটো-একটাকে বাবা তোদের কার-খানায় ঢুকিয়ে দিতেই হবে—'

নরেন অবাক হয়ে গেল তাঁর কথা শুনে। অনেকদিন আগেকার এক অতীত তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। তখন নরেন নিতান্তই ছেলেমানুষ। এমন কি বোধ করি নীলকণ্ঠর চেয়েও ছোট হবে। বাবা মারা যেতে সংসার চালাবার কোন পথ খোলা ছিল না তাদের। জমি-জায়গা বলতে যা ঐ ভিটেটুকুই ছিল। তাই তাকে চটকলে কাজ করতে যেতে হয়েছিল তখনই। কারখানা থেকে ফেরার পথে নরেন রোজই দেখত নস্করদের রকে বসে বসে বিপদভঞ্জন, নস্করবাবুদের বুড়োকর্তা এবং অনুরূপ সমবয়সীদের সঙ্গে গল্প-গুজব করত। একদিন এমনিতরো ফেরার সময় হঠাৎ বিপদভঞ্জন তাকে বললেন, 'নরেন যা দেখি চট্ করে এক বাণ্ডিল বিড়ি আর একটা দেশলাই বাজার থেকে এনে দে তো।' নরেন সেই মত্ত চটকলের হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে ফিরছিল, কাজেই মন তার সায় দিলে না তাঁর কথায় এবং তাই সে বললে, 'এই খেটেখুটে আসচি জ্যাঠামশাই—আপনি আর কাউকে বলে দেখুন না।' তাতে সকলের সামনে বিপদ-ভঞ্জন সেদিন অনেক কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন। সবচেয়ে মারাত্মক কথাটা তিনি সেদিন যা বলেছিলেন তা সে আজও ভোলে নি। বিপদভঞ্জন বলেছিলেন, 'ক্ষেলো লোকেরা সহবৎ শিখবে কোত্থেকে?' অর্থাৎ সেদিন কলে-কারখানায় কাজ করা লোকদের এঁরা ঘৃণার চক্ষে দেখতেন। আর

আজ—সেই লোকই এসেছেন নিজের ছেলে-দের জন্যে কলে-কারখানায় চাকরি যোগাড় করতে। আশ্চর্য পার্থক্য সেদিনে আর আজকের দিনে! কি অসম্ভব দ্রুত পরি-বর্তন। কে জানে কেমন করে এমন পরিবর্তন সম্ভব হল। বিপদভঞ্জন সেদিন যতই ঘৃণা করে থাকুন নরেনকে আর তার জন্য তার মনে যতই রাগ হয়ে থাকুক আজ সন্ধ্যায় সে গভীর সহানুভূতির সঙ্গেই বিপদভঞ্জনের কথাগুলিকে গ্রহণ করলে। হয়তো সংসার তাঁর অচল হয়ে পড়েছে আর্থিক কষ্টে। হয়তো সত্যিই খাবার কষ্ট হয়েছে বাড়িতে। কিন্তু নরেন আশ্চর্য হয়ে গেল তাঁর বড়ছেলের কথা ভেবে। শুনতে পাওয়া যায় তাঁর বড়ছেলে নাকি যথেষ্ট পয়সা রোজগার করে। নরেন সেই কথা তুলে বললে, 'কিন্তু জ্যাঠামশাই আপনার ছেলেদের কলকারখানায় যেতে হবে কেন—আপনার বড় ছেলে নিমাই তো অনেক পয়সার মালিক!'

বিপদভঞ্জন কথাটা লুফে নিয়ে বললেন, 'মালিক তো নিমাই শুধু পয়সারই নয়। কলকেতার পাশে কোথায় যেন বাড়িও করেছে পেরকান্ড। কিন্তু বাবা সে তো আমার সংসারের কেউ নয়—

'কেন জ্যাঠামশাই?'

'বুঝতে পারছিস না বাবা। পারে কুড়ুল মেরিচি যে আমি নিজেই।'

নরেন জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে বিপদভঞ্জনের দিকে তাকালো। বিপদভঞ্জন বলতে লাগ-লেন, 'দ্বিতীয়বার সংসার করে আমি মরিচি। যেমনি খাণ্ডালে বউ—তেমনি বিটলে আমার বড়ছেলে। তাছাড়া কি জানিস বাবা, সৎমা কখনো ভাল হয় না।'

নরেন আড়চোখে একবার ঘরের দরজার দিকে তাকালো। বিপদভঞ্জন কিন্তু থামলেন না। তিনি বললেন, 'কি বল্ না—সৎমা কখনো ভাল হয়? সে নিজের ছেলের দিকেই টানে। নয় কি?'

'তা সবাই কি তা করে জ্যাঠামশাই?'

'সবাই সবাই। হাজারে বড়জোর একটা ভাল হয়—' বিপদভঞ্জন বলতে লাগলেন, 'ঐ খাণ্ডালে বউ বাড়িতে ঢুকেই তো ছেলেটাকে আমার পর করে দিলে। দুটি চক্ষে ছেলেটাকে দেখতে পারত না মাগি।'

'গোড়া থেকেই অমনিতরো করত?'

'অবিশ্যি বাপু গোড়াতেই তেমন কিছু দেখি নি। কিন্তু যেই নিজের ছেলেপিলে হতে আরম্ভ করল, অমনি ছেলেটার অযত্নের বহর, খিচুনির বহর বাড়তে লাগল।'

'হয়তো ছেলেপুলে হলে এমনিই হয়।'

'হাঁ। সেই কথাই তো তোকে বলছিলুম—'

ইতিমধ্যে দরজার আড়ালে তখন অন্য খেলা শুরু হয়ে গিয়েছিল। স্বামীর একটি কথা নন্দরাণীর এতদিনকার সমস্ত বিশ্বাসের মূলে যেন একটা প্রচণ্ড কুঠারা-ঘাত করে বসল। 'হয়তো ছেলেপুলে হলে এমনিই হয়'—কি আশ্চর্য কথা, স্বামী একথা বললে কি করে? নন্দরাণীরও ছেলে হয়েছে। চন্দনকে কোলে পেয়ে কি সে কোনদিনও নীলকণ্ঠকে আলাদা করে দেখেছে, না সেরকম কিছু ভেবেছে? নির্বাক মানুষেরও একটা ভাষা আছে। সে ভাষা শব্দময় কথার চেয়ে অনেক ভয়ংকর। দরজার পাশে একটা দীর্ঘশ্বাস নন্দরাণীর বুক থেকে আছাড় খেয়ে বাইরে পড়ল। নরেন সেটা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারল। কিন্তু তখন সে হাতের ঢিল ছুঁড়ে দিয়েছে। ফিরিয়ে আনার কোন রাস্তাই নেই।

ছেলেদের কারখানায় চাকরির কথা বলতে এসে বিপদভঞ্জন সৎমায়ের জন্যে ছেলে পর হয়ে যায় উক্তি করে চলে যাবার পর নন্দরাণীর সঙ্গে নরেনের একহাত হয়ে গেল। নন্দরাণী বললে, 'তুমি ওকথা বললে কি করে?'

'কিন্তু কথাটা কি মিথ্যে?'

'তাহলে তুমি মনে করছ যে, আমার জন্যেই নীলকণ্ঠ পর হয়ে যাবে?'

'পর না হোক্ অন্ততঃ বয়ে যে যাবে সে কথা বুঝতে কোন কষ্ট নেই—'

'ছেলের বয়ে যাওয়াটা কি দেখলে?'

'সে কথা জিগির দিয়ে বলতে হবে', নরেন তীব্র শ্লেষের সঙ্গে বললে, 'এই যে সন্ধেবেলাতেই ছেলে খেয়েদেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছে, সে কার জন্যে শুনি?'

স্বামীর কণ্ঠ অনুকরণ করে নন্দরাণীও বললে, 'সে কি আমার জন্যে?'

'কেন তুমি বাড়ি ছিলে না?'

'বাড়ি থাকলে কি হবে—সে কি আমার কথা শোনে নাকি?'

'না শোনে', নরেন রীতিমত জোর দিয়ে বললে, 'যেমন করে হোক্ শোনাতে হবে।'

'ও!' নন্দরাণী ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে, 'তা'লে সৎমা বলে তোমাদের গেরামে ঢি-ঢি পড়ে যেতে আর বাকি থাকবে না।'

সৎমাদের এই বিপদ চিরন্তন। যদি সতীন ছেলেদের তারা শাসন করে তবে সেও হবে 'সৎমাটা দেখতে পারে না' আর যদি তারা রাশ আলগা করে দেয় তবে সেও হবে এই যে 'সৎমাটা ছেলেটাকে দেখে না পর্যন্ত। কাজেই সৎমারা যায় কোনদিকে?

এই নিয়ে সেদিন অনেক রাত অবধি তর্কবিতর্ক হয়েছিল। এমন কি এক সময়ে ব্যাপারটা চরমেও উঠে যায়। প্রসঙ্গ-ক্রমে নরেন বলেছিল, 'নীলকণ্ঠ বয়ে যাবে তোমারই জন্যে—এটা আমি আজ বুঝি নি, বুঝিছিলুম সেইদিন যেদিন আমি তোমাকে বিয়ে করে ঘরে এনেছিলুম!'

'এত বড় কথা', নন্দরাণী বলেছিল, 'তাহলে তোমার বিয়ে না করাই উচিত ছিল!'

'হ্যাঁ সেটাই ভাল হত।'

রাতে তো যা হবার তা হয়েছিল, কিন্তু সকালে কারখানায় যাবার সময় যা ঘটল সে আবার আরও মারাত্মক। নন্দ-রাণীকে শাসিয়ে নরেন বললে, 'ছেলেকে কারখানা থেকে এসে যদি বাড়িতে আজ না দেখি—তবে তোমারই একদিন কি আমারই একদিন।' কথাগুলো বলে সে চলেই যাচ্ছিল, কিন্তু বিন্দুঠাকরুণ এসে ইন্ধন যোগালেন ঠিক সেই মুহূর্তে। তিনি যাচ্ছিলেন নদীতে চান করতে। আগড়ের পাশে নরেনের গলা শুনতে পেয়ে একেবারে উঠোনে ঢুকে পড়ে বললেন, 'কি হয়েছে রে নরিন্দর—কি হয়েছে? এত চেঁচাচ্ছিস কেন?'

'এই দ্যাখো না দিদি—ছেলেটাকে আমার একেবারে পর করে দিলে!'

'কে—বউ', বিন্দুঠাকরুণ মুখে তাচ্ছিল্যজাত এক প্রকার শব্দ করে বললেন, 'হাজার হোক স-ৎ-মা-তো! স্ব-ধ-ম্মো যাবে কোথায়?'...

মায়ের মান-অভিমান, রাগ-চিৎকার, শাসন-তিরস্কার প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে এই সব ঘটনা যখন নীলকণ্ঠর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল তখন কি এক বেদনায় বুকখানা যেন তার টন্‌টন করে উঠল। আষাঢ়ী বর্ষণের পূর্বমুহূর্তে আকাশ যেমন মেঘ-ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে তেমনিভাবে তারও মনের আকাশে জমে উঠল মেঘ। কে জানে হয়তো এখনি বর্ষণ সুরু হবে।

মা কেমন ছিল তা নীলকণ্ঠ জানে না। জ্ঞান হওয়া অবধি নন্দরাণীকেই সে মা বলে জানে। নন্দরাণী সৎমা হলেও তার কাছ থেকেই সে মাতৃস্নেহ পেয়েছে। কোনক্রমেই সে আপন মা ও সৎমার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে না। কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে সে বোঝে মা তার আপন মা নয় বলেই একটা পার্থক্য দাঁড় করাবার ঘটনা রয়ে গেছে। এই পার্থক্য যে কেন লোকেরই পক্ষে আঙুল দিয়ে দেখানো সোজা। কিন্তু সেই পার্থক্য ডিঙিয়ে যে সৎমা অন্তরের সমস্ত মমতা উজোড় করে দিতে পারে তাকে দেখতে পাওয়া বোধ করি তত সোজা নয়। তাই লোকে তার মাকে অযথা আঘাত করে। কিন্তু লোকে আঘাত করে বলে বাবাও সেই আঘাত করবে?

যুগপৎ তাই মায়ের প্রতি সহানুভূতির আবেগে ও বাবার প্রতি ক্রুদ্ধ অভিমানে নীলকণ্ঠ যেন ফুঁসে উঠল। দু' চোখ বেয়ে নেমে এল তার বর্ষার বারিধারা। অন্যদিকে রাগে সে বলে উঠল, 'বাবা আজ ফিরুক—তারপর দেখব কি হয়?'

নন্দরাণী বলে উঠল, 'লজ্জা করে না তোর ও কথা বলতে?'

'লজ্জা কিসের? আমাকে বাবা যত পারুক শাসন করুক, কিন্তু তোমাকে কেন অমন করে বলবে?'

'তোর জন্যেই তো বলে।'

'আমার জন্যে আমাকে বলুক—আমার জন্যে তোমাকে বলার কি কোন মানে হয়?'

'মানে হয় বলেই তো ওরা বলে', নন্দরাণী আফশোষ করে বলে উঠল, 'তা না হলে বিন্দুঠাকরুণ পর্যন্ত অমন করে বলে যায়।'

'বিন্দুঠাকরুণ!' নীলকণ্ঠ যেন জ্বলে উঠল।

মনের ভিতর যে ক্রুদ্ধ অভিমান তার এতক্ষণ আকুলি-বিকুলি করে বাইরে, আছড়ে পড়তে চাইছিল, বিন্দুঠাকরুণের কথায় তা যেন একটা পথ খুঁজে পেলে। দাঁতে দাঁত দিয়ে সে বলে উঠল, 'দেখছি ঐ তোমার বিন্দুঠাকরুণকে।' কথাগুলো শেষ করতে না করতেই সে উঠোনে নেমে পড়ল।

নন্দরাণী সভয়ে বললে, 'কি রে বামুনের মেয়েকে কি দেখবি—ও নীলু?'

'কিচ্ছু নয়', নীলকণ্ঠ বললে, 'চরের ঘাট থেকে ওঠার সময় বামুনিকে তপসে মাছ দিয়ে এসিচি। কেড়ে নোব—'

নন্দরাণী প্রমাদ গণল। নীলকণ্ঠ ততক্ষণে আগড় ঠেলে পথে নেমে পড়েছে। নন্দরাণী ছুটল সেদিকে। চন্দন চেঁচিয়ে উঠে বললে, 'মা কাগে মাছ নিয়ে যাবে—'

সেই বিন্দুঠাকরুণ ওরফে বিন্দুপিসী—তখন থুপ্ থুপ্ করে গুটি গুটি আসছিলেন। নীলকণ্ঠ কয়েক পা এগিয়ে গেল সেদিকে। পিছন থেকে নন্দরাণী ডাকলে, 'নীলু ও নীলু—বাড়ি আয়। শিগগির বাড়ি আয়!'—নীলকণ্ঠ ততক্ষণে পিসীকে ধরে ফেলেছে। পিসী তাকে দেখে বললে, 'নরিন্দরের ব্যাটা না?'

'হ্যাঁ এখন চিনতে পারবে না' নীলকণ্ঠ পিসীর কোঁচড়ে হাত দিয়ে বললে, 'দেখি মাছগুলো দেখি!'

'সে কি কথা রে?'

'দেখি দেখি বলতে বলতে নীলকণ্ঠ বিন্দুঠাকরুণের কোঁচড় থেকে মাছগুলো বের করে নিয়ে বললে, 'এবার যাও—'

'ওমা মাছগুলো দিয়ে তুই কেড়ে নিলি?'

'হ্যাঁ। যে মানুষের যেমনি রোগ তাকে তেমনি ওষুধই দিতে হয়।'

ষোল-সতেরো বছরের কিশোর ছেলে নীলকণ্ঠ এই জাতীয় পিসীদের যতই চিনুক কিন্তু এই পিসীরা যে কত বড় এ্যাজিটেটর হতে পারে সে ধারণা বোধ করি তার কখনই ছিল না। মুহূর্তের মধ্যে সদাস্নাতা বিন্দুপিসী পথের ধুলোয় লুটিয়ে পড়লেন। স্বামীর অকল্যাণ যাতে না হয় তার জন্য কত কষ্টে চেয়ে-চিন্তে সংগ্রহ করা তাঁর তপসে মাছ—হতে পারে সে মাছ নরিন্দরের ছেলেই দিয়েছে—তাই বলে সে দিয়ে আবার কেড়ে নেবে? এত বড় আস্পর্ধা তার—পিসীর স্বামীর

এই স্লা নীলে—পিসীকে ধুলোয় ফেলে দিয়েছিস ক্যানরে স্লা?'

অকল্যাণ করবে সে মাছ কেড়ে নিয়ে? তাছাড়া 'নোক সমাজে' বলতেও 'নজ্জা হয়'—এই সাতসকালে বামুনের মেয়ের গায়ে হাত? হে ভগবান, দেশে মানুষজন নেই! ছোটনোকেরা এত বাড় বাড়বে—কেউ শাসন করবে না?

শাসন করবার লোক অবশ্যই আছে। যথাসময়ে তারা এসেও পড়ল। নন্দরাণী কিন্তু তারই মধ্যে ঘোমটা টেনে গিয়ে নীলকণ্ঠর হাত থেকে মাছগুলো ছোঁ মেরে কেড়ে নিলে এবং তারপর উপুড় হয়ে বিন্দুঠাকরুণের কাছে বসে পড়ে বললে, 'রাগ কোরো না দিদি এই নাও মাছগুলো। ওকে আমি খুব শাসন করে দোবো। এসব কিছুই হোতো নি—যদি তুমি আমায় সংমা বলে গাল না দিতে। যা হোক্ এখন ওঠো—ওতো তোমায় রাস্তায় ফেলে দেয় নি দিদি—'

'চোখ খাকি আমার', বিন্দুঠাকরুণ খেঁকিয়ে উঠে বললে, 'তবে কি চরের ঘাটে স্নান সেরে সুখ-নিদ্দির দিতে আমি এই রাস্তায় শুতে এসিছিনু?'

বিন্দুঠাকরুণ ভগবানকে ডেকেছিলেন। ভগবান বোধ করি সাড়া দিয়েছিলেন। তাই যারা সেখানে এসে পড়েছিল তাদের মধ্যে দেখা গেল বিপদভঞ্জন চাটুয্যের অপোগণ্ড ছেলেগুলিকে : যথাক্রমে তারা বাঁটুল, সাঁটুল, ফটকে, গুটকে, ঘন্টে আর ঘন্টে।

পিসীর কথা শুনে তারা প্রায় সমস্বরেই বলে উঠল, 'বটেই তো, বটেই তো!'

সমর্থন পেয়ে পিসী বললে, 'বল বাবা তোরা বল। তোরা পিসীর পেহারটা একবার দ্যাখ—দ্যাখ নরিন্দরের ব্যাটা কি করেছে, দ্যাখ!'

'দেখতে হবে বৈকি!'

বিপদভঞ্জন চাটুজ্যে তাঁর এই ছেলেগুলিকে কেন যে অপোগণ্ড বলে আখ্যা দেন তা তিনিই জানেন, তবে এরা যে কতখানি 'ডিসিপ্লিণ্ড' এবং 'স্মার্ট' তা জানলে নিশ্চয়ই তিনি তাঁর এই বংশধরদের সম্বন্ধে মতামতটা পুনর্বিবেচনা করার আগ্রহ প্রকাশ করতেন। সকলেই প্রায় একসঙ্গে নিচু হয়ে তাদের চোঙা পাংলুনগুলি হাঁটুর দিকে গুটিয়ে নিলে। গুটিয়ে নিলে আস্তিনগুলোও প্রায় একই সঙ্গে। তারপর সকলেই মাথার চুলে এক-একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে নীলকণ্ঠের দিকে আগিয়ে গিয়ে বললে, 'এই স্লা নীলে—পিসীকে ধুলোয় ফেলে দিয়িচিস ক্যানরে স্লা?'

'আমি ফেলি নি', নীলকণ্ঠ গম্ভীরভাবে জবাব দিলে। ছ-ভাই তখন একসঙ্গে পায়ের সামনের পাতায় ভর দিয়ে সড়াক করে খানিকটা উঁচু হয়ে প্রায়

[শেষাংশ ১৬১ পৃষ্ঠায়]

কথাটা সাধারণভাবেই বলা হয়ে থাকে যে, কোনো দেশের সৃজনশীল সাহিত্য সেই দেশের জাতীয় ঐতিহ্যের অভিব্যক্তি, তার বাহক; বাহির বিশ্বে সাহিত্যই সেই দেশের সংস্কৃতির পরিচয়। এই সাধারণ সংজ্ঞাটিকে সম্মুখে রেখে এ প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে, আমাদের আধুনিক-কালের বাংলা সাহিত্য কি পরিমাণে বাংলার ঐতিহ্যকে অভিব্যক্ত করছে, অথবা আদৌ তা জাতীয় পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে কি না।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল যে শিল্পী-মানস তা যে ইউরোপীয় সাহিত্যের পরিচর্যায় গঠিত এবং আমাদের বোধ-বুদ্ধি-মনন যে ব্যাপকার্থে ইউরোপীয় চিন্তার ঐশ্বর্যে নির্মিত, তা অবশ্যই স্বীকার্য। সেজন্য, অমন যে বঙ্কিমচন্দ্র—যাঁকে পরবর্তী-কালের মানুষ ঋষিত্বে বরণ করেছে এবং যিনি নানান দিক থেকে আমাদের বুদ্ধি-মার্গীয় মুক্তির সোপান নির্মাণ করে গেছেন, তাঁর বিরুদ্ধেও ঐতিহ্য-বিরোধিতার অভিযোগ উত্থিত হয়েছিল। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেশ্বর পাঁড়ে, পূর্ণচন্দ্র বসু প্রমুখ সকলেই এই অভি-যোগ ঘোষণায় ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। বীরেশ্বর পাঁড়ে লিখেছিলেন, 'বঙ্কিম-চন্দ্র খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যভাবে গঠিত হইয়াছিল।' আর পূর্ণচন্দ্র বসু কুন্দ-নন্দিনীর আত্মহত্যার মধ্যে 'ইংরেজী ট্র্যাজেডির দোষ' আবিষ্কার করে আলোচনান্তে মন্তব্য করেছিলেন, 'ম্যাক-বেথের বিষ ছিল কেবল ইংরেজী ভাষায়, এক্ষণকার কুরুচিসম্পন্ন লোকে তাহা বাংলা ভাষায় আনিয়াছে।'

সংবেদনশীল সাহিত্য-পাঠক এই অভিযোগের সঙ্গে নিশ্চয়ই সায় দেবেন না; কারণ, সাহিত্যের বোধে এ যেমন অনুজ্জ্বল, ঐতিহ্যের প্রকৃতি অন্বেষণে তা তেমনি অস্বচ্ছ। ঐতিহ্য জিনিসটা জল-মাটি-হাওয়ায় নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিবেশে গঠিত হয় সত্য, কিন্তু তা ডোবার জলের মত নিস্তরঙ্গ নিশ্চল গতিহীন নয় নিশ্চয়ই, বরং নদীর জল-স্রোতের মত প্রবহমান, গতিশীল। এই প্রবহমানতা যদি তার নিজস্ব আন্তর গরজের শক্তি থেকে উদ্ভূত না হয়, তাহলে হয় তাকে নিশ্চিত অবক্ষয়ের পথে অগ্রসর হতে হবে, নতুবা বাইরের সংযোগ-সংস্পর্শে নতুন পথে বাঁক নিতে হবে। যেমন, ঊনবিংশ শতকের বাংলা নিয়েছিল। সেদিনের সংঘাতে বাংলাদেশের হৃদয় যে সাড়া দিতে পেরেছিল তা তার প্রাণ-সম্পদেরই অপূর্ব প্রকাশ, এবং ঐতিহ্যের রূপান্তরধর্মিতার লক্ষণ। সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান মনের চলাচলের পথ প্রশস্ত করে, এবং ঐ চলাচলের অনুপাতেই ঐতিহ্য সমৃদ্ধতর হয়। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তিঃ 'নীল নদীর তীর থেকে বর্ষার মেঘ উঠে আসে। কিন্তু যথাসময়ে সে হয় ভারতেরই বর্ষা। তাতে ভারতের ময়ূর যদি নেচে ওঠে তবে কোনো শুচিবায়ুগ্রস্ত স্বাদেশিক যেন তাকে ভর্ৎসনা না করেন; যদি সে না নাচত তবেই বুঝতুম, মযূরটা মরেছে বুঝি। এমন মরুভূমি আছে যে সেই মেঘকে তিরস্কার ক'রে আপন সীমানা থেকে বার ক'রে দিয়েছে। সে মরু থাক আপন বিশুদ্ধ শুচিতা নিয়ে একেবারে শূন্য আকারে। তার উপরে রসের বিধাতা শাপ দিয়ে রেখেছেন, সে কোনোদিন প্রাণবান হয়ে উঠবে না। বাংলাদেশেই এমন মন্তব্য শুনতে হয়েছে যে দাশু রায়ের পাঁচালি শ্রেষ্ঠ যেহেতু তা বিশুদ্ধ স্বাদেশিক। এটা অন্ধ অভিমানের কথা।'

এই অন্ধ অভিমান থেকে আজকের সাহিত্যবিষয়ক মুক্ত; কেননা, তার ঐতিহ্য-অন্বেষণ শুধুমাত্র দেশ-কালের নিশ্চল সীমাবদ্ধতায় বিভ্রান্ত নয়। বরং বিশ্ব-জাগতিক মানব-অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি ও মূল্যায়নের পথে নিত্য-সৃজনশীল। মানব-অভিজ্ঞতার পশ্চাদ্‌পটে আমরা আধুনিক-কালের মানুষরা ঐতিহ্যের নবতর ঐশ্বর্যের সন্ধানী।

তথাপি প্রসঙ্গটিকে অন্য এক দৃষ্টিমার্গ থেকে বিশ্লেষণ করা চলে। ইউরোপীয় মানসজীবনের সংঘাত থেকে যে সাহিত্য-সংস্কৃতির আবির্ভাব, তার সমাজতাত্ত্বিক লক্ষণ এবং ঐ সংস্কৃতির নির্মাতাদের সামাজিক অধিষ্ঠান ও প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আলোচনা করার অবকাশ এখানে বিরল। শুধু স্মর্তব্য যে, জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে আমাদের সৃজনশীল লেখকবৃন্দ পাশ্চাত্ত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং তা অনুকরণ বা অনুসরণও করেছিলেন। মধুসূদন, রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ধরেই বায়রন শিক্ষিত বাঙালী যুবকের চরিত্রগঠনে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। মধুসূদন মহাকাব্যের প্রেরণা লাভ করেছিলেন ইউরোপীয় মহাকবিদের রচনা থেকে; স্কট দ্যুতি বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সের মানসিক প্রেরণা জুগিয়েছেন, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তো 'আনন্দমঠ'-এ বিলাতী পেট্রিয়টিজম্ এবং ইউরোপীয় outlawry-র সন্ধান পেয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের ঘোষিত আদর্শ ছিল, রুশ ঔপন্যাসিকদের বিশ্বজনীন মানবপ্রেম, অবশ্য আপন সৃষ্টিসম্ভারে তিনি কতটা সার্থকতা অর্জন করেছিলেন তা বিচার্য। বুদ্ধদেব বসু বা অচিন্ত্য সেনগুপ্তর উপন্যাস সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা অর্জন করে নি; কারণ, তাঁদের উপন্যাসের সমস্যা নীল নদের মেঘ দেখে ভারতের মযূরের নাচ নয়, মুখ্যত বেহিসেবীরকমে আরোপিত, সমাজের আন্তর সম্পর্কের অবশ্যম্ভাবিতা থেকে উদ্ভিন্ন নয়। প্রবহমান জীবনধারার সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত আরোপিত সমস্যা চিত্রণের সর্বাধুনিক দৃষ্টান্ত বোধকরি সমরেশ বসুর 'বিবর'।—আচ্ছা, আমরা যদি সবাই সত্য-কথা বলতে পারতাম, এই অজুহাতে এক কৃত্রিম মূল্যবোধহীন স্বাধীনতায় স্থিত হওয়ার প্রচেষ্টা। তারাশঙ্কর ও বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ঐতিহ্য-লালিত বাংলার মাটি অকাঙ্ক্ষায় বেদনায়

মর্মরিত হয়েছে সত্য, কিন্তু তার ধারা অব্যাহত থাকে নি।

আধুনিক বাংলা কাব্যের ভুবনে এই পাশ্চাত্ত্য প্রভাব আরও প্রকট। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা স্বদেশের মরমীয়া ক্রন্দন শুনতে পেয়েছি অবশ্য, কিন্তু তিনিও গণ-মানসের প্রগাঢ়তায় আত্ম-পরিচয়ে সম্পূর্ণ আত্মস্থ ছিলেন বোধ করি বলা যায় না। জীবনানন্দের কাব্যে বেতফল আর কাশ-শর-হোগলা আকর্ষণীয় সজীবতায় আবির্ভূত হলেও তাঁর অনুভবের বাংলা 'রূপসী' বাংলা; এ মনোভঙ্গিও ইউরোপীয়, স্বদেশকে চিরাচরিত মাতৃভাবে উপলব্ধি করার দৃষ্টিমার্গ এক্ষেত্রে বর্জিত। বিষ্ণু দে এবং তাঁর অনুসারী কবিগণ বিদেশী সাহিত্যের ভুবন থেকে আহরিত উপমা-চিত্রকল্প ইত্যাদির লোভ সংবরণ করে স্বাদেশিক স্বকীয়তায় নিবিষ্ট হয়েছেন সত্য; কিন্তু, সমস্ত অনুকরণ সত্ত্বেও মধুসূদন যে অর্থে ছিলেন পুরো স্বদেশী কবি, এ আমলের কবিগণ বোধ করি ততটা স্বদেশী নন। মধুসূদন বলেছিলেন, খৃস্টান হিসেবে তিনি আমাদের হিন্দুয়ানীকে ঘোড়াই কেয়ার করেন, কিন্তু তথাপি ভারতীয় পুরাকাহিনীর প্রতি তাঁর ছিল অসামান্য অনুরাগ, রক্তের এক উপপ্লাবী সম্পর্ক। সেই সম্পর্কই তাঁকে বাংলার কথ্য ভাষার সাযুজ্য এনে দিয়েছিল, এবং এক সুতীব্র আর্তিতে তাঁর চিত্ত কেঁদে উঠেছিল। সেই ক্রন্দন যে স্বদেশের প্রতি অমল ভালবাসায় ছিল উদ্বিগ্ন, তা বলাই বাহুল্য।

তেমনি ক্রন্দন ইদানীং আর আমরা শুনতে পাই না। তার অন্যতম প্রধান কারণ বোধ করি যে, সম্প্রতিকালের সাহিত্য-স্রষ্টাদের সঙ্গে স্বদেশী ঐতিহ্যের বন্ধন শিথিল, পূর্বাপেক্ষা ক্ষীণ। ঠিক এইখানটাতেই আমরা এক বৈপরীত্য ও সমস্যার সম্মুখীন হই।

সনাতন ঐতিহ্যের আশ্রয় আধুনিক সাহিত্যের না থাকলেও একে আশ্রয় করেই আধুনিক বাংলার সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছে; এবং সে বিচারে আমাদের ঐতিহ্যও রূপান্তরিত, বিস্তৃত এবং সমৃদ্ধতর হয়েছে। এই নতুন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অধিকার মুখ্যত শিক্ষিত—অর্থাৎ ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীর। ইংরেজী না-জানা গণসমষ্টি এই সাহিত্যের এই ঐতিহ্যের স্বাদ লাভ কতটুকু করেছেন বা আদৌ করেছেন কিনা, তা অতি সঙ্গতভাবেই উত্থাপন করা যেতে পারে।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে রেনেসাঁসের গর্বে আমরা গর্বিত, তা প্রধানত নির্মিত হয়েছিল ইংরেজ-সান্নিধ্যে এবং ইউরোপীয় অধ্যুষিত অঞ্চলে। বৃহত্তর জনসমষ্টি যেমন এতে আশ্রিত ছিল না, তেমনি ইংরেজী-শিক্ষিত এবং ইংরেজী না-জানা ও নিরক্ষরদের মধ্যে এক দুস্তর ব্যবধান সৃষ্ট হয়েছিল; সেই ব্যবধান আজও ঘোচে নি। সেজন্য ১৮৭২ সনে বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে সম্ভাবের যে অভাব দেখে ব্যথিত হয়েছিলেন, সে অভাব আজও সমান সত্যতায় অস্তিত্বশীল। এককথায়, শিক্ষিতের মননশীলতার এবং অর্জিত মূল্যের জগতে জনগণ আশ্রিত নয়, হতে পারে নি।

বোধকরি, আধুনিক সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা বড়ো দুর্বলতা এখানেই। মননশীলতা, অভিব্যক্তি ও নির্মাণ সৌকর্যের সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য সত্ত্বেও এই সাহিত্য প্রকৃত অর্থে গণ-মানসের সঙ্গে অন্বিত নয়। সুতরাং, শহুরে কলরব আর পাশ্চাত্ত্য মনোভঙ্গির অন্তরালে যে বৃহত্তর জীবন প্রবহমান, তার অন্তর্নিহিত বাণী এতে প্রতিফলিত হয় না। অথচ, এটা তো অতিশয় প্রাজ্ঞ অভিমত যে, শিল্পকর্মের মাধ্যমে শিল্পী জীবন-প্রাঙ্গণে উপনীত হন: যে কথাটা এলিয়ট বলেছেন escape into life. মানসিক ভাবনা যদি শিল্পী-সাহিত্যিক-কবির একান্ত ভাবনা হয়ে থাকে, তাহলে তাকে নিরন্তর দুশ্চিন্তা, ভাবনা, দুঃসহ বেদনায় অস্থির থাকতেই হয়। তাঁর কাল, তাঁর কালের মানুষ তাঁর কাছে তাদের প্রকাশিত অভিব্যক্ত হওয়ার আকুতিকে পৌঁছে দেয় তাদের স্বপ্ন-অধ্যাসের বাণী। সেই আকুতির আহ্বানে সাড়া দিয়েই শিল্পী আপন অহং-এর সীমাবদ্ধ জগৎ পার হয়ে জীবন-প্রাঙ্গণে এসে সকলের সঙ্গে মিলিত হন: সর্বজনীন মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় তাঁর চিত্ত উদ্ভাসিত হয়।

এই মুক্তিভাবনায় আধুনিককালের সাহিত্য বিশেষ উদ্বিগ্ন নয়, এবং সেদিক থেকে গণ-জীবনের সঙ্গে অন্বিতও নয়। অবশ্য, অন্বিত হওয়ার বাধাও বিস্তর। পূর্বে যে ব্যবধানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা পূর্বোক্ত অনন্বয়ের মুখ্য কারণ। তাছাড়া, আমাদের দেশে গণ-শিক্ষার যে অবস্থা তাতে জনসাধারণের পক্ষে সাহিত্যের সাযুজ্য লাভ করা সুকঠিন। বিদ্যাভ্যাসের সুযোগ যেখানে নগণ্য, সেখানে মানস-পরিচর্চার দ্বারা মার্জিত রসবোধের উদ্বোধন প্রত্যাশা করা বৃথা। এ কথার বিস্তর প্রমাণ আমরা অন্য একদিক থেকেও পেতে পারি। বাংলাদেশে যেসব মার্জিতরুচি অভিজাত পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তাদের প্রচার সমমরমী গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ,—পাশ্চাত্ত্য মনোভঙ্গির পরিচয় লাভ করেন নি এমন পাঠকগোষ্ঠী সেসব স্পর্শ করেন না, রসাস্বাদনের অক্ষমতার দরুণ। পক্ষান্তরে, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের পরিচয় সমৃদ্ধ পাঠকগণ যেসব পত্র-পত্রিকা স্পর্শ করেন না সেগুলো যথেষ্ট পরিমাণ বিদগ্ধ নয় বলে, সেসব সাময়িক পত্রই সর্বাধিক প্রচারিত। অভিজাত পত্র-পত্রিকাগুলো গণ-মানসে প্রভাববিস্তারে কি কারণে অক্ষম এবং তথাকথিত 'বাজে' পত্রগুলো কেন আজও গণ-মানস আকর্ষণে সমর্থ, সে বিষয়ে একটি সমীক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। তাহলে, গণ-মানসে বাংলার ঐতিহ্যের কোন্ কোন্ ধারা আজও বহমান তা যেমন একদিকে জানা সম্ভবপর হবে, তেমনি অপরদিকে পাশ্চাত্ত্য মনোভঙ্গিসম্পন্ন লেখকদের সম্মুখে গণ-জীবনের সঙ্গে অন্বিত হওয়ার বাধাই বা কোথায় তাও উদ্ঘাটিত হবে। সেই বাধাগুলো অপসারিত না হলে আধুনিক সাহিত্যের পক্ষে ব্যাপক জাতীয় জীবনের সাযুজ্য লাভ করা হয়ত কোনো দিনই সম্ভবপর হবে না।

আমি অন্যত্র একটি আলোচনায় বলেছিলাম যে, গণ-জীবনের সঙ্গে অন্বয়ের অভাব থেকেই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নানাবিধ কলুষ, বিবেকহীন আত্মপ্রিয়তা এবং মূল্যের প্রগাঢ় বোধহীন সাহিত্যকর্ম প্রশ্রয় লাভ করে। সেজন্য, সাহিত্য এবং সর্ববিধ শিল্পকর্মকে গণ-জীবনের সঙ্গে অন্বিত করার এবং অন্বিত রাখার সমস্যাটিকেও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সাহিত্য এভাবে যতই অন্বিত হবে ততই তা অনুভবে ও সততায় বিশালতা এবং প্রভাবে ব্যাপ্তি অর্জন করবে।

আমার মনে হয়, মধুসূদনের কাছ থেকে আমাদের কিছু শিক্ষা লাভ করার আছে। তিনি ঊনবিংশ শতকীয় কথ্য বাচনভঙ্গির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যকে কাব্যে ব্যবহার করেছিলেন; তাতে কথ্য ভাষার সাযুজ্য ছাড়াও অন্য একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সংসাধিত হয়েছিল। অর্থাৎ তিনি রক্তের জানা ভাষার মাধ্যমে নিজেকে রূপান্তরিত করেছিলেন, এবং যুগপৎ সেই ভাষাকে ভাবগাম্ভীর্যে উন্নীতও করেছিলেন। সেরকমভাবে, কথ্য ভাষার যে রূপটি ও ভাববাঞ্জনার যে বৈশিষ্ট্যটি গণ-জীবনে আজও প্রচলিত এবং ঐতিহ্যের যে ধারাটি তাতে আজও রক্ষিত, তার সান্নিধ্য যদি আধুনিককালের লেখকবৃন্দ লাভ করেন তাহলে পূর্বকথিত ব্যবধান কিছুটা অপসারিত হতে পারে: এবং উন্নত শিক্ষার বিস্তার বাকি অভাবটুকু মোচন করতে পারে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের ঐতিহ্যের যে রূপান্তর থেকে জনসমষ্টি উপকৃত হতে পারে নি, সেই রূপান্তরকে তাদের জীবনে

[শেষাংশ ১২৯ পৃষ্ঠায়]

মহাকাশ অভিযান ও আমাদের অন্য দিক

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

এই সেদিন চাঁদে নামল মানুষ। আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই ওরা হয়তো মঙ্গল বা শুক্রেও নামবে এবং এজন্যে টাকাও বরাদ্দ করবে কোটি কোটি, কোটি কোটি।

কিন্তু মানুষের এই উড়ন-চণ্ডী মনোভাবটাকে অনেকেই ঠিক শ্রদ্ধার চোখে দেখছেন না। বরং বলতে শোনা যাচ্ছে অনেককেই, কী লাভ হবে দূরের গ্রহ-উপগ্রহে যাবার নাম করে হাজার হাজার কোটি টাকা জলে ফেলে? পৃথিবীর ২০০ কোটি মানুষ যখন বুভুক্ষু, তখন চাঁদে গিয়ে বিজ্ঞরা কোন্ স্বর্গ-রাজ্যটা আবিষ্কার করবেন, শুনি?

মহাকাশ-অভিযানের উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে এই সব অভিযোগ পুরোপুরি মিথ্যে, তা বলবো না। কিন্তু একথা নিশ্চয়ই বলবো যে, মন্দেরও ভালো দিক থাকে অনেক সময় এবং এক সময় যা কারও কারও অদূরদর্শিতা বলে মনে হয়, অন্য সময় তা ওদেরই দূরদর্শিতাকে প্রমাণ করে।

সম্প্রতি মহাকাশ-অভিযানকে কেন্দ্র করে এই ধরণের প্রমাণ বলতে গেলে নিয়মিত পাচ্ছি আমরা। হামেশাই আমরা লক্ষ্য করছি, গ্রহান্তরে পাড়ি দেবার উদ্যোগ-আয়োজন থেকে মানুষ কোনো-কোনো দিক দিয়ে উপকৃত হচ্ছে।

এই সেদিন উপকৃত হল এক বেচারী, যে মস্তিষ্কে একটি বুলেট নিয়ে কবরে যাবার পথ খুঁজছিল।

বেচারীটি ক্যালিফর্নিয়ার এক রেস্টুরেন্টে কাজ করত। রেঁধে বেড়ে, আর বাবু-বিবিদের হুকুম তামিল করে মোটা-মুটি সুখেই দিন কাটত তার। এমন কি ৬৩ বছরে পা দিয়েও তার মনে হত না, সংসারটা খারাপ জায়গা।

কিন্তু বরাত খারাপ হলে যা হয়, খারাপ সম্বন্ধে ধারণাটা তিলে তিলে না হয়ে তালের মতো হয়ে বসে হঠাৎ।...

ওই রাঁধুনিটিরও তাই হল। এক-দিনের এক অভিজ্ঞতাতেই সংসারটা ঘোরতর কালো হয়ে গেল তার সামনে। সে দেখল, মানুষ নামক জীব ক্ষিধে না পেলেও কামড়ায়, কোনো কারণ না থাকলেও একে অপরের মাথা ফুটো করে দেয়।

মাথা ফুটো হল তারও। একদল ডাকাত এসেছিল রেস্টুরেন্টের টাকাকড়ি লুট করতে; ওদেরই দৌলতে হল। সে ভালো করে সব কিছু ঠাওর করার আগেই দু-দুটো বুলেট এসে ঢুকল তার মাথায়। আর সঙ্গে সঙ্গেই রক্তারক্তি। অ্যাম্বুলেন্স, হাসপাতাল, ডাক্তার, নার্স, অপারেশন-থিয়েটার—সব কিছু মিলিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি।

মানুষেরই জয় হল শেষ অবধি। বিশ্রুত শল্য-চিকিৎসক ডাঃ জেমস মারখাম্ বুলেটের টুকরোগুলো মুমূর্ষুর মাথা থেকে বের করে দিলেন। আর মুমূর্ষুটিও ধীরে ধীরে সেরে উঠে কয়েক মাস বাদে কাজে যোগ দিল।

কিন্তু কাজে এসেও বিপদ। রাঁধুনির আগের সে মেজাজ আর নেই। কিছুতেই তার মন বসে না কাজে। সব সময় মাথা ধরে থাকে।

অগত্যা মারখাম্-এর ডাক পড়ল আবার। আবার চিকিৎসার কথা উঠল।

মারখাম্ অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বললেন, সর্বনাশ। রুগীর মাথায় এখনও একটা বুলেট থেকে গিয়েছে দেখছি। ২২ ক্যালিবার বুলেটের বেশির ভাগই থেকে গিয়েছে।

—এখন উপায়?—রাঁধুনির আত্মীয়-দের মাথায় হাত।

—উপায়?—মারখাম্ সুরু করেন; উপায় যেমন করে হোক কিছু একটা খুঁজে পেতেই হবে। শুধুমাত্র কয়েকটা দিন সময় চাইছি আমি। বুলেটটা মাথার ঠিক কোন্ জায়গাতে আছে, তা একটু বুঝে নিতে চাইছি।

রাঁধুনির আত্মীয়রা বলল, বেশ। বুঝে নিন।

ওদিকে বুঝতে গিয়ে চোখ কপালে উঠল মারখাম্-এর। উনি দেখলেন, বুলেটটা আছে মস্তিষ্কের তৃতীয় রন্ধ্রে, যা নাকি মস্তিষ্কের যাবতীয় তরল পদার্থের নিষ্কাশন-পথ। বুলেট আর কয়েক মিলিমিটার এগোলেই চরম সর্ব-নাশ একেবারে অবধারিত ছিল। নিষ্কা-শন-পথের মুখ অবরুদ্ধ হয়ে যেত তবে। আর রুগী মারা যেত মস্তিষ্কে তরল পদার্থের অতিরিক্ত চাপে।

মারখাম্ ভেবে দেখলেন, অবস্থাটা খুবই বিপজ্জনক। অস্ত্রোপচার করা এখন ঠিক হবে না। এখন বরং অন্য এক চিকিৎসার শরণ নেয়া যাক।

নিলেন তিনি শরণ। রাঁধুনির তাজ্জব এক চিকিৎসা সুরু করলেন এবার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত এক মহাকাশ-গবেষণা-কেন্দ্র আমস্ ল্যাবরেটরীতে গিয়ে বললেন, এর সাহায্য পেলে মুমূর্ষু একটি রুগীকে বাঁচাতে পারি।

ল্যাবরেটরীর ডিরেক্টর মারখাম্-এর কথা শুনে ধ।

—বাঁচাতে পারেন? বেশ অবাক হয়েই বললেন তিনি।

মারখাম্ বললেন, হ্যাঁ, পারি। আপ-নার ল্যাবরেটরীর কিছু অংশ কয়েক ঘণ্টার জন্যে পেলেই কাজটা হাসিল করতে পারি আমি।

ডিরেক্টর বললেন, বেশ। ল্যাবরেটরী আপনার জিম্মায় ছেড়ে দেয়া হবে।

শেষ অবধি কথা রাখলেন ডিরেক্টর। আর মারখাম্ও তাঁর অভিনব চিকিৎসা সুরু করলেন। রুগীকে তিনি এমন এক জায়গায় বসালেন, কৃত্রিম উপায়ে যেখানে পৃথিবীর ৬ গুণ মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি সৃষ্টি করা যায়। এবং যেখানে প্রচণ্ড কেন্দ্রা-তিগ শক্তির সাহায্যে তা সৃষ্টি করা সম্ভব।

—কিন্তু ওখানে রুগীকে বসিয়ে আপনার লাভ?—ডিরেক্টর শুধালেন একবার।

মারখাম্ বললেন, লাভ অনেকখানি। কারণ ওই শক্তির সাহায্যেই রুগী সেরে

উঠবে। ওর মাথার বুলেটটা তৃতীয় রন্ধ্র থেকে সরে গিয়ে নরম ভাবে গ্রথিত মস্তিষ্কের কোষগুলোর মধ্যে আশ্রয় নেবে।

আশ্রয়ের কথাটা মিথ্যে নয়। মোটেই মিথ্যে বলেন নি মারখাম্। কারণ, ওই আজব চিকিৎসার খানিক পরেই দেখা গেল, বুলেটটা মস্তিষ্কের তৃতীয় রন্ধ্র থেকে পার্শ্ববর্তী রন্ধ্রে চলে গেছে। অর্থাৎ গেছে এমন এক জায়গায়, যেখানে ওটা থাকলে রাঁধুনির বিশেষ কোনো ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই।

রাঁধুনির এই কাহিনী শুনে অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন,—কিন্তু দুঃখী লোক তো আরও অনেক আছে পৃথিবীতে! অনেক আছে রুগ্ন ও মুমূর্ষু! মহাকাশ-অভিযানের দৌলতে ওরা কতটুকু লাভবান হবে? ওই যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যে দেশের ৫০টি রাজ্যের ২০ হাজার কারখানায় এবং ২০০টি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ৪ লক্ষ লোক মহাকাশযান, রকেট ইত্যাদির মাল-মসলা তৈরির কাজ করছে, সে কাজ থেকেই বা সে-দেশের এবং অন্য সব দেশের সত্যিকারের লাভ হবে কতখানি?

বিশেষজ্ঞরা এ-প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বলেন, লাভ অনেকখানিই হবে।

—হবে?—আমরা যেন বিশ্বাস করি না কথাটা। অবাক হয়ে বারবার শুধোই, হবে?

বিশেষজ্ঞরা অভয় দেন, হতে চলল সে সব কিছু! আর এখনও কিনা সন্দেহ!

আমরা বলি, না না; সন্দেহ করবো কেন? তবে কিনা ওই 'হওয়ার ব্যাপারটা' যত তাড়াতাড়ি হয়, ততই ভালো।

—তাড়াতাড়িই তো হচ্ছে!—উৎসাহী বিশেষজ্ঞরা বিরাট এক ফিরিস্তি দেন এইবার। বলেন, হচ্ছে কিছু; কিছু আবার হবো-হবো করছে। মহাকাশ-গবেষণার অভিজ্ঞতা অনেক রকম ভালো কাজে লাগার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে।

—যেমন?

—যেমন ধরুন, ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ; পল্লী-সমস্যার সঙ্গে যুদ্ধ; রোগের সঙ্গে যুদ্ধ, এবং আরও অনেক অনেক যুদ্ধ।

—রক্ষে করুন, ওই যুদ্ধ কথাটা শুনলেই কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসে আমাদের! হিরোসিমা আর নাগাসাকির শহীদদের কথা ভেবে কেমন যেন গায়ের চামড়ায় টান ধরে!

—আরে ছি ছি! টান অমনি ধরলেই হল? ওই মহাকাশ-গবেষণার দৌলতেই না কত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জিনিস তৈরি করছে মানুষ। নিত্য-ব্যবহার্য জিনিসেরও কত উন্নতি করছে।

এই শেষের কথাটা কিন্তু মিথ্যে নয়। সত্যি, হচ্ছে কিছু উন্নতি। এবং কী করে হচ্ছে, তা বুঝতে গেলে আজকের পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময় স্যাটার্ন-৫ রকেটের দিকে ফিরে তাকাতে হবে।

স্যাটার্ন-৫ রকেট, যারা নাকি অ্যাপোলো-৮, ১০, ১১ ইত্যাদিকে নিয়ে ছুটলো, তাদের প্রতিটির মধ্যে আলাদা আলাদা অংশ আছে ৫০ লক্ষ করে।

এতকাল ভাবা হত, কোনো যন্ত্রের শতকরা ৯৯·৯ অংশ যদি ঠিকভাবে কাজ করে, তবেই কেল্লা ফতে। যান্ত্রিক উন্নতির একেবারে চরমে পৌঁছুন গেছে তবে।

কিন্তু এখন উন্নতির চরম সম্বন্ধে ভাবনাটা এই রকম হলে চলে না। অন্ততঃ মহাকাশ-অভিযানের ক্ষেত্রে তো একেবারেই চলে না। কেন না, এই যে অ্যাপোলোতে করে চাঁদের দেশে অভিযান করছে মানুষ, এর যন্ত্রপাতি এবং বিভিন্ন অংশের মাত্র ৯৯·৯ ভাগ যদি নিখুঁতভাবে কাজ করে তো ৫০ লক্ষ ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে গড়ে ৫ হাজার করে অংশ অকেজো হয়ে পড়বে। এবং বলা বাহুল্য, অকেজো হবার বহরটা যদি এহেন বড় আকারের হয় তো দুর্ঘটনার আকারটাও বড়ই হবে। চাঁদ-অভিযানে বেরিয়ে হামেশাই নিখোঁজ হবে মানুষ।

কিন্তু ঠিক এমনটি হতে দিলে উদ্যোক্তাদের মান থাকে না। চাঁদ-অভিযাত্রী পথিকৃৎদের হালটাও গিনিপিগের মতো হয়ে দাঁড়ায়। তাই উদ্যোক্তারা বলেন, স্যাটার্ন-৫ রকেট এবং অ্যাপোলো মহাকাশযানের বিভিন্ন অংশ শতকরা ৯৯·৯৯৯ হারে নিখুঁত হওয়া চাই। অর্থাৎ, যেখানে ১ লক্ষ অংশের প্রশ্ন, সেখানে বড় জোর একটিকে বাদ দিয়ে অন্য সবগুলোই থাকা চাই ষোল আনা নিখুঁত।

বিভিন্ন কলকব্জা ও যন্ত্রপাতিকে নিখুঁত রাখবার এই অবিশ্বাস্য প্রচেষ্টা

'গ্রাউন্ড রিসেপ্‌শান্ সেন্টার'। যোগাযোগ-রক্ষাকারী কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে প্রেরিত বার্তা এইখানে ধরা পড়ে।

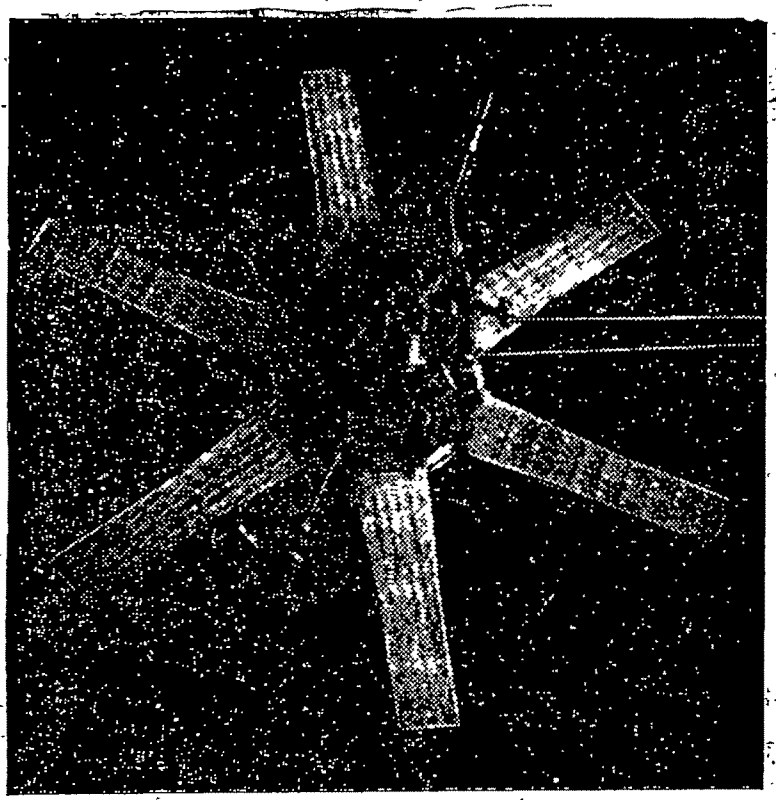

যোগাযোগ-রক্ষাকারী কৃত্রিম উপগ্রহ

অ্যাপোলো-৮ অভিযান থেকেই সাফল্য-মণ্ডিত হচ্ছে। ফ্রন ব্রন-এর কাছ থেকে আমরা জেনেছি, চাঁদের আকাশে পাড়ি জমাতে গিয়ে অ্যাপোলো-৮কে ৬ দিনে দাড়ে পাঁচ লক্ষ মাইল পথ-পরিক্রমা করতে হয়। কিন্তু এই দীর্ঘ ও বিপদসংকুল পথে তার পাঁচটি মাত্র অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ অংশ সঠিকভাবে কাজ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ, মোট ৫০ লক্ষটি অংশের মধ্যে শতকরা ৯৯.৯৯৯৯টিই নিখুঁতভাবে কাজ করেছিল। সম্প্রতি খবর পেয়েছি আমরা, অ্যাপোলো-১০ এবং ১১ সম্পর্কেও ঠিক এই একই কথা প্রযোজ্য।

যন্ত্রপাতিকে নিখুঁত করে গড়ে তোলার এই যে প্রয়াস, এ থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প ও পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা হয়েছে। এবং এই নবযুগ এসেছে বিশেষ করে শল্য-চিকিৎসার যন্ত্রপাতি, রেফ্রিজারেটার এবং ফাউন্টেন পেন উৎপাদনের ক্ষেত্রে। উৎপাদকরা তো বটেই, ক্রেতারাও বলছেন,—হ্যাঁ, এসব জিনিসের রূপবদল হল যেন রাতারাতি। জিনিস যে কত উচ্চাঙ্গের হতে পারে, মহাকাশ-গবেষণাই তা যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

আর দেখিয়ে দিল শুধুমাত্র চেনা-জানা জিনিসের ক্ষেত্রেই নয়, অচেনা-অজানা একেবারে আনকোরা নতুন জিনিসের ক্ষেত্রেও। দেখতে দেখতে মোট আড়াই হাজারেরও বেশি নতুন জিনিস গড়ে উঠল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এবং ঐসব জিনিসের মধ্যে থাকল নতুন নতুন সব সংকর ধাতু, অদাহ্য জামা-কাপড়, শল্য-চিকিৎসার নতুন যন্ত্রপাতি এবং অজৈব রঞ্জকদ্রব্য।

ওদিকে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠল বহু প্রতিষ্ঠান। ওদের একমাত্র কাজ হল নতুন-উদ্ভাবিত পণ্যদ্রব্য-গুলোকে নিয়মিত উৎপাদন করে বাজারে চালু রাখা।

—কিন্তু এ তো মোটে সুরু!—মহা-কাশ-বিজ্ঞানীরা বলছেন,—ভবিষ্যতে আরও কত কী যে বিস্ময় সৃষ্টি করবে মানুষ, আরও যে কত বিচিত্র পণ্য উৎপাদন করবে, এই মুহূর্তে তার পুরো ফিরিস্তি দেওয়া অসম্ভব। তবে হ্যাঁ, আভাস এখনই দেওয়া যেতে পারে। এখনই হলফ করে বলা যেতে পারে, ভবিষ্যতে মহাশূন্যেই হয়তো বহু কিছু পণ্য উৎপাদনের ধুম লেগে যাবে; এবং সেখানে উৎপাদিত হবে এমন সব পণ্য, পৃথিবীর পরিবেশে যাদের কথা আমরা কল্পনায়ও আনতে পারি না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মহাশূন্যের যে জায়গায় ওজন থাকে না কোনো কিছুর, তরল পদার্থকে সেখানে জমতে দিলে তা থেকে নিখুঁত গোলক ('পারফেক্ট স্ফীয়ার') গড়ে উঠবে। এই গোলকের অনুকরণে ছাঁচ তৈরি হবে এবং পরবর্তীকালে এসব ছাঁচের দৌলতেই পাওয়া যাবে এমন সব যন্ত্রপাতি, সংঘর্ষজনিত ক্ষয় এড়াবার ক্ষেত্রে যারা অদ্বিতীয়। অর্থাৎ, যারা কারখানায় কাজ করবে দিনরাত্রি, কিন্তু শব্দ করবে না এতটুকু; ক্ষয় চালু থাকবে দীর্ঘ-দিন; অথচ চালু রাখবার জন্যে যাদের পিছনে শক্তি অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজন হবে।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই নিখুঁত আয়না এবং চশমা, ক্যামেরা, দূরবীণ ইত্যাদির জন্যে উচ্চাঙ্গের কাচ উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

এ ছাড়া, সম্ভব হবে আরও কত কী! নভশ্চরদের পক্ষে মহাশূন্যে স্থিত ল্যাবরেটরীতে বসে বিভিন্ন দ্রব্যকে ভালোভাবে মেশান সম্ভব হবে।

পৃথিবীতে এই মেলামেশার কাজটা সুষ্ঠভাবে হয় না। কারণ, মাধ্যাকর্ষণের ফলে বিভিন্ন দ্রব্য তলায় গিয়ে জড়ো হয়। অপরদিকে মাধ্যাকর্ষণ যেখানে নেই, যেখানে ওজন শূন্য, সেখানে এ-কাজটা দিব্যি নিশ্চিন্তে হতে পারে; এবং এরই ফলে উৎপাদিত হতে পারে এমন সব যৌগিক পদার্থ, তাপের মারাত্মক হ্রাস-বৃদ্ধি সহ্য করার ব্যাপারে যাদের জুড়ি নেই। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এমন পদার্থও পেতে পারি আমরা, যা ইস্পাতের শক্তিসম্পন্ন; কিন্তু যা আবার কাঠের চেয়েও হাল্কা।

কিন্তু এ সবই তো গেল পণ্যদ্রব্যের কথা। এ ছাড়াও মহাকাশ-গবেষণা থেকে নানাভাবে উপকৃত হতে পারি আমরা। আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও আব-হাওয়া দপ্তর নানাদিক দিয়ে এ থেকে লাভবান হতে পারে।

সুখের কথা, লাভবান হবার উদ্যোগ-আয়োজন এরই মধ্যে সুরু হয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে এসেছে এ ব্যাপারে।

মহাকাশ-গবেষণাকে মানব-কল্যাণে নিয়োগ করার ব্যাপারে রাশিয়ার উদ্যোগ প্রথম সুরু হয় ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল। ওই বিশেষ দিনটিতেই যোগা-যোগ-স্থাপন কৃত্রিম উপগ্রহ মল্নিয়া-১কে আকাশে উৎক্ষেপ করেন ওঁরা। এরপর একে একে আরও কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয় এবং যোগা-যোগ স্থাপনের দিক দিয়ে নতুন এক যুগের সূচনা হয় পৃথিবীতে।

প্রথমে দুটি মাত্র জায়গা মস্কো ও ভ্লাডিভস্টক-এর যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। এবং তারপর আওতায় আসে সাইবেরিয়া সহ সোভিয়েত দেশের দূর-দূরান্তরের বহু জায়গা।

[শেষাংশ ১২১ পৃষ্ঠায়]

সমুদ্র সৈকতে

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

সামনে দিগন্ত বিস্তৃত অন্ধকার। দূরে মাঝে মাঝে টিমটিমে আলো চোখে পড়ে। বোধ হয় জাহাজের বা আলোকস্তম্ভ বন্দর। জনশূন্য সমুদ্রতট। ঢেউ এসে ক্রমাগত আছড়ে পড়ছে পাথরের ওপর। ফ্রান্সিসের খানিক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে সমুদ্রগর্জন। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় মন্দিরের দিকে॥

কেউ বলে রাম্ম, কেউ বলে রে, আবার কেউ বা ডাকে শুধু ফ্রান্সিস বলে। কে তার নাম রেখেছিল ফ্রান্সিস তা জানে না। কেনই বা সে রায় কা রে হল তাও সে জানে না। ফাদার গুডচাইল্ড শুধু একবার বলেছিলেন—"তোমার বাবার পদবী ছিল রায়। তুমি রে বা রায় যা ইচ্ছে লিখতে পারো তোমার পদবী।" ছোটবেলায় রে লিখতো ফ্রান্সিস, সেই থেকে রে-ই লিখে আসছে।

ভারতবর্ষের শেষ দক্ষিণ বিন্দু কন্যাকুমারিকা। মন্দিরের মধ্যে কন্যাকুমারীর শ্বেতপাথরের মূর্তি। মন্দির চত্বর বেশ ফাঁকা এখন। খানিক আগে মানুষের কোলাহল শুনেছিল ফ্রান্সিস তাই সাহস করে নি আসতে। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে বসে "কে তুমি? কোথা থেকে আসছো? কি নাম তোমার, মা-বাবার?" কি জবাব দেবে ফ্রান্সিস!

মুগ্ধ দৃষ্টিতে মূর্তির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ফ্রান্সিস। মনে হয় যেন অপূর্ব সুন্দরী একটি ষোল-আঠারো বছরের কুমারী মেয়ে প্রস্ফুটিত পদ্মের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, দেহলাবণ্যে চারদিক আলোকিত। আপনা-আপনি ফ্রান্সিসের দুটো হাত কপালে উঠে যায়। হাত দুটো তাড়াতাড়ি নামিয়ে নিয়ে চারদিক চেয়ে দ্যাখে ভালো করে,—কেউ দেখে ফেললে না তো? খ্রীস্টান ফ্রান্সিস হিন্দুর দেবীর উদ্দেশ্যে প্রনাম জানায়, এটা পাদ্রীদের চোখে ভালো নাও ঠেকতে পারে।

কিন্তু কেন জানে না, ফ্রান্সিসের শিশুকাল থেকে দেব-দেবীর মূর্তি দেখলেই অজ্ঞাতে হাত দুটো উঠে আসে কপালে। কত সময়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে মহামায়ার সন্ধিপূজোর আরতি। দেখতে দেখতে ভাবে তন্ময় হয়ে গেছে, দুচোখ ছাপিয়ে নেবে এসেছে জলধারা। সম্বিত ফিরে পেতেই লম্বা জামার খুঁটে মুছে নিয়েছে চোখ, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছে পূজা-মণ্ডপ থেকে। শ্যামা মায়ের বীভৎস উলঙ্গ মূর্তি অবাক হয়ে দ্যাখে ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিসের চোখের সামনে ফুটে ওঠে সৃষ্টি আর ধ্বংসের সমন্বয় করা অপূর্ব মাতৃমূর্তি। গির্জার মধ্যে যীশুখ্রীস্টের ভাবময় মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিস কেঁদে সারা হয়, আবার মন্দিরের মধ্যে পরমপুরুষ রামকৃষ্ণের মূর্তি দেখে চোখের জল সামলানো দায় হয়ে পড়ে ফ্রান্সিসের। ফ্রান্সিস বুঝতে পারে না কেন তার এমন হয়, কেন সে অনুভব করে এক অজ্ঞাত আকর্ষণ। যুক্তি খুঁজে পায় না ফ্রান্সিস। যুক্তি বের করে দেন ফাদার গুডচাইল্ড, বলেন, তোমার দেহে হিন্দু আর খ্রীস্টানের রক্ত সমানভাবে বইছে, তাই তুমি উভয়ের মধ্যেই সমান আকর্ষণ অনুভব কর।"

ফাদার গুডচাইল্ড আর ইহজগতে নেই। বন্যার্তদের সেবা করতে গিয়ে নিজেই ভেসে যান জলের স্রোতে।

মন্দির চত্বর ছেড়ে ফ্রান্সিস ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে সমুদ্রের ধারে। রাতের গভীরতা বুঝতে পারে না ফ্রান্সিস, পরিবেশ দেখে অনুমান করে বেশ রাত হয়েছে। চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নেয় একবার। না, কোথাও কোন জীবনের স্পন্দন শুনতে পায় না, দেখতে পায় না কোন মনুষের অবস্থিতি। শুধু একটানা ঢেউ-এর গর্জন কানে আসে।

পা দুটো ঝুলিয়ে একটা পাথরের চাঙড়ের ওপর বোসে পড়ে ফ্রান্সিস। ভাঙা ভাঙা ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে পায়ের ওপর। জলকণা ছিটকে এসে লাগছে চোখে-মুখে। জনমানবশূন্য অন্ধকার সমুদ্রতটে বোসে সেই একই প্রশ্ন জেগে ওঠে ফ্রান্সিসের মনে—"কে আমার বাবা! কে আমার মা?"

আজো পর্যন্ত সে দ্যাখা পায় নি তার মা-বাবার। মনে আশা আছে, খুঁজে সে পাবেই তার মা-বাবাকে। পথ-পরিক্রমায় বেরিয়ে কাশী, এলাহাবাদ হয়ে পৌঁছেছিল হরিদ্বারে। কনখলে এক সাধু তার হাত দেখে বলেছেন তার মা-বাবা এখনো জীবিত। তাঁরা আছেন দক্ষিণ-ভারতে।

উত্তর ছেড়ে দক্ষিণে পাড়ি জমায় ফ্রানসিস। হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, ত্রিবান্দাম, রামেশ্বরম ঘুরে এসে পৌঁছেছে কণ্যা-কুমারিকায়। আজ তিন দিন ধরে খুঁজছে ফ্রানসিস, এখনো মেলে নি তাঁদের দ্যাখা।

কিন্তু মা-বাবাকে যে খুঁজে বার করতেই হবে ফ্রানসিসকে। দুঃসহ এ অপমানের জ্বালা কতকাল আর সে বয়ে বেড়াবে। ফাদার গুডচাইল্ড বলেছিলেন —"তাতে কি যায় আসে ফ্রানসিস? তোমার পরিচয় তুমি নিজে, তোমার পরিচয় তোমার কাজ।"

কিন্তু এ যুক্তিতে আর মন ভরে না ফ্রানসিসের। স্কুলে সে মা-বাবার পরিচয় দিতে পারে নি, তাই হয়েছে হাস্যাস্পদ। পরিচয়হীন যুবকের সঙ্গে জয়ের বাবা-মা তাঁদের মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী হন নি শেষ পর্যন্ত, হোক্ না যতই কৃতি ছাত্র সে। যেখানেই যাও, জানতে চায় মা-বাবার পরিচয়। একটা ফরম্ ফিলআপ করতে গেলেও লিখতে হয় বাবার নাম।

জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা ফ্রানসিসের স্কুলে। সহপাঠীদের মুখগুলো এখনো আঁকা আছে তার মনের ক্যানভাসে। কী পৈশাচিক আনন্দ আর ঘৃণা ফুটে উঠেছিল সেই শিশু মুখগুলোর ওপর। এখন ভাবতেও অবাক লাগে ফ্রানসিসের। পরম পিতার সন্তান আমরা,—একজনের কাছে যেটা চরম লজ্জা, আর একজন কি করে তার সেই লজ্জাকে কেন্দ্র করে আনন্দ প্রকাশ করে, ফেটে পড়ে ঘৃনায় আর বিদ্রূপে। কি করে যে সম্ভব হয় আজো সে তথ্য অজানা ফ্রানসিসের কাছে।

স্কুলের প্রথম দিনে মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করেন—"কি নাম তোমার বাবার?"

অকপটে জবাব দেয় ফ্রানসিস—"ফাদার গুডচাইল্ড।"

শিশুকাল থেকে সে একমাত্র ফাদার গুডচাইল্ডকেই দেখে আসছে। সরল বিশ্বাসে তাই জেনেছে গুডচাইল্ডই তার বাবা। কিন্তু জবাব শুনে মাস্টারমশাই বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে ওঠেন—"হোয়াট!" ছেলের দল হেসে ওঠে। ছেলেদের হাসি থামিয়ে মাস্টারমশাই বলেন ফ্রানসিসকে "তুমি জিজ্ঞেস করবে ফাদার গুডচাইল্ডকে, কে তোমার বাবা? কি তাঁর নাম।"

বিকেলে উপাসনার আগে ফ্রানসিস আসে গুডচাইল্ডের কাছে। জিজ্ঞেস করে —"কে আমার বাবা?"

গুডচাইল্ড একটু বিস্ময় বোধ করেন, —হঠাৎ ফ্রানসিস বাবার নাম জানতে চাইছে কেন? স্নেহসিক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন—"কেন বল তো? হঠাৎ তোমার বাবার নামের দরকার পড়লো কেন?"

ফ্রানসিস বিবৃত করে স্কুলের ঘটনা।

সব বুঝতে পারেন গুডচাইল্ড। স্কুলের সহপাঠীদের বিদ্রূপ বড় গভীরভাবে বেজেছে ফ্রানসিসের বুকে। তারই প্রকাশ ফুটে উঠেছে ওর চোখে-মুখে। গুডচাইল্ড যীশুর মূর্তি দেখিয়ে হেসে বলেন—"উনিই তোমার বাবা।"

বহুবারের দেখা মূর্তি আর একবার ভালো করে দেখে নেয় ফ্রানসিস। তারপর জিজ্ঞেস করে গুডচাইল্ডকে—"তুমি তাহলে আমার বাবা নও?"

এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর এড়িয়ে গিয়ে গুডচাইল্ড স্মিতহাস্যে বলেন—"উনি বিশ্বপিতা। তোমারো পিতা, আমারো পিতা।"

শিশুমনের বিশ্বাসে ফ্রানসিস জানলো যীশুই তার বাবা। পরদিন মাস্টারমশাই ক্লাসে আসতেই ফ্রানসিস দাঁড়িয়ে উঠে বলে—"আমি জেনেছি আমার বাবার নাম। আমার বাবা ভগবান যীশু।"

হেসে ওঠেন মাস্টারমশাই, সঙ্গে ক্লাস ফাটিয়ে হেসে ওঠে ছেলেরা।

লজ্জায় অপমানে লাল হয়ে ওঠে ফ্রানসিসের মুখ, চোখের কোণে দ্যাখা যায় জলবিন্দু। জামার হাতায় চোখ মুছে নিয়ে ঘাড় হেঁট করে বসে পড়ে বেঞ্চিতে।

দুঃখে-অভিমানে বুকের ভেতরটা ফুলে ফুলে ওঠে ফ্রানসিসের। ছুটির পর সোজা চলে আসে ফাদার গুডচাইল্ডের কাছে। কেঁদে তাঁর কোলের ওপর আছড়ে পড়ে বলে ওঠে—"কেন তুমি মিথ্যে কথা বললে? বল, কে আমার বাবা?" গুডচাইল্ড কিছু আগেই শুনেছিলেন সে ঘটনা ঐ স্কুলেরই এক বর্ষীয়ান শিক্ষকের কাছে। মনে মনে তাই তৈরি ছিলেন। ফ্রানসিসকে কোলের ওপর বসিয়ে প্রথমে মুছিয়ে দিলেন তার চোখ নিজের রুমালে। তারপর তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—"মিথ্যে আমি বলি নি বৎস। উনি যখন জগতের পিতা, তখন তোমারও পিতা।"

এ উত্তরে মন ভরে না ফ্রানসিসের। তাই আবার জিজ্ঞেস করে—"তাহলে মাস্টারমশাই হাসলেন কেন? ছেলেরা কেন হাসলো?"

জবাব দিতে পারেন না গুডচাইল্ড। ফ্রানসিসের মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে থাকেন।

ফ্রানসিসের পেড়াপেড়িতে অনেক পরে শুধু বলেন—"তুমি বড় হও, সব কথা বলবো তোমাকে। এখন বলার সময় হয় নি, বললে তুমি বুঝতে পারবে না।" সান্ত্বনার কথা শুনে শান্ত হয় ফ্রানসিসের মন। গুডচাইল্ডের কোল ছেড়ে উঠে চলে যায় নিজের ঘরে।

ফ্রানসিস চলে যাবার পর অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন গুডচাইল্ড। ভাবেন স্কুলের কথা, ভাবেন ফ্রানসিসের কথা। বিদ্যার পীঠস্থানেও জাতের বিচার, জন্ম-রহস্যের খুঁটিনাটি। মানুষকে মানুষ বলে এখনো ভাবতে শেখে নি এরা। আর ফ্রানসিস,—ক্লাসের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ, কিন্তু পড়াশোনায় সর্বোৎকৃষ্ট। যেমন অসাধারণ মেধা, তেমনি নম্র আর বিনয়ী। কিন্তু সবই হয়তো ব্যর্থ হয়ে যাবে ওর জীবনে, শুধুমাত্র ঐ একটি কারণে—ও জানবে না কে ওর বাবা, কে ওর মা! আর যখন জানবে তখন হয়তো লোকলজ্জার ভয়ে ওকে গিয়ে লুকোতে হবে যেখানে মানুষের বাস নেই।

হঠাৎ ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তির ওপর চোখ পড়ে গুডচাইল্ডের। নির্জন ঘরের মধ্যে বসে তাঁর এক বিচিত্র অনুভূতি আসে। চীৎকার করে ওঠেন—"কে তোমার পিতা? বল, কে তোমার পিতা?" গুডচাইল্ডের জিজ্ঞাসার প্রতিধ্বনি মুহূর্তের জন্যে সমস্ত ঘরটা ভরিয়ে তোলে। তারপর বিরাজ করে নিঃসীম স্তব্ধতা।

সন্ধ্যে হয়ে গেলে অন্ধকার ঘরের মধ্যে বসে আছেন গুডচাইল্ড। হঠাৎ চোখের ওপর ভেসে উঠলো সেদিনের সেই দৃশ্য।

রাত থাকতে উঠে বেড়াতে যাওয়ার অভ্যেস ছিল গুডচাইল্ডের। সেদিনও বেরিয়েছিলেন রাত থাকতেই। পড় পড় শীতের শেষ রাত্রি। মাথায় টুপি, কমফার্টারে গালগলা জড়িয়ে গুডচাইল্ড চলেছেন গঙ্গার ধারের রাস্তা ধরে। অস্পষ্ট আলোয় হঠাৎ চোখে পড়ে গঙ্গার কিনারায় এক জীবন্ত মূর্তি হেঁটে যাচ্ছে জলের দিকে। কি রকম সন্দেহ হয় গুডচাইল্ডের। এ সময় কে যায় গঙ্গার ধারে। গুডচাইল্ড এগিয়ে যান মূর্তিটির দিকে। কাছাকাছি হতে চোখে পড়ে সাদা কাপড়ে সর্বাঙ্গ আবৃত এক নারীমূর্তি। মুখটি শুধু বেরিয়ে আছে। নিটোল সুন্দর মুখ, কিন্তু বিষাদে ভরা। মেয়েটির সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন গুডচাইল্ড, জিজ্ঞেস করেন—"কে তুমি মা? এই সময় এখানে কি করছো?"

ভয় পেয়ে যায় মেয়েটি। গুডচাইল্ডের দীর্ঘ, বলিষ্ঠ চেহারা আর পোষাক দেখে মেয়েটির বুঝতে বাকি থাকে না গুডচাইল্ড কোন মিশনের অধ্যক্ষ। আমতা-আমতা করে জবাব দেয়—"বেড়াতে বেরিয়ে জলতেষ্টা পেয়েছে, তাই গঙ্গায় যাচ্ছি।"

সন্দেহ কাটে না গুডচাইল্ডের, বলেন, —"গঙ্গার জলে তৃষ্ণা মেটাবে তুমি।"

তবুও মেয়েটিকে পেছনে রেখে কয়েক পা এগিয়ে যান।

হঠাৎ শিশুকণ্ঠের কান্না কানে যায় গুডচাইল্ডের। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। আদেশের সুরে ডাকেন মেয়েটিকে—"শোন।"

মেয়েটি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এসে দাঁড়ায় গুডচাইল্ডের সামনে।

গুডচাইল্ডের স্পষ্ট এবং সোজা জিজ্ঞাসা—"তোমার বুকে তোমার সন্তান রয়েছে?"

ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যায় মেয়েটি। মুখ দিয়ে কথা সরে না, ঘাড়টা শুধু অল্প নড়ে ওঠে।

গুডচাইল্ডের দৃঢ় কণ্ঠের জিজ্ঞাসা—"তুমি তোমার সন্তানকে নদীগর্ভে বিসর্জন দিতে এসেছ?"

ডুকরে কেঁদে ওঠে মেয়েটি।

গুডচাইল্ডের মন মেয়েটির জন্যে করুণায় ভরে ওঠে। স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলেন, "আমার সঙ্গ-পোষাক দেখেই বুঝতে পারছো আমি সন্ন্যাসী। আমার কাছে সব কথা অকপটে বলতে তোমার কোন বাধা থাকা উচিত নয়। বল—কি হয়েছে তোমার?"

মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে মাটির ওপরেই বসে পড়ে। কোলের শিশুর কান্না ক্রমশই বেড়ে চলে।

গুডচাইল্ড মেয়েটিকে উদ্দেশ করে বলেন,—"শিশু ক্ষুধার্ত। তুমি তোমার বুকের সুধা পান করিয়ে ওকে শান্ত কর। আমি একটু দূরে যাই, অল্প পরেই ফিরে আসছি।"

সেই রাত্রি শেষে গঙ্গার কিনারায় দাঁড়িয়ে গুডচাইল্ড শুনেছিলেন রেবেকার দুঃসহ জীবনের মর্মান্তিক কাহিনী। সতীশ রায়, নিপুণ টেনিস খেলোয়াড়। ক্লাবে আসতো টেনিস খেলতে, যেখানে রেবেকা প্রায় রোজই থাকত তার বাবার সঙ্গে। শেষে পরিচয় পরিণত হয় প্রণয়ে। সরল রেবেকা সত্যিই ভালোবেসেছিল সতীশকে। তাই সতীশকে তার অদেয় কিছু ছিল না। দিনের পর দিন যায়, সতীশ শোনায় অনেক আশার কথা। অনেকদিন ধরে ওরা দুজন রঙীন ভবিষ্যতের চিত্র আঁকে, শেষে গোপনে বিয়ে হয় ওদের। কথা ছিল সতীশের চাকরীর কিছু উন্নতি হলেই ওরা দুজনে গিয়ে জানাবে রেবেকার বাবাকে ওদের বিয়ের কথা। সে সুযোগ আর ঘটে নি রেবেকার জীবনে। ছ' মাসের ওপর হ'ল সতীশের কোন খবর পায় নি রেবেকা। অনেক সন্ধান করেছে, কিন্তু দেখা পায় নি সতীশের। মাত্র কয়েকদিন হল রেবেকা জানতে পেরেছে সতীশ এক ধনীর মেয়েকে বিয়ে করে দেশান্তরী হয়ে চলে গেছে। রেবেকার বাবা অসুস্থ হয়ে স্যানাটোরিয়ামে ছিলেন। এখন সুস্থ হয়ে কয়েকদিনের মধ্যে বাড়ি ফিরবেন। তাই অনন্যোপায় হয়ে সন্তানকে বুকে নিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে সব জ্বালা জুড়োতে এসেছিল রেবেকা।

গুডচাইল্ড শুনলেন রেবেকার জীবনের করুণ কাহিনী। অল্প সময় চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলেন রেবেকাকে—"তুমি কি পাবে না এই সন্তানকে নিজের মতন করে মানুষ করতে?"

—"সে সঙ্গতি আমার নেই।"—রুদ্ধ কণ্ঠের জবাব রেবেকার।

—"তোমার বাবা কি তোমার সন্তানকে মেনে নেবেন না?"—জিজ্ঞেস করেন গুডচাইল্ড।

—"না, আমার বাবা সে প্রকৃতির মানুষ নন।"—জবাবে বলে রেবেকা।

—"তা হলে উপায়?"—গুডচাইল্ডের জিজ্ঞাসা।

—"উপায় একমাত্র মা গঙ্গা"—রেবেকার জবাব।

পরম সহিষ্ণু গুডচাইল্ডও সেদিন একটু অসহিষ্ণু হয়ে পড়েন। অল্প থেমে বলে ওঠেন—"তা কিছুতেই হতে পারে না। আমি তোমাদের মরতে দিতে পারি না।"

—"কিন্তু কোথায় পাব আমি বেঁচে থাকার পথ?"—রেবেকার করুণ কণ্ঠের জিজ্ঞাসা।

নিজের হাত দুটো রেবেকার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে ওঠেন ফাদার গুডচাইল্ড—"সে পথের সন্ধান এখন আমি তোমায় দিতে পারবো না। আপাতত, তুমি তোমার সন্তানকে আমার কোলে দাও।" তারপর পকেট থেকে নিজের নাম লেখা একটা কার্ড বার করে রেবেকার হাতে দিয়ে বলেন,—"এক বছর পরে আমার সঙ্গে দেখা করবে। তোমার ছেলের কোন অযত্ন হবে না। যাও, শান্ত মনে বাড়ি ফিরে যাও।"

চোখের জল ফেলতে ফেলতে ধীর পদবিক্ষেপে রেবেকা চলে যায় গঙ্গার কিনারা ছেড়ে। আকাশে উষ্ণা অল্প অল্প আলোর রেখা দেখা দিয়েছে। অপরিচিত এক শিশু সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরে গুডচাইল্ড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন রেবেকার চলে যাওয়া। অজ্ঞাতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে তাঁর বুক থেকে। শিশু সন্তানকে বুকের ওপর চেপে ধরে গুডচাইল্ড পা চালিয়ে দেন তাঁর নিজের বাসার দিকে।

বছর ঘুরে যায়, আসে না রেবেকা তার সন্তানের খোঁজ। গুডচাইল্ড খোঁজ করেন রেবেকার, সন্ধান মেলে না। ভাসা ভাসা খবর পান, কেউ বলে রেবেকা আত্মহত্যা করেছে আবার কেউ বা বলে রেবেকা সন্ন্যাসিনী হয়ে গৃহত্যাগ করেছে। ছ'টা বছর কেটে গেল, এল না রেবেকা।

পাথরের চাঙড়ের ওপর বসে ফিমনি আসে ফ্রানসিসের। দমকা একটা বাতাস এসে উড়িয়ে নিয়ে যায় ফ্রানসিসের মাথার টুপি, একটা বড় ঢেউ আছড়ে এসে পড়ে পাথরের ওপর, জল ছিটকে এসে ভিজিয়ে দেয় ফ্রানসিসের জামা পেন্টুলুন। চমক ভেঙে যায় ফ্রানসিসের, উঠে গিয়ে কুড়িয়ে নেয় টুপিটা।

আবার খানিক চেয়ে দ্যাখে চারধার। নিস্তব্ধ বেলাভূমির ওপর শুধু ঢেউগুলো আছড়ে আছড়ে পড়ছে। তারই একটানা শব্দ। তা ছাড়া কোন শব্দ বা জীবনের স্পন্দন শুনতে পায় না ফ্রানসিস। আপন মনেই পদচারনা করতে করতে একবার আকাশের দিকে তাকায়, তারপর চেয়ে থাকে সমুদ্রের দিকে। মনে হয় কত বিশাল এরা, বলতে গেলে সীমাহীন। কত উদার এদের আহ্বান। কিন্তু কই এরা তো মানুষকে এখনো পুরোপুরি উদার হবার শিক্ষা দিতে পারে নি, পারে নি নিজের বিশালতার ছাপ এঁকে দিতে মানুষের বুকে! এদের সামনে নিজেকে খুবই অকিঞ্চিৎকর মনে হয় ফ্রানসিসের।

হঠাৎ মনে পড়ে যায় সেদিনের ঘটনা, যেদিন প্রবেশিকা পরীক্ষার চমকপ্রদ খবর নিয়ে ছুটতে ছুটতে ফিরে আসে ফাদার গুডচাইল্ডের কাছে। গুডচাইল্ড বুকে জড়িয়ে ধরেন ফ্রানসিসকে, বলেন—"এইটেই হচ্ছে তোমার সত্যিকারের পরিচয়। তোমার পরিচয়ের পরিধি আরো বেড়ে যাবে যখন তুমি তোমার জ্ঞানের ভাণ্ডার উজাড় করে দেবে জনকল্যাণে।" নিজের কতটুকু জ্ঞান আছে সেটা ঠিক মত জানা না ফ্রানসিস। কিন্তু যতটুকুই থাক, ততটুকুই সে বিলিয়ে দিতে চেয়েছে মিশনের মাধ্যমে যে মিশনের প্রতিটা ইঁট, কাঠ আর প্রতিটি গাছগাছালির সঙ্গে সে শিশুকাল থেকে পরিচিত। যে মিশন তৈরি করে গ্যাছেন ফাদার গুডচাইল্ড তাঁর বুকের রক্ত দিয়ে। কিন্তু কি লাভ হ'ল তার? মিশনের সহকর্মীদের কাছ থেকে সে পেয়েছে অপমান আর লাঞ্ছনা। বাবা-মার পরিচয় তার জানা নেই, শুধু শুনেছিল গুডচাইল্ডের কাছ থেকে যে তার বাবা তার মাকে সত্যিই বিয়ে করেছিল। সে বলার চেষ্টা করে—সে জারজ সন্তান নয়, তার বাবা-মার কিছু পরিচয় নিশ্চয়ই ছিল, যা সে জানে না। কিন্তু তার কথায় বিশ্বাস করার মত উদার অন্তর কোথায়! অলক্ষ্যে তাকে শুনতে হয়েছে, সে বেশ্যা-পুত্র, তার কোন পরিচয় নেই। ব্যথায় মোচড় দিয়ে ওঠে তার বুকের ভেতরটা, কেঁদে ভাসিয়ে দেয় মাথার বালিশ।

সারারাত ধরে সেদিন কেঁদেছিল ফ্রানসিস। প্রবেশিকা পরীক্ষার সাফল্যে গুডচাইল্ডের আশীর্বাদ পেয়ে মনটা আনন্দে ভরে উঠেছিল ফ্রানসিসের। বিকেলে মনের খুশিতে বাঁশি বাজাচ্ছিল একটা গাছতলায় বসে। বাঁশি বাজানো শিখেছিল সে গুডচাইল্ডের কাছ থেকে। গুড-

চাইল্ড নিজে খুব ভালো বাঁশি বাজাতে জানতেন, শিখিয়েছিলেন ফ্রানসিসকে। হঠাৎ ফ্রানসিস দ্যাখে দুজন মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ওর দিকেই এগিয়ে আসছেন গুড-চাইল্ড। উঠে দাঁড়ায় ফ্রানসিস। গুড-চাইল্ড বলেন,—"এঁরা কাগজের অফিসের লোক, তোমার কৃতিত্বে আকৃষ্ট হয়ে এঁরা তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে এসেছেন।" অভিভূত হয়ে পড়ে ফ্রানসিস, কোন কথা বলতে পারে না। শুধু একদৃষ্টে চেয়ে থাকে আগন্তুকদের মুখের দিকে। দৃষ্টিটা তার কৃতজ্ঞতায় ভরা ছিল এটা সে আজো স্মরণ করতে পারে।

কাগজের অফিসের লোকেরা তার পিঠ চাপড়ে বাহবা দিলেন। বললেন,—তার সম্বন্ধে তাঁরা লিখবেন। তাঁদের কাগজে। শুনে গুডচাইল্ড খুশিতে আত্মহারা হয়ে ওঠেন। সবিস্তারে বলে যান ফ্রানসিসের সম্বন্ধে। লেখা শেষ করে তাঁরা বলেন ফ্রানসিসকে—"এইবার বল তোমার বাবার নাম।"

প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না ফ্রানসিস। করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে গুডচাইল্ডের মুখের দিকে।

গুডচাইল্ডের খুশি মাখা মুখখানা মুহূর্তে ম্লান হয়ে যায়। আগন্তুকদের উদ্দেশ্যে বলেন,—"ওর সম্বন্ধে লিখবেন তো ওর বাবার নামের কি দরকার?"

মৃদু হাসেন আগন্তুকদের একজন। বলেন,—"এটা যে প্রথা। পিতৃ পরিচয় না জানালে তো সত্যিকারের পরিচয় দেওয়া হল না।"

গম্ভীর হয়ে যান গুডচাইল্ড। বলেন —"তাহলে লিখে নিন, বিশ্বপিতার সন্তান ও।"

আগন্তুক দুজন অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন গুডচাইল্ডের মুখের দিকে। তাঁদের মুখ দিয়ে শুধু বেরিয়ে আসে দুটি কথা —"তার মানে?"

গুডচাইল্ড একভাবেই জবাব দ্যান—"এর বেশি কিছু আর আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না।"

মুচকি হেসে বিদায় নেন আগন্তুকরা।

পদচারনা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে ফ্রানসিস। বোসে পড়ে বাঁধানো চাতালটার একধারে। মনটা বড়ই বিক্ষিপ্ত আজ। থেকে থেকে অতীতের কত ঘটনাই মনের ওপর দিয়ে ছায়াছবির মত মুখর হয়ে ভেসে চলে গেল। মনকে সে শান্ত রাখতে চায়, পেরে ওঠে না সব সময়।

দেওয়ালে মাথাটা হেলান দিয়ে ক্লান্তি-বশতঃ একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল ফ্রানসিস। হঠাৎ একটা কলহাস্য কানে যেতেই ভেঙে গেল তন্দ্রা। চোখ চাইতেই প্রথমে চোখে পড়লো রক্তাভ সূর্যকে। রাত শেষ—, কখন যে হয়েছে জানতেই পারে নি ফ্রানসিস। অভ্যেস অনুযায়ী কপালে হাত ঠেকিয়ে সূর্যপ্রণাম শেষ করে উঠে দাঁড়ালো। পেছন ফিরে তাকাতেই চোখে পড়লো ভ্রমণ বিলাসী একদল লোক এই সকালেই এসে হাজির হয়েছে। কে, কে ঐ মেয়েটি! দলের পুরোভাগে বর্ষার ঝর্ণাধারার মত নাচতে নাচতে চলেছে? জয়? জয়? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক সেই মুখ, সেই চুল। কিন্তু সে চোখ কোথায়? কোথায় সেই চোখের দৃষ্টি? যে দৃষ্টির আকর্ষণে সব ছেড়ে দিয়ে ফ্রানসিস সংসারী হতে আগ্রহী হয়েছিল?—না, ও তো নয় জয়,—জয়েস মুর।

কাঁপতে কাঁপতে ফ্রানসিস আবার বসে পড়লো চাতালটার ওপর, অনেকদিন আগে কলেজের সেদিনের, সেই দৃশ্যটা ভেসে উঠলো চোখের সামনে। ডায়াসের সামনে দাঁড়ানো সেই মেয়েটি, চোখে তার এক অদ্ভুত মায়াময় দৃষ্টি,—আকুতিতে ভরা। কোঁকড়া কোঁকড়া সোনালী চুলগুলো ঘাড় ছাড়িয়ে পিঠের প্রান্তে ঝুলছে, কপালের ওপর দুএকটা গুচ্ছ অবাধ্য শিশুর মত দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। গাঢ় সবুজ রংয়ের জামার ফাঁকে ফাঁকে গোলাপী মোমের মত দেহের রং উঁকি মারছে। নিরাভরণ নিটোল দুটো হাত মঞ্চের কিনারায় রেখে দাঁড়িয়ে আছে জয়-জয়সমুর।

কলেজের শেষ পরীক্ষা হয়ে গ্যাছে। বিদায়ী ছাত্রদের অভিনন্দন জানাবার জন্যে আয়োজন করা হয়েছে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের। ফ্রানসিসের খ্যাতি ছিল বাঁশি বাজানোর। এর আগেও কলেজের অনুষ্ঠানে সে বাঁশি বাজিয়েছে। সেদিনের অনুষ্ঠানের কর্মসূচীতেও ছিল তার বাঁশি বাজানোর দায়িত্ব। মানুষের ভিড়ে ভরে গ্যাছে প্রশস্থ প্রেক্ষাগৃহ, দু পাশের চলন পথেও বহু লোক দাঁড়িয়ে আছে। বাঁশি বাজানো শেষ করে উঠে দাঁড়িয়েছে ফ্রানসিস। সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ তখন ভরে উঠেছে করতালি-ধ্বনিতে। সমস্বরে আওয়াজ উঠেছে—আর একটা, আর একটা। জনতার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার বসে পড়লো ফ্রানসিস। ফুঁ দিলে বাঁশিতে, উন্মত্ত জনতা যেন কি এক অপূর্ব মন্ত্র বলে মুহূর্তেই স্তব্ধ হয়ে গেল। বাঁশিতে ঝরে পড়তে লাগলো সুরের সুরধুনী। শেষ হল বাজানো। আবার সেই হাত-তালির লহরা মুখর করে তুললো সমস্ত প্রেক্ষাগৃহকে। তখনো উঠে দাঁড়ায় নি ফ্রানসিস মঞ্চের ধারে এসে দাঁড়ালো এক ষোড়শী তরুণী। আকুতিভরা দৃষ্টিতে বললে ফ্রানসিসকে—"যদি কিছু না মনে কর আর একটা বাজাবার অনুরোধ করতে পারি কি?"

ফ্রানসিসের মুখ দিয়ে কথা সরে না, অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মেয়েটির মুখের দিকে। লজ্জা পেয়ে সরে আসে মেয়েটি।

ফুঁ পড়লো বাঁশিতে। সুরের মায়া-জাল ধাপে ধাপে ওঠে, আবার নেবে আসে। তারই মধ্যে ফ্রানসিসের বাঁশি যেন কত কথা বলে চলেছে। শ্রোতাদের বুক চিরে বাঁশির সেই কান্না যেন হৃদয়ের অন্তস্থলে পৌঁছে অন্তরের পুঞ্জীভূত কান্নাকে নিঙড়ে বার করে নিয়ে আসছে। সমস্ত পরিবেশ অদ্ভুত বকমের স্তব্ধ, শুধু শ্রোতাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ক্ষীণ শব্দ কানে ভেসে আসে।

থামলো বাঁশি। সুরের রেশটা তখনো সমস্ত পরিবেশকে ভরিয়ে রেখেছে, তখনো এক অদ্ভুত স্তব্ধতা ছড়িয়ে আছে চার-দিকে। আবার মঞ্চের ধারে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল মেয়েটি। দু' চোখ ভরা জল। জলভরা চোখ দুটো ফ্রানসিসের মুখের দিকে তুলে শুধু বললে—"অপূর্ব।" ফ্রানসিসের চোখেও জল এসে গিয়েছিল। মেয়েটির কথা শুনে ঝরে পড়লো ঝর ঝর করে।

জয়ই এগিয়ে এসেছিল আলাপ করতে। আলাপ হল, পরিচিত হল পরস্পরে, শেষে গাঢ় হল পরিচয়ের পরিধি, পরিণত হল প্রণয়ে। ফ্রানসিস গেল জয়ের বাড়ি; দেখলো ওর বাবা মাকে। তাঁরাও দেখলেন আত্মভোলা কৃতীছাত্র ফ্রানসিসকে। জয়ের মা মনে মনে ঠিক করলেন বেঁধে ফেলতে হবে ফ্রানসিসকে জয়ের বাঁধনে। বললেন স্বামীকে মনের গোপন কথা। বেল-দপ্তরের মোটা মাইনের কর্মচারী জয়ের বাবা জীবনে দেখেছেন অনেক, অভিজ্ঞতা পর্বতপ্রমান। স্ত্রীর কথা শুনে বলেন—"অত নাচানাচি কোরো না। মিশনারীতে মানুষ যে ছেলে তার সম্বন্ধে অনেক খোঁজ খবর নেওয়া দরকার।"

জয়ের বাবার খোঁজ খবর নেওয়া এগিয়ে চললো, এদিকে এরা দুজনেও এগিয়ে চললো আরো কাছাকাছি হয়ে।

জয় প্রশ্ন করে—"আমাকে বিয়ে করলে তোমার মিশনের কাজ দেখবে কে?

জয়ের হাতটা নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে উত্তর দেয় ফ্রানসিস—"আরো অনেক লোক আছে মিশনের কাজ দেখার জন্যে। তারা দেখবে মিশন।"

—"কিন্তু ফাদার গুডচাইল্ড তো তোমাকে মিশনেরই কাজ করতে বলে গেছেন।"

—"না, তা তিনি বলে যান নি। তিনি বলেছিলেন জনগণের কল্যাণকর কাজ করতে। বিয়ে করেও সে কাজ করা যায়",—বেশ দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেয় ফ্রান-সিস।

হেসে ওঠে জয়, বলে—"তখন আর সময় পাবে কখন। আমি একদণ্ডের

জন্যেও তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না।"

গভীর আবেগে জয়ের হাতটা আবার টেনে নেয় ফ্রানসিস নিজের হাতের মধ্যে। বলে ওঠে—"আমিও তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না জয়। মিশনের কাজের জন্যে তোমাকে আমি হারাতে পারবো না।"

জয়ের যে হাত ফ্রানসিস একদিন গভীর আবেগে চেপে ধরেছিল সেই হাত ছাঁড়িয়ে জয় চলে গ্যাছে বহুদূরে। আজ আর চেষ্টা করলেও তাকে ভালোমত স্মরণে আনতে পারে না ফ্রানসিস। অথচ একদিন ছিল যখন সবকিছু পরিত্যাগ করে সে জয়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে সংসারের পথে হাঁটতে চেয়েছিল। গুডচাইল্ডের উপদেশ তখন তার কাছে তুচ্ছ মনে হয়েছিল, সংসার-ধর্ম স্থান পেয়েছিল সন্ন্যাসের ওপরে।

বহুদিন পরে আজ ঐ মেয়েটিকে দেখে জয়ের প্রায় মুছে যাওয়া স্মৃতি ফুটে ওঠে ফ্রানসিসের মনে। মনে পড়ে যায় জয়ের বাবার নির্মম কটূক্তি—"লজ্জা করে না তোমার! যার জন্মের কোন পরিচয় নেই দেবার মত, সে আসে আমার মেয়েকে বিয়ে করতে! যাও, আর কোনদিন কোন কারণে তুমি আসবে না আমার বাড়িতে। জয়ের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করবে না।" ঘাড় হেঁট করেই বেরিয়ে আসছিল ফ্রানসিস। হঠাৎ ফ্রানসিসের মনে হল জয়ের মতামতটাও জেনে যাওয়া দরকার। সদর দরজায় দাঁড়িয়ে খবর পাঠালে পরিচারিকাকে দিয়ে। তখুনি জবাব এল জয়ের কাছ থেকে—"দ্যাখা করে কিছু লাভ হবে না। তাছাড়া সে খুব ব্যস্ত আছে।"

মাতালের মত টলতে টলতে বেরিয়ে আসে ফ্রানসিস। পথ চলতে চলতে একটা কথাই বার বার তার মনে এসেছে—এখানেও সেই এক প্রশ্ন,—কে তার বাবা? কে তার মা? ভালোবাসা মিথ্যে, প্রেম মিথ্যে—সত্য শুধু তার পরিচয়। কোথা থেকে সে এসেছে এটাই জানতে চায় সকলে। ভুলে যায় সে একজন মানুষ। তার হৃদয় আছে, হৃদয় জুড়ে আছে প্রেম, মানুষের জন্যে আছে সেখানে অকৃত্রিম ভালোবাসা।

ঘাড় ফিরিয়ে ফ্রানসিস আর একবার চেয়ে দেখলো মেয়েটির দিকে। ভেতরে একটা উত্তেজনা অনুভব করছে সে, কি একটা অজানা জিনিস জানবার জন্যে বুকের ভেতরটা আকুলি-বিকুলি করছে। মাথার চুলগুলো খুব জোর টানতে টানতে উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালো ফ্রানসিস। তারপর ঊর্ধ্বে আকাশের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলো—"ফাদার, তুমি বলে দাও, কে আমার বাবা? কে আমার মা?" ফ্রানসিসের চীৎকার শুনে ভ্রমণবিলাসী দলটি অবাক হয়ে চেয়ে দেখলো ফ্রানসিসের দিকে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই ফ্রানসিসের। সমুদ্রতীরের ওপর দিয়ে ফ্রানসিস তখন ছুটতে আরম্ভ করেছে। মুখে তার সেই এক কথা—"কে আমার বাবা? কে আমার মা? খুঁজে বার করতেই হবে আমাকে, যেমন করে হোক, খুঁজে বার করতে হবে। সন্ন্যাসী আমার হাত দেখে বলেছে, আমার বাবা-মা জীবিত। ফাদার, তুমি বলে দাও কোথায় তাঁরা?"

শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যেবেলা আবার ফিরে আসে ফ্রানসিস সেই চাতালটির কাছে। মন্দিরে তখন সন্ধ্যা আরতি শুরু হয়েছে। মধুর কণ্ঠে কে গান গাইছে। গানের মানে বুঝতে পারে না ফ্রানসিস, কিন্তু বড় ভালো লাগে শুনতে। বোসে পড়ে চাতালটার ওপর। গান শুনতে শুনতে ঝিমুনি আসে, শুয়ে পড়ে চাতালের মেঝেতে।

গভীর ঘুমে অচেতন ফ্রানসিস। চারদিক নিস্তব্ধ। শুধু সমুদ্রের ঢেউ-এর শব্দ বাতাসে ভেসে আসছে। ঘুমের মধ্যেই ফ্রানসিস দ্যাখে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক দিব্যমূর্তি। সেই মূর্তি বলছে—"আই য়্যাম দি লাইট অফ দি ওয়ারল্ড।" ঘুম ভেঙে যায় ফ্রানসিসের, ধড়মড় করে উঠে বসে। কিন্তু কোথায় সেই দিব্যমূর্তি? কই, কেউ তো নেই এখানে।

আর ঘুম আসে না চোখে। জেগে বোসে থাকে ফ্রানসিস, মনে মনে উচ্চারণ করে সেই দিব্যমূর্তির বলা কথা। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে, চঞ্চল হয়ে পাইচারী করে বেড়ায় চাতালটার এধার থেকে ওধার। শেষে শ্রান্ত হয়ে বোসে পড়ে চাতালের ওপর। অন্ধকারে ভেসে আসে সমুদ্রের গর্জন। ফ্রানসিস কান পেতে শোনে সেই গর্জন। মনের মধ্যে চিন্তার জট পাকায়—এই যে একটানা শব্দ ভেসে আসছে—এখন আসছে, অনাদি অনন্তকাল ধরে এসেছে, ভবিষ্যতেও আসবে। যুগযুগান্ত ধরে পৃথিবীর বুক জুড়ে রয়েছে এই সীমাহীন সমুদ্র, গর্ভে তার অনন্ত সম্পদ। মানুষ সেই সম্পদের লোভে নেবে যায় তার অতলগর্ভে। কোথা থেকে এই সমুদ্রের সৃষ্টি তা নিয়ে মাথা ঘামায় না মানুষ। সমুদ্রও বাচবিচার না করেই বিলিয়ে দেয় তার রত্নসম্ভার মানুষের কল্যাণে।

ফ্রানসিসের মন অনেকটা শান্ত হয়। অন্ধকার সমুদ্রের দিকে চেয়ে বোসে থাকে চুপ করে। হঠাৎ মনে হয় কেন তার এই আকুতি, কেন এই উত্তেজনা! তার তো সকলের চেয়ে বড় পরিচয়—সে মানুষ। কোথা থেকে তার সৃষ্টি এ প্রশ্ন তার কাছে অবান্তর বলে মনে হয়। পৃথিবীর কল্যাণের জন্যেই তার সৃষ্টি,—এই কথাটাই বড় হয়ে ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে। পরিচিত সব মুখ মুছে যায় তার দৃষ্টির সীমানা থেকে, মুছে যায় জয়, নিঃশেষে মুছে যায় অতীত। চোখের সামনে শুধু ভেসে ওঠে গুডচাইল্ড—ফাদার গুডচাইল্ড।

জাহাজের তীব্র বাঁশীর শব্দে চমক ভেঙে যায় ফ্রানসিসের। চেয়ে দ্যাখে অন্ধকার সমুদ্রের দিকে। চোখে পড়ে সঞ্চরণশীল আলোকমালা। অন্ধকারে জাহাজকে দেখতে পায় না ফ্রানসিস, দেখতে পায় টিমটিমে আলোগুলো অন্ধকারের বুকের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। ফ্রানসিসের মনে হয়, ঐ আলোক বিন্দুই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, ঐ তো তার জীবনপথের দিশারী। মনের মধ্যে অনাবিল আনন্দ অনুভব করে ফ্রানসিস। একমাত্র সম্বল ছোট্ট পুঁটলিটা কাঁধের ওপর ফেলে নেমে পড়ে রাস্তায়। নতুন করে শুরু করে পথপরিক্রমা জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছবার সংকল্প নিয়ে। আকাশের তারাগুলো তখন মিটমিট করে জ্বলছে, চাঁদ পশ্চিমাকাশে অনেকটা হেলে পড়েছে। ঘাড় তুলে চাইতেই ফ্রানসিসের চোখে পড়ল উত্তরাকাশের ধ্রুবতারা। ঐ তো ফ্রানসিসের লক্ষ্য, ঐ তারকাই তো ফ্রানসিসকে যাত্রাপথের নিশানা ঠিক করে দেবে। আর একবার ধ্রুবতারাকে ভালো করে দেখে নিয়ে চলার গতি বাড়িয়ে দেয় ফ্রানসিস।

এ সমতার যাবতীয় গ্রন্থ ও গ্রন্থাবলীর প্রাপ্তিস্থান
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ
কলিকাতা—১২
এবং
সান্যাল এণ্ড কোং
১/১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মাছি

ভবানী মুখোপাধ্যায়

নয়াদিল্লীর একটি প্রেস কনফারেন্স ডেকেছিলেন যেদিন 'এক্স—০৯' প্রথম বাজারে ছাড়া হয়। প্রেস কনফারেন্সটি ভীষণ জমেছিল। স্বয়ং বানারসী দাস সেদিন বক্তৃতা করেছিলেন।

উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেছিলেন—"এক্স—০৯' দীর্ঘদিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলেই সার্থক হয়েছে। ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই রাসায়নিক বস্তুটি প্রস্তুত করা হয়েছে। কোনোরকম ধর্মীয় আচারে যাতে আঘাত না লাগে সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হয়েছে। কারণ, জীবহত্যা যে অনেকের মতে পাপ এটা আমরা জানি। ভারতবর্ষ এক মহান দেশ, সেই মহাদেশ অতীতের গৌরবের দিকে চেয়ে এই আবিষ্কারের জন্য নিঃসন্দেহে গর্ববোধ করতে পারে। আমরা বার বার অসফল হয়েছি, কিন্তু অসাফল্য আমাদের উদ্যমকে দমিয়ে দিতে পারে নি।"

হিন্দি ভাষণের ইংরাজী হ্যান্ড আউট সকলে পেয়েছিলেন, এই বক্তৃতায় ঘন ঘন করতালি ধ্বনিত হল।

বানারসী দাসজী পরমোৎসাহে বলতে লাগলেন—"অবশেষে সাফল্য এসেছে, আমি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু বাংলা কবিতা পড়েছি—তিনিই তা বলেছেন 'থরে বারে জ্বালাবি বাতি, হয়ত বাতি জ্বলবে না—'। তাই হতাশ হয় নি।"

এরপর তিনি একটি সবুজবর্ণ তরল পদার্থপূর্ণ কাচের শিশি সবাইের চোখের সামনে তুলে ধরলেন—বললেন :

"এরই নাম এক্স—০৯। অর্থাৎ নিশ্চিত মৃত্যু। মাছিরা সবংশে নিপাত যাবে। এই এক্স—০৯ যেখানে একটু ছড়িয়ে দেওয়া হবে তার ওপর এসে বসলেই মাছির বংশ একেবারে ধ্বংস। আমাদের নতুন স্লোগানও তাই রাখা হয়েছে।

"বন্ধুগণ! আমি জোর করে বলতে পারি সামনের ছ মাসের মধ্যে আমাদের এই পবিত্র ভারতভূমিতে মাছির বংশ লোপ পেয়ে যাবে।"

আবার হাততালি পড়ল।

'এক্স—০৯' গৃহস্থের প্রয়োজনে বিনামূল্যে দেওয়া হল। তা ছাড়া খাটাল ও নর্দমায় বিমানযোগে সিঞ্চিত হল। এই মারাত্মক মাছিনাশক ঘনসন্নিবেশ এমন প্রক্রিয়ায় তৈরী যে মৌমাছি বা অন্য পোকা-মাকড়দের পক্ষে তা সম্পূর্ণ নিরাপদ।

এক মধ্য-নিদাঘে মাছি নিবারক সপ্তাহ প্রতিপালিত হল। যথারীতি নৃত্য ও গীত-সহকারে প্রতিটি রাজ্যের রাজভবনে উদ্বোধনী উৎসব অনুষ্ঠিত হল। ইনফরমেশন ফিল্মে তার ছবি প্রতি সিনেমায় দেখানো হল। আর আশ্বিন মাসের মধ্যেই মাছিদের আর দেখা গেল না।

এক্স—০৯-এর আবিষ্কারক হরিবল্লভ গুজরালকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি দেওয়া হল এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানালেন যে প্রায় ১০০,০০০,০০০ কোটি টাকার খাদ্য অপচয় নিবারণ করা সম্ভব হয়েছে।

সকলেই এই সংবাদে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

শীতের এক অপরাহ্ণ। দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল। মুকুন্দনগরের শ্রীবৎস কলেজের অধ্যাপক হরিহর পাত্র এক আতংককর আবিষ্কার করলেন। তিনি একটি রবিবাসরীয় পত্রিকা পড়তে পড়তে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলেন। এমন সময় কি একটি পতঙ্গ তাঁর কেশবিরল মাথায় এসে বসল। অধ্যাপক মাত্র তাঁর মাথার টাকটির জন্য অতি সহজেই বুঝলেন কোনো হানাদার এসে মাথায় নেমেছে, তিনি অভ্যাসবশত একটি চড় তুলেছিলেন কিন্তু সহসা মনে হল এখন ত' আর মাছি নেই, মাছির বংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। তাহলে এটি নিশ্চয়ই বোলতা বা মৌমাছি কিংবা ভীমরুল।

পতঙ্গটি পাত্রমহাশয়ের অভ্যাসসংযমে সতর্ক হয়ে আবার ডানা মেলে উড়ে গিয়ে বন্ধ কাচের জানলায় বসল। অধ্যাপক সবিস্ময়ে দেখলেন একটি বিরাট মাছি।

অধ্যাপক তখনই এক্স—০৯ স্প্রে করলেন, কিন্তু এই সিঞ্চনে কিছু ফল হল না। মাছিটার মৃতদেহ মাটিতে পড়ল না, বরং হাঁস যেমন অবলীলাক্রমে পাখা নেড়ে অঙ্গ থেকে জল ঝরিয়ে ফেলে মাছিটা সেইভাবে রাসায়নিক দ্রব্যটি ঝেড়ে ফেলে উড়ে চলে গেল।

অধ্যাপক সবিস্ময়ে এই দৃশ্য দেখতে লাগলেন, মাছিটা বেরোতে না পেরে বার বার কাচের শার্সিতে মাথা ঠুকছে।

অবশেষে তিনি অবশ্য সেই রবিবাসরীয় পত্রিকাটি দিয়ে মাছিটাকে পরাস্ত করলেন এবং মাটিতে ফেলে পা দিয়ে থেঁতলে তার আর কিছু রাখলেন না।

এর পরই তিনি কাগজ-কলম নিয়ে তাঁর প্রিয় সংবাদপত্রের সম্পাদক মহাশয়ের উদ্দেশ্যে একটি পত্রাঘাত করলেন।

এই ঘটনাটির পর এক পক্ষকাল কেটে গেল। একদিন স্বাস্থ্যমন্ত্রক থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হল। প্রেসনোটের আকারে সেটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল—

"জানা গিয়েছে সম্প্রতি একজাতীয় মাছির ডিম ফুটে বেরিয়েছে যারা এক্স—০৯ দ্বারা ধ্বংস হয় না। শুধু তাই নয় বর্তমান শীত কালেও তাদের একটুও কাবু করতে পারে না। জনসাধারণকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে এই জাতীয় মাছি দেখতে পেলেই তাকে হাত দিয়ে মারবার চেষ্টা করবেন এবং স্থানীয় থানা বা কাঁড়িতে এই রকম এক কেজি মৃত মাছি জমা দিলে প্রতি কেজিতে দশ টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হবে।"

সমস্ত শীতকাল ধরে নতুন মাছি আমদানির সংবাদ আসতে লাগল। জলন্ধর

পাঠানকোট, অগ্রতেসর প্রভৃতি উত্তরাঞ্চলের শহরেও যেমন তেমনই আবার ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূর, হায়দ্রাবাদের অবস্থা, আর দক্ষিণী রাজ্যগুলির ত' দুর্দশার অবধি নেই। এইখানে আবার মাছিদের নাকি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, অর্থাৎ শীত-গ্রীষ্ম সব সময়েই এখানে মাছির অভাব হয় না। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা দিন দিন মাছির সংবাদে পূর্ণ থাকে। একদিন সংবাদ প্রকাশিত হল যে, গুজরাটে এক বিশেষ মাছিমারণ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবে, তার জন্য প্রায় পাঁচশ মন উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত পোড়ানো হবে।

তারপর ২০০১ খৃস্টাব্দের ১৭ই মে তারিখে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নটবর মিশ্র জাতির উদ্দেশে এক বেতার ভাষণ প্রচার করলেন—তিনি বললেন, "আমাদের সুদীর্ঘ ইতিহাসে আমরা এক ভীষণ সংকট মুহূর্তে উপনীত হয়েছি। পাখায় ভর দিয়ে শত্রু এসে হানা দিচ্ছে। এইবার আমাদের ভূমিতে দাঁড়িয়ে লড়তে হবে। প্রতিটি সরকারী কারখানায় মাছি-নিবারক তৈরী করা হচ্ছে। আগামী কাল থেকে প্রতিটি ডাকঘর থেকে বিনামূল্যে এই মাছি-নিবারক বিতরণ করা হবে। আমাদের স্বদেশের স্বপক্ষে এই জেহাদে যোগদানের জন্য কেউই তেমন বৃদ্ধ নন, বা কেউই ছেলেমানুষ নন, সকলের সমান অংশ এই পবিত্র লড়াই-এ। প্রতিজনে প্রতিদিনে অন্ততঃ হাজার মাছি মারা চাই। জয় ভারত।"

২৮শে মে তারিখের মধ্যে বোঝা গেল যে এই হাজার মাছির টার্গেটটি ভুল, কারণ প্রতিজনে হাজার মাছি মারলে কটি মাছি আর মরবে। আগের দিন রাত্রে কয়েকটি শহরে পশ্চিমী বাতাসের সঙ্গে পঙ্গপালের ঝাঁকের মত মাছিরা উড়ে এসেছে। কলিকাতা শহরে মাছিদের গুঞ্জন ধ্বনি এমনই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে ট্রাফিকের কলকোলাহল চাপা পড়ে গিছল।

দিবালোকে রাস্তায় যানবাহন চলাচল কঠিন হয়ে উঠল। রাত্রি নটায় বেতার সংবাদে বলা হল, কলিকাতা, কইমবাটুর ও ভুবনেশ্বরে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের কাজ ব্যাহত হয়েছে।

পরদিন প্রাতে সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে কয়েকটি জরুরী কাজ বাদ দিয়ে আর সব কাজ স্থগিত রেখে সমগ্র দেশবাসীকে মাছি বিতাড়নের কাজে ব্রতী হতে বলা হল। এরা হানাদার, যে কোনও উপায়ে এদের নিঃশেষিত না করলে দেশ বিপন্ন, এই দেশের সংকটত্রাণ করা যাবে না।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জগন্নাথন দেব উপদেশ দিলেন প্রতিটি শহরের পৌর-প্রধানরা যেন দোল-উৎসবের নেড়া পোড়ার মত একটি বহ্নুৎসব অনুষ্ঠান করেন। সেই অগ্নিকুণ্ডে মৃত মাছিদের পোড়ানো হবে। এই কাজে সমগ্র পুলিশ বাহিনী ও সামরিক বিভাগের কর্মীদের সহায়তা পাওয়া যাবে। মফস্বল অঞ্চলে সেনাদলই মাছি বিতাড়নে ব্রতী হলেন। সেনাদের মুখে চাপা দেওয়ার জন্য নেটের ওড়না সরবরাহ করা হল। অনেক কন্ট্রাকটার এই মওকায় বেশ কিছু পিটে নিলেন। সাধারণ সেনাবাহিনীর কর্মীদের প্রতিষেধক টীকা দেওয়া হল।

প্রতিটি অঞ্চলে একটি করে অঞ্চলপ্রধান নিযুক্ত হলেন। তাঁরা যাতে স্বীদের অঞ্চলের নিরাপদ আশ্রয়ে অবসর যাপন না করেন তার জন্য প্রতি পাঁচজন অঞ্চলপ্রধানের ওপর একজন মুখ্য পর্যবেক্ষকও নিযুক্ত করা হল।

রীতিমত যুদ্ধ।

এর পর দুইদিন তেমন বিশেষ উন্নতি দেখা গেল না। তবে আবহাওয়া ভারতের দুর্গত জনগণের সহায়ক হল। কদিন দেশের সর্বত্র লাগাতার বৃষ্টি নামল। এই-জাতীয় প্রবল এবং অবিরাম বৃষ্টি অনেকদিন দেখা যায় নি। এই বর্ষণে কিছু মাছি আত্মগোপন করে থাকলেও একটা মোটা অংশ জলে ভেসে গেল। আত্মগোপনকারী মাছির সংখ্যা তেমন বেশী নয়। আরও বৃষ্টির জন্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রার্থনা সভা বসল।

পয়লা জুন। বেশ কাটল। মাছির সংখ্যা অনেক কম, আকারেও বেশী বড় নয়। কিন্তু সসারাম থেকে সংবাদ এল সদ্যোজাত মাছিদের আকৃতি বিরাট এবং তাদের ওজনও শতকরা পঁচিশ ভাগ বেশী। পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অনুরূপ সংবাদ দেশের অন্য প্রান্ত থেকে আসতে লাগল।

পণ্ডিত গজানন গ্যাডগিল একজন কীটতত্ত্ববিদ্। তিনি জানালেন যে গড়পড়তা প্রতিটি স্ত্রী মাছি পূর্বে মাত্র ১৫০টি ডিম্ব প্রসব করত। এখন করে ৫০০টি ডিম্ব প্রসব। এই হারে যদি মাছি জন্মায় তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

৪ঠা জুন কানপুর, দেবাদুন এবং দানাপুরে বেসব মাছি ধরা পড়ল তাদের ওজন অনেক বেশী, তাদের দেহের অনুপাতে ডানা ছোট, ফলে উড়তে পারে না। কোনোরকমে বুকে হাঁটে।

এর ফলে ভাল হল, মাছিরা আর উড়তে পারে না, ফুটপাথে, পথে, ঘাটে পড়ে থাকে, শুধু মাড়িয়ে গেলেই হল। কোটি কোটি মাছি পায়ের তলায় চাপা পড়ে মরতে থাকে।

এই মাসের শেষে অবস্থা আয়ত্তাধীনে এল তবে আশ্বিন মাসের পূর্বে আর স্বাভাবিক অবস্থায় দাঁড়ালো না। চারদিক থেকে যে সব রিপোর্ট আসতে লাগল তাতে মনে হল মেঘ কেটে গেছে।

'এক্স—০৯' এর সমস্ত স্টক ধ্বংস করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী বছর অর্থাৎ ২০০২ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে জানা গেল স্বাভাবিক আকৃতির মাছিরা আবার দেখা দিয়েছে।

তামিলনাড়ুর ভেঙ্কটরত্নম মুদেলিয়র লোকসভায় ভাষণ প্রসঙ্গে বললেন—'এক্স—০৯'-এর ঘটনা যেন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে মানুষ প্রকৃতির ওপর হাত দিতে পারে না। প্রকৃতির বাইরে একটা বোম্বারকে আমরা বোম্বার বলি, ট্যাঙ্ককে ট্যাঙ্ক-ই বলি। যদি বোম্বারের ডানাটা নিয়ে ট্যাংকে বসাই তাহলে কী বীভৎস কিম্ভূত সৃষ্টি হবে। গত গ্রীষ্মে স্বয়ং বিধাতার করুণায় আমরা বেঁচে গেছি। অস্ট্রেলিয়ার খরগোস থেকে কি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল বা আমেরিকার জিপসি মথের কথা আমরা ভুলে গেছি। গত বছর আমরা এমন নির্বোধের মত কাজ করেছি যে হাত-পা ফোলার ব্যাধির দাওয়াই হিসাবে যা সৃষ্টি করেছি তার দ্বারা পরের ডানা গজায়, তারা স্বচ্ছন্দে আকাশে উড়তে পারে।"

চারদিক থেকে প্রচণ্ড হাততালি পড়ল। সেই ভেঙ্কটরত্নম মুদেলিয়র বললেন—"মাছিরা কোথায় যায় এই চিন্তা না করাই ভাল্যে—এক্স—০৯-এর আবিষ্কর্তার পদ্মভূষণটা ফিরিয়ে নিন। তাঁকে অন্য কোনো ভূষণে সম্মানিত করুন।"

সকলের অট্টহাস্যে সভাগৃহ মুখরিত হল।

মুকুন্দপুরে অধ্যাপক হরিহর পাত্রের চায়ের পেয়ালায় একটি মাছি এসে ধীরে ধীরে বসল। অধ্যাপক মৃদুহেসে সস্নেহে বললেন—খা বেটা, একটু চা খা। তোরা না থাকলে আমার চাকরীই থাকত না।

কারণ, শ্রীহরিহর পাত্রই এখন মাছি-নিবারক অধিকর্তার একান্ত সচিব এবং প্রধান জনসংযোগ রক্ষাকারক।

চার্লস ডিকেন্স

রাধারমণ মিত্র

লেখকের জীবনের চেয়ে তাঁর রচনার আকর্ষণ বেশি। জীবনের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তা লেখক তাঁর লেখার মধ্যে নিঃশেষে দান করেন। যাঁর বই পড়ে পাঠক হেসেছে, কান্নায় উথলে উঠেছে, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পর তাই স্বপ্নভঙ্গের বেদনা ভোগ করতে হয় প্রায়ই। ব্যতিক্রম আছেন কয়েকজন। এঁদের জীবন একটি মহাগ্রন্থের মতো, যা বারবার পড়লেও পুরনো হয় না। চার্লস ডিকেন্স সেই মুষ্টিমেয় লেখকদের একজন। তাঁর রচনা তাঁর জীবনের কয়েকটি বিচ্ছুরিত স্ফুলিঙ্গ। তাঁর জীবন তাঁর রচনাবলীর চেয়ে ছিল অনেক বড়। সমকালীন পাঠক সেই জীবনের সঙ্গে পরিচিত হতে না পারলে হয়তো সেদিন এমন করে তাঁর গ্রন্থাবলীকে গ্রহণ করতে পারত না।

১৮১২ খ্রীস্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারি এক নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে চার্লস ডিকেন্সের জন্ম হয়। বাবা জন ডিকেন্স নেভি পে আপিসের কেরাণী,—মাসিক বেতন শ' আড়াই টাকা। তখনকার দিনে এ টাকায় সংসার মোটামুটি চলে যাবার কথা। কিন্তু জন ছিলেন ঘরাবরই বেহিসেবী, আয়ের কথা ভেবে ব্যয় করা তাঁর স্বভাবে ছিল না। তাই প্রায়ই তাঁকে দেনায় জড়িয়ে পড়তে হত। পাওনাদারদের তাগিদ ছিল জীবনের নিত্য সঙ্গী। দেনার দায়ে তাঁকে জেলেও যেতে হয়েছে। ডিকেন্স জ্ঞান হবার পর থেকেই কুশ্রী দারিদ্র্যের পরিচয় লাভ করেছেন। আর ছেলেবেলা থেকেই সকলের কাছে শুনতেন, এই দারিদ্র্যের জন্য দায়ী তাঁর বাবা। তবু বাবার উপর কোনো বিদ্বেষ ছিল না তাঁর। সরল, আমুদে, স্নেহশীল কিন্তু উড়নচণ্ডী এই লোকটির উপর ডিকেন্সের ছিল গভীর মমতা। ডেভিড কপারফিল্ডের চিরদরিদ্র বন্ধু হিসাবে অমর করে রেখেছেন তাঁকে। মিকওবার চরিত্রটি ইংরেজী ভাষার অভিধানে ডিকেন্সের আরও অনেক চরিত্রের মতো স্থান পেয়েছে বিশেষ অর্থে। যে অলস ব্যক্তি নিজে উদ্যোগী না হয়ে কেবল আশা করে থাকে কিছু একটা সুরাহা হয়ে যাবেই, ইংরেজীতে তাকেই বলে মিকওবার।

একদিকে দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা, অন্যদিকে অর্থের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা—এই দুই পরস্পর বিরোধী মানসিকতার মধ্যে ডিকেন্সের ছেলেবেলা কেটেছে। বাবাকে কেন্দ্র করে যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল মামাবাড়িতেও তার অভাব ছিল না। দাদামশাই সরকারী তহবিলের লাখ খানেক টাকা তসরুফের দায়ে অভিযুক্ত হন। দেশত্যাগ করায় কারাবাস এড়াতে পেরেছিলেন।

ডিকেন্সের বয়স যখন মাস ছয়েক, তখন থেকেই পরিবারের আর্থিক অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। ভালো বাড়ি থেকে বাবা উঠে এলেন অপেক্ষাকৃত কম ভাড়ার ছোট বাড়িতে। এরপর কেবলই চলেছে বাড়ি বদল; আর চাকরিতে স্থান পরিবর্তন। ল্যাণ্ডপোর্ট থেকে লণ্ডন, লণ্ডন থেকে চ্যাথাম, আবার লণ্ডন। চার্লস নিয়মিত স্কুলে পড়ার সুযোগ পান নি। বাবার চাকরিতে বদলি এর কারণ নয়। অর্থাভাবটাই বড় কথা। সামান্য ইংরেজী শিক্ষা এবং ল্যাটিন বর্ণমালার প্রথম পাঠ মা'র কাছেই হয়েছিল। চ্যাথামে থাকবার সময় কিছুদিনের জন্য স্কুলে পড়বার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেখানকার শিক্ষক উইলিয়ম গাইল্‌স্ চার্লসের কল্পনাবিলাসী মন উদ্দীপ্ত করেছিলেন নানা গল্প বলে।

বালক চার্লস রোমাঞ্চকর আনন্দের উৎস আবিষ্কার করেছিলেন বাবার একটা পুরনো কাঠের বাক্সে। চিলেকোঠায় পড়ে থাকত বড় বাক্সটা। ডালা খুলে চার্লস একদিন বের করে আনলেন চামড়ায় বাঁধানো সোনার জলে নাম লেখা মোটা মোটা বই: ডন কুইকসট, রবিনসন ক্রুসো, টম জোন্স, ভিকার অব ওয়েকফিল্ড ইত্যাদি। বইয়ের রাজ্যে মন বন্দী হয়ে পড়ল। সব বোঝা যায় না; কিন্তু একটা অচেনা মায়াময় জগতের আভাস পাওয়া যায়। অভাব-অনটন, মা-বাবার কলহ, স্বচ্ছল পরিবারের ছেলেদের অনুকম্পা—এই সব থেকে অনেক দূরে চলে যাওয়া যায় বইয়ের মধ্যে ডুব দিয়ে।

বারাও বুঝতে পেরেছেন, চার্লস তাঁর অন্য সাতটি ছেলেমেয়ের মতো নন। অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ, বড় বেশি অভিমানী এই ছেলের ওপর টান তাঁর সবচেয়ে বেশি। যদিও স্কুলে পড়াবার সামর্থ নেই, সর্বদা সে জন্য নিজেকে অপরাধী মনে হয়, তবু তাঁর বিশ্বাস চার্লস একদিন পরিবারের আশার গণ্ডী অতিক্রম করে অনেক বড় হবেন। কেমন করে তা জানা নেই। বন্ধুদের আপিস থেকে আমন্ত্রণ করে আনেন। চার্লস তাঁদের কবিতা বা ন্যাট্যাংশ আবৃত্তি করে শোনান। চার্লসের কল্পনাদীপ্ত চোখ, টলমল মুখশ্রী এবং আবেগোপ্লুত কণ্ঠস্বর তাঁদের মুগ্ধ করে। ভবিষ্যৎ জীবনে ডিকেন্সের অভিনয় প্রীতির পটভূমিকা এইভাবেই রচিত হয়েছিল।

চার্লসের বয়স যখন এগারো তখন বাবা বদলি হলেন চ্যাথাম থেকে লণ্ডনে। জন ডিকেন্স ছটি সন্তানের পিতা। সংসার কিছুতেই চলছে না। লণ্ডন যাবার ঠিক আগে বাড়ির পুরনো কিন্তু বড় প্রিয় চেয়ার-টেবিলগুলি বিক্রি করে দেওয়া হলো। লণ্ডনে এসে চার্লসের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠল। স্কুল নেই, সর্বদা কেবল অভাবের কথা। পাওনাদাররা এসে বাড়িতে চড়াও হয়। বাবা ঘরের এক কোণে আত্মগোপন করে থাকেন। তাদের অপমানজনক কথাগুলি কিশোর বালককে চাবুক মারত। চার্লসের একটা বড় কাজ ছিল পাড়ার মহাজনদের দোকানে দোকানে ঘোরা। মা ঘরের বাসন-কোসন তাঁর হাতে তুলে দিতেন। চার্লস সেই সব বন্ধক দিয়ে টাকা নিয়ে আসতেন। সেদিন চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এসেছিল যেদিন পুরনো কাঠের বাক্সটা খুলে একে একে প্রিয় বইগুলিকেও দোকানে নিয়ে যেতে হয়েছিল।

এই যন্ত্রণাদায়ক পরিবেশ থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায় ছিল লণ্ডনের অলি-গলিতে ঘুরে বেড়ানো। দশ মাইল পনেরো মাইল বেড়ানো ছিল প্রায় প্রাত্যহিক ঘটনা। কিন্তু এই স্বাধীনতাটুকুও বেশি দিন রইলো না। পরিবারের এক আত্মীয় প্রস্তাব দিলেন, 'চার্লস কেন মিথ্যে বসে আছে! আমার শিশি-বোতলের কারখানায় কাজে ঢুকে পড়ুক।'

মা-বাবা সম্মতি দিলেন। দিনে বারো ঘণ্টা খাটুনি। সপ্তাহে ছয় শিলিং মজুরি। চার্লসের আশা ছিল, মা-বাবা তাকে এই বয়সেই এমন কঠোর মজুরের কাজে নিশ্চয়ই যেতে দেবেন না। পড়াশুনা করবে, থিয়েটার করবে, লিখবে,—কত স্বপ্ন ছিল! সব এক মুহূর্তে ভেঙ্গে গেল। সংসারের বোঝা, একজনকে কম খাওয়াতে হলেই মা-বাবার স্বস্তি। বুকভরা অভিমান নিয়ে চার্লস কাজে যোগ দিলেন।

এর অল্পদিন পরেই দেনার দায়ে জন ডিকেন্সকে গ্রেফতার করা হলো। সে সময় ঋণীর পরিবারকে জেলে থাকতে দেওয়া হতো। ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সরকারের। মা অন্য ভাই-বোনদের নিয়ে জেলের মধ্যে চলে গেলেন। চার্লসকে ফ্যাক্টরির কাছে থাকবার জায়গা খুঁজে নিতে হলো। একটা কাঠের গুদামের উপরে ছোট্ট ঘর; কন্‌কনে ঠাণ্ডা, কিন্তু সস্তা ভাড়া। বারো বছরের কিশোর এই প্রথম একা থাকছেন। রাত্রিতে বড় ভয় করে। ভূতের, আরো কত কিছুর ভয়। তার উপর মাঝে মাঝে কিডনির দুঃসহ ব্যথা। রাত্রিতে ব্যথা উঠলে কাউকে কাছে পাবার উপায় নেই। আশঙ্কা হয় রাতটা বুঝি কাটবে না, আর ভোরের আলোতে চোখ খুলবে না। এই দুঃখের দিনগুলির কথা চার্লস কোনোদিনই ভুলতে পারেন নি। নানা কাহিনীতে বারবার এই বেদনার ইতিহাস স্থান পেয়েছে।

এক আত্মীয়ের উইল থেকে আকস্মাৎ কিছু টাকা পাওয়ায় জন ডিকেন্স ঋণ শোধ করে কারামুক্ত হতে পারলেন। কাজ ছাড়িয়ে ছেলেকে বাড়ি নিয়ে এলেন তিনি। আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য নয়, এ ধরণের কাজে বংশমর্যাদার হানি হয় বলে। কিন্তু মা এর জন্য ঝগড়া শুরু করে দিলেন। ছেলেকে বাড়িতে বসিয়ে খাওয়াবে কে? আর্থিক সামর্থ কই। মা চেয়েছিলেন, চার্লস আবার শিশি-বোতলের কারখানায় কাজে যাক। ডিকেন্স এ জন্য মাকে কখনো ক্ষমা করতে পারেন নি। অনেক দোষ থাকা সত্ত্বেও বারাকে ভালবাসতেন, মাকে নয়। মা'র সম্বন্ধে অনেক কঠোর মন্তব্য করেছেন; তাঁর যত্ন নেওয়ার কথা মনে হয় নি; এমন কি, মৃত্যুর পরে কবরের উপর স্মৃতি-ফলকে কিছুই লেখেন নি তাঁর সম্বন্ধে।

পরিণামের কথা না ভেবে বাবা চার্লসকে ফ্যাক্টরির কাজে ফিরে যেতে দিলেন না। কোথা থেকে টাকা আসবে তার হিসেব না করেই ছেলেকে ভর্তি করিয়ে দিলেন লণ্ডনের এক স্কুলে। বছর দুই মাত্র সেখানে পড়া হলো। তারপরে মাত্র পনেরো বছর বয়সে চার্লস এক সলিসিটরের আপিসে কনিষ্ঠ কেরাণির চাকরিতে ঢুকলেন। কিন্তু এই বৈচিত্র্যহীন কাজ তাঁর ভালো লাগত না। তাঁর ইচ্ছা সাংবাদিক হবার। পয়সা আর বৈচিত্র্য দুই-ই আছে। কিন্তু সাংবাদিকতায় সাফল্য লাভ করতে হলে দুটি শর্ত পালন করতে হবে। এক, নানা বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান থাকা চাই। এর জন্য চার্লস ব্রিটিশ মিউজিয়মের মেম্বার হয়ে গেলেন। সময় পেলেই চলে যেতেন সেখানকার রীডিং রুমে, পড়তেন নানা বিষয়ের বই। দুই, গ্রতি করতে হলে জানা চাই শর্টহ্যাণ্ড। পার্লামেণ্টের বক্তৃতার রিপোর্ট নির্ভুল হলেই কৃতিত্ব। আর এর জন্য শর্টহ্যাণ্ডের জ্ঞান অপরিহার্য। অল্প সময়ের মধ্যে চার্লস চমৎকার আয়ত্ত করে ফেললেন শর্টহ্যাণ্ডের কৌশল। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে তাঁকে। অল্পদিনের মধ্যেই দেখা গেল এই নবযুবক সঠিক রিপোর্টিং-এ অনেক প্রবীণ সাংবাদিককেও হার মানিয়েছে। সুতরাং চাকরি পেতে অসুবিধা হলো না।

সাংবাদিক হবার পূর্বে চার্লসের একবার ইচ্ছা হয়েছিল থিয়েটারে অভিনেতা হিসেবে যোগ দেবার। বিজ্ঞাপন দেখে আবেদন করেছিলেন এবং সাক্ষাৎকারের জন্য দিনও ঠিক হয়েছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে সর্দি-জ্বর হওয়ায় নিয়োগকর্তার সঙ্গে দেখা করতে পারেন নি। তা না হলে হয়তো আমরা ঔপন্যাসিক ডিকেন্সকে পেতাম না। তাঁর অভিনয়প্রীতি সারাজীবন সৌখীনই রয়ে গেছে।

সাংবাদিক হিসেবে চার্লসের বেশ নাম হয়েছে। এটুকুতে তিনি সন্তুষ্ট নন। আরও উন্নতি করতে হবে, দ্রুত উন্নতি। এর জন্য যে কোনো কষ্ট বরণ করতে তাঁর দ্বিধা নেই। কর্মোদ্যমের পশ্চাতে এসেছে নতুন প্রেরণা। ভালোবাসা। জীবনের প্রথম প্রেম ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখছেন। কিন্তু তার জন্য আরও অর্থ এবং কর্মজীবনে প্রতিপত্তি চাই। ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের মেয়েকে ঘরে আনবার স্বপ্ন দেখছেন যে।

১৮২৯ সাল। চার্লস মাত্র আঠারো বছরের যুবক। যেন যৌবন-চাঞ্চল্যের প্রতিমূর্তি। চলায় বলায় জীবনীশক্তি ঝিকমিকিয়ে ওঠে। সবচেয়ে আশ্চর্য মুখ। ভাসা ভাসা উজ্জ্বল চোখ। মুখের দিকে তাকালে যেন চলচ্চিত্রের মতো লোকটি ধরা পড়ে। লী হান্ট, শ্রীমতী কার্লাইল এবং এমনি আরও কত বিখ্যাত লোক চার্লসের মুখশ্রী দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। সেই মুখ আকৃষ্ট করল মারিয়া বীডনেলকেও। মারিয়া চার্লস-এর চেয়ে এক বছরের বড়। কিন্তু দেখে তা মনে হয় না। কঠোর দারিদ্র্যের জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে চার্লস এই প্রথম একটি স্বচ্ছল পরিবারের সুন্দরী তরুণীর সান্নিধ্য লাভ করলেন। রোমান্টিক স্বভাবের নবযুবক প্রথম আলাপেই প্রেমে পড়লেন মারিয়ার। মারিয়াও চার্লসের আকর্ষণ এড়াতে পারেন নি। চার্লস ঘন ঘন আসতেন মারিয়াদের বাড়িতে। দুজনে কত গল্প, কত কথা, কত হাসি। তাদের

উৎসবের দিন এগিয়ে এলো

এগিয়ে এলো সাজগোজের দিন। শুরু হলো রূপচর্চার মরশুম। সময় হয়েছে এবার

ফেমিলা পোর কৌটোটি হাতে তুলে নেবার।

বিশেষ দিনে রূপকে আরও বিশিষ্ট করে তোলে ফেমিলা। "ফেমিলা পো" বিশেষণের বিশেষণ। নীরবে ত্বকের গভীরে অনুপ্রবেশ করে এই আশ্চর্য জাদুকরী। ব্যবহারে প্রতিবারই মনে হয় ত্বক আরও কোমল, আরও মসৃণ, আরও স্বচ্ছ। কখনও আর এমনটি দেখায়নি আপনাকে।

বোরোলীন হাউস,
কলিকাতা-৩

যেন এক আলাদা জগৎ। আর কে আছে বাড়িতে খেয়াল নেই। সংবাদপত্রের আপিসের কাজ সেরে অনেক রাত্রিতে চার্লস ইচ্ছা করেই মারিয়াদের বাড়ির সামনেকার পথ দিয়ে ফিরতেন। হয়তো মারিয়াকে ব্যালকনিতে দেখা যাবে!

মারিয়ার মা-বাবার দৃষ্টি এড়ায় নি। ছেলেটি তো দেখতে বেশ, কথার-বার্তায়ও খুব ভালো। কিন্তু শুধু ছেলে দেখে মেয়ে দেবার মতো প্রতিষ্ঠা চার্লসের তখনও হয় নি। পরিবারের খোঁজ করতে গিয়ে তাঁরা চমকে উঠলেন। চার্লসের বাবার জেল হয়েছিল দেনার দায়ে। এমন পরিবারে মেয়ের বিয়ে কিছুতেই হতে পারে না। মারিয়ার মন ফিরিয়ে নিতে হবে। কিছুদিন দূরে থাকলেই চার্লসকে ভুলে যাবে মারিয়া। সুতরাং প্যারিস পাঠিয়ে দেওয়া হলো মারিয়াকে। চার্লস জানলেন, মারিয়া তার পড়া শেষ করতে প্যারিস যাচ্ছে।

দীর্ঘ দু'বছরের বিচ্ছেদ। চার্লসের মনে কোনো আশঙ্কা নেই। মারিয়া তো তাঁরই। অপেক্ষাটা দুর্বিসহ লাগছে। ফিরে আসতেই ছুটে গেলেন। একটু অন্যরকম। সেই আন্তরিকতা নেই। শুধু ভদ্রতা, বন্ধুত্ব। তার বেশি যেন এগুতে চায় না। মান-অভিমানের পালা হলো অনেক। কিছুদিন যাবার পর আবার যেন পুরনো মারিয়াকে ফিরে পাওয়া যায় কখনো কখনো। এক একবার মন গুটিয়ে নেয়, আবার প্রসারিত করে। দ্বন্দ্ব চলছে মারিয়ার মনে। এই দ্বন্দ্বের যত তাড়াতাড়ি অবসান ঘটে ততই মঙ্গল। চার্লসের একুশ বছর পূর্ণ হলো, এবার তিনি সাবালক। সেই উপলক্ষে পার্টির আয়োজন করা হলো। মারিয়া এই পার্টির [illegible]। কথাটা পাকা করে নেবার এই তো সুযোগ। একপাশে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। বুকে টেনে বললেন, 'তুমি আমার হবে?'

মারিয়া নিজেকে মুক্ত করে বলল, তুমি তো এখনো ছেলেমানুষ!

ছেলেমানুষ! চাবুকের ঘা খেলেন চার্লস। মাথা নিচু করে চলে এলেন। এই আঘাতে মন যে ভাঙল তা আর জোড়া লাগে নি। মারিয়া যে স্বামীর ঘর করতে গেল চার্লসের তুলনায় তাঁর বয়স এবং সামাজিক মর্যাদা দুই-ই বেশি ছিল।

চার্লস মারিয়াকে জীবনে কোনোদিন ভুলতে পারেন নি। রক্তমাংসের মারিয়া নয়। তাঁর কল্পনার মারিয়া, সমগ্র নারীজাতির প্রতীক যে রমণী, প্রথম যৌবনের সব স্বপ্ন যে রঙীন করে তুলেছিল, সে সত্যিকার মারিয়াকেও অতিক্রম করে চার্লসের হৃদয়ে অমর হয়ে রইলো। জীবনে আসে নি বলেই স্বপ্নে এমন করে বেঁচে থাকতে পেরেছে। চার্লস পরবর্তী জীবনে নানা শ্রেণীর নারীর সংস্পর্শে এসেছেন। কিন্তু আর কাউকে একান্তভাবে ভালোবাসতে পারেন নি, ভালোবেসে সুখী হতে পারেন নি। মারিয়া যে আদর্শ নারীর ছবি রেখে গেছে তার সমকক্ষ আর কেউ হতে পারে না।

সাংবাদিক যশোপ্রার্থী চার্লস যখন উপন্যাসিক হিসাবে দেশে-বিদেশে খ্যাতি লাভ করলেন, তাঁর বই যখন লোকের ঘরে ঘরে, তখন মারিয়াও আবিষ্কার করে বিস্মিত হল আজকের খ্যাতিমান লেখক তারই প্রত্যাখ্যাত প্রেমিক। বেদনাও বোধ করল নিশ্চয়। এই খ্যাতির একটা অংশও তো মারিয়াও পেত!

তারপর বাইশ বছর কেটে গেছে। ডিকেন্সের নাম এখন লোকের মুখে মুখে। 'ডেভিড কপারফিল্ড' প্রভৃতি বিখ্যাত উপন্যাসগুলি বেরিয়ে গেছে। কপারফিল্ডের ডোরা স্পেনলো মারিয়াকে মনে করেই লেখা। ডিকেন্স বিয়ে করেছেন, নটি সন্তানের পিতা; যশ ও ঐশ্বর্য জীবন পূর্ণ করেছে। তবু একা যখন থাকেন তখন প্রায়ই মারিয়ার কথা মনে পড়ে যায়। সেই অতৃপ্ত প্রেমের আকাঙ্ক্ষা জীবনের সকল সফলতাকে যেন বিস্বাদ করে দেয়।

একদিন বই পড়ছিলেন। বেয়ারা এসে একতাড়া চিঠি রেখে গেল। রোজ এমনি কত চিঠি আসে। ভক্তদের চিঠি। সব পড়বার সময় হয় না। আজও বই নামিয়ে চিঠিগুলির উপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলেন। একটি খামের উপর মেয়েলী লেখার বিশেষ ছাঁদে চোখ আটকে গেল। হঠাৎ বুকে কেমন একটা ব্যথা বোধ করলেন। না, ভুল হবার নয়। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর খুললেন ধীরে ধীরে। হ্যাঁ, মারিয়ার চিঠি। লিখেছে, ডিকেন্সের সব খবরই সে রাখে। জানিয়েছে নিজের কথা। এখন সে মিসেস উইল্টার; স্বামী ব্যবসা করেন। দুটি মেয়ের জননী। ডিকেন্স চলে গেলেন সেই প্রথম যৌবনের দিনগুলিতে। সেদিনকার মারিয়া আবার তাঁর কল্পনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যেন তাঁর বয়স হয় নি, বিয়ে করেন নি, নয়টি সন্তানের পিতা নন। সেই বাইশ বছর আগেকার জীবন ফিরে এসেছে। সেদিনকার আবেগ নিয়ে উত্তর দিলেন। একটি অপূর্ব প্রেমপত্র। মারিয়া আশ্বস্ত হল। ভোলে নি তাহলে।

মারিয়া একদিন দেখা করতে এলো। না এলে ভালো হতো। লাবণ্যময়ী তরুণী মারিয়া হারিয়ে গেছে। চুয়াল্লিশ বছরের বিপুলকায়া মহিলাকে দেখে ডিকেন্স মারিয়ার সঙ্গে কোন যোগ খুঁজে পেল না। শুধু দেহের নয়, মনেরও আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। কেমন যেন একটু নির্বোধ মনে হয়। বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য কোথায় হারিয়ে গেছে।

মারিয়া ঘনিষ্ঠ হতে চায়। থিয়েটারে, অন্যত্র, ডিকেন্সকে আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। ডিকেন্স এড়িয়ে যান; কথা দিয়েও কথা রাখেন না। মারিয়া অপেক্ষা করে করে ফিরে যায়। ডিকেন্স মারিয়ার মধ্যে তাঁর মানসীর অপমৃত্যু প্রত্যক্ষ করবার বেদনা সহ্য করতে পারতেন না, তাই এড়িয়ে চলতেন।

কয়েক বছর পরে স্বামীর ব্যবসা ফেল পড়লে মারিয়া টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিল। ডিকেন্স তাঁর অক্ষমতা জানিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরও মারিয়া ষোল বছর বেঁচে ছিল। ডিকেন্স তাকে ভালোবাসতেন একথা লোকের কাছে প্রচার করতে দ্বিধা ছিল না। প্রেতাত্মা লোলচর্ম প্রগলভা এই বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত অবিশ্বাসের সঙ্গে।

ডিকেন্স-এর জীবনে এইটে দেখা যায়। প্রেমের দেবতা বারবার তাঁকে বঞ্চনা করেছেন; অথচ সেই ব্যর্থতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লেখক হিসাবে পরপর সাফল্যের সিঁড়িগুলি পার হয়ে এসেছেন। মারিয়াদের পরিবার যখন তাঁর আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে প্রত্যাখ্যান করল তখন ডিকেন্স সঙ্কল্প করলেন জীবনে সাফল্য লাভ করতে হবে, টাকা ছাড়া অন্য কোনো পথে, যে পথে প্রতিযোগিতা করবার ক্ষমতা মারিয়াদের নেই।

কোন পথ? লেখাই তাঁর পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ পথ। রিপোর্ট তো লিখতেই হয় রোজ। আর একটু যত্ন আর অধ্যবসায় থাকলে হয়তো কিছু লেখা সম্ভব হবে। অবসর সময়ে কতকগুলি নক্সা লিখলেন। একদিন তারই একটি—'এ ডিনার ইন অপলার ওয়াক'—চুপি চুপি "মান্থলি ম্যাগাজিনের" ডাকবাক্সে ফেলে এলেন। তারপর থেকে প্রত্যেক মাসে একবার করে স্টলে দাঁড়িয়ে দেখে যান লেখা বেরুলো কি-না। ১৮৩৩ সালের শেষ ভাগে সেই আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। তাঁর লেখা বেরিয়েছে। ভবিষ্যতের পথ স্থির হয়ে গেল সেই মুহূর্তে।

স্কেচ লিখতে লাগলেন একের পর আর এক। ছাপা হতে লাগল। নিজের নামে নয়, ছোট ভাইয়ের ডাক নাম বজ্। সেই নামে। বই হিসাবে নক্সাগুলি বের হল ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে। দ্রুত কতকগুলি সংস্করণ বিক্রি হয়ে গেল। স্কেচেস্ বাই বজ্-এর নাম তখন সকলের মুখে মুখে। নতুন প্রকাশক লেখার ফরমায়েস নিয়ে এল। তাদের জন্য ধারাবাহিক লিখতে আরম্ভ করলেন 'পিকুইক পেপার্স'। ডিকেন্স এই গ্রন্থে দুটি অবিস্মরণীয় চরিত্র সৃষ্টি করেছেন—পিকুইক এবং স্যাম ওয়েলার। এই বইটি লেখক হিসাবে ডিকেন্সকে প্রতিষ্ঠিত করে।

জর্জ হগার্থ প্রখ্যাত সাংবাদিক। ডিকেন্সের সহকর্মী। সেই সূত্রে হগার্থের বাড়ি যাতায়াত করেন। তিন মেয়ে তাঁর। ক্যাথারিন বড়; তারপর কিশোরী মেরী; জর্জিনা সকলের ছোট। ক্যাথারিন সুন্দরী, সরল, পরম বিশ্বাসী। মারিয়ার কাছ থেকে আঘাত পেয়ে এমনি এক তরুণীর মধ্যে আশ্রয় পেয়ে ডিকেন্স শান্তি পেলেন। বিচার করবার শক্তি ছিল না। পিকুইক পেপার্স বেরুবার দু'দিন পরে ক্যাথারিনকে বিয়ে করে ডিকেন্স নতুন সংসার পাতলেন। ক্যাথারিন পুতুলের মতো সুন্দর, আদর করবার জিনিস। কাজ-কর্ম অগোছালো। কিছুই করে উঠতে পারে না। রান্নার কাজটাও ভালো করে জানা নেই। বছর-খানেক পরে প্রথম ছেলে হবার পর ক্যাথারিন যখন আরো অকর্মণ্য হয়ে পড়ল তখন মেজো বোন মেরি এলো ঘর সামলাতে। ষোলো বছরের মেয়ে, কিন্তু একেবারে পাকা গিন্নী। সব দেখেশুনে কাজ করতে ওস্তাদ।

ডিকেন্স মেরির মধ্যে খুঁজে পেলেন সত্যিকার অন্তরের সঙ্গী। বেড়াতে বের হন দু'জনে এক সঙ্গে; নতুন কিছু লিখলেই পড়ে শোনান মেরিকে। মেরি শুধু যে চুপ করে শোনে, তা নয়, ভালো মন্দ মন্তব্যও করে। সাহিত্যের রস উপভোগ করবার ক্ষমতা আছে। ক্যাথারিন এমন করে স্বামীর জীবনে স্থান করতে পারে নি। বই পড়বার অভ্যাস তার ছিলই না বলা যেতে পারে।

কিন্তু মেরির সাহচর্যের আনন্দ বেশি দিন ডিকেন্স পান নি। একদিন দু'জনে থিয়েটার দেখে ফেরার একটু পরেই হঠাৎ মেরি অসুস্থ হয়ে পড়ল। তার পরদিন মেরি ডিকেন্সের বুকে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। মেরি যে তাঁর জীবনে কত বড় স্থান অধিকার করেছিল ডিকেন্স তা পূর্বে কখনো উপলব্ধি করতে পারেন নি। হঠাৎ যেন সংসার থেকে সমাজ থেকে সকল আলো নিভে গেল। মেরিকে হারাবার বেদনা তিনি কখনো ভুলতে পারেন নি। মেরির আংটি তিনি আজীবন নিজের হাতে পরেছেন। "ওল্ড কিউরিসিটি শপ"-এর লিটল নেল চরিত্রের মধ্যে ডিকেন্স মেরিকে অমর করে রেখেছেন। নেলও মেরির মতোই অল্প বয়সেই মারা গিয়েছিল। ডিকেন্স তাঁর ভক্তদের কাছ থেকে অসংখ্য চিঠি পেতেন। নেলের যেন মৃত্যু না হয়। ডিকেন্সও তো তাকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন; কিন্তু নিয়তির অমোঘ নিয়ম। ডিকেন্স লেখক হিসাবে কতটুকু করতে পারেন? নেলের মৃত্যু তাঁকে দেখাতে হল। ইংলণ্ডে সেদিন সার্বজনীন শোকের ছায়া পড়ল। ল্যাণ্ডর ও কার্লাইলের চোখ দিয়ে জল পড়েছে নেলের মৃত্যুর বর্ণনা পড়ে। কতো উচ্চ-মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি রেল গাড়িতে ও অন্যত্র প্রকাশ্যে কাঁদতে লাগলেন নেলের দুঃখে। আজকাল অবশ্য কোনো কোনো সমালোচক বলেন, এটা ডিকেন্সের সস্তা ভাবাবেগ ছাড়া আর কিছু নয়। ডিকেন্সের রচনার একটি ত্রুটি। কিন্তু আজকের রুচি দিয়ে সেদিনকার সাহিত্যকে যথার্থ বিচার করা চলে না। সেদিন ইংলণ্ড ও আমেরিকার পাঠক-পাঠিকারা নেলের শোকে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, একথা সত্য।

"পিকুইক পেপারস্"-এর পরেই ডিকেন্স পাঠকদের হাতে তুলে দিলেন নতুন উপন্যাস "অলিভার টুইস্ট" (১৮৩৮)। সমাজবিরোধীদের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন লেখক। অসহায় শিশুদের উপর ওয়ার্ক হাউসে যে অমানুষিক অত্যাচার করা হতো তারই মর্মন্তুদ বিবরণ এই কাহিনীতে পাওয়া যাবে। প্রকৃতপক্ষে ডিকেন্সের উদ্দেশ্য ছিল পুওর ল'-এর নিষ্ঠুর ধারাগুলির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। এই উপন্যাসের সফলতা থেকে ডিকেন্স উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তাঁর শক্তির উৎস কোথায়। সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি অক্লান্ত ভাবে লিখে গেছেন। পরের বছর বের হল নতুন উপন্যাস "নিকোলাস নিকলবি"। শিক্ষার নামে যে ব্যবসা চলছিল তখন ইংলণ্ডে ডিকেন্স তারই মুখোস খুলে দিয়েছেন। "দি ওল্ড" "কিউরিসিটি শপ" এবং "বারনাবি রজ্" একই সঙ্গে বের হয়। প্রথমটিতে আমরা অনেকগুলি অবিস্মরণীয় চরিত্রের মিছিল পাই। কিন্তু লিটল নেল অন্য সবাইকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। স্কটের আদর্শে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার প্রয়াস "বার্নাবি রজ্"।

সস্ত্রীক আমেরিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে লিখলেন "মার্টিন চাজলউইট"। আমেরিকার জীবনযাত্রার সমালোচনার জন্য স্বভাবতই এ উপন্যাস ওদেশে সমাদর লাভ করে নি। আমেরিকা তখন কোন মূল্য না দিয়েই যে কোনো বই ছাপিয়ে নিত। এ ব্যাপারের প্রতিকারের জন্য ডিকেন্স যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কপিরাইটের সুবিধা তিনি নিজে ভোগ করে যান নি। এই আন্দোলনের জন্য এবং আমেরিকানদের সম্বন্ধে মার্টিন চাজলউইটে বিরূপ মন্তব্য থাকায় ওদেশে তাঁর জনপ্রিয়তা অনেকটা কমে গিয়েছিল।

"ডেভিড কপারফিল্ড" ডিকেন্সের নিজের মতে তাঁর সবচেয়ে ভালো বই। এই আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে অন্যান্য অনেক পরিচিত চরিত্রের মধ্যে আছে বাবা এবং মারিয়ার প্রতিচ্ছবি। সমালোচকরা ডিকেন্সের উপন্যাসের মধ্যে "ব্লীক হাউসকে" শ্রেষ্ঠ বলে অভিমত দিয়েছেন। লাল ফিতার ফাঁস এবং বিচারের বিলম্ব যে জীবনে কত বড় ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করতে পারে, এই উপন্যাসে তাই দেখিয়েছেন লেখক। 'হার্ড টাইম্স'-এ ডিকেন্স তাঁর উদ্দেশ্য গোপন রাখবার কোনো চেষ্টা করেন নি। সমাজে যারা অবহেলিত ও অত্যাচারিত, ডিকেন্স তাদের পক্ষ নিয়ে কথা বলেছেন। এখানে শিল্পনগরী ম্যাঞ্চেস্টারে শ্রমিকদের যে পশুর মতো জীবনযাপন করতে হয় তার বিরুদ্ধে ডিকেন্স কলম ধরেছেন। মনে হয় কোথাও কোথাও শিল্পীর নিরপেক্ষতা অতিক্রম করে লেখকের ক্রোধ প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর চোখে সকল শ্রমিক আদর্শ চরিত্রের মানুষ এবং সকল মালিক দানব। খ্রীস্টান অনুকম্পার প্রয়োগ ছাড়া শ্রমিক-মালিক বিরোধের জন্য অন্য কোনো মীমাংসা তিনি উপস্থিত করতে পারেন নি। এর পরে প্রকাশিত হয় "লিটল ডোরিট"। অধমর্ণদের অবস্থা, বিশেষ করে জেলের অভ্যন্তরে তাদের জীবনের কথা এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। কার্লাইলের 'ফ্রেঞ্চ রিভলিউশনের' প্রভাবে এর পরে তিনি লিখলেন "এ টেল অব টু সিটিজ্"। এটি তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাস-গুলির অন্যতম।

সার্থক শিল্পকলার দিক থেকে "গ্রেট এক্সপেকটেশান" (১৮৬১) ডিকেন্সের শেষ উপন্যাস। নায়ক পিপের ভাগ্যবিপর্যয়ের এবং সেই সঙ্গে এস্টেলাকে লাভ করে জীবন পূর্ণ হবার আশার মধ্যে কাহিনীর সমাপ্তি।

'আওয়ার মিউচুয়াল ফ্রেন্ড' (১৮৬৫) ডিকেন্সের সর্বশেষ সম্পূর্ণ উপন্যাস। 'দি মিস্ট্রি অব এডুইন ড্রুড' ডিকেন্স সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। আরেও কয়েকটি বই—বিশেষ করে ভ্রমণ কাহিনী এবং ছোটগল্প লিখেছেন।

ডিকেন্স সমকালীন ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁর জীবিত-কালেই কোনো কোনো উপন্যাস লক্ষাধিক কপি বিক্রি হয়েছিল। তিনি অধিকাংশ কাহিনী রচনা করেছেন সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায়। এক সঙ্গে দু-তিনটি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে লিখেছেন। পাঠকরা প্রত্যেকটি কিস্তির জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। কোন চরিত্রের কি হবে তা জানতে লেখককে চিঠি দিত। পাত্র-পাত্রীদের সুখ-দুঃখ সমগ্র পাঠক-সমাজের সুখ-দুঃখে পরিণত হতো। পাঠকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য ডিকেন্স ব্যগ্র ছিলেন। এই যোগাযোগ হত দু'ভাবে। নাটক অভিনয় করতেন মাঝে মাঝে। আর নিজের লেখা থেকে পাঠ করতেন; শত শত লোক শোনবার জন্য ভীড় করত। পাঠ শোনাবার জন্য দর্শনীর

ব্যবস্থা ছিল। প্রথম কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের জন্য ডিকেন্স পাঠ করতেন; তারপরে অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যেই নিয়মিত পাঠ করতে হতো তাঁকে। উপার্জন হতো প্রচুর। বিশেষ করে দ্বিতীয়বার আমেরিকা ভ্রমণ করতে গিয়ে বহু জায়গায় পাঠের আয়োজন করে বর্তমান মূল্যের প্রায় চার লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন।

কিন্তু একালের সমালোচকরা ডিকেন্সের রচনায় অনেক ত্রুটি দেখতে পান। সহজ ভাবপ্রবণতা, নাটকীয়তার আধিক্য, টাইপ চরিত্রের প্রাচুর্য এবং অনেক ক্ষেত্রে প্লটের শৈথিল্যের জন্য তাঁর রচনার এক বৃহৎ অংশের শিল্পগুণ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কিন্তু এই সব ত্রুটিগুলি পাঠকদের নিকট বড় হয়ে দেখা দেবার সুযোগ পায় নি। কারণ ডিকেন্স তাঁর কাহিনী কেন্দ্র করে এমন একটি জগৎ সৃষ্টি করতেন যেখানে প্রবেশ করলে সব কিছু সহজ ও স্বাভাবিক মনে হতো। আজকের নতুন পরিবেশে ডিকেন্সের রচনার আকর্ষণ নিশ্চয়ই অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু তাঁর উপন্যাসে আধুনিক চিন্তাধারার অভাব নেই। সমাজের অত্যাচারিত ও অবহেলিত অংশের জন্য তাঁর গভীর সহানুভূতি ছিল। একালের কোনো কোনো সমালোচক তাঁকে মার্ক্সবাদী বলে দাবী করেছেন। "লিটল ডোরিট"-এ জেলখানার অব্যবস্থার কথা আছে। মনে হয় সমাজও তার নানা বিধি নিষেধের সমষ্টি নিয়ে এক বৃহত্তর কারাগার মাত্র। বার্নার্ড শ' এ বই সম্বন্ধে বলেছেন, মার্ক্সের ক্যাপিট্যালের চেয়েও অধিকতর রাজদ্রোহজনক।

"লিটল ডোরিট" শেষ করে আর কোনো লেখা আরম্ভ করতে পারছেন না বলে ডিকেন্সের মন অস্থির। এই অস্থিরতার মধ্য দিয়েই এমন এক দুর্বলতা এলো তাঁর জীবনে যার ফল হয়েছিল বিষময়। উইলকি কলিন্স বয়সে অনেক ছোট হলেও তখন ডিকেন্সের অন্তরঙ্গ সহচর। কলিন্সের লেখা একটি নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা হলো। ডিকেন্স এবং আরও অনেকের সঙ্গে সেই অভিনয়ে যোগ দিয়েছিলেন ষোড়শী এলেন টারনান। ছেচল্লিশ বছরের প্রৌঢ় এলেনের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। এলেনের মধ্যে পেতে চাইলেন মারিয়া বীডনেলকে।

এলেনের প্রতি আকর্ষণ হয়তো ক্যাথারিনের সঙ্গে বিচ্ছেদের প্রত্যক্ষ কারণ। ডিকেন্স বিবাহে সুখী হতে পারেন নি। ক্যাথারিন তাঁকে দশটি সন্তান উপহার দিয়েছে; কিন্তু সঙ্গিনী হতে পারেনি। খ্যাতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ডিকেন্সের সামাজিক দায়িত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। তার অংশ গ্রহণ করবার মতো গৃহিণী নেই। লেখা সম্বন্ধে দুটো কথা বলা যায় না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন ডিকেন্স। সর্দি, কাশি, স্নায়বিক দুর্বলতা, পায়ে বাতের যন্ত্রণা এবং সর্বদা প্যারালিসিস হবার আশঙ্কা। এর জন্য যে সেবা-যত্ন প্রয়োজন ক্যাথারিনের পক্ষে তার দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁর নিজের স্বাস্থ্যও এখন ভেঙ্গে পড়েছে। একমাত্র রূপ দেখেই ডিকেন্স মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেই রূপও হয়েছে অন্তর্হিত। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এখন আছে কেবল খিটিমিটি, সর্বদা অশান্তি। এলেন তাঁদের মধ্যে আসায় অশান্তি আরো বাড়ল।

এই অশান্তির মধ্যে লেখার কাজ অসম্ভব। তাই ক্যাথারিন এবং ডিকেন্স স্থির করলেন তাঁরা পৃথক থাকবেন। শুধু বড় ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাথারিন চোখের জল ফেলতে ফেলতে অন্য বাড়িতে চলে গেলেন। এরপর থেকে তাঁর জীবনে রইলো একমাত্র গৌরব, একদিন ডিকেন্সের মতো প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ভালোবেসে তাঁকে বিয়ে করেছিলেন।

অন্য ছেলেমেয়েদের নিয়ে রইলেন ডিকেন্স। তাঁর সংসার দেখতে রয়ে গেলেন জর্জিনা, ক্যাথারিনের কনিষ্ঠা ভগ্নী। নিজের ঘর বাঁধবার বাসনা ত্যাগ করে ডিকেন্সের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। শান্ত, বুদ্ধিমতী এবং সকল কাজে তৎপর। ডিকেন্স নতুন লেখা তাঁকে পড়ে শোনাতেন; কখনো বলে যেতেন, লিখে নিতেন জর্জিনা। ডিকেন্স জর্জিনার প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমুখ। একি জর্জিনার শুধুই নিঃস্বার্থ সেবা? ভালোবাসার কোনো আকর্ষণ ছিল না? হ্যাঁ, অভিযোগ উঠেছে দিদির কাছ থেকে। জর্জিনার মা-ও এই নিয়ে তিরস্কার করেছেন। কিন্তু সকল অপবাদ মাথায় করে জর্জিনা ডিকেন্সের সেবা করে গেছেন।

জীবনের শেষ ক'বছর ডিকেন্সের স্বাস্থ্য ধীরে ধীরে ভেঙ্গে পড়ছিল। যশ ও প্রতিষ্ঠা যত বাড়ছিল তিনি যেন ততই অক্ষম হয়ে পড়ছিলেন। রাণী ভিক্টোরিয়া আলাপ করবার জন্য ডেকেছেন তাঁকে। খুব সম্মানের কথা। কিন্তু রীতি অনুসারে দেড় ঘণ্টা যাবৎ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হলো। রাণীর সামনে বসতে নেই। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পায়ের ব্যথাটা অসহ্য হয়ে উঠল। মনে হলো, সম্মানের চেয়ে স্বস্তি ভালো।

স্বাস্থ্য খারাপ হবার একটা বড় কারণ ছিল তাঁর উপর নানা দিক থেকে অর্থের দাবী। নিজের তো বৃহৎ সংসার। ছেলেরা কেউ তেমন কিছু সুবিধা করতে পারেনি। তাছাড়া ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন সকলেই সাহায্যের প্রত্যাশী। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে লেখার পরিমাণ কমে যাচ্ছে। সুতরাং আয়ের অন্য পথ বেছে নিতে হলো। অর্থের বিনিময়ে নিজের বই থেকে পাঠ করে শোনানো। নগদ টাকা পাওয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে। পরিশ্রমও কম নয়। পড়তে পড়তে শ্রান্ত হয়ে পড়তেন। শ্রোতাদের সম্বর্ধনা তাঁকে উৎসাহ দিত, প্রেরণা যোগাত। প্রায় সাড়ে চারশ' পাঠের আসরে তিনি বিভিন্ন বই থেকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন। প্রত্যেক আসরে তিনি পারিশ্রমিক পেতেন একশ' পাউন্ড। মৃত্যুকালে তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ছিল তিরানব্বই হাজার পাউন্ড। এর প্রায় অর্ধেকই উপার্জন করেছিলেন আবৃত্তি করে।

আটান্ন বছর বয়সেই ডিকেন্স একেবারে বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের ৮ই জুন। সারাদিন "এডুইন ড্রুডের" কাহিনী লিখেছেন। সন্ধ্যার সময় খাবার টেবিলে এসে বসেছেন। টেবিলের উল্টো দিক থেকে জর্জিনা তাঁর মুখে বেদনার চিহ্ন দেখে চমকে উঠল। ডিকেন্স একটু বেদনার সঙ্গে বললেন, ঘণ্টাখানেক যাবৎ বড় ব্যথা হচ্ছে। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন; বললেন, আমাকে এক্ষুণি একবার লণ্ডন যেতে হবে।

লণ্ডন দূরের কথা, একটি পা ফেলতে গিয়েই পড়ে যাবার উপক্রম হলো। জর্জিনা তাড়াতাড়ি ধরে না ফেললে মেঝেতে পড়ে যেতেন। সহচরদের সহায়তায় জর্জিনা ডিকেন্সকে সোফার উপর শুইয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো শ্বাস কষ্ট। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের কাছে খবর পাঠানো হলো। পরদিনও অচেতন অবস্থায় রইলেন। ছেলে-মেয়ে, ঘনিষ্ঠ বন্ধু, এলেন টারনান-সবাই শেষ দেখা দেখতে এসেছেন। শুধু ক্যাথারিনকে খবর দেওয়া হয় নি। ৯ই জুন সন্ধ্যায় একটু নড়ে উঠল ডিকেন্সের দেহ। ডান চোখ থেকে এক ফোঁটা জল বেরিয়ে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। আর সেই সঙ্গেই সব শেষ। মৃত্যুর পরে খবর পাঠানো হলো ক্যাথারিনকে। ক্যাথারিন আসেন নি।

ডিকেন্সের ইচ্ছা ছিল তাঁর সমাধি হবে অনাড়ম্বর। দেশের লোক দাবী তুলল লণ্ডনে এনে যেখানে খ্যাতনামা ইংরেজ লেখকদের সমাধি সেই ওয়েস্ট মিনস্টার অ্যাবিতে কবর দিতে হবে। এই দাবী মেনে নেওয়া হলো। কিন্তু শোকযাত্রায় কোনো আড়ম্বর হলো না। শুধু পরিবারের লোক এবং কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এঁদের মধ্যেও ক্যাথারিনকে দেখা যায় নি।

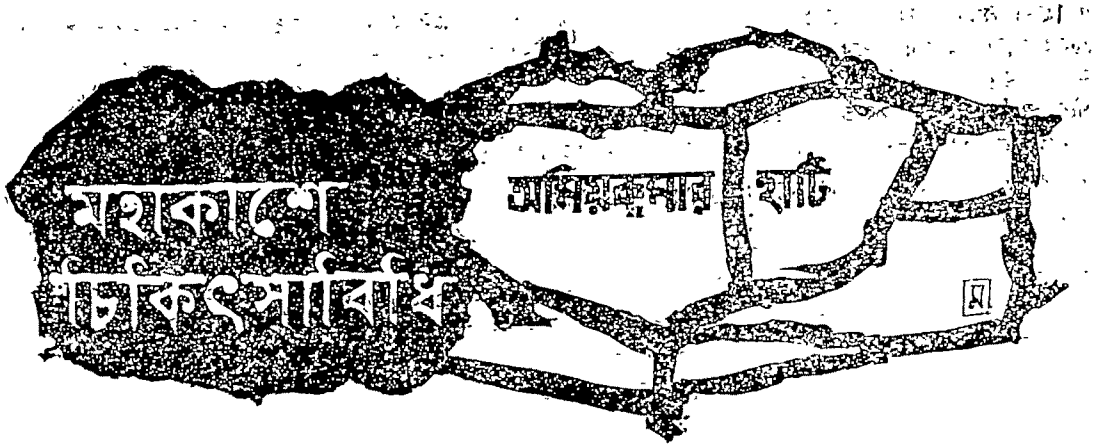

ভূমিকা

মানুষের মহাকাশ যাত্রার সব থেকে বড় বাধা হ'ল সে নিজে। চাঁদে সে পা রেখেছে—এরপর তার থেকেও দূর-দূরান্তরে পাড়ি দেবে। কিন্তু তার আগে চিকিৎসা বিজ্ঞানসংক্রান্ত কতকগুলি সমস্যার সমাধান তাকে করতে হবে—কতকগুলি বাধা অতিক্রম করার উপায় তাকে খুঁজতে হবে।

মহাকাশে গেলে মানুষ সেই সম্পূর্ণ ভিন্নতর পারিপার্শ্বিকে কি সব সমস্যার মধ্যে পড়ে, তার আলোচনার জন্যে তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন বসেছিল জেনেভায়—১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসে। বিজ্ঞানের একটি শাখার উন্নতি হলে সেই উন্নতির ঢেউ অন্য শাখায় এসেও লাগে। মহাকাশযাত্রায় যেমন প্রযুক্তিবিদ্যার অসাধারণ উন্নতি হয়েছে, সেই সঙ্গে চিকিৎসাবিদ্যাও কিন্তু খুঁটিনাটি কয়েকটি বিষয়ে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছে। 'ইন্টারন্যাশনাল এ্যাসট্রোনটিকাল ফেডারেশন' ও 'ইন্টারন্যাশানাল ফেডারেশন অব এ্যাসট্রোনটিকস'-এর উদ্যোগে এবং 'ইন্টারন্যাশনাল এ্যাটমিক এনার্জী এজেন্সী' ও 'ওয়ার্ল্ড' হেল্থ অর্গানাইজেসনের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতায় উপরোক্ত এই সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকদের ২০টিরও বেশি মূল্যবান প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হয়। পৃথিবীর সমস্ত অগ্রসর দেশেই চিকিৎসক-বিজ্ঞানীরা মহাকাশের চিকিৎসাবিধি নিয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করছেন। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নিয়ামক ডঃ এম জি কান্ডাই ছাড়াও যেসব মহাকাশ চিকিৎসা বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ চিকিৎসক বা বিজ্ঞানী উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে রাশিয়ান ডঃ পি ডি ভ্যাসিলেভ, ডঃ বোরিস ইগোরভ, ডঃ এন এন গুরোভস্কজি, ডঃ বি জে ডেভিডভ, ডঃ ডি পি জুখার, ডঃ পি ডি সিমোনভ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ডঃ জি ডি ওহেডন, ডঃ ডবলু এন জেনসেন, ডঃ ডবলু এল জোন্স, ডঃ এ জি গ্রেবিয়েল, ডঃ এইচ জে মেফার, বৃটিশ যুক্তরাজ্যের ক্যাপ্টেন টি সি ডি হোয়াইট সাইড, ফ্রান্সের প্রফেসর আর গ্র্যান্ডপিয়র, যুগোস্লাভিয়ার ডঃ আর কে আন্ডজুস প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

ভারহীনতার ফল

মহাকাশে অসুবিধা অনেক। পৃথিবীর টান ছাড়িয়ে মহাশূন্যে এলে সে ভারহীন হয়ে পড়ে। মহাজাগতিক বিকিরণজনিত ক্ষতি হতে পারে তার। মহাকাশযানের দ্রুতগতিও তার পক্ষে অসুবিধাজনক। দারুণ মানসিক চাপ তাকে সহ্য করতে হয়। পরিবেশ ছোট। একাকীত্ব বোধ জাগে। প্রায় বন্দী অবস্থায় তার কাল কাটে।

রক্তের চাপ কমে যায়, রক্তের জলীয় অংশের পরিমাণ কমে, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এসব বেশি পরিমাণে বেরিয়ে আসে বলে হাড় নরম হয়ে যায়, মজ্জার পরিমাণ কমে যায়, অনেক হর্মোনের নিঃসরণ অস্বাভাবিক রকম বাড়ে, রোগ বাধা দেবার ক্ষমতা কমে যায়, ক্ষিদে কম লাগে যদিও মহাকাশচারীর শক্তি যোগানোর জন্যে খাওয়ার খুবই দরকার। মহাকাশচারীর মনঃসংযোগের অভাব ঘটে, তার ঘুম ব্যাহত হয়।

অবশ্য সব মহাকাশচারীর উপরেই ভারহীনতার প্রভাব একরকম নয়। কারুর খুব অল্পেই অসুবিধা হয়, কারুর বমি-বমি ভাব হয়, আবার কেউ বা সম্পূর্ণই বিফল হয়ে পড়ে।

দেখা গেছে, মহাকাশে দু' সপ্তাহ থাকলে পৃথিবীর সাধারণ অবস্থার তুলনায় শতকরা ৯ ভাগ ফসফরাস শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। এটি স্বাভাবিক অবস্থার থেকে ২৩ শতাংশ বেশি। সেই রকম হাড়ের ক্যালসিয়াম শতকরা ২½ থেকে ১৫ ভাগ কমে যেতে পারে। কাজেই বুঝতেই পারা যাচ্ছে, মহাকাশে বেশি দিন থাকলে হাড়ের কাঠামোর অস্তিত্বই আর থাকবে না—হাড় যেখানে সেখানে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হবে—হাড় থেকে ক্যালসিয়াম বেরিয়ে যেতে থাকলে ঐ ক্যালসিয়াম শরীরের অন্য সব জায়গায় যেমন হৃৎপিণ্ডে, মাংসপেশীতে জমা হবে; হৃৎপিণ্ড বিকল করে তুলবে। যে ত্রিশদিন মহাকাশ ভ্রমণ করবে, তার হাড়ের ক্যালসিয়াম সাধারণ অবস্থার তুলনায় ৪০% কমে যাবে।

ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস ছাড়াও নাইট্রোজেন, সালফার, এ্যালডোস্টেরন, ১৭. কিটোস্টেরয়েড প্রভৃতির নিঃসরণও বেড়ে যায়।

ভয়ঙ্কর দ্রুত গতির জন্যে শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের উপরেও অস্বাভাবিক রকম চাপ পড়ে। সব থেকে অসুবিধা যা, তা হল সোজা হয়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা রক্ষা করাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। মহাশূন্যে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর বিপদও অনেক।

চিকিৎসকদের মধ্যে সোভিয়েট মহাকাশচারী ডঃ বোরিস ইগোরভ দুর্লভ সম্মান লাভ করেছেন। তিনিই প্রথম চিকিৎসক মহাকাশচারী—১৯৬৪ সালে ভস্কুড-১-এ মহাশূন্যে পাড়ি জমিয়ে ছিলেন। এঁর অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মূল্যবান। মহাকাশের চিকিৎসা-বিধি নিয়ে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। ভারহীনতার কিছু কিছু কুফল প্রতিবিধানের কথা তিনি বলেছেন।

মহাকাশযানের মধ্যে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর যে সমস্যা, যদি ৯০% অক্সিজেন ও ৫% কার্বন ডাইঅক্সাইড মেশানো গ্যাস নিশ্বাসের সঙ্গে নেওয়া যায় তাহলে নাকি সেই সমস্যা থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে। হয় কি, ভারশূন্য

অবস্থায় দাঁড়ালে হৃৎপিণ্ডের রক্ত সব নিম্নাঙ্গে চলে যায়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, পায়ের মাংসপেশীর নিয়মিত সংকোচন-প্রসারণের ফলে এই বাধা দূর হতে পারে, রক্তসঞ্চালন স্বাভাবিক হতে পারে।

রক্তের জলীয় অংশও কমে, আবার লোহিতরক্তকণিকা তৈরি কম হয় বলে কিম্বা বেশি লোহিতরক্তকণিকা নষ্ট হয় বলে লোহিতরক্তকণিকাও বেশ কমতে আরম্ভ করে আস্তে-আস্তে। হৃৎপিণ্ডের যা পরিবর্তন হয়, তা মূলত অনেকখানিই হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী নষ্ট হয়ে যাবার ফলে। এর জন্যে দায়ী রক্তসঞ্চালনের স্বল্পতা।

২২ দিন মহাকাশে ছিল এরকম একটি কুকুরের ২২·৬% এবং অন্য আর একটি কুকুরের ২৯% ওজন কমে গেছে সাধারণ অবস্থার তুলনায়। অর্ধেক ওজন কমেছে জলীয় অংশ বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে। আর বাকী অর্ধেক মাংসপেশী ক্ষয়ের জন্যে। ওদের জলীয় অংশের অভাব দূর হতে সময় লেগেছিল ৯।১০ দিন। আর মাংসপেশীর অভাব পূর্ণ হতে লেগেছিল ত্রিশদিন। ২২ দিন মহাকাশ ভ্রমণের পর ঐ কুকুর দুটো সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিল না ঠিকমত; টলে টলে পড়ছিল; ভারসাম্য হারাচ্ছিল। দুর্বলভাবে ইচ্ছাশক্তি রহিত অবস্থায় মাথা নাড়াচাড়া করছিল, ঠিকমত খেতেও পারছিল না। সম্ভবত মহাকাশযানের দ্রুতগতিই এ সবের কারণ। মাটিতে ফিরিয়ে আনার পর আস্তে আস্তে ঐ সব অবস্থা কেটে যায়, কুকুর দুটো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে, পৃথিবীর চেয়ে টান বা অভিকর্ষ বেশি যদি হয়, সেই রকম পরিবেশে মানুষকে যদি রাখা যায়, তাহলে তার শরীরের স্নেহজাতীয় পদার্থ কমে যাবে। কম অভিকর্ষে যেখানে, বা যেখানে কোন অভিকর্ষই নেই, সেখানে তাহলে অন্য অবস্থা স্বাভাবিক থাকলে মানুষের ওজন বাড়তে পারে।

মনের উপর যে সাংঘাতিক চাপ পড়ে, তাতে মানসিক ভারসাম্য সব থেকে বেশি বিপর্যস্ত হয়। এর জন্যে মহাকাশে মহাকাশচারীর কোন কুফল হতে পারে বা কয়েকটা পরস্পরবিরোধী মানসিক চাপ পরস্পরের উপর কাজ ক'রে কুফল দূর করতে পারে কিম্বা মানুষকে কোন নির্দিষ্ট ভবিতব্যকে সহ্য করতে বাধ্য করাতে পারে।

অনবরত ঘূর্ণায়মান অবস্থায় থাকার জন্যে গতিদৌর্বল্য (motion sickness) ঘটতে পারে। কতকগুলি ওষুধ অবশ্য এ ব্যাপারে বেশ উপকারী বলে জানা গেছে।

মহাজাগতিক বিকিরণ

কসমিক আলো ছাড়াও রয়েছে সৌরজগৎ থেকে উৎসারিত প্রোটন বিকিরণ, পৃথিবীর কাছাকাছি ম্যাগনেটোস্ফেয়ারের প্রোটন ও ইলেকট্রন বিকিরণ, অধিক শক্তিসমন্বিত কসমিক বিকিরণ, 'সুপার নোভা' থেকে আগত অধিক শক্তিসম্পন্ন বিকিরণ।

মহাজাগতিক বিকিরণ-এর হাত থেকে পৃথিবী মুক্ত এই কারণে যে, পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে আবহাওয়ার আবরণ। একমিটার পুরু মিশে যে পরিমাণ মহাজাগতিক রশ্মি শোষণ করে নিতে পারে, আমাদের পৃথিবীর উপরিস্তরের আবহাওয়াও সেই পরিমাণ বিকিরণ শোষণ করে নেয়। মাত্র ০·৬% বিকিরণ আবহাওয়া ভেদ করে পৃথিবীপৃষ্ঠে পৌঁছায়।

মহাজাগতিক বিকিরণের ফল দুটি। ক্যানসার বা লিউকিসিয়া আর আয়ু কমে যাওয়া। গুণে দেখা গেছে, মহাকাশে ১০০ দিন থাকলে নীহারিকাপুঞ্জের বিকিরণের ফলে আয়ু কমবে ২৫ দিন।

সৌরজগতের উৎসারণই প্রোটন বিকিরণের মাধ্যমে বেশি ক্ষতি করতে পারে। ভাগ্যক্রমে এই উৎসারণ ঘটে অল্প সময়ের জন্যেই, আর বারেও খুব কমই হয়। এরও সঠিক পরিমাপ করতে হবে—ঠিক করতে হবে পরিকল্পিত দূরপাল্লার মহাকাশযাত্রায় কতটুকু সৌরজাগতিক বিকিরণ কি ক্ষতি করবে।

অনেকে গবেষণা করেছেন বা করছেন, এই মহাজাগতিক বিকিরণের হাত থেকে কিভাবে রেহাই পাওয়া যেতে পারা যায়, তার জন্যে। অন্য প্রাণীর উপর পরীক্ষা করে জানা যায়, শরীরের তাপমাত্রা খুব কম করে দিলে বা দম বন্ধ করে রাখলে বিকিরণের প্রভাব অনেক কমে যায়। কিন্তু মানুষ মাত্র ৮০C পর্যন্ত শীতলতা সহ্য করতে পারে—আর খুব বেশিক্ষণ দম বন্ধ করে থাকতেও পারে না। কাজেই মানুষের জন্যে ঐ রকম অবস্থার সৃষ্টি করা সম্ভব হবে কি না—তাও ভাববার বিষয়।

ঘুম, সতর্কতা, বোধশক্তি

মহাকাশ ভ্রমণের প্রথম কয়েকদিন ভাল ঘুম হয় না। মহাকাশ যাত্রী টিটভ ঘুমুবার ইচ্ছা থাকলেও সময়মত ঘুমুতে পারেন নি। কেউ কেউ মতামত দিয়েছেন যে, বিশ্রামের জন্যে ঘুমের দরকার অবশ্য নেই—কিন্তু মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম কাজকর্ম, কার্যকারণ সম্পর্কে বোঝা, শেখা, স্মৃতিশক্তি উদ্দীপ্ত ও প্রখর রাখা—এ সবের জন্যে ঘুমের দরকারই। ভারহীন অবস্থায় মনের একাগ্রতাও কমে যায়, পৃথিবীর আকর্ষণের তুলনায় কম আকর্ষণের জায়গায় পৌঁছুলে সতর্কতাবোধ কম যাবে, কোন কাজ করতে তাকে খুবই কষ্ট পেতে হবে, মানুষ অস্বাভাবিক ক্লান্তি বোধ করবে। ভারহীন অবস্থায় মাংসপেশীর সংযোগ স্নায়ুগুলির সঠিক কর্মক্ষম না থাকায় কোন্ অঙ্গ কি অবস্থায় আছে, সেই বোধই দুরূহ হয়ে উঠতে পারে। দেখা ও দেখে-বোঝার ব্যাপারে গণ্ডগোল হতে পারে। দূরত্ব, গতিবেগ, কোন বস্তুর মাপ—এসব চোখ ঠিকমতো ধরতে পারে না। পৃথিবীতে সাধারণ অবস্থা যে ধরণের উত্তেজনা পায়, মহাকাশে সেই ধরণের উত্তেজনা না পাবার ফলেই চোখের এরকমটা ঘটে। মানুষের বিচারবোধও লোপ পেয়ে যেতে পারে। সে দিবাস্বপ্ন এমন কি অলীক দৃশ্যও দেখতে আরম্ভ করে।

মহাকাশ ভ্রমণকারী বেছে নেবার মাপকাঠি

দূরপাল্লার মহাকাশযাত্রার নাবিকদের সংগ্রহ করার সময় খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। দলবদ্ধ হয়ে মহাকাশ পাড়ি দেবার পর এরা সবাই মিলে এক হয়ে কাজ করতে না পারলেই সমূহ বিপদ। ১৪ দিন মহাকাশে কাটানো এখন আর দূরপাল্লা বলে গণ্যই করা হয় না। ৬০ বা ৯০ বা তারও বেশিদিন একসঙ্গে সহযোগিতা করে কাটাবার মতো উন্নত চরিত্র, সহিষ্ণুতা, উদারতা ও দৃঢ়তা থাকা চাই মানুষগুলোর মধ্যে। অবশ্য মানুষ মেরু অভিযানে দলবদ্ধভাবে ৬ মাসেরও বেশি কাটিয়েছে। তবে, একথা বারবার মনে রাখা দরকার যে, মহাকাশে মানসিক চাপ থাকে অত্যধিক। পরিবার-পরিজন স্ত্রী-পুত্র পরিবেশ থেকে আলাদা হয়ে অনিশ্চিতের পথে পরস্পর অজানা কয়েকজন লোক যদি থাকেন মহাকাশযানে, তাহলে সমঝোতা সর্বাগ্রে দরকার। স্থানাভাব হবে, জনাকীর্ণ মনে হবে, কোন গোপনীয়তা থাকবে না। সমঝোতা কমে গেলে একে অপরের প্রতি অসহিষ্ণু বা বিরূপ হতে পারেন, ও একে দলে টানেন, কেউ কারুর প্রিয়পাত্র হন, কেউবা কারুর অপ্রিয় হয়ে ওঠেন, কেউ নেতা বনে যান আর কেউবা তাঁর বিরোধিতা করেন। এইসব কাটিয়ে ওঠার জন্যে বিশেষ ধরণের শিক্ষার দরকার। যাত্রার আগে যেন তাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন এবং কাজ করতে পাবেন, এরকম ব্যবস্থা করা হয়। কাজকর্মের সঠিক ভাগ করে দেওয়া হয় প্রত্যেককে। মানুষ বাছাই করতে হয় শিক্ষার ভিত্তিতে, তাঁর চরিত্র, প্রবণতা, সদিচ্ছা, স্বভাব ও ব্যক্তিত্ব দেখে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের সমৃদ্ধি

মানুষের মহাকাশ যাত্রার ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞান নানাভাবে লাভবান

[শেষাংশ ১৩০ পৃষ্ঠায়]

মহাকাশ অভিযান

অন্য দিক

[১১৩ পৃষ্ঠার পর]

কৃত্রিম উপগ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ-ব্যবস্থার যে বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলোর নাম দেওয়া হয় 'অরবিটা'।

এই সব অরবিটার কাজ চলে কীভাবে প্রসঙ্গত তা নিয়ে আলোচনা করা যাক। গোড়াতেই বলে রাখা যাক, যোগাযোগ-ব্যবস্থা বলতে এখানে মুখ্যত টেলিভিশনকে বোঝাচ্ছি।

সাধারণ টেলিভিশন-এর শক্তি সীমাবদ্ধ; দূর-দূরান্তরে তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়তে পারে না। কিন্তু কৃত্রিম উপগ্রহ মল্‌নিয়া-১-এর দৌলতে টেলিভিশন-বার্তাকে দূর-দূরান্তরে পাঠাল মানুষ।

প্রশ্ন উঠবে, কী করে পাঠাল?

নভোস্থিত প্রেস এজেন্সি থেকে প্রচারিত ' USSR probes space' নামক শ্লেষে এই 'কী করে'-র চমকপ্রদ এক জবাব পেয়েছি আমরা। আমরা জেনেছি, মস্কো অঞ্চলে স্থাপিত পরমশক্তিশালী গ্রাউন্ড ট্রান্সমিটার' থেকে কিছুক্ষণ বাদে বাদে টেলিভিশন-সঙ্কেত পাঠানো হয় মল্‌নিয়া-১'-এ। তারপর 'মল্‌নিয়া-১' সেই বেতার-সঙ্কেতগুলোকে 'অ্যাম্‌প্লিফাই' বা পরিবর্ধিত করে এবং পৃথিবীতে ফেরৎ পাঠায় ওদের।

ওদিকে 'অরবিটা'গুলো গ্রাহক-যন্ত্র নিয়ে তৈরি হয়েই থাকে। ফেরৎ-আসা বার্তাগুলোকে যথাসময়েই গ্রহণ করে ওরা। মস্কো থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে থাকা সত্ত্বেও কাজ করতে ওদের কোনো অসুবিধে হয় না।

অসুবিধে অবিশ্যি দূর-দূরান্তরের টেলিভিশন কেন্দ্রগুলোরও হয় না। কারণ, 'অরবিটা'র দৌলতে সর্বক্ষণ কর্মচঞ্চল থাকে ওরা। মস্কো থেকে হাজার হাজার মাইল দূরের দর্শকদেরও ওরা মস্কোরই টেলিভিশন-কর্মসূচী দেখিয়ে খুশি রাখে।

তাহলে দেখছি, টেলিভিশন-কর্মসূচীকে দেশ জুড়ে এবং এমন কি বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে কৃত্রিম উপগ্রহ; এবং এই ক্ষমতাকে কাজে লাগালে মানুষ কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে সরাসরি উপকৃত হতে পারে।

এছাড়া অন্যভাবেও মানুষকে সরাসরি উপকৃত করার উদ্যোগ-আয়োজন এখন চলছে। কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে কোনো কোনো দেশ আবহাওয়া-বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করছে এখন। সোভিয়েট দেশ চাইছে বিশ্বজোড়া এক আবহাওয়া-দপ্তর গড়ে তুলতে।

আশার কথা, [illegible] রূপ দেবার জন্যে কস্‌মস্-পর্যায়ে এরই মধ্যে কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপ করেছে ওরা। কয়েক বছর আগেই উৎক্ষেপ করেছে কস্‌মস্-১২২ কে।

এই উপগ্রহটির দৌলতে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন জায়গার তাপমাত্রা, বিভিন্ন অঞ্চলে জমে-থাকা বরফের পরিমাণ এবং আকাশের বিভিন্ন অংশে ভেসে-বেড়ানো মেঘ সম্বন্ধে মূল্যবান কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়। এই সব তথ্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেবার ব্যাপারে খুবই কাজে লাগে।

১৯৬৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী ও ২৭শে এপ্রিল উৎক্ষিপ্ত হয় যথাক্রমে কস্‌মস্-১৪৪ ও কস্‌মস্-১৫৬। আবহাওয়া সম্বন্ধে তথ্য-সংগ্রহের জন্যে একসঙ্গে দু-দুটি কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাকাশে পাঠাবার নজীর এই প্রথম। এই প্রথম একই সঙ্গে দুটি কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথকে এমনভাবে ঠিক করা হল, যাতে পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি অঞ্চলের আবহাওয়া সম্বন্ধেই প্রতি ৬ ঘণ্টা অন্তর খবর পাওয়া যায়।

এদিকে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ ব্যবস্থা একেবারেই পরীক্ষামূলক। ভবিষ্যতে অনেক উন্নতি হবে এর। একসঙ্গে চার-পাঁচটি কৃত্রিম উপগ্রহ তখন পৃথিবী-প্রদক্ষিণ করবে। সারা পৃথিবীর আবহাওয়া সম্বন্ধে আমাদের ওয়াকিবহাল রাখবার জন্যে কোনো উপগ্রহ তখন পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবে অপেক্ষাকৃত কম দূরত্বে; আবার কোনো কোনোটি পৃথিবীর প্রায় তিন-চারশো মাইল দূর দিয়ে তার কক্ষপথকে বেছে নেবে।

কৃত্রিম উপগ্রহকে আবহাওয়া-দপ্তরের এবং যোগাযোগ-ব্যবস্থার কাজে লাগাবার ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও পিছিয়ে নেই। এই সেদিন, ১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে ৭২৬ কিলোগ্রাম ওজনের অতিকায় একটি কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপ করল ওঁরা। ওঁরা জানাল, এই উপগ্রহটি নাকি যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক দিয়ে নানাভাবে ওঁদের উপকৃত করছে।

কিন্তু তবু, মহাকাশ-অভিযানের এই এত সব উপকারের কথা স্মরণে রেখেও বলতে পারি, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে পৃথিবীর সকলের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ যদি এ থেকে না হয়, যদি কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার বা আবহাওয়া-দপ্তরের উন্নতিটা মুষ্টিমেয় দু-একটি দেশের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, তবে পুরোনো সেই খেদোক্তিটা আবার করবো আমরা। আবার আমরা বলবো, বিজ্ঞান তার নিষ্কাম কল্যাণধর্ম থেকে দূরে সরে গিয়ে কামনা-কলুষিত অকল্যাণ ও অধর্মের পথে পা বাড়াচ্ছে।

উত্তরাধিকারীরা আসে

[৭২ পৃষ্ঠার পর]

চোরের মত এদের ঘরে ঢুকেছি, এরা জোট বেঁধে আমাকে যেন তাড়িয়ে দিচ্ছে।

'আমরা গরীব হতে পারি, কিন্তু ভাড়া নেবে দিই না কখনো।'

আমি সেই প্রবল কণ্ঠস্বরের সামনে নিতান্ত অসহায়ের মত হঠাৎ প্রচণ্ড চীৎকার করে বলতে চাইলাম, 'না' আর তারপর আমার চারপাশে তখনো যারা দাঁড়িয়েছিল, সেই রং-মিস্ত্রি, ট্রাম কন্ডাক্টর, ফেরী-অলাটা রক্তের মত তাদের মূর্তি, এক চোখে অসম্ভব ক্রোধ আর এক চোখে অসম্ভব ঘেন্না, যেন আর একটা বাড়তি কথা বললেই আমাকে পেড়ে ফেলবে, ওদের সবার দিকে এক নজর বুলিয়ে আমি একটা অন্ধের মত হাতড়াতে হাতড়াতে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নাবতে লাগলাম।

একটু আগেও দ্বিজদাসদের [illegible] আমার বিলাসী চোখে অলক্ষুণে আর রাক্ষুসে মনে হয়েছিলো, তখনো পর্যন্ত দ্বিজদাসের জোর দেখি নি, সে জোর যে কতো অলক্ষুণে আর রাক্ষুসে হতে পারে একটু আগেও কি স্বপ্নেও তা ভাবতে পেরেছিলাম? হ্যাঁ, অন্ততঃ এক দিনের জন্যে হলেও এক্ষুনি আমাকে এখান থেকে যেতে হবে, দলিল, পাট্টা আর দাদুর দেওয়া রক্তসূত্রে পাওয়া এই উত্তরাধিকার, এসব এখন কিছুই কিছু নয়, কেননা...কেননা প্রকৃত উত্তরাধিকারী এসে গেছে...ওরা এমনি করেই আসে।

সাহিত্য ও জাতীয় ঐতিহ্য

[১১০ পৃষ্ঠার পর]

পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে এবং তাদের জীবনের সঙ্গে অন্বিত থেকেই সাহিত্যকে প্রাণবান এবং ঐতিহ্যকে গতিশীল করা সম্ভব হবে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "ঐ ধুলো-মাটি-ঘাসের মধ্যে আমি হৃদয় ঢেলে দিয়ে গেলাম, বনস্পতি-ওষধির মধ্যে। যারা মাটির কোলের কাছে আছে যারা মাটির হাতে মানুষ, যারা মাটিতেই হাঁটতে আরম্ভ করে শেষকালে মাটিতেই বিশ্রাম করে, আমি তাদের সকলের বন্ধু....."; এ কথা সাহিত্যস্রষ্টাদের জীবনে সত্য হয়ে উঠলেই সাহিত্য জাতীয় ঐতিহ্যের সার্থক অভিব্যক্তি রূপে পরিগণিত হবে।

মহাকাশে চিকিৎসাবিধি

[১২৮ পৃষ্ঠার পর]

হয়েছে। যেমন—(১) মহাকাশযাত্রা নিয়ন্ত্রণকারী অতিসূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির দোষ পরীক্ষা করার জন্যে একরকম ইলেকট্রনিক প্রোব এনালাইজার আছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে একে কাজে লাগানো হয়েছে। ইলেকট্রনগুলির সূক্ষ্ম রশ্মিপাতে রোগীর রোগ নির্ণয়ের জন্যে সংগৃহীত রক্তে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে প্রত্যেকটি রাসায়নিক উপাদানের চরিত্রানুগ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিকিরণ পাওয়া সম্ভব। এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করে এক বিজ্ঞানী দেখিয়েছেন যে, লিউকিমিয়া রোগীর কোষে বেশি পরিমাণ টাইটেনিয়াম ও দস্তা রয়েছে। প্রথম অবস্থায় ক্যানসার রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। (২) চাঁদে নামার জন্যে যে ধরণের চলমান যান ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলো প্রেরণা যোগাবে বিকলাঙ্গ ছেলেমেয়েদের জন্যে চাকাহীন হুইলচেয়ার উদ্ভাবনের। (৩) মহাকাশচারীরা যে পোষাক পরেন, তার মধ্যেই রয়েছে তরল পদার্থ শীতলীকরণের ব্যবস্থা। এইটিই পোষাকের প্রথম প্রস্থ—শরীরের সর্বাঙ্গে নাইলন জালের উপর বিছানো থাকে বহু জলবাহী নালা পিঠের দিকে সংলগ্ন ট্যাঙ্ক থেকে জল এসে এই নলগুলো ঠান্ডা রাখে। এইরকম শীতলীকরণ ব্যবস্থা খুব জ্বরের চিকিৎসার জন্যে দরকার হতে পারে। যাঁরা খুব বেশি তাপে কাজ করেন, তাঁদের জন্যেও এ ধরণের পোষাক তৈরি করার চেষ্টা চলছে।

(৪) টেলিভিসন ছবির খুবই উন্নতি হয়েছে। এক্সরে ছবিরও এরকম উন্নতি আশা করা যায়। এর ফলে ফুসফুস, হাড় বা শরীরের অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যত গভীরে যাই থাক না কেন, তার অবিকল ফটো তোলা যাবে—রোগ নির্ণয় প্রক্রিয়া সহজ হয়ে উঠবে।

(৫) এক ধরণের অতি সংবেদনশীল যন্ত্র মহাকাশযাত্রার জন্যে দরকার—যে যন্ত্রে ধরা পড়ে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উল্কার উপস্থিতি। এইরকম যন্ত্রের সাহায্যে মাংসপেশীর অতি সূক্ষ্ম স্পন্দনও ধরা পড়তে পারে এবং এইভাবে প্রথম অবস্থাতেই স্নায়বিক রোগ নির্ণয় করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করবে।

(৬) মহাকাশে ভারহীন অবস্থায় মাংসপেশী শুকিয়ে যেতে থাকে। দেখা গেছে, ঐ মাংসপেশীকে কোন উপায়ে উত্তেজিত করলে শুকিয়ে যাবার ভয় কমে থাকে। স্নায়বিক কোন কোন রোগে এই ধরণের ভারহীনতার সুযোগ গ্রহণ করে তাকে উত্তেজিত করলে হয়তো ঐ সব রোগ সেরেও যেতে পারে।

(৭) বাতাসে নানারকম দূষিত পদার্থ বীজাণু বা জীবাণু ঘুরে বেড়ায়—যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। মহাকাশ বিজ্ঞানে ব্যবহৃত নেফেলোমিটার নামে এক যন্ত্র—বিভিন্ন স্থানে এইরকম ছবি ও পদার্থ খুঁজে বেড়ানোর ব্যাপারে সহায়তা করবে। বাতাসের অতি সূক্ষ্ম জীবাণু বা বীজাণুরা ধরা পড়বে এক ধরণের পুষ্টিসাধক ফিতেয়, যাকে ঠান্ডা অবস্থায় অনেক দিন রেখে দেওয়া সম্ভব। পরে এই ফিতে থেকে পরীক্ষা করে বের করা যাবে, কী ধরণের জীবাণু বা বীজাণু বাতাস দূষিত করেছে।

(৮) রেডিও টেলিমেট্রি ব্যবস্থার ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞানে আর একটি যুগান্তর আসছে। মহাকাশচারীদের হৃৎপিন্ড কেমন কাজ করছে, রেডিও টেলিভিসনের যোগে পৃথিবী থেকেই চিকিৎসকরা তা জানতে পারছেন। তাদের নাড়ীর স্পন্দনও সঠিক ধরা পড়ছে। মস্তিষ্কের স্নায়বিক সঙ্কেতসম্বলিত ইলেকট্রোএনকেফালোগ্রাম স্নায়বিক নানা রোগ নির্ণয়ের জন্যে দরকার হয়। এখন রেডিও মারফৎ এই ইলেকট্রোএনকেফালোগ্রামের সঙ্কেত রোগীর ঘরে আছে এমন একটি গ্রাহক যন্ত্রের মাধ্যমে দূর দূরান্তরে পাঠানো সম্ভব। লাউডস্পীকারের পাশে রাখা একটি টেলিফোন এই সঙ্কেত গ্রহণ করে এবং বিশ্লেষণ করার জন্যে নির্দিষ্ট ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়ে দেয়। স্নায়বিক নানারকম রোগ যেমন মৃগীরোগ, ঘুমের মধ্যে হেঁটে বেড়ানো, শিশুদের অস্বাভাবিক ব্যবহার ইত্যাদি ডাক্তারের ক্লিনিকে না গিয়ে ঘরোয়া পরিবেশে পরীক্ষা করার দরকার হয় অনেক সময়। উপরের ব্যবস্থা সে সুযোগ এনে দেবে। চাঁদে যাঁরা গিয়েছিলেন, পৃথিবীতে থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা তাঁদের হৃৎপিন্ড কেমনভাবে কাজ করছে, তা জানবার জন্যে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম পরীক্ষা করেছিলেন এই রকম রেডিও টেলিমেট্রির মাধ্যমেই। এই রকম আধুনিকা কায়দায় সাজানো এ্যাম্বুলেন্স-এ করে রোগীকে যখন হাসপাতালে নিয়ে আসা হবে, তখন হাসপাতালের গেটে ঢোকার আগেই ডাক্তাররা রোগ নির্ণয় করে ফেলবেন টেলিভিসন-এর মাধ্যমে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের সামনে আজ একটা নতুন ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত হয়ে গিয়েছে। মানুষকে যখন গ্রহ গ্রহান্তরে পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছে, তখন তাঁরা ভাবছেন, কিভাবে নীরোগ মানুষকে তার জীবিতকালে সম্পূর্ণ নীরোগ রাখা যায়। তাঁদের এই বিশিষ্ট চিন্তাধারার ফলে হয়ত এমন একদিন আসতে পারে, যেদিন জরা-ব্যাধি আর তাকে কাবু করতে পারবে না, যতদিন বাঁচবে, সুস্থ, সবল চিরতরুণ হয়ে বাঁচবে।

বিপ্লবী জাতীয় আন্দোলনের স্মৃতিকথা

[৩০ পৃষ্ঠার পর]

ফেলে। সতীশ পাকড়াশী, নিরঞ্জন সেন ও রমেন বিশ্বাস মাদুয়াবাজারে গ্রেপ্তার হন। সুধাংশু দাশগুপ্ত বোমাসহ বাড়িতে প্রবেশ পথে ধরা পড়েন। নিকটবর্তী অপর এক বাড়িতে সহস্র সহস্র টাকার বোমা তৈরির সরঞ্জাম ও রিভলবার ধরা পড়ে। বরিশালে অনেকে ধরা পড়েন। তাদের নিয়ে মাদুয়াবাজার বোমার মামলা হয়। যতীন দাস লাহোরে গিয়ে পূর্বেই গ্রেপ্তার হয়ে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হন। তাঁর উপর অস্ত্র সংগ্রহের দায়িত্ব ছিল। তাঁর গ্রেপ্তারে আমরা খুব আঘাত পেলাম। কিন্তু আরব্ধ কার্য করতেই হবে। মাদুয়াবাজার বোমার মামলায় সতীশ পাকড়াশী, নিরঞ্জন সেন ও আরো কয়েকজন দ্বীপান্তরে ও কারাগারে গেলেন। যতীন দাস রাজবন্দীদের প্রতি মানুষের মত আচরণের দাবিতে লাহোর জেলে দীর্ঘদিন অনশন করে মারা গেলেন। দেশে বিরাট আন্দোলন হওয়া সত্ত্বেও ইংরাজ শাসকগোষ্ঠী এতটুকুও পাশবিক নীতি সংস্কার করতে রাজি হয় নাই। সতীশ পাকড়াশী, নিরঞ্জন সেন প্রভৃতি কলকাতায় ধরা পড়ায় চট্টগ্রাম বিপ্লবীরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেন। তাঁরাও ধরা পড়ে যেতে পারেন এই আশঙ্কায় দ্রুত আয়োজন করতে থাকেন। ১৮ই এপ্রিল (১৯৩০) তারিখে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা সাফল্যজনকভাবে অস্ত্রাগার আক্রমণ করায় সারা ভবতে আলোড়ন উপস্থিত হয়। তাদের বীরত্বব্যঞ্জক আক্রমণ জালালাবাদের লড়াই ও আত্মদান ইংরাজ বাজত্বে সংগ্রামের ইতিহাস উজ্জ্বল করে রেখেছে।

'রিভোল্ট গ্রুপ' বা 'এডভান্স গ্রুপ' যদি পরিকল্পনা অনুযায়ী ৩।৪ জেলায় একযোগে সশস্ত্র অভ্যুত্থান করতে পারতো, তবে গান্ধীর লবণ আইন অমান্যের ব্যর্থ প্রয়াস আবো ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়ে যেত। ভারতে সশস্ত্র বিদ্রোহের উদ্দীপনা জোরালো হত।

পরেও সশস্ত্র বিপ্লববাদীদের ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে, কিন্তু চট্টগ্রামের মত উচ্চতর সংগ্রামের পথ তাঁরা গ্রহণ করেন নাই। অনুশীলন দলের কর্মীরা ও-রকম সশস্ত্র অভ্যুত্থানের (armed rising) কল্পনা নিয়ে কাজ করেছিলেন কিন্তু কার্যত কিছু হয় নাই। তারপর আন্দোলনের ঝড়ো হাওয়ায় দিন বদলের পালা এল। শ্রমিক-কৃষকের গণশক্তির জাগরণ, সমাজবাদের আদর্শ এসে সন্ত্রাসবাদী সংগ্রাম আন্দোলনের প্রভাব ম্লান করে দেয়।

সেই সকালে

[৫২—পৃষ্ঠার পর]

চলে না যেতুম—থাকতুম ওর কাছে, মুখে একটু জল-টল দিতুম, তা হলে বুড়ীটাকে অন্তত জ্যান্ত শেয়ালে ছিঁড়ে খেতে পারত না, হয়তো আরো দু-চারদিন বেঁচে থাকত।'

আসবার জন্যে পা বাড়িয়েছি, দেখলুম এদিক ওদিকে দপ দপ করে জ্বলছে কতগুলো হিংস্র সবুজ চোখ। ওই হারামজাদা শেয়ালেরা। এখনো আশা ছাড়ে নি, লকলকে জিভ মেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি একটু সরে গেলেই হয়। তারপরে এসে আবার খাওয়া আরম্ভ করে দেবে।

না—আর চলে আসা যায় না। বুড়ী তো শেষ হয়ে গেছে—আর পনেরো মিনিট, বিশ মিনিট বড় জোর—তারপর বুকের ভেতরের ওই কাঁপুনিটুকু থেমে যাবে চিরকালের মতো। কিন্তু তাই বলে শেয়ালেরা ওকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে, সে হতেই পারে না, কিছুতেই না।

লাঠি তো আমার হাতে ছিলই। আমি দাঁড়িয়ে গেলুম।

বুঝলি, শেয়ালগুলো শয়তানের চাইতেও লোভী! তার ওপর রক্ত-মাংসের স্বাদ পেয়েছে, হারামজাদারা কি আর নড়তে চায় নাকি ওখান থেকে। একটু অন্যমনস্ক হই—অমনি দেখি, একপাশ থেকে একজোড়া সবুজ চোখ গুটি গুটি এগিয়ে আসছে রক্ত-মাংসের পিণ্ডিটার দিকে। রাস্তা থেকে মাটির ঢেলা কুড়িয়ে ছুড়ে মারি, খানিকটা দৌড়ে পালায়, আবার তারপরেই দেখি টিপে টিপে চলে আসছে এদিকে।

সারা রাত তাড়ালুম ব্যাটাদের। তারপর ভোরের আলো ফুটল—তখন পালিয়ে গেল যে যেদিকে পারে। কটা গোরুর গাড়ি আসছিল, মাঠের ভেতর দিয়ে চৌকিদারকে আসতে দেখলুম, আমি চলে এলুম তখন।'

সব শুনে আমার হাত-পা আতঙ্কে জমে গিয়েছিল।

'আর বুড়ীটা?'

'আসবার সময় সেদিকে আর চাইতে পারি নি, সাহসে কুলোল না রে। আমি সুমন্ত ঘোষ, কত মানুষ পুড়িয়েছি শ্মশানে, জলে-ডোবা মড়া ফুলে ঢোল হয়ে ঘাটে এসে লেগেছে—লোকে পালিয়েছে তা দেখে, আমি বাঁশ দিয়ে ঠেলে ঠেলে সে মড়া আবার স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছি। কিন্তু বুড়ির দিকে আর চাইতে পারলুম না। শরীরের যেটুকু বাকী ছিল সে তো কখন মরে শক্ত হয়ে গেছে—এবার চৌকিদার এসে দেখে থানায় খবর দেবে নিশ্চয়, ওরা ডোম পাঠাবে, তারাই ঝোলায় করে তুলে নিয়ে পুতে-টুতে দেবে যেখানে হোক।'

সন্ধ্যায় আত্রাইয়ের জল কালো হয়ে গিয়েছিল। আমি সুমন্তদাকে আবছা আবছা দেখছিলুম, মনে হচ্ছিল ওর চোখ বেয়ে জল পড়ছে। বুড়ীর জন্যে আমার কতটা মায়া হচ্ছিল মনে নেই, কিন্তু নিদারুণ আতঙ্কে আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছিল—যেন চোখের সামনে আধ-খাওয়া সেই বিকট শরীরটা দেখতে পাচ্ছিলুম আমি। মনে হল, যদি কখনো এমন হয়—আমি কোনোদিন অসুস্থ হয়ে নির্জন কোনো রাস্তার ধারে পড়ে থাকি রাতের বেলায়, তা হলে শেয়ালেরা এসে আমাকেও কি ওই ভাবে—

'সুমন্তদা, বাড়ি চলুন।'

'হ্যাঁ, চল'—অন্যমনস্ক হয়ে উঠে পড়ল সুমন্তদা।

পথে আসতে আসতে বললে, 'মন্টু, কোনো কিছুরই মানে হয় না—যদি জীবনে মানুষের সেবাই না করতে পারি।'

একটু দূরেই ঝোপের ভেতর দিয়ে একটা ছোট জন্তু দৌড়ে গেল। রোজই ওদের দেখি, কিন্তু আজ দেখবামাত্র শিহরণ জাগল, দাঁড়িয়ে পড়লুম তৎক্ষণাৎ।

'সুমন্তদা—শে—শেয়াল!'

নিজের ভাবনার ভেতরেই মগ্ন ছিল সুমন্তদা, ভারী বিরক্ত হল।

'শেয়াল তো কী হয়েছে? তোকে আমাকে ধরে খাবে নাকি এখন? তুই এত ভীতু না—যে জীবনে তোর কিছু হবে না।'

সেই রাতে আমার ভালো ঘুম হল না। মনে আছে খুব বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছিলুম—যেন বল খেলতে খেলতে বলটা হঠাৎ একটা ঝোপের মধ্যে হারিয়ে গেল, খুঁজছি—খুঁজছিই, তারপর অন্ধকার হয়ে গেল চারদিকে। বল তো দূরে থাক, বেরুবার রাস্তাই খুঁজে পাই না, যেদিকে যাই—শুধু ঝোপ আর কাঁটা ঝোপ—যেন আমাকে আঁকড়ে ধরেছে তারা। আর সেই সময় আমাকে গোল হয়ে ঘিরে ধরল কতগুলো প্রাণী, হিংস্র সবুজ চোখ নিয়ে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে তারা—যেন একটু ফাঁক পেলেই এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার ওপর।

আমি চীৎকার করে উঠলুম।

আমাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিলেন মা: 'কী হয়েছে মন্টু, চেঁচিয়ে উঠলি কেন?'

মাকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে আমি বললুম, 'খুব খারাপ স্বপ্ন দেখছিলুম মা।'

আমি এসে দাঁড়াতেই দু-তিনটে শেয়াল পাকুড়তলা থেকে বেরিয়ে মাঠের দিকে দিলে দৌড়। আর আমি দেশলাইয়ের কাঠি জেলে দেখি—

মা আস্তে আস্তে আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগলেন। বললেন, কিছু না—কিছু না, দুর্গা—দুর্গা।'

জানলার বাইরে নক্ষত্রারা দপ দপ করছিল। ঠিক মা-র চোখের মতো। মা-র বুকের ভেতরে মাথা গুঁজে আমি ভাবতে লাগলুম—মানুষের সেবা করতে চায় সুমন্তদা করুক; কিন্তু নিজের মা-কে ফেলে চলে এল কী করে?

॥ পাঁচ ॥

'জীবনে তোর কিচ্ছু হবে না—' সুমন্তদার কথা।

কিছুই হয় নি। আরো পাঁচজন সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলের মতো মাস্কারিভাবে লেখাপড়া শিখেছি, চুকেছি কলেজের মাস্টারিতে, একটানা—বর্ণহীন দিনগুলো পেরিয়ে চলেছি বছরের পর বছর। কোনো বড় স্বপ্ন দেখি নি, কোনো আদর্শকে বুকের ভেতর জ্বেলে রাখি নি আলোর মতো। আমি যা হয়েছি এর অতিরিক্ত কী আর হতে পারতুম। আমি তাদেরই একজন—যারা সন্ন্যাসের সংখ্যাতত্ত্বে, ভোটারের তালিকার অসংখ্যের ভেতরে নির্বিশেষ হয়ে আছে, জনতার সীমানা ছাড়িয়ে কোনোদিন অন্যতম হওয়ার কল্পনাও করি নি।

কিন্তু সুমন্তকুমার ঘোষ?

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-কালী দা, মাদার—ভবানী পাঠকের সাধনপীঠ? 'অপেক্ষা করে আছি রে—ডাক এলে আমাকে আর কোথাও খুঁজে পাবি না তোরা।'

'সন্ন্যাসী হয়ে যাবে—না?'

'নিশ্চয়।'

'আমাদের কাছে আর আসবে না সুমন্তদা?'

'আসতে পারি—যদি কখনো প্রয়োজন পড়ে। তবে তখন আমি আর তোদের সুমন্তদা থাকব না।'

'তোমার অন্য নাম হবে, তাই না?'

'শুধু অন্য নাম? জন্মান্তর ঘটে যাবে।'

দীপু গালে এক টুকরো আমসত্ত পুরে নিয়ে স্লেটে বোধ হয় কাক আঁকবার চেষ্টা করছিল একটা। হঠাৎ 'কাঁচপোকা—কাঁচপোকা' বলে বাড়ির দক্ষিণের দেওয়াল বেয়ে যেখানে নীল অপরাজিতা ফুটেছে রাশি রাশি—ছুটে গেল সেদিকে। এ দিকে আমি হাঁ করে চেয়ে রইলুম সুমন্তদার মুখের দিকে।

'জন্মান্তর?'

'নিশ্চয়। তখন আমার আর কোনো পূর্বাশ্রম থাকবে না।'

'পূর্বাশ্রম? তার মানে কী?'

'আমি অন্য লোক। আমি সন্ন্যাসী। আমার মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন—ঘর-দুয়োর কিচ্ছু থাকবে না। আমি নতুন মানুষ। সুমন্ত বলে কেউ ডাক দিলে আর সাড়া দেব না আমি। তুই হয়তো বলবি—আপনি সুমন্তদা না?' আমি বলব—কে সুমন্তদা? ও নামের কাউকে তো আমি চিনি না। তোমাকেও চিনি না আমি।'

'সে কি!'

একটা অনুকম্পার হাসি সুমন্তদার ঠোঁটে: 'সন্ন্যাসের তাই নিয়ম।'

তাই নিয়ম? জন্মান্তর?

সামনে সমুদ্র। দুপুরের রোদে নির্জন নীলমণি রোডে ঢেউয়ের একটানা নিঃশ্বাসের শব্দ। তাল-নারকেলের হাওয়ার মাতামাতি। সুমন্তদার জন্মান্তর কি শেষ পর্যন্ত এস. কে ঘোষম হয়ে? এই ঘড়ি সারাইয়ের কাজই কি তাঁর সন্ন্যাসের শেষ লক্ষ্য? তাই কি আমাকে চিনেও চিনতে চান নি।

তবু সংসারের মায়া কেটেও তো কাটল না। তবুও তো বলতে হল শেষ পর্যন্ত: 'হাঁ মন্টু, আমিই তোমার সুমন্তদা।' লিখতে হল ঘড়ির রসিদে: 'নো চার্জ।'

শুধু একটা প্রশ্ন আমার বুকের ভেতরে কান্নার মতো কেঁপে উঠেছিল—আজ ত্রিশ বছর ধরে আমার মনের কাছে যে প্রশ্নের কোনো উত্তর মেলে নি।

'কল্যাণীদি কোথায় গেছে সুমন্তদা? জানেন আপনি? বলতে পারেন—কল্যাণীদি কোথায়?'

হয়তো কালা ঘড়ি ফেরৎ নিতে গিয়ে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হবে আমাকে। হয়তো এই প্রশ্নটা আমি কোনোদিন—কোনোমতেই জিজ্ঞেস করতে পারব না।

কিন্তু কল্যাণীদি-কে একটু সরিয়ে রাখতে হবে এখন। আর এরকম সমুদ্রের পাখি সামনে। আরো অনেক—অনেক স্মৃতি।

বোধ হয় দু-তিনটে বছর পেরিয়ে গেছে এর ভেতরে। দীপু এখন বড় হয়ে মেয়েদের প্রাইমারী স্কুলে পড়তে যায়, আমি উঠেছি আর একটু ওপরের ক্লাসে। এখন আর স্কুলের প্রাইজে যোগীনী সরকারের, ছড়া-গল্পের বই দেয় না—দেয় 'আশুতোষের ছাত্রজীবন', 'নিগ্রোজাতির কর্মবীর', 'হিরোজ অব বেঙ্গল', 'ল্যামস টেল্‌স্ ফ্রম শেক্‌সপীয়র'। এখন বর্ষা ছাড়া অন্য সময়ে আমি অনায়াসে আত্রাই নদী সাঁতরে পেরিয়ে যেতে পারি। বছর-খানেক আগে হাফ-প্যাডাল করে সাইকেল চালাতুম, এখন পুরো প্যাডাল করতে পারি। এখন জানি, বালুরঘাট এই জেলার একটা মহকুমা শহর—সেখানে যেতে রোমাঞ্চিত হওয়ার কিছু নেই—শুধু—শুধু ওই পাঠক দেউলের জঙ্গলটা ছাড়া।

ওই জঙ্গল—সেই ভাঙা মূর্তি—আজও আমার কাছে আতঙ্ক। আর পথের ধারে কোথায় সেই পাকুড় গাছটা? জানতে চাই না আমি, কিছুমাত্র উৎসাহ নেই জানবার।

'সুমন্তদা, আর আপনি অমাবস্যার রাত্রে জঙ্গলে যান নি তো?'

'গেলেও বলব নাকি তোকে? তুই যা কাওয়ার্ড!'

আর সুমন্তদা না বললেও জানবার উপায় নেই কোনো। বাইরের দিকের ঘরে সে শোয়। রাত্রে ঘরে তালা দিয়ে টুপ করে বেরিয়ে গেলে আর তেমনি চুপি চুপি ফিরে এলে কেউ টেরও পাবে না। সুমন্তদা কিছু বলে না, কিন্তু আমি ভাবতে থাকি, এতদিন সাধনা করে অনেক দূর এগিয়েছে নিশ্চয়, তার ডাক এবার এসে পড়ল বলে।

রাত্রে ঘুম না আসা পর্যন্ত 'বীর বাণী' শুনি, আরো কী সব সুর করে পড়ে, বুঝতেও পারি না—ঘরে তার নিজের হাতে তৈরি কেরোসিন-কাঠের সেল্‌ফ্ একটা, তাতে কিছু বই রাখা আছে—তাই থেকেই পড়ে নিশ্চয়। যেন অনেক দূরে থেকে গুন গুন করে অদ্ভুত রহস্যময় হয়ে পড়বার শব্দটা আসে, আমার গা ছম ছম করে, পাঠক দেউলের বন আর সেই ভয়ঙ্কর পাকুড় গাছটার কথা মনে পড়ে যায়।

কিন্তু সুমন্তদা আর শতমূলী আনতে চায় না—কবিরাজ মশাই মারা গেছেন।

সেই দিনটা ভেসে উঠল সামনে। বাবা বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে একটা অর্ধ-সাপ্তাহিক ইংরিজি খবরের কাগজ পড়ছেন। কাল সন্ধ্যায় ডাকে এসেছে সেটা। সেকালে বাংলাদেশের দূরের পাড়া-গাঁয়ে দৈনিক কাগজ এখনকার মতো পৌঁছুত না—সাপ্তাহিক—অর্ধ-সাপ্তাহিক বিরাট বিরাট খবরের কাগজেরই চলন ছিল বেশি।

আমি আর দীপু যথানিয়মে আর একটু দূরে মাদুরে বসে পড়া করছি। সুমন্তদা পড়াচ্ছে আমাদের। এখন আর আমাকে আগের মতো চোখ বুজে পড়াতে পারে না, ইংরিজি শব্দ দেখবার জন্যে কখনো ডিক্‌শনারী দেখতে হয়, নইলে বাবা কাছে থাকলে জিজ্ঞেস করতে হয় তাঁকে।

বাবা কাগজটা নামিয়ে চশমা খুললেন। ডাকলেন, 'সুমন্ত?'

'কিছু বলছেন কাকামণি?'

বাবা বললেন, 'তোমার আর নাসিমপুরের দিকে না যাওয়াই ভালো।'

রান্নাঘরে মা বোধ হয় শুনছিলেন।

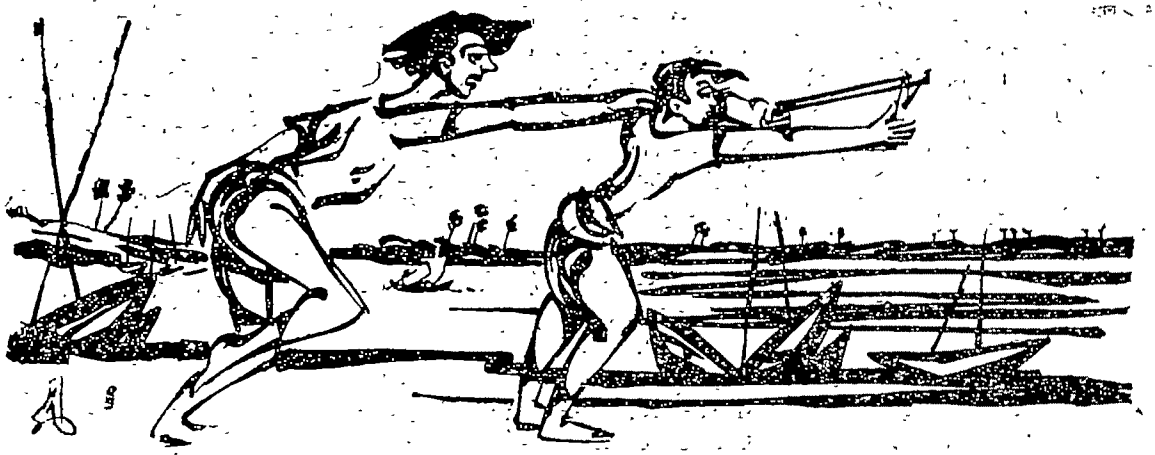

সুমন্তদা ফস করে আমার হাত থেকে গুলতি কেড়ে নিলে।

বাড়িতে বামুনঠাকুর আছে, তবু ঠাকুরের কাছে গিয়ে পিঁড়ি পেতে বসবেনই, মা-র এই নিয়ম। রান্নাঘর থেকে মা-র গলা পাওয়া গেল: 'হাঁ, ভালো করে বলে দাও ওকে। আমি তো ওর সঙ্গে কথায় পারি না—কী যে বলে যায় বুঝতেও পারি না সে সব।'

সুমন্তদার মুখ রাঙা হল।

'নাসিমপুরে যেতে বারণ করছেন কেন কাকামণি?'

খুব সোজা কারণ। ওই কলেরা এপিডেমিকের মধ্যে তোমার দৌড়োদৌড়ি করবার কোনো মানে হয় না।'

অতিমাত্রায় আশ্চর্য হয়ে গেল সুমন্তদা।

'আপনিও এ কথা বলছেন কাকামণি? এ অবস্থায়ও দেশের মানুষের সেবা করব না?'

আমি ফস করে বলে ফেললুম, 'হুঁ—সেই বুড়ীটা—'

'সেই বুড়ীটা মানে—' বাবা প্রশ্ন করলেন আমাকে।

সুমন্তদার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি সামলে নিয়েছি ততক্ষণে। বললুম, 'না বাবা, কিছু না।'

'কিছু না?'—বাবা আরো সন্দিগ্ধ হলেন।

মিথ্যে কথা বলা উচিত নয়, প্রাণান্তেও বলবে না—জীবন বিসর্জন দেবে সত্যের জন্যে। এই সব উপদেশ সুমন্তদার মুখ থেকে অনেকবারই শুনতে হয়েছে আমাকে। কিন্তু সেই মুহূর্তে বোধ হয় তার মনে পড়ল: 'সত্যম্ অপ্রিয়ম্' বা 'বিপজ্জনকম্' না বলাই এ ক্ষেত্রে প্রাজ্ঞতার কাজ হবে। ফস করে বলে বসল: 'না—মানে একটা বুড়ী একদিন ভিক্ষে করতে এসেছিল।'

বাবা বললেন, 'তা আসুক। কিন্তু নাসিমপুরে তোমার আর যাওয়ার দরকার নেই।'

আমি তো সাবধান হয়েই নার্স করি কাকামণি। তা ছাড়া বাড়ি ফেরবার আগে স্নান করে—ডাক্তারখানা থেকে ডিজ্‌ইন্‌-ফেক্‌টেড্ হয়ে—'

'সে কথা হচ্ছে না। এখন অনেক ডাক্তার এসে গেছেন ওদিকে, রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরাও কাজ করছেন। তুমি না গেলেও কোনো ক্ষতি হবে না।'

'কিন্তু কাকামণি, মানুষের সেবা—'

বাবা বাইফোক্যাল চশমাটা আবার পরে নিয়ে সুমন্তদার দিকে ভুরু কুঁচকে চাইলেন, পরপাঠ কুঁকড়ে গেল সুমন্তদা। বাবা বললেন, 'তুমি ভালো কাজ করছ, কোনো সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু তোমার সম্পর্কে আমাদেরও একটা দায়িত্ব আছে। তোমার যদি কোনো অসুখ-বিসুখ করে, তা হলে—'

বলতে বলতেই মা-ও বেরিয়ে এলেন রান্নাঘর থেকে।

'কালই তো তোর মা-র চিঠি পেয়েছি। লিখেছেন, আমার ছেলেটা পাগল, উহার মতি-গতির স্থির নাই। তোমাদের কাছে রহিয়াছে বলিয়া নিশ্চিন্ত আছি—সর্বদা দৃষ্টি রাখিয়ো।'

'হুঁ।'—বাবা আবার খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে বললেন, 'যা বললুম মনে থাকে যেন। আর নাসিমপুরে যাওয়ার কোনো দরকার নেই তোমার।'

সুমন্তদা ঘাড় নীচু করে বসে রইল গোঁজ হয়ে।

মা বললেন, 'কলেরার রুগী, তাই ঘাঁটতে যাচ্ছে রোজ। হাঁ রে, তোর ভয়-ডরও নেই নাকি?'

"ছিন্নকণ্ঠ ছাগের রুধির, দেখে তোর হিয়া কাঁপে? কাপুরুষ, ভয়ের আধার!" —সুমন্তদার মুখে বার বার শোনা এই সব বীরত্বব্যঞ্জক লাইন আমার মনে এসে গিয়েছিল, কিন্তু বুঝতে পারলুম আপাতত ওগুলো আবৃত্তি করা উচিত নয়।

বিকেলে স্কুল থেকে ফেরবার পরে মাঠের দিকে বকুলতলায় আমাকে ডেকে নিয়ে সুমন্তদা বললেন, 'দেখলি?'

বললুম, 'কী দেখব?'

'একেই বলে সংসার!'—বলেই বুক-ভাঙা এক দীর্ঘশ্বাস।

আমার হাতে একটা গুলতি ছিল, তাই দিয়ে আমি খানিক দূরে একটা চিলকে তাক করবার চেষ্টায় ছিলুম। সুমন্তদা ফস করে আমার হাত থেকে গুলতি কেড়ে নিলে।

'ধেত্তোরি গুলতি! একটা সিরিয়াস কথাও কি বলা যাবে না তোর সঙ্গে?'

আমি বললুম, 'কী হয়েছে?'

'বলছি না—সংসার একেই বলে?'

'কাকে বলে?'

'তোর মাথা যে কী মোটা!'—ভীষণ বিরক্ত হল সুমন্তদা: 'পাড়া গাঁয়ের ইস্কুলে দু-একটা প্রাইজ-ট্রাইজ পাস—বাঁশ বনে শেয়াল রাজা! দেখলি নে আমার অবস্থা? কাকামণি নাসিমপুরে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন।'

ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম হল এতক্ষণে।

'না-ই গেলেন আর। বাবা তো ভালো কথাই বলেছেন।'

'তোর মুণ্ডু!'—একটা বকুল গাছের তলায় বসে পড়ে সুমন্তদা বললে, 'অসুস্থ-পীড়িত মানুষকে সেবা করব—জীবনে এর চাইতে বড়ো কাজ আর কী আছে! তার জন্যে প্রাণ যায় তো যাক্ না। কিন্তু কাকামণি—'

কিছুক্ষণ চুপ। তারপর সুমন্তদা আবার বললে, 'সংসারের চেহারাই এই। স্নেহের বন্ধন, মায়ার বন্ধন। চারদিক থেকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে। আর মা-র কাণ্ডটাও দ্যাখ একবার—অত বিতং দিয়ে খুড়িমাকে চিঠি না লিখলেই হত না? যত সব!'

কী জবাব দিই? শুনে যেতে লাগলুম।

বকুলি মন্টু, এবার আমায় ছাড়তে হবে।'

'কী ছাড়তে হবে?'

'এই সংসার। এই স্নেহের বন্ধন। সব মায়া কাটিয়ে চলে যাব।'

'কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন, সময় হলে ডাক আসবে।'

'ডাক আসতে আসতে বুড়িয়ে যাব নাকি?'—স্টিমারে সেই স্বপ্নে দেখা মহাপুরুষের ওপর সুমন্তদার ভক্তি একটু টলেছে বলে মনে হলঃ 'এখন দেখছি সে আশায় বসে থাকলে আমি একেবারে পাঁকে ডুবে যাব! নিজের খেয়ালে কী স্বপ্ন দেখলুম—তাই আঁকড়ে ধরে বসে আছি, ব্যাস।'

'কিন্তু তোমাকে তো এক মহাপুরুষ স্বপ্ন দিয়েছিলেন।'

'রাখ তোর মহাপুরুষ! বেশ প্ল্যান করে বেলুড় যাওয়ার জন্যে বেরিয়েছিলুম—' সুমন্তদা গজ গজ করতে লাগলঃ 'সব গেল মাটি হয়ে। তাছাড়া এদিকে যে আরো কত ডেন্‌জারাস্ ব্যাপার ঘটছে—'

'কী ডেন্‌জারাস্ ব্যাপার?'

'কাউকে বলবি না?'

'না—কক্ষণো না।'

'কিন্তু এক্ষুণি তো সেই বুড়ীটার কথা প্রায় বলে দিয়েছিলি।'

মুখ ফসকে এসে গিয়েছিল। কিন্তু সামলে নিয়েছি তো। মাইরি বলছি সুমন্তদা, কাউকে বলব না আমি।'

আশ পাশে কতগুলো বকুল ফল ছড়িয়ে পড়েছিল, তারই একটা তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ নখ দিয়ে কুটি-কুটি করে কাটল সুমন্তদা। তারপর বললে, 'জানিস—দিন পনেরো আগে আমার মা কী একটা ভীষণ চিঠি লিখেছে আমাকে? শুনলে তোর মাথা ঘুরে যাবে।'

'সে আবার কী?'

'সেই কথাই তো বলছি। মা লিখেছে, বাবা সুমন্ত, আর কতদিন এভাবে বাউন্ডুলের মতো ঘুরিয়া বেড়াইবে। তোমার বয়স বাইশ বৎসর পার হইয়া গেল আমিও বুড়া হইতেছি, আর কতদিন এভাবে পড়িয়া থাকিব। আমি ভাবিয়াছি, এইবারে তোমাকে বিবাহ দিয়া সংসারী করিব—' বলতে বলতে সুমন্তদার মুখ রাঙা হয়ে উঠলঃ 'লোকের মা কত স্নেহময়ী হয়—যেন দয়ার প্রতিমা—খুড়িমাকেই দ্যাখ্ না! আর আমার মা? একেবারে সর্বনাশিনী!'

'এতে সর্বনাশের কী আছে সুমন্তদা?'—সরল বিশ্বাসে প্রশ্ন করলুম আমি।

'তাই যদি বুঝবি, তা হলে আর মাথা মোটা বলব কেন তোকে? মা আরো কী লিখেছে, জানিস? হারাণ দত্ত মশাইয়ের মেয়ে ফুলুকে তো দেখিয়াছি, এখন বেশ সুন্দর আর ডাগোর-ডোগর হইয়াছে। দত্তমশাই তোমার সাহত ফুলুর বিবাহ দিতে ইচ্ছুক। তিনি আরো বলিয়াছেন, এই কন্যাকে বিবাহ করিলে তিনি তোমাকে বাটাজোড়ের দত্তদের ওখানে একটি চাকুরির ব্যবস্থাও করিয়া দিবেন।'—সুমন্তদা প্রায় গর্জে উঠলঃ 'মা! জননী মা! তা নইলে একেবারে মাথায় পা দিয়ে ডোবানোর বন্দোবস্ত।'

'বেশ তো সুমন্তদা, আপনি বিয়ে করবেন—ভালোই তো।'

'চুপ কর বোকারাম। কিচ্ছু বুঝিস না তুই। বিয়ে করব—চাকরি করব—' সুমন্তদা যেন নিজের মা-কেই মুখ ভ্যাংচাতে লাগলঃ 'বাটাজোড়ের দত্ত বাড়িতে চাকরির ব্যবস্থা করিয়া দিবেন! —এই জন্যেই আমি স্বামীজীর বই পড়ি, মায়ের সাধনা করি।'

'বিয়ে করলে সাধনা হবে না সুমন্তদা?'

'চুপ কর, বলছি! ওরে গর্দভ, স্বামী বিবেকানন্দ বিয়ে করেছিলেন?'

'ন্—না তো।'

'আর বুদ্ধদেব কী করেছিলেন? ইতিহাস তো পড়েছিস।'

'স্ত্রী-ছেলে ফেলে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন।'

'আর শ্রীচৈতন্য?'

'ঠিক জানি না তো?'

'কী জানিস তা হলে? পাড়া গেঁয়ে ইস্কুলে প্রাইজ পাস—তাও আবার এই জংলা দেশে, বাঁশ বনে শেয়াল রাজা। পড়তিস অশ্বিনীকুমারের বরিশালের কোনো ইস্কুলে—প্রমোশনই পেতিস না।'

আমি ঘাবড়ে গিয়ে চুপ করে থাকলুম।

'শ্রীচৈতন্যও বউ ফেলে রেখে সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেলেন।'

আমি বললুম, 'বেশ তো। আপনিও তাই করুন। আগে বিয়েটা করে ফেলুন, তারপর বউ ফেলে সাধু হয়ে বেরিয়ে চলে যাবেন।'

সুমন্তদা অবাক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ফট্‌ফট্ করে চেয়ে রইল আমার দিকে।

'ইস, কী মাথামোটা! পেরেক ঠুকলেও ঢুকবে না দেখছি।'

আমি ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারছিলুম না। গালাগাল খেয়ে বসে থাকলুম ম্লান মুখে।

সুমন্তদা বললে, 'আমি মাকে খুব কড়া করে চিঠি দিয়েছি একটা। তাতে লিখেছি, খবর্দার, ভুলেও এই সমস্ত মতলব মনে আনিবে না। আবার যদি কোনোদিন আমাকে বিবাহের কথা লেখো—সেই দিনই আমি গেরুয়া পরিয়া হিমালয় পর্বতে রওনা হইয়া যাইব—কোনো জন্মেও আমাকে আর দেখিতে পাইবে না।'

আমি বললুম, 'জ্যেঠিমার মনে খুব কষ্ট হবে।'

'হোক গে। এইসব মায়ার বন্ধনে এমনি করেই ঘা দিতে হয়। কিন্তু আমি ভেবেছি আর একটা বছর দেখব।'

'কী দেখবে?'

'ডাক আসে কি না। যদি না আসে—'

'না আসে?'

'নিজেই চলে যাব একদিন।'

'কোথায়?'

'হিমালয়ে। মা-কে একদম বিশ্বাস নেই, বুঝলি? লোকের মা হয় মূর্তিমতী করুণার ধারা, আর আমার—'

...নীলম্ রোডে এক্কার আওয়াজ—টক টক করে ঘোড়ার পায়ের শব্দ। স্মৃতির ছবি বদলালো। বাড়িতে শনি-পুজো চলছে। আমাদের হেড পণ্ডিত মশাই 'শনির পাঁচালী' পড়ছেন সুর টেনে।

'শনিবারে শনিপুজা সব তেয়াগিয়া।
শনি তুষ্ট হলে তার দুঃখ নাহি ঘটে,
আপনি রাখেন শনি তাহাকে নিকটে—'

মা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সুমন্ত কই রে?'

'জানি না তো।'

'জানিস না কি রকম? রাতদিন শিষ্য হয়ে পেছনে ঘুরছিস, কোথায় গেছে সে খবর জানিস নে? দেখে আয় তো ডাক্তারবাবুর ওখানে, বোধ হয় পাশা নিয়ে বসেছে।'

'তাস-দাবা-পাশা—তিন কর্মনাশা—' মার মুখে শুনেছি। সুমন্তদার একটু পাশা খেলার ঝোঁক আছে—মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যেবেলায় ডাক্তারবাবুর ওখানে পাশার আড্ডাও বসে। কিন্তু নেশা ধরতে কখনো দেখি নি। যেই কখনো গিয়ে খবর দিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়েছে খেলা ফেলে।

ডাক্তারবাবু হয়তো বলেছেন, 'আরে উঠছ কেন, এই বাজীটা অন্তত শেষ করে যাও।'

'না কাকা, পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে বের করেছে ওরা—খেলা ঘুরে যাবে, অনেক দেরি হবে বাজী উঠতে। আমি চললুম।'

হয়তো দান ফেলতে যাচ্ছিল, হাতের পাশাগুলো ছড়িয়ে দিলে খড় খড় করে।

'আর কাউকে নিয়ে বসুন কাকা, আমি চললুম।'

না—কোনোদিন কোনো নেশা দেখি নি সুমন্তদার। অদ্ভুত নির্লোভ সে। সন্ন্যাসী হওয়ার জন্যেই যে জন্মায়—কোনো আসক্তিই থাকতে নেই তার।

মা-র কথা শুনে আমি ডাক্তারখানার দিকে চললুম সুমন্তদাকে খুঁজতে।

কিন্তু আজ যে পাশার আসর বসেনি সে দূর থেকেই দেখতে পেলুম আমি। খেলাটা হয় ডাক্তারখানার বারান্দায় মাদুর

পেতে, লণ্ঠন জেবলে। সেখানে আজ কেউ নেই। শুধু দুটো কুকুর ঘুমুচ্ছে সেখানে, আর সামনের ছোট মাঠটুকুতে কম্পাউণ্ডার-বাবুর আধ-পাগলা বুড়ো বাপ খুব বড় বড় পা ফেলে পায়চারী করছেন। এই ভদ্রলোককে দেখলেই আমার ভয় করে, খপ্ করে চেপে ধরে অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করতে থাকেন।

ইস্কুলে পড়িস, তাই না? শুনেছি তুই ভালো ছেলে। বল্ দিকি এ লাইন-গুলো কার লেখা?

ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে
যক্ষ-রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট-অট্ট হাসিছে?'

একমাত্র জব্দ থাকেন সুমন্তদার কাছে। ওই রকম কিছু জিজ্ঞেস করতে এলেই সুমন্তদা কট-কট-কটর-কটর করে কী সব ইংরিজি বলতে থাকে, কম্পাউণ্ডার-বাবুর বাবা বেমন ঘাবড়ে গিয়ে সুড় সুড় করে চলে যায় বাড়ির মধ্যে।

আমি তো এখন ইংরিজি পড়ি, কিন্তু সুমন্তদা যে কী বলে, তার এক বর্ণও বুঝতে পারি না।

একদিন জিজ্ঞেস করেছিলুম, সুমন্তদা, কী বললেন আপনি?'

সুমন্তদা গম্ভীর হয়ে বলে যেতে লাগল এই রকম কিছু শব্দ—আবছাভাবে যা মনে পড়ে: ইন দি লেবিরিন্থ অব ডিহাইড্রেটেড ক্যাটাক্লিজম, ইন্ট্রোস-পেকটিভ ক্যাটাকুম ওয়াজ ভ্যাকসিনেটেড্ বাই এ ভোসিফোরাস জারু স্টাপোজিশন অব দি ম্যাগনানিমাস হাইপোডার্মিক সীরিন্জ—'

শুনতে শুনতে মাথা ঘুরে গিয়েছিল। ঘাবড়ে গিয়ে বলেছিলুম, থাক্—থাক। মানে কী ওর?'

'মানে? মানে কি আমিই জানি নাকি একটা শব্দেরও? ডিক্সনারী থেকে জোগাড় করেছি ওগুলো। বুড়োকে ঘাবড়ে দিতে হবে তো। নইলে হয়তো ফস করে জিজ্ঞেস করবে:

চলে কপাল ধ-ধ-ধ
কার মাথা এটা হী হী হ
ধাকিটি ধাকিটি ধানিয়া?'

আরো আঁতকে আমি বলেছিলুম, এই কবিতাই বা কে লিখেছে সুমন্তদা?'

'দুত্তোর! কে জানে। বুড়োই লিখেছে হয়তো বা। পাগলের খেয়াল।'

পরে বড় হয়ে জেনেছি এ-সব কার লেখা। কিন্তু বুড়োকে দেখে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাবার পক্ষে এই যথেষ্ট।

আজও সামনের মাঠে বড় বড় পায়ে ভদ্রলোককে চক্কর বেড়াতে দেখে আমি আর দাঁড়ালুম না। তৎক্ষণাৎ এক দৌড়ে গঞ্জের রাস্তায়। কিন্তু সুমন্তদা গেল কোথায়? সেই আড়তদার শশীবাবুর ওখানে? কিন্তু সে তো অনেক দূরে।

ঠিক তখনি আর একটা কথা মনে পড়ে গেল আমার।

প্রবোধবাবুর খুব অসুখ রে! লোকটাকে দেখবার কেউ নেই। একলা ঘরে পড়ে ছটফট করছে।'

সুমন্তদা একবার বলেছিল কাল সকালে পড়তে বসার সময়।

প্রবোধবাবু—প্রবোধ মণ্ডল। ইউনিয়ন বোর্ডের কেরাণীবাবু। শীত-গ্রীষ্ম বারো মাস একটা ছেঁড়ামতন কোট গায়ে। লম্বা রোগা চেহারা—ঘাড় কুঁজো—চোখের চশমাটাকে দাড়ি বেঁধে পরতে দেখেছি কখনো কখনো। বিদেশী মানুষ—উলুবেড়ে না কোথায় যেন তাঁর বাড়ি। দেখলেই মনে হয়, কখনো হাসেন না, খুশি হন না—সব সময়েই তলিয়ে রয়েছেন কী একটা দুশ্চিন্তার ভেতরে। মুখে খোঁচা খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি, পাঁচ-সাতদিনে একবার কামাতেন বোধ হয়। আর হাটের দিনে দেখতুম—দাড়িতে বাঁধা একটা ছোট্ট মাছ আর একটা ছোট্ট লাউ কি কুমড়ো কিনে মাথা নামিয়ে টুকটুক করে হেঁটে যাচ্ছেন বাসার দিকে।

এই প্রবোধবাবুর অসুখ। দেখবার কেউ নেই তা-ও শুনেছি। তা হলে নিশ্চয় সুমন্তদা গেছে তাঁর ওখানেই। ওর পক্ষে এটাই স্বাভাবিক।

প্রবোধবাবুর বাসা গঞ্জ থেকে একটু একটেরেয়। একটা পুরনো অন্ধকার আম-বাগান পেরিয়ে তাঁর বাসা। মাটির দেওয়াল, টালীর চাল। দূর থেকে বাসাটা আমি দেখেছি, আর দেখেছি তার মাটির দেওয়ালের নীচের দিকের অনেকটা জায়গায় গোল করে নতুন মাটি লেপা। এক সময় বড় একটা সিঁদ কেটেছিল ওখানে।

যেতে যেতে আমার ভয় করতে লাগল। কী তিথি ছিল জানি না—আকাশে চাঁদ নেই। আমবাগানটায় থমথম করছে অন্ধকার। এদিকে একটা ডোবার পাশে দু-তিনটি কুলগাছে ঝকঝক করছিল জোনাকি।

মাথার ওপর দিয়ে বাদুড় যাচ্ছিল। নির্জন জায়গাটা—আমবাগানের দিকে তাকিয়ে বুক কাঁপছিল আমার। আমি কাঠ পাতা সিঁড়ি বেয়ে মেটে দাওয়ায় উঠলুম। সামনে ভেজানো কপাট। ভেতর থেকে আবছা আলোর সরু রেখা একটা দরজার জোড়ের ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে বারান্দায়। কোনো সাড়া-শব্দ নেই কোথাও। শুধু মনে হল, ভেতরে কে যেন জড়ানো গলায় বিড় বিড় করে কথা বলছে।

কী করব বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইলুম একটু। তারপর আলতোভাবে দু-তিনটে টোকা দিলুম দরজায়।

'কে?'—চমকে উঠে কে যেন সাড়া দিলে ভেতর থেকে। ঠিকই আন্দাজ করেছি আমি। সুমন্তদার গলা। এখানেই রয়েছে সে।

'আমি মণ্টু।'

'মণ্টু?'—সুমন্তদার স্বর আর এক-বার চমকালো: 'তুই এখানে?'

দরজাটা খুলে গেল। ঘরের ভেতরে লণ্ঠনের লাল আলো—সুমন্তদা পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছে, আমি তার মুখ দেখতে পাচ্ছিলুম না। একটা অচেনা ছায়া মূর্তির মতো মনে হল তাকে।

সুমন্তদা ফিসফিস করে বললে, 'মণ্টু, তুই এখানে কেন?'

'বা-রে, বাড়িতে যে শনিসেবা। মা খুঁজছিল আপনাকে।'

'আমি যে এখানে তা কী করে জানলি?'

'ডাক্তারখানায় গিয়েছিলুম—সেখানে কাউকে দেখলুম না। তখন মনে পড়ল, আপনি বলেছিলেন প্রবোধবাবুর খুব বেশি অসুখ, দেখবার কেউ নেই, তাই আমি ভাবলুম, আপনি হয়তো—'

কথাটা শেষ পর্যন্ত শুনল না সুমন্তদা—মাঝখানেই বাধা দিলে। গলাটা কাঁপতে লাগল তার।

'হাঁ রে, সত্যিই খুব বেশি অসুখ। বুঝলি, লোকটা বাঁচবে না।'

বলার ভঙ্গিতে ধক্ করে উঠল আমার বুকের মধ্যে।

সুমন্তদা বললে, 'তুই এসেছিস, খুব ভালো হয়েছে। আমি ভারী মুস্কিলে পড়েছি—বুঝলি? লোকটার বিছানার পাশে এখন আমি ছাড়া কেউ

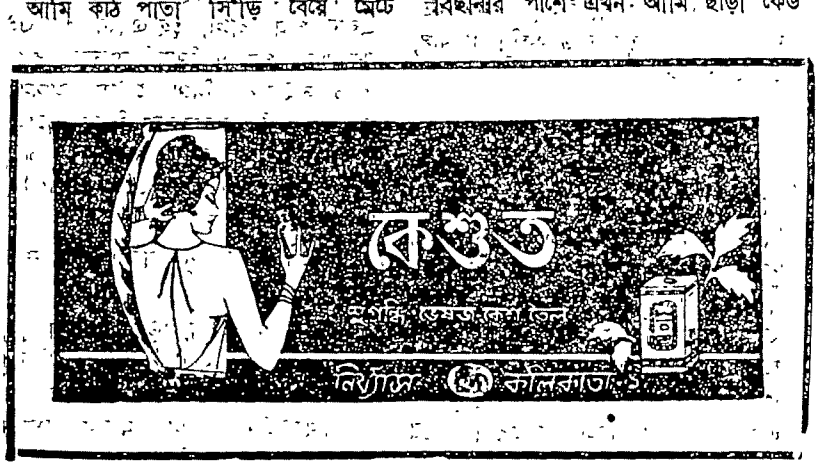

—'এই—এই শুনছিস?'

নেই। ইউনিয়ন বোর্ডের যে দুটো পিয়ন রাত জাগে পালা করে, তারা আসবে খেয়ে-দেয়ে, রাত ন'টা-সাড়ে ন'টায়। অথচ, আমার একদম ভালো লাগছে না রে। লোকটা যেন কি রকম করছে। একবার ডাক্তার দেখানো দরকার। অথচ আমাদের ডাক্তারবাবু কোথায় দূরে কলে গেছে, কখন আসবে ঠিক নেই। এখন হবিব ডাক্তারকে ডেকে আনা যায়—সেও তো অনেক দূরে। প্রবোধবাবুর একটা পুরনো সাইকেল আছে, নিয়ে যেতে পারবি তুই?'

কিন্তু হবিব ডাক্তার কোথায় থাকে আমি তো জানি না সুমন্তদা।'

'হুঁ। হবিব ডাক্তার থাকে বন্দর ছাড়িয়ে আর একটু দূরে, কাজীপাড়ায়। তোর খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে, তা ছাড়া এই পুরনো সাইকেল দিয়ে এত রাতে অত দূরেও পাঠাতে পারি না তোকে। অথচ লোকটাকে একলা ফেলে—' একবার থামল সুমন্তদা: 'একটু বসতে পারবি মন্টু রোগীর কাছে? আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব।'

গায়ের ভেতরে আমার শিরশির করে উঠল: 'কেন পারব না? তবে দেরী হলে মা—'

'খুড়িমা সব বুঝবেন। বেশি তো নয়, আধঘণ্টা। তুই যাতে বকুনি না খাস, সে আমি দেখব।'

'আচ্ছা।'

'তবে আয় ভেতরে।'

প্রবোধবাবুর ঘরটা আমি বাইরে থেকে দেখেছি, ভেতরে ঢুকিনি। আজ পা দিতেই যেন অন্তরাত্মা চমকে উঠল। মাথার কাছে একটা টুলের ওপর চিমনিতে কাগজের পুটি আঁটা লণ্ঠন—তার মাথাটা আবার ভাঙা হু-হু করে ধোঁয়া উঠছে সেখান দিয়ে। আর একটা টুলের ওপর একরাশ ওষুধের শিশি, জলের গ্লাস, একটা পেয়ালা। হাতলভাঙা একটা কাঠের চেয়ার টানা রয়েছে বিছানার পাশে, তার ওপর একটা তালপাতার পাখা—ওই চেয়ারে বসে বোধ হয় রোগীর মাথায় হাওয়া করছিল সুমন্তদা। ঘরের আর একটা দিক প্রায় অন্ধকার, সেখানে দু-একটা বাক্স-টাক্স কী দেখা যায়—একটা দড়িতে কতগুলো কাপড়-জামা—তার ওপারে খোলা জানলা দিয়ে ভূতুড়ে আম-বাগানটার চেহারা। অসুখ আর ওষুধের গন্ধভরা অদ্ভুত দমচাপা আবহাওয়া একটা—মাথার ওপর তালকাঠের আড়া-গুলো যেন হাত বাড়িয়েই ছোঁয়া যায়।

কিন্তু তারও চাইতে অস্বস্তিকর রোগীর চেহারা।

মুখ ভরে গেছে কাঁচা-পাকা দাড়িতে। আরো তুবড়ে গেছে ভাঙা গাল দুটো। বুক থেকে গলা পর্যন্ত কাঁপিয়ে বড় বড় নিশ্বাসের ঢেউ উঠছে।

এই ঘর—এই সব গন্ধ, ভাঙা লণ্ঠনের লাল আলোয় ঘরময় ছায়ার নাচানাচি—আমার প্রথমেই মনে হল এক ছুটে পালিয়ে যাই এখান থেকে। কিন্তু আমি নড়তে পারলুম না।

সুমন্তদা বললে, 'ওই শ্বাসটাই আমার ভালো ঠেকছে না, মন্টু। ওটা—' একটু থেমে বললে, 'তুই একটু বোস ওই চেয়ারটায়, পাখাটা নিয়ে বাতাস কর। আমি সাইকেলটা নিয়ে দৌড়ে আসব। যদি আমাদের ডাক্তারবাবু ফিরে থাকেন, তা হলে তো এক্ষুণি আসছি। আর হবিব ডাক্তারকে আনতে হলে—আধঘণ্টা। বসতে পারবি না?'

পারব না বললেই বাঁচা যেত। বলা গেল না।

সুমন্তদা বললে, 'তুই ছেলেমানুষ, তোর একটু ভয় করতেই পারে। কিন্তু ভয়ের কী আছে রে? মনে রাখিস বীরবাণী, মনে রাখিস মায়ের সেবক কাউকে ভয় পায় না। আচ্ছা—আমি চললুম, আর সময় নেই।'

পুরোনো সাইকেলটা বোধ হয় বারান্দায় রাখা ছিল, আমি দেখি নি। সুমন্তদা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। সাইকেলটা নিয়ে রাস্তায় নামল, চলে গেল—সে আওয়াজও পেলুম।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, এখন আমি একা। তেরো বছর বয়েসে একা রোগীর ঘরে। খোলা জানলাটা দিয়ে অন্ধকার আমবাগানের হাওয়া আসছিল, লণ্ঠনের শিখা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছিল সে হাওয়ায়, ঘরময় যেন কতগুলো অশরীরীর নাচ চলছিল। তালকাঠের আড়াগুলো যেন চেপে ধরছিল মাথার ওপর। আর অসুখের গন্ধ, ওষুধের গন্ধ, মাটির ঘরের গন্ধ, রোগীর ময়লা বিছানার গন্ধ। দম আটকে আসছিল যেন।

আর বিছানার ওপর রোগী চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। মুখভরা খোঁচা খোঁচা দাড়ি, তোবড়ানো গাল দুটো বসে গেছে আরো। নিশ্বাসের ঢেউ উঠে পেট থেকে গলা পর্যন্ত দুলিয়ে দিচ্ছে—থেকে থেকে একটু-একটু হাঁ হয়ে যাচ্ছে মুখটা।

সেদিকে আমি চাইতে পারলুম না। মাথাটা সামনের দেওয়ালের দিকে ফিরিয়ে—ছায়ার নাচ দেখতে দেখতে প্রাণপণে হাওয়া করে যেতে লাগলুম হাতপাখাটা দিয়ে।

কতক্ষণ কেটেছে, জানি না। ডান হাত ধরে গেলে পাখাটা বদলে নিচ্ছি বাঁ হাতে। এমন সময় শাঁ-শাঁ করে চাপা গলায় কে বললে, 'এই—এই শুনছিস?'

ভয়ানক চমকে আমি চেয়ে দেখলুম। চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন প্রবোধবাবু। কিন্তু কী ভয়ঙ্কর সেই চোখ! যেন রক্তে ছোপানো। হাওয়ার কাঁপন-লাগা লণ্ঠনের লাল আলোয় সেই

চোখ দেখবামাত্র অন্তরাত্মা একেবারে শুকিয়ে গেল আমার।

চোখ দুটো মেলে আছেন আমার দিকেই, অথচ আমাকে দেখছেন না। সেই রক্তমাখা চোখের তারা যেন ঘরের আড়ায়—ছায়ানাচা কোণে কোণে ঘুরে ঘুরে কী খুঁজছে।

'এই—শুনতে পাচ্ছিস, এই?'

বড় বড় নিঃশ্বাসের সঙ্গে চাপা গলার কাঁপা-কাঁপা ডাক যেন দূর-দূরান্ত থেকে আসতে লাগল আমার কাছেঃ 'তাড়িয়ে দে—তাড়িয়ে দে। তক্তার তলায় দুটো বড় বড় শেয়াল ঢুকল—দেখছিস না? তাড়িয়ে দে শীগগির—'

আতঙ্কে সিঁটিয়ে গিয়ে আমি ক্ষীণ-স্বরে বললুম, 'কই—কোথায় শেয়াল?'

'আছে! আছে শেয়াল। কে ঘুরছে চালের ওপর দিয়ে—কে? কারা ওখানে? এই খোল্ দরজাটা, এক্ষুণি খোল্—বাইরে কারা সব দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখছিস না? খুলে দে—খুলে দে দরজা—'

সেই বয়সেও আমি জানতুম ও ডিলিরিয়ম—অসুস্থ মনের প্রলাপ। কিন্তু বাইবে জংলা আমের বাগানটায় হাওয়া দিয়েছিল, শাঁ শাঁ করে শব্দ আসছিল তার—খোলা জানলা দিয়ে মনে হচ্ছিল অসংখ্য কালো কালো ছায়া জড়ো হয়েছে সেখানে; চারদিকের সেই কুৎসিত নির্জনতার মধ্যে আমি অনুভব করছিলুম ঘরের মধ্যে অনেকগুলো অদৃশ্য প্রাণীর পদসঞ্চার হচ্ছে, তারা শেয়ালের মতো দেখতে—অথচ শেয়াল নয়; আমি টের পাচ্ছিলুম দরজার বাইরে কখন নিঃশব্দে জড়ো হয়েছে অনেকে, একবার খোলা পেলেই তারা এই ঘরের ভেতরে চলে আসবে।

'আসতে দে—আসতে দে ওদের—' শ্বাসের টানটা ঘড় ঘড় করতে লাগল গলায়ঃ 'দরজা খুলে দে। কে—কে চলে বেড়াচ্ছে চালের ওপর? ওরা কারা?'

অমানুষিক ভয়ে আমার সব অনুভূতিগুলো লোপ পেয়ে গেল। হাত থেকে কখন ঠক করে নীচে খসে পড়ল তালপাতার পাখাটা, আমি টেরও পেলুম না।

রক্তমাখা চোখ দুটো বুজে গেল আবার। বড় হতে লাগল মুখের হাঁ-টা। আরো কিছু বলছিলেন হয়তো, কিন্তু সব মিলিয়ে গেল গলার ঘড়ঘড়ানির ভেতরে। তারপর সেই আওয়াজটা বাড়তে লাগল, আরো বেড়ে চলল—যেন সমস্ত ঘরটাকে ভরে দিলে। তারও পরে—

প্রকাণ্ড একটা নিশ্বাসের ঢেউয়ে সারা শরীর দুলে উঠল প্রবোধবাবুর—মরা মাছের মতো হাঁ হয়ে গেল মুখটা, মাথাটা বালিশের একদিকে কাত হয়ে গেল। একটা হাতে মুঠো করে ধরেছিলেন বিছানার চাদর, ধীরে ধীরে মুঠোটা খুলে ছড়িয়ে পড়ল আঙুলগুলো।

তারপর সব শান্ত।

বাইরে কখন দুটো সাইকেলের শব্দ উঠেছে টেরও পাই নি। দরজাটা খুলে যেতে আমি বিহ্বল চোখে সেদিকে তাকালুম। সব ছায়া-ছায়া লাগছিল, তবু চেতনার শেষ কেন্দ্রে পৌঁছে আমি বুঝতে পারলুম পাকা দাড়িওলা লম্বা ফর্সা মানুষটি হবিব ডাক্তার, তাঁর পেছনে সুমন্তদা।

'কেমন আছেন উনি—' বলতে গিয়েই সুমন্তদা থমকালোঃ 'একি!'

স্বপ্নের মধ্যে হবিব ডাক্তারের গলা শুনতে পেলুমঃ 'কেন আর আমাকে খামোখা ডেকে আনলে হে? দেখবার তো আর কিছু নেই—হি ইজ্ ডেড।'

ওইটুকুই বাকী ছিল আমার। কখন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলুম মনে নেই, এবার আমি সোজা টলে পড়ে গেলুম মাটিতে।

পৃথিবী মুছে গেল।

সেই আমার প্রথম দেখা—মৃত্যুর সঙ্গে।

॥ ছয় ॥

সামনে একটানা সমুদ্রের শব্দ। প্রবোধ মণ্ডলের শ্বাস টানার কথা মনে পড়ে যায়।

তারপরে তো কত মৃত্যু এল গেল। সুমন্তদা বুড়ো হয়ে গেছেন, আমি কবে পার হয়ে গেছি যৌবনের সীমা। আর এই বেঁচে থাকার দিনগুলো যত বেড়ে চলে, ততই তো মৃত্যুর সঙ্গে দেখা হতে থাকে বার বার। আত্মজনেরা চলে যায়, বন্ধুরা হারায়, কতবার শ্মশানে যাই, কত চিতার আগুনে দেখি মরণ-মহেশ্বরের আরতি চলছে।

সুমন্তদা এই জীবনের সব কিছু আমায় চিনিয়ে দিয়েছিল বুঝি। মৃত্যুকেও। আমি এখনো চোখ বুজলে সেই কেরোসিনের লাল আলোয় ছায়া-নাচা ঘরটাকে দেখতে পাই—সেই আতঙ্ক এখনো চমক দিয়ে ওঠে বুকের ভেতর, এখনো আমার কানের কাছে সেই টানা-টানা শ্বাসের স্বর আসেঃ 'খাটের নীচে দুটো শেয়াল ঢুকেছে, দেখছিস না? তাড়িয়ে দে—তাড়িয়ে দে।'

আজ জানি, প্রবোধ মণ্ডল মারা গিয়েছিলেন মেনিনজাইটিসে।

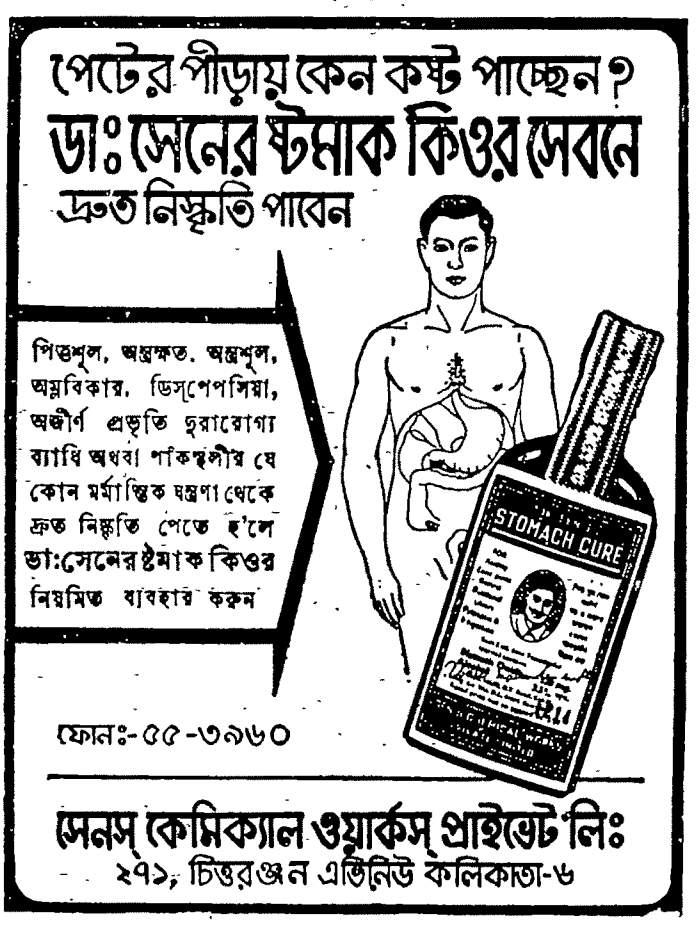

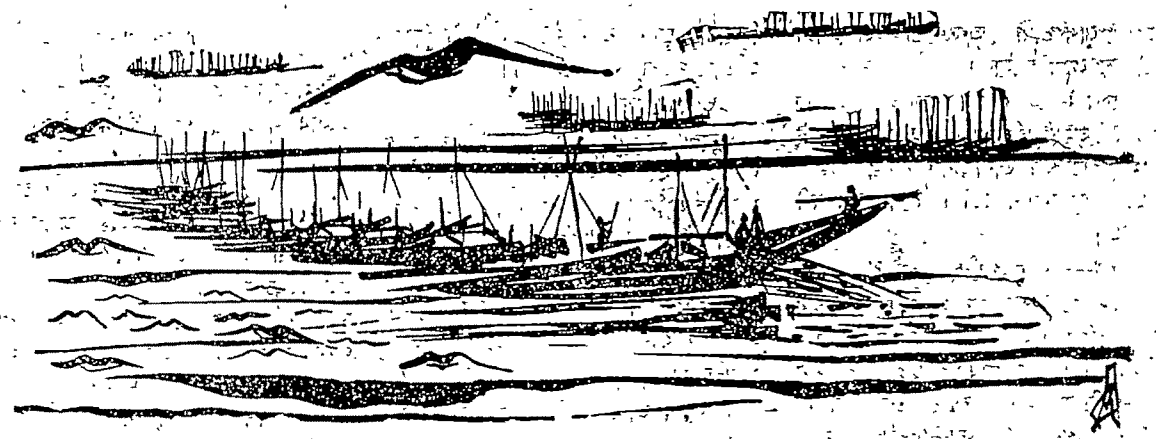

প্রকাণ্ড নদীতে কোথাও এখন বেড়াজাল পড়েছে—কোথাও দল বেঁধে বেরিয়েছে জেলেডিঙি।

সমুদ্রের ওপর রোদটা যেন নীল হয়ে জ্বলছে। এখনো ফিরছে জেলেদের নৌকো। চকচকে মাছে ভরা ওদের জাল। সমুদ্রে ওরা ইলিশ মাছও ধরে নিশ্চয়। কিন্তু সে মাছের স্বাদ ভালো নয়, পুরীতে খেয়ে দেখেছি।

ইলিশ মাছ!

স্মৃতিতে আবার ছবি পড়ল।

উত্তর বাংলার সেই দূরের গ্রাম—যেখান থেকে অন্তত মাইল তিরিশেক না গেলে ছোট একটা রেল স্টেশনেরও দেখা পাওয়া যায় না—সেখানে ইলিশ মাছ ছিল আমাদের কাছে স্বপ্ন। আমার আবছা মনে পড়ে আমাদের ঘরের দেওয়ালে কৃষ্ণনগরের তৈরির মাটির ইলিশ ঝুলত এক জোড়া। খুব সম্ভব বরিশালের মানুষ বাবা ওই মাছ দুটোর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সখী হতেন।

কালে-ভদ্রে হাঁড়িতে করে কোথা থেকে আসত যেন নোনা ইলিশ। আর তাতেই বাড়িতে উৎসব পড়ে যেত।

সুমন্তদা একদিন বললে, নোনা ইলিশ! ধ্যেৎ! দেশে আবার লোকে খায় নাকি ওগুলো?

মা বললেন, কী করা যাবে, এই তো পাওয়া যায় না এখানে।

সুমন্তদা বললে, বোগাস—বোগাস জায়গা। এত দেশ থাকতে কেন যে কাকামণি চাকরি নিয়ে এল এখানে! ইলিশ মাছের জন্যে আপনার মন কাঁদে না খুড়িমা?

মা মুচকে হেসে বললেন, বিশেষ না।

সেকি কথা! বরিশালের মেয়ে হয়ে—

মা তেমনি হাসতে হাসতে বললেন: না বাবা, আমি চব্বিশ পরগনার মেয়ে। নৈকষ্য কুলীন খাঁজেতে গিয়ে আমার বাবা আমাকে তোমাদের বাঙাল দেশে চালান করেছেন। আর তখন থেকে তোমার কাকাবাবু কেবল চাকরিতে ঢুকে বসিরহাটে পোস্টেড হয়েছেন—নইলে বাঙালের ঘরে আসবার কপাল আমার হত না।

হোপলেস খুড়িমা, একেবারে হোপলেস। আপনি ইলিশের মর্ম কী বুঝবেন?

জবাব না দিয়ে মা রান্নাঘরে চলে গেলেন। নোনা ইলিশ রান্নার ঝঞ্ঝাট অনেক—হিন্দুস্থানী ঠাকুর পেরে উঠবে না।

সুমন্তদা দাওয়ায় পা ছড়িয়ে গান ধরল: 'ও আমার ইলিশা রে—'

দীপু খিলখিল করে হেসে উঠল: 'এ আবার কী গান!'

'ভাগ্। পুচকে ফাজিল কোথাকার! ইল্‌শা মাছে উড়িষ্যা বলে আমার বড় ঘেড়ি, আমার লাইগ্যা সাজিয়া রইছে উজীরপুরের বড়ি—ও আমার ইলিশা রে—'

আমি হাঁ করে চেয়ে রইলুম। সুমন্তদা বললে, কি রকম লাগল?

কিছু বুঝতে পারলুম না।

নাঃ, তোর মাথায় সত্যিই কিছু নেই। জ্বালে ইলিশ মাছ উঠল। উঠে কী বললে? আমার বড় ঘেড়ি—অর্থাৎ আমার ঘাড়টা খুব মোটা। আমাকে কে কাটবে? না—আমার জন্যে উজীরপুরের বড়ি—

আমি বললুম, বড়ি মানে তো ইংরিজি। বড়ি মানে শরীর।

তোর মুণ্ডু। বড়ি মানে কাঁটি, বরিশালে ওই রকম বলে। ইলিশ মাছ বললে, আমাকে কাটবার জন্যে উজিরপুরের বটি তৈরি হয়ে রয়েছে।

উজিরপুর! সে কোথায়?

আমার গ্রাম থেকে বেরিয়ে প্রথম গেলি মাহিলাড়া। সেখান থেকে গেলি বাটাজোড়—হু হু—অশ্বিনী দত্তের গ্রাম। সেখান থেকে শিকারপুর—যেখানে আবার বাড়ি আছে—একঘর পীঠের এক পীঠ। শিকারপুর থেকে শোলোক—শোলোক পার হয়ে—

বরিশালের ভূগোল শুনতে শুনতে মাথা ধরে গেল।

উজিরপুরের কথা বলুন সুমন্তদা।

আরে তারপরেই তো উজিরপুর। আমার মেজো পিসিমার বাড়িই তো সেখানে। বুঝলি সেখানকার দা-বটি, তার তুলনাই হয় না। উজিরপুরের বটি আর ইলিশ মাছ—ব্যাস, আর দেখতে হবে না।

আমার ইলিশা রে—

একটু চুপ করে থাকল সুমন্তদা। তারপর বললে, আমি তো সব ছেড়েই এসেছি, আমার আর মায়ার বন্ধন বলতে কী-ই বা আছে। তবু কখনো কখনো ইচ্ছে করে দেশে যাই।

আবার চুপ করল। দিনটা মেঘলা, আকাশ অন্ধকার। থেকে থেকে বৃষ্টি চলছে সমানে। আমাদের বাড়ির সামনের গাছটা থেকে কদমফুলগুলো ঝরে ঝরে পড়ছে জলে-কাদায়। বাগান থেকে যুঁইয়ের গন্ধ, কামিনীর গন্ধ। ভরা বর্ষায় খ্যাপা নদী আত্রাই ছুটেছে ঘোলা জলের ঘূর্ণি ঘুরিয়ে। সাঁতার শিখেও সে নদীতে এখন নামবার কথা ভাবতে পারি না আমি, সুমন্তদাও না। জল অসম্ভব বেড়েছে, খেয়া বন্ধ। আমি আশায় আশায় মধ্যে মধ্যে তাকাচ্ছি বোয়ার মতো মেঘ উড়ে যাওয়া আকাশের দিকে—বৃষ্টিটা একটু চেপে নামলেই আজ স্কুলে নির্ঘাত রেনি-ডে। কয়েকটা ছোট-বড়ো ব্যাং এসে লাফালাফি করছে উঠোনে, দীপু একটা কাঠি দিয়ে তাদের খোঁচা-খুঁচি করছে আর রান্নাঘর থেকে মা দীপুকে বকছেন।

আত্রাইয়ের সেই একটানা ডাক কিছুক্ষণ কান পেতে শুনল সুমন্তদা। একটা নিশ্বাস ফেলল।

এই তো ইলিশের সময়—বুঝলি। মেঘের ডাকে নেচে ওঠে মাছের ঝাঁক, উল্লসে ওঠে জলের ওপর। প্রকাণ্ড নদীতে কোথাও এখন বেড়াজাল পড়েছে—কোথাও দল বেঁধে বেরিয়েছে জেলেডিঙি। জেলের পাশে জালের দড়ি জড়ানো, হাতে বৈঠা। জালের দড়িতে

[শেষাংশ ১২৪ পৃষ্ঠায়]

পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভবিষ্যত ও আগামীদিনের রাজনীতি

কৃত্তিবাস ওঝা

পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার কতদিন টিকবে? পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকারের যুক্ত-দলগুলি কতদিন যুক্তফ্রন্টে থাকবে? যদি যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন হয়, যদি যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যায়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কী—এই প্রশ্নগুলি সাধারণভাবে উচ্চারণ করা দূরে থাক, প্রকৃতপক্ষে মনে আনাও মানা। কিন্তু মন হলো এমন একটা বস্তু—যে সব সময় আইনের কথাও মানে না, কোন নীতিরও ধার ধারে না, কারও প্রতি ভয়-ভীতিতে নতিস্বীকারও করে না। তাই পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার চলতে চলতে যখনই কোন শরিকী সংঘর্ষে হোচট খায়, তখন সরকারের টাল-মাটাল অবস্থা দেখে মনের কোণে এই প্রশ্ন জাগে—এই সরকার কতদিন চলবে অথবা এইভাবে কতদিন চলতে পারে। অবশ্য এই প্রশ্নগুলি সোচ্চারভাবে তোলবার সাহস কারো হবে না। কারণ এই প্রশ্ন যিনিই তুলবেন, পরিণামে তাঁকে নানা বিশেষণে ভূষিত হতে হবে। যেগুলি কারো পক্ষেই অভিপ্রেত নয়।

কিন্তু তবু প্রশ্ন উঠছে। প্রশ্ন উঠছে ভোটের দিকে তাকিয়ে, প্রশ্ন উঠছে পশ্চিম-বঙ্গের যুক্তফ্রন্টের শরিকী সংঘর্ষ দেখে। অন্য কোন কারণে না হোক, অতি নিষ্পাপ মন নিয়েও একটু হিসেব করে দেখা যাক না।

সত্যিই যুক্তফ্রন্ট তার নির্দিষ্ট সময় যুক্তভাবে থেকে সরকার চালাতে পারবে? যদি না পারে, তবে তার বিকল্পে কী!

১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিম-বঙ্গের রাজনৈতিক নির্বাচনোত্তর আধুনিক পরিস্থিতি ও দলীয় শক্তির হিসা-নিকাশে যে পরিস্থিতি ছিল, ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর পরিস্থিতি এক নয়।

১৯৬৭ সালের হিসাব নিকাশে যে পরি-স্থিতি ছিল, তাতে যে কোন এক পক্ষকে বাদ দিয়ে আর এক পক্ষ সরকার গঠন করতে পারতেন, অথবা দলত্যাগ করে পক্ষ পরিবর্তন করে সরকারের পতন ঘটানো সম্ভব ছিল। যে কারণে, ১৯৬৭ সালে ২রা অক্টোবর নামীয় ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। অথবা শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে সংখ্যালঘু সরকার গঠিত হয়েছিল, পরে, সেই সরকারের সঙ্গে কংগ্রেস যুক্ত হয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়েছিল। আবার শ্রীআশুতোষ ঘোষ ও শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জির নেতৃত্বে কিছু সদস্যের দলত্যাগে সেই সরকারের পতন ও রাষ্ট্রপতি শাসন কায়েম সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু আজ যে কোন হিসাবই করা যাক না কেন, যখন একদিকে যুক্তফ্রন্টের নিজস্ব শক্তি দুই শত আঠাশ, কংগ্রেসের শক্তি পঞ্চান্ন, তখন অঙ্কের হিসাবে কোনভাবেই বর্তমান সরকারের বিকল্পে অন্য কিছু চিন্তা করা সম্ভব নয়।

কিন্তু রাজনীতি হল এমন একটা বস্তু, সেখানে অঙ্কের হিসাব বা মনের কোন চিন্তা কখনই ছকে বাঁধা থাকে না। আকস্মিকভাবে এমন সব ঝড় অথবা ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়, যেটা আগে কখনই কল্পনা করা যায় না। কিন্তু মৌলিক প্রশ্নটা হল এই যে, পশ্চিম-বঙ্গে যুক্তফ্রন্ট দলগুলি কতদিন ঐক্যবদ্ধ থেকে সরকার চালাতে পারে?

প্রশ্নটা পশ্চিমবঙ্গের জন্য হলেও মূল প্রশ্নটা সারা ভারতে রাজনীতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আজ যদি প্রশ্ন করা যায়, ১৯৬৭ সালের পর যে সব রাজ্যে, যথা—বিহারে মহামায়াপ্রসাদ সিং-এর নেতৃত্বে উত্তরপ্রদেশে চরণ সিংএর নেতৃত্বে পাঞ্জাবে গুরুনাম সিং-এর নেতৃত্বে, মধ্যপ্রদেশে গোবিন্দনারায়ণ সিংএর নেতৃত্বে যে সরকারগুলি গঠিত হয়েছিল, সেই সরকারগুলির পতন ঘটল কেন? অথবা আরও স্থূলভাবে যদি প্রশ্ন করা যায়, '৬৭ সালের পশ্চিমবঙ্গের যুক্ত-ফ্রন্টের পতন হল কেন?

আবার একইভাবে যদি প্রশ্ন করা যায় উড়িষ্যায় শ্রীসিং দেওয়ের নেতৃত্বে, মাদ্রাজে আন্নাদুরাইয়ের পরে করুণানিধির নেতৃত্বে, এবং কেরলে নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বে সরকার টিকে আছে কেন? তাহলে সরকার ভেঙ্গে যাওয়া ও সরকার টিকে থাকা—এই দুইয়ের মধ্যে নিশ্চিতভাবে একটি রহস্য আছে, যে রহস্যে কিছু সরকার কদলী বৃক্ষের মত ঝড়ের আঘাতে ভূপাতিত হয়, আর কিছু সরকার প্রায় শাল বৃক্ষের মত অটুট থাকে।

এই রহস্যের সন্ধান পেলেই সরকারের স্থায়িত্ব ও ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা দুই সম্পর্কেই আঁচ করা যায়।

কিন্তু এই সব দর্শনের কথা বাদ দিলেও স্থূলভাবে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে হিসাব-নিকাশ করা যায়। পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত-ফ্রন্ট সরকার সব অবস্থার হিসাব-নিকাশ করে কতদিন টিকতে পারে।

বর্তমান যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্থায়িত্বকাল কী ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত হবে? '৭৪ সালই বা কেন? যদি বলি '৭৪ সালের পর আর পাঁচ বৎসর ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত হবে।

ঠিক একইভাবে প্রশ্ন হতে পারে—১৯৭৯ সাল সে ত বহু দূরের কথা, তার আরও অনেক আগেই বর্তমান সরকার ঊন-পঞ্চাশ বাযুর আক্রমণে ভেঙ্গে ছত্রদান হয়ে যাবে।

শ্রীপ্রফুল্ল সেনের সেই কথা—ছুচ, ইঁদুর, বিড়াল, গরু, ছাগল—এই সবকে জোটবদ্ধ করে কি রথ চালানো যায়? এর কোনটা সত্যি হবে!

হিসাবের সূত্রে প্রথম কথা বলতে হয়—পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভর করে প্রধানতঃ দুইটি পার্টির আচ-রণের উপর অর্থাৎ দুই কম্যুনিস্ট পার্টির সরকার সম্পর্কে কি মনোভাব গ্রহণ করবে তার উপর। যদি বলা যায়, মার্ক্সবাদী কম্যু-নিস্ট পার্টির শক্তি আশির কিছু উপরে। কম্যুনিস্ট পার্টির শক্তি তিপ্পান্নের কিছু উপরে। এরা দুইজন সরকার রাখতে অথবা ভাঙ্গতে কে?

দুশো আশিতে এই দুই পার্টির শক্তির মূল্য কতটা। কিন্তু প্রশ্নটা এইভাবে বিচার করলে সঠিক উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। তা যদি হতো, তাহলে কেরলে নাম্বুদ্রিপাদ সর-কার আজ কয়েক মাস ধরে বধ্যভূমিতে কি করে দাঁড়িয়ে আছে।

সেখানকার অবস্থাটা কী? একদিকে মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি আর একদিকে কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কয়েকটি দল।

অথবা কেরল কংগ্রেস দুই-ই এই শরিকী কাড়া এরিয়ার বাইরে। কেউ তাদের নিয়ে মাথা ঘামায় না। কেউ তাদের প্রকৃতপক্ষে পোছেও না।

কিন্তু অবস্থা কি হলো? মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি আজ স্পষ্ট ঘোষণা করছে যে, কেবল কংগ্রেস ও কেরলের সরকারী কংগ্রেসকে নিয়ে সি, পি, আই, আর, এস, পি প্রভৃতি নাম্বুদ্রিপাদ সরকারের পতন ঘটাতে বদ্ধপরিকর।

কাজেই পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে যদি কোন দিন দুই রকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাহলে কংগ্রেস দলের পঞ্চাস্ত্র অথবা প্রগতিশীল মুসলীম লীগ দলের তিন এই শক্তিও দেখা যাবে রীতিমত হিসাব-নিকাশের পর্যায়ে এসেছে। কাজেই কোন শক্তিই নগণ্য নয়। কোন শক্তি অগ্রাহ্য করার মত নয়। সমরমত অতি নগণ্য শক্তিও অসমান্য শক্তিতে সঞ্চয় হয়ে ঢুকে শালে পরিণত হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার অতি স্বচ্ছন্দ এবং জনগণের মঙ্গল বিধানের বহু কর্মসূচী রূপায়ণ করে চলেছে ও ভবিষ্যতে করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার বিগত কয়েক মাসে এমন সমস্ত কাজ করেছে, যে সমস্ত কাজের তুলনা ভারতবর্ষের কোন রাজ্যের কোন সরকার করে নি। এমন কি অনেকের পক্ষে এই সকল কাজ চিন্তারও অগম্য। কৃষকদের স্বার্থে, শ্রমিকদের স্বার্থে, শিক্ষক ও সরকারী কর্মচারী ও অগণিত সাধারণ মানুষ সরকারের বহু জনকল্যাণমূলক আইনে তার আগামী দিনের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, সুনিশ্চিত ও স্বপ্নময় করে তোলবার অবকাশ পাচ্ছে।

যদি রাইটার্স বিল্ডিং-এর মন্ত্রীদের দিকে তাকানো যায়, মন্ত্রীদের আচরণ ও তাঁদের কাজ বিচার করা যায়, তবে এই সরকারের বিকল্পে অন্য কোন সরকারের কথা চিন্তা করা যায় না।

অথবা এই সব দলের যে মন্ত্রীরা আছেন, তাঁদের স্থলে অন্য কোন দলের মন্ত্রীদের কথাও ভাবা যায় না।

কিন্তু এই সত্যের পাশে আর একটি সত্যও কী ধীরে ধীরে প্রকট হয়ে উঠছে না? সে সত্য হ'ল, সি, পি, এম বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে এগিয়ে চলেছে যে সি, পি, আই যে কোন প্রকারে তাদের ক্ষমতাচ্যুত করতে চায়। সি, পি, আই, সি, পি, এমের কুৎসা গেয়ে সি, পি, এম-কে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। অপরপক্ষে সি, পি, আই একথা বলতে কোন প্রকার কুণ্ঠাই বোধ করছে না যে, সি, পি, এম তাদের যেনতেন প্রকারে, এমন কি ঠেঙিয়েও নিশ্চিহ্ন করতে চায়।

কাজেই এই দুই শক্তি একসঙ্গে থাকবে কিভাবে?

নিজেকে অনুপ্রাণিত করে যে, সারা ভারতবর্ষে তার প্রভাব বেশি, বিশ্বকম্যুনিস্ট আন্দোলনে সে হ'ল স্বীকৃত দল। কিন্তু ভারতবর্ষে যে দুটি রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার পরিচালিত হচ্ছে, সেখানে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি হ'ল শরীকে। সেখানে কম্যুনিস্ট পার্টি নিতান্তই অনুগৃহীত শক্তি। কাজেই সি, পি, আই যদি মনে করে, এই দুই রাজ্যে সরকারের শরীকে থেকে সি, পি, এম শক্তি বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে অথবা সি, পি, আই-কে দাবিয়ে রাখবার শক্তি পাচ্ছে, তবে সে কেন সি, পি, এম-কে ক্ষমতাচ্যুত করবার জন্য, সি, পি, এম-এর শক্তি বৃদ্ধির উৎস রোধ করার জন্য চেষ্টা করবে না।

অনুরূপভাবে সি, পি, এম—সে তো সি, পি, আই সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করে, যে ধারণার মূল কথা হ'ল—সি, পি, আই কম্যুনিস্ট দল তো নয়ই, পরন্তু কংগ্রেস ও পুলিশের কাজের সহায়ক শ্রেণীর দল। সি, পি, এম বাষট্টি সাল থেকে চৌষট্টি সাল পর্যন্ত সময়ের ঘটনাগুলি কোনক্রমেই ভুলতে রাজি নয়।

এবং তাদের বদ্ধমূল ধারণা এই সময়ে সি, পি, আই, নন্দা-শাস্ত্রী প্রমুখের পঞ্চম-বাহিনীর কাজ করেছে অর্থাৎ সাদা কথায় সরকার তথা পুলিশের দালালী করেছে। এককথায় সেই দিনের ঘটনা প্রকৃতপক্ষে আজ মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট দলের রাজনীতির অন্যতম ও শ্রেষ্ঠ পুঁজি। নচেৎ যে চীন-সোভিয়েট বিভেদ ও ভাঙনকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের দুই কম্যুনিস্ট পার্টির জন্ম হয়েছিল অথবা পরবর্তীকালে, যে সকল আদর্শ ভিত্তি করে দুই কম্যুনিস্ট পার্টি আলাদা পথে চলেছিল, তার তাদের একজন একজনকে শোধনবাদী অথবা এই জাতীয় গালাগালি ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে নিজেদের আলাদা থাকবার যুক্তি সাধারণ মানুষকে বোঝানো সহজ নয়। এটা বোঝানো কঠিন হয়ে পড়েছে তখন থেকে, যখন সি, পি, এম চীনের প্রতি অন্ধ আনুগত্য সরিয়ে চীনকে সমালোচনা করতে শুরু করেছে। একই সময়ে চীনের প্রতি অন্ধ আনুগত্যে সি, পি, আই, এম, এল পার্টি গঠিত হয়ে উঠেছে।

সি, পি, আই, এম, সি, পি, আইকে শোধনবাদী বলে নিজেদের আলাদা অস্তিত্বের প্রমাণ জনসমক্ষে রাখত। কিন্তু যেদিন থেকে সি, পি, আই, এম, এল, সি, পি, আই, এম-কে নয়া শোধনবাদী নামে চিহ্নিত করল, সেদিন প্রথম দুই কম্যুনিস্ট পার্টির দর্শনগত পৃথক অস্তিত্ব সাধারণ মানুষের কাছে লুপ্ত হয়ে গেল।

কিন্তু সাধারণ মানুষ চাইলেও ভাগ্যে সুন্দরায়া এক হবেন বা জ্যোতিবাবু ও বিশ্বনাথবাবু এক হবেন এটা সম্ভব নয়। কম্যুনিস্ট পার্টিরই লক্ষ্য একে অপরের অস্তিত্ব বিলোপের সাধনায় সিদ্ধ হলেই নিজের অস্তিত্ব স্থায়ী করতে পারবেন। এই যে চিন্তা, ভারতবর্ষের দুই কম্যুনিস্ট পার্টি সেই চিন্তারই প্রতিফলন ঘটেছে কেরলের যুক্তফ্রন্ট সরকারে, পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সবকার। কেরলে এস, গোবিন্দন নায়ার আর শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে যে লড়াই করছেন, কিছু বিলম্বে হলেও সেই লড়াই পশ্চিমবঙ্গে জ্যোতি বসু ও বিশ্বনাথবাবু শুরু করেছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতিতে একটি লক্ষ্যনীয় বিশেষত্ব আছে, সেটি হ'ল এখানে সরকার রাখা বা ভাঙ্গার মূল চাবি কাঠিটি কিন্তু দুই কম্যুনিস্ট পার্টির হাতে নয়। সেই চাবিটি রয়েছে—গান্ধীবাদী নেতা অজয়বাবুর হাতে। কাজেই পশ্চিমবঙ্গে যদি সরকারকে ভেঙ্গে দেওয়া কারো লক্ষ্য হয়, তবে শুধুমাত্র একজন আরেক জনকে বধ করলেও হবে না—সেখানে তৃতীয় শক্তি শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে বধ করতে হবে। আবার শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় নিছক একজন ব্যক্তি নন। অথবা সদ্য গঠিত বাংলা কংগ্রেস নামীয় একটি দলীয় সংগঠনের নেতা নন। তিনি এককভাবে যেমন জনগণের অস্থার ভিত্তিতে একটি শক্তি, তেমনি তাঁকে ঘিরে রয়েছে আরও কয়েকটি শক্তি, যথা—ফরওয়ার্ড ব্লক, লোকসেবক সঙ্ঘ, পি, এস, পি এস, এস, পি, গোর্খা লীগ এমনি দলগুলি। তা'হলে প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে তিনটি শক্তি তিনদিকে দাঁড়িয়ে আছে। একদিকে মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি, তার সঙ্গে আছে ওয়ার্কার্স পার্টি, আর, সি, পি, আই আর একদিকে রয়েছে কম্যুনিস্ট পার্টি। এক কথায় বলতে তাদের সঙ্গে স্থায়ী মৈত্রীতে আবদ্ধ অথবা স্বর্গে গেলেও সঙ্গে যাবে, নরকে গেলেও সঙ্গে যাব—এমন দল কেউ নেই। আর একদিকে রয়েছে জাতীয়বাদী দলগুলি। বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি। এ ছাড়া আরও কয়েকটি মার্ক্সবাদী ও জাতীয়তাবাদী দল আছে—এরা কারো প্রতি স্থায়ী আনুগত্যে আবদ্ধ বলা যায় না। যেমন আর, এস, পি—সি, পি, এম-এর সঙ্গে তার আলাদা কোন অস্তিত্বের প্রমাণ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নেই বললেই চলে। কিন্তু কেরলে আর, এস, পি দলের বেবী জন নাম্বুদ্রিপাদের অন্যতম প্রধান শত্রু।

কাজেই কেরলে যে দল শত্রু, পঃ বঙ্গে সেই দল পরম মিত্র।

এই বিচিত্র রাজনীতি চিরস্থায়ী হতে পারে না। অপরদিকে এস, ইউ, সি কট্টর মার্ক্সবাদী, এমন কী সার্থক চীনাপন্থী বলতে আজ এস, ইউ, সিকেই বোঝা উচিত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এস, ইউ, সি'র সঙ্গে মিতালি মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির

সঙ্গে নয়। সেই মিতালি কখনও কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে, কখনও ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে। আবার এস, এস, পি দলের অবস্থা এক বিচিত্র। সারা ভারতে এস, এস, পি কট্টর কম্যুনিস্ট-বিরোধী, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বরাবরই মিতালি করে মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে। যাহোক সর্বশেষ অবস্থা যা হবে—সে হ'ল বর্তমানে যে রাজনৈতিক শিবির রয়েছে, সেই শিবির আরও ভাঙবে, যেমন ভেঙেছে ১৯৬৭ সালের পর। ১৯৬৭ সালে ইউ, এল, এফ ও পি, ইউ, এল, এফ—দুই শিবিরকে-যদি খুঁজে বের করতে হয়, তবে কোনক্রমেই পাওয়া যাবে না। ১৯৬৮ সালে ও ১৯৬৯ সালে এই ইউ, এল, এফ ও পি, ইউ, এল, এফ শক্তির কিছুটা রূপরেখা বেঁচেছিল। কিন্তু নির্বাচনের পর মন্ত্রিসভা গঠনের সময় শেষ মুহূর্তে বাংলা কংগ্রেস যখন মুখ্যমন্ত্রীত্ব রক্ষায় স্বরাষ্ট্রদপ্তর সি, পি, এম-কে ছেড়ে দিল অথবা একদা মধ্যরাত্রে বাংলা কংগ্রেস সি, পি, এম-এর কাছে আত্মসমর্পণ করল ও পরদিন শ্রীডাঙ্গে ও শ্রীভূপেশ গুপ্ত শ্রীঅজয় মুখার্জীর বাসভবনে গিয়ে দেখলেন—যার জন্য লড়াই করতে তাঁরা দিল্লী থেকে ছুটে এসেছেন, সেই স্বরাষ্ট্র পুলিশ-দপ্তর সি, পি, এম-কে দিয়ে বাংলা কংগ্রেস আপোষ করে বসে আছে—সেই দিনই পি, ইউ, এল, এফ-এর সমাধি হয়ে যায়। এই ঘটনার পরিণতিতে অবস্থা এই হয় যে, মন্ত্রিসভাতেও জোট বন্দী অবস্থা আর পূর্বের মত থাকে না। ১৯৬৭ সালে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় যতটা শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের উপর নির্ভর করতেন, সেই নির্ভরতা কমে যায়—তাইরেও শ্রীসুকুমার রায়ের অন্য যে কোন দপ্তর অপেক্ষা সি, পি, এম দপ্তরে যাতায়াত বেড়ে যায়। ইউ, এল, এফ দলের এই একই অবস্থা। আর, এস, পি, ও এস, এস, পি—যারা একদা ইউ, এল, এফ-এর প্রধান শক্তি ছিল, আজ আর এস, এস, পি দলের সি, পি, এম-এর প্রতি সেই আনুগত্য নেই। আসানসোলে শ্রী বি, কে, ঝার মৃত্যুর পর থেকে সি, পি, এম-এর সঙ্গে এস, এস, পি-র মনকষাকষি সুরু হয়ে আজ এস, এস, পি-কে কোন শিকল দিয়েই সি, পি, এম-এর সঙ্গে বেঁধে রাখা যাবে না। তবে আর, এস, পি-সম্পর্কে অতটা না হলেও একই কথা বলা যায়। কেরলের প্রশ্ন বাদ দিলেও আলিপুর-দুয়ারে আর, এস, পি যে ব্যবহার পেয়েছে সি, পি, এম-এর কাছে—সেটা সহজে ভুলে যাওয়া তাদের সম্ভব নয়। কিন্তু এই অবস্থার মধ্যেও অতি অজান্তে পি, ইউ, এল, এফ ও ইউ, এল, এফ শক্তি নিশির ডাকে মিলিত হন, ভাবের বিনিময় করেন। যে-কোন একটা সঙ্কট সৃষ্টি হলে দেখা যায়—ঘুরে-ফিরে আর, এস, পি যেমন সি, পি, এম-এর কাছে চলে গেছে, শ্রীমাখন পাল বসে আছেন শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের কাছে—অপরদিকে সি, পি, আই, ফরোয়ার্ড ব্লকও অনেক ঝগড়া করেন, কিন্তু ঠিক সঙ্কটের সময় দেখা যায় শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় আর শ্রীঅশোক ঘোষ এক হয়ে গেছেন। আরো মজার কথা এঁদের হৃদযের টান কত গভীরে তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন বরাহনগরে শ্রীশিবু ভট্টাচার্যকে আহত করায় সি, পি, আই, সি, পি, এম-কে বলছে না এমন কথা নেই—কিন্তু সি, পি, আই-এর অনেক বড় নেতা, এমন কি যাঁকে '৬১ বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কম্যুনিস্ট নেতা ও একটা ইনস্টিটিউশনের সঙ্গে তুলনা করা হয়, সেই শ্রীদেবী নিয়োগী যাঁর একখানা হাত নেই, তাঁর অন্য একখানা হাত ফরোয়ার্ড ব্লক কেটে দিল, তবু যুক্তফ্রন্টে গুরুতর সঙ্কট দেখা দিল না। বরং দেখা গেল শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী ও শ্রীশম্ভু ঘোষ কোচবিহার যেয়ে মিষ্টিমধুর কথা বলে আপোষ করে এলেন। একইভাবে আবার আসানসোলে ময়রা কলিয়ারীতে যখন ফরওয়ার্ড ব্লকের শ্রীরণজিৎ সিংকে নির্মমভাবে সি, পি, আই-এর লেকেরা হত্যা করে, তখন ফরওয়ার্ড ব্লক কিন্তু যতটা উত্তপ্ত হওয়া উচিত ততটা হয় নি। কাজেই একটা মনের টান দুই শিবিরে রয়েই গেছে বলা যায়, যেটা ধরা পড়ে বিশেষ বিশেষ সঙ্কটকালে। কিন্তু এই যে দুই শিবির—এই শিবির ভেঙে আর একটা তৃতীয় শিবিরও কিন্তু ইতিমধ্যে গঠিত হয়েছে, সেই শিবিরও কিন্তু কম শক্তিশালী নয়। তার প্রমাণ পাওয়া যায় গত রাজ্যসভার নির্বাচনকালে। রাজ্যসভার নির্বাচনকালে দেখা গেল সি, পি, এম একা এক পক্ষে। যাঁদের প্রার্থী ছিলেন শ্রীমনোরঞ্জন রায় ও শ্রীনীরেন ঘোষ। সি, পি, এম তাদের দুইজন প্রার্থী ছাড়া শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যালকে প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করালেন। অপরদিকে বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক ও সি, পি, আই একজোট হয়ে তিনজন প্রার্থী দাঁড় করালেন—শ্রীকল্যাণশঙ্কর রায়, শ্রীপ্রণব মুখোপাধ্যায় ও শ্রীঅমরপ্রসাদ চক্রবর্তীকে। কিন্তু এই সময় দেখা গেল দুই জোটেরই অতি রংশবদ দলগুলি নিজেরা এক হয়ে একটি ফ্রন্ট করলেন এবং তাদের প্রার্থী হলেন শ্রীসুহৃদমল্লিক চৌধুরী। এই তৃতীয় ফ্রন্টের চাপে পড়ে সি, পি, এম যেমন তার প্রার্থী প্রত্যাহার করতে বাধ্য হ'ল তেমনি ফরওয়ার্ড ব্লকও তার প্রার্থী তুলে নিতে বাধ্য হ'ল। রাজ্য রাজনীতির এটাই ছিল সর্বশেষ জোটবন্দী রূপ। তারপর রাজ্যসভার নির্বাচনের পর আবার দেখা গেল এই জোট আর নেই। কাজেই পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট শরিক দলগুলির প্রকৃত জোটবন্দী হওয়ার কোন স্থায়ী রূপ কিছু নেই—সময়ে ও প্রয়োজনে জোট গড়ে ওঠে আবার সময় ও প্রয়োজনে সেই জোট ভেঙে ছত্রখান হয়ে যায়। কাজেই অতীতের আলোকে আগামী দিনের জোটবন্দী রূপ কল্পনা করা যাবে না। তবে এক কথা সত্য, সে হ'ল সি, পি, এম শিবির যে কোন সময়ে প্রায় একশতজন সদস্য এক করতে পারে, সি, পি, আই বাংলা কংগ্রেস ও ফরওয়ার্ড ব্লককে নিয়ে প্রায় এক শত শক্তি হাজির করতে পারে, তৃতীয় শক্তি—আর, এস, পি, এস, এস, পি, এস, ইউ, সি প্রায় ৫০-এর মত শক্তি দেখাতে পারে। আগামী দিনে সরকার ভাঙুক অথবা নূতন সরকার গড়তে এই তৃতীয় শক্তির ভূমিকা হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সি, পি, এম চাইবে সি, পি, আই শিবির যতটা ভেঙে সি, পি, আই-কে একক করা যায়—আর সি, পি, আই চাইবে সি, পি, এম-এর কাছ যতটা শক্তি সরিয়ে সি, পি, এম-কে একঘরে করা যায়। অন্য পার্টিগুলি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এই সি, পি, আই ও সি, পি, এম-এর ভাঙা-গড়া খেলার শরিক হতে বাধ্য। এখন প্রশ্ন হ'ল এই খেলা ভাঙার খেলা সুরু কবে অথবা আদৌ হবে কি? এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া খুবই কঠিন। কারণ যুক্তফ্রন্টের যে-কোন শরিক দলই মুখে যে কথাই বলুন না, সাহসভরে ফ্রন্ট ত্যাগ বা মন্ত্রিসভা ত্যাগ করতে পারবে না। সেই ক্ষেত্র সকলেরই কৌশল হবে ঘরে থেকে ঘর ভাঙা, নিজে ঘরে থেকে অন্যকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া। এই প্রচেষ্টা জ্ঞাতসারে হোক অথবা অজ্ঞাতসারে হোক, রাজ্যের যুক্তফ্রন্টে সুরু হয়ে গেছে বলা যায়। কেরলেও প্রথমে এইভাবে শুধু দলের প্রতি দলের দোষারোপ চলতো—পরে সেই দোষারোপ নেমে এল ব্যক্তিগত পর্যায়ে। কেরলে যে এক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আর এক মন্ত্রী দুর্নীতির অভিযোগ আনছেন, সেটা হল দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলা তথা শেষ খেলার আগের খেলা। পশ্চিমবঙ্গে দলের প্রতি দলের দোষারোপ পর্যায় এখন শেষ প্রান্তে অর্থাৎ যেখানে শ্রীজ্যোতি বসু বলছেন—শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী মন্ত্রিসভা ভাঙতে চান আর শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী বলেছেন—শ্রীজ্যোতি বসু আমাদের উৎখাত করতে পুলিশ ব্যবহার করছেন। এর পরই সুরু হবে একের বিরুদ্ধে অপরের দুর্নীতির অভিযোগ। সত্য কথা বলতে দুই-একজন মন্ত্রী সম্পর্কে ইতিমধ্যেই এই জাতীয় কিছু অভিযোগ না উঠেছে তা নয়। আইন ও বিচার মন্ত্রী সম্পর্কে কিছু অভিযোগ কোন একটি দলের দপ্তর থেকে উৎসাহ ভরেই কাগজে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেটা কাঁচা মামলা ছিল বলে ধোপে টেকে নি। এখন কিন্তু বেশ কয়েকজন মন্ত্রী অন্য মন্ত্রীর কাজ সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করছেন—কে কত জন স্বজনকে উচ্চ পদে বসিয়েছেন থেকে সুরু করে কোন কোন মন্ত্রী সম্পর্কে টাকা-পয়সা সংক্রান্ত প্রশ্ন এমন কি কোন কোন মন্ত্রীর ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কেও বেশ কিছু কথা হাওয়ায় উড়ছে

[illegible] সমেত। অবশ্য এই সব কথা কি মামুলী গুজবে অথবা নিতান্ত দুই একটি পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্বে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার বিপন্ন হবে না। বর্তমানে এই সব কাজ হল ভাবী কালের কোন বড় কাজের নিতান্তই প্রস্তুতি-পদক্ষেপ। এরপর গুঞ্জন উঠবে—না, এত দল নিয়ে সবকার চালানো যায় না। সবকার চালাতে হলে সমধর্মী দলের ঐক্য চাই, তখন খোঁজ সুরু হবে সমধর্মী কে আছে অর্থাৎ সমধর্মী নাম করে জোট বাঁধবার চেষ্টা হবে। তারপর সুরু হবে জনগণের দরবারে আর্জি পেশ। আজ যে-সব বিরোধের কথা যুক্তফ্রন্টে আলোচনা করে মীমাংসার চেষ্টা হচ্ছে, সেই সবই প্রকাশ্য জনসভায় পেশ করা হবে এবং জনগণকেই আহ্বান জানানো হবে তাদের রায় জানাতে। অর্থাৎ সারা রাজ্যে এমনভাবে হাওয়া তোলা হবে যে, জনগণই দাবী করবে—অমুক অমুক দলকে বাদ দিয়েই সরকার হোক। কিন্তু কোন দলকে বাদ দিতে হলে নতুন সরকার গড়তে হয়, নতুন সবকার গড়তে হলে আবার নির্বাচন দরকার হয়—তাই চাই নির্বাচন। এই হাওয়া তুলে যে দল বা ফ্রন্ট এগিয়ে যেতে পারবেন, তাঁরাই আহ্বান জানাবেন—সবকার ভেঙে দাও, নতুন নির্বাচন চাই।

১৯৬৭ সালে ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষকে কেন্দ্র করে যখন মন্ত্রী গোলযোগ সুরু হয়, তখন সি, পি, এম সর্বপ্রথম বললো—আবার নির্বাচন হোক। তখন সেই কথার প্রতিবাদে অনেক সোচ্চার হয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল মধ্যবর্তী নির্বাচন হল এবং সি, পি, এম যেমন প্রায় দ্বিগুণ শক্তির অধিকারী হয়ে ফিরে এল, অন্য দলেরাও সকলে নিজ নিজ শক্তি বৃদ্ধি ঘটালো। আবার যদি নির্বাচন হয়, তখন কিন্তু কংগ্রেসের শক্তি হ্রাস করে কোন দলের শক্তি বৃদ্ধির সুযোগ ঘটবে না—কারণ আজ আর কংগ্রেসের কাছ থেকে খুব বেশী আসন ছিনিয়ে নেবার প্রশ্ন নেই। তখন শক্তি বৃদ্ধির নির্ভর করবে আজকের যুক্তফ্রন্টের কোন শরিককে কে কতটা গ্রাস করতে পারে। এই ক্ষেত্রে জোট বাঁধবার পদ্ধতিটি হবে—যে যাকে গ্রাস করতে চায়, তাকে শত্রুশিবিরে রেখে জোট বাধা। সি, পি, এম যদি চায় নিজের শক্তি ১৮০-এ আনতে তবে সে বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক, সি, পি, আইকে বাদ দিয়ে অন্য যে-সব দল যারা দুটো পাঁচটা আসন পেলে খুশী, তাদের নিয়ে জোট বাঁধবে। আবার সি, পি, আই চাইবে সি, পি, এমকে একা ফেলে অন্য সকলকে নিয়ে যাতে নিজের জোটের শক্তি ১৮০তে আনতে পারে।

কিন্তু এই দুই শরিকের কাছে একটা প্রধান হিসাবে দেখা দেবে আজকের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়। আজকের পরিস্থিতি হল—শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের উপরই নির্ভর করছে সরকারের স্থায়িত্বের, কারণ প্রাক্তন মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে ছাড়া নতুন নির্বাচনের আহ্বান দেওয়া সহজ নয়। সেই দিক দিয়ে যাঁরা সরকার ভেঙে দিতে চাইবেন, তাঁদের কাজ হবে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তাকে নিঃশেষ করে দেওয়া, অপর দিকে সবকার পরিচালনায় তাঁকে অভিজ্ঞ ও অক্ষম করে তোলা। সবটা মিলিয়ে এই কর্মসূচী রূপায়ন পাকা করতে করতে সময় এসে যাবে পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনের। প্রচণ্ড রকম পাকা হাতে খেলায় এই হাওয়া তোলা হবে যে, ১৯৭২ সালেই পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে নির্বাচন হোক ও জনগণের রায় নেওয়া হোক। রাজ্যব্যাপী যে হানাহানি ও যুক্তফ্রন্টের অনৈক্যের রূপ আর সেই সঙ্গে বিভিন্ন দলের শক্তি বৃদ্ধির উদগ্র চেষ্টা ও অন্যের এলাকায় নিজের প্রভাব বৃদ্ধির উদ্যোগ—এর একমাত্র লক্ষ্য হল ১৯৭২ সালে যাতে পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে নির্বাচন হয়। জ্ঞাতসারে হোক আর অজ্ঞাতসারে হোক, এই খেলাতেই শরিক হয়েছেন অনেক দল।

কিন্তু দলের কথা বাদ দিয়েও আর একটা শক্তি আছে পশ্চিমবঙ্গে সেই শক্তি হল জনগণ। পশ্চিমবঙ্গে যত মানুষ সক্রিয় রাজনীতি করে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়, তার চেয়ে অনেক বেশী মানুষ কোন দলে বিভক্ত না হয়ে কল্যাণকর রাজনীতি করেন। এই শক্তি কিন্তু বহু সময় রাজনৈতিক দলের শক্তিকে পরাভূত করে দেয়। কাজেই আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান যুক্তফ্রন্ট সবকার বেঁচে থাকবে কিনা, অথবা এই সবকার ভেঙে দিয়ে নতুন সরকার গঠন করা হবে কিনা অথবা কাদের হাতে থাকবে সরকার পরিচালনার ভার—তার সবচেয়ে বড় নিয়ামক হলেন জনগণ। নইলে পশ্চিমবঙ্গে কোন ফ্রন্টই একক শক্তিতে সর্বশক্তিমান হতে পারে না—১৯৬৭ সালে কংগ্রেস বনাম দুই ফ্রন্টের যুদ্ধে তা প্রমাণিত হয়ে গেছে। আবার যদি আজকের যুক্তফ্রন্ট দুই ফ্রন্টে বিভক্ত হয় এবং কংগ্রেস নিজের স্থানে থাকে, তার ফল খুব বেশী ইতর বিশেষ হবে এমন কোন প্রমাণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। কাজেই বর্তমান যুক্তফ্রন্ট সবকার সব অবস্থা কাটিয়ে এগিয়ে চলবে ততদিন, যতদিন অন্যের কাঁধে সবকার ভাঙবার দায়িত্ব চাপানো সম্ভব না হয় অথবা যতক্ষণ এক পক্ষ আর এক পক্ষকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে নিজে সাধু সাজবার অবকাশ না পায়। বর্তমানে যে পর্যায় চলেছে, সেটা হল পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাল—আসল খেলা সুরু হবে ১৯৭২ সালের কাছাকাছি সময়ে। সেই সময় জনগণ যদি প্রচণ্ড চাপে যুক্তফ্রন্টকে সামলে রাখতে পারেন তবে সেই পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার শুধু দীর্ঘস্থায়ী হবে না, ভারতবর্ষে কম করে ১২টি রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে কেন্দ্রেও যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের সুযোগ এনে দেবে। স্বাধীনতার পর কংগ্রেস যেভাবে ২০/২৫ বৎসর একছত্রভাবে শাসন পরিচালনা করেছে, সেই সুযোগ আসবে যুক্তফ্রন্ট শক্তির। কারণ, কংগ্রেসের বিকল্প রূপে কোন একদল কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল করেছে এমন শক্তির অভ্যুদয় হতে কম করে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত সময় লাগবে।

যা হোক, পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের আসল ফাঁড়া আসবে ১৯৭২ সালের মুখে—এখন যে পর্যায় চলছে তার দ্বারা অন্য যে ঘটনাই ঘটুক না কেন, সরকারের পতন ঘটার সম্ভাবনা অঙ্কের হিসাবে পাওয়া যাবে না। আর ১৯৭২ সালের পরও যদি পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার টিকে যায়, তবে সেই সরকার হবে দীর্ঘস্থায়ী—যদিও সেখানে পথ খুব আলোকোজ্জ্বল নয়, বরং কণ্টকাকীর্ণ ও দুর্গম বলা যায়।

আর একটা কথা হল কোন সংকটের কারণে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙবে না। কারণ, যে-কোন সংকট মোচন এই সবকার করবে বিপুল সাফল্যে ও শক্তিতে। তার নজীর ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে। যেমন পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সংকট। গত ২০/২৫ বৎসর মে মাস থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য নেই, খাদ্য চাই আওয়াজে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে থাকতো। কিন্তু এই বার যুক্তফ্রন্ট সবকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য সংকট নামের শব্দটি উপে গেছে। খাদ্য নিয়ে কত আন্দোলন, কত রক্তপাত, কত বিপ্লব হয়েছে—কিন্তু সেই ক্ষণিক খাদ্য সংকট নিয়ে এইবার এই সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসেও কোথাও কোন শব্দ নেই। আবার ঘেরাও গতবার যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের অন্যতম কারণ হয়েছিল, এমন কি এবারও সরকার ক্ষমতায় এসে এই ঘেরাও নিয়ে কলকাতা দিল্লী উথাল-পাথাল সুরু হয়েছিল। কিন্তু শ্রমমন্ত্রী শ্রীকেশ্ট ঘোষ ঘেরাও রূপী কংস আর জরাসন্ধকে প্রায় বধ করে ফেলেছেন। নইলে এই পুজো এসে গেছে—বোনাস নিয়ে কত কি হবে শোনা গিয়েছিল। অথচ এইবার দেখা যাচ্ছে যে-কোন বার থেকে বোনাস নিয়ে হাঙ্গা-হাঙ্গামা কম। একইভাবে বলা যায় জমি দখল, আর ভেড়ী দখল বা ফসল কাটা সবকিছু সমস্যাই অতি ধীরে ধীরে সমাধান হয়ে যাবে। কাজেই পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের সংকট কখনও কোন সমস্যা থেকে আসবে না—আসবে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের কারণে। কাজেই যতদিন সি, পি, এম, সি, পি, আই অথবা বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক অথবা আর, এস, পি এস, ইউ, সি জোট ক্ষমতা দখলের যুদ্ধে না নামছেন, ততদিন পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার নিরাপদ আর এই জাতীয় যুদ্ধ ১৯৭২ সালের আগে সুরু হবার কোন সম্ভাবনা নেই বলা যায়। তাই আজকের যুক্তফ্রন্ট সরকার চলছে ও চলবে, সামনে যত অন্ধকারই দেখা যাকনা কেন।

নির্বাচিত গল্প

মনোজ বসু

ধরণী-দা এসে ঢুকলেন।

টাকা দে, দু-টাকা—

কারো কাছে এক টাকা চাইবেন, কারো কাছে বা দু-টাকা। দু-টাকার বেশি কোন ক্ষেত্রেই নয়। বলা মাত্র সঙ্গে সঙ্গে বের করে দিতে হবে। নয়তো তিনি চললেন। এ-মাসে আপনি আর দিতে পারলেন না।

আজকে আমার ঠিক সেই অবস্থা। পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখি, ব্যাগ বাড়ি ফেলে এসেছি।

বসুন ধরনী-দা। এক্ষুনি এনে দিচ্ছি, এক মিনিট বসুন।

ধরণী-দার দয়া হল, দাঁড়ালেন। বসেন না তিনি কিছুতে—বসা চাট্টিখানি কথা নয়—বিস্তর হাঙ্গামা। মনে মনে কানমলা খাচ্ছি ঃ মাসের গোড়ার হপ্তায় পকেট কদাপি যেন ব্যাগশূন্য না হয়। এবারে মার্জনা হল, বারান্তরে আর হবে না।

ছুটে গিয়ে পাশের দোকান থেকে দুটো টাকা হাওলাত করে এনে দিলাম। এমনি সময় ফণী এসে গেল হস্টেল থেকে। আমার বন্ধু, শিবপুর কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। গাট্টাগোট্টা চেহারা, স্পোর্টস-ম্যান। দু-জনে খেলা দেখতে যাচ্ছি, টিকিটের ব্যবস্থা ফণীই করেছে।

ঘরে কেবল পা ঠেকিয়েছে, আচমকা বজ্রপাত যেন ছোঁ মারল ফণীর চুলের উপর। ছোঁ মেরেই বাজ যে উড়ে গেল তা নয়, কামড়ে ধরে আছে। ধরণী-দার কৃশ বাঁ-হাতের মুঠি। একঘর লোকের মধ্যে বুঝে দেখুন ফণীর অবস্থা। অথচ জন্মে চেনা-পরিচয় নেই—চোখের দেখা আজকেই এই প্রথম।

ধরণী-দা বাজখাঁই আওয়াজ ছাড়লেন ঃ চুল ফাঁপিয়ে বেড়াস কেন?

ছাড়ার পাত্র নয় ফণীও। হাতা গুটিয়ে সমুচিত জবাব দেবে—কী করিস, কী করিস বলে আমি হাত এঁটে ধরলাম। অগত্যা মুখের কথায় শোধ নিয়ে নিচ্ছে ঃ চুল আমি ফাঁপিয়েছি, মশায়ের বাপ-ঠাকুরদা'র মাথায় কি—

সম্পূর্ণ হল না। মুখে হাত চাকা দিয়ে কথা আটকে দিয়েছি।

খবরদার। জানিস কে উনি?

আমার চণ্ডমূর্তি দেখে ফণী অবাক হয়ে গেল। ধরণী-দা নির্বিকার। কাজ অন্তে পথে নেমে থপ থপ করে চলেছেন। পায়ে চটি—চটির বং আদিতে কালোই ছিল, রাজপথের ধূলি-মাহাত্ম্যে ইদানীং গেরুয়া বর্ণ ধারণ করেছেন। আপন-মনে চলেছেন। আর ধুলো ছড়িয়ে যাচ্ছেন চটির গহ্বর থেকে পিচকারির মুখে জল ছিটানোর মতো।

ফণী জিজ্ঞাসা করে ঃ কে বুড়োটা?

ধরণী-দা। তাচ্ছিল্য করে বলবি নে ওঁর নাম ধরে। থাকিস না এদিকে, তা বলে নামটাও কি শুনিস নি? আশ্চর্য।

ইতিমধ্যে ধরণী-দা আবার এক আসামি পাকড়েছেন। দেখছি আমরা। এক ছোকরা মোড়ের দোকানে সিগারেট কিনে জ্বলন্ত দড়ির মুখে ধরিয়ে নিচ্ছিল। চটাস করে তার গালে চাপড়। মুখের সিগারেট মাটিতে পড়ে গেল।

ছোকরা ধরণী-দাকে নিশ্চয়ই চেনে। ফণীর মতন রাগ করল না, সুড়ুত করে গলির মধ্যে ঢুকে গেল। গলি থেকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। বেরিয়ে এসে পড়ে-যাওয়া সিগারেটটা কুড়িয়ে নেবে, সে সাহস নেই। আর মোড়ের দোকানিও দেখি হি-হি করে হাসছে।

ধরণী-দার দৃকপাত নেই। পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চলেছেন। কত কষ্ট যেন হাঁটতে—তবু ছাড়বেন না। আবার এক ঘরে ঢুকবেন : টাকা দে—

জীর্ণশীর্ণ বুড়োমানুষের প্রতাপ দেখে ফণী তো অবাক। বলে, কিসের টাকা নিচ্ছেন?

বিবেকভবনের চাঁদা। যুবকদের বিবেকবান করে নিখুঁত নিয়মে গড়ে তুলবেন। এখন অবধি অবশ্য শুধু একটা লাইব্রেরী। কিন্তু হবে অনেক-কিছু। খুব বেশি দেরিও হবে না। আশি ধরো-ধরো ধরণী-দার বয়স, আর আশিটা বছর লাগতে পারে বড় জোর।

দু-জনেই হাসছি। গল্প করতে করতে বড-রাস্তায় পড়ে ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছি।

ফণী বলে, তোর ধরণী-দা দুনিয়া সুদ্ধ শাসন করে বেড়ান দেখছি।

হাতের নাগালে দুনিয়াটা পেলে করতেন ঠিক তাই। মানুষ যতগুলোকে পান, করেন। তার মধ্যে বাছ-বিচার নেই। শাসন করেন, আবার আদরও করেন। আমাদের এমনি হয়ে গেছে, দুয়ের একটা-কিছু চাই-ই। নইলে ভাল ঠেকে না।

হাঁটতে হাঁটতে ধরণী-দাও এসে পড়লেন। অকস্মাৎ আবার এক ঘটনা। বিপরীত দিক দিয়ে সত্যসখা আসছিল—ধরণী-দার পয়লা নম্বরি সাগরেদ, বিবেক-ভবনের সেক্রেটারি যে, ধরণী-দাকে দেখে হন হন করে যে কাছে চলে এলো। নিচু হয়ে গড় করতে যাচ্ছে।

ধরণী-দা হুঙ্কার ছাড়লেন : কী হচ্ছে, এই-ও শুয়ার?

ধরণী-দা প্রণাম নেন না, অন্তরঙ্গ সবাই মানে। তবু মন বোঝে না এক এক সময়, পায়ের নিচে মাথা নোয়াবার জন্য মন আনচান করে। সত্যসখার সেই অবস্থা। কিন্তু করবে কি করে? কামিজ এঁটে ধরে ধরণী-দা হাতের মোটা লাঠি তুলে-ছেন। অবাধ্য হয়েছ কি মাথা ফাটিয়ে চৌচির করবেন। ভাবখানা তেমনি।

রণে ভঙ্গ দিল অগত্যা সত্যসখা। ধরণী-দার পাশাপাশি যাচ্ছে, বিবেক-ভবনের প্রসঙ্গ তুলেছে। আবার কি—ধরণী-দা মেতে গিয়েছেন একেবারে। লাঠি নামিয়ে সত্যসখার কাঁধ ধরে সহস্র মুখে কথা বলছেন। অন্যমনস্কতার এই সুযোগ নিয়ে সত্যসখা দুটো হাত চকিতে ঢুকিয়ে দিল ধরণী-দার দুই পায়ের চটির ভিতরে, নিজের মাথায় সেই হাত ছুঁইয়েই দৌড়। নির্বিঘ্ন দূরত্বে গিয়ে দাঁত মেলে হাসছে : কেমন, প্রণাম যে নেবেন না বললেন! দু-দুখানা পায়ের ধুলো দেখুন! মাথায় নিয়ে নিয়েছি।

ধরণী-দা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। সামনে গিয়ে গর্জন করে উঠলেন : পালাবি কোথা শুয়ার, কাছে আর আসবি নে কখনো? বুঝবি ঠেলা।

গর্জন, এবং ঠাহর করলে দেখা যাবে ঐ সঙ্গে মৃদু হাসিও ঠোঁটের ওপর লেপটে আছে। ফণীর গা টিপে বলি, ধরণী-দার আদর। 'শুয়ার' বলে ডাক-লেন—জন্তুজানোয়ারের নাম যার-তার ভাগ্যে জোটে না। সত্যসখা আর একজন দু-জনই শুধু পেয়ে থাকে। আর সেকালে যারা পেতো—

বলতে বলতে চেপে গিয়েছি। পুরনো-কাসুন্দি ঘাঁটব না। ধরণী-দার কানে উঠলে রক্ষে রাখবেন না।

কিন্তু ফণী নাছোড়বান্দা, অর্ধেক শুনে ছাড়বে না সে কিছুতে। কানের কাছে ভ্যানর-ভ্যানর করছে : সেকালের তাঁদের কি হয়েছিল? অত বড় একটা নিশ্বাস ছাড়লি কেন তুই? ধরণী-দার আদর পেয়েছিলেন, কারা সেসব মানুষ? খুলে বল্।

আদর দেখলি, বড় সাংঘাতিক ধরণী-দার ঐ আদর। কালকূট বিষ। কেউ বড় রক্ষে পায় না। কয়েকটা বলি। নীলকণ্ঠকে দেখলেই গালির তুফান ছুটিয়ে দিতেন : গালি পাড়তেন আর হাসতেন। ফাঁসিতে চড়ে নীলকণ্ঠ সে আদরের শোধ দিয়ে গেছে। লাল আর একটি—মুখোমুখি সার্জেন্টের গুলী খেয়ে মরল। আর নীরদ ভটচাজের মধ্য দিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে পালাল। সে-ও মরেছে ঠিক কিভাবে মরেছে, তা অবশ্য জানিনে। প্রাণে বেঁচে থাকলে স্বাধীন দেশে ফিরে আসবে না কেন? ধরণী-দার ভালবাসা এমনি-এমনি একতরফা নেওয়া যায় না, চরম মূল্য দিতে হয়। আগের তারা সব দিয়ে গেছেন—সত্যসখারাও দেবে, নির্ঘাৎ জানি।

কয়েকটা জায়গায় আদায় সেরে ধরণী-দা আমার কাছে এসে পড়েছেন। একেবারে পাশটিতে। যেহেতু বেচাল কিছু নেই, তাকিয়েও দেখলেন না আমাদের দিকে। থপ থপ করে যাচ্ছেন যথারীতি। যাচ্ছেন, যাচ্ছেন। এই এতক্ষণ ধরে এত সব হল—টেরি ভাঙা, মুখের সিগারেট ফেলে দেওয়া, সত্যসখার সুকৌশলে পদধূলি নেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি—কোন-কিছুই মনে নেই। জলের উপরে দাগের মতন সঙ্গে সঙ্গে বেমালুম। ধরণী-দা পথে বেরুলে এমনধারা হরবখত হয়ে থাকে।

খেলার মাঠে ফণীর পাশে বসেছি। ঐ ভিড় আর ঐ রকম উত্তেজনা—তার মধ্যেও ধরণী-দার প্রসঙ্গ। ক্যাপাটে বুড়োমানুষটি পেয়ে বসেছে দেখি ফণীকে। বলে, কী কী জানিস ওঁর সম্বন্ধে সমস্ত বল্ আমায়।

উনি ধরণী-দা—

নাম তো শুনলাম। কেন তোরা সব ওঁর নামে তটস্থ—কী করেন উনি?

বিবেকভবনের চাঁদা তোলেন, লোকের মাথার টেরি ভাঙেন, আদর করে গাল-মন্দ দেন বিশেষ বিশেষ ছেলেকে।

আর, সেই ছেলে পাগল হয়ে প্রাণ দিতে ছুটে বেরোয়—

আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে ফণী বলল, রহস্যটা জানতে চাইছি।

জানলে তবে তো বলব! কেউ জানে না। খোদ ধরণী-দাকে জিজ্ঞাসা করে দেখিস—তিনিও না। শতকণ্ঠে না—না—করবেন : কিছু জানি নে আমি, কোন-কিছু করি নি। অন্তরঙ্গ কেউ সেকালের গোপন জীবনের কিছু ফাঁস করেছে—শুনতে পেলে ধরণী-দা ক্ষেপে যাবেন সেই মানুষটার ওপর।

ফণী বলল, বোমা-পিস্তলের কার-বারি যাঁরা ছিলেন, মোটামুটি সকলের নামই আজ জানা হয়ে গেছে। উপযাচক হয়ে তাঁরাই বলে দিচ্ছেন অমুক দলে তমুক দাদার অভিন্নহৃদয় সাগরেদ ছিলাম, হ্যানো করেছি ত্যানো করেছি, দাদা শহীদ হলেন আমিও হতে গিয়ে কোনরকমে পিছলে গেছি।

ধরণী-দা কিন্তু সেই ওঁদের পুরনো মন্ত্র-গুপ্তি ধরে রয়েছেন। কত কত ছেলে প্রাণদান করে গেছে, কোনদিন কেউ নামটাও জানতে পারবে না। ধরণী-দাকে তো উঠতে বসতে জেলে নিয়ে পুরত—উনি বলেন, জেলের মধ্যে ওঁর জন্যে নাকি বিশেষ জামাই-আদরের ব্যবস্থা। মুখ-চোখ ফুলে গেছে, ইন্টারভিউয়ের সময় ধরণী-দার চেহারা দেখে সকলে অবাক। মারধোর নয়—নেটের মশারির ফাঁকে মশা ঢুকে নাকি ঐ অবস্থা ঘটেছে। বাঁ-হাত মচড়ে ভাঙা, দাঁত একপাটি উপড়নো—সে সব নাকি পা পিছলে আছাড় খাওয়ার দরুন।

ধরণী-দাকে ফণী সেই প্রথম দেখল। তারপরে দেখি সে-ও জড়িয়ে গেছে। একবার ধরণী-দা বড় অসুখে পড়লেন। যমে-মানুষে টানাটানি। মানুষেরই জিত আপাতত—প্রাণরক্ষা হয়েছে, কিন্তু রোগি

বন্ড কাহিল। ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ফণী এখন জামসেদপুরে কাজ করে, ছুটি-ছাটা পেলেই কলকাতায় এসে হাজিরা দেয়। সে বলল, বাসাটা আমার বেশ ভাল। নিরিবিলি পাড়া, জায়গাও স্বাস্থ্যকর। সেবাশুশ্রূষার কোন রকম ত্রুটি হবে না। দিন কতক থেকে চাঙ্গা হয়ে আসুন।

প্রস্তাব শুনে ধরণী-দা তেড়ে উঠলেন ফণীর ওপর : আমায় নিয়ে যেতে চাস, এত বড় আস্পর্ধা! গোল্লায় গেছিস তুই, মেয়েলোক বিয়ে করেছিস।

ফণী তো মুখ চুন করে রইল। আমরা হেসে লুটোপুটি : সত্যি ফণী, বলা তোর অন্যায় হয়েছে। দু-দুটো সাংঘাতিক অপরাধ। বিয়ে করেছিস, তায় আবার মেয়েলোক বিয়ে। তোর বাসায় ধরণী-দা থাকবেন, বললি কেমন করে এত বড় কথা!

ছেলেদের রুকিয়ে দেবার জন্যেই মেয়েলোকের জন্ম, ধরণী-দার চিরকালের প্রত্যয়। মেয়েছেলে দেখলেই বেজার হতেন। আমার এককোটা বোন স্নেহ—বছর বারো বয়স—একবার ধরণী-দার খুপরিতে ঢুকে পড়েছিল অটোগ্রাফের লোভে। কে আপনি, কী চাই আপনার? বারো বছুরে মেয়েকে আশি বছুরে বৃদ্ধের আপনি-আপনি করে সম্বোধন, এবং অবোধ মেয়েটার উপর হুঙ্কার। সেই সময়টা আমি গিয়ে পড়লাম। স্নেহর চেয়ে ধরণী-দার জন্য কষ্ট বেশি হচ্ছিল, অলক্ষ্যে কে যেন আষ্টে-পিষ্টে জল-বিছুটি মারছে, এমনি-ধারা ভাব। কয়েক হাত দূরে স্নেহ দাঁড়িয়ে আছে কিছুতে তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। স্নেহকে ঘরের বাইরে সরিয়ে দরজা এঁটে দিলাম, তবে যেন সোয়াস্তি।

ধরণী-দার প্রেয়ারের সাগরেদ সত্যসখাও মরবে ভেবেছিলাম, না মরে উল্টে সে মিনিস্টার হল। যেখানে যেমনটি হবার কথা, স্বাধীনতার দৌলতে হিসাব-পত্র বিলকুল সব উল্টে গেল। ভালই হল। ধরণী-দার মহাভক্ত সে—কাশিয়াঙে তাঁর জন্য সে রাজকীয় ব্যবস্থা করে দিল। অন্তিমে ধরণী-দার জন্য এত সুখ কোন দিন কেউ ভাবতে পারে নি। মরে গেলেন বটে, কিন্তু বড় আরামের মরণ।

ধরণী-দার বিবেকভবনও চটিয়ে চলছে। এক টাকা দু-টাকা করে পথে পথে চাঁদা আদায় করে বেড়াতে হয় না আজকাল। ধরণী-দার সার্থক শিষ্য সত্যসখা—কয়েকটা ধনী কারবারিকে বলে দিয়েছে, দেশের যুবকদের বিবেক-বর্ধনের জন্য প্রাণ কেঁদে উঠল তাঁদেরও, মোটা টাকা দান করলেন। শ' দুয়েক আলমারিতে ঠাসা বই। নিজস্ব বাড়ি এবং সভা ও নাচ-গান ইত্যাদির জন্য হল হয়েছে এই কিছু-দিন আগে—মাননীয় মিনিস্টার সত্যসখা-সোম তার উদ্বোধন করে এলো।

বাড়ি ফিরে এসে কাপড়-চোপড় ছাড়া নেই, চা খাওয়া নেই, সর্বাগ্রে কাগজের অফিসে ফোন। একটা পাশে অনেকক্ষণ থেকে আমি অপেক্ষায় আছি, নজরেই পড়লাম না মোটে আমি।

যথোচিত আমড়াগাছি অন্তে সত্যসখা বলছে, আমার বক্তৃতায় আপনাদেরই দেখলাম না তো! যেতে পারেন নি, কী আর হবে, কিন্তু রিপোর্ট যেন ঠিক ঠিক বেরোয়। ভাল জায়গায় যায় যেন, ডবল ব্যানারে যাবে তো? মোটামুটি একটা খসড়া আমি এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সেই চেয়ারে বসেই তক্ষুনি খসড়া বানাতে বসে গেল। বলেই ফেললাম, ধরণী-দার কাছাকাছি ঘুরতে, এত নাম বাড়ানোর নেশা কেন?

সত্যসখা বলল, যে বিদ্যের যে মতোর। মিনিস্টারি করতে হলে কাগজ-ওয়ালাদের খাতির করতেই হবে। ধরণী-দার ছিল গোপন কাজকর্ম—মুখ ঢেকে তো বেড়াতেই হবে। তাঁরা মারা গেছেন, সে দিনকালও শেষ হয়ে গেছে।

মুখফোঁড় আমি একদিন বলেছিলাম, মাইনে পাঁচ-শ'র বেশি হবে না কথা ছিল। বাড়তে বাড়তে প্রায় তো এভারেস্টের মাপে এসে যাচ্ছে।

হাত ঘুরিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে সত্যসখা বলল, অসবেই। যিনি বলেছিলেন, হাটুভর নেংটি পরে ফকির-বেশ নিয়েছিলেন—তাঁর দিব্যি পুষিয়ে যেতো। তিনি গত হয়েছেন, দিনকাল আলাদা, পাঁচ-শ' একটা কথার-কথা হয়ে আছে এখন।

হঠাৎ কেন-জানি নরম হয়ে বলতে লাগল, মাইনে বাড়ানোর আমি কিন্তু বিপক্ষেই ছিলাম। শত্রুরা এই নিয়ে নিন্দে রটাবে, জেনে-বুঝে বরাবর লড়াই করে এসেছি। কিন্তু একজন দু-জনের কথায় কি হবে—পার্টি রয়েছে, মেজরিটিতে পাশ হয়ে গেল। তার পরে আর বিবেকের বাণী শুনতে গেলে চলে না, প্রকাশ্যে 'হাঁ' দিয়ে যেতে হয়। কিন্তু বিশ্বাস কর, পাঁচ-শ' টাকাতেই নিজে আমি সম্পূর্ণ রাজি। বাড়তি যা পাচ্ছি, স্বচ্ছন্দে ফেরৎ দিতে পারি। দিই না—একলা যদি ফেরৎ দিই, অন্যদের লোভী বলে নিন্দে রটনা হবে।

সত্যসখার কথাটা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি আমি। বাড়তি পাঁচ-শ' কেন, হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছে—সম্পূর্ণ টাকাটাই অবহেলায় সে ছুঁড়ে দিয়ে আসতে পারে। সেকালের জমিদারি সেরেস্তাতেও এমনি ছিল। নায়েবের মাইনে বিশ টাকা—তারই মধ্যে খাওয়া-পরা কাছারির তামাক-কেরাসিন ইত্যাদি যাবতীয় খরচা। সেই বিশ টাকা মাইনেও মাসান্তে নিয়ে নিতে নায়েবমশায়ের মনে থাকে না। এদেরও তাই। স্বাধীন হয়েছি—স্বাধীনতার দুলাল এরাই সব, কে কী বলবে! বলবার লোকই বা কোথা! ধরণী-দার সেকেলে দলবল অস্ত্র-শস্ত্র তোবা দিয়ে চরকায় নেমেছিলেন শেষটা। কাঠ-কাঠ উপোষ দিয়ে অহিংস প্রতিবাদ জানাবেন—কিন্তু কারো টিকিরই ইদানীং আর পাত্তা মেলে না। অতএব জয় হোক সত্যসখাদের—তা নিরঙ্কুশ রাজত্ব।

* * *

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। কাগজে দেখলাম, সত্যসখা খুন হয়েছে। কে খুন করেছে, জানা যাচ্ছে না।

ফণী দেখা করতে এসেছিল। কোন সূত্রে সে জেনেছে, খুনি নীরদ—পাহাড় ডিঙিয়ে যে ফেরারি হয়েছিল। মরে নি নীরদ—ধরণী-দা মরেছেন তো সেই বিশ্বস্ত সাকরেদ বুড়োবয়সে ফিরে এসে ধরণী-দার আর এক সাকরেদের মুণ্ডপাত করে গেল। প্রয়োজনে আরও করবে।

শারদীয়ার সাদর সম্ভাষণ গ্রাহকদিগকে জানাইতেছি—

ইঞ্জিনের পার্টস, পাম্পিং সেট, ইলেকট্রিক মোটর ও সুইচ, ধানকল, আটাকল, চিড়া-কুটা মেসিন ও তাহার পার্টস আমরা সর্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত রাখি, কটনমিল, জুটমিল ও কোলিয়ারির যাবতীয় স্টোর্স সরবরাহ করি। মফঃস্বলের ক্রেতাদিগের একমাত্র শ্রেষ্ঠতম পরিবেশক। আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

ভরদ্বাজ মেসিনারী সাপ্লাই এজেন্সী

২০, নেতাজী সুভাষ রোড (একতলা)
কলিকাতা—১
ফোন : ২২-২৮৫৫

সারা পৃথিবীর নাট্যরসিকেরা আজ বিনা দ্বিধায় স্বীকার করে নিয়েছেন যে, বেরটল্ট ব্রেশট এ-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। ইস্‌কাইলাস, সোফোক্লিস, শেক্সপীয়ার, স্ট্রীন্ডবার্গ, ইব্‌সেন, রবীন্দ্রনাথ ও নীল প্রমুখ যেমন দেশ ও কালের গণ্ডীকে অতিক্রম করে নিজেদের নাট্যপ্রতিভাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন, ব্রেশটও তাঁর রচনা প্রতিভায় নিজেকে এঁদেরই সমপর্যায়ভুক্ত করতে সমর্থ হয়েছেন।

ব্রেশট নিজেই স্বীকার করে গেছেন যে নাটক রচনায় এবং নাটকের প্রডাকসন ব্যাপারে তিনি পৃথিবীর নানা দেশের অন্তরীতি এবং নাট্য রচনা পদ্ধতি থেকে অনেক মূল্যবান বস্তু আহরণ করেছেন। এই জন্যই তাঁর থিয়েটারে এলিজাবীথান, চাইনিজ, জাপানিজ এবং ভারতীয় সংস্কৃত নাটকের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় নাটকের প্রভাবের উদাহরণ হিসাবে অনেক 'দি গুড্ পার্সন্ অভ্ সেজুয়ান' এবং 'দি ককেশিয়ান চক্ সার্কলের' নাম করবো। নাটক দুটির পাত্র-পাত্রী অন্য দেশীয় হলেও রচনারীতি আমাদের সংস্কৃত নাটকের ধরণের।

আমরা ভারতীয় নাট্যরসিকেরাও ব্রেশটকে অন্তর থেকে গ্রহণ করেছি। কেন গ্রহণ করেছি তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখতে পাই—ভারতীয় দর্শকেরা ক্ল্যাসিকাল সিম্পলিসিটির অনুরাগী, আর এই বস্তুটি ব্রেশটের নাটকের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই কারণেই ব্রেশট আমাদের দেশে এত জনপ্রিয়। উদাহরণ হিসাবে বলতে পারি যখন ককেশিয়ান চক্ সার্কলের মত একটি নাটক আমাদের হাতে আসে, আমরা অতি সহজেই এর মূল বক্তব্যটি (রেলিং আইডিয়া) ধরতে পারি।

"Children to the motherly, so that they grow up healthy
Wagons to good drivers; So that they be properly driven
And the valley to the irrigators
So that it bring forth fruit."

এর সুন্দর ভাবানুবাদ করেছেন কবি শ্রীদেবীদাস সরকার :

গান :

"তোমরা তোমরা তোমরা যারা
চক্‌মেড়িতে আঁকাবুত্তের গল্প শুনেছ
আর্যবাক্য শ্রবণ করে
কেউ নিজেদের দিন কি গুণেছ?
সজ্জনেরাই ফিরে পাবে
হারানো ধন কে না জানে—
আসল মাতা যেভাবে পান
চুরি করা তার সন্তানে।
যারাই ভালো চালক
তারা চালায় গাড়ি অবশেষে
সেচকর্মে কুশলী লোক
পাবেই জমি দেশে দেশে,
এসব কথা তোমরা ভুলেছ।"

যে কোন ব্রেশট-প্লে পড়ে যা তার মঞ্চরূপায়ণ দেখে আমরা সহজেই বুঝতে পারি গল্পচ্ছলে একটি মহৎ সত্যকে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য করে চমৎকারভাবে নাট্যিক আকারে রূপায়িত করেছেন বেরটল্ট ব্রেশট।

তাছাড়া ব্রেশট-প্লেতে থাকে প্রচুর চিন্তার খোরাক। তাঁর নাটক পড়ে প্রত্যেক পাঠকের মনে জেগে ওঠে কর্তব্যবোধ ন্যায়-অন্যায় বোধ এবং মানবিকতার গুরুত্ব সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা। ব্রেশট নিজে ধনীর সন্তান ছিলেন—কিন্তু ঐশ্বর্য এবং বিলাস তাঁর মনকে আকর্ষণ করতে পারে নি। তাঁর অন্তরের সহানুভূতি ছিল বঞ্চিত শোষিত দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি। তিনি লিখেছিলেন :

"I grew up as son
Of well-to-do people. My parents tied
A collar round my neck and brought me up
To be accustomed to service. And practised in the art of command. But
When I was grown up and looked about me
I did not care for the people of my own class
Not for commanding, not for being served
And I left my own class and associated
With unimportant persons."

কবিতাটির শ্রীদেবীদাস সরকারকৃত বাংলা অনুবাদ এইরকম—

গান :

"তোমরা জানো জন্ম আমার
বিরাট বড়লোকের ঘরে।
সেই কথাটি শুনে করছো আমার
বিচার ওজন দরে।
মা ও বাবা স্নেহের সাথে
আমায় ঢেকে দিলেন সোনার পাতে
হুকুম করে সেবা নেবার
মন্ত্র দিলেন সোহাগ ভরে।

পারিনি আর সেবা নিতে,
দেখতে পেলাম গরীবজনের
চালক করো চালাকিতে।
তারা আমার আপন শ্রেষ্ঠ শ্রেণী
দেয় না কারেও দু-এক পেনী,
অবশেষে তাদের ছেড়ে
এলাম তোমাদেরি দোরে।
অজানাদের
পেলাম অভাগাদের।"

ব্রেশটের পাশাপাশি রেখে যখন আমরা এ্যাবসার্ড নাটক পড়ি—যথা বেকেটের 'এণ্ড গেম্', অথবা ইউনেস্কোর 'দি লেশন' বা 'দি চেয়ার্স' মনে হয় যেন আমরা জিগ্-স পাজল্-সেব সম্মুখীন হয়েছি।

যে কোন এ্যাবসার্ড নাটকের মূল-বক্তব্যের অনুধাবন করবার জন্য দু'তিন ঘণ্টা করে—অর্থাৎ যে সময়টা ঐ সব নাটক দেখতে বা পড়তে যায়—যে মানসিক অত্যাচার এবং পীড়ন আমাদের সহ্য করতে হয়, তারপর স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে—"এই মানসিক উৎপীড়ন সহ্য করবার কোন সত্যিকার আবশ্যকতা ছিল কি?"

তাছাড়া একথা বিনাদ্বিধায় বলা যায় যে, এ্যাবসার্ড প্লে এমন একটা অস্বাস্থ্যকর এবং হতাশাপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি করে, যার ফলে পাঠক বা দর্শকের মনটা বিষাক্ত এবং ক্লেদাক্ত হয়ে ওঠে।

এ্যাবসার্ড নাটকের অন্তঃসার একবার জানতে পারলে আর দ্বিতীয়বার ঐ নাটক দেখবার বা পড়বার কোন সত্যিকার আন্তরিক ইচ্ছা আপনার হবে না। ঐ নাটকের পাণ্ডুলিপি আপনার কাছে পাগলের প্রলাপ বলে মনে হবে। তার মঞ্চরূপায়ণ দেখতে গিয়ে 'দি লেশনের' ছাত্রীটির মতই দাঁত ব্যথার যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকবেন।

ব্রেশটের নাটকের বেলায় এর ঠিক উল্টো—তাঁর লেখা নাটক বার বার পড়তে ইচ্ছা হয়—এবং যত বেশী বার পড়বেন সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পর্ক এবং নাগরিকদের প্রতি সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তব্য বিষয়ে আপনার জ্ঞান ক্রমাগত বেড়ে যাবে।

একথা আমাদের অজানা নয় যে, ব্রেশটের নাট্যিক শক্তির উদ্বোধন, উদ্দীপন এবং পরিপুষ্টির মূলে ছিল দুটি বিশ্বমহাযুদ্ধের সর্বনাশকর বিষময় কীর্তিকলাপ এবং জনসাধারণের নিদারুণ ক্ষয়ক্ষতি। এই দুটি যুদ্ধের ফলে সারা পৃথিবীতে যে ধ্বংস এবং নাশনের প্রলয় তাণ্ডব চলেছিল, সাধারণ মনুষ্যকে যেভাবে গরু-ভেড়াতে পরিণত করেছিল, তারই বিরুদ্ধে শক্ত হাতে লেখনী ধারণ করেছিলেন এ যুগের সেরা নাট্যকার বেরটল্ট ব্রেশট। আর ব্রেশটের চিন্তার অনুধাবন করা ভারতীয়দের পক্ষেই তো সব থেকে সহজ। কারণ বৃটিশ শাসনের আমলে বিজেতা ইংরাজরা তো এদেশের লোকেদের গরু-ভেড়ার থেকে খুব বেশি উচ্চশ্রেণীর আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করতো। বিগত দুই বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এই ইংরাজ মহাপ্রভুদের তুষ্টিসাধনের জন্য আমাদের ক্রীতদাসদের মত সেবা করতে হয়েছে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়কেরা বিনা বিচারে বন্ধ কারাগৃহে পশুর অধম জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছেন।

ব্রেশটের নাটকে ধনতান্ত্রিক সমাজের এবং রাষ্ট্রের কুণ্ঠব্যাধিগ্রস্ত বিকৃত স্বরূপকে তুলে ধরা হয় বলেই, বঞ্চিত আপামর সাধারণ তাঁকে এ যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়ে থাকেন। এই প্রসঙ্গে ব্রেশটের 'দি থ্রাপেনী ওপেরার', 'হাউ ডাজ্ ম্যান কিপ্ এলাইভ' কবিতাটির শ্রীদুর্গাদাস সরকারকৃত বাংলা অনুবাদটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। কবিতাটি তুলে দিলাম :

কিভাবে মানুষ বিলাস-ব্যসনে
বাঁচবার নেয় ঝুঁকি?
হয়তো সে ভাবে ধরা পড়বে না।
তার কোনো বুঝ নাকি।
চারিধারে শুধু ক্ষুধিত মানব—
মরিছে অত্যাচারে,
লুণ্ঠন করে গলা টিপে মারা
লৌহের কারাগারে।
কোনদিন সে কি হবে না ধরার
সত্যের মুখোমুখি?
বেঁচে থাকা মানে মনুষ্যত্ব বিসর্জন,
একদিন সে যে কবরে নিজেকে সমর্পণ,
তখনই বলবে : মানুষ মেরেই
বেঁচে থাকা লোকে সুখী।"

শোষক শ্রেণীর লোকেরা কিন্তু ব্রেশটের নাটকের বিকৃত ভাষ্য করে জনসাধারণের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে চায়—যাতে তারা ঐ সব বিকৃত ভাষ্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিপথে পরিচালিত হয়ে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনে। ধনতান্ত্রিক দেশের সমালোচকেরা এমন কথাও প্রচার করবার চেষ্টা করেছেন যে, যেহেতু ব্রেশট কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলেন না, সুতরাং তিনি সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাস করতেন না। এ বিষয়ে কারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকলে তাঁকে আমি ব্রেশটের 'দি গুড পার্সন অভ সেজুয়ান' নাটকটি একটু মন দিয়ে পড়তে বলব।

এ নাটকে ব্রেশট আগামী বিজ্ঞান-ভিত্তিক এবং সমাজতান্ত্রিক যুগে নাট্যরচনারীতি এবং অভিনয় পদ্ধতি কোন্ পথ ধরে অগ্রসর হবে তার একটি চমৎকার উদাহরণ আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। সেজুয়ানের মহৎ নারীতে তিনি যেন বর্তমান পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর সাধারণ দরিদ্র শোষিত মানুষদের সম্বন্ধেই প্যারাবলের সাহায্যে একটি চমৎকার আলেখ্য দর্শক এবং পাঠকদের উপহার দিয়েছেন।

এ নাটকের শেন-টের শ্বেতসত্ত্বা সুইটা এক জায়গায় বলছে :
সুইটা—এ শহরের সবচেয়ে বেশি দুর্ভাগ্য কোনো একজন লোকের পক্ষে তা সামলানো অসম্ভব। (দর্শকদের সম্বোধন করে) এগারোশো বছর আগে আমাদের এক কবি এদেশ সম্বন্ধে যা লিখে গেছেন আজও তা সমানভাবে সত্যি :

"হাজার হাজার লোক যখন
ঠাণ্ডায় জমে মরছে,
তার প্রতিবিধান হবে কি করে?
একজন বা দুজনের শরীর
গরম রাখবার
ব্যবস্থা করে লাভ কি হবে?
দশ হাজার ফুট লম্বা একটা কম্বল
যদি পেতুম
একই সঙ্গে শহরের প্রতিটি ইঞ্চি জমি
তা দিয়ে ঢেকে দেওয়া যেত।"

এ কথাগুলো তো যে কোনো ধনতান্ত্রিক দেশের বঞ্চিত জনসাধারণের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

সেজুয়ান নাটকটির মূল বক্তব্য হচ্ছে—

In our Country
The capable man needs
luck Only
If he has mighty backers
Cam he prove his capacity,
The good
Have no means of helping themselves and the Goods are powerless. etc.

এই গানটির চমৎকার বাঙলা অনুবাদ করেছেন সুকবি শ্রীদুর্গাদাস সরকার :

সৎ এবং ঈশ্বরের অসহায়তার গান
আমাদের এই দেশে,
যদি কপাল ভালো হয়,
আর খুঁটির জোর রয়
তবেই তুমি পারবে দিতে
যোগ্যতার প্রমাণ
নইলে, সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা
হয় ধূলির সমান।
সজ্জন আজ অসহায়,
দৈবশক্তি শূন্যের কোঠায়,
ভগবান, কেন রক্ষা নাহি কর
তুমি সকল সৎ জনে,
কেন কঠিন আঘাত নাহি
হান সকল দুর্জনে।
ভগবান, কেন ভালো হয়েও
অনাহারে দিন কাটাতে হয়
কেন ক্ষুধাতুরের মাথায়
তোমার আশিস নাহি রয়,
ভগবান, কেন তোমার ধন
দাও না তুমি সবাইকে সমান।
কেন সবার হাতে দাও না
তুলে প্রকৃতির দান,
ওগো, একী তোমার নিষ্ঠুর বিধান
হায়, সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা
হয় ধূলির সমান।

ব্রেশটের জীবনদর্শন সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে সেইন্ট জোন্ অভ্ দি স্টকইয়ার্ডসের দুটি গানে। শোষক এবং শোষিতের এই গান দুটির অনুবাদও করেছেন শ্রীদুর্গাদাস সরকার ঃ

শোষকের বক্তব্য

"নিচতলা আর ওপরতলার লোকের প্রাণে
উচ্চে ওঠার শক্তি জাগুক অভয় জ্ঞানে।
যারা আছে এখন যেথায়
থাকবে তারা সুখে সেথায়।
করবে লোকে যা তার যোগ্য
যে ভুগবে তা—তার দুর্ভোগ গো
সেই কথাটি এই মহাজন কেবল জানে
বলতে পারো নিচতলাকার মানুষগুলি
যোগ্য জনের অধিকার যায় কেন ভুলি?
যে পারে সে উঠতে পারে আকাশ পানে।

শোষিতের জবাব

কিন্তু যারা নিচের দিকে
তলিয়ে যায়—
রাখছো তাদের আরো
নিচের কোন্ তলায়?
ওপর তলায় আছো চরম সুখে,
উঠবে আরো ওপরে কোন মুখে?
ওই ওপরের মানুষগুলোর ছোট্ট মন।
হে মহাজন! সাধবে তারা
কার প্রয়োজন?
কারণ তাদের সকল কানুন
গরীবদেহি কানমলায়।
জানে তারা ভীষণ শোষণ
ওরা বৈনিয়মে রক্তলোচন;
তাই তো বলি, ওপরতলার শোষককে
কি সহ্য করা যায়?"

এরপর ব্রেশটের দি থ্রা পেনী ওপেরার একটি গান তুলে দিচ্ছি—এরও অনুবাদক শ্রীদুর্গাদাস সরকার ঃ

ভালো মানুষের ভেক
নেবার তো বুদ্ধি বলিহারী।
গরীবকে দাও অর্থ তোমার,
চমক লাগাও ভারি।
যখন সকল মানুষ জাতি ভালো
তারা যে তার রাজত্বটা পায়,
কী চমৎকার স্বর্গীয় সেই আলো,
বলি ততে থাকতে কে না চায়?
লোক ঠকাবার ভড়ং তোমার
ধরতে যেন নারি।
বেঁচে থাকার দায়টা তবু
মেটে না যে মেটে;
যোগান বন্ধ বাজারে,
তাই গরীবের প্রাণ ওষ্ঠাগত।
তবু যে চায় শান্তি সহবস্থান
খুব তারিফ করি তারি।
কিন্তু প্রাচীন জগৎটা যে
নয়কো তেমন ঠাঁই,
এই পুরাতন পৃথিবীকে বদল করা চাই।
আমরা সবাই প্রাচীন নিয়ম
বদলে দিতে পারি।"

ব্রেশটের কাছে প্রগ্রেস অর্থে ছিল ক্রমাগত এগিয়ে চলা। রচনার ক্ষেত্রেও তিনি কখনও থেমে থাকেন নি। নিজের রচনাকেও একটা ফাইন্যাল ফর্ম দেওয়াতে তিনি বিশ্বাস করতেন না। এই জন্যই সব রচনাকেই তিনি ক্রমাগত সংশোধন করতেন, বদলাতেন।

ব্রেশটের নাটকের মঞ্চাভিনয় করতে হলে প্রথমেই তাঁর বিচ্ছিন্নতাবাদ বা থিওরি অব্ এলিয়েনেশনকে ভালভাবে বোঝা দরকার। এই বিচ্ছিন্নতাবাদ তত্ত্বটি ভারতীয় নাট্যবিদদের কাছে একটা নতুন তত্ত্ব নয়। সংস্কৃত নাটকে রঙ্গমঞ্চে মঞ্চসজ্জার অভাব, অভিনয়ে সংলাপ বাদন সব বিষয়েই বিচ্ছিন্নতাবাদ সৃষ্টির সচেতন প্রচেষ্টা দেখা যায়। দীর্ঘ স্বগতোক্তি, পরিচালকের প্রতি নির্দেশ, সূত্রধারের অবতারণা, স্থান বিশেষে বর্ণনারীতি, সঙ্গীতপ্রাধান্য এ সবও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির প্রয়াস।

আমাদের দেশের যাত্রাতেও বিচ্ছিন্নতাবাদেরই প্রাধান্য। যাত্রাভিনয়ে দর্শকদের ভেতর কোনও hypnotic fields of action সৃষ্টি করবার প্রচেষ্টা করা হয় না। দর্শকরা সচেতন মনে এবং সমালোচকের দৃষ্টিতে সব কিছু বিচার-বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে নেবার অবকাশ পান।

রবীন্দ্রনাথও তাঁর নাটকে মঞ্চসজ্জার ব্যাপারে ইলিউশন অব্ রিয়ালিটিকে বর্জন করবারই নির্দেশ দিয়ে গেছেন। অভিনয়ে বিচ্ছিন্নতার প্রচার করে গেছেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার—তিনি বলতেন ঃ অভিনেতাকে সব সময়েই তাঁর নাট্যচরিত্র থেকে আলাদাভাবে থাকতে হবে, তা না হলে শিল্পসৃষ্টি বা রসসৃষ্টি হবে না।

অভিনয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদ বলতে তিনি ঠিক কি বুঝতেন এ বিষয়ে ব্রেশট একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ "যে কোন বড় শহরের একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনার কথা ধরা যাক—রাস্তায় একটি এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে এবং ঘটনাস্থলে প্রচুর লোক জড় হয়েছে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী অন্যান্যদের কাছে ঘটনার বিবরণ দিচ্ছেন ঃ তিনি বোঝাতে চাইছেন আহত বৃদ্ধ লোকটি ধীরে ধীরে হেঁটে আসছিলেন। বিবরণ দেবার সময় বক্তা বৃদ্ধের হাঁটবার ভঙ্গি নিজে হেঁটে দেখাবেন অর্থাৎ এর দ্বারা তিনি শ্রোতাদের নিজের বক্তব্য সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেবেন। এক্ষেত্রে বক্তা বৃদ্ধের হাঁটবার ভঙ্গিটা উদাহরণ হিসাবে দেখাচ্ছেন। এ উদ্দেশ্য বক্তার নেই যে ঐ সব শ্রোতা এবং দর্শকেরা তাঁকেই ঐ আহত বৃদ্ধ বলে মনে করুক।

ব্রেশটের নাটক সঠিকভাবে এ্যাপ্রিসিয়েট করতে হলে তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা দরকার। অর্থাৎ আমাদের জানা দরকার যে ব্রেশট অন্তর থেকে বিশ্বাস করতেন ঃ

(১) সমাজের গঠন বদলিয়ে দেওয়া যায়।

(২) মানুষের স্বভাব বদলিয়ে দেওয়া সম্ভব।

(৩) মানুষের স্বভাব শ্রেণীভিত্তিক।

(৪) নাটকীয় সংঘাত হওয়া উচিত সামাজিক সংঘাত।

(৫) ডায়ালেকটিক্যাল মেটিরিয়ালিজম হচ্ছে আনন্দ আহরণের উৎস।

(৬) বাস্তবতা এবং কাব্যের সমতা রাখতে পারলেই নাটকীয় সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়।

ককেশিয়ান চক্ সার্কলের আর একটি সুন্দর গানের বাংলা অনুবাদ দিয়ে এ প্রবন্ধ শেষ করবো। এ গানটির অনুবাদকও শ্রীদুর্গাদাস সরকার।

ছেলে কার? পরিচারিকা গ্রুশার না গভর্নরের স্ত্রী? এ সমস্যার ফয়সলা করবার জন্য যখন আদালতে বিচার শুরু হল, বিচারক আজডাক গ্রুশাকে সম্বোধন করে বললে ঃ

আজডাক—আচ্ছা ধর ও তোমারই সন্তান—তুমি কি চাওনা সুযোগ পেলে ওকে বড়লোক করে দিতে? তোমাকে শুধু বলতে হবে ও তোমার ছেলে নয়। সঙ্গে সঙ্গে ও হবে যার এক বিরাট প্রাসাদের মালিক—ওর আস্তাবল থাকবে ঘোড়ায় ভর্তি, দরজার সামনে ভিক্ষে করবে অজস্র ভিক্ষুক, ওর অধীনে কত শত সৈন্য কাজ করবে, কত আবেদনকারী ওর আদালতঘর ভরে ফেলবে। কি বল, ও ধনী হোক এটা কি চাও না?

কঞ্চক—যে কথাগুলো গ্রুশা এর উত্তরে ভেবেছিল কিন্তু মুখে বলে নি, তা হচ্ছে এই—

গান ঃ

যদি সে সোনার জুতোয় দুই পা এঁটে
বুক ফুলিয়ে যায় সে হেঁটে
গলায় এঁটে গলায় পেটে
জীবনে পাবে কি সুখ?
যতো সে ভেংচি কাটুক
হা হা সে যতই হাসুক
তবু সে বুক ফুলিয়ে যাচ্ছে হেঁটে।

মানুষের নরম বুকে বয় কবে বয়
পাথরের নির্দয় ওই কঠিন হৃদয়।
বড় হলে এমনি ধারা
কাজ শুধু গরীব মারা।
ভাবে কি এভাবে দিন যাবে কেটে।
ভুখাদের মিছিল গেছে হয়তো ফিরে।
ক্ষুধার ভয় আসছে তেড়ে,
(তার) প্রাণ বাঁচবে এখন কি রে!
বাঁচবে সোনার জুতো?
আঁধারে যায় সে গুতো
আলো সে হারিয়ে ফেলে
কাঁদা যে বেড়ায় ঘেঁটে।

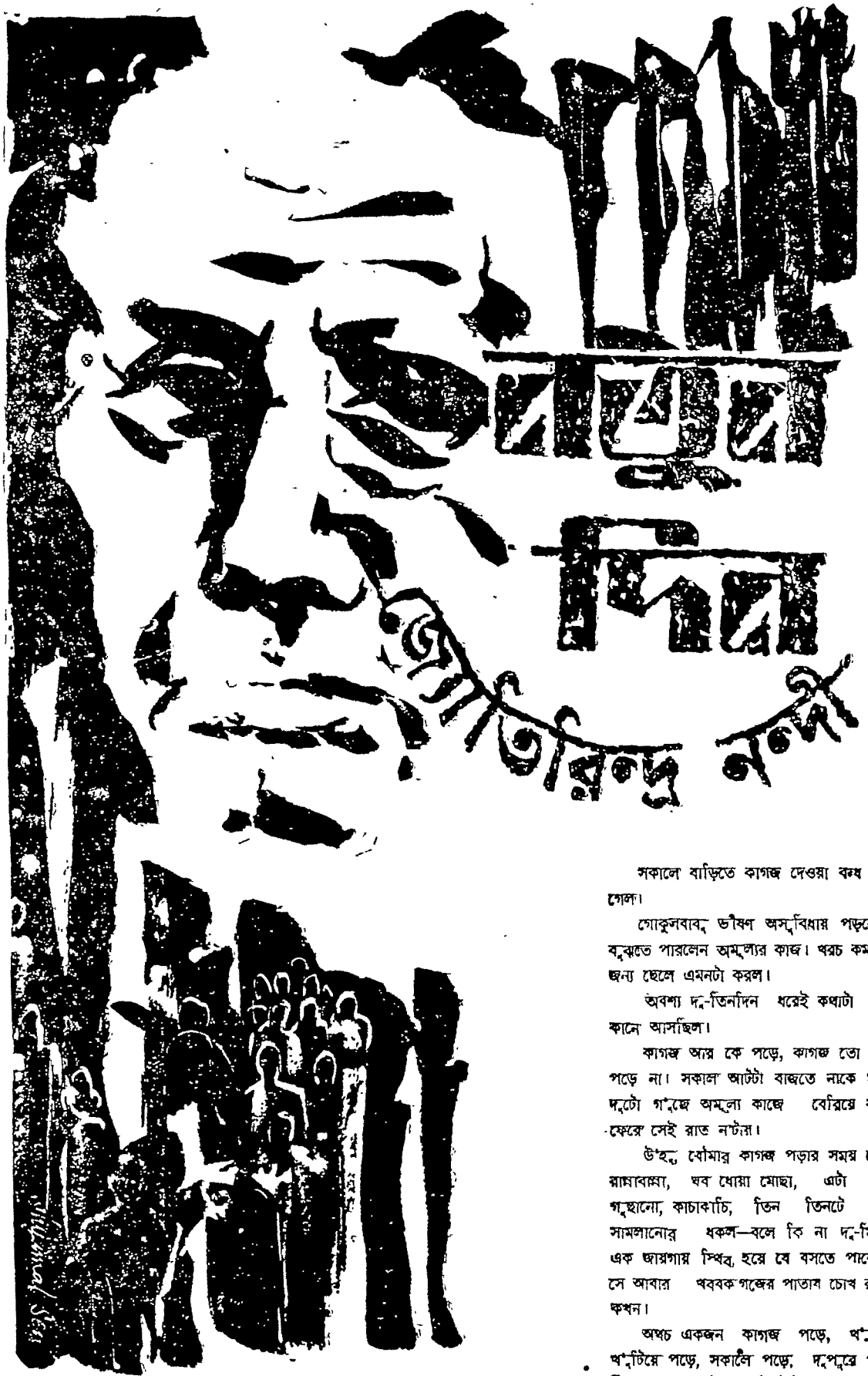

সকালে বাড়িতে কাগজ দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

গোকুলবাবু ভীষণ অসুবিধায় পড়লেন। বুঝতে পারলেন অমূল্যর কাজ। খরচ কমাবার জন্য ছেলে এমনটা করল।

অবশ্য দু-তিনদিন ধরেই কথাটা তাঁর কানে আসছিল।

কাগজ আর কে পড়ে, কাগজ তো কেউ পড়ে না। সকাল আটটা বাজতে নাকে মুখে দুটো গুঁজে অমূল্য কাজে বেরিয়ে যায়। ফেরে সেই রাত নটায়।

উঁহু, বৌমার কাগজ পড়ার সময় নেই। রান্নাবান্না, ঘর ধোয়া মোছা, এটা ওটা গুছানো, কাচাকাচি, তিন তিনটে বাচ্চা সামলানোর ধকল—বলে কি না দু-মিনিট এক জায়গায় স্থির হয়ে যে বসতে পারে না সে আবার খবরের কাগজের পাতায় চোখ রাখে কখন।

অথচ একজন কাগজ পড়ে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে, সকালে পড়ে, দুপুরে পড়ে, বিকেলে একটু হেঁটে-টেটে এসে আবার কাগজ নিয়ে বসে। হুঁ, গোকুলবাবু।

কিন্তু বৌমা কি অমূল্যর যেন এটা চোখেই পড়ল না।

যেহেতু তারা কাগজ পড়তে পারে না, পড়ার সময় নেই, সুতরাং কাগজওয়ালাকে মাস মাস পাঁচ ছ'টাকা দেওয়া বাজে খরচ ছাড়া কিছু না।

গোকুলবাবুর কিছু বলার নেই।

সকালে চা খেয়ে জানালাটার দিকে চোখ রেখে দেখলেন টুং টুং বেল বাজিয়ে শুকদেও এতবড় একটা কাগজের বাণ্ডিল সাইকেলের ক্যারিয়ারে চাপিয়ে সাঁ সাঁ করে চলে গেল। অবশ্য যাবার পথে নিবারণবাবুর বৈঠকখানায় একটা কাগজ ছুঁড়ে ফেলে গেল, হৃদয়বাবুর দোতলার বারান্দায় কাগজ ছুঁড়ে দিয়ে গেল, তারপরেই শুকদেওয়ের এই বাড়ির জানালায় কাগজ ছুঁড়ে ফেলার কথা, আজ শুকদেও এই জানালার দিকে তাকালও না, সোঁ করে সাইকেল নিয়ে গলিটা পার হয়ে গেল।

গোকুলবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। অর্থাৎ অমূল্য কালই বলে দিয়েছে, আর কাগজ দিতে হবে না। বাবাকে একবার জিজ্ঞাসাও করল না সে।

তার বাবা যে এত মনোযোগ দিয়ে খবরকাগজ পড়ে, বিটাযার করার পর তিনি বাড়িতে বসা, হাতে কোনো কাজকর্ম নেই, লোকজনের সঙ্গে মেলামেশাটাও খুব একটা পারেন না, কোনদিনও পারেন না, এই অবস্থায় কাগজখানাই যে তাঁর সাথী, প্রায় একটি বন্ধুর মতন, অমূল্য বুঝি সেই খোঁজ রাখে না!

কি করে রাখবে। সকাল আটটায় বাড়ি থেকে বেরোয়। ফিরতে রাত নটা দশটা বাজে। বাবা কাগজ পড়ে কি পার্কে ঘোরে, সেদিকে চোখ রাখার তার সময় নেই।

বৌমার অবস্থাও অনেকটা তাই। সারাদিন ধোয়া-মোছা রান্নাবান্না কাচাকাচি ঝাড়পোঁছ, তার ওপর তিন তিনটে বাচ্চার দৌরাত্ম্য। একা মানুষ মুখে রক্ত ওঠার কথা।

কদিন কি রেখেছিল অমূল্য।

বৌমার একটু সুবিধা হয়েছিল।

কিন্তু ঐ যে আগুন লাগা বাজার।

কি তুলে দিতে হয়েছে।

সবই বোঝেন গোকুলবাবু। অমূল্য যা আয় করছে তাতে একটা সংসার খুব ভাল করে চলে না। খুব ভাল কেন, মোটামুটি রকম চলাও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দশ টাকা মাছের কেজি। টাকা পাঁচ-সিকের কমে বাজারে কোনো অনাজ নেই।

কোনোদিন কেউ যা দেখে নি, শোনে নি।

কাজেই বাড়তি খরচ কি, খবরকাগজ—হুঁ, দুধ, নিতান্তই ওদের কোলের শিশুটার একটু দুধের দরকার—এইজন্য একটু রাখতে হয়।

গোকুলবাবু তো আশঙ্কা করছেন সেটুকুও না বন্ধ করে দিতে হয়।

অথচ, কথাটা শুনতে খারাপ লাগে, গোকুলবাবু লো পেসারের রুগী, ডাক্তার তাঁকে রোজ অন্তত একপো করে দুধ খেতে বলেছিল—কিন্তু অমূল্যকে তিনি বাড়িতে এসে সেকথা বলেন নি। বৌমাকেও না। দুধ ছাড়াই তাঁকে চলতে হচ্ছে। তিনি জানেন, বাচ্চাটার দুধের সঙ্গে আর একপো করে দুধ রাখার ক্ষমতা অমূল্যর নেই।

না হয় তাঁর জন্য অতিরিক্ত একপো রাখা হল, কিন্তু আরো তো দুজনটো শিশু আছে ঘরে। অমূল্যর বড় ছেলেটার বয়স পাঁচ। মেয়েটার বয়স তিন। পাঁচ বছর তিন বছরের শিশু দুধ খেতে পাবে না, অথচ তিনি দুধ খাবেন। ভাবতেও যেন কেমন লাগে।

ডাক্তার তো বলবেই।

কেবল কি দুধ, রোজ একটা করে হাফবয়েল মুরগির ডিম খেতেও বলেছিল তাঁকে।

একটা ডিমের দাম ত্রিশ নয়া। শীতকালে একটু কম। তাও পঁচিশ নয়ার এদিকে নামে না।

কাজেই কোন্ সাহসে তিনি অমূল্যকে বলবেন, আমার জন্য রোজ একটা করে মুরগির ডিম রেখে দে।

ডাক্তারের এই উপদেশ বাণীও তাঁকে বেমালুম চেপে যেতে হয়েছে।

যাই হোক, ডিম, দুধ তিনি চান নি। নিজে যেদিন উপার্জন করতেন, খেয়েছেন। কারো মুখের দিকে তাঁকে তাকাতে হয় নি। অফিসে যাবার সময় অমূল্যর মা রোজ তাঁকে একটা ডিম সিদ্ধ করে দিয়েছে, রাত্রে বাটির সঙ্গে গরম দুধ দিয়েছে। কোনোদিন যদি তিনি দুধটুকু খেতে না চাইতেন, অমূল্যর মা রাগারাগি করত।

স্ত্রী রাগারাগি করবে ভয়ে কতদিন কম ক্ষুধা নিয়েও তিনি বাটির দুধটুকু চুমুক দিয়ে খেয়ে নিয়েছেন।

সেদিনও টাকা পাঁচসিকের একসের খাঁটি দুধ পাওয়া গেছে। আজ তার দাম দাঁড়িয়েছে সাতসিকে, কোনো সময় দু-টাকা হাঁকে।

যাক, কবে তিনি দুধ খেয়েছেন ডিম খেয়েছেন, সেসব আজ আর ভাবেন না, ইচ্ছে করেই ভুলে থাকেন।

তাঁর কষ্ট হচ্ছে, হঠাৎ কবে কাগজটা বন্ধ হয়ে গেল। বৌমা তো জানে, চোখের ওপর দেখে শ্বশুরমশায় সারাদিন ঐ একটা জিনিস নিয়ে থাকেন। অন্য কোনো বই-টই পড়ার নেশা তাঁর নেই।

অন্তত বৌমা একবার তাঁকে বলতে পারত, আর কাগজ রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

গোকুলবাবু এই নিয়ে আপত্তি করতেন না।

শুধু তিনি আশা করেছিলেন, কাগজটা বন্ধ করার আগে তাকে একবার জানান হবে। এইটুকুন সরলতা পুত্র, পুত্রবধূর কাছ থেকে আশা করা কি তাঁর পক্ষে অন্যায়।

শুকদেও চলে যাবার এক মিনিট পরেই দূরে গোপী সিং-এর লাল রঙের সাইকেলটা গোকুলবাবুর চোখে পড়ল। বাংলা ও ইংরেজী দুরকম কাগজ থাকে গোপী সিং-এর কাছে।

যেন ঠিক এই রাস্তাটায় গোপী সিং-এর কাগজের খদ্দের খুব একটা নেই। নিমগাছতলার চারতলা বাড়ির সামনে সাইকেল থেকে লাফিয়ে নেমে খপ করে একখানা কাগজ বাণ্ডিলের ভিতর থেকে টেনে বের করে এক টুকরো সুতোর প্যাচ দিয়ে গোপী হেঁই করে সেটা ছুঁড়ে একেবারে তেতলার বারান্দায় তুলে দিল। জিনিসটা দেখবার মতন। এভাবে রোজ রাস্তা থেকে সরাসরি তেতলায় কাগজ পাঠিয়ে দেওয়ার মধ্যে যথেষ্ট কৃতিত্ব আছে বলে গোকুলবাবু মনে করেন। তিনতলায় পাশাপাশি দুটো ফ্ল্যাট। নীতিশ ডাক্তার এদিকের ফ্ল্যাটে থাকেন, ওদিকের ফ্ল্যাটে আছেন অ্যাডভোকেট চারুবাবু। চারুবাবু গোপী সিং-এর কাছ থেকে কাগজ নেন। কাজেই এত নিচে থেকে গোপী যখন কাগজটা ওপরের দিকে ছুঁড়ে মারে কাগজটা রেলিং টপকে অ্যাডভোকেটের বারান্দায় গিয়ে পড়ে, একদিনও সেটা ডাক্তারের বারান্দার দিকে চলে যায় না। চমৎকার হাতের নিশানা গোপী সিং-এর।

আজও ব্যাপারটা লক্ষ্য করে গোকুলবাবু মনে মনে সিংজীর হাতের অব্যর্থ নিশানার প্রশংসা করলেন। সাইকেল ছুটিয়ে হাওয়ার বেগে গোপী সিং গলি থেকে বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে যাওয়ার পর গোকুলবাবু কিন্তু অন্য চিন্তায় নিমগ্ন হলেন।

সদ্য প্রেস থেকে বেরিয়ে আসা তকতকে ঝকঝকে কাগজখানার কথাই তিনি ভাবছিলেন। যেন চোখের সামনে প্রথম পাতার বড় বড় হেডিং-টাব লেখাগুলি তিনি চোখের সামনে দেখছিলেন। হুঁ, তাই হবে। আজ ডঃ হো চি মিনের অন্ত্যেষ্টি। আজ বুঝি দার্জিলিং-এর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে। কাল পর্যন্ত তো তাই লিখেছিল। তিস্তার জল কমছে। খান আব্দুল গফুর খানের ভারত পরিদর্শনের পাকাপাকি তারিখটা নিশ্চয় আজ বেরোবে। ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ নিয়ে শ্রীমধু লিমায়ে খুব একচোট বক্তৃতা ঝেড়েছিল কাল। আজ আবার কে কি বলেছে কে জানে।

আজ আর গোকুলবাবুর জানালায় কাগজটা এসে পৌঁছাল না। পৃথিবীর সমস্ত খবর অন্ধকার হয়ে গেল।

এই একটি সুখের জিনিস, এই একটি মাত্র আনন্দের জিনিস ছিল গোকুলবাবুর। খবরকাগজ পড়া তাঁর কাছে একটা নেশার মতন।

বেলা বাড়ছিল। রোদ চড়ছিল।

অ্যাডভোকেটের চারতলা বাড়ির সামনের নিমগাছের পাতা রোদে চিকচিক করছে। এতক্ষণ চায়ের কাপটা হাতে ধরে রেখেছিলেন গোকুলবাবু। কখন চা খাওয়া হয়ে গেছে। দুটো নীল মাছি এসে বসে আছে শূন্য কাপের কিনারে। গোকুলবাবু একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেললেন।

কাপটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন। লুঙ্গি পরা ছিল। লুঙ্গি ছেড়ে ধুতিখানা পরলেন। পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়ালেন। আলনার হুকে বেতের লাঠিটা ঝুলছিল। হাত বাড়িয়ে লাঠিটা পেড়ে আনলেন। তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

এই সময়টা তিনি বড় একটা বাড়ি থেকে বেরোন না। তাঁর বেরোবার সময় ভোর পাঁচটা।

পাঁচটা থেকে ছটা—পুরো একটা ঘণ্টা তিনি এদিক ওদিক হাঁটাহাঁটি করেন। সব সময় যে হাঁটেন তা না। এই অঞ্চলে এখন দু-দুটো নতুন পার্ক হয়েছে। যে-কোনো একটায় ঢুকে পড়ে খানিকক্ষণ বসে বিশ্রাম করেন। নিরিবিলি বসে থাকতে বড় ভাল লাগে তাঁর। খুব একটা ভিড় হয় না, বিশেষ করে এদিকের বড় পার্কটায়।

ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের কল্যাণে এটা তৈরী হয়েছে। আর একটা পার্কও হয়েছে সরকারী ফ্ল্যাটগুলির গা ঘেঁষে।

অনেক লোকজন এসে গেছে সেসব ফ্ল্যাটে। অথচ লাগোয়া পার্কটা ছোট। কাজেই সেখানে ভিড় বেশি। সকাল বিকেল দুবেলাই বিস্তর জনসমাগম হয়। ভিড় এড়াবার জন্য গোকুলবাবু বেললাইনের ধারের বড় পার্কটায় চলে যান। ওটা অনেক নির্জন।

এদিকেও অনেক নতুন বাড়ি উঠছে। ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট তৈরী করছে। ফ্ল্যাট বাড়ি। ভাড়া দেওয়া হবে। অথবা বিক্রী করা হবে।

ফ্ল্যাট কেনার একটা হিড়িক বেড়ে গেছে। আগাম কিছু টাকা দিয়ে তারপর কিস্তীতে বাকি টাকা শোধ করা। সুবিধা আছে।

তা না হলে কলকাতা শহরের ওপর জমি কিনে বাড়ি করা। সে অনেক টাকার ধাক্কা।

এমনিও একখানা দু-খানা মোটামুটি ভাল ঘর দেড়শ দু-শ টাকার কম ভাড়া পাওয়া যায় না।

এর চেয়ে যদি একসঙ্গে আট দশ হাজার টাকা দিয়ে এসব ফ্ল্যাট নেওয়া যায়—তারপর মাসে মাসে দেড়শ দু-শ টাকা কিস্তী টেনে বাকি টাকা শোধ করে ফেললেই হল। ফ্ল্যাটখানা নিজের হয়ে যাবে।

এমনি ভাড়া বাড়ির হাঙ্গামা কত। বাড়িওয়ালাদের জুলুম কত।

না না, তার চেয়ে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ভাল ব্যবস্থা করেছে। জনসাধারণ উপকৃত হবে। তবে কিনা একসঙ্গে দশ-বারো হাজার টাকা আগাম দেওয়া অনেকের পক্ষেই সম্ভব না। অবশ্য ছ-সাত হাজার টাকা দিলেও নাকি ছোট ফ্ল্যাটে ঢোকা যায়। কিন্তু একসঙ্গে ছ-সাত হাজার টাকাই বা কটা লোক দিতে পারছে। যা দিনকাল।

তবে কিনা কলকাতা শহর।

নেই দলের মানুষের যেমন সীমা সংখ্যা নেই, তেমনি আছে দলের মানুষের সংখ্যাও অগুণতি।

এই এক তাজ্জব জায়গা।

অভাব অভাব অভাব। আবার একটু চোখ ফেরালেই দেখবে অঢেল প্রাচুর্য অপর্যাপ্ত। খেয়ে কুলোতে পারছে না। ফেলে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

তাই তো দেখছেন গোকুলবাবু। তিনি আজ ত্রিশ বছরের ওপর এই তল্লাটে আছেন। চোখের ওপর দেখলেন হাজার হাজার বস্তি ভেঙ্গে দিয়ে চারদিকের নালা বুজিয়ে ঝোপঝাড় কেটে সাফ করে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট জায়গাটার চেহারা বেমালুম পাল্টে দিয়েছে।

বড় বড় রাস্তা তৈরী হল। আণ্ডারগ্রাউণ্ড ড্রেন হল। ঝোপ জঙ্গল বস্তি কাঁচা নর্দমার চিহ্নও আর রইল না কোথাও।

তবে কিনা বস্তির সেই মানুষগুলি গেল কোথায়। ট্রাস্ট সেদিকেও দৃষ্টি রেখেছে। তাদের জন্য চমৎকার পাকা বাড়ি তৈরী হয়ে গেল।

কিন্তু মুস্কিল, বস্তির খোলার ঘরে টালির ঘরে যেখানে সাত টাকা আট টাকা বেচারাদের ভাড়া দিতে হত, সরকারী কোয়ার্টারের এক একখানা ঘরের জন্য উনিশ টাকা কুড়ি টাকা ভাড়া দিতে হচ্ছে।

ফলে কী দাঁড়াল। বলে কিনা পেটে খেলে, তবে অন্য সুখ, দরকার নেই আমার স্যানিটারি পায়খানার, দরকার নেই আমার ইলেকট্রিক আলোর। অনেকেই আবার কোথায় কোন্ তল্লাটের বস্তিতে সাত-আট টাকায় ঘর ভাড়া পাওয়া যায় সেখানে ছুটল। অবশ্য যাবার সময় পাকা ঘরে কাউকে বসিয়ে দিয়ে গেল।

কিন্তু এমনি কি কেউ কাউকে বসিয়ে যায়। এমন সুহৃদ এ দিনে কটি আছে। নগদ কিছু হাতে নিয়েই তবে ঘরখানা ছাড়ল।

গোড়ায় হয়তো এমন একটি দুটি ঘটনা ঘটেছিল।

তারপর দেখতে দেখতে এটাই কেমন চমৎকার রেওয়াজ হয়ে দাঁড়াল।

ঐ যে বলা হয়েছে। 'নেই দলের' মানুষের যেমন সীমা সংখ্যা নেই, তেমনি 'আছে দলের' মানুষও গুণে শেষ করা যায় না।

আর 'আছে দলের' মানুষ সুযোগ পেলেই যে 'নেই দলের' ওপর সুবিধা নেবে এ তো শাস্ত্রের কথা। সেই দেবতা আহারের আমল থেকে এই জিনিস চলে আসছে। অমৃত আমরা খাব আমরা দেবতা, তোমাদের অসুরদের এর ওপর অধিকার নেই।

অবশ্যেও তাই। ভি আই পি রোডের ওপর এমন চমৎকার সুর কোঠা বাড়ি। আমাদের দাও। টাকা চাইছ? কত টাকা? কামরা পিছে পাঁচশ। আরে রাম! পাঁচশ আবার একটা টাকা। তুমি আটশ নাও, আমি আটশ টাকা দিচ্ছি। হ্যাঁ, ঘর তোমার নামেই থাকবে, তোমার নামেই আমি গভর্নমেন্টকে ভাড়া দিয়ে যাব, তবে কিনা এক টুকরো কাগজের ওপর লিখে দিয়ে যাও, এই ঘরের ওপর আমার আর কোনো দাবী দাওয়া রইল না। নেই দলের মানুষ হাসতে হাসতে লিখে দিল। থোক টাকা পাচ্ছে। এত টাকা একসঙ্গে সে দেখেনি। দরকার কি আমার পাকা ঘরের। পাকা কল পায়খানার। কলকাতা শহরে এখনো অঢেল বস্তি পড়ে আছে। আবার আট দশ টাকা ভাড়ার একটা ঘর খুঁজে নিলেই চলবে। বরং এই যে রূপকড়ে টাকাগুলো পেলাম, তাই দিয়ে একটা পানের দোকান খোলা যাবে। ছোটখাট চায়ের দোকান দিয়েও বসা যায়। 'নেই দলের' মানুষের কি অভাবের শেষ আছে। আর একজন তখনই ঠিক করে ফেলল টাকাটা দিয়ে বোনের চিকিৎসে চলবে। বেচারা টি বি-তে ভুগছে। আর একজন মেয়ের বিয়ের কথা চিন্তা করছে।

আছে দলের একজন যদি আটশ দিল, আর একজন ছুটে এল হাজার টাকার নোট নিয়ে। তারপর আর একজন এল দেড় হাজার টাকা কোমরে গুঁজে। এখন একটা ঘরের দাম হয়েছে দু-হাজার। গোকুলবাবু আশঙ্কা করছেন, আরো উঠবে।

যারা এভাবে ঘর কিনে নিচ্ছে তাদের বিষয়বুদ্ধি অনেক বেশি। হয়তো যাদবপুরে কি বেহালায় দেড়শ টাকা রাডি ভাড়া গুনছিল। তার চেয়ে ভি আই পি রোডের ওপর এমন দু-খানা কামরা তিন চার হাজার টাকা খরচ করে হাত করে নিতে পারলে অনেক অসুবিধে। টাকাটা উঠে আসতে কদিন লাগবে। ভাড়া তো মাত্র কুড়ি কুড়ি চল্লিশ। এখান থেকে বড়বাজার কাছে, ডালহৌসী চৌরঙ্গী কাছে। মেডিকেল কলেজ, শেয়ালদা, হাওড়া সব নাকের ডগায়। যাদবপুর বেহালা কি এই মুলুকে।

কাজেই বস্তি ভেঙ্গে দিয়ে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট যাদের জন্য ঘর তৈরী করেছিল তারা আবার বস্তিতে ফিরে যাচ্ছে। এসব বাড়ির জন্য এখন উকিল মোক্তার ডাক্তার প্রফেসার ও কারবারী মানুষেরা গোছা গোছা নোট নিয়ে হাত বাড়িয়ে আছে।

তবে এদিকটা অনেক বেশি অভিজাত।

বড় বড় ফ্ল্যাট হয়েছে। ভাল ভাল লোকেরা সব আসছেন। তাদের অনেকেরই লম্বা মাইনের বড় চাকুরী, বড় ব্যবসায়ীও আছেন। আবার হাতে যা পুঁজিপাটা ছিল সব বেচে দিয়ে মনের মতন একখানা ফ্ল্যাট বাড়িতে বাস করার আশায়ও কতজন ছুটে

এল। ঐসে তখন তাল সামলাতে গিয়ে পায়ে পায়ে হোঁচট খাচ্ছে। পাশের ফ্ল্যাটের গিন্নীর ফ্রিজ আছে, গ্যাসে রান্না হচ্ছে—সব দেখে শুনে এই ফ্ল্যাটের গিন্নীর মুখ ভার মন খারাপ। ওদিকের ফ্লাটের বাবুটির গাড়ি আছে, আর এই ফ্ল্যাটের বাবু ট্রামে বাসে ঝুলে অফিস করছে, গাড়ি কিনবে দূরে থাক, বাড়িতে একটা চাকর রাখার ক্ষমতাও হচ্ছে না, কেন না মাস মাস গভর্ণমেন্টের কিস্তীর টাকা গুণে খাই-খরচ চালানোই মুস্কিল হয়ে পড়েছে—কাজেই ফ্ল্যাট কেনার আগে, যদি বা চাকর ছিল এখন সেটি কাট্ করতে হয়েছে, আগে যদি বা ছেলেমেয়েদের জন্য মাসে একশ টাকা খরচ করে ছেলের প্রাইভেট টিউটর রাখার রেওয়াজ ছিল, এখন সেটি বন্ধ করে দিতে হয়েছে।

তার মানে ওপরটা তকতকে ঝকঝকে। কিন্তু খোঁজ নিলে দেখা যাবে ভেতরটা ফাঁপা। অর্থাৎ এখানেও নেই দল' আছে দলের একটা অদৃশ্য সংঘর্ষ তলে তলে কাজ করে যাচ্ছে।

গোকুলবাবু যখনই রাস্তায় বেরোন এই ফ্লাটের নতুন বাড়িগুলি নতুন মানুষগুলিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন।

সত্যিই আবহাওয়াটা কেমন বদলে গেছে।

অমূল্য একদিন দুঃখ করে বলেছিল, বাবার প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাটা থাকলে একখানা ফ্লাটে ঢুকে পড়া যেত। কিন্তু গোকুলবাবু প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের কত টাকাই বা পেয়েছিলেন। একটা কাগজের অফিসের প্রুফ রীডার ছিলেন। শেষ দিকে হেড প্রুফ রীডার হয়েছিলেন। তারপর যখন চোখে ছানি পড়ল, কাজ করতে মাথা ঘুরতে আরম্ভ করল তখন তাকে চাকরি থেকে অবসর নিতে হল।

কাজেই প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে কত টাকাই বা তাঁর হাতে এসেছিল। কিন্তু ঐ যে, মেয়ের বিয়ে। বাসনার বিয়ে দিতে অর্ধেক টাকাই খরচ হয়ে গেল।

তাতেও কি কুলিয়েছিল।

অমূল্যর মার হাতের চারগাছা চুড়ি এবং গলার হারখানা বাঁধা দিতে হয়েছিল।

হারটা উদ্ধার করা হয়েছিল, কিন্তু চুড়ি কগাছা আর ফিরিয়ে আনা সম্ভবই হল না। আজও সেই চুড়ি ভুবন সিকদারের বাড়ে পড়ে আছে। এখন আর বাড়ে তোলা নেই। ভুবন সিকদারের দ্বিতীয় পক্ষের গিন্নীর হাতে সেই ইলেকট্রিক প্যাটার্নের চুড়ি কগাছা উঠেছে।

গোকুলবাবু কি আর দেখেছেন। গতবার পুজোর সময় বাসনা কদিনের জন্য বেড়াতে এসেছিল। বাসনা ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিল। ভুবন সিকদারের দ্বিতীয় পক্ষের পরিবারও ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিল। বাড়ি ফিরে বাসনা গোকুলবাবুকে বলেছিল, মার হাতের

...সিকদার গিন্নী ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছে

চুড়িগুলি পরে সিকদার গিন্নী ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছে।

শুনে মনে এত কষ্ট পেয়েছিলেন গোকুলবাবু।

তাঁর তো আর চাকরি নেই, উপার্জন করার ক্ষমতাও শেষ হয়েছে।

তিনি আশা করেছিলেন, অমূল্য তার মায়ের চুড়িগুলি উদ্ধার করে আনতে পারবে। মানুষটা স্বর্গে চলে গেছে। তাঁর একটা স্মৃতিও তো বটে। কিন্তু অমূল্যর ক্ষমতায় কুলোল না। তার যা চাকরি। একটা গুদ্দরাটি ফার্মের টাইপিস্ট। ঐ চিরকাল থাকবে। কী আশা আছে কী ভবিষ্যৎ আছে টাইপিস্টের। আর এক জায়গায় গেলে আর কিছু টাকা না হয় বেশি পাবে। এলাউন্স টেলাউন্স নিয়ে শ' তিনেক টাকা এখন পায়। অন্য কোথাও চান্স পেলে তিনশ' টাকা বেড়ে না হয় সাড়ে তিনশ' হল, বেশ তো চারশই হল, তা বলে আটশ হাজার টাকা কোনদিনই হবে না।

কাজেই যদি প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাটা গোকুলবাবু তার হাতে তুলে দিতেন তাহলে কী হত ? হুঁ, না হয় তার মার গয়না বাঁধা দিয়ে যে টাকাটা ধার করা হয়েছিল, সেটাও তাকে দেওয়া হত, তারপর ? ফ্লাট কিনত ? কিনত মানে কী— এই টাকাটা জমা দিয়ে ফ্লাটে গিয়ে বসতে পারত। কিন্তু তারপর ?

তিনটে বাচ্চা। তারা স্বামী স্ত্রী। গোকুলবাবু এখনো জীবিত। সকাল হতে পাঁচ-ছটা মুখের খাদ্যের জোগাড় চাই। তার ওপর জামা কাপড় আছে। অমূল্যর অফিসের টিফিন খরচ আছে, বাস ভাড়া আছে, তার সিগারেট আছে, তার ওপর ঝোপা নাপিত ইলেকট্রিক বিল—এদিকে আশী টাকা বাড়ি ভাড়া। এই নিয়েই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে চাঁদা যার ফলে গোকুলবাবুর দুধ বন্ধ হয়ে গেল, খবরকাগজ বন্ধ হয়ে গেল। হুঁ, যে কথা হচ্ছিল, এখানকার নতুন হাওয়াটা একটু ভাল করে গায়ে লাগাবার জন্য, অ্যারিস্টক্রেট হবার জন্য অমূল্য যে ফ্লাটে ঢুকতে চেয়েছিল, তারপর অবস্থাটা কী হত ? কিস্তীর টাকাটা বয়ে টানত কী করে ?

মাঝখানে থেকে তাঁর প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাটা যেত। এইজন্য গোকুলবাবু শক্ত মুঠোয় টাকাটা ধরে রাখলেন এবং চেষ্টাচরিত্র করে যতটা তাড়াতাড়ি পারলেন বাসনার বিয়ে দিয়ে দিলেন। তা না হলে আজও মেয়েটার বিয়ে হত না। অমূল্যর ক্ষমতা ছিল না এই চাকরি করে বোনের বিয়ে দেয়।

তার অর্থ আজও বাসনা গাছ হয়ে

খেয়ে থাকত। অমূল্যর স্যার হুকুম খাটত আর সারাদিন তাদের কাচ্চা বাচ্চা আগলত।

টাকাটা তিনি দেন নি। অমূল্য কি কম যোগাযোগ করেছে। বলেছিল, এখন তো অ্যাডভান্স টাকাটা দিয়ে স্ল্যাটটা নিয়ে নেওয়া যাক—তারপর বাকী টাকা যে করে হোক আমি শোধ করব।

কি করে সে শোধ করত ? চুরি করে? ডাকাতি করে ? গোকুলবাবু অবশ্য ছেলেকে এই নিয়ে প্রশ্ন করেন নি।

তবে তিনি মনে মনে ভাবেন, যারা চুরি ডাকাতি করতে পারে তারা বাবার প্রভিডেন্ট ফান্ডের কটা টাকার আশায় বসে থাকে না। তাদের কাচ্চা বাচ্চার কি বুড়ো বাপের দুধ বন্ধ হয় না, কি চাকর তুলে দিতে হয় না। দৈনিক খবরকাগজের জন্য মাসে কটা টাকা দিতে হবে বলে দুর্ভাবনায় মরতে হয় না।

মুদির দোকানটায় সর্বদা ভিড় লেগে আছে। হরিশ মুদি একখানা কাগজ রাখে। কিন্তু দোকানের দরজায় এত মানুষ, গিসগিস করে। মোড়ের দোকান বলে এই অবস্থা। অবশ্য এই তল্লাটে এখনো এই একটাই দোকান।

আর একটা মুদিখানা আছে রেল-লাইনের ওপারে। বেশ একটু দূরে পড়ে যায়। কাজেই হরিশের দোকানে চাপটা পড়ে বেশি। কি চলে যাবার পর থেকে এটা ওটা কিনতে গোকুলবাবুকে কবারই দোকানে আসতে হয়। তিনি দেখেছেন বেলা বারোটা পর্যন্ত খদ্দেরের ভিড় লেগে থাকে।

আর ভিড় যদি নাও থাকত, হরিশের দোকানে বসবার জায়গা কোথায় যে কাগজটা খুঁজে ধীরে সুস্থে একটু পড়া যাবে।

ডালের বস্তা, লঙ্কা পেঁয়াজের বস্তা তেলের টিন গুড়ের টিনে দোকানের ভিতরটা সর্বদা বোঝাই হয়ে থাকে। তা না হলে কাগজখানা তো এমনি পড়ে থাকে। হরিশের সময় নেই কাগজ পড়ার। তার কর্মচারীরও সেই অবস্থা। খদ্দের দেখতে তাদের প্রাণ বেরিয়ে যায়।

চায়ের দোকান না যে সকালে কেবল কাগজ পড়তেই সেখানে একটা ভিড় জমে যাবে। এখানে লোকে আসে ডাল তেল নুন মশলাপাতি কিনতে। তাদেরও কাগজ পড়ার সময় থাকে না।

হরিশের কাগজখানা চেয়ে নিয়ে অনেকটা সময় নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া যেত। কিন্তু ঐ যে ভিতরে বসবার জায়গা নেই। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তো আর কাগজ পড়া যায় না।

গোকুলবাবু একটু হতাশ হয়ে আবার হাঁটতে আরম্ভ করলেন।

হরিশের ভাঁজ করা কাগজখানা হকার যে অবস্থায় দিয়ে গেছে ঠিক সেই অবস্থায় পিছনের কাপড়কাচা সাবানের চাকাগুলির ওপর পড়ে আছে। এত বেলা হল, এখন পর্যন্ত কাগজটা একবার কেউ খুলেও দেখল না।

ভাঁজ করা কাগজখানা গোকুলবাবুর চোখের ওপর ভাসতে লাগল।

দোকান বন্ধ করে হরিশ যখন দুপুরে ভাত খেতে বাড়ি যাবে তখন কালে কার কাগজখানা নিয়ে যাবে। হয় খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করার সময় বিছানায় শুয়ে কাগজ-খানা সে একবার খুলে দেখবে, হয়তো হরিশের বাড়ির অন্য কেউ পড়বে। একজন পড়বেই, না হলে পয়সা খরচ করে রোজ কাগজ রাখা হয় কেন।

তবে এটাও সত্য কথা, খবরকাগজ মুদিখানার পক্ষে একটা অতি প্রয়োজনীয় জিনিস। ঠোঙ্গা বানাতে কি এমনি জিনিসপত্র মুড়ে দিতে কথায় কথায় কাগজের দরকার।

তবে এটা গোকুলবাবু বিশ্বাস করেন না যে কেবল ঠোঙ্গা বানাবার জন্য কি ছিঁড়ে হলুদ লঙ্কার মোড়ক করার জন্য হরিশ একখানা করে দৈনিক কাগজ রাখে।

হরিশ নিজে পড়ুক কি বাড়ির আর কেউ পড়ুক, একজন ঠিকই পড়ে। তারপর হয়তো দোকানের সওদা দেবার জন্য কাগজ-

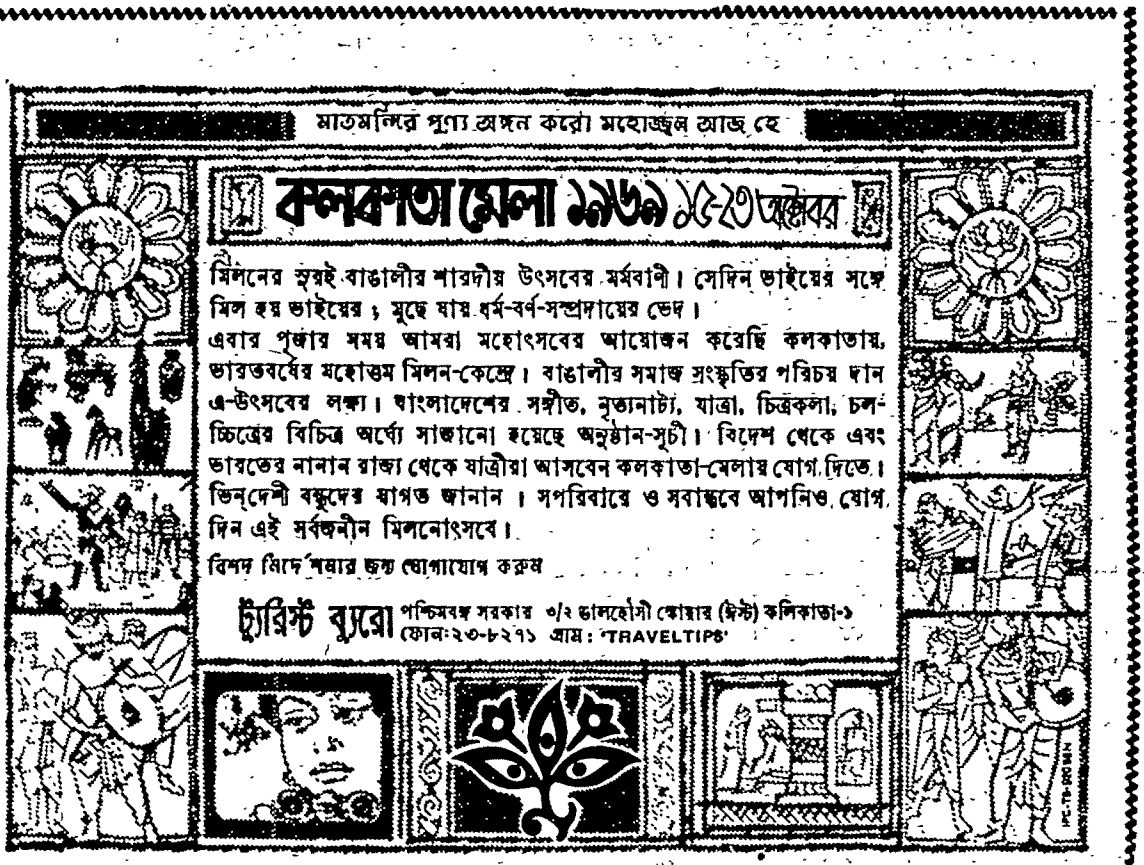

জন্য ছেড়া হয় কি ঐ দিয়ে ঠোঙ্গা তৈরী করা হয়।

বড় রাস্তার চায়ের দোকানটা গোকুলবাবুর পক্ষে একটা ভীতিপ্রদ জায়গা।

সেই সকালে তিনি যখন বেড়াতে বেরোন তখন তাঁর চোখে পড়ে পনেরো কুড়িজন চায়ের কাপ সামনে নিয়ে চেয়ারগুলি একত্র করে গোল হয়ে বসে অনর্গল কথা বলছে।

সঠিক কি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে গোকুলবাবু ঠিক শুনতে পান না। তবে ছাড়া ছাড়া কয়েকটা কথা সর্বদাই তাঁর কানে ভেসে আসে। যেমন সিমেন্ট, লোহা, ইট-কাঠের দর মাঝে মাঝে ঘোড়ার কথা শোনেন, লটারীর টিকেট শব্দটাও কানে আসে। আর আসে ট্যাক্সির পারমিট, মদের দোকানের লাইসেন্স ইত্যাদি বড় বড় কথা।

কাজেই গোকুলবাবু অনুমান করেন ব্যবসা ছাড়া অন্য কোনো কথাই কেউ সেখানে উচ্চারণ করে না।

হুঁ, খবরকাগজ রাখা হয় বৈকি। আড়চোখে কতদিনই গোকুলবাবু তাকিয়ে দেখেন, এর ওর হাতে কাগজের একখানা দুখানা সীট ঝুলছে। অথচ কাগজের দিকে কারো চোখ নেই। এমনি ওটা হাতে নিয়ে বসে মদের দোকানের লাইসেন্স, ট্যাক্সির পারমিট নয়তো লোহালক্কড়, সিমেন্টের বাজার দর নিয়ে জোর আলোচনায় সব নিমগ্ন।

অথচ মজা এই যে, এই মানুষগুলি রোজ সেই কাকভোরে কোথা থেকে ছুটে সেই তৃপ্তি নিকেতনে একত্র হয়, তাদের বাসস্থান কোথায়, এবং কতক্ষণ পর্যন্ত এই সব আলোচনা নিয়ে তারা মেতে থাকে, গোকুলবাবু ঠিক বুঝতে পারেন না। কেন না বিকেলের দিকেও বেড়াতে বেরিয়ে তিনি ঠিক ঐ মুখগুলি দেখতে পান। এবং তখনও ইট সিমেন্ট লোহা কাঠ রেস বন্দুক মদের দোকান নিয়ে জোরালো আলোচনা চলতে থাকে।

তখন অবশ্য আর খবরকাগজ কারো হাতে চোখে পড়ে না।

গোকুলবাবুর কাছে সবাই নতুন। মুখ। চায়ের দোকানটাও নতুন এবং তাদের আলোচনার প্রসঙ্গগুলিও তাঁর কাছে অন্তত এই তল্লাটে নতুন মনে হয়।

তা তো হবেই, গোকুলবাবু তখন চিন্তা করেন, জায়গাটাই তো নতুন হয়ে গেল। যেখানটায় এখন সুপারওয়ে নাম দিয়ে এমন চওড়া সড়ক তৈরী হয়েছে, ক'দিন আগেও সেখানে বড় বড় জলা ছিল, বাবলার জঙ্গল ছিল আর ছিল উঁচু উঁচু তাল-নারকেল গাছ। জলার পাশ দিয়ে রিক্সা, গরুর গাড়ি চলতে পারে এমন কাঁচা রাস্তা বছরের বেশির ভাগ সময় জল, কাদায় প্যাচ প্যাচ করত। এখন মুহুর্মুহু ট্যাক্সি প্রাইভেট গাড়ি বাস ছুটছে। বড় বড় বিমান কোম্পানির গাড়ি দমদম এয়ারপোর্টের দিকে ছুটে যাচ্ছে। কে কবে আশা করেছিল এদিক দিয়ে সোজা দমদম যাবার একটা প্রকাণ্ড চওড়া পথ বেরিয়ে যাবে।

কাজেই সবকিছু এই তল্লাটে নতুন। একটু পুব দিক ধরে এগিয়ে যাও, কত বড় লেক হয়েছে, কত বড় শিশু হাসপাতাল হয়েছে, দেখতে দেখতে ক'টা পাম্পিং স্টেশন বসে গেল, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, নার্সিং হোম—বলে কিনা সেদিনও যেখানে শেয়াল চড়ে বেড়াত, মরা গরু মোষ খেতে কাঁকে কাঁকে শকুন নেমে আসত, এখন চোখ দুটো বিশ্বাস করতে চায় না এই অঞ্চলের এই রূপ এই বেশ।

কাজেই এত যেখানে নতুন, সেখানে একটা জমকালো তৃপ্তি নিকেতন, হবে, আর নতুন নতুন মুখ এসে দোকানের সব ক'টা চেয়ার একত্র করে গোল হয়ে বসে দুবেলা নতুন নতুন কথা বলবে আশ্চর্য কি।

গোকুলবাবু সযত্নে তৃপ্তি নিকেতনের পাশ কাটিয়ে গলির মধ্যে ঢুকে পড়েন।

উঁহু, দোকানে বসে চা খাওয়া তাঁর কোনোদিন অভ্যাস নেই। যতদিন কাগজের অফিসের চাকরি করেছেন বেয়ারা কেটলি করে টেবিলে চা ঢেলে দিয়ে গেছে। বাড়িতে অমূল্যর মা চা তৈরী করে দিয়েছে। এখন আর অফিসে যান না। বৌমা দুবেলা চা করে দেয়।

দোকানের কাপগুলির ঘিনঘিনে চেহারা তো আছেই, আর ঐ যে বাজে আড্ডা—গোকুলবাবুর একেবারে অসহ্য।

কিন্তু আজ যেন নিরুপায় হয়ে তিনি হাঁটছেন। সকালে কাগজ পড়া হয় নি। তাঁর চল্লিশ বছরের নিয়মিত অভ্যাস। সকালে উঠে পায়খানা করার মতন, দাঁত মাজার মতন খবরকাগজ খুলে বসা তাঁর স্বভ বের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। এর ব্যতিক্রম ঘটলেই তিনি অস্বস্তিবোধ করেন, অসুস্থবোধ করেন।

নতুন দোকান টোকান যেমন হয়েছে তেমনি দু ধারে দেকানও আছে যেমন এখনও তকতকে ঝকঝকে নতুন পাকা ইমারতের পাশে পলস্তরা খসা একটা দুটো ধ্বসে বিবর্ণ পুরোনো বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। যেমন সুট-বুট-পরা নতুন নতুন বাবুদের মধ্যে গোকুলবাবুর মতন, যাঁরা ত্রিশ চল্লিশ বছরের ওপর এই অঞ্চলের বাসিন্দা, জীর্ণ শীর্ণ চেহারার মলিন পোষাক পরা একটা দুটো মানুষকে রাস্তায় চলতে দেখা যায়।

এমন একটা পুরোনো দোকানের সামনে এসে গোকুল দাঁড়ালেন।

টিনের চালা। চালের ওপর একটা চালতে গাছ নুয়ে পড়ে দোকানের চেহারাটাকে কেমন অন্ধকার করে রেখেছে।

প্রহ্লাদ মাইতির চায়ের দোকান অনেক-দিনের। প্রহ্লাদ বেঁচে নেই। তার ছেলে এখন দোকান দেখাশোনা করছে। অমৃত কেবিন। প্রহ্লাদ যে কোথা থেকে এই চমৎকার নামটা জোগাড় করেছিল ঈশ্বর জানে।

দোকানের চা তিনি খান না। তাহলেও অমূল্যর মা যখন মৃত্যুশয্যায়, অথচ অমূল্যর বিয়ে হয় নি, বাসনা রূপিণীকে নিয়ে ব্যস্ত, সেই দুর্দিনে গোকুলবাবুকে হাঁটতে হাঁটতে এখানে চলে আসতে হত। তা-ও কি তিনি সেদিন দোকানের কাপে কবে চা খেয়েছেন। বাড়ি থেকে ছোট কাচের গেলাসখানা পকেটে ফেলে এখানে চলে আসতেন।

না, এতে লজ্জার কিছু ছিল না।

আজ পকেট থেকে একটা গেলাস বার করলে অন্য বন্ধেরা হাসাহাসি করবে ঠিকই। দিন বদলে গেছে মানুষ বদলে গেছে। মানুষের চিন্তাধারা অন্য রকম হয়ে গেছে।

তখন প্রহ্লাদ বেঁচে। দোকানে ঢুকতেই কত আদর যত্ন করে গোকুলবাবুকে বসাত।

দুনিয়ার কী হালচাল বলো গোকুলদা' প্রহ্লাদ হেসে প্রশ্ন করত। আবার একটা লড়াই-টড়াই বাঁধবে?'

'না রে পাগলা' গোকুলবাবু কাগজের অফিসের মানুষ। প্রহ্লাদের চিরকাল ধারণা ছিল দুনিয়ার সব খবর গোকুলের নখদর্পনে। 'এই তো এতবড় একটা যুদ্ধ হয়ে গেল। তার খেসারৎ দিতেই বাঘ্যু বাঘ্যু দেশগুলোর এখন কবছর ধরে হিমসিম খেতে হবে।'

একটু চিন্তান্বিত হয়ে প্রহ্লাদ পরে বলত, তবে আমাদের স্বাধীনতার কী খবর বলো, দেশের খবরটাই তোমার মুখ থেকে শোনা যাক।'

গোকুলবাবু খুশি হতেন। লড়াইয়ের খবর শুনে শুনে সেদিন যেন মানুষের একটা নেশা হয়ে গিয়েছিল। স্বাভাবিক রক্ত ঝরিয়ে ঝরিয়ে মানুষের যেমন কেবল রক্ত ঝরাবার নেশায় পেয়ে বসে, রক্ত খেয়ে খেয়ে যেমন আরো রক্ত খাবার বাসনা বুকে তীব্র হয়ে ওঠে, তেমনি, রক্ত ঝরছে রক্ত খাচ্ছে, খবর শুনে শুনে আবার কবে রক্ত খাওয়া হবে, আবার কবে খুনখারাপি চলবে শুনতেও মানুষ কম অধীর হয় নি।

তখনো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ। ভারত স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু অবাক কাণ্ড। স্বাধীনতার চেয়ে রাস্তায় ঘাটে মানুষকে যুদ্ধের কথাই বেশি ভাবতে দেখা গেছে। যেমন আবার একটা প্রলয়ংকরী যুদ্ধের তাপ পোহাবার নেশার জন্য মানুষগুলি উসখুস করত।

তাই গোকুলবাবু শুনতেন, হিটলারের জার্মানী শেষ হয়েছে, ইটালী কাবু হয়েছে, জাপান বুটেনের হয়েছে এবং দ্যাখো না, লড়াইয়ে জিতে গিয়ে এখন যুদ্ধের ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে রাশিয়া আমেরিকা ইংরেজের মধ্যে কেমন খাওয়া খাওয়ি সুরু হয়। আবার একটা লড়াই লেগে গেল বলে, এই জানুয়ারীতেও রাশিয়া ব্রিটিশ-আমেরিকার বিরুদ্ধে

ওরার ডিক্লেয়ার করবে। ট্রামে বাসে হাটে-বাজারে এমন কি অফিসে বসেও গোকুলবাবু এসব শুনতেন।

কাজেই সেদিন হঠাৎ সুরে পাল্টে প্রহ্লাদ স্বাধীনতার কথা তুলতে গোকুল খুশি হল। তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করে বলল, 'সবে তো দেশ স্বাধীন হল, দেখবি ঠাঁ ঠাঁ করে এখন দেশের মানুষের অবস্থা ফিরে যাবে। সবাই আবার পেট ভরে ভাত খাবে, কেউ বেকার থাকবে না, কোনোরকম আন্দোলন থাকবে না, সকলেই এখন শান্তিতে জীবন কাটাবে।'

শুনে আহ্লাদে প্রহ্লাদের চোখ দুটো বড় হয়ে গিয়েছিল।

গোকুলবাবু সেখানেই থামেন নি।

'দেখবি দেশে এখন টাকার ছড়াছড়ি সোনার ছড়াছড়ি কত। ইংরেজ আমাদের সব টাকা সব সোনা জাহাজ বোঝাই করে বিলেতে নিয়ে যেত। এখন সেই জিনিস বন্ধ হয়ে গেল। এখন আর এই দেশে ভিক্ষুক থাকবে না, কাউকে খোলার ঘরে বাস করতে হবে না। সকলেই পাকা বাড়িতে থাকবে, সকলেই গাড়ি চড়ে বেড়াবে, সকলের ঘরের বৌ-ঝিকে গা ভরা সোনার গয়না পরতে পারবে। সকলের ছেলেমেয়েরা স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া শিখতে পারবে। সব ছেলেমেয়েই পাঠ্য বই কিনতে পারবে, স্কুলের মাইনে দিতে পারবে।'

দেশ স্বাধীন হয়েছে। দেশের চেহারা রাতারাতি বদলে যাবে। নতুন যুগ আরম্ভ হল। গোকুলের মুখে কথাগুলি শুনতে শুনতে প্রহ্লাদের যেন বাহ্যজ্ঞান লোপ পাবার মতন অবস্থা হত।

কিন্তু বেশি সময় দোকানে বসে গল্প করার সময় হত না গোকুলবাবুর। ঘরে রুগিণী ফেলে এসেছেন। চা খেয়েই তাঁকে বিদায় নিতে হত।

প্রহ্লাদ মাথার দিব্যি দিয়ে বলত, ওবেলা আসবেন, আবার স্বাধীনতার কথা শুনব।

ওবেলা হয়তো যাওয়া হত না গোকুলবাবুর পরদিনও না। আবার হয়তো অমূল্যর মার একদিন অসুখের বাড়াবাড়ি দেখা দিল। ঘরে চা খাওয়ার অসুবিধা দেখে আবার একদিন কাচের গেলাসটা পকেটে ঢুকিয়ে গুটি গুটি গিয়ে তিনি অমৃত কেবিনে হাজির হলেন। প্রহ্লাদ যেন হাতে স্বর্গ পেত।

'এসো এসো গোকুলদা। কতদিন তোমার পথ চেয়ে বসে আছি। ভারত স্বাধীন হল। এখন দেশের চেহারাটা কেমন হবে ভাল করে আমাকে বুঝিয়ে দাও দিকিনি।'

গোকুলবাবু স্বাধীনতার সোনার ফসল কত দিক দিয়ে কত ভাবে দেশে ফলতে পারে তার রঙিন ছবিটা আবার প্রহ্লাদের চোখের সামনে তুলে ধরতেন।

শুনে প্রহ্লাদ আত্মহারা হয়ে যেত, প্রহ্লাদের দু-চারজন বন্ধুও দোকানে উপস্থিত থাকত। তারাও কান পেতে গোকুলের কথা শুনত।

ভাগ্যিস প্রহ্লাদ আর বেঁচে নেই।

কথাটা সময় সময় চিন্তা করেন গোকুলবাবু।

আজ বহুদিন পর চলতে চলতে সেই টিনে ছাওয়া খুপ্পড়ে জীর্ণ চেহারার দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে আবার প্রহ্লাদের মুখটা তাঁর মনে পড়ল।

ভাগ্যিস প্রহ্লাদ মরে গেছে,

তা না হলে গোকুলবাবুকে দেখা মাত্র 'চোর', 'ধাপ্পাবাজ', 'ফোর টুয়েন্টি' 'মিথ্যাবাদী' ইত্যাদি পাঁচরকম গালিগালাজ মুখে এনে লোকটা চিৎকার করে উঠত। দেশে কেউ বেকার থাকবে না, সব মানুষ পেট ভরে ভাত খেতে পারবে, ঘরে ঘরে বৌ-ঝিরা গা ভরে সোনার গয়না পরবে, সকলের মস্ত পাকা বাড়ি, কোনো আন্দোলন নেই, বিক্ষোভ নেই, হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত কেবল শান্তি আর শান্তি।

বস্তুত এতগুলি মিথ্যা কথা যে মানুষ শোনাতে পারে তাকে আজ বাগে পেয়ে প্রহ্লাদ যে কী করত চিন্তা করে গোকুলবাবু শিউরে উঠলেন।

দোকানের ভিতরটা প্রায় ফাঁকাই ছিল বলা চলে। এপাশে কোণার দিকে তিনটি অল্প বয়সের ছেলে বসে গল্প করছিল। আর এক কোনায় একটি মানুষ, কালো বেঁটে মতন দেখতে, চওড়া গোঁফ, মন দিয়ে খবর-কাগজখানা পড়ছিল। দেখা গেল একটা মাত্র সীট তার হাতে, বাকি তিনটা পাতাই টেবিলের ওপর পড়ে আছে। টেবিলে চেয়ার ও ঘরের মেঝের যেমন মাছি বিজবিজ করছিল তেমনি পত্রিকার খোলা পাতাগুলির ওপরও অগুনতি মাছি বসে আছে গোকুলবাবুর চোখে পড়ল।

তিনি আর লোভ সংবরণ করতে পারলেন না। ভিতরে ঢুকে সোজা সেই কোনার দিকের টেবিলটার কাছে চলে গেলেন। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে নিঃশব্দে টেবিল থেকে কাগজের খোলা পৃষ্ঠাগুলি তুলে নিলেন।

গোঁফওয়ালা মানুষটি এক নজর গোকুলবাবুকে দেখে আবার কাগজ পড়ায় মন দিল।

'চা খাবেন?' দোকানের কর্মচারীটি এসে গোকুলের সামনে দাঁড়াল। প্রহ্লাদের ছেলেকে গোকুলবাবু দেখতে পাচ্ছিলেন না। 'হুঁ, খাব।' চায়ের দোকানে ঢুকে চা না খেয়ে কেবল কাগজখানা পড়ে চলে যাবেন—খুবই দৃষ্টিকটু দেখায়। কাজেই তিনি ঘাড় কাত করলেন।

'ভাঁড় আছে?'

'আছে।'

'তবে ভাঁড়ে করে চা দাও।'

এই অবেলায় চা খাওয়ার অভ্যাস নেই, তা হলেও কাগজ পড়তে হলে গোকুলবাবুকে নিয়মভঙ্গ করতে হল। উপায় কি।

ভাঁড়ে করে চা এল। একটি মাত্র চুমুক দিয়ে গোকুলবাবু কাগজের মধ্যে ডুবে গেলেন।

গোকুলবাবু কিন্তু দেখলেন না, ও-পাশের তিনটি ছেলে গভীর মনোযোগ দিয়ে তাঁকে লক্ষ্য করছিল। তারা বুঝতে পারছিল, কাগজখানা পড়তেই আজ দোকানে ঢুকেছে এই বুড়ো। কোনোদিন তো এখানে আসে না।

ফিসফিস করে তিনজন কি যেন বলাবলি করল। ঠেট টিপে টিপে হাসছিলও তারা। পরনে চোঙা প্যান্ট, গায়ে বুক খোলা হাওয়াই সার্ট, তিনজনের মাথার চুলই খাড়া খাড়া। দেখলেই বোঝা যায় চুলে কোনোদিন তারা তেল দেয় না। কেবল সাবান ঘষে মাথায় জল ঢালে।

একজন পকেট থেকে একটা দুমড়ন সিগারেটের প্যাকেট বের করল। দেখা গেল একটি মাত্র সিগারেট রয়েছে। সিগারেটটা দুভাগ করে দুজনে নিল। আর একটি ছেলে পকেট থেকে বিড়ি বের করে ধরাল। সিগারেটের ভাগ পেল না বলে তার মুখ কালো হল না। বরং বিড়ি মুখে গুঁজেই খুশি।

ধূমপান করতে করতে তারা গোকুলবাবুকে দেখছিল আর নিঃশব্দে হাসছিল।

তারপর তাদের মধ্যে একজন গলার

দাদু ইন্দিরা-কোসিগিন ছাক্কাৎকার পড়ছে.....

একটা অদ্ভুত শব্দ করে হাসল কি কাঁদল বোঝাই গেল না।

কিন্তু গোকুলবাবুর সেসব দিকে মোটেই দৃষ্টি ছিল না। কাজেই এভাবে শব্দ করে সুবিধা হল না বলে তিনটি ছেলে এবারের টেবিলটার কাছে সরে এসে একটা লম্বা বেঞ্চিতে আবার পা ঝুলিয়ে পাশাপাশি হয়ে বসল।

'দাদু, আজকের কাগজে কী লিখেছে?' একজন তখনি প্রশ্ন করল।

গোকুলবাবু একবার মাত্র চোখ তুলে ছেলেটির মুখ দেখলেন। তারপর আবার কাগজ পড়ায় মন দিলেন।

'এই, দাদুকে ডিস্টার্ব করছিস কেন রে।' আর একটি ছেলে গোকুলবাবুকে শুনিয়ে শুনিয়ে সঙ্গীকে ধমক লাগাল। 'দেখছিস না, দাদুর কথা বলার সময় নেই।'

'কিন্তু দাদুর ভাঁড়ের চা যে জল হয়ে গেল।'

'হোক, গরম খবর পড়ছে—চা জল হলেও দাদুর আক্সেস নেই। কি বলেন দাদু?'

গোকুলবাবুর পাকা ভুরু দুটো কুঁচকে রইল। যেন তিনি ছারপোকার কামড় খাচ্ছেন অথচ জায়গা ছেড়ে নড়তে পারছেন না। এমন একটা অস্বস্তি নিয়ে কাগজের দিকে চোখ দুটো ধরে রাখলেন।

'দাদু, অত মন দিয়ে কী পড়ছে একবার ন্যাখ না।' যে ছেলেটি বিড়ি টানছিল সে তার পাশের ছেলেটিকে উস্কে দিল। সেই ছেলেটি তৎক্ষণাৎ বেঞ্চি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গোকুলবাবুর কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন থেকে মুখটা বাড়িয়ে দিল।

'অহো, দাদু ইন্দিরা-কোসিগিন ছাক্কাৎকার পড়ছে!'

'কেমন, ভাই নাকি দাদু?' আর একটি ছেলে বেঞ্চি ছেড়ে উঠে এল।

'তোমরা এমন গোলমাল করছ কেন!' রুষ্ট হয়ে গোকুলবাবু তাদের দিকে চোখ ঘোরালেন।

'না, অত মন দিয়ে খবরকাগজ পড়াটা আপনার ঠিক না।' ছেলেটি ভেংচি কাটার মতন চেহারা করল।

'তাই তো, তাই তো; আর একটি ছেলে, যে তখনও বেঞ্চিতে বসেছিল, চট করে এদিকে সরে এল। 'ইন্দিরাদির খবর পড়ে আর কোসিগিনদাদার বার্তা পড়ে আমাদের ভাতের সমস্যা মিটবে না।'

গোকুলবাবুর চোখ দুটো গোল হয়ে গেল।

'ঠিকই বলেছে ও দাদু'—টাকার জন্য কাল তার বাবা রেশন তুলতে পারে নি।'

গোকুলবাবুর চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে গেল। কাগজখানা হাতে ধরা—অথচ সেদিকে চোখ থামাতে পারছেন না।

'জানেন দাদু।' এতক্ষণ একটু দূরত্ব রেখে ওরা দাঁড়িয়েছিল। এবার তিনজন তাঁর কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়ল। 'আমরা কাগজ পড়ি না, কাগজ পড়ে আমাদের ঘা শুকোবে না।'

'উঁহু, শুকোবে না', পাশের ছেলেটি তৎক্ষণাৎ গলা চড়িয়ে দিল। 'জানেন দাদু, আমার ছোটভাই ক্লাস ফাইভে পড়ে, পাঁচশখানা তার পাঠ্যবই, সেপ্টেম্বর এসে গেল, দশখানা বই মোটে আমি কিনে দিতে পেরেছি। আর পারছি না।'

'হুঁ, শুনিয়ে দে, দাদুকে সব শুনিয়ে দে।' তৃতীয় ছেলেটি কেমন একটা নাচের ভঙ্গি করল। 'একবার কোসিগিন পড়া হয়ে গেলেই দাদু এখন আমাদের [illegible] মন দিয়ে পড়বে। এদিকে বন্ধ কারখানা লক্ আউট হয়ে আমরা এতদিন বন্ধু মাসের পর মাস ভেরেণ্ডা ভাজছি।'

'কাজেই বুঝতে পারছেন দাদু', প্রথম ছেলেটি গোকুলবাবুর হাত থেকে ছোঁ মেরে কাগজখানা তুলে নিল। 'কেউ অত মন দিয়ে কাগজ পড়ছে দেখলে আমাদের মাথা গরম হয়ে যায়।'

'হুঁ, নেতাদের বুলি পড়ে আর ছবি দেখে আমরা রোজ সময় নষ্ট করি—এদিকে আমাদের ঘা যেমন ছিল তেমন থেকে যাচ্ছে। বরং যত কাগজ পড়ছি ঘা তত বোশ দগদগ করছে।'

'তাই তো, ছ'মাসের ওপর আমরা বেকার।'

'ছোটভাইটার স্কুলের পাঠ্যবইগুলো কিনে দিতে পারলাম না! পঁচিশটা বই—ইয়ার্কি!'

'আমাদের কাল রেশন তোলাই হল না।'

'প্রেক টাকার অভাব—প্রেফ ভাতের অভাবে আমরা মরে যাচ্ছি।'

'আর আনন্দ করে দাদু কিনা কোসিগিন-ইন্দিরাজী পড়ছে, শরীকি ঝগড়া নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, লাও-দং লে-জুয়ান সমাচার খুঁটিয়ে দেখছে।

গোকুলবাবুর কপালে ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম জমছিল।

'কিন্তু তোমরা ভাই ভুল করছ।' এতক্ষণ পর কোণের সেই বেঁটে কালো গোঁফওয়ালা লোকটি মুখের ওপর থেকে কাগজটা সরিয়ে ছেলে তিনটের মুখের দিকে তাকাল। 'আমাদের সমস্যা নেতারা মেটাতে পারবে না, আমাদের সমস্যা চীন রাশিয়া মেটাতে পারবে না, আমাদের নিজেদেরই সমস্যা মেটাবার ভার নিতে হবে।'

'কেমন করে?' তিনটি ছেলে হাঁ করে মানুষটিকে দেখছিল।

'কেমন করে? এই এমন করে—' হাতের মুঠটা শক্ত করে পাকিয়ে নিয়ে গোঁফওয়ালা দুম্‌দুম্‌ করে টেবিলে ঘুষি বসাতে লাগল। তার চায়ের কাপটা ডিসের ওপর ঝনঝন শব্দ করে নেচে উঠল।

সাত সুখ শান্তি, আসুক সমৃদ্ধি ...

পূজো এলো! সবার মনে আনন্দের জোয়ার; সুখ-সমৃদ্ধির পরশ! আমাদের পৃষ্ঠপোষকের মনেও শান্তি, তাদের ধনসম্পত্তি সব নিরাপদে আছে। আমাদের ও দায়িত্ব কত, পৃষ্ঠপোষকদের দেখাশোনা করা, সব রকম ভাবেই। আজ, এই শুভদিনে, তাদের, আপনাদের সবার জন্যেই আমাদের শুভকামনা। পূজোর দিনগুলোয় সবার প্রাণ ভরে উঠুক সমৃদ্ধির জোয়ারে।

চিরসমৃদ্ধির সোপান

ব্যাঙ্ক অব বরোদা

হেড অফিস : মাণ্ডভী, বরোদা

ভারতে ও বিদেশে ৪০০ র বেশী শাখা রয়েছে

Shilpi BOB:30/69Ben

গোকুলবাবুর মাটির ভাঁড়টা, ততক্ষণে অবশ্য চুমুকটুকু খাওয়া হয়ে গেছে, একদিকে কাত হয়ে পড়ল। আর এতক্ষণ কালো হয়ে টেবিলের ওপর বিজবিজ করছিল মাছির ঝাঁক, ঘুষির তোড়ে পাতলা তক্তাটা কেঁপে উঠতে গোকুলবাবুর কানের কাছে চোখের কাছে মাছিগুলি বন্‌বন্‌ শব্দ করে উড়তে আরম্ভ করল।

একটি ছেলেও কথা বলছিল না। গোকুলবাবু আগের চেয়েও বেশি হতভম্ব হয়ে যাওয়ার মতন চেহারা করে চুপ করে রইলেন।

'কে—বে, পয়সা নিয়ে যা।' চাঁচ ছোলা গলার গোঁফওয়ালা হেঁকে উঠতে দোকানের কর্মচারীটি ছুটতে ছুটতে সামনে এসে দাঁড়াল।

'কোন্‌ দোকান থেকে তোরা চা আনিস ? টেবিলে পয়সা রেখে লোকটি কটমট করে কর্মচারীর মুখটা দেখল।

'আজ্ঞে হিমালয় স্টোর্স থেকে আমাদের চা আসে।'

'হিমালয় স্টোর্সের চায়ে চামড়ার কুঁচি কাঠের গুঁড়ো মেশান থাকে।'

'আজ্ঞে সবাই তো আমাদের এই চা খেয়ে সন্তুষ্ট।'

'রন্দা মেরে তোর ঘাড়ের শলা ভেঙ্গে দেব শুয়োর, আমার সঙ্গে তর্ক করা। চামড়ার গন্ধে উটকি আসে—আমি আদ্ধেক চা ফেলে দিয়েছি, এই দ্যাখ্‌!' গোঁফওয়ালা কাপটা তুলে ধরল। সবাই দেখল কাপের তলার অনেকটা চা পড়ে আছে।

'খবরদার আর একদিন যদি হিমালয়ের চা আমায় খেতে দিচ্ছিস, লাথি মেরে তোর কাপ ডিস কেটলি ভেঙ্গে দেব বলে রাখলাম।'

গোঁফওয়ালা আর বসল না। কাপের দিকে আর তাকাল না। গট গট করে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

'চিনতে পারলি ?'

'রাধু গুণ্ডা।'

'এই সেই রাধু! এত যার নাম-ডাক ?'

'হুঁ, দেখছিস না কেমন গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা—কেমন তেজ রাখে ভেতরে।'

তিনটি ছেলে কথা বলছিল। গোকুলবাবু শুনছিলেন। কিন্তু খুব মন ছিল না এসব কথায়। সতৃষ্ণ চোখে টেবিলের ওপর এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে থাকা কাগজের সীটগুলি দেখছিলেন।

'রাধুকে দেখলেন দাদু ?' ছেলের দল আবার গোকুলবাবুকে নিয়ে পড়ল।

'হুঁ, গোকুলবাবু সংক্ষেপে উত্তর করলেন।

'রাধু গুণ্ডার নাম শোনেন নি ?'

'না।'

'আপনি দাদু কিসসু না', একটি ছেলে দাঁত ছড়িয়ে হাসল। 'কেবল দিল্লীর খবর রাখেন মস্কোর খবর রাখেন আন্দিস-আবাবার খবর রাখেন—বাংলাদেশের ছেলে রাধুর খবর রাখেন না।'

গোকুলবাবুর শুকনো চোয়াল দুটো আবার কঠিন হয়ে উঠল।

'রাধু কী বলে গেল শুনলেন তো ?' গোকুলবাবুর মুখের কাছে একজন মুখটা বাড়িয়ে দিল। নেতারা দেশের কিছু করবে না, মন্ত্রীরা কিছু করবে না, তারা কেবল বক্তৃতা দেবে আর বৈঠক করবে। ভাত-কাপড়ের সমস্যা আমাদের নিজেদের মেটাতে হবে।'

'কেমন করে মেটাতে হবে দাদুকে বুঝিয়ে বল্‌।' পিছন থেকে একটি ছেলে গলা উঁচিয়ে দিল।

'এই যে দাদু, এভাবে।' রাধুর মতন একজন ঘুষি পাকিয়ে দেখাল। 'এর অর্থ কি জানেন ?'

'কি করে জানবে, দাদু কি এসব নিয়ে মাথা ঘামায়, দাদু কেবল কাগজ পড়ে।' পিছনের ছেলেটি তৎক্ষণাৎ ফোড়ন কাটল।

'বুঝলেন দাদু।' সামনের ছেলেটি গোকুলবাবুর নাকের সামনে হাতের মুঠিটা নাচাতে লাগল। 'ঘুষি মানে কেবল ঘুষি না, এর অনেক অর্থ, যাকে বলে আপনা হতে জগন্নাথ, তার মানে বলং বলং বাহুবলম্‌, তার মানে বোমা স্টেনগান টমিগান রিভলবার,—রাধুর ইঙ্গিতটা বুঝলেন তো ? ঐ যদি জোগাড় করতে পার, আর ঐ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পার তো টাকার অভাবে কোনোদিন তোমার রেশন আটকাবে না, পাঠ্যবইয়ের অভাবে ভাইয়ের পড়া বন্ধ হবে না, বৌ খুশি থাকবে, পাড়ার লোকে খাতির করবে—কেন না তখন তুমি একটা শাঁসালো মানুষ—তোমার কোনো সমস্যাই নেই।'

ছেলেটির কথা শুনে তার সঙ্গের আর দুটো ছেলে হি-হি করে হাসতে লাগল। গোকুলবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাদের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

'বুঝলেন দাদু, কাগজ পড়া কমিয়ে দিন, কাগজ পড়ে কিচ্ছু হয় না, ছাগলের মতন সারাদিন কাগজের খবর চিবিয়ে চিবিয়ে মগজটা নষ্ট হয়ে যায়। তার চেয়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে কেমন করে লোকটা কাঠের আগুনে ভুট্টা পুড়িয়ে পুড়িয়ে খদ্দেরদের হাতে তুলে দিচ্ছে দেখুন গে, অনেক বেশি জ্ঞান সঞ্চয় হবে।'

'তবে কিনা আমরাও যে একেবারে কাগজ না পড়ি তা না', আর একটি ছেলে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করল, 'আমি স্রেফ আইন-আদালত পড়ি, নারীধর্ষন আর নারী-হরণ।'

'আমি খেলার খবরটা একটু দেখি, রঙ লেভার আবার কেমন গ্র্যান্ড স্লাম পেয়ে গেল।'

'আমি শালা চাঁদের খবর ছাড়া আর কিছু পড়ি না।'

'বুঝলেন দাদু খবর পড়তে হয় এসব খবর পড়বেন, খেলা, আইন-আদালত চাঁদ, মঙ্গল—রাজনীতি পড়তে গেলেই আপনার প্রেসার বেড়ে যাবে। ডায়বেটিজে ধরবে।'

'থাক, দাদুকে আর জ্ঞান দিতে হবে না, এবার নিজেরটা নিজে বুঝুক—চল একবার লেকের ধারে ঘুরে আসা যাক।'

তিনজন হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে যাচ্ছিল, কর্মচারীটি ছুটে এল।

'বাবু পয়সা ?'

'কিসের পয়সা ?' তিনজন একসঙ্গে রুখে উঠল। অপ্রস্তুত হয়ে গেল দোকানের লোকটি।

'তিনকাপ চা তিনটে কেক।' নিচু গলায় বলল সে।

একসঙ্গে তিনজন ভেংচি কাটল।

'চা। চামড়ার গন্ধে উটকি আসে—উনি চায়ের দাম চাইছেন। রাধু কী বলে গেল শুনিস নি ? চ—' তিনজন চৌকাঠের দিকে এগোতে লাগল।

'না না, বাবুরা আমায় বিপদে ফেলবেন না—মানিব দোকানে নেই, মাগনা চা খাইয়েছি শুনলে ভয়ানক রাগারাগি করবে।'

'এই শুয়োর, চুপ করে থাক—বেশি বকলে লাথি মেরে তোর কাপ ডিস কেটলি উনুন চুরমার করে দেব—তখন ঠেলা বুঝবি।'

তিনজন শিস দিতে দিতে রাস্তায় নেমে গেল।

ভেড়ার মতন বোকা বোকা চোখ করে প্রহ্লাদের দোকানের কর্মচারীটি বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

গোকুলবাবু একটা লম্বা নিশ্বাস পরিত্যাগ করে কাগজের সীটগুলি গুছিয়ে হাতে তুলে নিলেন। কিন্তু তখন কোনো খবর পড়ার মন দিতে পারলেন না। চোখের সামনে এতক্ষণ যা দেখছিলেন শুনছিলেন, তাই ভাবতে লাগলেন। এরাই কি নতুন দিনের নতুন মানুষ? স্বাধীনতার কথা বার বার নিজেকে প্রশ্ন করলেন তিনি।

তখন অফিস ছুটির সময়। রাস্তায় মানুষ কিলবিল করছে। ট্রাম-বাসে বাদুড় ঝোলা হয়ে যাচ্ছে সব। তার ওপর আকাশটা মেঘলা। বাতাস বন্ধ। রিক্সা-ট্যাক্সি কিছু নাকের সামনে দিয়ে যেতে পারছে না। কোথা থেকে কারা ছুটে এসে খপ করে ধরে ফেলছে। সব দেখেশুনে কেমন যেন মাথা ঘোরে। তার ওপর একেবারে হাওয়া নেই।

রিক্সা-ট্যাক্সির আসা করে না অমূল্য। যেটাতেই চাপুক দু টাকা-আড়াই টাকা বেরিয়ে যাবে। এই বাজে খরচ অমূল্যর পোষাবে না।

কিন্তু ট্রাম-বাসের যা অবস্থা।

অফিস-পাড়ার একটা মোড়ের সামনে মেঘলা আকাশের মতন মুখটা কালো করে অমূল্য দাঁড়িয়ে থাকল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে

অপেক্ষা করল। কোনো আশা নেই দেখে অগত্যা সে হাঁটতে আরম্ভ করল।

তার চেহারা দেখে মনে হবে সে বুঝি শ্মশানের দিকে যাচ্ছে, অথবা শ্মশান থেকে ফিরছে।

মুখটা বিষণ্ণ। উৎসাহ উদ্যম কিছুই যে তার মধ্যে নেই এক-নজর দেখলেই বোঝা যায়।

ছটা বেজে গেছে। ক্ষুধা পেয়েছিল।

দু পা এগোতে একটা ফেরিওয়ালার সামনে পড়ল। তার বুকে কাচ-পরান টিনে গরম চিনাবাদাম দেখা যাচ্ছে। চোখ বুজে অমূল্য দশ নয়ার কিনে ফেলল। ঠোঙাটা পকেটে ঢুকিয়ে পকেটের মধ্যেই একটি দুটি করে খোসা ছাড়িয়ে চুপটাপ মুখে ফেলতে লাগল।

গাড়ির পোড়া তেলের গন্ধ। বাদাম ভাজার গন্ধ। ফার্নিচারের দোকানের সামনে দিয়ে সে চলছিল। ডিপিবিট-বার্নিশের গন্ধ। নানারকম গন্ধ নাকে নিয়ে সে বিষণ্ণ মুখে কিছু কিছু করে এগোতে লাগল।

অবশ্য এভাবে সে কতটা রাস্তা হাঁটবে তার কিছু ঠিক নেই। মাঝে মাঝে একটা স্টপে দাঁড়াবে। যদি ফুটবোর্ড পা রাখার মতনও কোনো গাড়িতে একটু জায়গা আছে চোখে পড়ে তখন সে একটু চেষ্টা করে দেখবে, লাফিয়ে উঠতে পারে কিনা। এভাবে অবশ্য ওঠা যায় না। কেন না এমন একটা স্টপে সে দাঁড়াল, বাসটা সেখানে হয়তো ধরলই না। সাঁ করে বেরিয়ে গেল।

আবার এমনও হয়েছে কোনোদিন, একটা স্টপ সে পিছনে ফেলে গেল, দাঁড়াল না, কেন না জায়গাটার চেহারা দেখে তার হয়তো মনে হল ট্রাম, বাস কিছুই সেখানে দাঁড়াবে না, বরং ঐ যে সামনে মোড় দেখা যাচ্ছে, দুটো রাস্তা ক্রস করেছে, ওখানকার বাস-স্টপে বাস, ট্রাম-স্টপে ট্রাম দাঁড়াবেই। একটা নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে সে হাঁটে।

আহা, কী কপাল!

মোড়ের কাছে পৌঁছোবার আগেই সে দেখল একটা ট্রাম ঠিক পিছনের স্টপে দাঁড়াল। দু জন দিব্যি উঠে যেতে পারল। তারপর গাড়িটা সোঁ সোঁ করে ছুটল। তারপর মোড়ের স্টপে গাড়িটা কিনা দাঁড়ালই না; স্টপে থাকলে হবে কী, রেড-সিগন্যাল নিয়ে গিয়ে সেখানে সবুজ বাতি জ্বলছে, তার মানে বেরিয়ে যাও, রাস্তা পরিষ্কার, ঘটাং ঘটাং শব্দ করে ট্রামটা বেরিয়ে গেল।

এরকম কদিনই হয়েছে। তখন সত্যি এত রাগ হয় ঐ শালা কণ্ডাক্টরদের ওপর।

কিন্তু রাগ করে সে করবে কী।

মুখটা বাংলা পাঁচের মতন করে মোড়ের স্টপে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে, যদি তখনি একটা বাস এসে যায়।

দু মিনিট চার মিনিট কিছুই না।

ঠায় পঁয়ত্রিশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকল সে। একটা বাস এল না।

কাজেই বিরক্ত হয়ে আবার হাঁটা।

পকেটের বাদাম ফুরিয়ে গেছে। এবার আঙুল চুষতে চুষতে তাকে অনির্দিষ্টকালের মত হেঁটে হেঁটে এগোতে হয়।

সেদিন অমূল্য তাই করছিল।

বৌবাজার, কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে বাস ট্রাম কিছুই ধরতে না পেরে হতাশ হয়ে সে হাঁটছিল, পিছন থেকে কেউ তার ঘাড়ের ওপর আস্তে চাপড় বসাল।

চমকে উঠে অমূল্য ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। বাসুদেব। তার বহুদিনের বন্ধু।

'কি ব্যাপার?' বাসু হাসছিল।

'তুই এখানে?' অমূল্য খুবই বিস্মিত হল।

'হ্যাঁ, ওদিকের ওই ফার্নিচারের দোকানে একটু কাজ ছিল। বেরিয়ে আর ট্যাক্সি ধরতে পারছি না, অগত্যা হন্টন। তারপর? অফিস থেকে বুঝি?'

অমূল্য মাথা ঝাঁকাল।

'ওঃ, অনেকদিন পর দেখা।'

'তাই তো।' বাসু অমূল্যর হাত ধরল। 'আমি পেছনটা দেখেই চিনতে পেরেছি।'

আমিও ভাবলাম, এমন কে পরিচিত মানুষ আছে এখানে যে আমার কাঁধে হাত রাখবে।'

(শেষাংশ ২২১ পৃষ্ঠায়)

বিরাট পরিবর্তন

ইউবিআই এর ঋণদানের মাপকাঠিতে
ছোট ছোট শিল্পোদ্যোগী, চাষী, খুচরা দোকানদার, পরিবহন পরিচালক বা অন্যান্য ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে তাঁদের যে গুণটি প্রধান বলে গণ্য হয় তা হল ঋণ পরিশোধ ক্ষমতা, যার অর্থই হল

- কারিগরি বিদ্যা
- পরিচালন পারদর্শিতা
- উৎপন্ন দ্রব্যের বা সেবার বিপণন-ব্যবস্থা
- ব্যক্তিগত সততা

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া
হেড অফিস: ৪, নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত সরণি
(পূর্বতন ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট)
কলিকাতা-১

পশ্চিমবঙ্গে ১১৫টিরও অধিক শাখা আছে

[৬৪ পৃষ্ঠার পর]

কিন্তু বরেন মিত্তির উৎসুক।—কি শিখেছিলে? যন্ত্র করে অন্য কি শিখেছিলে?

—সে আপনার কোনো কাজে লাগবে না। স-মর্যাদায় একটা অনুভূতির ধকল সামলাবার জন্যেই যেন দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

কারখানার হেনা ঘোষ রোজ হেঁটে ঘরে ফেরে। সেদিন বাসের প্রতীক্ষায় বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে আছে। পর পর দুটো বাস চলে গেল, ওর ওঠার তাড়া নেই। একটু বাদেই দূরে মালিকের চেনা-গাড়িটা চোখে পড়ল। নিজেই ড্রাইভ করে।

...আরো ঠান্ডা গম্ভীর মুখে বাসের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে হেনা ঘোষ।

গাড়িটা পাশ কাটিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে। হেনা ঘোষ আস্তে আস্তে চোখ ফেরালো সেদিকে। বরেন মিত্তির মুখ বার করে ইশারায় ডাকছে ওকে। নিথর পদক্ষেপে এগিয়ে গেল।

—তোমার বাড়ি এদিকে নাকি?

দুই-এক পলক নীরব থেকে হেনা ঘোষ জবাব দিল, বাড়ি নয়, বস্তি।

বরেন মিত্তির পাশের দরজা খুলে দিল।—উঠে এসো, পৌঁছে দিচ্ছি।

হেনা ঘোষের ঠান্ডা দু'চোখ, তার মুখের ওপর স্থির কয়েক মুহূর্ত। তারপর নির্দেশ মতো উঠে পাশে বসল। গাড়িতে স্টার্ট পড়তে নিরুত্তাপ সুরে বলল, আপনার এই গাড়ি আমার বস্তি-ঘরের সামনে দাঁড়ালে সেখানকার লোক অবাক হবে।

নিজের প্রতিটি কথার ওজন নিজেই অনুভব করছে হেনা ঘোষ। বরেন মিত্তিরেরই বিব্রত মুখ।—আচ্ছা, আচ্ছা, খানিকটা আগেই নামিয়ে দেব।...ইয়ে, তুমি যন্ত্র করে আর কি শিখেছিলে বললে না তো?

—বলেছি তো...সে আপনার কোনো কাজে লাগবে না।

—না লাগুক, তবু শুনি না?

হেনা ঘোষ আস্তে আস্তে মুখ ফেরালো তার দিকে। চেয়ে রইল একটু।—ঢাকার সংস্কৃতির কোনো বড় আসর আমার নাচ-গান ছাড়া জমত না।...সেখানকার রেডিওতে মাসে এক-দিন অন্তত গানের প্রোগ্রাম থাকতই।

গাড়ি চালাচ্ছে ভুলে বরেন মিত্তির হাঁ করে চেয়েছিল ওর দিকে।

তারপর...

তারপর একদিন পাখি নামে একটা মেয়ে দুপুরে কাজে বেরিয়ে আর ফেরে নি। সে মুছে গেছে। ভোলা সরকারের জন্য তার দুঃখ হয়েছে একটু, কিন্তু হেনা আলো থেকে-পাখি নামে মেয়েটা কারণে-অকারণে খিটির-মিটির বাঁধিয়েছে ভোলা সরকারের সঙ্গে, কটূক্তি করেছে, গালাগাল পর্যন্ত করেছে। ভোলা সরকার অবাক হয়ে ক'দিন জিজ্ঞাসা করেছে, তুমি হঠাৎ এ-রকম হয়ে যাচ্ছ কেন?

সত্যি জবাব দিলে বলতে হত, পাখিকে মুছে ফেলে ও রবারকার মত হেনা ঘোষ...সম্ভব হলে হেনা মিত্তির হতে চলেছে বলে। আর বলতে হত, পাখি মুছে গেলে ও যেন বোকার মতো আর পাগলের মতো তাকে খুঁজে না বেড়ায়—যেন বুঝতে পারে।

...তারপর পাখিকে মুছে ফেলে হেনা ঘোষ হয়ে যেটুকু দিতে হয়েছিল তার বিনিময়ে তিন বছর বড় ওস্তাদ রেখে নাচ-গান শেখার নিশ্চিন্ত সুযোগ মিলে-ছিল। ওকে মস্ত শিল্পী করে তোলার নেশা ধরেছিল বরেন মিত্তিরের।

...আর তারপরেও হেনা ঘোষ সেই নেশা কাটতে দেয় নি। শিল্পী হিসেবে মোটামুটি নাম করার পর দর্শের ভিড়ে তার মোহ বরং আরো বাড়তে পেরেছিল।

শেষে হেনা ঘোষ সগৌরবে হেনা মিত্তির হয়েছে।

রাত্রি তখন সাড়ে বারোটা। হাস-পাতাল নিঝুম। গত দু'দিনের মতই ছেলের শয্যা-পাশে বসেছিল হেনা মিত্তির। তারপর বারান্দার দিকে চোখ পড়তে গত দু'রাতের মতই চমকে উঠে-ছিল।

খানিক নিষ্পলক চেয়ে থেকে লোকটা যেন ইশারায় ডেকেছিল তাকে। হেনা মিত্তির মোহগ্রস্তের মতই উঠে গেছল।

ঘোবালো চোখে ভোলা সরকার তার দিকে চেয়ে থেকে বিড়বিড় করে বলে-ছিল, ছেলেটা যেতে বসেছে.. প্রায়শ্চিত্ত করেছ?

হেনা মিত্তির নিস্পন্দ, কাঠ।

উদগ্র রোষে ভোলা সরকার হঠাৎ তার দুই কাঁধ ধরে প্রবল ঝাঁকুনি দিতে দিতে নির্মম চাপা রূঢ় কণ্ঠে বলে উঠল, ওই ফুলের মত ফুটফুটে ছেলেটা মরতে বসেছে, তাকে ধরে রাখার জন্য কি প্রায়শ্চিত্ত করেছ? কি প্রায়শ্চিত্ত করেছ?

বাইরে অস্ফুট একটা আর্তনাদ শুনে রাতের নার্স ছুটে বেরিয়ে এসেছে। ভোলা সরকার তখনো মহিলার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলছে, কি প্রায়শ্চিত্ত করেছ? কি? কি?

পরদিন। শনিবারের বিকেল।

স্ত্রীকে নিশ্চিন্ত করবার জন্য তাকে সঙ্গে করে আর এস, ডক্টর চ্যাটার্জীর ঘরে এসে বসেছিল বরেন মিত্তির। ভোলা সরকার ক্লান্ত দেহে গত রাতে ওরকম ব্যবহার করেছিল, ডক্টর চ্যাটার্জীকে তা সকালেই জানানো হয়েছে। লোকটা পাকিস্তানে তার স্ত্রীর বাপের বাড়িতে কাজ করত, সেখানকার দুর্যোগের সময় হেনা ওর সঙ্গে কোলকাতায় পালিয়ে আসে, কিন্তু ওর তখন এত সাহস যে ও তাকে বিয়েই করতে চায়, এত কাল বাদে সুযোগ পেয়ে সেই আক্রোশই ফলিয়েছে, ইত্যাদি।

শয়তান লোকটার কি শাস্তি হল হেনা মিত্তির নিজের কানেই শুনল। তারপরেও নির্বাক, নিষ্প্রভ মূর্তি। পাজী লোকটা এর আগেও কতবার কত কান্ড করেছে ডক্টর চ্যাটার্জী তাদের সে-কথা শোনাচ্ছিল। কিন্তু হেনা মিত্তির কিছুই শুনছিল না।

আবারও চমক। ঘরের অপর দু'জনও সচকিত একটু। ডক্টর চ্যাটার্জী গম্ভীর তারপর।

ভোলা সরকার শ্রান্ত পায়ে ঘরে ঢুকল। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। শুকনো কুৎসিত মূর্তি। বরেন মিত্তিরের পাশে হেনা মিত্তিরকে দেখল একবার। তারপর ডক্টর চ্যাটার্জীর দিকে তাকাল।

ফাইল থেকে ওর বরখাস্তের নোটীশটা বার করে ডক্টর চ্যাটার্জী তার দিকে বাড়িয়ে দিল। রূঢ় গাম্ভীর্যে বলল, নাও। আর তোমার চাকরি নেই —আজই হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাবে।

ভোলা সরকার ক্লান্ত দু'চোখ মেলে চেয়ে রইল একটু। তারপর কাগজটা নিল। তার অন্য হাতে কি একটা বস্তু। আস্তে আস্তে হেনা মিত্তিরের দিকে ফিরল। অন্য হাতের ওই জিনিসটা তার সামনে ধরে শান্ত মুখে বলল, মায়ের প্রসাদ, আজ ভালো দিন, দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পুজো দিয়ে এসেছি, ছোঁয়া-ছানিতে নষ্ট না হয় সে-জন্যে হেঁটে গেছি হেঁটে এসেছি।...প্রসাদ একটু মুখে দিয়ে দিও আর ফুল ক'টা ছেলের বালিশের নিচে রেখো।

শুধু হেনা মিত্তির নয়, অন্য দু'জনও নির্বাক হঠাৎ।

হাতের ঠোঙাটা হেনা মিত্তিরের দিকে আরো একটু এগিয়ে দিয়ে অকৃত্রিম কোমল সান্ত্বনার সুরে ভোলা সরকার আবার বলল, ভয় কি, ছেলে নিশ্চয় ভালো হয়ে যাবে।

বরখাস্তের নোটীশ হাতে ক্লান্ত শরীরটা টেনে টেনে লোকটা চোখের আড়াল হয়ে যাচ্ছে। ঘরের তিনটি প্রাণী তেমনি নির্বাক, তেমনি বিমূঢ়। বিশেষ করে হেনা মিত্তিরের ফর্সা মুখখানা বিবর্ণ একেবারে।

.. কেউ বুঝি একটা যন্ত্র বসিয়ে তার দেহের সমস্ত রক্ত নিঃশেষে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

স্বর্ণ শিমূলের চরে

[১০৮ পৃষ্ঠার পর]

মারমুখী হয়ে বললে, 'আরে স্লা মিথ্যে কথা?'

ঘটনাটা কোন দিকে যেত বলা যায় না। গোপালপুরের ডাকসাইটে গোপাল এদিক দিয়ে আসছিল—জটলা দেখে সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। সে দাঁড়াতেই সবাই যেন কেমন চুপচাপ হয়ে গেল। গোপালের আবির্ভাব নয় তো, যেন সে উদ্যত সাপের মুখে প্রত্যক্ষ বিষমন্ত্র। রোগা লিকলিকে চেহারা তার, বয়স বত্রিশ কি তেত্রিশ হবে; মাথায় একমাথা ঝাঁকড়া চুল, গায়ে একটা গেঞ্জী, কোমর বেঁধে কাপড় পরা, পায়ে একটা পাঁচসিকে দামের রবু-রঙের হাওয়াই চটি। চোখ-গুলো যেন তার সব সময়ে জ্বলে। তাকে দেখলেই মনে হয় বুকের ভেতর যেন তার লুকিয়ে আছে যুগ-যুগান্তরের আগুন। রাজবংশীয় ঘরের ছেলে সে—পৃথিবীতে তার সবি ছিল, সবি গেছে। সবাইকে চুপ করে যেতে দেখে সে নীলকণ্ঠকে উদ্দেশ করে বললে, 'কি হয়েছে রে নীলু?'

নীলকণ্ঠ বললে, 'বাঁটুল-সাঁটুল বাবুরা আমাকে মারতে এসেছে!'

'ক্যানো?'

নীলকণ্ঠ কিছু কিছু বললে, বাঁটুল-সাঁটুলরাও বলতে ছাড়ল না। এমন কি বিন্দুপিসীও মুখ খুলতে পেছুলেন না। কিন্তু নন্দরাণী তাঁকে ততক্ষণে অনেক-খানি ঠাণ্ডা করে এনেছিল—সেজন্যে তার আজির ওপর বাঁটুল-সাঁটুলদের মামলা তেমন জমল না। গোপাল সব শুনে নীলকণ্ঠকে বললে, 'যা বাড়ি যা!' তার-পর নন্দরাণীর দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমি কি করতে এসেছিলে বোদি?'

'ঐ যে আমার শম্ভুর ঠাকুরপো', ইসারায় নীলকণ্ঠকে দেখিয়ে দিয়ে নন্দ-রাণী বললে।

গোপাল একটু হাসল। তারপর কেমন যেন কঠিন হয়ে বিপদভঞ্জন নন্দন-দের দিকে তাকিয়ে বললে, 'দ্যাখ বাঁটুল—কারণে-অকারণে যখন-তখন তোরা গোল-মাল পাকাস! আমি সেই ভোটের আগে থাকতে লক্ষ্য করে আসছি। কিন্তু তোদের আমি বলে দিচ্ছি—আর গ্রামে সে-দিন নেই যে চোখ রাঙালে লোকে মেনে নেবে!'

বাঁটুল ভেংচি কেটে বললে, 'কেন তোদের ফ্রন্ট গরমেণ্ট হয়েছে বলে—'

'হ্যাঁ ঠিক তাই।'

'আচ্ছা দেখা যাবে খন কত ধানে কত চাল...'

ছেলের জন্য ভয়ের অন্ত নেই নন্দ-রাণীর। পাছে কোন গোলমাল হয় সেই ভয়েই সে ছুটে এসেছিল পথে। এতক্ষণ যেভাবে চাটুয্যেমশায়ের ছেলেরা তাকে ঘিরে ধরেছিল, গোপাল ঠাকুরপো না এলে যে কি হত কে জানে! কিন্তু সে যাই হোক, চাটুয্যেমশায়ের এই ছেলে-গুলোর কথা শুনে সে আপাতত মনে মনে বেশ একটু রেগে উঠল এবং তাদের জব্দ করার উদ্দেশ্যে বলেও ফেললে, 'সে কি গো বাঁটুলবাবু, তোমরা অমন বামভোন-সজ্জন ঘরের ছেলে। কালই তো ঠাকুর-মশাই চরণধুলো দেছিলেন আমাদের বাড়িতে—তিনি এসে নীলুর ছেলেকে ওদের কারখানায় তোমাদের চাকরীর জন্যে বলছিলেন...'

বাঁটুল বিস্মিত হয়ে বললে, 'কে—আমার বাবা?'

'হ্যাঁ গো!'

জোঁকের মুখে নুন পড়লে যেমন অবস্থা হয় বাঁটুলের অবস্থা প্রায় তেমনি হয়ে উঠল। একপ্রকার মানসিক যন্ত্রণার আবেগে সে তার পঞ্চভ্রাতার দিকে তাকিয়ে বললে, 'কি বলব মাইরি...!'

সাঁটুল বললে, 'মানে কথা বাবার জন্যে আর...'

ফটকে বললে, 'মান সম্মান আর কিছু রইল না!'

গুটকে বললে, 'এর বিহিত করতে হবে'

ঝণ্টে বললে, 'এরপর হয় বাবা বাড়ি থাকবে—

ঘণ্টে কথার পিঠে কথা বলে উঠল : 'নয় আমরা থাকব—!!

পিছন থেকে তাদের মা অর্থাৎ বিপদ-ভঞ্জন-পত্নী আসছিলেন চরের ঘাট থেকে স্নানান্তে। ছেলেদের ঘোষণা স্বকর্ণে শ্রবণপূর্বক তিনি বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ বাবা আজ লাগিয়ে দাও বাড়িতে—বাপ-বেটার শম্ভু-নিশম্ভুর পালা।'

সকলেই সেদিকে তাকালো। তিক্ত-বিরক্ত জীবনের এমন অব্যর্থ প্রকাশ বোধ-হয় এমন করে প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা খুব কম লোকেরই হয়। সকলে মুখ-চাওয়া চায়ি করতে লাগল। কিন্তু বাঁটুল বলে উঠল, 'দ্যাখো মা পথে-ঘাটে আমাদের এমন করে অপমান কোরো না—আমরা ভদ্র-লোকের ছেলে!'

'হ্যাঁ সে তো দেখতেই পাচ্ছি' বলে তিনি যেমন এসেছিলেন তেমনি ভাবেই সমুখ পথে চলে যেতে লাগলেন।

কিন্তু আশ্চর্য ঝগড়া যাকে নিয়ে তিনি সেই বিন্দুপিসী—তিনি নীরবে তখন অনুসরণ করছিলেন নন্দরাণীকে। নন্দরাণীর সঙ্গে তাঁর রফা হয়েছে, নন্দ-রাণী তাঁকে দু-ঘড়া জল ঢেলে গায়ের ধুলো-মাটি ধুইয়ে দেবে।

এরপর বাঁটুলদের আর সে জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। যাত্রার দলের মৃত সৈনিক যেমন আসর থেকে উঠে পদ-ব্রজে চলে যায়, তারাও ঠিক সেইভাবেই চলে গেল।

গোপাল শুধু নীলকণ্ঠকে জিগ্যেস করলে, 'হ্যারে নীলু তোদের নৌকোখানা চরের ঘাটে আছে'

'আছে।'

'আমি একবার নিয়ে যাচ্ছি—তুই যাবি?'

'আ—মি...'

তার ইতস্তত ভাব দেখে গোপাল বললে, 'আচ্ছা থাক এখন তোর গিয়ে কাজ নেই বরং রাতের দিকে—'

'আচ্ছা' বলার সঙ্গে সঙ্গে গোপাল চলে গেল। নীলকণ্ঠ বাড়ির দিকে ফিরল।

বাড়িতে তখন চন্দন এক ঝাঁক কাকের সঙ্গে লড়াই করছিল হুস হুস করে।

আশ্চর্য।

যে নন্দরাণী অভিমানভরে বলে উঠেছিল 'ফেলে দে ও মাছ আমি ছোঁব না'—সেই নন্দরাণীই পরম যত্নভরে নীল-কণ্ঠর ধরে আনা মাছগুলোকে ভাজতে বসল। কে-জানে এই হয়তো জননী চরিত্র। অন্তসলিলা ফল্গুধারার মত কোথায় যে মায়েদের বুকে স্নেহ মমতার স্রোত বহে যায় তা যেমন ধরাও যায় না, যেমন আন্দাজ করাও যায় না—তেমনি তার প্রকাশে মানুষ বিস্মিত না হয়েও পারে না। এই বিস্ময় নীলকণ্ঠের চোখে, এই বিস্ময় চন্দনেরও চোখে।

বিন্দুঠাকরুণকে মা যখন দু ঘড়া জল ঢেলে তাঁর গায়ের ধুলো-মাটি ধুইয়ে দিচ্ছিলো, যখন আরও মাছ দেয়ার আশ্বাস দিয়ে তাঁকে খুশি করে তুলছিল তখন চন্দনকে নিয়ে নীলকণ্ঠ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

ফিরল যখন তখন মাথার ওপর জ্যৈষ্ঠ দুপুরের নির্মম আকাশ। ঘর্মাক্তকলেবরে আগড় ঠেলে উঠোনে পা দিতেই 'হ্যাঁক'

অশোক গুহের
চার্লি চ্যাপলিন
মূল্য ৭·৫০
বিশ্বের শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিকের
চলচ্চিত্র-জীবনী ও তাঁহার
সংগ্রাম-বহুল সুনিপুণ জীবন-বেদ।
॥ অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য ছবি ॥
শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

'ঝ্যাক' করে মাছ ভাজার শব্দ কানে গেল তাদের। দুজনেই সচকিত হয়ে উঠল এবং আনন্দে মুখ চাওয়াচায়িও করতে লাগল। চন্দন বললে, 'দাদু মাছ ভাজছে মা।' অর্থাৎ এই মা-ই তো বলেছিল 'ফেলে দে ও মাছ, ও মাছ আমি ছোঁব না।' তাহলে মায়ের রাগ নিশ্চয়ই পড়ে গেছে। ছোট্ট চন্দনেরও এটুকু বুঝতে বাকি রইল না।

নীলকণ্ঠ বললে, 'ভাজা মাছ খাবি চন্দন?'

'তুমি খাবে?'

'হ্যাঁ।'

'তবে চলো—'

নন্দরাণী দাওয়ার একদিকে উনুন-গোড়া থেকে ছেলেদের কথা পুরোপুরিই শুনতে পেলো। এতক্ষণ ছেলে দুটো বাড়ি ছিল না বলে মনটা তার যেন কেমন কর্ কর্ করছিল। মাছ ভাজতে বসলে দুটো ছেলেই হাতের কাছে থালা-বাটি যা পাবে তাই নিয়েই তার পাশে এসে বসবে, আর চেয়ে চেয়ে যতক্ষণ না পরিপূর্ণ তৃপ্তি হবে ততক্ষণ ধরে খাবে। এমনি করে ছেলেদের খাওয়াতে নন্দরাণীর ভালও লাগে খুব। শুধু সর্ষের তেলের দর হয়ে যাওয়ার জন্যে অনেক সময়ে পারে না বলে মনে কষ্ট হয় রীতিমত। আ নইলে মাছের অভাব তাদের বড় একটা হয় না। নীলকণ্ঠ মাছ ধরতে রীতিমত ওস্তাদ। ওর বাবাও কম যায় না। কারখানার ছুটি থাকলে নিজেই বেরিয়ে পড়ে নৌকো নিয়ে। বস্তুত নৌকোখানা স্বামী করে রেখেছে এইজন্যেই। ছেলে-দের আসতে দেখে নন্দরাণী বলে উঠল, 'কোথা গেস্‌লি তোরা—বাড়ির ত্রিসীমানাটে যদি থাকিস্। এতখানি বেলা হল—না নাওয়া, না খাওয়া। খিদেও পায় না তোদের?'

খিদে পাবে কি করে?

খিদের চেয়ে অনেক অপ্রত্যাশিত ও লোভনীয় চাহিদা সেদিন মিটেছে তাদের জীবনে। বিন্দুঠাকরুণকে মায়ের ধুইয়ে দেওয়ানোটার প্রতি অপাঙ্গে একবার দৃষ্টিপাত করে সেই যে দুভাই বেরিয়ে পড়েছিল পথে—তারপর তারা গিয়ে উঠে-ছিল একেবারে রাখালদের বাড়িতে। ওদের বাড়ি পেঁছুতেই ছুটে এল রাখাল; রাখালের মা, ঠাকুরমা এবং তার ছোট বোন পদ্ম। পদ্ম রাখালের পিঠোপিঠি বোন, বয়সে রাখালের চেয়ে দু-এক বছরের ছোট কিন্তু তাহলেও দেহে ও মনে সে রাখালের মতই বড় হয়ে উঠেছিল। সে চন্দনকে বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে বলে উঠল, 'চন্দ-ন-বা-বু।'

চন্দন অবাক্ পদ্মদিদিকে দেখে। এর আগেও সে তাকে দেখেছে তাদের বাড়িতে, মায়ের সঙ্গে বসে বসে গল্প করতে। সে সময় তাকে আদরও করেছে পদ্মদিদি। কিন্তু সেদিন যেন তাকে এক অদ্ভুত বলে মনে হল চন্দনের। পদ্মদিদির রঙ যেমন চাঁপাফুলের মত, তেমনিই যেন তার সারা অঙ্গে ভরে রয়েছে অপূর্ব এক সৌরভ। পদ্মদিদির মুখের দিকে তাকিয়ে চন্দন বুঝতে চেষ্টা করল, তারা আসতে কেন এত খুশি হল সে? পরক্ষণেই তার মনে হল, পদ্ম-দিদি তাকে নিশ্চয়ই খুব ভালবাসে। বাস্তবিক শিশুরা অন্তর্যামী। মানুষের ভালবাসা উপলব্ধি করতে তারা অদ্বিতীয়।

চন্দনের মা নীলকণ্ঠর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'খুব ছেলে যা হোক্ বাবা!'

নীলকণ্ঠ একগাল হেসে বলল, 'কেন কি হয়েছে কাকিমা?'

রাখালের মা বললে, 'কি ছেলে বাবা তোরা—মহাযোগীনির শ্মশানে যেতে তোদের কি ভয় করল না?"

নীলকণ্ঠ তেমনিভাবেই বললে, 'আমরা কি ইচ্ছে করে গেসলুম কাকিমা!'

'তা নয়, আমি তো বাপু শুনে অব্দি ভয়ে মরছি।'

ঠাকুরমা বললে, 'দ্যাখো বৌমা ছেরটা কাল তোমার সেই একই অভ্যেস। ছেলে-গুলো এলো—কোথায় তুমি আগে ওদের বসতে দেবে, দুটো শুধুমুদু যা হোক খেতে দেবে—না আগেই মহাযোগীনির শ্মশানপালা গাইতে বসলে—'

'তোমার এক কথা মা', বলে মুখ ঘুরিয়ে রাখালের মা দাওয়ায় মাদুর পাততে গেল। চন্দন তখন পদ্মর বুক থেকে নিজের বন্দীত্ব মোচন করে তার হাত ধরে দাঁড়িয়েছিল। রাখালের ঠাকুরমা ও মাকে তর্কবিতর্ক করতে দেখে সে যেন কেমন ভয় পেল। এমনি করে কথার পিঠে কথাতেই ঝগড়া হয়—এ সে কত দেখেছে তাদের নিজেদের বাড়িতে। কিন্তু কি আশ্চর্য, রাখালদাদা ও পদ্ম-দিদির মা অর্থাৎ কাকিমাকে এমন দেখতে কেন? কাকিমাকে তো অনেকটা মায়ের মতই মনে হয়—অথচ মায়ের মত পাড়-ওয়ালা কাপড় পরে নি, একেবারে পাড়-হীন শাদা কাপড়। চলগুলো মায়ের মত আঁচড়ানো আর সুন্দর করে বাঁধা নয়, কেমন যেন এলোমেলো। চন্দন শুনেছে রাখালদাদা আর পদ্মদিদির বাবা নেই। যাদের বাবা নেই তাদেরই মা হয়তো এমনিভাবে থাকে। চন্দনের মনটা কেমন যেন ভারী হয়ে উঠল, যদি কোনদিন তার বাবা না থাকে তাহলে তারও মায়ের মূর্তি তো এমনিতরো হয়ে উঠবে। এমনি পাড়হীন শাদা কাপড় পরবে, এমনি করেই চুলগুলো এলোমেলো করে থাকবে! না না, সে শুনেছে আকাশের দিকে নাকি কোথায় ভগবান থাকে, সেদিকে তাকিয়ে সে কি যেন বলতে চাইল।

এরপর দাওয়ায় গিয়ে তারা বসতেই রাখালের কাকা জলধর এসে পড়ল। জলধরের একটা মুদীখানা দোকান আছে। জলধরের বয়স পঁয়তিরিশ কি ছত্রিশ হবে। সারা মুখে বসন্তের দাগ, মাথার চুলগুলো খোঁচা খোঁচা। গলায় হরিনামের মালা। নীলকণ্ঠ ও চন্দনকে দেখে সে বলে উঠল, 'আরে নরেনের ছেলেরা যে—কি ব্যাপার গো বাবুরা?'

নীলকণ্ঠ বললে, 'এসে পড়লুম।'

'বেশ, বেশ', তারপর চন্দনকে দেখে বললে, 'আসছি দাঁড়াও—'

পরক্ষণেই পাশের দোকান থেকে বিস্কুট আর লজেন্স এনে চন্দনের দিকে

চন্দন তখন পদ্মর বুক থেকে নিজের বন্দীত্ব মোচন করে তার হাত ধরে দাঁড়িয়েছিল

হাত বাড়িয়ে বললে, 'নাও গো বাবু!' চন্দন দাদার দিকে ও পদ্মদিদির দিকে তাকালো।

পদ্ম গিয়ে চন্দনের পাশে বসেছিল। সে বললে, 'নাও—'

কিন্তু দাদা তখনও বলে নি। কাজেই চন্দনের কেমন ইতঃস্তত ভাব দেখা গেল। নীলকণ্ঠ ঘাড় নেড়ে ইসারা করলে চন্দন সেগুলো জলধরের হাত থেকে নিলে। এরপর জলধর বললে, 'রাখাল বাবা তোকেই খুঁজছিলুম—'

'কেন কাকা?'

'একবার বিরামনগরের হাটে যেতে পারবি?

'হাটে?'

'হ্যাঁ—কাল থেকে হাটে নন্দীদের দোকানে আমার ক'বস্তা মাল সওদা করা রয়েছে—সেগুলো নিয়ে আসবি বাবা!'

তাহ'লে তো গাড়ি নিয়ে যেতে হয়।'

'হ্যাঁ তাতো বটেই। আমি তাহলে গরু দুটোকে গাড়িতে জুড়ে দোব?'

রাখাল নীলকণ্ঠর দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই যাবি?'

'বেশ তো চল্ না।'

চন্দন কান খাড়া করে দাদার মুখের দিকে তাকালো। বুকখানা তার আনন্দে যেন দুলে-দুলে উঠল। বিরাম-নগরের হাট—কে জানে সে কতদূর। সেই দূরে—হয়তো যেখানে আকাশ ঝুলে পড়েছে বনের সীমানায় ঠিক সেইখানে গরুরগাড়ি চেপে যাবে তারা! পথের দু'পাশে আর হাটে গিয়ে হয়তো দেখবে কত কি সব আশ্চর্যকর ব্যাপার!

জলধর বললে, 'বেশি দেরি হবে না তে দের, এই ধর যেতে ঘণ্টা দেড়েক আর আসতে ঘণ্টা দেড়েক। আর ধর মাল-গুলো বহা আর তোলায় বড়জোর আধ-ঘণ্টা—মোট সাড়ে তিন ঘণ্টার মধ্যেই তোরা ফিরে আসতে পারবি।'

রাখাল বললে, 'ঠিক আছে—ঠিক আছে।'

জলধব গাড়িতে গরু জুড়ে দেবার ব্যবস্থা কবতে গেল। ঠাকুরমা বললে, 'অ বৌমা—ছেলেগুলো যে বেরিয়ে পড়বে। ওদের দুটো যাহোক কিছু দাও না খেতে।'

'না না', চন্দন বলে উঠল, 'আমরা খেয়ে এসিচি!'

চন্দনের কথায় সকলেই একসঙ্গে হেসে উঠল। পদ্ম চন্দনকে পাঁজাকোলা করে ধরে ফেলে বলে উঠল, 'গরুর গাড়ি চাপার দেরি হয়ে যাবে না!'

নীলকণ্ঠ বললে, 'ঠিক ধরেচিস্ তো পদ্ম!'

পদ্ম বললে, 'আমি ওর মনের কথা বুঝি নি—ঠিক বুঝিচি!' বেশ করে চন্দনকে বুকে চেপে ধরে তারপর সে যেন কি বলতে গেল কিন্তু পারল না বলতে। আহা, যদি তার এমনি একটা ভাই থাকত! কিন্তু কি করে থাকবে, তার বাবা যে তার আগেই গত হয়েছে।

গাড়ি প্রস্তুত হতেই তারা বেরিয়ে পড়বার উদ্যোগ করল। জলধর তাড়া-তাড়ি খান তিনেক থলে আর গোটা দুই ছাতা এনে দিয়ে বললে, 'বেজায় রোদ হয়ে যাবে এই ছাতাগুলো নিয়ে যাও। আর থলেগুলো চেপে বোসো তা নইলে ঘন্ড লাগবে।'

রাখাল কাকাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'কিছু বলতে হবে না?'

জলধর বললে, 'না না। তোকে তো চেনে নন্দীরা।'

'হ্যাঁ।'

হেট হেট করে গাড়ি ছেড়ে দিলে রাখাল। উঁচু-নিচু গ্রামের পথ। ধুলো উড়িয়ে চলতে লাগল গাড়ি। রাখাল যে কত বড় দক্ষ গরুরগাড়ি চালিয়ে, তা অবাক হয়ে দেখতে লাগল চন্দন। কখনো গড়ুর লেজ মলে দিয়ে, কখনো পাচন-বাড়ির খোঁচা দিয়ে, গরু দুটোকে সে ঠিক ঠিক চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগল এবং মোড় ঘোরবাব সময়ও তার অদ্ভুত হিসাব লক্ষ করা গেল—একটা গরুর দড়িকে টেনে ধরে আরেকটা গরুর দড়িকে স্ল্যাক দিতে লাগল সে।

চন্দন আনন্দে বিস্ময়ে ভরপুর। পথের দু'ধারে তাল নারিকেল, খেজুর গাছ। কোথাও কোথাও আকাশকে অন্ধকার করে আদ্যিকালের বদ্যিবুড়োর মত বটের বিস্তৃতি। এরই মাঝে ঝাঁকে ঝাঁকে ঘরবাড়ি মানুষের। গোপালপুর গ্রামখানা অনেক বড়ো—পুব-পশ্চিমে গ্রাম। এই গ্রাম পেরিয়ে, মাঠের রাস্তায় উত্তরে মাইল দুয়েক গিয়ে তারপর বিরামনগর পড়বে। সেখানেও প্রায় মাইলটাক যাবার পর তবে হাটতলা।

পোদ্দারবাবুদের বাড়ির সামনে দিয়ে গাড়ি যাচ্ছিল। কি বিরাট প্রাসাদোপম বাড়ি। ওপরের ছাদ ভেঙে পড়েছে। দেয়াল গেছে জায়গায় জায়গায় ধসে। মোটা মোটা কড়ি-বরগাগুলো নিচে-ওপরে খাড়াখাড়ি পড়ে। বাড়িটার মাথায় আর দেয়ালে দেয়ালে বড় বড় আধবুড়ো অশত্থ ও বটের গাছ। বেশ খানিকটা আসার পর দেখা গেল, খবরের কাগজে যুদ্ধবিধ্বস্ত শহরের ধ্বংসলীলার ছবির মত সিংহ-দ্বারটা পড়ে রয়েছে হুমড়ি খেয়ে, পাশে নহবৎখানাটা যদিও অটুট, কিন্তু সিঁড়ির অগ্রভাগটা গেছে ভেঙে, নিচের দিকে খিলানের ওপর এখনও সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। বাড়িটার চারিদিকে রেলিং। রেলিং কোথাও দশ-বিশ গজ করে ফাঁকা, কোথাও কিছু রেলিং আশ্রয় করে পানশিউলি আর বনশিউলির লতানো-বিস্তৃতি।

চন্দন জিজ্ঞাসা করলে নীলকণ্ঠকে, 'দাদা বাড়িটায় এত গাছ কেন?'

'অনেক পুরনো বাড়ি যে—'

'কত দিনকার পুরনো?'

'তা অ-নে-ক বছরের।'

'তুমি তখন হয়েচো?'

'য্যেৎ বোকা—আমি, বাবা—এমনকি ঠাকুরদাদাও তখন হয়েছে কিনা সন্দেহ!'

বাবা-ঠাকুরদাও তখন হয় নি। চন্দনের চোখে-মুখে কি যেন এক গভীর বিস্ময়! তাহলে কতদিনকার বাড়ি এটা। ভাবতে ভাবতে সে যেন আর কুল পেল না। গরুরগাড়ি এগিয়ে চলছে। হঠাৎ বাড়িটার একটা জায়গায় কেন রেলিংই নেই দেখা গেল। সেখানে বড় বড় সব কারুকার্য করা চৌবাচ্ছার মত জলাধার। জলাধারগুলোর মাঝখান দিয়ে উঠেছে এক-একটা স্প্রিং-এর মত লোহার পাকানো পোস্ট, আর তার ওপর এক-পা পিছনদিকে করে এক-পা সামনে এগিয়ে দিয়ে মার্বেল পাথরের ডানাওয়ালা সব নারীমূর্তি। হঠাৎ সেদিকে নজর পড়তেই চন্দন চেঁচিয়ে উঠল, 'দাদা মানুষ—মানুষ!'

নীলকণ্ঠ ও রাখাল একসঙ্গে হেসে উঠল। চন্দন অপ্রতিভ হয়ে দাদার মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকালো। নীলকণ্ঠ বললে, 'ওগুলো মানুষ নয় চন্দন—ওগুলো পরী!' রাখাল নীলকণ্ঠকে সংশোধন করে দিয়ে বললে, 'শুধু পরী নয়—জলপরী!'

যে পরীই হোক্। কতদিন, কত সন্ধ্যায়, আর কত রাতে মায়ের বুকে মাথা দিয়ে চন্দন যে পরীর গল্প শুনেছে সে কি তবে এদেরই গল্প!

বিস্ময়ের পর বিস্ময়! বিস্ময় যেন আর ফুরতে চায় না। দাদার কাছে ঘেঁসে বসে তার একখানা হাত জড়িয়ে

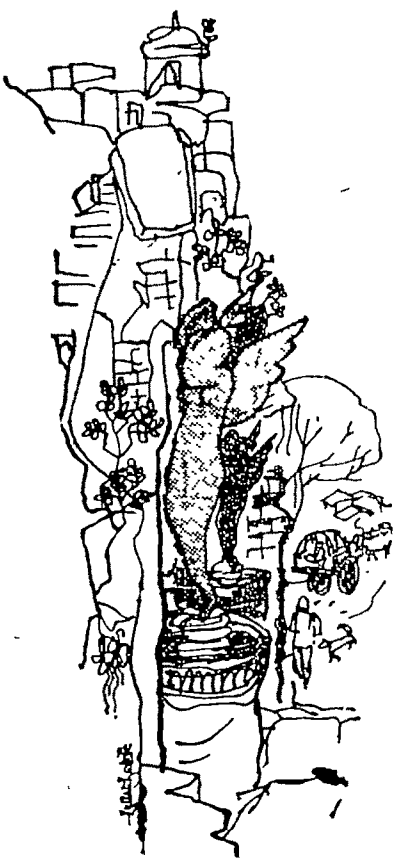

যে পরীই হোক্। কতদিন কত সন্ধ্যায় আর কত রাতে মায়ের বুকে মাথা দিয়ে চন্দন যে পরীর গল্প শুনেছে সে কি তবে এদেরই গল্প

ধরে পথের ঢেউ খেলানো উঁচু-নিচুতে গরুরগাড়ির ওপর দোল খেতে খেতে সে চলেছে। সত্যিই এ বিস্ময়ের কি শেষ আছে? অদ্ভুত শব্দ গরুরগাড়ির। এরও যেন কেমন ছন্দ আছে। ক্যাঁচ-কোঁচ করতে করতে গাড়ি শুধু এগিয়েই চলেছে। চন্দনের জীবনে এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। কখনো সে এমন করে গরুরগাড়ি চেপে কোথাও যায় নি।

এরই মধ্যে কখন শেষ হয়ে গেল পোদ্দারবাবুদের প্রাসাদের বিস্তৃতি। গরুরগাড়ি এগিয়ে চলেছে। কে জানে এমনি করেই হয়তো সময়ের স্রোতে পোদ্দারবাবুরাও একদিন শেষ হয়ে গেছেন। এমনি করেই পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে তাঁদের বনেদীয়ানায়।

আর?

এইতো গরুরগাড়ি এগিয়ে চলেছে। এইতো এসে পড়ল গাড়িখানা নস্করবাবুদের আধুনিক লোহা আর সিমেন্ট, নিওন আর তেরঙ্গা লাঞ্ছিত, বিরাট মেট্রো-সংস্কৃতির কন্ট্রাক্টরী চত্বরের প্রাসাদখানার সামনে। চোখ ঝলসে গেল চন্দনের, চোখ ঝলসে গেল নীলকণ্ঠ আর রাখালের। চন্দন ছেলেমানুষ, বিস্ময়ের আবেগে সে বলে উঠল, 'ইস্ কি সুন্দর বাড়ি।'

রাখাল বললে, 'কি করে এত বড় বাড়ি কবলে বল দিকি?'

'কেন করবে না ভাই, ওরা সব বড় বড় মন্ত্রী ছিলেন যে। কত ওঁদের পাওয়ার!'

'ওঁদের অনেক টাকা, নয়?'

'শুধু টাকা—হাজার হাজার বিঘে পর্যন্ত জমি!'

'কিন্তু শুনেছিলুম যে লোকে আর বেশি জমি রাখতে পারবে না?'

'তা বললে কি হয়—ওরা সব কায়দাকরণ জানে।'

বস্তুত একদিন বাবা ও গোপালকাকাকে এই সব কথা আলোচনা করতে নীলকণ্ঠ শুনেছিল এবং সেই আলোচনার ভিত্তিতেই সে এতবড় সব ভয়ানক কথা বলে ফেলতে পারল।

চোখের সামনে ভেসে উঠল পুরনো প্রাসাদ ধসে পড়ছে, তার জায়গায় নতুন প্রাসাদ উঠছে। পোদ্দারবাবুরা শেষ হয়ে যাচ্ছে। নস্করবাবুদের শুরু হচ্ছে। অদ্ভুত একটা কথা নীলকণ্ঠ শুনেছিল বাবার মুখে। বাবা বলেছিল—'বনেদীরা শেষ হয়ে গেল, দো-আঁশলাদের শুরু হল। গোপালকাকা শুনে বাবাকে বলেছিল, 'বড় ঠিক কথা বলেছো নরেনদা একেই আমরা বলি সামন্তবাদ। এ যখন মুমূর্ষু তখন একে এই দো-আঁশলাদের দিয়েই বাঁচানোর চেষ্টা হচ্ছে।' এসব কথা রাখালও তেমন বোঝে না, আর চন্দন তো ছেলেমানুষ।

কিন্তু গরুরগাড়ির চাকা যতই গড়িয়ে চলতে লাগল ততই তাদের চোখের সামনে এই পরিবর্তনটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। খানিকটা যেতেই নস্করবাবুদের বিরাট গেটখানা। যেখান দিয়ে দেখতে পাওয়া গেল অজস্র ফুলের গাছ। গাড়িবারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে দু'খানা মটর গাড়ি।

চন্দন সবিস্ময়ে সেদিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'দাদা—ম-ট-র-গা-ড়ি!'

নীলকণ্ঠ বললে, 'হ্যাঁ।'

একজায়গায় দেখল চন্দন পরী, আরেক জায়গায় মটর গাড়ি। সেই পরীগুলোই কি তবে উড়ে যাওয়ার বদলে ছুটে যাবার মটর গাড়ি হয়ে গেল? অদ্ভুত জিজ্ঞাসা তার মনের কাছে।

একসময়ে নস্করবাড়িও শেষ হয়ে গেল। তারপর আরও কতকগুলো বাড়ি, তারপর গ্রামে যেসব জায়গার আগে আদৌ কোন মূল্য ছিল না, পোড়ো জলা-জমি, বাঁশঝাড়, এঁদো পুকুর প্রভৃতি ছিল—সে সব জায়গায় জমজমাট হয়ে উঠেছে দোকানপাট, ইলেকট্রিক কোম্পানীর সাব স্টেশন, সেটেলমেন্ট, বি-ডি-ও প্রভৃতি আপিস। থানা আগে ছিল গ্রামের মধ্যে—এখন বাড়ি-ঘর হওয়ায় উঠে এসেছে এখানে। এখানে বাস স্ট্যান্ড—বিরামনগর হয়ে বাস যায় আরও দূরে, সেই কলকাতায়। এখানে সারি সারি গড়ে উঠেছে কেরোসিন কাঠের প্যাকিং বাক্স, চাঁচের ঝুড়ি, বড় বড় টুকরি প্রভৃতির ব্যবসা। পাশাপাশি গড়ে উঠেছে অনেকগুলো বরফ কল। থান থান বরফ তৈরি হয় কলগুলোয়। প্যাকিং বাক্স, চাঁচের ঝুড়ি আর টুকরিতে যখন এদিককার মেছোঘেরীর শত শত মণ মাছ চালান যায় তখন এই বরফ কলের বরফ সেই মাছে দিয়ে মাছকে পচে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা হয়। থান থান বরফ কলের সামনে কাঠের গুঁড়ো মাখা অবস্থায় বড় বড় কাঁটাপাল্লায় ওজন হতে দেখে চন্দন চেঁচিয়ে উঠল, 'দাদা কত বরফ দ্যাখো।'

দাদা কোন উত্তর দেয়ার আগে চন্দন অবাক হয়ে স্মরণ করল তাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যে পাংখাবরফওয়ালা যায় তাকে। এক টুকরো ন্যাকড়ায় সামান্য একটা বরফের ডেলা আর একটা কাঠি দিয়ে লোকটা কাঠের হাতুড়ি দিয়ে ধাঁই ধাঁই করে পেটে—তারপর বোতল থেকে লাল সিরাপ ঢেলে দেয় সেই বরফের ওপর। দাম তার তিন পয়সা। অথচ এখানে থান থান বরফ ঠেলাগাড়ির মত ঠেলে ঠেলে আনা হচ্ছে, বড় বড় কাঁটা-পাল্লায় দড়াম-দড়ুম করে ফেলা হচ্ছে, কত টুকরো-টাকরা ছিটকে পড়ছে; কই কারো কাছ থেকে তো তার জন্য পয়সা নেয়া হচ্ছে না। চন্দনের মনে হল—এবার সে বরফ কিনতে হলে এইখানে এসেই বরফ কিনে নিয়ে যাবে—এরা নিশ্চয়ই তিন পয়সায় অনেকখানি দেবে।

এরই পর সোজা উত্তরে মাঠের বুক চিরে মাইল দুয়েক পথ। রাস্তা এখানে খুবই ভাল। পিচঢালা কালো কুচকুচে সুন্দর পথ। লরী, বাস, গরুর গাড়ি এসব চলার কোন অসুবিধা নেই। পথের দু'পাশে বিস্তীর্ণ মাঠ। এখন খাঁ-খাঁ করছে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপে। বর্ষায় দু'পাশে সবুজ ধান ক্ষেতে ভরে ওঠে। যত দূর চাওয়া যায় শুধু সবুজ আর সবুজ। পশ্চিম দিক দিয়ে গেছে রেল লাইন। গরুর গাড়ি এ পথে রীতিমত ছুটেই চলল। মাঝে মাঝে লরী যায় তীর বেগে, রাখাল গাড়িটাকে একদিকে সাইড করে দাঁড়ায়। বাসও যায় হর্ন দিতে দিতে। রাখাল তেমনি করেই সেগুলোকেও যেতে দেয় পাশ কাটিয়ে।

এমনি করে একসময়ে পৌঁছুল তারা বিরামনগরে। বিরামনগরও বেশ বর্ধিষ্ণু জায়গা। গ্রামে ঢুকতেই বড় বড় সব বাড়ি। বড় বড় দোকান, কয়লার গোলা, চালানী কাঠের আড়ত, করাত কল, ছাপাখানা, পুলিশ ফাঁড়ি, কংগ্রেস আপিস, সিভিল সাপ্লাইয়ের আপিস সবই যেন পাশাপাশি। মাইলখানেক ভিতরদিকে সব যেন একেবারে থৈ-থৈ—আড়তের পর আড়ত। ব্যবসায়ের প্রাণকেন্দ্র। গঞ্জ হলে যেমনটি হয় ঠিক তেমনটিই। ঘিঞ্জি, ঠেলা, লরী, হেঁপো, গরুরগাড়ি, মটরগাড়ি সব যেন একাকার। ভিড়ে ভিড় জায়গাটা। পাশেই রেল স্টেশন। অনবরত মালগাড়ি শান্ট করছে। ইঞ্জিনের বাষ্পীয় বাঁশীর শব্দে কানে তালা লেগে যায়। চন্দন বিস্ময়ে নির্বাক। এমন জগৎও আছে তাদের বাড়ির পাশেই। আহা-আ সে যদি আরও কিছুদিন আগে এখানে আসতে পারত। এসে কি হত তা সে জানে না কিন্তু না আসার বেদনাটাই যেন তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। খুব ইচ্ছা হল তার রেলের কাছে গিয়ে একবার মালগাড়ি আর রেল স্টেশনটা দেখে আসে কিন্তু দাদা বা রাখালদাদা কেউ সেদিক দিয়ে কিছু বললে না বলে, সে মনের কথা মনেই চেপে রাখল।

নন্দীদের দোকান এরই মাঝে। খুব বড় দোকান। রাখালকে তারা চেনে। কাকা বলেছিল বড় জোর আধঘণ্টা লাগবে মাল বহে আনা আর বোঝাই করতে। কিন্তু তার আগেই বোঝাই হয়ে গেল। তবে দেরি হয়ে গেল ভিড় ঠেলে বেরুতে এবং তার-জন্যই আধঘণ্টার মত সময় ঝটমুট বেরিয়ে গেল।

এবার নীলকণ্ঠ রাখালকে বললে, 'দে রাখাল এবার আমি গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবো।'

রাখাল বললে, 'নে চালা!'

চন্দন অবাক হয়ে বললে, 'দাদা তুমি গরুরগাড়ি চালাতে পারো?'

'দাদা সব পারে' বলে নীলকণ্ঠ গাড়ির অগ্রভাগে গিয়ে বসল।

সত্যিই নীলকণ্ঠ গাড়ি চালাতে পারে। সেই একই পথ। ব্রোঝাই করা গরুরগাড়ি ক্যাঁচ কোঁচ করে আবার চলতে লাগল। মাথার ওপর প্রচণ্ড রোদ। ভাগ্যি ছাতা দুটো দিয়েছিল জলধরকাকা। উত্তরের পথ শেষ করে গোপালপুরের সীমানায় এল তারা। সেই বরফ কল। সেই প্যাকিং বাক্স আর কুড়ি তৈরির কারখানা, থানা, বি-ডি-ও আপিস, সর পার হয়ে এগিয়ে এল—এগিয়ে এল তারা পাশে ফেলে রেখে নস্করদেব চোখ-ঝলসানো বাড়িটা, পোদ্দাববাবুদের ধ্বসে যাওয়া প্রাসাদ। তারপর সেই আদ্যিকালের বদ্যিবুড়োর মত বিস্তৃত বট আর গ্রামের তাল-নারিকেল-খেজুরের গাছের সারি দেয়া পথ অতিক্রম করে ফিরে এল তারা বাড়ি।

তাই মা যখন মাছ ভাজতে ভাজতে বলে উঠল, 'খিদেও পায় না তোদের?' তখন নীলকণ্ঠ বললে, 'খিদে পেয়েছে বলেই তো এলুম।' তারপর চন্দনকে বললে, 'যা ঘর থেকে একটা থালা নিয়ে আয়।'

শুধু বলার অপেক্ষা। চন্দন ছুটে গিয়ে ঘর থেকে থালা বের করে আনল। নীলকণ্ঠ গিয়ে মায়ের পাশে বসে পড়ল। চন্দন বসল, দাদার গায়ে গা ঠেকিয়ে। নন্দরাণী কয়েকটা ভাজা মাছ খুন্তি করে তুলে দিলে থালায়। চন্দন হাত দিতে গেল মাছে। নীলকণ্ঠ বাঁ হাতে তার হাত-খানা চট করে চেপে ধরে বললে, 'এই বোকা হাত পুড়ে যাবে যে, দাঁড়া আমি ছাড়িয়ে দিচ্ছি তুই খা।' চন্দন আনন্দে পেটের দুদিকটা দুহাতে চাপড়ে নিলে কয়েকবার।

তাজা, টাটকা তপসে মাছ ভাজা খেতে সত্যিই চমৎকার। দু-একটা গরম মাছ ভেঙে ভেঙে আর ছাড়িয়ে দিয়ে নীলকণ্ঠ চন্দনকে খাওয়ালে। তারপর বাকি মাছ-গুলো যখন আপনা-আপনিই ঠাণ্ডা হয়ে এল তখন সে বললে, 'এবার তুই নিজে খা—'

চন্দন এতক্ষণ তারই জন্যে যেন অপেক্ষা করছিল। মহার্থশি সে। নিজে হাতে ভেঙে ভেঙে সে খেতে লাগল। নীলকণ্ঠ উপর্যুপরি কয়েকটা খেতেই তার মাছ শেষ হয়ে গেল। নন্দরাণী বললে, 'দাঁড়া আরেক খোলা ভাজা হোক—'

চন্দন মাছ খেলেও আসলে তার আজ বিরামনগর যাবার কথাটা মাকে বলবার জন্য যেন সে আকুলি-বিকুলি করছিল। কিন্তু সুযোগ কোথায়। ভিতরটা তার যেন তোলপাড় করছিল। এদিকে মাছ খেতে খেতে একসময়ে চন্দনের পেটও যেন ভরে আসছিল। খাওয়ার একাগ্রতা ক্রমশঃ কমেও আসছিল। চঞ্চল বালক এবার ছুটে গেল যেন কল্পলোকে উধাও হয়ে। কিন্তু সর্বাগ্রে মনে পড়ল দাদার কৃতিত্বের কথাটা। সে মাকে বলে উঠল, 'জানো মা দাদা কাল রাতে মহাযোগীনির শ্মশানে গেস্‌লো রাখালদাদার মা গল্প করলে!' নীলকণ্ঠ চোখ পাকিয়ে ভাইকে নিষেধ করল, ওসব কথা না বলতে। ততক্ষণে নন্দরাণী নীলকণ্ঠর শাসানিটা লক্ষ্য করে নিয়েছিল। তাই সে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বললে, 'ভাইকে চোখ রাঙিয়ে কি হবে—রাত্তিরে তুই মহাযোগীনির মহা-শ্মশানে গেছিলি—এ কি কথা রে!'

বিব্রত বোধ করে নীলকণ্ঠ বললে, 'না—না।'

চন্দন আবার বলে উঠল, দাদা একটুও ভয় পায় নি মা।'

চন্দন যে এমন হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবে এটা নীলকণ্ঠ বুঝতেই পারে নি। যদি এতটুকু সে বুঝতে পারত তাহলে আগেই সে রাখালদেব বাড়িতে তাকে বারণ করে রাখতো এবং একবার বারণ করে রাখলে চন্দন কখনই মাকে বলত না, কারণ দাদাকে সে পৃথিবীতে বোধ করি সবচেয়ে ভালব সে। তা ছাড়া এ কথা তো চন্দনের বলার কথা নয় বরং সে যেটা বলতে পারত সেটা হচ্ছে বিরামনগর যাওয়ার ব্যাপার। বিরামনগরে গিয়ে সত্যিই সে খুশি হয়েছিল। কিন্তু কে জানে, যে কথাটা বিরামনগর যাওয়ায় একেবারে চাপা পড়ে গিয়েছিল হঠাৎ সে কথাটা চন্দনের মাথায় এল কি করে? সে কি তবে নিজের আনন্দ ও কৃতিত্বের চেয়ে দাদার কৃতিত্ব ও আনন্দের ঘোষণা করাটাকেই বড় করে দেখেছিল? কিন্তু কেন? ভুল হয়েছে নীলকণ্ঠরই এবং এ ভুলের মাশুল যে তাকে কিভাবে ও কত পরিমাণে দিতে হবে তা কল্পনা করতেও তার কষ্ট বোধ হল। কারণ সেই একটি জায়গায় ব্যথা, বেদনা ও কান্নার স্রোতো-ধারা এসে পৌঁছে যাবে—মা বলবে, 'আমি তোর সৎমা, তাই তুই এমন করে আমাকে কষ্ট দিস!'

বাস্তবিক, এ এক অদ্ভুত ব্যাপার! শেষ পর্যন্ত নীলকণ্ঠ যা ভাব-ছিল তাই ঘটল। মা বললে, 'শ্মশানে-মশানে ঘোরা কি রে—সেখানে কত অপ-দেবতারা থাকে। কে কি ভর করবে! তুই সব্বোনাশ করবি আমার!'

'তোমার কি সর্বনাশ করব আমি?'

'তোর কিছু একটা হলে আমার সব্বোনাশ নয়? আমি তোর সৎ-মা বলে আমার কিছু ক্ষতি হবে না, না?'

'আগে তুমি ব্যাপারটা শোনো—কি হয়েছিল?'

'কি আবার হয়েছিল—তুই মহা-যোগীনির মহাশ্মশানে গেস্‌লি কেন বল আগে—'

ওদিকে উনুনের বুকে তপ্তকড়ায় মাছ প্রায় চুয়ে যাবার যোগাড় হল। নীলকণ্ঠ বললে, 'তুমি আগে মাছগুলো দ্যাখো দিকি—আমি তোমায় সব কথা খুলে বলছি।'

নন্দরাণী কড়াটা উনুন থেকে নামিয়ে মাছগুলো একবার নেড়ে দিয়ে বললে, 'কি বল তুই? আমার আর বেঁচে সুখ নেই নীলু! এরপর আবার তোর ছেলে এসে যখন শুনবে এ সব কথা, তখন আমার আর পেজ-পয়জার কিছু বাকি থাকবে না।'

নীলকণ্ঠ বললে, 'তুমি কিচ্ছু ভেব না মা। শোনো আমি তোমায় সব বলছি।' এরপর একে একে যা ঘটেছিল সমস্ত ঘটনা সে মাকে খুলে বলে গেল। ঘটনা সে মাকে খুলে বলে গেল। নন্দরাণী সব উৎকর্ণ হয়ে শুনল। শুনে একটা জায়গায় সে আশ্বস্ত হল যে, ইচ্ছাকৃতভাবে সে ব্যাপারটা করে নি। কিন্তু কি বিপদ, কি ভয় যে এই ঘটনার মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে সে তো তার কল্পনার বাইরে নয়। কত ভূতপ্রেত, কত

জগদ্ধাত্রী জগদ্দেবতা ঐ মহাযোগীনির মহাশ্মশানে বসবাস করে, তার কি কোন ইয়ত্তা আছে! তা ছাড়া কতদিন ধরে কত মানুষ ঐ শ্মশানে ছাই হয়ে গেছে কিন্তু ছাই হয়ে গেলেই কি সব ছাই হয়ে যায়—তা তো নয়। সেই সব মৃত মানুষগুলো মৃত্যুর পরেও হয় তো মুক্তি পায় নি, তাদের অতৃপ্ত আত্মা শ্মশানের চারিপাশ ঘিরে কেবলই ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কে জানে যদি তাদের কেউও এমন সোনার চাঁদ ছেলের লোভে লোভে ছায়ার মত এসে থাকে তাহলে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে। বাছা কি আর বাঁচবে! নন্দরাণীর চোখ দুটো যেন যন্ত্রণায় ফেটে পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে দুই গণ্ড বেয়ে বর্ষার বারিধারার মত অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

নীলকণ্ঠ বললে, 'এ কি মা শুধু শুধু এমন করে কাঁদছো কেন—আমি তো কোন অন্যায় করি নি।'

নন্দরাণী যেন আর থাকতে পারল না। চোখ দুটো বুজে ফেলে দু' হাত কপালে ঠেকিয়ে বললে, 'ঠাকুর, তুমি রক্ষে কোরো।'

চন্দন একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। অতো ছোট ছেলে সেও বুঝে নিলে যে মহাযোগীনির মহাশ্মশানে দাদার যাওয়ার কথাটা সে না বললেই বোধ করি ভাল করত। দাদার গায়ে হাত রেখে সে অপরাধীর মত তার দিকে তাকালো শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে। নন্দরাণী ইতিমধ্যে হাত ধুয়ে উঠে পড়ে ঘরে গেল। একখানা গামছা পরে শুদ্ধাচারে ঘরের কুলুঙ্গী থেকে, কবে বুঝি নরেন পুরী গিয়েছিল, আর সেখান থেকে এনেছিল জগন্নাথের মহাপ্রসাদ—সেই মহাপ্রসাদ বের করে এনে নীলকণ্ঠকে বললে, 'মুখটা ধুয়ে হাঁ কর—'

নীলকণ্ঠ মায়ের হেঁসেলের ঘটি তুলে নিয়ে আলগোছে মুখে জল ঢাললে। তারপর কুলকুচু করে দাওয়া থেকে উঠোনে মুখের জলটা ফেলে দিয়ে মায়ের সামনে গিয়ে হাঁ করে দাঁড়ালো। নন্দরাণী মহাপ্রসাদগুলো তার মুখে ফেলে দিয়ে বললে, 'একটু দাঁড়া।' তারপর উঠোনে নেমে পড়ে তুলসীতলার খানিকটা মাটি এনে নীলকণ্ঠর মাথায়, কপালে ঘষে দিয়ে বললে, 'আর কখনো ওদিকে যাসনি, বুঝলি?'

'কেন মা?'

'ওরা বেগে থাকবে।' সঙ্গে সঙ্গে নন্দরাণীর মাথায় খেলে গেল একটা কথা এবং তদনুসারেই সে বলে উঠল, 'ওরা দেখবে মা-ই হচ্ছে তোর তাবিজ-কবচ, তখন ওরা আগে তোর মাকেই মেরে ফেলবে—'

'তারপর?'

'তারপর কি আর তোকে ছেড়ে দেবে—'

'আমাকেও মেরে ফেলবে?'

'তোকে মারার জন্যেই তো ওরা ঘুরবে!'

'আচ্ছা মা ধরো তোমাকেও মারলে আর আমাকেও মারলে। মরে গিয়ে আমরা এক জায়গায় থাকবো তো?'

'তা কি করে বলব—তবে মা কি আর ছেলেকে ছেড়ে থাকতে পারে?'

'তাহলে মা ভয় করার কি আছে' নীলকণ্ঠ বলতে লাগল, 'মরেও তো আমি তোমার কাছে থাকব?'

'হ্যাঁরে' নন্দরাণী বিস্ময়-উত্যক্তভাবে বলে উঠল, 'তোর ভয় ডর বলেও কি কিছু নেই?'

'কেন মা শুধু শুধু ভয় করতে যাব', নীলকণ্ঠ বললে, 'মানুষ তো একবারের বেশি মরে না। তা ছাড়া যারা ভীরু তারাই শুধু মরার ভয় করে।'

নন্দরাণী দেখলে এ এক হিতে বিপরীত হয়ে গেল। অদ্ভুত ছেলে এই নীলকণ্ঠ। নন্দরাণী মরে যেতে পারে তার জন্যে এ কথা বলেও তাকে সে নিজের পথে আনতে পারল না। এবার তাই তাকে ধমক দিয়ে বললে, 'থাম এসব কথা মুখে আনতে নেই।'

সন্ধ্যাবেলায় স্বামীর সঙ্গে নন্দরাণীর এইসব কথাই হচ্ছিল।

যে নরেন সকালবেলা কারখানায় যাবার সময় নন্দরাণীকে শাসিয়ে বলে গিয়েছিল, 'ছেলেকে কারখানা থেকে এসে যদি বাড়িতে আজ না দেখি তবে তোমারই একদিন কি আমারই একদিন' —সেই নরেন বাড়ি ফিরে সত্যিই ছেলেকে দেখতে পেল না কিন্তু আশ্চর্য, কোনরকমেই সে 'তোমারই একদিন কি আমারই একদিন' এ ধরনের কিছু করল না। অথচ নন্দরাণী কি ভয়ে-ভয়েই না ছিল। এ বাড়িতে আসা অবধি কখনো স্বামী তাকে এমন করে বলে নি। তাই সারাদিন সে প্রায় নানাকাজের মধ্যে ও অবসরে এই একই কথা ভেবেছে, কেন এমন করে স্বামী তাকে বললে? মনের মধ্যে তার কি এমন হয়েছিল? সত্যিই, কোনদিন তো সে নীলকণ্ঠকে কেন্দ্র করে তার বিরুদ্ধে নালিশের কোন কাজই করে নি। তবে?

বিপদভঞ্জনের কথাটা তার মনে পড়ল। গত সন্ধ্যায় লোকটা তাদের বাড়িতে আসার পরেই বোধ হয় এমন ব্যাপারটা ঘটে যেতে পারল। বুড়ো ইনিয়ে-বিনিয়ে নিজের দ্বিতীয়বার বিবাহ করার কাহিনী যখন বলে যাচ্ছিল, তখন হয়তো স্বামীর মনে তার কিছু কিছু রেখাপাত হয়েছিল। তা ছাড়া সৎ-মা এমন একটা কথা—যে কথার সঙ্গে যুগ-যুগান্তের কত অবিচার, অত্যাচার, কত ভুল বোঝাবুঝি, কত আশা ও নিরাশার কাহিনী জড়িয়ে আছে। সংক্রামক ব্যাধির মত হয়তো নরেনকে এর শিকার হয়ে পড়তে হয়েছিল।

প্রধানতঃ কথা হচ্ছে মা যার নেই, তার মা কে হবে? যে নারী কখনো তাকে গর্ভে ধারণ করল না, দশ মাস দশ দিন প্রতিনিয়ত একটা জীবনকে অন্তরের ভয়, আশা ও আকাঙ্ক্ষায় সম্পূর্ণ করে এবং রক্ত, অশ্রু ও অনন্নুভবনীয় আনন্দের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর আলো দেখাতে পারল না—সে নারী কি করে সেই মাতৃহীন বালকের জননীর আসনে এসে বসবে? তার কাছ থেকে এ দাবী করলে তা কি খুব ন্যায়সঙ্গত হবে? এ কি মানুষের অতিরিক্ত এবং অবাস্তব দাবী নয়? শুধু কোন স্বামী কোন নারীকে বিবাহ করে এনেছে বলেই কি, স্বামী-পুত্রের ওপর তার সর্বপ্রকার জননীসুলভ দায়িত্ব পালন করতেই হবে? বাইরের দিকে তাকে নাইয়ে-ধুইয়ে, খাইয়ে-দাইয়ে, আদরে-যত্নে, লালন-পালন করে তুলে কর্তব্য পালন করা কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু কোথায় সেই যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে নাড়ীর একাত্মতা? সেই একাত্মতা তো লৌকিক আচরণের দ্বারা কখনই বোধ করা যায় না। অথচ এইটাই মানুষ যুগ-যুগান্ত ধরে আশা করে এসেছে। যে নারী সেই আশা পূর্ণ করতে পারে নি, সেই নারীকে বার বার অভিশাপ গ্রহণ করতে হয়েছে। কিন্তু পারা যে সম্ভব নয়, সে কথাটা কেউই তলিয়ে দেখতে চায় নি।

অথচ এ কথাও সত্যি যে তাও সম্ভব। যেখানে শিক্ষা আছে, পরিবেশ আছে, যেখানে জীবনের মহত্তর প্রেরণায় নিজের সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার বেদনাকে নিখিল নারীর বেদনা বলে অনুভব করার অনুভূতি আছে—আর আছে সেই নারীর সন্তানের প্রতি যে মমতা সেই মমতার নির্ঝরিণী ধারা নিজের মধ্যে—সেখানে নিশ্চয়ই এটা সম্ভব। আর তা সম্ভব বলেই লোকে আজও অনেক সৎ মার উদাহরণ দিয়ে বলে, 'দ্যাখো তো ওদের কি সৎমা বলে মনে হয়?'

নন্দরাণী সেদিক দিয়ে কোনদিনই নীলকণ্ঠকে নিজের ছেলে ভিন্ন অন্য রকম করে দেখতে পারে নি এবং স্বামী এটুকু উপলব্ধি করুক এইটুকুই সে চেয়েছে।

কিন্তু নরেন কি সে কথা জানে না? খুব জানে। কিন্তু কি যে হল তার, বিপদভঞ্জন চাটুয্যের কথাগুলো শুনতে শুনতে, সে যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। সারাদিন সে কারখানায় কাজ করতে করতে কেবলই আজ অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। একবার এমন হল, হাতুড়ির একটা ঘা তার বাঁ হাতের তর্জনীতে লেগেও

গেল। ভাগ্যিস্ রোষ লাগে নি তাই রক্ষে! বাস্তবিক, নন্দরাণী তার কথায় কতখানিই না আঘাতে পেয়েছে। বুড়ো বিপদভঞ্জন যখন নিজের অপোগণ্ড ছেলেদের চাকরীর কথা বলতে এসেছিল তাকে তখন হঠাৎ তার নীলকণ্ঠের কথাই মনে পড়ে গিয়েছিল। নীলকণ্ঠ যদি বিপদভঞ্জনের ছেলেদের মত হয়ে যায় তবে কে তার জীবনের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা করে দেবে? নীলকণ্ঠকে সে স্কুলে দিয়েছিল, স্কুলে লেখাপড়াও যে সে করত না এমন নয় কিন্তু গেল সে লেখাপড়া নষ্ট হয়ে, গেল তার সকল শাসন-বাঁধন শিথিল হয়ে। কিন্তু এজন্য কি শুধু নন্দরাণীকেই দায়ী করা যায়? সে সময়টা ফ্যাক্টরী বন্ধ হয়ে গেল। খাবারই সংস্থান ছিল না তখন, কাজেই পড়াবে সে কি করে? শ্রমিকের ছেলের লেখাপড়াতো এমনি করেই নষ্ট হয়ে যায়। তাই সারাদিন সে টো-টো করে ঘুরে বেড়ায়, নৌকো নিয়ে মাছ ধরে। রাজ্যের বিদ্‌কুটে বিদ্‌কুটে কাজ করে সকলকে তাক লাগিয়ে দেয়। তাই যখন বিপদভঞ্জন বলে উঠলেন, 'বুঝতে পারছিস না বাবা পায়ে কুড়ুল মেরিছি যে আমি নিজেই অর্থাৎ দ্বিতীয়বার সংসার করেছেন তিনি, তখন নিজের ছেলের কথা মনে করে নরেনের মনটা কেমন যেন হু-হু করে উঠেছিল। নরেনও তো কুড়ুল মেরেছে নিজের পায়ে, দ্বিতীয়বার সংসারও করেছে তো সে—তবে কি...তবে কি তারও নীলকণ্ঠ অমনি করে বিপদভঞ্জনের ছেলের মত পর হয়ে যাবে, অমনি করে রয়ে যাবে? তাই অবচেতন মনের অবরুদ্ধ চিন্তাস্রোত যেন হঠাৎ তরঙ্গ তুলে বাইরে আছাড় খেয়ে পড়ল এবং সে আছাড় খেয়ে পড়ার আধার আর কে হবে—যখন বাড়িতে তার বিপদভঞ্জন-গৃহিণীর মতই নন্দরাণী রয়েছে। প্রথম আছড়ে পড়ার আকস্মিকতায় নন্দরাণী হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তারপর সেও যখন প্রতিবাদ-মুখর হয়ে উঠল তখন উত্তরোত্তর নরেনও সীমা অতিক্রম করে গেল। সে সীমা যে কতখানি অতিক্রান্ত হয়েছিল তা সকালের ঝগড়াতেই বোঝা যায়। কিন্তু সকালের ঝগড়াতেই আবার এমন ঘটনা ঘটল, যখন থেকে নাকি স্রোত একেবারে স্বাভাবিক পথে ঘুরে গেল। তাদের ঝগড়া শুনে স্নানার্থীনি বিন্দু ঠাকরুণ একেবারে উঠোনে এসে ঢুকে পড়েছিলেন। নরেনের মুখে ছেলেকে পর করে দেয়ার কথা শুনে তিনি বলেছিলেন 'হাজার হোক্ স-ৎ-মা তো। স্ব-ধ-ম্মো যাবে কোথায়?' বিন্দুঠাকরুণের এইভাবে তাদের সাংসারিক ব্যাপারে এসে পড়া এবং গায়ে পড়ে ঐ রকম মন্তব্য করাটা তখনই নরেনের ভাল লাগে নি। সেই ভাল না লাগা থেকেই নরেনের সমস্ত চিন্তাধারা একেবারে ওলট-পালট হয়ে গেল। সারাদিন তাই ভেবে ছেলে সে একেবারে শান্ত সহজ মানুষটি হয়ে বাড়ি ফিরেছিল। তাই ছেলেকে বাড়িতে দেখতে না পেয়েও সে কোন কথা তোলে নি।

অবশ্য কথা বলার কোন পরিস্থিতিও ছিল না।

প্রথমতঃ নরেনের ছিল সকাল বেলায় বলে যাওয়া 'তোমারই একদিন কি আমারই একদিন' উক্তিটা। দ্বিতীয়তঃ নন্দরাণীর মনে ছিল প্রচণ্ড একটা ভয়। নরেন ফিরতে নন্দরাণী প্রতিদিনকার মত উঠোনে গাড়ু-গামছা এগিয়ে দিয়ে চুপ-চাপ পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। চন্দন বসে-ছিল দাওয়ায়।

হাত-পা ধুতে ধুতে নরেন বললে, 'পথে দেখলুম নীলু গোপালের সঙ্গে যাচ্ছে—'

নন্দরাণী কোন কথা বললে না।

নরেন বলে যেতে লাগল, 'নীলুকে গোপাল খুবই ভালবাসে—'

এবারেও নন্দরাণী নিরুত্তর। তবে সে বুঝতে পারল যে গোপালের সঙ্গে নীলুকে যেতে দেখে স্বামী কোনরকম অসন্তুষ্ট হয় নি।

'গোপালের মত ছেলের সঙ্গে নীলু যেখানেই যাক, আমার কোনদিন আপত্তি হবে না। আহা অমন ছেলে হাজারে একটা মেলে না। তাছাড়া গোপালের সঙ্গে মেলামেশা করলে নীলু আমার খারাপ হবে না—বরঞ্চ মানুষই হয়ে যাবে।'

নন্দরাণী তেমনিভাবেই চুপচাপা।

হাত-পা ধুয়ে গামছায় মুখ মুছতে মুছতে নরেন লক্ষ্য করলে নন্দরাণী চুপ-চাপই আছে। অর্থাৎ সকালে তার ব্যবহারটায় সে রীতিমত মর্মাহত হয়েছে এবং তারি জন্যে সে কথা বলতে পারছে না। অবশ্য বলতে পারা স্বাভাবিকও নয়। স্বাভাবিক নয় বুঝতে পেরেই তো নরেন অনেক আগে থাকতেই কথা বলতে শুরু করেছিল। কিন্তু নন্দরাণী কোনমতেই যেন সেদিক দিয়ে যেতে চায় না।

ভিজে গামছাটা নন্দরাণীর দিকে দিয়ে নরেন চটি জুতোটায় পা দিতে দিতে বললে, 'তোমার দেখছি রাগ এখনও পড়ে নি!'

এতক্ষণ বার বার নরেন কথা বলায় মনটা নন্দরাণীর খানিকটা হাল্কা হয়ে গিয়েছিল। এবারে নরেন কথা বলতেই সে বলে উঠল, 'রাগ—রাগ মনে পুষে রেখেই বা করব কি। ঘর-সংসার তো করতেই হবে—'

'সেই জন্যেই তো ওসব ঝেড়ে ফেলতে হবে মন থেকে।'

'তা আমি কি ঝেড়ে ফেলি নি!'

'হ্যাঁ নিজেদের সুখ-দুঃখ নিয়ে নিজেদেরই চলতে হবে। অন্য লোকের কথায় নিজেদের কখনো উপকার হয় না।'

নন্দরাণী বুঝতে পারল স্বামী বিপদ-ভঞ্জন বুড়ো আর বিন্দুঠাকরুণের কথাই বলছে। যাক কথাটা স্বামী শেষ পর্যন্ত ধরতে পেরেছে। ধীরে ধীরে মনটা তার আরও হাল্কা হয়ে এল এবং ক্রমশঃ স্বাভাবিকও হয়ে গেল। পরক্ষণেই গোপালের কথা নিয়ে শুরু হয়ে গেল কথাবার্তা।

নন্দরাণী বললে, 'ভাগ্যি আজ গোপাল ঠাকুরপো ছিল তাই রক্ষে—নইলে কাল যে ঠাকুরমশাই এসেছিলেন তেনারা ছেলেগুলো প্রায় মেরে ফেলত নীলুকে—'

'বল কি?'

এই প্রসংগে একটি একটি করে বিন্দুঠাকরুণের কাছ থেকে নীলুর মাছ কেড়ে নেয়ার কথা, বাঁটুল-সাঁটলের কথা প্রভৃতি এসে গেল। তার সঙ্গে সঙ্গে এল মহাযোগিনীর মহাশ্মশানের কথা, চন্দনকে নিয়ে সকালে বিরামনগরে বেড়াতে গিয়ে ঠিক দুপুরে ফেরার কথা, এমন কি সেই সব কথা দুপুরে নীলকণ্ঠ যখন ঘরের এক কোণে ঘুমোচ্ছিল তখন মায়ের বুকের কাছে শুয়ে শুয়ে চন্দনের বলার সুন্দর ভঙ্গীর কথা—সব কথাই এসে পড়ল। ইতিমধ্যে নন্দরাণী স্বামীকে কয়েকখানা রুটি আর তপসে মাছ ভাজা খেতে দিয়ে বললে, 'নীলু ধরে এনেছিল—'

'ব্যাটা খুব মাছ ধরতে পারে তো?'

'হাজার হোক বাপের ব্যাটা তো!'

নরেন হাসতে হাসতে বললে, 'আমি আর আজকাল মাছ ধরি কৈ?' তারপর চন্দনকে কাছে ডেকে নরেন একখানা মাছ

বেনারসী সিল্ক, তাঁতবস্ত্র ও ফ্যান্সী সাড়ীর অপূর্ব সমাবেশ
গিণিসোনার গহনা, রৌপ্যের বাসনাদি ও আসল গ্রহরত্ন
স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরী
২১৩, বিধান সরণী (ওনতলা) কলিঃ ৬, ফোন: ৩৪-৩৫৫২

খানিকটা খেতে তার মুখের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, 'নাও হাঁ করো।'

চন্দন বললে, 'আমি অনেক খেয়েচি বাবা।'

'তবুও খাও—আমি দিচ্ছি।'

এবার চন্দন হাঁ করল। নরেন তার মুখে মাছের টুকরোটা দিয়ে দিলে। চন্দন খেতে লাগল। নরেন স্নেহভরে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলে, 'সকালে কোথায় বেড়াতে গেসলে বাবা?'

চন্দনের জীবনে সে এক অভিনব অভিজ্ঞতা। যেমন করে দপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর মায়ের বুকের কাছে শুয়ে বিরামনগর যাবার পথে সে যা দেখেছিল তাই যেমন বর্ণনা করেছিল ঠিক সেই-ভাবেই আবার বাবাকেও বলে যেতে লাগল। সেই পরীর কথা, মোটরগাড়ির কথা বরফ কলের কথা কিছুই বাদ গেল না। রেলের কাছে গিয়েও সে রেল দেখতে পায় নি, সেজন্য তার মনে যে বেদনাটুকু জমে উঠে-ছিল সেটুকুও সে বলতে ভুলল না। সব বলা হয়ে গেলে ফিরে এল সে তার সেই আক্ষেপের জায়গায়। বাবাকে সে বললে, 'বাবা কতো বরফ কলে নষ্ট হয় দেখলুম, কিন্তু পাখোবরফওলা তিন নয়ায় আমাদের অতটুকু বরফ দেয় কেন?'

নরেন বললে, 'ওরা কিনে এনে বেচে তো!'

'আচ্ছা অতো বরফ কারা খায় বাবা?'

'ও বরফ কি আর লোকে খায়—ওসব চালানি মাছে দেয়া হয়।'

'চালানি মাছ কাকে বলে বাবা?'

'এখানকার সব মেছোঘেরীতে যে সব মাছ ধরা হয় সেই মাছ কলকাতার বাজারে পাঠানো হয়। সেই মাছ পাঠানোর নাম হচ্ছে চালান দেয়া।'

'তা মাছ পাঠাবে পাঠাবে, তাতে বরফ দেবে কেন?'

'মাছ যাতে পচে না যায়।'

পরক্ষণেই শিশু-মনে প্রশ্ন উঠল, 'তাহলে যারা মাছ কেনে তারা বরফও পায়?'

নরেন হেসে উঠে বললে, 'না না। ও বরফ কেউ নেয় না!'

'অতো বরফ কেউ নেয় না?'

'ও বরফ আঁশটে গন্ধ হয়ে যায়, নোংরা হয়ে যায় সেই জন্যে কেউ নেয় না।'

ব্যাপারটা যেন সহজ হল চন্দনের কাছে। কি ভেবে সে বলে উঠল, 'আচ্ছা বাবা আমরা যদি কলকাতায় মাছ চালান দিই তাহলে আমাদেরও বরফ দিতে হবে মাছে।'

'আমরা মাছ পাঠাবো কি করে বাবা?'

'কেন?'

'আমাদের তো মেছোঘেরী নেই—কি করে আমরা মাছ চালান দেবো কলকাতায়?'

চন্দন বললে, 'কেন বাবা আমাদের মেছোঘেরী নেই—'

'আমরা ঠিক কল-কৌশল জানতুম না—তা না হলে কিছু জমি আগে করে রাখতুম!'

'কিসের কল-কৌশল বাবা?'

নন্দরাণী স্নেহভরে তারিফ করে এবং ঈষৎ বিরক্তি প্রকাশ করে বললে, 'উঃ ছেলের জেরা দ্যাখো দিকি!'

'আহা এ ঠিক জেরা নয়', নরেন বললে, 'ও জানতে চাইছে কেন আমাদের মেছো-ঘেরী নেই। এখন ওকে বললে হয়তো ও বুঝতেই পারবে না। কিন্তু এ কথা তো সত্যি গোটা দেশে এই মেছোঘেরী নিয়ে কি না হচ্ছে। হয়তো ওরও মনে সে কথাটা উঠছে—'

চন্দন বাবার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। বাস্তবিক বাবা কত কথাই না জানে। নরেন ছেলের অনু-সন্ধিৎসু মনের ক্ষুধা মেটাবার উদ্দেশ্যে বললে, 'মেছোঘেরী করেছে তারাই বাবা—যারা নদী আর খালের বাঁধ কেটে জমিতে জল ঢুকিয়ে দিয়ে মানুষের চাষের জমি, বসতবাটি, ভিটেমাটি সব জলে ডুবিয়ে দিয়েছে।'

হ্যাঁ, ঠিক এই কথাটাই গোপালও বলছিল।

স্বর্ণশিমুলের চর থেকে নীলকণ্ঠদের নৌকোখানাকে সন্ধ্যাবেলা নিয়েই সকালের কথা মত গোপাল নীলকণ্ঠকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়েছিল। খাড়ি আর খাল বেয়ে নৌকো করে যাচ্ছিলো তারা। নীলকণ্ঠ দাঁড় টানছিল। গোপাল ছিল হালে। মাথার উপরে চিরদিনের সেই নক্ষত্রখচিত অন্ধকার আকাশ। খাড়ি আর খালের জলে তার প্রতিবিম্ব। সুমুখে তাদের দিগন্ত-বিস্তৃত মেছোঘেরীর সমুদ্র। জায়গায় জায়গায় বাঁধ আর বাঁধের বেরুনির মুখে ছোট-বড় কপাট। এখানে অধিকাংশ এলাকাই নস্করবাবুদের। এ সবের পাশ কাটিয়ে এই রাতে তাদের যেতে হবে মেছো-ঘেরীর জমি থেকে হটে যাওয়া মানুষের সাম্প্রতিক বাসস্থান নীলসোনা, কাঞ্চন-ডাঙা, চন্দ্রদ্বীপ, ইন্দ্রলপুর প্রভৃতি গ্রামে। স্বর্ণশিমুলের চর দিয়ে খাড়ি ও খালের পথ। অর্থাৎ এই জলপথ ছাড়া যাবার আর পথ নেই। আগে, মাঠের বাঁধে বাঁধে হাঁটা পথে যাওয়া যেত, কিন্তু এখন সেখানে মেছোঘেরীর জল, তাই যাবে কি করে? অবশ্য নস্করবাবুদের বাড়ির ওদিকে সরাসরি মেছোঘেরীতে নামার একটা রাস্তা আছে, কিন্তু সে ওঁদের নৌকো ছাড়া আর কারো নৌকো যেতে পারে না।

এ পথে যাবার অবিশ্যি অনেক বিপদ আছে। মেছোঘেরীর বাঁধে বা বেরুনির মুখে মুখে যেদিন থেকে আবার যুক্তফ্রন্ট সরকার হয়েছে, সেদিন থেকে পাহারা বসে গেছে মালিকদের। তারা শুধু মাছ পাহারাই দেয় না, তাছাড়াও কিছু পাহারা দেয়। লোকগুলোর কাছে সকল সময়েই বর্শা-বল্লম, লাঠি-সড়কি, এমন কি পিস্তল-বন্দুকও থাকে। রাতে যে কোন সময়ে তারা আক্রমণ করতে পারে। এ অবস্থায় তাদের আড়াল করে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

গোপাল জলের বুকে হালের চাপ দিয়ে মেছোঘেরী কি করে হল তা ধীরে ধীরে বলছিল আর নীলকণ্ঠ দাঁড় টানতে টানতে তা শুনছিল।

ঊনিশশো তিপ্পান্ন সাল। হ্যাঁ, ঊনিশশো তিপ্পান্ন সাল। ষোল-সতেরো বছর আগেকার কথা। একটা আইন নিয়ে এল সরকার। আইনটার নাম হচ্ছে জমিদারী দখল আইন। সেই আইনে পরিষ্কার ভাবে বলা ছিল, ফলের বাগান এবং জলকর অথবা মাছ চাষের জমিতে হাত দেয়া হবে না। সেদিন সরকারে যাঁরা আসীন ছিলেন তাঁরা এই জমিদার শ্রেণীরই লোক। তাছাড়া এদের হাতে রাখার জন্য বড় বড় শিল্পপতি বা একচেটিয়া পুঁজি-পতিদেরও একটা দুর্নিবার আশঙ্কা ছিল। কেন না এদের হাতে না রাখলে গ্রামীণ জনশক্তিকে তাঁরা নিজেদের পক্ষে রাখতে পারবেন না। তাই মুখে প্রগতিশীলতার তুবড়ি ফুটিয়ে এই আইনের মধ্যে এমন ফাঁক রাখলেন তাঁরা যে, মাথা পিছু পঁচাত্তর বিঘা জমি রাখার বিধান সত্ত্বেও, তারা তার চেয়ে বেশি জমি নিজেদের হাতে রাখতে পারল। অর্থাৎ পরিষ্কার ভাবে বলে দেয়া হল, হে ভূস্বামিকুল আপনারা অতঃপর আপনাদের হস্তগত সমস্ত জমিকে ফলের বাগান অথবা মৎস্য চাষের জন্য মেছোঘেরীতে রূপান্তরিত করে ফেলুন। আইনের এই প্রত্যক্ষ নির্দেশে উৎসাহিত হয়ে দেশের নার্শারীগুলি কত সংখ্যক গাছের চারা বিক্রী করেছিলেন তা খুব বিশদভাবে না জানা গেলেও—মেছোঘেরীর ব্যাপারটা কিন্তু পরিষ্কারভাবে জানা গিয়েছিল।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, রাজবংশী, বর্গক্ষত্রিয়, তিওর আর মাহিষ্য চাষীদের চাষ আর বাস ছিল এখানকার বিস্তীর্ণ কৃষি-জমিকে ঘিরে। জমিদারের কাছ থেকে জমা নিয়ে, ভাগ কবুলতি দিয়ে এই সব জমিতে চাষ আবাদ করত এই চাষীরা এবং বাস করত কোর্ষা সত্ত্বে ও শর্তে। ঘর-দোরও তৈরি করেছিল তারা। এইভাবেই বংশানুক্রমে কঠিন জীবন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে চলে আসছিল এই সব মানুষগুলির জীবনযাত্রা।

কিন্তু এই আইন সরকারে পাশ হতে না হতেই শুরু হয়ে গেল খেলা। এক-একটা এলাকায় জমি থেকে প্রথমে উচ্ছেদ

শুরু হল। উচ্ছেদের বিরুদ্ধে দু-একজন অবশ্যই রুখে দাড়ালো। পরিকল্পনা করে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারী করা হল। মানুষ সংঘবদ্ধভাবে চলাফেরা করতে পারে না। এমনিতরো অবস্থায় এল সেই বর্ষার দিন।

নদীতেও ষাঁড়াষাঁড়ির বান ডাকার দিন এল। খাল আর খাড়িগুলো জলে জলে ফুলে ফেঁপে উঠল। আকাশের বুকে কৃষ্ণ-কালো মেঘের সমারোহে ক্ষিপ্তমোক্ত বর্ষণ শুরু হল দিনে-রাতে। এই তো সুবর্ণ সুযোগ—হোক্ না কারো পৌষ মাস আর কারো সর্বনাশ! খালের শক্ত বাঁধ রাত্রির অন্ধকারে কেটে জল ঢুকিয়ে দেয়া হল মাঠে। খাড়ির মুখ নিচু করে কেটে জলের রাস্তা করে দেওয়া হল এদিকে ছুটে আসার। গ্রামের সমস্ত নিকাশীকে ঘুরিয়ে দেয়া হল এইদিকেই। জল শুধু জল, আর যেন কিছু নেই চারিদিকে। একদিকে আকাশে অবিশ্রান্ত বর্ষণ, অন্যদিকে সমস্ত জলের গতিপথকে এদিকে ঘুরিয়ে কেন্দ্রীভূত করে দেয়া—ধারণা করা যাবে না কি সে জল! উন্মত্ত জলরাশি তার সহস্র বাহু বিস্তার করে করাল দ্রংষ্ট্রা রেখায় মুখ-ব্যাদন করে যেন ছুটে এল। ডুবল ডাঙা, ডুবল জলা-জাঙ্গাল, ডুবল লোকের ঘর-বাড়ি সর্বস্ব। রাত্রির অন্ধকারে মানুষ কোথা যাবে তার ঠিক নেই। প্রাণ ভয়ে স্ত্রী-পুত্র, সন্তান-সন্ততি, সহায়-সম্বল নিয়ে মানুষ আর্তনাদ করতে করতে আশ্রয় খুঁজতে লাগল। কেউ উঠল ঘরের চালে, কেউ গাছের ডালে, রাতের মধ্যে যারা পারল তারা কোনরকমে ছুটে এল গোপালপুরের দিকে।

গোপালের মনে পড়ল সেদিন একটিমাত্র লোক—সেই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মোড়ল অজামিল মণ্ডল ছাড়া মানুষকে বাঁচাতে আর কেউ ছুটে আসে নি। মাথার ওপরে অবিশ্রান্ত বর্ষণকে উপেক্ষা করে, প্রকৃতি ও মানুষের সম্মিলিত হিংস্র অভিযানের বিরুদ্ধে একা সে তার টলমল করা বিহ্বল তরীখানি নিয়ে সংগ্রাম করে গিয়েছিল। নিজের চোখে সে দেখেছে খালের বাঁধ কাটার নৃশংসতা। শুধু তাই নয় তার নেতৃত্ব যিনি করেছিলেন তাঁকে অজামিল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিল। দিগন্তবিস্তৃত প্লাবিত জলরাশির মধ্যে মটরলঞ্চ তীরবেগে একদিক থেকে আরেকদিকে ছুটে যাচ্ছিলো। আর তাদের সেই বাঁধকাটা লোকগুলিকে উদ্ধার করে নিরাপদ ডাঙায় পৌঁছে দিচ্ছিল। লঞ্চের তীব্র সার্চলাইটে সেদিন এসবের কিছুই চাপা থাকে নি। মানুষ, গ্রামের মানুষ চোখের সামনে ভেসে যাচ্ছে, তারা আর্তনাদ করে উঠেছে তবু সেদিনকার সেই নায়কের মনে এতটুকু দয়া হয় নি। অজামিল কোনরকমে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সেই অসহায়দের উদ্ধার করেছে। পৃথিবীতে যুদ্ধ হয়, যুদ্ধের সময় মানুষ

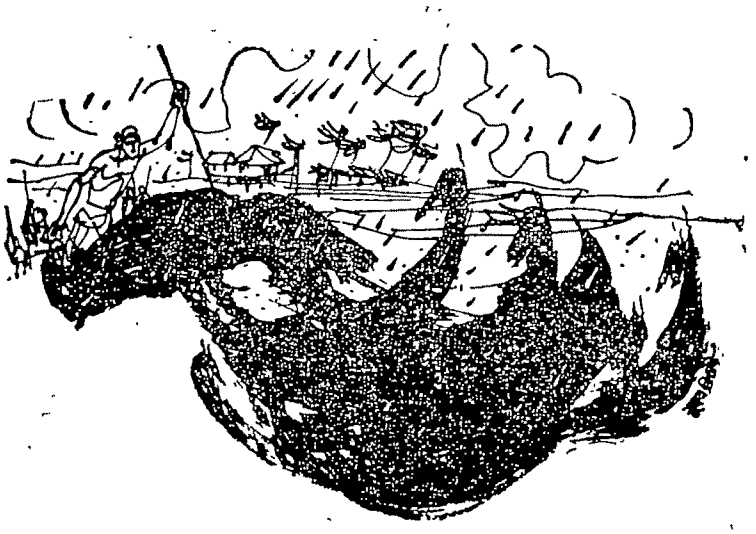

উন্মত্ত জলরাশি তার সহস্র বাহু বিস্তার করে করাল দ্রংষ্ট্রা রেখায় মুখ-ব্যাদন করে যেন ছুটে এল

সমস্ত মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলে, বর্বর হয়ে ওঠে কিন্তু একটা সভ্য দলের সাংবিধানিক শাসনের শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে এরকম বর্বরতা যে অনুষ্ঠিত হতে পারে; একথা কল্পনাতীত। অথচ এটাই ঘটে গেছে এই বাংলাদেশে। ঘটেছে শাসনযন্ত্রের প্রত্যক্ষ সহায়তায়।

কিন্তু মজা এই জলের এ জতুগৃহ সৃষ্টি করেছিল যারা তারাই এসে দাঁড়ালো পরিত্রাতা হিসাবে। সংবাদপত্র আর রেডিওয় তারপর প্রচারিত হল বন্যার ভয়াবহ সর্বগ্রাসী রূপ। মানবিকতার প্রশ্নে সাড়া দিয়ে বিবৃতি দিলেন কয়েকজন মন্ত্রী ও নেতা কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পী ও সাহিত্যিক। এবং জীবনে যাঁরা শোষক শ্রেণীর মধ্যে মহত্ত্ব ছাড়া আর কিছু দেখতে পান নি এমন কয়েকজন বুদ্ধিজীবীও বিবৃতি দিলেন কয়েকদিন ধরে।

রিলিফ এসে পৌঁছুলে নস্করবাড়িতে। জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, সার্কেল অফিসার, দারোগা-দফাদার চৌকিদার এবং নেতৃবৃন্দ সবাই মিলে রিলিফ বিলি করতে লাগলেন। প্রথমে রিলিফ পেল বাবুদের কর্মচারী, থানার টাউটের ভূতারা, বাবুদের বাড়ির বেওয়া-ঝিয়েরা, মণ্ডল-কংগ্রেসের বাবুদের চাকর-বাকরেরা! তারপর ডাকা হল তাদের, যাদের সর্বস্ব গেছে। সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা এলেন, ফটোগ্রাফার এলেন। নস্করবাবুদের কাছ থেকে বন্যার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ নিলেন, তাঁদেরই সামনে রেখে ছবি তুলে নিয়ে গেলেন প্রশংসনীয় রিলিফ কার্য সম্পর্কে। বাস্তবিক দেশের এই দুর্দিনে এ বাড়ির দেশসেবার কোন তুলনা হয় না।

সেই থেকে এই বিস্তীর্ণ এলাকা নস্করবাবুদের মেছোঘেরী। এই মেছোঘেরীর কথা বারে বারে বিরোধী দলেরা বিধানসভায় তুলেছেন। জমিদারী দখল আইনের ফাঁক দিয়ে মানুষকে মহা বিপদের মধ্যে ফেলে তাদের অসহায় অবস্থার সুযোগে স্বাভাবিকভাবে ভিটেমাটি চাটি করে এই মেছোঘেরী সৃষ্টি করা হয়েছে—অতএব এগুলির যথাযথ তদন্ত করা হোক্ কিন্তু মন্ত্রিসভা, যেহেতু তাঁদের লোকই এসবের মধ্যে জড়িত, সেই হেতু বিরোধী দলের এসব অভিযোগ 'বিদ্বেষপূর্ণ' এবং মন্ত্রীদের দলের মুখে কালিমা লেপন করবার একটা গর্হিত প্রচেষ্টা বলে উড়িয়ে দিয়েছে।

নীলকণ্ঠ সব শুনতে শুনতে বলে উঠল, 'অথচ কাকা, ব্যাপারটা কত সত্যি!'

'সত্যি বলেই লোকে আজ নড়ে উঠেছে,' গোপাল বললে, 'আর আমাদেরও কদিন খাটুনির শেষ নেই!'

'দুপুরে কি কাকা এদিকেই এসেছিলে আমাদের নৌকো নিয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'সেই দুপুরে এসেছিলে আবার এখন যাচ্ছো,' নীলকণ্ঠ অবাক হয়ে বললে, 'তাহলে তোমার খাটুনিই হচ্ছে তো খুব!'

'হ্যাঁ খাটতেই হবে কোন উপায় নেই।'

খালের ভিতর দিয়ে আসতে আসতে এবার এমন একটা জায়গায় এসে পড়ল তারা, যেখানে একটা বাঁধের সামনে ছিল একটা দেশী লক গেট। একটাই মাত্র কপাট। ওপরে প্যাঁচ দেয়া স্ক্রুর মত একটা হাতল। সেটাকে সোজা পাকে ঘোরালে কপাটটা নিচের দিকে নেমে যায় আর উল্টোদিকে ঘোরালে কপাটটা উঁচু দিকে উঠে আসে। এখানটা এমন জায়গা যে যদি এই কপাটটা তুলে এর ভেতর দিয়ে যাওয়া যায় তাহলে নীলসোনা, কাঞ্চনডাঙা চন্দ্রদ্বীপ ইদিলপুর প্রভৃতি গ্রামগুলোয় তিন ঘণ্টা আগে পৌঁছনো যাবে অর্থাৎ

প্রায় ছ'মাইল ঘুর-পথের হয়রানি থেকে তারা বাঁচবে।

গোপাল বললে, 'নীলু এইবার আমরা একটা বেয়াড়া জায়গায় এসে পড়িছি।'

'কি রকম?'

গোপাল সব খুলে বললে। তারসঙ্গে একথাও বললে, 'এই কপাট তুলে আমরা যেতে গেলেও যেমন বিপদ আছে, তেমনি আবার গেলেও কসরৎ করতে হবে প্রচুর।'

নীলকণ্ঠ মেছোঘেরী হবার পর কখনো এদিকে আসে নি। মনে পড়ে খুব ছেলে-বেলায় বাবার সঙ্গে এখানে এই মাঠে পৌষ-সংক্রান্তির সময় সে ঘুড়ি ওড়াতে আসত। ভেড়ার লোম ছাঁটার মত রিক্ত ফসল মাঠ-গুলো খাঁ খাঁ করত। ছুটে ছুটে সে ঘুড়ি ওড়াতো, কেটে গেলে ধরে আনত। সেই মাঠ এখন জলে জলময়। এখন এর কোথায় কি তা সে আদৌ জানে না। তাই সে বললে, 'খুলে বলো কাকা—আমি এদিককার কিছুই জানি না।'

গোপাল বললে, 'নৌকো থেকে নেমে আমরা যদি কপাটের ওপর উঠে হাতলটা ঘোরাতে যাই তাহলে শালারা টের পেলে প্রলয়কাণ্ড বাধিয়ে দেবে একেবারে। আবার কপাট তুলে নৌকো ভেতরে ঢোকানোও মুস্কিল, জলের তোড়ে ভেসে যাবে নৌকো—'

'তাহলে?'

গোপাল বললে, 'আমি ওপরে উঠে কপাটটা ঘরিয়ে ঘরিয়ে তুলব আর তুই তোর নৌকো-বাঁধা লগির চাড় দিয়ে নৌকোটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিবি—'

উঁহুঁ, নীলকণ্ঠ বললে, 'যাবে না কাকা। নৌকোর মুখ ঘুরে যাবে—'

'ঘুরে যাবে?' তাহলে? গোপাল বললে, 'যদি দড়িটড়ি দিয়ে ধর দড়ি নিয়ে আমি ওপরে উঠলুম তারপর কপাটের হাতলটায় দড়িটা জড়িয়ে ধরলুম। তুই থাকলি নিচে দড়িটা ধরে। আমি ওপর থেকে টানব আর তুই লগি দিয়ে ঠেলবি। ঘুরে না এতে?'

'না কাকা নৌকো জলের তোড়ে উল্টে যেতে পারে। কিম্বা আমার পায়ের তলা থেকে নৌকো পিছলে চলে যেতেও পারে। সে আরও মুস্কিলের ব্যাপার হবে', নীলকণ্ঠ তারপর কি যেন ভাবলে। এই বয়সে যে কতখানি জলের স্রোত সম্পর্কে অভিজ্ঞ তা তার পরবর্তী কথা থেকেই বোঝা গেল। সে বললে, 'কাকা ওদড়ি-টড়ি দিয়ে কিছু হবে না।' কপাটটা তোলার আগে লগিটা আমাদের শক্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে আর এমন-ভাবে পুঁততে হবে যাতে শুধু কপাটের ধাপ আর লগির মধ্যে নৌকোটাকে লম্বা-লম্বিভাবে ঢুকিয়ে দেয়া যায়। তাতে জলের তোড় যতই হোক কিচ্ছু হবে না—আমরা ঠিক ঢুকে পড়তে পারব। তবে আমরা যে-মুখো যাচ্ছি লগিটা গেটের সেইদিকেই পুঁততে হবে—কেন না এদিক-টায় জলের নিচু দিকে গতি, এই খাল তো নদীতে পড়েছে, সেজন্যে জল এদিকেই ভাঙবে।'

'এ তুই মন্দ বলিস নি।'

'আর তুমি যেই কপাটটা একটু একটু করে তুলবে ওপর থেকে আমিও অমনি নৌকোটাকে তেমনি তেমনি করে ভেতর দিকে ঢুকিয়ে দোব। তারপর আমি গলে পড়ে কপাটে চাপ দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ব। আর তুমিও কপাট নাবিয়ে দেবে। তারপর লগিটা ওদিক থেকে তুলে নিয়ে এদিক দিয়ে নেবে আসবে।'

'এই ঠিক কথা!'

এরপর শক্ত করে নীলকণ্ঠ লগিটাকে ঠিক জায়গা মত পুঁতে ফেলল। পরবর্তী কাজগুলো ঠিক ঠিকভাবে করতে গিয়ে বুক একেবারে কেঁপে উঠল যেন। বিস্তীর্ণ এলাকার অবরুদ্ধ জলরাশি একটিমাত্র পথ খোলা পেয়ে মুহূর্তের মধ্যে যেন দৈত্যের মত গর্জন করে লাফিয়ে পড়ল তার ওপরে। অবশ্য গোপাল খুব তাড়াতাড়িই কপাটটাকে তুলে ধরেছিল। কিন্তু সে যত সহজে তার কাজটা করতে পেরেছিল নীলকণ্ঠের পক্ষে তত সহজে তার কাজটা করা সম্ভব ছিল না—লগিও লক গেটের ধাপের মধ্যে পড়ে প্রাণপণে সে লগিতে চাপ দিয়েছে একধারে, অন্যদিকে সঙ্গে সঙ্গে নৌকোয় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে কপাটের বিট ধরে নৌকোকে টেনে নিয়েছে ভেতর দিকে। তারপর চিৎকার করে বলে উঠেছে, 'কাকা ফেলে দাও কপাট!'

আর ভয় নেই।

আধ মিনিটেরও কাজ নয় কিন্তু কি কঠিন পরিশ্রম করতে হল নীলকণ্ঠকে তা সেও যেমন বুঝল, তেমনি বুঝল গোপালও। গোপাল লগিটা তুলে নিয়ে এসে যখন নৌকোয় নামল তখন সে নীলকণ্ঠের প্রতি মমতায় বলে উঠল, 'খুব কষ্ট হল, না রে?'

নীলকণ্ঠ হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'উঃ জলের কি তোড় কাকা!'

'এ শুধু তুই ছিলি বলে আমি এদিক দিয়ে এলুম,' গোপাল বললে, 'ফেরার পথে কোন কোন দিন আমি এদিক দিয়ে ফিরেছি কিন্তু যাবার সময় কোনদিনও যাই নি।'

নীলকণ্ঠ বললে, 'কাকা তুমি এবার দাঁড়ে যাও—আমি হালে বসি। হাড় একে-বারে হিম করে দিয়েছে ব্যাটা জল।'

'সত্যি,' গোপাল বললে, 'যা তুই আমি দাঁড় টানছি।'

'তবু কাকা জষ্টি মাসের জল—বর্ষার জল নয়।'

'বর্ষার জল হলে আর পারা যেত না।'

'অসম্ভব।'

মেছোঘেরীর অভিজ্ঞতা নীলকণ্ঠের ছিল না। হালে বসে চারিদিকটায় একবার সে তাকালো। ধূ-ধূ করা বিস্তীর্ণ জল-রাশি। গত রাতে মহাযোগিনীর শ্মশান থেকে ফেরার পথে নদীর যে কূল দেখতে পেয়েছিল কিন্তু এখানে যেন কূল-কিনারা কিছু নেই—শুধু জল আর জল। এই জলের ওপরে এখানে-সেখানে দূরে-দূরান্তরে অসংখ্য জোনাকির মত আলো। এখানে-সেখানে কেমন যেন একটা একটানা চড়বড় করে শব্দ। নীলকণ্ঠ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল গোপালকে, 'কাকা অতো আলোই বা কিসের আর শব্দই বা কিসের বল তো?'

গোপাল বললে, 'আস্তে কথা বল্।' তার একথার অর্থ তখনই বোঝা গেল। হঠাৎ দূর থেকে হাঁক দিলে কে, 'কা-রা যা-য় গো-ও-ও-ও-ও!'

গোপাল বললে, 'এই রে শালারা টের পেয়েছে—'

'কিন্তু এদিকে তো ওদের কেউ ছিল না।'

'হ্যাঁ সেজন্যেই ভাবলুম নিরাপদেই যাওয়া যাবে। তাছাড়া আমার মনে হয়েছিল রাতে আর কে এদিক দিয়ে যাবে মনে করে হয় তো ওরা এদিকে কোন নজর রাখবে না কিন্তু এখন দেখছি শালারা—'

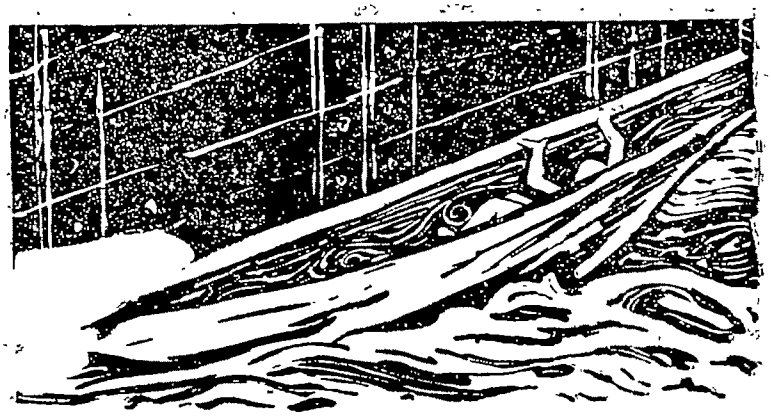

—নৌকোয় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে কপাটের বিট ধরে নৌকোকে টেনে নিয়েছে ভেতর দিকে

আবার হাঁক শোনা গেল, 'কা-রা-গো-ও-ও-ও?'

কি করবে গোপাল একটু যেন চিন্তা করে নিল। অন্যসব দিকে যেসব আলো জ্বলছিল—তাদের মধ্যে থেকে কে একজন বলে উঠল, 'কে গো?' গোপাল বুঝলে এই হাঁক দেয়ার জবাব না দিলে এখনই চারিদিকে হাঁকাহাঁকি শুরু হয়ে যাবে এবং তারপর সকলেই চারদিক থেকে তাদের দিকে ছুটে আসবে আর তাতে বিপদ বাড়বে বৈ কমবে না। তাই সেই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত করে নিয়ে সে জবাব দিলে, 'আ-ম-রা গো-ও-ও-ও-ও!'

'তো-ম-রা কা-রা-আ-আ-আ?'

'রা-হী-ই-ই-ই-ই।'

'থামো—থা-মো-ও-ও-ও?'

'আ ছ-...-গো-ত্তা।'

নীলকণ্ঠ অবাক হয়ে এখানকার রীতিনীতি বোঝবার চেষ্টা করতে লাগল এবং জিজ্ঞাসা করল, 'কাকা ওরা এক্ষুণি আসবে—'

'হ্যাঁ।'

'কি বলবে?'

বলব ইদিলপুর থেকে আসছিলুম—খালের বুক থেকে কখন পথ হারিয়ে এদিকে ঢুকে পড়েছি।'

হ্যাঁ, এ যুক্তির মার নেই। নীলকণ্ঠ ভয় না পেলেও একটা উৎকণ্ঠার ভাব তার মনে সৃষ্টি হয়েছিল। সেটা যেন খানিকটা কেটে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই দেখা গেল অন্ধকারের বুক চিরে একখানা নৌকো জলে শব্দ তুলে তীর বেগে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। মাঝে-মাঝে ঘট্‌ঘট্ করে একটা শব্দও হচ্ছে। ওদিকে পূর্বের সেই এক-টানা চড়বড় করা শব্দ ঠিক সেইভাবেই শোনা যাচ্ছে। জ্যৈষ্ঠ দিনের প্রচণ্ড সূর্য কিরণে এই বিস্তীর্ণ জলরাশি উত্তপ্ত হয়ে উঠে ছিল—তারই উষ্ণতা জলের বুকে নৌকোর ওপরেই বেশ অনুভব হচ্ছিল। নীলকণ্ঠ ভাবল, এ তো এক অদ্ভুত জগৎ।

বাস্তবিকই অদ্ভুত জগৎ।

তীরবেগে নৌকোখানা এসে আর অপেক্ষা করল না—সঙ্গে সঙ্গে জনতিনেক ষণ্ডা ষণ্ডা লোক লাফিয়ে তাদের নৌকোয় এসে পড়ল। নৌকোখানা প্রবল ঝাঁকুনি খেয়ে দুলে উঠল। তিনজন লোকেরই হাতে অস্ত্র—একজনের হাতে বল্লম, এক-জনের হাতে মাছ মারা সড়কি, তৃতীয় ব্যক্তির হাতে বন্দুক। প্রায় সমস্বরেই তারা বলে উঠল, 'কোত্থেকে আসছ?'

গোপাল দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'ইদিল-পুর থেকে—'

বল্লম হাতে লোকটা বললে, 'যাবে কোথায়?'

'স্বর্ণশিমুলের চরে—'

'তারপর...?'

'বিরামনগরে।'

'ও এদিকে এলে কি করে—'

সঙ্গে সঙ্গে জনতিনেক ষণ্ডা ষণ্ডা লোক লাফিয়ে তাদের নৌকোয় এসে পড়ল।

'খাল দিয়ে আসতে আসতে ভাই—'

বন্দুকওয়ালা লোকটা বললে, 'এখন তো তোমাদের তাহলে অনেকটা ঘুরতে হবে।'

'কিন্তু করব কি—উপায় তো নেই।'

লোকগুলো বিশ্বাস করল গোপালের কথাগুলো। নীলকণ্ঠ সত্যিই অবাক। এ জঙ্গল সম্বন্ধে বাইরের মানুষ বোধ হয় কেউ কিছুই জানে না। ওদের দেখামাত্র মনে হবে, সভ্যজগতের কোন আইন-কানুনই এখানে চলে না। দেশের অভ্যন্তরে এ যেন আরেক রাজ্য। এ রাজ্যে বল্লম, সড়কি, বন্দুকই মুখ্য। এখানে এই রাতে দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশির বুকে ঐ লোকগুলো যদি তাদের মেরে ফেলে দেয় জলে তাহলে কে আর খোঁজ পাবে তাদের? হয়তো এই মেছোঘেরীর জলে ভাসতে ভাসতে তাদের মৃতদেহগুলো ঘুরে বেড়াবে। আর শকুনের দল সেই মৃতদেহগুলোর ওপরে বসে বসে তাদের ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে খাবে। এখানে শাসন নেই, পুলিশ নেই, নেই কোন আদালত কিম্বা কোন গভর্নমেণ্ট। মেছোঘেরীতে বোধ করি নস্করবাবুরাই সম্রাট, তারাই এখানে রাজত্ব করে, তাদের আইনই এখানে আইন এবং এখানকার প্রচ-লিত শাসন।

লোকগুলো তিনজনেই নিজেদের নৌকোয় চলে গেল। বন্দুকধারী লোকটা বললে, 'সোজা পশ্চিমদিকে চলে যাও—গিয়ে দেখবে বাঁধের পাশে প্রকাণ্ড একটা অশ্বত্থ গাছ। সেই গাছের কাছাকাছি একটা গাঁথুনি আছে, তার ওপর বাতা দেরা আছে। খালের জোয়ারের সময় বোধ হয় তোমরা এসেছিলে তাই বাতাটা তোমরা বুঝতে পারো নি—এখন ভাঁটা, কাজেই সেখানে নৌকো তোমাদের টেনে টেনে বের করতে হবে।'

জায়গাটা গোপাল জানে। তাই সে বললে, 'মনে হচ্ছে এইরকম একটাই ভুল হয়েছিল, যাই হোক তোমরা বলে দিলে বড় উপকার করলে ভাই—'

লোকগুলো যেমন তীরবেগে এসেছিল, তেমনি তীরবেগেই আবার চলে গেল।

নীলকণ্ঠ বললে, 'খুব বেঁচে গেছি আমরা—'

'বলতে', গোপাল বললে, 'নে শক্ত করে হাল ধর—আমি দাঁড় টানি জোরে জোরে।'

নৌকোর নিচে মাঝে মাঝে খটাখট করে শব্দ হতে লাগল। নীলকণ্ঠ জিজ্ঞাসা করলে, 'কি বল দিকি কাকা।'

'জলের নিচে সব বাড়-বাতা বাঁধা আছে।'

'ও! কিন্তু ও চড়বড় করে কি এক-টানা শব্দ হচ্ছে বল দিকি মাছ লাফানোর মত?'

'ও মাছই লাফাচ্ছে।'

'মাছ?'

'হ্যাঁ। দিনমানে সব মাছ ধরে চার-দিকে চারটে লগি পুঁতে টানা জাল বেঁধে তার মধ্যে মাছগুলো জীইয়ে রেখেছে। ভোরবেলা সব টাট্‌কা তাজা মাছ চালান দেবে কলকাতায়'—

'ও', সবিস্ময়ে নীলকণ্ঠ এরপর বললে, 'সবি যাবে কলকাতায়?'

'না, অন্য জায়গায়ও যাবে', গোপাল বললে, 'দেখিস না গোপালপুরে থানার ওদিকে ঝুড়ি-টুকড়ি আর বরফ কল। ঐ বরফ দিয়ে মাছ যাবে সব শেয়ালদা, পাতিপুকুর, দমদম—সেখান থেকে যাবে আবার জেলায় জেলায়—'

মানুষ যখন ঐ মাছ খায় তখন তারা হয়তো জানে না মানুষের কতখানি চোখের জলে ঐ মাছ চাষ হয়েছে এই মেছোঘেরীতে।

উৎকণ্ঠা, ভয় ও বিস্ময়ের জগৎ পার হয়ে নীলকণ্ঠ ও গোপাল খালে পড়ল। খালে পড়েই গোপাল জোরে জোরে দাঁড় টানতে লাগল। খালের দু'পাশে অসংখ্য গাছ। অন্ধকারে পাহাড়ের মত যেন দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়ের শব্দে গাছের ঘুমন্ত পাখিগুলো বোধকরি ভয় পাচ্ছিল, তাদের ডানার ঝাপটায় সে ভয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠছিল।

নীলকণ্ঠ জিজ্ঞাসা করলে, 'কাকা আর কদ্দুর আছে?'

গোপাল দাঁড়টা তুলে পিছন দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে। তারপর বললে, 'আর একটুখানি—ঐ যে সব মিট্ মিট্ করছে আলোগুলো, ঐখানে আমাদের যেতে হবে। প্রায় আমরা এসে পড়েছি।

নীলকণ্ঠ ভাল করে দেখল আলোগুলো। এত কাছে তাদের লক্ষ্যস্থল! আনন্দে আর উত্তেজনায় মনটা তার ভরে উঠল। সেই মন এরপর প্লাবিত নদীর মত দুকূল উপচে গেল যখন কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা পৌঁছল নীলসোনা গ্রামের কোলে।

সবে নৌকোখানা ঠেকেছে কি না ঠেকেছে গ্রামের মাটিতে, শত শত মানুষ, হাতে তাদের পাঁকাটির তাড়া দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। খালের জলে পড়ল তার রক্তরাঙা দীপ্তি। লালে লাল হয়ে গেল রাত্রির অন্ধকার আর সমগ্র পরিবেশটা। আনন্দে মানুষগুলি ঘোষণা করে উঠল, ক্ষেত-খামারে জোট বাঁধার সংকল্প, বাপ-চোদ্দপুরুষের হৃত জমি উদ্ধার করার দুর্নিবার আগ্রহ।

গোপালকাকাকে ও তাকে নৌকো থেকে নামিয়ে সমস্ত জনতা তাদের নিয়ে যেতে লাগল যেন রাজার মত। জোয়ান জোয়ান ছেলে সব কাঁধে লাঠিতে বাঁধা কাণ্ডা তাদের সামনে রেখে সারি দিয়ে তারা চলতে লাগল। কারো হাতে লণ্ঠন, কারো হাতে পাঁকাটির মশাল। আকাশ-বাতাস মুখরিত করে ধ্বনি দিতে দিতে তারা চলতে লাগল। এ যেন যুগ-যুগান্তের অন্ধকার পাতালপুরী থেকে উঠে পৃথিবীর সুপ্রশস্ত পথে মানুষের মহাযাত্রা।

একটা বিরাট মাঠের মধ্যে মায়াপুরীর মত জ্বলে উঠেছে আলো। পত্ পত্ করে উড়ছে অসংখ্য পতাকা। অগণিত লোক বসে আছে সেই মাঠে। ওরা নিশ্চয়ই প্রতীক্ষা করছে গোপালকাকার আসার।

পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো এক প্রৌঢ়। মাথায় তার জটা, আলগা গা, রংটা তামাটে। দাঁতগুলো কালো। চেহারাটা লম্বাটে। সে বললে, 'গোপালদা নিশ্চয়ই মেছোঘেরীর মধ্যে দিয়ে এসেছেন—'

'হ্যাঁ', গোপাল বললে, 'তা নইলে এত তাড়াতাড়ি আসব কি করে?'

'আমিও তাই ভাবছিলুম', লোকটি বললে।

গোপাল বললে, 'এদিক দিয়ে আসাই যেত না যদি না এই ছেলেটি থাকত। মেছোঘেরীর কপাটের ভেতর দিয়ে আসা কি সোজা!'

লোকটি বললে, 'তাই তো!'

নীলকণ্ঠর বুকখানা ধক্ করে উঠল। মেছোঘেরীর কপাটের নিচে দিয়ে আসাটা তার শুধু যে কাকা নিজেই তারিফ করেছে তা নয়—কাকা সেকথা সমস্ত লোককে পর্যন্ত জানিয়ে দিলে। বাস্তবিক কাকা যে তাকে কতখানি ভালবাসে এই কথাই তার প্রমাণ। লজ্জায় নীলকণ্ঠ কেমন যেন একটু ম্রিয়মাণ হয়ে গেল।

সেই জটাধারী লোকটা এরপর জিজ্ঞাসা করল, 'ছেলেটি কে গোপালদা?'

'ভাইপো।'

'ভাইপো' লোকটি কেমন যেন একটু বিস্মিত হল। সকলেই তো জানে তিনকুলে গোপালের এক মা ছাড়া আর কেউ নেই—এ ভাইপো তার এল কোত্থেকে? শুধু লোকটিই যে বিস্মিত হয়েছিল তা নয়—বিস্মিত হয়েছিল নীলকণ্ঠও। কাকা তাকে সত্যিই 'ভাইপো' বলে মনে করে।

একটা মাটির ঘরের দাওয়ায় তাদের বসার জায়গা হয়েছিল। আগে থাকতে অনেকেই সেখানে বসেছিল। গোপাল ও নীলকণ্ঠ সেখানে পৌঁছুতেই সকলে জায়গা করে দিলে।

কেউ কেউ বলে উঠল, 'আসতে খুব কষ্ট হয়েছে আপনার?'

'এ আর কি কষ্ট। আরও কষ্ট আমাদের সামনে—'

সেই জটাধারী লোকটা এবার বলে উঠল, 'আর দেরি নয়, মাঠে লোক থুক্ করছে। আপনাদের যা আলোচনা করার আছে তা শেষ করে ফেলুন—'

গোপাল সময় নষ্ট করার লোক নয়। সে বললে, 'অজামিলদা ঠিক কথা বলেছেন।'

নীলকণ্ঠ এবার ভাল করে জটাধারী লোকটিকে তাকিয়ে দেখল। এঁরই নাম অজামিল মণ্ডল। সেই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতা—যিনি সেই রাতে বাঁধ কাটিয়ে দেওয়ার পর একা নৌকো নিয়ে মানুষ বাঁচাতে ছুটেছিলেন। যিনি দেখেছিলেন ভাস্করবাবুদের লঞ্চে করে বাঁধ-কাটা লোকদের নিয়ে যেতে, সেই সর্বগ্রাসী বন্যার রাতে যিনি দেখেছিলেন ওদের লঞ্চের সার্চলাইটের আলোয়—মানুষ ভেসে যাচ্ছে তবু তাকে ওরা তোলবার এতটুকু চেষ্টা করে নি! গভীর শ্রদ্ধায় লোকটির প্রতি নীলকণ্ঠ মনে মনে প্রণাম জানালো! এতক্ষণ লোকটিকে না চিনে সে কি ভুলই করেছে! কেমন একটা অস্বস্তিকর যন্ত্রণা যেন তার মনের এক-প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ঘুরে বড়াতে লাগল।

'হ্যাঁ আরম্ভ করা হোক্ না' বললে আর সকলে।

শুধু নীলসোনা নয়—কাঞ্চনডাঙা, চন্দ্রদ্বীপ, ইদিলপুর, চারখানা গ্রামেরই প্রতিনিধি এসেছিলো সেখানে। কাঞ্চনডাঙার যুধিষ্ঠির নেয়ে বললে, 'সভাপতি করো—'

চন্দ্রদ্বীপের সনাতন খেলো বললে, 'নীলসোনা গাঁয়ে মিটিন হচ্ছে, এ গাঁয়ের মেম্বরই সভাপতি হবে।

ইদিলপুরের উত্তম নস্কর বললে, 'ঠিক কথাই তো। আমি প্রস্তাব করছি আজকে আমাদের চার গেরামের এই সভায় আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র অজামিল মণ্ডল মশাই সভাপতিত্ব করবেন।'

সনাতন খেলো বললে, 'আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করছি।'

যথারীতি সভা শুরু হয়ে গেল। অনেক বাগবিতণ্ডা, তর্ক-বিতর্কের মধ্যে দিয়ে স্থির হল সাত দিনের মধ্যে গোপালপুরে একটা জনসভা হবে আর তার অন্ততঃ দু দিন আগে যাতে মেছোঘেরীতে যে যে জমিতে চাষ-আবাদ করত তা ফেরৎ দেয়ার জন্যে মন্ত্রীদের কাছে একবার আবেদন জানাতে হবে। এই দুটি কাজকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হল এবং সে কমিটিতে রইলেন নীলসোনা থেকে অজামিল মণ্ডল, কাঞ্চনডাঙা থেকে যুধিষ্ঠির নেয়ে, চন্দ্রদ্বীপ থেকে সনাতন খেলো, ইদিলপুর থেকে উত্তম-নস্কর আর এই কমিটিকে পরিচালনা করবেন এখানকার সবচেয়ে আপনজন রাজবংশীয় ঘরের ছেলে গোপাল মিস্ত্রে।

বেটার দ্যান বেস্ট
এম, পি, ট্রান্সপোর্ট
এজেন্সী
শালিমার-কোল ডিপো
হাওড়া

অজামিল মণ্ডলের ভাষায় মাঠে প্রতীক্ষারত থক্ থক্ করা জনসভায় এই সিদ্ধান্তই ঘোষণা করা হল, জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা তুলে।

তারপর সেই ফেরার পথ। রাত তখন প্রায় তৃতীয় প্রহর। শুক্লপক্ষের চাঁদ প্রথম রাতেই অস্ত গিয়েছিল। কাজেই অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে। সকলের ভালবাসাকে পাথেয় করে আবার তাদের যাত্রা শুরু হল।

গোপাল বললে, 'সব বুঝতে পারলি তো নীলু?'

'হ্যাঁ কাকা।'

'তাহলে লেগে পড় কাল থেকে।'

'লিখতে পারবি তো?'

'কি লেখা।'

'ঐ দেয়ালে যে পোস্টার মারা হয় সেই লেখা।'

'কেন পারব না। তোমাদের যা লেখা দেয়ালে আঁটা হয় আমি বরঞ্চ তার চেয়ে ভাল লেখাই লিখতে পারব।'

'বেশ এখন হালটা ধর তুই—আমি জোরে জোরে দাঁড় টেনে যাই—'

সেদিনের সেই নৈশ অভিযান সেরে নীলকণ্ঠ যখন বাড়ি ফিরেছিল রাত তখন প্রায় ভোর। গোপাল-কাকা তাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে চলে গিয়েছিল। নীলকণ্ঠ তারপর দাওয়ার এককোণ থেকে হোগলা কাঠির বোনা মাদুরখানা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়েছিল এবং রাত্রির সেই অক্লান্ত পরিশ্রমের পর স্বাভাবিকভাবে ঘুমিয়েও পড়েছিল।

সকালে স্বামীর কারখানায় যাওয়ার রান্না করতে উঠে নন্দরাণী ঐভাবে ছেলেকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে একবারে হায় হায় করে উঠল। ওমা কি লজ্জার কথা। কি ঘেন্নার কথা! ছেলে দাওয়ায় পড়ে সারারাত ঘুমুলো আর সে কিনা স্বামীর সঙ্গে সেই সময়ে ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে রইল। এ যেন ভাবতেও লজ্জায় তার মাথা কাটা গেল! তাড়াতাড়ি সে ঘরে গিয়ে স্বামীকে ডাকলে, 'ওগো শুনছো!'

নরেন চোখ মেলে বললে, 'কি?'

'ওঠ দেখি।'

'কেন।'

'উঠে দ্যাখো দিকি ছেলের কাণ্ড—'

'কি কাণ্ড', ধড়মড়িয়ে এবার উঠে বসল নরেন।

নন্দরাণী বললে 'বাইরে এসো শিগ্‌গির!'

নরেন নন্দরাণীর সঙ্গে বাইরে এসে দেখল, দাওয়ায় মাদুরের ওপর নীলকণ্ঠ অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু এই দৃশ্যটাতে নরেনকে ঘুম থেকে তুলে এনে দেখাবার মত কি আছে! জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নরেন স্ত্রীর দিকে তাকালো। নন্দরাণী যন্ত্রণা-কাতরভাবে বলে উঠল, 'কখন এসেছে—ডাকে নি পর্যন্ত ছেলে!'

'ডাকলে তো ল্যাঠা চুকেই যেত!'

'কিন্তু কি লজ্জার কথা বল দিকি!'

'এতে লজ্জার কি আছে?'

'লজ্জার কিছু নেই—আমি যে সৎমা—'

'তা তুমি তো আর ওকে ওখানে শুয়ে থাকতে বাধ্য করো নি?'

'তা না করলেও—বাছার মনে তো লাগবে। মা-বাবা কেউ একবার তার খোঁজ পর্যন্ত নিলে না। ঘরে খিল দিয়ে ঘুমিয়ে রইল! তাছাড়া লোকেই বা কি বলবে শুনলে?'

'হুঁ', নরেন কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর বললে, 'যে ছেলে নিশা-চরের মত সমস্ত পৃথিবী ঘুরে বেড়াবে, সে কখন বাড়ি ফিরবে, মা-বাবা আ জানবে কি করে?'

'কথাটা ঠিকই কিন্তু—'

'তুমি সৎমা, তোমার ভয় লোকনিন্দের—এই তো?'

'তাই তো!'

এই তব শুভ আশীর্বাদ !

প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে গান্ধিজী কথাপ্রসঙ্গে প্রিয় শিষ্য শ্রীসতীশ দাশগুপ্তকে বলেছিলেন, তাঁর বড় ইচ্ছে যে একটি সত্যিকারের ভালো স্বদেশী কালি তৈরী হয়। দেশের মুক্তি আন্দোলনে আত্মনিবেদিত দুই তরুণ "মৈত্র" ভ্রাতা তখন সবে জেল থেকে বেরিয়েছেন। সতীশ বাবু তাঁদের দুজনকে ডেকে এই মহৎ কাজের ভার দেন। সহায় সম্পদ বলতে তেমন কিছুই নেই, তবু শুধু নিষ্ঠা এবং দেশপ্রেম সম্বল করেই, তাঁরা দুজন এই দুঃসাধ্য ব্রতের ভার মাথায় তুলে নেন। আজকের বিশ্ববিখ্যাত সুলেখা ফাউন্টেন পেন কালির এই হল গোড়ার কথা।

সুলেখার আজ যে এই সুনাম ও সমাদর, এটা গ'ড়ে উঠতে যথেষ্ট সময় লেগেছে। বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম ক'রে, নিরলস গবেষণা, কর্মীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা এবং জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও সমর্থনে এই বিপুল সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে।

যাঁর প্রেরণা ও আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু, সেই জাতির জনকের পুণ্য জন্মশতবর্ষে, তাঁর উদ্দেশ্যে বিনত নমস্কারে নিবেদন করি আমাদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড, সুলেখা পার্ক, কলিকাতা৩২

Progressive/SW-46

'কিন্তু তুমি কি ওকে স্নেহ করো না, তুমি কি ওকে ভালবাস না?'

'স্নেহ করি, ভালবাসি বলেই তো আমার এত ভয়। লোকে যে সেটুকুও বুঝবে না।'

'নাই বা বুঝল, যাকে ভালবাসো সে তো বুঝতে পারে—'

'হ্যাঁ তা পারে।'

'তবে—ছেড়ে দাও ওসব কথা।'

পরক্ষণেই নন্দরাণী বলে উঠল, 'যাক্ এখন ওকে আমি ঘরে শোয়ার ব্যবস্থা করে দিই—'

'না-না-না', নরেন বলে উঠল, 'দিব্যি অঘোরে ঘুমুচ্ছে। ডাকলেই উঠে পড়বে, তারপর হয় ত' আর শোবে না', বলে নরেন স্ত্রীর দিকে পরিস্থিতি বিশ্লেষণের যথার্থতা তার বোধগম্য হল কিনা সেটুকু বোঝবার চেষ্টা করল। তারপর বললে, 'জানো তো কেমন লোকের সঙ্গে রাতে বেরিয়েছিল—'

'হ্যাঁ সে একটা কথা বটে। প্রসঙ্গত ডাকসাইটে গোপালের কথা তাদের মনে পড়ে গেল। গোপাল—অদ্ভুত ছেলে ঐ গোপাল। এই বয়সের মধ্যে পাঁচ-ছবার জেল খেটেছে। এক বছর আগে এখানে তেভাগার আন্দোলন হ'ল। শত শত ভাগ-চাষীর সঙ্গে তাকেও পুলিশ কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে গেল ধান চুরির মিথ্যা অভিযোগে। কিন্তু সেজন্যে তার মনে এতটুকু দুঃখ দেখা গেল না। দেখা গেল না কোন বেদনা কিম্বা লজ্জা। সকলের সঙ্গে সঙ্গে হাসতে হাসতেই সে নস্করবাবুদের বাড়ির সামনে দিয়ে চলে গেল। সেই ঘটনা নিয়ে নস্করবাবুদের কত উপহাস। ওঁদের বাড়ির ছেলে ভাস্করবাবু—যিনি নস্করবাবুদের বাড়ির যুবরাজ—তিনি কত কথাই না বলে বেড়ালেন লোকের কাছে। একটি কথা তাঁর সকলের মনে আছে। সে কথাটি হচ্ছে লেখাপড়া শিখে যে লোকে এমন অমানুষ হয় তা এই গ্রামে আমরা গোপালকে দেখে তা বুঝলুম।' বস্তুত গোপাল লেখাপড়া শিখেছিল খুবই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী ছিল তার কিন্তু কেমন করে যে চাষী-বাসীদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল তা সে নিজেও হয়তো ভাল করে জানত না। লোকের অভাব-অভিযোগের প্রতীকার করার দাবি নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশ সে দরিদ্র চাষীদের কাছে আশা ও ভরসার পাত্র হয়ে দাঁড়ায়। তারপর কৃষক-সমিতি ইত্যাদি গড়ে তুলে তার মাধ্যমে সে কাজ শুরু করে। এই তো ক'বছর আগে গ্রামে যখন প্রচণ্ড অকাল দেখা দিয়েছিল লোকে যখন খেতে পাচ্ছিল না, তখন নস্করবাবুদের গোলাবাড়িতে হাজারখানেক মড়ই ইয়ে ধান ভর্তি ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা লোককে একদানা দেয় নি। উপরন্তু নিজেদের বাড়িতে মন্ত্রী ছিল বলে সে ধানকে পাহারা দেবার জন্য সশস্ত্র পুলিশ নিয়োগের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং যে-কোন মুহূর্তে সেখানে শান্তি-ভঙ্গ হতে পারে বলে একশো চুয়াল্লিশও জারী করতেও ছাড়েন নি। সেই সে বছরে, বছরটা ছিল যতদূর স্মরণে পড়ে ইংরেজী উনষাট সাল—সেই বছরে এখানকার হাজার হাজার কৃষককে নিয়ে গোপাল কলকাতা গিয়েছিল খাদ্যের দাবিতে কিন্তু সেখানে এমন বীভৎস অত্যাচার করেছিল তৎকালীন সরকার যা মনে হলে এখনও বুক কেঁপে ওঠে। কতকগুলো লোক তো আর গ্রামে ফিরলই না। আর গোপাল এমনভাবে আহত হল যে হাসপাতাল থেকে মাস তিনেকের আগে মুক্তি পেল না। হাত-পায়ে প্লাস্টার করা, মাথায় ব্যাণ্ডেজ করা অবস্থায় দিনের পর দিন তাকে থাকতে হয়েছিল হাসপাতালে। প্রতিদিন গ্রামের শত শত লোক টিকিট খরচ করে কলকাতার হাসপাতালে দেখে আসত তাকে। নরেন ও নন্দরাণী—তারাও একদিন দেখে এসেছিল সকলের মত। এখানকার মানুষের একান্ত ভালবাসার আর শ্রদ্ধার পাত্র এই গোপাল—মনে পড়ে এই গোপালের জন্য তুলসীতলায় পিদিম দিতে গিয়েও মেয়েরা তার সেরে ওঠার জন্য প্রার্থনা জানাতো। নন্দরাণীও এ কর্তব্য পালন করতে ভোলে নি কোনদিন। কাজেই এইরকম দৃঢ় চরিত্র, কর্মঠ মানুষের সঙ্গে যখন নীলকণ্ঠ রাতে গিয়েছিল তখন নিশ্চয়ই সে বসেছিল না বরং বলা যেতে পারে খাটুনি তার যৎপরোনাস্তিই হয়েছিল। তাই স্বামী যখন ইংগিত করল গোপাল সম্পর্কে তখন যুগপৎ নন্দরাণীর মনে হল, পরিশ্রান্ত হয়ে সে যেমন ঘুমোচ্ছে, তেমনিই আবার ঘুম ভেঙে গেলে হয়তো কোন পরিশ্রমের কাজ করতেই ছুটে যাবে। তার চেয়ে ঘুমোচ্ছে ঘুমুক।

এরপর নন্দরাণী উনুনে আগুন দিতে যাবার উদ্দেশ্যে পা বাড়ালো। নরেন বললে, 'কোথায় চললে?'

'আগুন দিতে হবে না উনুনে?'

'নাই বা দিলে' বলে নরেন ঘুমন্ত নীলকণ্ঠের মাদুরে বসে পড়ে বললে, 'ছেলেটা রোজ আমার কাছ থেকে তো পালিয়ে পালিয়েই থাকে। তাছাড়া আজ শরীরটাও যেন কেমন ম্যাজ ম্যাজ করছে আমার—'

নন্দরাণী মনে মনে ভারি তৃপ্তি অনুভব করল এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর চাতুরিটাও সে ধরে ফেলল। মেয়েরা স্বামীকে আড়াল করে সন্তানের প্রতি মমতা ঢেলে দিলে, স্বামীরা মেয়েদের মাতৃত্বগৌরবের প্রতি কপট কটাক্ষ করতে ছাড়ে না কিন্তু পুরুষেরাও যে স্ত্রীকে আড়াল করে সন্তানের প্রতি একই ভাবে মমতা ঢেলে দেয় এবং সেইটাই তাদের পিতৃত্ব গৌরব, নরেনের এই পিতৃত্ব গৌরবের প্রতি কপট কটাক্ষ করবার এমন একটা সুযোগ পাওয়া গেছে তখন সে তা ছেড়ে দেবে কেন? তাই নন্দরাণী বললে, 'গা ম্যাজ ম্যাজ করছে বলছ কেন—আসল কথাটা তো বলেই ফেলেছ!'

নরেন হেসে উঠল। নন্দরাণীও পরম তৃপ্তি সহকারে সে হাসিতে যোগ দিলে।

ওদিকে বাবা ও মা'র হাসি কানে যেতে চন্দন উঠে পড়েছিল। সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে একেবারে বাবার কোলের কাছে বসে পড়ে বললে, 'দাদা এখানে শুয়ে কেন বাবা?'

'ঘুমুচ্ছে।'

'এখানে কেন?'

'রাতে ফিরে আর ডাকে নি কারোকে।'

'ডাকব—দাদা ঘরে শোবে?'

'না না।'

ইতিমধ্যে চন্দনের সাড়া পেয়ে নীলকণ্ঠর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সে নড়েচড়ে পাশ ফিরে শুয়ে সেকথা বুঝিয়ে দিলে। হয়তো সে উঠেই বসত কিন্তু বাবাকে পাশে বসে থাকতে অনুভব করে সে যেন কেমন চিন্তিত হয়ে পড়ল। চন্দন দাদাকে নড়েচড়ে শুতে দেখে বুঝতে পেরেছিল যে দাদার ঘুম নিশ্চয়ই ভেঙে গেছে। সে তাড়াতাড়ি বাবার কাছ থেকে দাদার মুখের কাছে এগিয়ে এল। তারপর তার চোখের পাতাদুটো দু'হাতে ধরে খুলতে গেল—

বাবা ধমক দিয়ে উঠল, 'ও কি রে!'

বাবা ধমক দিলে কি হবে, চন্দন প্রথমটায় থত মত খেয়ে গেল বটে কিন্তু দাদার চোখের পাতা খুলতেই দাদা চোখ পিট্ পিট্ করে উঠেছিল, তাই দেখে সে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠে বললে, 'দাদা জেগে রয়েছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ বাবা।'

নীলকণ্ঠ ভাইকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'তুই তো আমার ঘুমটা ভাঙালি!'

'আমি ভাঙালুম বৈকি! নিজে জেগে ছেলো—'

'না রে তুই-ই ভাঙিয়েচিস্! তুই বল্‌লি তো বাবাকে—দাদাকে ডাকব। ঠিক তখনই ঘুমটা চড়াক্ করে ভেঙে গেল!'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ', তারপর পাশ ফিরে বাবার দিকে তাকিয়ে নীলকণ্ঠ বললে, 'বাবা আজ কাজে যাবে না?'

'না। শরীরটা কেমন করছে—'

বাবা শরীরটা কেমন করছে বলতেই নীলকণ্ঠ তাড়াতাড়ি উঠে বসল। তারপর বললে, 'কি হয়েছে বাবা?'

'না তেমন কিছু নয়?'

'জ্বরটর হয় নি তো—'

'না রে—'

'তবে?'

'তবে কি। তোর জন্যেই তো আমি ভেবে ভেবে।'

'আমার জন্যে ভেবে ভেবে!'

ততক্ষণে নন্দরাণীও সেখানে এসে হাজির। নীলকণ্ঠ মায়ের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো। বাবা বললে, 'তুই আমায় ভাবাচ্ছিস না? তুই আমার কাছ থেকে প্রায়ই দেখছি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস। কোথায় যাস্, কোথায় থাকিস্—এসব কিছুই তো আমি জানি না।'

আবার নীলকণ্ঠ মায়ের দিকে তাকালো।

মা বললে, 'খালি খালি আমার দিকে চাইলে কি হবে। ছেলে বলছে—ছেলেকে জবাব দাও!'

কি জবাব দেবে সে? এসব অভিযোগের কোনটা কি সত্যি? অথচ বাবা এইসব কথাগুলো স্বচ্ছন্দেই বলে যাচ্ছে। আশ্চর্য। মা ও বাবা আজকাল যেন তাকে কি পেয়েছে।

নরেন বললে, 'আমি তো তোকে দেখতেই পাই না।'

'তাহ'লে আমি কোথায় থাকি?'

'তুমিই জানো।'

'বাঃ রে এক আমি আর রাখাল, ঘরে ফেলে মাছ ধরি—আর কখনো কখনো গোপাল কাকার সঙ্গে এদিক-ওদিক যাই। এছাড়া আর আমি তো কোথাও থাকি না!'

নন্দরাণী বললে, 'এ ছাড়া সব অভ্যেসগুলোর কথা বলো—'

নরেন জিজ্ঞাসা করলে, 'সেগুলো আবার কি?'

'সব কথা কি তোমায় আমি বলি, ব্যাটা আমার চোদ্দপুরুষের শ্বশুর—আমাকে কম জ্বালাতন করে? দাঁড়াওনা আমি সব দেখাচ্ছি,' বলে নন্দরাণী কোথায় যেন গেল।

মধুর একটা স্নেহস্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে দিয়ে কথা হচ্ছিল দেখে নীলকণ্ঠর খুব ভাল লাগছিল। মা ও বাবার কাছে এইটুকুই তো সর্বদা আশা করে। সর্বদা যে সে এটুকু পায় না তা নয়। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই যে, এই স্নেহ-স্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে ওরা এমন বাড়াবাড়ি করে এবং তাকে এর মধ্যে এমন করে বাঁধতে চায় যে সে সময় সময় যেন হাঁপিয়ে ওঠে। প্রাণের আবেগে তার ছুটে বেড়াতে মনটা যখন উধাও হয়ে যেতে চায় তখন ওরা পায়ে পরিয়ে দিতে আসে নিজেদের বেড়ি।

কিন্তু মা কোথায় গেল?

'চান তো আমায় করতেই হবে,' বলতে বলতে পরক্ষণেই দেখা গেল নন্দরাণী উঠোনে এনে ফেলল, একটা মড়ার মাথা, একটা লাঠি, একটা তীর ধনুক, একরাশ পালক। তারপর বললে, 'দ্যাখো ছেলের সব কাণ্ড!'

চন্দন লাফিয়ে উঠে বললে, 'বাবা দাদা কি সুন্দর খেলা দেখায়—দেখবে বাবা?'

বিস্ময়ের আবেগে নরেন বললে, 'ওগুলো কি?'

নীলকণ্ঠ বললে, 'কিছু নয় বাবা—'

'কিছু নয় কি,' চন্দন বললে 'মা সেই মাছখেকো বুড়ি—'

নরেন বললে, 'কি হয়েছে মাছখেকো বুড়ির—'

'কালই তো এসেছিল বুড়ি!'

নন্দরাণী বললে, 'হ্যাঁ, বিদ্ঘুটকরণ কাল এসেছিল—'

'ঠিক তার আগের দিন মা,' চন্দন বললে, 'দাদা খেলা দেখালো না?'

'হ্যাঁ।'

'তবে দাদা বলছে, কিছু নয়—'

'দাদা এখন তোমার ছেলের সামনে সাধু সাজছে।'

নীলকণ্ঠ সলজ্জভাবে বললে, 'হ্যাঁ সাজছে!'

নন্দরাণী উঠোনে এনে ফেলল, একটা মড়ার মাথা, একটা লাঠি, একটা তীর-ধনুক, একরাশ পালক

নরেন জিজ্ঞাসা করলে, 'ও মড়ার মাথায় কি হয়—'

চন্দন উঠোনে নেমে পড়ে বললে, 'মা বাবাকে দ্যাখাও না—দাদা যেমন করে দেখিয়েছিল?'

কত বড় একটা মজার ব্যাপার যে বাবার চোখের সামনে থেকে ফস্কে যাচ্ছে, মা সেটা বুঝেও যেন বুঝতে পারছে না। অথচ মা ইচ্ছে করলেই তা দেখাতে পারে। তাই মায়ের অনিচ্ছার পাহাড়কে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে পুনরায় সে বললে, 'তুমি লাঠিটা তুলে নাও—মড়ার মাথার কাছে-ঠক্ ঠক্ করো আর দাদার মত রামচরণ রামচরণ করে ডাকো—

'সে কিরে,' নন্দরাণী বললে, 'আমাকে দিয়ে তুই তোর ছেলেকে 'রামচরণ' দেখাবি?'

'আগে তুমি লাঠিটা নাও না।'

অগত্যা নন্দরাণীকে লাঠি তুলে নিতে হল। রামচরণ রামচরণ করে সেটা ঠুকতেও হল। কিন্তু 'রামচরণ' আদৌ নড়ল না। নীলকণ্ঠ হাসতে হাসতে বললে, 'হ-বে-না!'

নন্দরাণী হেসে উঠে বললে, 'কি ব্যাপার বল দিকি?'

এবার নীলকণ্ঠ উঠল। মাকে সে খুব ভালভাবে বুঝে নিয়েছে। বেচারী অত্যন্ত ভালবাসে তাকে এবং ভালবাসে বলেই, আজ যখন দেখেছে বাবার মন ভাল আছে তখন সেই সুযোগে তার সমস্ত কীর্তিকলাপকে মা, বাবার কাছ থেকে পাশ করিয়ে নিতে চায়। তাই যদি সে উঠে এ বিষয়ে মাকে সাহায্য না করে তবে মায়ের ওপর তার পক্ষ থেকে অবিচার করা হবে। সে উঠে বেড়ার মনসাগাছগুলোর কাছে গেল। কাগজ-মোড়া দুটো কি জিনিস নিয়ে এল। তারপর মাকে বললে, 'তুমি সরে গিয়ে ঐ দাওয়ার কাছে দাঁড়াও—'

ছেলে তার 'ট্রেড সিক্রেট' বোধকরি কারোকে দেখাতে চায় না। তাই নন্দরাণী সেখান থেকে সরে গেল। নীলকণ্ঠ পিছন ফিরে মড়ার মাথাটার ভিতর দিকে কি একটা বাঁধলে—আর লাঠির ডগায় কি একটা গুঁজে দিলে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'বাবা রামচরণ—আমার বাবাকে মাকে প্রণাম করো তো.....' বলার সঙ্গে সঙ্গে নীলকণ্ঠ লাঠিটার ডগাটা ওপর দিকে আস্তে আস্তে তুলে ধরল, আবার তেমনি করে নামালো—মড়ার মাথাটাও একবার ওপর দিকে উঠল, তারপর নিচু হল। সত্যিই মনে হল সে যেন প্রণাম করল। নন্দরাণী তারিফ করার ভঙ্গীতে স্বামীর দিকে তাকালো। নরেন বিস্মিত হয়ে বললে, 'কি করে করলি রে?'

চন্দন বললে, 'দাদা নিশ্চয়ই কোন মন্তর জানে বাবা। তা না হ'লে যখন সেই একই লাঠি আর একই রামচরণ, মা তখন পারল না কেন?'

আশ্চর্য। ছেলে তাহ'লে দিনরাত এই সবই করে বেড়ায়। কিন্তু যাই হোক ব্যাটা বুদ্ধি খাটিয়ে করেছে তো বেশ। নরেন মনে মনে ছেলেকে তারিফ করল। এরপর নন্দরাণী তীর-ধনুকটা তুলে স্বামীকে দেখিয়ে বললে, 'ধনুক দ্যাখো দিকি—যেন হরধনুক আর তীর নয় তো যেন সাঁওতালদের কাঁড়—'

সত্যিই আদিবাসীদের তীর যেমনি হয় তেমনিই। নীলকণ্ঠ বললে, 'ওটা আমি স্বারিক সাঁওতালের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলুম। বিষ দিয়ে পান করা—'

'ধ্যেৎ ফিরে!'

'ওতে তো মানুষও মরে যাবে—

'কিন্তু মানুষকে অর মারব কি করে তাই পখিই মারি।'

নন্দরাণী নরেনের দিকে তাকিয়ে বললে, ঐ পালকগুলো দ্যাখো না—কতরকমের পালক। আজ নিয়ে এল হতেল, কাল নিয়ে এল কাদাখোঁচা, পরশু শালুকখোল কিম্বা ঘুঘু, ডাকপাখি—একটা না একটা কিছু আনা চাই। আর তেমনি তৈরি করেছে ভাইটিকেও। এনেছে তো দুই ভায়ে বসবে পালক ছাড়াতে। তারপর আমাকে বলবে রেঁধে দাও—

থাক্ তবু তো নিজেরা যোগাড় করে খেতে শিখেছে। কিন্তু কোনদিন তো বলো নি এসব?'

বলব কি,' নন্দরাণী বললে, 'বলবার কোন সুযোগ দিয়েছো?'

'ও,' নরেন বলে উঠল, 'বাবা শেষকালে এই অভাগার ওপরই উল্টো চাপ।'

নীলকণ্ঠ বাবার মেজাজ দেখে, ভাবল, দিনটা আজ ভালই যাবে। তাই সে রামচরণ, তীর-ধনুক, এসব যথাস্থানে রাখতে গেল। মা কিন্তু তাকে ছেড়ে দিলে না। বললে, নীলু চান করে তবে ঘরে ঢুকবি। রামচরণ ছুঁয়েছিস—'

এ তুমি আমার জ্বালালে মা,' নীলকণ্ঠ বললে, 'রামচরণ আমার অশুদ্ধ কিসে?'

'তা তোরই বা চান করতে অসুবিধেটা কিসে?'

অসুবিধে কিছু নেই তবে শুধু শুধু এখন চান করেই বা করব কি; নীলকণ্ঠ বললে, তোমার তো এখনও রান্নার অনেক দেরি—'

'রান্নার সঙ্গে তের চান করার কি সম্বন্ধ?'

নীলকণ্ঠর এ অভ্যেসটা নন্দরাণীর জানা। চান করে সে আর অপেক্ষা করতে পারে না। চান করেছে কি অমনি তাকে খেতে দিতে হবে। এবার নবেন বললে, 'নীলু কিন্তু ঠিকই বলেছে। চান টান করে আর বাপু বসে থাকা যায় না। খেতেই হয়—'

'তা ঠিকই' নন্দরাণীও শেষ পর্যন্ত অনুমোদন করলে কথাটা!

আচ্ছা মা তোমার রান্নাবান্না হোক, নীলকণ্ঠ বললে, আমি এসে চান করে যাব'খন। ততক্ষণে আমি একটু ঘুরে আসি—'

নন্দরাণী বললে, তোমার ছেলে আছে। বেশি দেরি কোরো না যেন—'

অচ্ছা,' বলতে বলতে নীলকণ্ঠ বেরিয়ে গেল।

নীলকণ্ঠ বাড়ি থেকে বেরুল বটে কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সে ফিরে এল। হাতে তার এক গাদা পুরনো খবরের কাগজ আর দুটো পাত্রে দু'রকম রঙ—লাল আর কালো।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথমেই সে গিয়েছিল গোপাল কাকাদের বাড়ি। যেতে যেতে সে ভেবেছিল, সে গিয়েই কাকাকে তাক লাগিয়ে দেবে। হয়তো কাকা তখনও ঘুমোবে। কারণ রাতে মেজোঘোরী যেতে আর আসতে ভর প্রচণ্ড খাটুনি হয়েছিল। অতো লেখাপড়া জানা মানুষ, তার কি রাতের ঐ ভয়ঙ্কর খাটুনি শরীরে সহ্য হয়। কাজেই ক্লান্ত হয়ে নিশ্চয়ই অঘোরে ঘুমোবে। নীলকণ্ঠ তাদের বাড়ি পৌঁছুলে গোপাল কাকার মা অর্থাৎ ঠাকুরমা তাকে দেখে বলবে, 'কীরে নীলু—সকালে হঠাৎ কি মনে করে এলি ভাই?'

নীলু বলবে, 'একবার এলুম কাকার কাছে ঠাকুমা!'

ঠাকুরমা বলবে, তোর কাকা ঘুমোচ্ছে এখন—একটু পরে আসিস!'

হাজার হোক মায়ের প্রাণ তো! ছেলে সারা রাত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে ফিরে এসেছে, মায়ের প্রাণ নিশ্চয়ই চাইবে, আহা একটু ঘুমোক। কিন্তু নীলকণ্ঠ বলবে, বড় দরকার ছিল যে ঠাকুমা!'

খুব দরকার?'

হ্যাঁ ঠাকুমা!'

এই কথা বলতে বলতেই গোপাল কাকা উঠে পড়বে নীলকণ্ঠর গলার আওয়াজ পেয়ে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অবাক হয়ে বলবে, কিরে এত সকালেই বেরিয়ে পড়েছিস,—ঘুমুস নি একটুও।'

কিন্তু আশ্চর্য, যাকে নীলকণ্ঠ তাক লাগিয়ে দেবে ভেবেছিল, বাড়িতে পা দিয়েই তাকে দাওয়ায় বসে বসে রঙ ও তুলি নিয়ে কি লিখতে দেখে সে নিজেই অবাক হয়ে গেল। গোপাল কাকা ঘুমোয় নি পর্যন্ত। বিস্ময়াম্বিতভাবে নীলকণ্ঠ ডাকলে, 'কাকা?'

আয়,' বলে গোপাল যেমনভাবে লিখছিল তেমনিভাবেই লিখে যেতে লাগল।

দাওয়ার কাছে গিয়ে নীলকণ্ঠ দেখল গতকাল নীলসোনা গ্রামে বসে যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল গোপালপুরে সভা করার, তারই পোস্টার লিখছে গোপাল কাকা। নীলকণ্ঠ বলে উঠল, 'কাকা আমি লিখব?'

কেন তো লেখ না!'

তুলি?'

তুলি একটা পাকিয়ে নে—'

কিসে পাকাবো?'

ঐ খবরের কাগজের নিচে বেধহয় তুলো আছে দ্যাখ্ দিকি—আর এই খ্যাংরা-কাঠি নে। কাঠিটায় আমার মত করে তুলো পাকিয়ে ফ্যাল!'

নীলকণ্ঠ একখানা খবরের কাগজের নিচে হাতড়িয়ে তুলো বের করল। তারপর একটা কাঁচা-কাঠি টেনে নিয়ে যথারীতি তুলিটা পাকালো। তুলি পাকিয়েই রঙের

আইটেক্স সৌন্দর্য্য প্রসাধনী!

★ আইটেক্স (কাজল)
★ আইটেক্স টিপ
★ আইটেক্স কুমকুম পেষ্ট

ARAVIND LABORATORIES
P. B. 1415., MADRAS-17
Distributors for West Bengal & Orissa
M/s. PRAGATI DISTRIBUTORS, CALCUTTA-14

পাত্রটায় ডুবিয়ে একখানা খবরের কাগজে সে লিখতে শুরু করে দিলে। গোপাল নীলকণ্ঠর লেখা ভাল করে দেখে নিয়ে বললে, 'বাঃ রে—সত্যি সত্যিই তো তুই ভাল পোস্টার লিখতে পারিস!'

'এবকমভাবে লিখলে ঠিক হবে?'

গোপাল বললে, 'খুব হবে। তোর হাতের লেখা তো বেশ ভালই।'

উৎসাহ সহকারে নীলকণ্ঠ পর পর কয়েকটা পোস্টার লিখে ফেললে। তারপর বললে, 'কাকা আমায় চাট্টি কাগজ দেবে—আমি বাড়িতে গিয়ে আরও দু-একজনকে নিয়ে লিখব?'

'নিয়ে যা না কাগজ—কাগজ তো প্রচুর রয়েছে,' বলে দাওয়ার একদিকে একটা টেবিলের প্রতি নীলকণ্ঠর দৃষ্টি আকর্ষণ করল গোপাল। নীলকণ্ঠ তাড়াতাড়ি সেদিকে গিয়ে একগাদা কাগজ বগলদাবা করে নিলে। তারপর বললে, 'রঙ পাবো কোথায়?'

'রঙের ভাবনা কি', গোপাল বললে, 'আমার এই রঙগুলো নিয়ে যা! আমার তো আর লেখা হবে না—আমাকে এখুনি বেরুতে হবে।

নীলকণ্ঠ খুশি হয়ে রঙের পাত্র দুটো দুহাতে তুলে নিলে।

গোপাল উঠে পড়ে বললে, 'লেখা হয়ে গেলে সব একজায়গায় রেখে দিবি—কাল পরশু সব একসঙ্গে দল বেঁধে মারতে বেরুনো হবে। আগে মারতে যাসনি যেন—

'কেন কাকা?'

'পরে শুনিস্। এখন যা—'

গোপাল কাকাদের বাড়ি থেকে আসার পথে রাখালদের বাড়ি পড়ে। নীলকণ্ঠ ভাবল, বিভীষিকাপূর্ণ সেই গতরাত্রির নিশীথ অভিযান রাখালকে বলে সে তাকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলবে এবং তারপর পোস্টার লেখার জন্য তাকে ডেকে তাদের বাড়ি নিয়ে যাবে। সে ওদের বাড়ি ঢুকতেই দেখল—পদ্ম দাওয়ায় বসে একরাশ তুলো আর একটা খোল নিয়ে বুঝি বালিশ তৈরী করছিল। তাকে দেখেই সে বলে উঠল, 'নীলুদা তোমার বগলে আর হাতে ওসব কি গো।'

'কাগজ—আর রঙ।'

'কি হবে?'

নীলকণ্ঠ গম্ভীরভাবে বললে, 'মিটিংয়ের পোস্টার লেখা হবে।'

'কেন গো—আবার কি ভোট হবে?'

'ধ্যেৎ—রোজ রোজ ভোট হয় নাকি? ভোট তো এই সবে হয়ে গেল—'

'তবে?'

'শুনিচিস মিটিংয়ের পোস্টার—মিটিং হবে, আমাদের গোপালপরে। যাক্ এখন রাখাল কোথা গেল বলদিকি?'

'তোমার রাখালবাবু এখনও ঘুমোচ্ছে।'

'সে কি রে কুম্ভকর্ণ হার মেনে যাবে যে—'

'যা বলেছো নীলুদা,' পদ্ম বলতে লাগল, 'শুতে যদি কোথাও পেলে দাদা একটু—ব্যস অমনি ঘুম। কি করে যে দাদা ঘুমোয় এত আমি তো বুঝতেই পারি না।' কথাগুলো বলতে বলতে পদ্ম রাখালের ঘুমের গাঢ়ত্ব ও তজ্জনিত কবে তার কি বিপদ হয়েছিল এবং কবেই বা তক্তাপোষ থেকে মেঝেয় পড়ে গিয়েও সে অঘোরে ঘুমিয়ে ছিল, সেইসব কথা ও কাহিনী সে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করে গেল।

নীলকণ্ঠ বললে, 'যাক—ও ঘুম থেকে উঠলে তাড়াতাড়ি আমাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিবি। আমি চললুম। আমার তাড়া আছে।

'বসবে না—' মা ঠাকুমা ওরা সব পুকুরে গেছে। এখুনি আসবে।'

'এলে বলিস আমার কথা', নীলকণ্ঠ বেরিয়ে পড়ল।

তারপরেই এই নিজেদের বাড়িতে—

বাড়িতে পা দিতেই পদ্মর মত চন্দনেরও সেই একই প্রশ্ন, 'তোমার বগলে আর হাতে ওসব কি দাদা?' নীলকণ্ঠ বললে, 'আগে দাওয়ায় মাদুরটা পাত্ তারপর বলছি।'

মা দাওয়ায় উনুন-গোড়ায় কি যেন ভাজা-ভুজি করছিল। বাবা তৈরী হচ্ছিল বুঝি বাজার যাবার জন্য। কারণ হাতে বাবার বাজারের থলি। চন্দনও প্যান্ট শার্ট আর জুতো পরে তৈরী, সম্ভবতঃ বাবার সঙ্গে যাবে।

বাবা ডাকল, 'চন্দন চল্।'

চন্দন দাওয়ায় মাদুরটা পেতে দিয়েই বলে উঠল, 'তুমি যাও বাবা—আমি যাব না।'

'সে কি রে', বাবা বিস্মিত হয়ে বললে, 'এই তুই যাবার জন্যে জামা জুতো পরলি?'

নন্দরাণী উনুনগোড়া থেকে ততক্ষণে উঠে এসেছে। নরেনের দিকে তাকিয়ে বললে, 'বুঝতে পারছ না? দাদা এসেছে এখন সব মজা ফস্কে যাবে, আর তোমার সঙ্গে যাবে কেন?'

চন্দন বাবা ও মার দিকে মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শুধু মিট্ মিট্ করে হাসল।

নন্দরাণী স্বামীকে বললে, 'যাও যাও তুমি যাও—'

বাবা বেরিয়ে যেতেই নীলকণ্ঠ কাগজপত্র মিলে ঝাঁটাকাঠির তুলি আর রঙ নিয়ে বসল। চন্দন হাঁটু গেড়ে দাদার সামনে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি লিখবে দাদা?'

নীলকণ্ঠ বললে, 'দ্যাখ না।' তারপর সে কালো রঙে এক লাইন আবার লাল রঙে আরেক লাইন—এইভাবে লিখে যেতে লাগল।

নীলকণ্ঠ এক-একটা অক্ষর লিখছে আর চন্দন চিৎকার করে উঠছে, 'ও মা দ্যাখো দাদা কি সুন্দর লিখছে—ঠিক ছেনা ছাপার অক্ষর!'

সবে প্রথম ভাগ শেষ করেছে চন্দনা। যুক্তাক্ষর এখনও সে পড়তে পারে না। বানান করে আর বিড়বিড় করে সে পড়তে লাগল, 'বে-আ-ই-নী মে-ছো যে-গী-রা জ-মি-উ-...তারপর একটু থেমে আবার পড়তে লাগল, 'উ-রের দা-বী-তে জ্ব-ন-স-ভা!' নীলকণ্ঠ চন্দনের 'উ' বলে একটু থামা এবং তারপর 'উদ্ধারের' বদলে 'উরের' বলে উচ্চারণ করাটা শুনেছিল। তাই সে হেসে বললে, 'আরে বোকা ওটা উ-রেব নয় উদ্ধারের—'

অপ্রতিভ হয়ে চন্দন বললে, 'উ-দ্ধা-রে-র হস্ব-উয়ের পর ওটা তাহলে ধারের ?'

'ধারের কি নগদের নয় রে দয়ে ধয়ে...'

'কই দয়ে ধয়ে—ও তো দয়ের নিচে একটা ব-এ আকার মতন!'

'ঐটাকেই দয়ে ধয়ে বলে।'

এবার চন্দন বিজ্ঞের মত বললে, 'আচ্ছা দাদা এরকম করে দ-য়ে ধ-য়ে লেখার চেয়ে দ'য়ের নিচে একটা 'ধ' বসিয়ে দিলেই তো মিটে যেত।' এরকম করেছ কেন ?'

'এই রকমই যে নিয়ম।'

'এ নিয়ম কিন্তু ভাল নয়—এতে বুঝতে অসুবিধে হয়!'

'তা হয় আর কি করা যাবে বল', নীলকণ্ঠ বললে, 'তুই আমায় বকাসনি। বকালে লিখব কি করে ?'

'আচ্ছা তুমি লেখো—আমি আর বকাবো না।'

কিন্তু কতক্ষণই বা আর চন্দন তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারল। এরপরেই সে নীলকণ্ঠর পরবর্তী লেখাগুলি পড়তে লাগল, 'আ-গা-মী র-বি-বা-র দুয়ের পিঠে সাত সাতাশে জের বে-লা পাঁচে পঞ্চবান ঘ-টি-কা

নীলকণ্ঠ বললে, 'এই তো বেশ পড়ছিস্—'

চন্দন অধিকতর উৎসাহে তারপর আরও পড়তে লাগল, দন্ত্যসয়ে হ্রস্ব গো-পা-ল.....

'দন্ত্যসয়ে হ্রস্ব কি রে।' নীলকণ্ঠ বললে, 'ওটা স্থান—দন্ত্যসয়ে থয়।'

চন্দন অবাক হয়ে বললে, 'থ' কই—ওটা তো 'হ' ?

'দন্ত্যসয়ের নিচে হ থাকলেই 'থ' হবে ?'

বাস্তবিক এ বড় মুস্কিল। চন্দন ভেবে পায় না যে কেন এরকম করে সব অক্ষর সৃষ্টি করা হয়েছিল। একটা 'হ' দিয়ে 'থ' বোঝানো—বুদ্ধিসুদ্ধি থাকলে কেউ কখনো এরকম করে ? অতঃপর চন্দন পড়তে লাগল, স্থা-ন গো-পা-ল পু-র বা-জা-র স-ক-লে দ-লে দলে যো-গ দি-ন।

একখানা পোস্টার পুরো লেখা হতেই চন্দন সেটা তুলে নিয়ে মাবের কাছে ছুটে গেল এবং বললে, 'মা দ্যাখো দ্যাখো—দাদা কি সুন্দর লিখেছে!'

মা পরিপূর্ণ তৃপ্তির ভঙ্গীতে লেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে বললে, 'সত্যিই ভারি সুন্দর!'

ইতিমধ্যে রাখাল ও পম্ম এসে হাজির হল। ওদের দেখে চন্দন তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে লাফাতে এসে বললে, মিটিং—মিটিং মিটিং...!'

পম্ম বললে, 'কোথায় মিটিং'—

চন্দন বললে, গোপালপুরে।

নীলকণ্ঠ রাখালের উদ্দেশ্যে বললে, 'কাঁধে একটা বালিশ দোবো না কি রে!'

নীলকণ্ঠর বলার ধরণ দেখে পম্মা খিল করে হেসে উঠে বললে, ' ঠিক বলেছো নীলুদা—'

নন্দরানী উনুনগোড়া থেকে এগিয়ে এসে বললে, 'ও মা পদ্মরানী যে গো। এই আমি মনে করছিলুম নীলুকে তোমাদের বাড়ী একবার পাঠাবো। তা তোমরা ভাই-বোনে এসেই পড়েচো!

'কেন জ্যাঠাই!'

'তোমার জ্যাঠা আজ বাড়িতে আছে। বলছে অনেকদিন তেমন জুৎ করে খাওয়া-দাওয়া হয় নি। তা নিজেই গেল বাজারে করতে। মাংস টাংস সব আনবে। তাই মনে করিচি তোমাদের আজকে খেতে বলব ভাইবোনকে। অবিশ্যি তোমরা এলেও বাড়ীতে গিয়ে বলে আসবে ওরা!'

নীলকণ্ঠ উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল মায়ের কথা। সে বলে উঠল, 'এতবড় একটা খবর —তুমি আমায় বলো নি মা এতক্ষণ ?

'কখন বলব বাবা তুমি এসেই তো এস্টেট পত্তর মিলে বসলে!'

নীলকণ্ঠ বললে, 'কি রে রাখাল—কতখানি সাঁটাবি ?'

পম্ম বললে, 'তোমরা তো খালি সাঁটা-তেই আছো। শুনেছো কি অমনি দুই স্যাঙাতে যুক্তি হচ্ছে। এদিকে জ্যাঠাইমার যে প্রাণ বেরিয়ে যাবে রান্নাবান্না করতে—

নীলকণ্ঠ বললে, সেইজন্যেই তো তোকে রাখা হয়েছে—

'তা আমি কি তোমাদের মত খালি খেতেই আছি, পম্ম বললে, 'মেয়েরা তোমাদের মত টো-টো করে ঘুরে বেড়ায় না। বাড়ীর কাজ করে।'

'কাজ তো করে একেবারে উল্টে যাস' নীলকণ্ঠ বললে, তবু যদি একটু আগে তোদের বাড়ী না যেতুম—'

'গেসলে তো—গিয়ে কি দেখেছিলে, সেটা বলো ?'

'একখাশ তুলোর মধ্যিখানে, খাটুয়ালা হয়ে বসেছিলেন তো!'

'ও মা কি মিথ্যুক—আমি যেন শুধু বসেইছিলুম! আমি বালিশ তৈরী করি নি ?'

নন্দরানী জিজ্ঞাসা করলে, 'বালিশ কেন গো পদ্মরানী?'

পম্ম বললে, ঠাকুমা কতকগুলো স্বর্ণ-শিমুল অনেকদিন ধরে জমিয়ে রেখেছিল। সেইগুলো—'

নন্দরানী মনে মনে হেসে হাসল।

এরপর একদিকে চলল রান্নাবান্নার হাঙ্গামা, আরেকদিকে পুরোদমে পোস্টার লেখা। নন্দরানী ও পম্মা লেগেছে রান্নার যোগাড়ে আর নীলকণ্ঠ ও রাখাল লেগেছে পোস্টার লিখতে। আর চন্দন দুই শিবিরের সংযোগকারী হিসেবে কখনো এদিক কখনো ওদিকে যোরাফেরা করছে।

মুহূর্তের চাকায় বেলা বেড়ে চলেছে। অথচ নরেন ফিরছে না। নন্দরানী বিরক্ত হয়ে উঠছে। এরপর কখনই বা রান্না হবে আর কখনই বা ছেলেমেয়েগুলো খাবে!

একসময়ে অবশ্য বাজার করে ফিরে এল নরেন। বাজারের থলিগুলো দাওয়ায় নামাতেই নন্দরানী এগিয়ে এল। সে বিলম্বতার জন্য কোন অনুযোগ জানাবার আগেই নরেন কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললে 'ভাগ্যি চন্দন যায় নি আমার সঙ্গে —গেলে আজ ও-ও যেত আর আমিও যেতুম!'

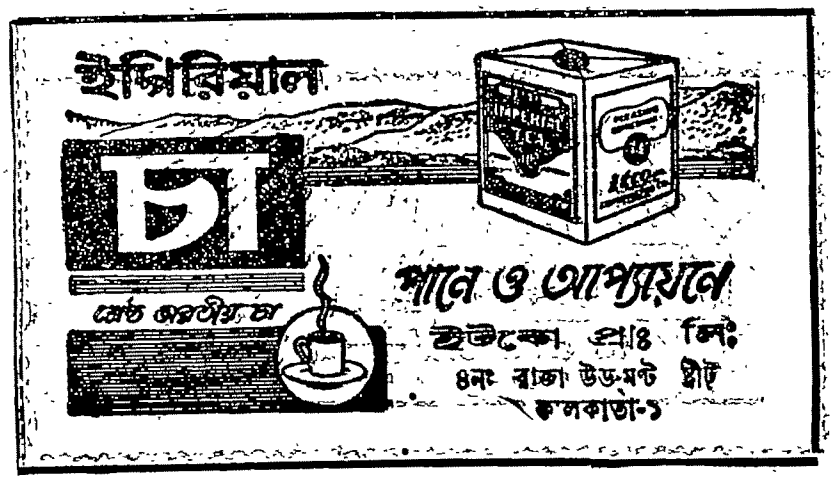

কেন গো ?' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল নন্দরানী !

ওদিকে পোস্টার লিখতে লিখতে নীলকণ্ঠ রাখালকে গত রাত্রির মেছোবেরী অভিযানের গল্প বলছিল—হঠাৎ বাবার কথায় সেও উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

নরেন বললে, 'বাপরে! সে কি বোমা ছোবাছুরি খুনোখুনি...থানার সামনে আর বাজারে!'

'বলো কি গো', নন্দরানী সভয়ে বলে উঠল, 'তুমি তখন কোথায় ছিলে ?'

'আর থাকা', বলে নরেন দাওয়ায় উঠল। নন্দরানী একখানা চটের আসন আগিয়ে দিলে। নরেন বসে পড়ে বললে, 'খুব ভাগ্যের জোর যে আমি কোন রকমে বেঁচে ফিরিছি।'

নন্দরানী ভয়ে চোখ বুজে ফেলল।

নীলকণ্ঠ রাখাল চন্দন সবাই নরেনের চারপাশে এসে বসে পড়ল। পদ্ম ইতিপূর্বে উনুনের আঁচ ওঠাটাকে ত্বরান্বিত করার জন্য একখানা পাখা নিয়ে গিয়েছিল—সেটাকে সে এনে নরেনকে বাতাস করতে লাগল। নীলকণ্ঠ বললে, 'কি হয়েছিল বাবা ?'

'সব বাজার শেষ করিচি, মাংস টাংস তখন সব আমার কেনা হয়ে গেছে,' নরেন বলতে লাগল, 'লক্ষ্মণের দোকানের বিড়িটা ভাল তাই কিনতে গেছি, ব্যস ধম্ ধম্ করে দুটো বোমা ফাটল! সে কি বিকট আওয়াজ! লোকজন সব কে কোনদিকে দৌড়ুল যে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। জায়গাটা ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল। আমি তো মনেই করি নি যে আমি বেঁচে আছি! একটু খেয়াল হতে দেখি—দুটো লোক রাস্তায় পড়ে তখন সামান্য সামান্য নড়ছে আর রক্তে ভেসে গেছে জায়গাটা...'

নীলকণ্ঠ বললে, 'লোক দুটো বাঁচবে ?'

'বাঁচবে কি তখুনি শেষ হয়ে গেল তারা!'

'তারপর ?'

'তারপর ওখান থেকে যা হয় করে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আসব বাজারে, দেখি দুদলে প্রচণ্ড ছোরাছুরি! বাজারের সময় কত লোক থাকে, ভিড়ে গম্ গম্ করে বাজারটা, চক্ষের নিমেষে বাজারের সে ভিড় কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গেল। দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেল, সারা বাজারটা খাঁ-খাঁ করতে লাগল। আর তার মাঝখানে বুকে পেটে কাঁধে ছোরার ঘায়ে রক্তমাখা মানুষগুলো যেন বুনো জানোয়ারের মত চারিদিক চষে বেড়াতে লাগল।'

'পুলিশ ছিল না ?'

'পুলিশের নাকের ডগাতেই তো এসব ঘটল !'

নন্দরানী জিজ্ঞাসা করলে, 'বোমা খুনোখুনি এসব যারা করলে তারা কোথাকার লোক ?'

'শুনলুম রেলের ওয়াগন ভাঙা সব লোহাপাটির লোক!'

নীলকণ্ঠ জিজ্ঞাসা করলে, 'দুদলই ?'

'দল একটাই তবে ঝগড়া বেধেছিল ওদের বখরা নিয়ে। লোক তো সব বলাবলি করছিল কাল রাত থেকেই ওদের ঝগড়া শুরু হয়েছিল। তারপর চোলাই মদের কল্যাণে সেটা আর থামে নি। শেষকালে দারোগার কাছে এসেছিল সালিশ করতে। সেখানে আরও চোলাই গিলে—'

নীলকণ্ঠ বললে, 'রেলের ওয়াগন ভাঙা লোহাপার্টি দারোগার কাছে সালিশ করতে গেল কেন ?'

নন্দরানী বললে, 'আর দারোগাই বা ওদের সালিশ করতে রাজি হ'ল কেন ?'

'শুনলুম লোকে বলাবলি করছে দারোগাই নাকি ওদের ওপরওয়ালা!'

নীলকণ্ঠ বিস্ময়ান্বিতভাবে বললে, 'সে কি!'

বস্তুত বিরামনগর থেকে আরম্ভ করে কি দক্ষিণে আর কি উত্তরে—দীর্ঘকাল ধরে একটানা রেল চুরি চলে আসছে। মাল-গাড়ির সীল ভেঙে, ওয়াগন ভেঙে, দামী দামী সব চালানী মাল, লোহা-লক্কড়, মেসিন, ট্রাক্টর গাড়ির পার্টস, ঘড়ি, সাইকেল, বিভিন্ন রকমের টায়ার, টেরেলিন, নাইলন, সিমেন্ট, চা, ওষুধ, পারফিউমারী—এসব চুরি এখানে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। তাছাড়া রেলের পাটি, সদ্য পোঁছানো নতুন স্লিপার, তার, ওভারহেড ইলেকট্রিক লাইনকে লাইন, ট্রেনের পাখা, বাল্ব, এসব কিছুই বাদ যায় না, এসবই ঘটে চোখের সামনে। রেলের ছোট-বড় অফিসার থেকে আরম্ভ করে পুলিশের বড়কর্তারা পর্যন্ত সবাই সব জানে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এর কোনই প্রতীকার হয় না।

এই ওয়াগন ব্রেকারদের সংগঠন প্রচণ্ড শক্তিশালী। থানায় যদি কোন ভাল অফিসার আসেন তবে তাঁর অধঃস্তনদের হাত করে এরা সম্পূর্ণ থানাটাকে নিজেদের পক্ষে ব্যবহার করে। ও-সি পক্ষে হলে তো আর কথাই নেই। তাছাড়া টাকা দিয়ে থানা তো থানা—তারা সর্বস্তরের উর্ধ্বতনদের কিনে রাখে। কোন মন্ত্রীর বা বড় অফিসারের আদেশ মান্য করার চেয়ে এইসব অফিসাররা ওয়াগন ব্রেকারদের আদেশকেই শিরোধার্য করে কর্তব্যপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা দেখান।

এদের সংগঠনের মূল একবার শুধু চোখ খুলে তাকালে দেখা যাবে কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। রেলের পাশে পাশে শহর ও গ্রামগুলোতে এরা পুলিশের যোগসাজসে তৈরি করেছে ভিলেজ রেজিস্ট্যান্স গ্রুপ। এই সব গ্রুপগুলির মধ্যে যে ভাল লোক থাকে না তা নয়—বরং ভাল লোককেই সামনে রেখে এদের আসল লোকগুলি কাজ করে যায়। এ ছাড়া থানায় থানায় অসংখ্য টাউট আর দিকে দিকে চোলাই মদের ঘাঁটি এরাই অর্থ সরবরাহ দ্বারা গড়ে তুলেছে।

দীর্ঘ বিশটা বছর ধরে এরা সব এমন কলাকৌশল আয়ত্ত করেছে যা শুনলে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। কোথা কোন ট্রাকে করে রেলের ওয়াগন ভাঙা লোহা-লক্কড় কিংবা কোন মূল্যবান দ্রব্যসম্ভার পাচার হচ্ছে হয়তো, হয়তো দেশের সৎ উৎসাহী যুবকেরা তা সন্দেহক্রমে ধরেছে—সেখানে যদি কেউ পাঁচটা মিনিট দাঁড়াল, তাহ'লে তিনি দেখতে পাবেন, ওয়াগন ব্রেকাররা দপ্তরের দস্তখত করা পারমিট-লাইসেন্স দেখাচ্ছে। অন্যদিকে আবার এও দেখা যাবে, ঘটনাস্থলে আর-জি পার্টি অর্থাৎ ভিলেজ রেজিস্ট্যান্স গ্রুপ এসে পড়েছে—তারা স্থানীয় মন্দির, স্পোর্টিং ক্লাব, রাস্তা উন্নয়ন, এমন কি বিদ্যালয়ের উন্নতির নাম করেও সকলের সামনেই টাকা নিচ্ছে আর এইভাবে ওয়াগন ব্রেকারদের ট্রাক ছেড়ে দেবার নৈতিক জমি তৈরি করে দিচ্ছে। এরপর পুলিশ অফিসাররা আসবেন, তাঁরা আইনের মর্যাদা অর্থাৎ মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করার বিরুদ্ধে বলবেন। পরবর্তী সময়ে দেখা যাবে ওয়াগন ব্রেকারদের ট্রাক ছাড়পত্র পেয়ে বিজয় গৌরবে চলে যাচ্ছে। শুধু কি তাই এর পরে সৎ উৎসাহী যুবক, যারা ট্রাক আটকেছিল, তাদের নামে বে-আইনী জনতা সৃষ্টি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার অভিযোগ এসেছে এবং তারা গ্রেপ্তারও হয়েছে। আর দেখা যাবে এসব ক্ষেত্রে অভিযোগকারী হচ্ছে

ওয়াগন ব্রেকারদেরই কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। পুলিশ তারই ওপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে মাত্র।

এই শ্রেণীর লোকদের সংগঠন শুধু নিচেই নেই, উপরেও। স্বরাষ্ট্রদপ্তর, সাধারণ প্রশাসন এখানে তো এদের লোক আছেই—এমন কি জনহিতকর বিভাগ স্বাস্থ্যদপ্তর ও পবিত্র শিক্ষাদপ্তরেও এরা থৈ-থৈ করছে। লক্ষ লক্ষ টাকার ওষুধ পাচারের অনেক ঘটনাই স্বাস্থ্য দপ্তরে ঘটে গেছে, বৈদেশিক মুদ্রা ফাঁকি দেয়ার ঘটনাও এই বিভাগে বিরল নয়। শিক্ষা দপ্তরেও এই একই অবস্থা। দপ্তর থেকে মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ—মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ থেকে জেলায় জেলায় ডি-আই, সোশ্যাল এডুকেশন অফিসারের অফিস পর্যন্ত দৃষ্টক্ষতের মত এদের হস্ত প্রসারিত। দেশ বিভাগের পর চোরাই ডিগ্রীর ছাপাখানা খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে, সরকারী পাঠ্যপুস্তকের দরুন সরবরাহ করা উৎকৃষ্ট কাগজ তথাকথিত বিধ্বস্ত প্রেসগুলি থেকে কিভাবে পাচার হয় তারও দৃষ্টান্ত খুঁজলে মেলা অসম্ভব নয়। কাগজের কোণে 'এক্স-ওয়াই-জেড' ছেপে লটকে-লট এই কাগজ ছাপা কাগজ হিসাবে আইনকে ফাঁকি দিয়ে পাকিস্তানে চালান দেয়া হয়ে থাকে। এরপর নিকৃষ্ট কাগজে ঐ বইগুলি ছাপা হয় কিন্তু তাও বাজারে ছাত্র-ছাত্রীরা নির্ধারিত মূল্যে পায় না। ডি-আই অথবা সোশ্যাল এডুকেশন দপ্তর থেকে লরী লরী পাচার হয়ে যায়—আদালতের রেকর্ড খুঁজলে এরকম দু-একটা ঘটনা যে মিলবে না তা নয়। কিন্তু কারা এইভাবে পাচার করার উদ্দেশ্যে পদাতিক বাহিনী হিসাবে কাজ করে—সে কি কারো অজানা আছে? তাছাড়া শিক্ষাদপ্তরে বসে বহু অফিসার স্বনামে-বেনামে পাঠ্যপুস্তক লেখেন এবং পদমর্যাদার সুযোগে সেইসব বই তাঁরা বিদ্যালয়ে-বিদ্যালয়ে চালাতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করেন। কিন্তু কোনক্রমে স্থানীয় মনোভাব যদি এই সুবিধাবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যায়, তবে সেই পুস্তক লেখক অফিসারদের নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে স্থানীয় পুলিশচক্র এবং ওয়াগন ব্রেকারদের মহৎ সমাজের শরণাপন্ন হন। এইভাবে বিরাম-নগরের রেলধার থেকে মহাকরণ অবধি এদের সুসংবদ্ধ এক চেন দেখা যাবে। যদি কেউ কোনদিন এসবের প্রতিবাদ করতে যায় তবে মহাকরণ থেকে আরম্ভ করে রেল লাইনের দুপাশ পর্যন্ত লোকচক্ষের অন্তরালে লালিত এই 'ঝটিকাবাহিনী' বিপুল বিক্রমে লাফিয়ে পড়বে তাদের ওপর।

এরপরেও যদি কখনও দুস্তর বাধা অতিক্রম করে কোন সৎ অফিসার এই 'সুসংবদ্ধ চেনের' উৎসসন্ধানে কোনরকম সক্রিয়তা দেখিয়েছেন তবে 'মাই ডিয়ার অমুকদা' বলে মন্ত্রীদের কাছে চিঠি গেছে, টেলিগ্রাম গেছে, দরবার হয়েছে এবং তাতে দুষ্কৃতকারীদের নিরাপত্তা নির্বিঘ্ন হয়েছে। আর যেটা বলা বাহুল্য সেটাও হয়েছে অর্থাৎ ঐ সৎ অফিসারটিকে হয় কোন দুর্গম জায়গায় বদলী হতে হয়েছে, নয় তো তাঁর সার্ভিস-রেকর্ডে কালো দাগ পড়ে গেছে। অবশ্য 'মাই ডিয়ার অমুকদারও' এসব না করে উপায় থাকত না কারণ 'মাই ডিয়ার দাদা' এদের কাছ থেকেই ইলেকশনে অর্থ পান, এরাই তাঁর বিশ্বস্ত পদাতিক বাহিনী। কাজেই.... এর ওপর আবার সবচেয়ে ন্যক্কার-জনক ব্যাপার হচ্ছে বিখ্যাত বিখ্যাত সংবাদ-পত্রগুলি, সমাজ ও দেশ কোথায় যাচ্ছে তা জেনেও এদেরই পৃষ্ঠপোষকতা করে যান।

গত বিশটা বছর ধরে দেশের সামগ্রিক প্রশাসনের আড়ালে আরেকটি প্রশাসন এই-ভাবে গড়ে তোলা হয়েছে এবং এই সঙ্গে পৃথিবীর সমাজবিজ্ঞানে যে শ্রেণীর কখনো আবির্ভাব ঘটে নি সেই শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছে এই বাংলাদেশে—এই শ্রেণীর কোন সংজ্ঞা দিলে সুস্পষ্টভাবে বলতে হয় এরা 'লুম্পেন কাম-ক্রিমিন্যাল বুর্জোয়া।' বাংলাদেশের গত বিশ বছরের শাসক সম্প্র-দায়ের এ কৃতিত্ব সমাজবিজ্ঞানীরা হয়তো কালো কালিতে লিখে রাখবেন চিরদিনের জন্য।

বাবার মুখে এই ভয়াবহ বোমা ছোঁড়া ও ছোরাছুরির আরো সব বৃত্তান্ত শুনে নীলকণ্ঠ বলে উঠল, 'তারপর কি হল বাবা?'

নরেন বললে, 'কিন্তু অতো যে সব কাণ্ড, দু-পাঁচ মিনিটের মধ্যে কেমন যেন সব মন্তরের মত শান্ত হয়ে গেল যেই প্রীতম সিং বলে একটা লোক মটরগাড়ি করে এসে হাজির হল!'

'প্রীতম সিং—প্রীতম সিং কে বাবা?'

'আরে লোকে তো বললে সে-ই নাকি সব। দিব্যি গা-জোয়ান চেহারা লোকটার। ফর্সা টকটক করছে রঙ। ইয়া বাবরি কাটা চুল। গালে গালপাট্টা। পরণে কাঁচিপাড় ধুতি, গায়ে কোণ-সেলাই করা আদ্দির পাঞ্জাবি, ভেতর থেকে জালি গেঞ্জীর ছাঁদাগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—'

হ্যাঁ সেই লোকটা মটরগাড়ি থেকে রাস্তায় নামল। নেমেই গাড়ির দরজাটা ঘটাং করে বন্ধ করে দিলে। পিছনেই এসে-ছিল একখানা লরী। প্রীতম সিং দক্ষবজ্ঞ সৃষ্টিকারী লোকগুলোকে ইশারা করে বললে, 'উঠো উসমে—'

মন্ত্রমুগ্ধের মত লোকগুলো লরীটায় উঠতে গেল। ওর মধ্যে কয়েকজনকে ইশারা করে বললে, 'লাস ভি লে চলো—'

লোকগুলো বোমার নিহত লাস দুটোকেও টেনে টেনে লরীতে তুলল। তারপর নির্দেশ মত লরী ছুটে চলল। বিরামনগরের দিকে। আর প্রীতম সিং গাড়ি নিয়ে গিয়ে একেবারে উঠল নস্করবাবুদের বাড়িতে।

নরেন বললে, 'আমি যখন আসছিলুম তখন দেখলুম প্রীতম সিং তার গাড়িতে আর ভাস্করবাবু নিজের গাড়িতে—দুখানা গাড়ি ঝড়ের মত ছুটে গেল আমার সামনে দিয়ে—'

এই বীভৎস পরিস্থিতি থেকে স্বামী যে অক্ষত অবস্থায় ঘরে ফিরে এসেছে নন্দরাণীর এই মহাভাগ্য। কথাবার্তা শুনতে গিয়ে অনেকখানি সময় চলে গিয়েছিল। এবার তাড়াতাড়ি সে রান্নাবান্না শেষ করার আয়োজন করতে লেগে পড়ল। তবু এরই এক ফাঁকে সে আসল কথাটা বলতে ভুলল না। স্বামীকে সে বললে, 'ওগো একবার পদ্মদের বাড়িতে ঘুরে এসো দিকি। বলে এসো যে ওরা এখানে আজ খাবে—'

পদ্ম বললে, 'শুধু শুধু জ্যাঠাইমা জ্যাঠাকে পাঠাবে কেন। জ্যাঠা এই রোদে তেতে পুড়ে এল।'

'সে কি হয় মা', নন্দরাণী বললে, 'তোমার মা-ঠাকুমা মনে করবে কি?'

'কি মনে করবে জ্যাঠাই', পদ্ম বললে, 'আমরা কি এ বাড়িতে আসি না, না নীলুদা চন্দন আমাদের বাড়ি যায় না?'

'তা নয় মা', নন্দরাণী বললে, 'সমাজ বলে একটা জিনিস আছে মা। তাছাড়া—'

'তাছাড়া কি?'

নন্দরাণী ও নয়নের পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল। পদ্মর সেটুকু দৃষ্টি এড়াল না। তাই সে কেমন যেন লজ্জানত মুখে আরক্ত হয়ে উঠল।

নরেন বললে, 'আচ্ছা আমি ওদের বাড়ি যাচ্ছি—জলধরের দোকানে তো আমাকে যেতেই হবে।'

নন্দরাণী এবার নীলকণ্ঠের উদ্দেশ্যে বললে, 'যা না এবার তোরা চান করে আয় না—সেই তো সকালে রামচরণ ছোঁয়ার পর থেকে এখনও নাইলি না—'

পদ্ম জিজ্ঞাসা করলে, 'রামচরণ কে জ্যাঠাই?'

নন্দরাণী বললে, 'জিগ্যেস কর না ওদের!'

পরক্ষণেই চন্দন বললে, 'দেখবে পদ্মদিদি!'

রাখাল নীলকণ্ঠকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি রে?'

অনেকগুলো পোস্টার লেখা হয়েছিল। সব গুছিয়ে-গাছিয়ে রেখে নীলকণ্ঠ বললে, 'দেখবি রামচরণ?'

চন্দন ততক্ষণে পদ্মদিদিকে টানতে টানতে নীলকণ্ঠের কাছে এসে পড়েছিল। সে বললে, 'দাদা পদ্মদিদিকে একবার রামচরণ দেখাবে?'

হ্যাঁ দেখাবো, বলে নীলকণ্ঠ দাওয়া

[শেষাংশ ২০৯ পৃষ্ঠায়]

ভারতের জাতীয় সংরক্ষণাগার

বিশু মুখোপাধ্যায়

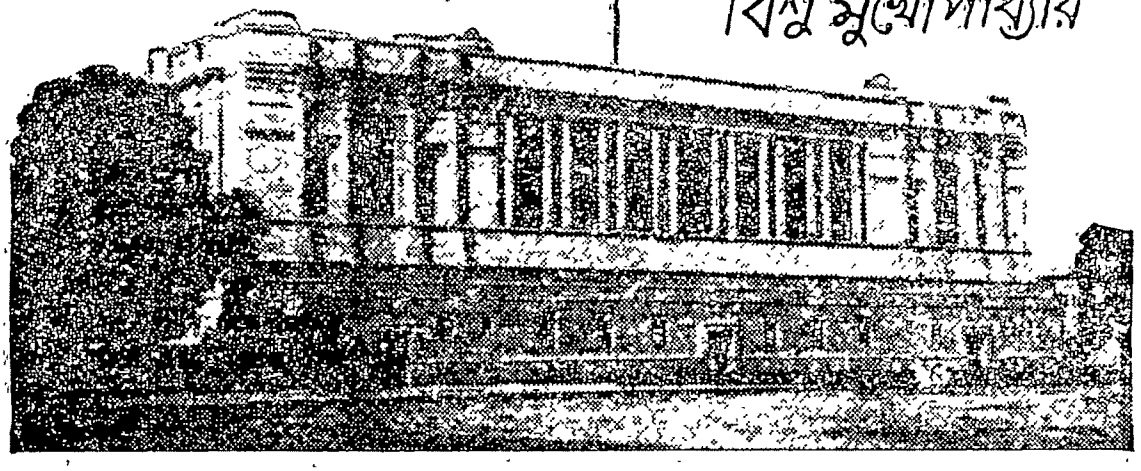

যারা ভারতের রাজধানী দিল্লী গিয়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই নিউ দিল্লীর ইণ্ডিয়া গেট থেকে সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট যেতে, দু'ধারের তরুরাজি শোভিত পথের মাঝামাঝি জায়গায় বিরাট একটি সৌধ বিস্কৃত এলাকা জুড়ে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গভাবে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পাবেন। এই গাম্ভীর্যপূর্ণ প্রকাণ্ড হর্ম্যটি ভারত সরকারের হাজার হাজার পাণ্ডুলিপি, নথিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ জাতীয় প্রয়োজনে যত্নসহকারে রক্ষা করার মহাভাণ্ডার—দি ন্যাশানাল আরকাইভস অব ইণ্ডিয়া। বাংলায় যাকে 'ভারতের জাতীয় সংরক্ষণাগার' নামে অভিহিত করা যায়।

১৯৪৭ সালে 'জাতীয় সংরক্ষণাগার' নামকরণের পূর্বে, পর পর এই সংস্থাটির দুটি নাম ছিল। একটি ইম্পিরিয়াল রেকর্ড অফিস এবং অপরটি ইম্পিরিয়াল রেকর্ড ডিপার্টমেণ্ট। সর্বপ্রথম এই অফিসের পরিকল্পনা ও ভিত্তি স্থাপিত হয় ১৮৯১ খৃস্টাব্দে। এবং প্রায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময় থেকেই এখানে এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই সরকারের সংখ্যাতীত চুক্তিপত্র, অসংখ্য লেখ্য, মূল্যবান দলিলাদি ও অন্যান্য বহু সংগৃহীত কাগজপত্র সমূহের বিষয়বস্তু অনুযায়ী বর্ণানুক্রমিক তালিকা রচনা, বিভক্তকরণ ও অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বাছাই প্রভৃতি ব্যাপক কার্যাদি সাধিত হয়ে থাকে বিভিন্ন বিভাগের আধুক্তকের (officer-in-charge) সাহায্যে। এখানকার রেকর্ডস্ সমূহের পরিমাণ, অর্থাৎ আয়তন ও ব্যাপ্তি সম্বন্ধে আনুমানিক একটা আভাস দিতে গেলে এই কথাই বলতে হয় যে, এই কাগজপত্রগুলির বাণ্ডিল যদি পর পর সাজিয়ে রাখা যায় তাহলে কমপক্ষে পনর মাইলের মত জায়গা অবশ্যই লেগে যাবে।

এই সংরক্ষণাগার ১৮৯১ সালে স্থাপিত হলেও, ১৭৫৬ সাল থেকে প্রায় ধারাবাহিকভাবে এখানেই সমূহ সরকারী রেকর্ডস্ রাখা আছে বলা যায়। প্রথম দিককার এই নথিপত্রের সাহায্যে বহু রোমাঞ্চকর ঐতিহাসিক ঘটনার সন্ধান ও কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীর আভাস মেলে। যদিচ এই সকল ঘটনা ও কাহিনী সংক্রান্ত কাগজপত্রের অধিকাংশই ইংরেজীতে, তথাচ তদানীন্তনকালের সংস্কৃত, চীন, তিব্বতীয় ও পারসীক ভাষায় রচিত কাগজপত্রের সংখ্যাও এ ব্যাপারে স্বল্প নয়।

রাজনৈতিক প্রয়োজনে বিভিন্ন বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ভারত সরকারের যে সকল মূল্যবান চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়েছে, সেগুলি ব্যতীত, ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক বিষয়-সংক্রান্ত এমন সব রিপোর্ট ও রেকর্ডস্ এখানকার রক্ষাগারে সংগৃহীত আছে, যার উপর নির্ভর করে বহু গবেষণা কার্য করা সম্ভব। কেবলমাত্র ঐতিহাসিক বা অর্থনৈতিক বিষয়-সংক্রান্তই নয়, ভারত সরকারের অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের ফলে,—উদ্ভিদবিদ্যা, জীববিদ্যা, ভূবিদ্যা ও নৃবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যে-সকল তথ্য এ যাবৎ উদ্ভাবিত বা আবিষ্কৃত হয়েছে, তারও নথিপত্র এখানে রক্ষিত আছে সযত্নে।

বিশেষভাবে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের বহু জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ যে-সকল বৈদেশিক কাগজপত্র এখানে পাওয়া যায়, তা ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ, যথা আফগানিস্তান, পারস্য, মধ্য-এশিয়া এবং চীন ও বর্মার তৎকালীন আভ্যন্তরিক ঘটনাসমূহের উপর প্রভূত আলোকপাত করে। এতদ্ব্যতীত অনুসন্ধানীর চোখে আরও তথ্যের সমারোহ দেখা দেয় তিব্বত, নেপাল ও মিশরীয় কাগজপত্রের দপ্তরে। প্রকৃতপক্ষে এই জাতীয় সংরক্ষণশালায় যত্নসহকারে রক্ষিত দলিল পত্রে ইংরেজ শাসনের প্রাথমিক কাল থেকে বিদেশীয় ও ভারতের সংলগ্ন দেশসমূহের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা ও নৈকট্য স্থাপনের বহু সূত্র যেমন পাওয়া যায়, তেমনি তুলনামূলক বিচারেরও বহুবিধ সুযোগ পাওয়া যায়। সে জন্য প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপর যাঁরাই গবেষণা কার্য করেন, তাঁরাই এই সকল রেকর্ডগুলি থেকে প্রভূত উপকৃত হন—তাঁদের কাছে এগুলি অপরিহার্য হিসাবে গণ্য হয়।

১৯৪০ সালে নিয়মিতভাবে রিসার্চ স্কলারদের জন্য এই সংরক্ষণাগারের পাঠাগার খুলে দেওয়ার পর থেকে গবেষকদের সংখ্যা এখানে ক্রমশ বেড়েই চলেছে। প্রায় চার-পাঁচশ'র বেশি গবেষণারত ছাত্র ও পণ্ডিত ব্যক্তি প্রত্যহ এখানকার পাঠগৃহে তাঁদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদির সংগ্রহকার্য করে থাকেন এবং আনুমানিক হিসাবে তাঁদের উত্থাপিত সমূহের পৃষ্ঠা-সংখ্যা এক্সাসাইজ খাতার কাগজে লক্ষাধিকের বেশি হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। ১৯৪৯ সালে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা হয় এই সংরক্ষণাগার সম্পর্কে। এই আইনের সাহায্যে সর্বসাধারণের প্রয়োজন সপক্ষে অধিকাংশ মূল্যবান ও দুর্লভদর্শন কাগজপত্র দেখার সুযোগ-সুবিধা করে দেওয়া হয়।

এই আরকাইভস্-এর মধ্যে কেবলমাত্র বিবিধ দলিল-দস্তাবেজ, প্রাচীন ঐতিহাসিক রেকর্ড, অন্তর্ভারত ও বহির্ভারতের বিভিন্ন তথ্যপূর্ণ পত্র ও চুক্তিপত্রগুলি স্তূপাকারভাবে গুদামজাত করে রেখে দেওয়াই হয় না, তার মধ্যে থেকে মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য জিনিসগুলির প্রতিলিপি প্রস্তুত করে রাখার জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ-ব্যবস্থা এবং পাণ্ডুলিপিগুলির মাইক্রোফিল্ম গ্রহণের জন্যও সম্পূর্ণ পৃথক একটি বিভাগ আছে। ভারতীয় ইতিহাস ও আংশিকভাবে সাহিত্যের তথ্য-সংবলিত বহু পাণ্ডুলিপির অনুলিপি ও মাইক্রোফিল্ম বিশ্বের বিভিন্ন সংরক্ষণাগার থেকে ক্রয় করেও এখানে এনে রাখা হয়েছে। এই ফিল্মগুলি বিভিন্ন দেশ থেকে যেমন আমরা কিনেছি, তেমনি তার পরিবর্তে বৃটিশ মিউজিয়াম, প্যারিসের জাতীয় সংরক্ষণাগার, মস্কোরাষ্ট্র, নরওয়ে, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ড, পর্টুগাল ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশকে বিক্রিও করেছি প্রচুর দুর্লভ ভারতীয় ঐতিহাসিক পুঁথি-পত্রের মাইক্রোফিল্ম। এই মাইক্রোফিল্ম গ্রহণ ও রক্ষার বিভাগটি সংরক্ষণাগারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ এই কারণে যে, এর দ্বারা পণ্ডিত ব্যক্তি ও বিদ্যানুধ্যায়ী ছাত্ররা তাঁদের গবেষণার মালমসলা সংগ্রহের জন্য বহু ক্ষেত্রে অযথা বিদেশ যাত্রার ব্যয়ভার থেকে অব্যাহতি পান। অবশ্য সর্বক্ষেত্রে তা সম্ভব না হলেও, যেটুকু উপকার বিদগ্ধ ব্যক্তিরা এখানে পেয়ে থাকেন, সেটুকুও কম নয়!

সত্যই মাইক্রোফিল্ম প্রস্তুতের ডিপার্টমেণ্টটি এই আরকাইভস্-এর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কালের আবর্তে বিগত দিনের যে-সকল স্মৃতি আজ বিলুপ্তির পথে, সে সকল দলিল, কড়চা, চুক্তিনামা ও পুঁথি-পত্রের পাঠোদ্ধারই কেবলমাত্র অসম্ভব হবে না, তাদের উপর হস্তক্ষেপ বা নাড়াচাড়াও অসম্ভব হয়ে যাবে, সেই সকল জীর্ণ কাগজ-পত্রের মাইক্রোফিল্ম গ্রহণ এই বিভাগের কয়েকটি ক্যামেরার সাহায্যে হয়ে থাকে। তাছাড়া এখানে বিশেষ ফটোস্টেট (Photo-stat) পদ্ধতিতে কোন হস্তাক্ষরের প্রতি-লিপি প্রস্তুত, বহু জিনিসের পুনর্মুদ্রণ এবং গবেষকদের প্রয়োজনানুসারে মাইক্রো-ফিল্মগুলি বর্ধিত আকারে প্রতিফলিত করে প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা আছে। সাধারণত এই ফিল্মগুলি একটি স্বতন্ত্র প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হয়ে থাকে। এ ছাড়া এখানে কয়েকজন 'রীডার্স'ও আছেন অনুসন্ধানী শিক্ষার্থী-দের যথাযথভাবে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি অবহিত করার জন্য।

চৈনিক ইতিহাসের বহু মূল্যবান তথ্য ও দলিলপত্রের যে মাইক্রোফিল্ম এখানে আছে, তাদের সংখ্যা প্রায় সার্ধশত। চীনের সঙ্গে আমাদের মন কষাকষি ও যুদ্ধের কিছু-কাল পূর্বে, পিকিং-এর জাতীয় পাঠাগারের অনুরোধে উক্ত ফিল্মগুলির মধ্যে 'চায়না পেপার্স' নামে খ্যাত অংশটির মাইক্রোফিল্ম তাঁদের করে দেওয়া হয়েছিল। এই সমস্ত কাগজপত্রের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল প্রায় ছ' হাজারের মত এবং এগুলির বেশির ভাগই ১৮৩৯-৪২ খৃষ্টাব্দে প্রথম চীন যুদ্ধের সময়কার তথ্যসমৃদ্ধ। ইতিহাসে এই যুদ্ধ সর্বত্র 'অহিফেন যুদ্ধ' (Opium War) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

এই জাতীয় সংরক্ষণাগারে গবেষকদের গবেষণাকার্যের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া ছাড়া, আরও বহুবিধ উদ্দেশ্য সফল হয়ে থাকে। সাময়িক পরিদর্শক, উচ্চপদস্থ সর-কারী তথ্যানুসন্ধী কর্মচারী ও বৈদেশিক ছাত্র পড়ুয়ারাও এখান থেকে বহু তথ্যের সন্ধান সংগ্রহ করে থাকেন। এছাড়া এখানে আরও একটি জিনিস সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়, যা স্বাক্ষর-সংগ্রহকারীদের (Auto-graph-hunter) পক্ষে শুধু আগ্রহেরই নয়, লোভেরও। কিন্তু এগুলি দেখে চক্ষু সার্থক করা ছাড়া, সংগ্রহ করার কোনই উপায় নেই! বৃটিশ শাসনের একেবারে গোড়ার দিক থেকে আরম্ভ করে,—মিঃ চার্নক, ক্লাইভ, ভেলে-হাউসী, ওয়ারেন হেস্টিংস, লর্ড কার্জন; টিপু সুলতান, আলিবর্দি, বাহাদুর শা, সিরাজদ্দৌলা, মিরজাফর, উমিচাঁদ প্রমুখ ইতিহাস-খ্যাত মহাতেজা মহাজনগণের স্বাক্ষরযুক্ত কাগজপত্র এখানে তো আছেই, তাছাড়া ভারতের আরও বহু রাজা-মহারাজা, বাদশা-বেগম, লাট-বেলাটদের স্বাক্ষর ও চিঠিপত্র (Holograph) যে এখানে আছে তার ইয়ত্তা নেই। এগুলির অধিকাংশই ইংরেজী, প্রাচীন বাংলা, আরবী, ফারসী ও সংস্কৃতে লেখা। যাঁরা হস্তাক্ষর (Calli-graphy) দেখতে, মেলাতে বা সংগ্রহ করতে ভালবাসেন, তাঁদের কাছে এই সংরক্ষণ-শালা সম্ভবত স্বর্গের চেয়েও উপভোগ্য, কাম্য স্থান। বিশেষ করে পারসীক লিপি-কুশলতার বৈচিত্র্য, ভুটান ও তিব্বতের চিত্রাপিত পত্রগুচ্ছের অভিনবত্ব ও রঙের ছটা তাক লাগিয়ে দেয় নিষ্ঠাবান দর্শকদের। অধিকন্তু বৌদ্ধধর্মের উপর রচিত 'গিলগিট পেপার্স' নামে আখ্যাত পাণ্ডুলিপিগুলিকে বর্তমানে অত্যাধুনিক প্রক্রিয়ায় যেভাবে নতুন সংস্কার করে রাখা হয়েছে এখনকার প্রয়োগ-শালায়, তা দেখবার মত। বৌদ্ধযুগের উপর যাঁরা গবেষণা করছেন তাঁদের কাছে এগুলি অত্যন্ত মূল্যবান দ্রষ্টব্য।

প্রাচীন ভারতীয় পুঁথিপত্রও এই সংরক্ষণাগারের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ও সম্পদ। স্বদেশের বিভিন্ন জাদুঘরে এই পুঁথিপত্রের যথেষ্ট নিদর্শন আছে, এবং কলি-কাতার এসিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহ-সংখ্যাও স্বল্প নয়, তথাপি ভারতের এই জাতীয় সংরক্ষণাগারে যে পরিমাণ ভূর্জপত্র, তালপত্র ও তুলটপত্রের সমারোহ দেখা যায়, তা অত্যন্ত বিস্ময়ের। চামড়ার উপর, ধাতুপত্রের উপর এবং দারুখণ্ড ও প্রস্তর ফলকের উপর উৎকীর্ণ ঘোষণাপত্র ও ফরমাও এখানে আছে কিছু কিছু।

কালের করাল কবলে সবই একদিন ধ্বংস পেয়ে থাকে। মানুষের তৈরি কোন কিছুই হোক, আর প্রকৃতির সৃষ্ট কিছুই হোক, নিরবধিকালের স্থিতত্ব বা অমরত্বের সার্টিফিকেট নিয়ে কেউই আসে নি এখানে। কাজেই ক্ষীয়মাণ, ক্ষণভঙ্গুর ও ধ্বংসপ্রায় মূল্যবান জিনিসগুলিকে আমরা অধিকতর ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে থাকি—ধরে রাখি তার নিদর্শন। প্রস্তর বা ধাতু-নির্মিত দ্রব্যাদি অপেক্ষা কাগজপত্র, ভূর্জপত্র বা তালপত্র অতি সহজেই এবং অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই বিনষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে। সুতরাং এই সংরক্ষণাগারের প্রাথমিক ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজই হল, নিরন্তর ধ্বংসনীয় বা ধ্বংসমুখ দ্রব্যগুলিকে রক্ষা করার জন্য ধ্বংসাত্মক শত্রুসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে চলা—কালের হাত থেকে, আব-হাওয়ার হাত থেকে ও অনিষ্টকারী পোকা-মাকড়ের হাত থেকে ঐ সকল মহামূল্য কাগজের ঐশ্বর্যকে অনাগতকালের মানুষের জন্য অতীতকালের মানুষের কীর্তিকলাপ রক্ষা করা। এই ন্যাশনাল অরকাইভস্-এর সর্বাপেক্ষা মহত্তর, বৃহত্তর ও গুরুতর কাজই হল সংরক্ষণের কাজ এবং এর এই সংরক্ষণ কার্যে সাহায্যকারী বিভাগগুলিই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিভাগ।

এই বিভাগগুলির দ্বারাই শেষ বিশ্ব-যুদ্ধের সময়ের মধ্যেও এখানে ১৬,৫৫,২৭১ খানি দলিলের পাতার মেরামত কার্য নিষ্পন্ন হয়েছে, ১,৮২৫ খণ্ড গ্রন্থ নতুন করে বাঁধাই হয়েছে। কীট-নিবারক বাষ্পস্নান (Fumigate) করান হয়েছে ১৪,১৩৫ বান্ডিল কাগজপত্র। এছাড়া ৬০,২৫০ সংখ্যক বাঁধাই খণ্ডকে চামড়ার আস্তরণের মধ্যে এবং ভাঁজ করা ১,৯০০,০০০ সংখ্যক বড় সীট পাণ্ডুলিপি ও কাগজ রাখা হয়েছে বিভিন্ন পর্যায়। কয়েক বৎসর পূর্বে এখানে প্রায় চৌদ্দ টন ওজনের এমন একটি যন্ত্র বসান হয়েছে, যার সাহায্যে অতি পুরাতন জীর্ণ রেকর্ডসমূহের প্রায় ছ' হাজার বান্ডিলকে প্রতিদিন চাপ ও তাপের সাহায্যে সংকুচিত সেলুলোজ ভব থেকে নতুনভাবে সঞ্জীবিত করে তুলবে। দিল্লীর বহু দর্শনীয় স্থানের মধ্যে এই স্থানটিও বিশেষভাবে বিশ্বজনের কাছে একটি অবশ্য গন্তব্য স্থান হিসাবে গণ্য হয়ে রয়েছে।

বাঙলাভাষা কোথায়?

গোপাল হালদার

বাঙলা লেখার কথা

প্রায় একশ বৎসর হতে চলল—'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলা লেখকদের প্রতি তাঁর নিবেদন জানিয়েছিলেন। বঙ্কিমের নিবেদন বাঙালি লেখকদের কাছে নিশ্চয়ই ছিল নির্দেশ। সাময়িক ছাপটুকু বাদ দিলে তাঁর বক্তব্য এখনকার বাঙলা লেখকদের কাছেও নির্দেশরূপেই গ্রাহ্য হওয়া উচিত। বাঙলা সাময়িক পত্রে ইদানীং কিছু কিছু পুরনো লেখা, বিশেষ করে স্মৃতিকথা, পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে। এ শুভবুদ্ধি অভিনন্দনযোগ্য। অনেকাংশেই তা মনোরঞ্জক। কিন্তু বঙ্কিমের সেই নিবেদন বা সুপরামর্শ কোনো সাময়িক পত্র পুনর্মুদ্রণ করেছেন বলে জানি না। হয়তো তত মনোরঞ্জক হবে না, কিন্তু বুদ্ধি উদ্দীপক হবে। সাহিত্যবোধকেও তৃপ্তিদান করবে। অন্তত সাহিত্যিক দায়িত্ববোধ জাগাতে পারবে।

অবশ্য শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের সেই নিবেদন নয়; বাঙলার প্রধান সাহিত্যরথীদের অভিজ্ঞতামূলক ও জাতীয় বক্তব্য পুনর্মুদ্রিত হওয়া উচিত। বাঙলা সমালোচনা সাহিত্যের বা গদ্য ও কবিতার সংকলন গ্রন্থ কম প্রকাশিত হয় নি। স্কুল কলেজের চাহিদা মিটিয়েই তার সবগুলির প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়, এমন কথাও ঠিক নয়। কিন্তু লেখার কথা লেখকের কাছে লেখকের পরামর্শ—কেমন করে লিখতে হবে,—এমন সব লেখার একটি সুনির্বাচিত সংকলন কি প্রকাশিত করা চলে না? বিক্রী হবে না, কে বলে? বাঙলা লেখকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়—'উদীয়মান' ও উদয়-প্রয়াসীদের ধরলে দু-এক হাজার নিশ্চয়ই ভরে; আমাদের সাহিত্যে আমরা লেখক হতে চাই, কিন্তু লিখতে শিখতে চাই না। মনে করি, ও গুণ জন্মায়ত্ত—শিখতে হবে কেন? নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট রসবোধ ও বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য কতকাংশে ব্যক্তির জন্মগত অধিকার। আমাদের দেশের ভাষায় বলা যায়—পূর্বজন্মের সুকৃতির ফল। সাধারণত কিন্তু কবিরাই এ জাতের লেখক। এবং তেমন ভাগ্য যাঁদের, তাঁদেরও দরকার অফুরন্ত পরিমার্জনার। আমরা তো চোখের ওপরই দেখেছি—রবীন্দ্রনাথের বিকাশ-ধারা। সার্থকতার উচ্চ স্তরে উঠেও কবি বার বার কত ভাবে তাঁর লেখা পরিমার্জনা করতেন। নিজের লেখা কাটতে কাটতেই তো—সেই কাটা-কুটির সূত্রে—কবি রবীন্দ্রনাথ চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছিলেন। বলা বাহুল্য; সবাই রবীন্দ্রনাথ নন; শতকরা ৯০ জন লেখক কবিও নন; অধিকাংশই গল্প-উপন্যাস, প্রবন্ধ, নানা জাতীয় বিবরণ ও সাংবাদিক রচনার লেখক। এঁদের পক্ষে নিশ্চয়ই বিশেষ বিভাগের বিশেষ শিল্পগুণ আয়ত্ত করতে হয় দেখে শিখে,—তাঁদের সাফল্য শুধু জন্মায়ত্ত নয়, অনেকটা কর্মায়ত্ত। এসব লেখকদের প্রত্যেকেরই আরেকটা মূল ধর্ম শেখা দরকার—তা হচ্ছে 'কেমন করে লিখব,' তা আয়ত্ত করতে করতে দেখতে হয় 'বিশেষ লেখা কী বিশেষ পদ্ধতিতে লিখব।' অর্থাৎ ভাষার মূল ধর্ম বুঝে নিজের ভাষার বনিয়াদ গড়া। কেমন করে লিখতে হবে, এইটা প্রতিভার কথা ততটা নয়, যতটা সাধনার কথা। জশুয়া রেনল্ডের কথায়— দশ ভাগ 'ইন্‌স্পিরেশন্' ও নব্বুই ভাগ 'পারস্পিরেশনের' কথা।

বড় বড় সাহিত্যে লেখা শেখার জন্য স্কুল আছে, কলেজ আছে,—যেমন এদেশেও আছে আর্ট স্কুল, আর্ট কলেজ। কিম্বা আছে—কিছুকাল ধরে 'সাংবাদিকতার' ক্লাশ। যতটুকু জানি পেশাগত লেখা শেখানোই এই পেশাদারী বিদ্যার ক্লাশের কাজ। আর, লেখার কথা অপেক্ষাও পেশার কথাই সাংবাদিক ক্লাশে প্রধান আলোচ্য বিদ্যা। লেখার ক্লাশ, লেখকের ইস্কুল এদেশে এখন না হওয়াই ভালো—হলেই তো সঙ্গে সঙ্গে আসবে মাস্টারদের দাবী, ছাত্রদের দাবী, অন্যদিকে 'কী পড়ব-না-পড়ব' শেক্‌সপীয়র রবীন্দ্রনাথ. না, 'মাও-এর চিন্তা'? 'কালচারাল রিভ্যালুশান'-এর পটকা ও ফটকা ইত্যাদি। তার চেয়ে কফি হাউস, 'পরিচয়ে'র মতো পত্রিকার আপিসের লেখকের আড্ডা, এ সবে যা হচ্ছে এখন তাই চলুক।—বরং দেখা যেতে পারে সদক্ষিণা 'করেসপণ্ডেন্স কোর্স' বা লেখা বিক্রেতা 'লেখক গিল্ড'-এর মতো প্রতিষ্ঠান গড়া চলে কি না, আর তদভাবে অন্তত সংকলন—'লেখার কথা', কেমন করে লিখতে হবে, এ বিষয়ে পূর্বজ লেখকদের পরামর্শ।

॥ ২ ॥

ভবিষ্যতের পটভূমি

ভূমিকাটা অপরিমিত দীর্ঘ হয়ে গেল—বাঙলা লেখকের এটাও এক মজ্জাগত দোষ। কিন্তু লেখকদের প্রশিক্ষণের (শিক্ষার) প্রয়োজন বলতে এ লেখা লিখিত হচ্ছে না। উদ্দেশ্য আরেকটু ব্যাপক, যদিও সুদূর। আসল উদ্দেশ্য বাঙলা ভাষার ভবিষ্যতের কথা। ৪০ বছর পূর্বে আমরা দুই বন্ধুতে এক সময়ে তা ভেবে দেখতে চেয়েছিলাম। 'প্রবাসী'তে ও-বিষয়ে একটি প্রবন্ধও লিখেছিলাম—সে চল্লিশ বৎসর আগে, বোধহয় ১৯৩০-এর মাঝামাঝি। তখন যে আশঙ্কা করেছিলাম তা কোনো কোনো দিকে দূর হয়েছে। আবার কোনো কোনো দিকে তা প্রবলতর হয়েছে। বাঙালি জাতি বিভক্ত হয়ে গিয়েছে—১৯৩০-এ তা তখন ছিল

স্বপ্নাতীত। বাঙলা ভাষাই বরং তখন মনে হয়েছিল বিভক্ত হয়ে যাবে—'মুসলমানী বাঙলায়' ও 'হিন্দু বাঙলায়'। আজ পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা প্রমাণ করে দিচ্ছেন দেশ বিভক্ত হলেও ভাষা বিভক্ত হয় না—হয়ত জাতিসত্তাও হয় না। ১৯৩০-এ হিন্দীর দাপটে বাঙলা এতটা কোণঠাসা হবে মনে হয় নি। আজ মনে হচ্ছে, হিন্দীর দাপটের চেয়ে (পশ্চিম বাঙলার) বাঙালির বিশৃঙ্খল কর্ম ও বিপর্যস্ত বুদ্ধিই বেশি মারাত্মক। অর্থাৎ চল্লিশ বৎসর পরে আজ আবার মনে হচ্ছে—বাঙলা ভাষা ও বাঙলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ একবার বিচার-বিশ্লেষণ করা দরকার।

আমরা তাই ইতিমধ্যে বুঝছি মাতৃভাষার প্রবর্তনের উদ্দেশ্য নিয়ে একটা সংস্থা গঠন করি। কী হবে তার কার্যক্রম, তা সম্মেলিতভাবে আলোচনা করে ঠিক হোক্। ইতিমধ্যে আমরাও নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা মতো ও সম্পর্কে একটু ভাবি—আরও দশজনকে একটু ভাবাতে চেষ্টা করি। শুধু লেখকদেরই ভাবতে চাই, তা নয়; শুধু প্রকাশকদেরও নয়। শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের সরকারী ও বেসরকারী কর্মী ও কর্তাদেরও ভাবাতে চাই। সাংবাদিকরাও নিশ্চয়ই তার অন্তর্ভুক্ত। যেমন, অন্তর্ভুক্ত শিক্ষামন্ত্রক, তথ্য-মন্ত্রক প্রভৃতি মন্ত্রক, আর বাঙলার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও। এ সবেরও বাইরেকার মানুষও আছেন—সাধারণ বাঙালি, তাঁরা কেউ পাঠক—কেউ স্বাক্ষর, কেউ নিরক্ষর যাঁরা এখন পর্যন্ত পাঠক নন। অথচ বাঙলা ভাষাই তাঁদের জীবন-যাত্রার ও সমাজযাত্রার একমাত্র যোগাযোগের সেতু। তাঁদের মুখেই শেষ পর্যন্ত বাঙলা ভাষার গোমুখী—শিক্ষিতরা সাহিত্যিকরা তাকেই শঙ্খ বাজিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেন বিশ্বের সাগরসঙ্গমে। কথা আর না বাড়িয়ে এবার আসল ভূমিতেই অবতরণ করি—বর্তমান অবস্থায় বাঙলা ভাষা কোথায়? ভবিষ্যতের তাই হবে পটভূমি। ভবিষ্যৎ-জিজ্ঞাসা না হলে বাস্তব হবে না—হবে দৈববাণী বা আপ্তবাক্য॥

॥ ৩ ॥

পৃথিবীতে নাকি আড়াই হাজার-তিন হাজার ভাষা আছে। আর পৃথিবীর লোকসংখ্যা নাকি আড়াই শ' কোটি কি তিন শ' কোটি—গড়পড়তা তা হলে এক-একটা ভাষা দশ হাজার লোক বলে। গড়পড়তা হিসাবটা অনেক ক্ষেত্রে যে কত অবাস্তব, তা বোঝাবার জন্যই এ কথাটা বলা। কারণ, বাস্তবতঃ ব্যাপারটা কি? এমন কতকগুলো ভাষা আছে যা কোটি কোটি লোক বলে। স্বাভাবিকভাবে তাদের তা নিজ ভাষা, অর্থাৎ 'মাতৃভাষা' এমন ভাষাও তাই বহু শত যা দু'-দশ হাজার লোকেও বলে না। ছোট ছোট আদিবাসী বা আধিজাতি গোষ্ঠী বিচ্ছিন্নভাবে দূরে দূরে থাকে ওরকম ভাষা দিয়ে নিজ নিজ সমাজে সাধারণ কাজকর্ম চালায়। এরূপ বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীর মানুষেরা প্রায়ই বেশি উন্নত হতে পারে নি; তাদের ভাষারও তাই বিশেষ বিকাশ হয় না। তাদের ভাষা শুধু অল্প লোকের ভাষা নয়, অ-বিকশিত ভাষাও। আবার অন্য দিকে এরূপ ভাষা আছে যা কোটি কোটি লোক বলে—ইংরেজি, উত্তর চীনা, পর্তুগীজ, হিন্দী প্রভৃতি ভাষা বলে ১০ কোটিরও বেশি লোক বলে, এর পরেই জাপানী, বাঙলা, জার্মান প্রভৃতি ভাষার স্থান—মোটামুটি বাঙলা বোধহয় এখন প্রায় ১০ কোটি লোকের মাতৃভাষা—৪ কোটির মতো লোক বাঙলা বলে পশ্চিম বাঙলায়, ৬ কোটির মত লোক বাঙলা বলে পূর্ব পাকিস্তানে। এই লোকসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে বাঙলার স্থান ষষ্ঠ কিম্বা সপ্তম। অর্থাৎ সেদিক থেকে বাঙলা হয়তো ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি ভাষার থেকেও বড় ভাষা।

কিন্তু শুধু লোকসংখ্যা দিয়ে তো ভাষা বড় গণ্য হয় না; আরও অনেক গুণও সে হিসাবে গণনীয়। যেমন, ভাষার বিকাশ কতটা ঘটেছে, অর্থাৎ প্রকাশশক্তি কতটা সে আয়ত্ত করেছে, নানা বিষয়ে জ্ঞান আহরণের মতো সুযোগ সে ভাষার কার্যত কতটা পাওয়া যায়, অর্থাৎ কিরূপ তাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই সহজলভ্য। আর শেষ কথা, তার সাহিত্য বা অধ্যাত্মসম্পদ কতটা বিকশিত। এ সবের সঙ্গে লোকশক্তি মিলিয়ে তবে ভাষার সম্পূর্ণ পরিমাপ করা হয়—অর্থাৎ ভাষা ছোট, না বড়, না মাঝারি—ফেলের স্তরের ভাষা, না 'সি' পাওয়া পাশ ভাষা, না 'এ' পাওয়া 'অনার্স' পাশ ভাষা; এরূপ পর্যায় ভাগ করা চলে। এরূপে ভাষার যে পর্যায় ভাগ হয়, তাতে বাঙলা ভাষার স্থান কোথায়? কোন্ পর্যায়ে?

এ কথার আলোচনায় প্রবেশ করবার আগে আরও একটি মূল কথা কিন্তু মনে রাখা উচিত। পর্যায় যেমনি হোক্, কী দৃষ্টিভঙ্গি (approach) নিয়ে আমরা ভাষার গুণাগুণের, বা ছোটত্বের-বড়ত্বের হিসাব নোব?

প্রথম কথা : ছোট হোক্ বড় হোক্ সকল ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণই হচ্ছে ভাষা জিজ্ঞাসায় প্রথম দায়িত্ব। আজ যে ভাষা ছোট, কাল—অর্থাৎ একশত বৎসর সে ভাষা বড় হয়ে ওঠা মোটেই অসম্ভব নয়। ফেলের স্তরের ভাষাও যত্ন পেলে পাশের ঘরে উঠে যেতে পারে। একটা চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত নিই—রোমকরা যখন ইউরোপ-আফ্রিকা দাবিয়ে বেড়াচ্ছিল তখন কি তারা জানত—ওই জার্মানীর অরণ্যবাসী সেই অসভ্য জাতিদের ভাষা এত বড় হয়ে উঠবে যে, তাতে রোমের ভাষা হার মানবে? কিংবা, জার্মানদের দ্বীপান্তরিত এক শাখার ভাষা ব্রিটেনে এমন বিকশিত হয়ে উঠবে যে, পৃথিবীর কোনো ভাষাই কোনো কালে তার সমান হয় নি। অথবা, পঞ্চাশ বৎসর আগে কেউ বলতে পারত কিরঘিজ ভাষা (এখনো মাত্র ১০ লক্ষ লোকের ভাষা) সত্যই কোনো কালে লেখা হবে; তাতে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদান সম্ভব হবে, এমন-কি সাহিত্যও রচিত হবে? ইতিহাসের কার্যকারণ সূত্রে কে যে কী ভাবে বড় হবে ছোট হবে, তা জোর করে বলা যায় না। অলৌকিক কিছু না ঘটলেও অভাবনীয় উন্মেষ কতই না ঘটে! তাই সকলের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণই বুদ্ধিমানের কাজ।

সকল ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা আরেকটা কারণেও পোষণ করা উচিত—সকল জাতির প্রতি, সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা যেহেতু মনুষ্যত্বেরই পরিচায়ক। ছোট-বড়র প্রশ্ন তাতে নেই এটা মনুষ্যত্বের দায়িত্ব।

দ্বিতীয় কথা : প্রত্যেকেরই নিজের ভাষার সম্বন্ধে অপর ভাষার সঙ্গে তর্কে-আলোচনায় হওয়া উচিত একই কালে পরমতসহিষ্ণু ও আত্মমর্যাদাবান্। এই যুগল দৃষ্টি না থাকলে পরের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া অনুচিত।

তৃতীয় কথা : আলাপ-আলোচনায় শুধু নয়, সর্ব সময়েই আরেকটা মনোভাবও থাকা চাই—কোনো ভাষারই বিকাশের প্রয়োজন শেষ হয়ে যায় নি। যে উন্নত তারও উন্নততর হওয়া প্রয়োজন। সব ভাষারই কিছু না কিছু অভাব আছে। কিন্তু তার মধ্যে কোন্ অভাব গুরুতর, উন্নতির প্রয়াসেও কোন্ কাজ আগে, কোন্ কাজ পরে,—কার অগ্রাধিকার, তা স্থির করা চাই। অবশ্য ভাষার অবস্থা ঠিক মত না জানলে তা সম্ভব নয়। এজন্যই প্রথম দরকার অবস্থা বিশ্লেষণ করা, তারপর অভাব বোঝা, তারপর অগ্রাধিকার স্থির করা।

॥ চার ॥

পর্যায় নির্ণয়

প্রত্যেক ভাষারই জন্মপত্রিকা আছে, হিন্দু-আর্য, না মঙ্গোলীয় এরূপ কোনো পরিবারে তার জন্ম, ইত্যাদি। জাতি-গোত্র-শুদ্ধ তার পরিচয়ও নেওয়া চলে। সেরূপ পরিচয় ছাড়াও আরও বিচার

আছে—তার বিশেষ চরিত্র কী? চরিত্র নির্ণয় অবশ্য খুব জটিল প্রশ্ন। তবু, সূচনা না হলেও মোটামুটি কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা সহজ। যেমন, বিশ্লেষণমূলক (যথা ইংরেজি), সংশ্লেষণমূলক (যথা সংস্কৃত), কিম্বা, জড়পাকানো (যথা দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ভাষা), গ্রহণ-পটু (যথা ইংরেজী, উর্দু), না গঠন-পটু (যথা জার্মান), ইত্যাদি কোন লক্ষণ কার বৈশিষ্ট্য। এসব মোটা কথা। চরিত্র-নির্ণয়ে সূক্ষ্মতর প্রশ্নও অনেক আছে। তবে আপাতত সে আলোচনায় না গিয়ে বরং আরও মোটা এবং গোড়ার কথাই আগে ভাবা যাক্—কোন্ ভাষা কী সামাজিক ভূমিকা পূরণ করে—তার-কাজ কী ও কতটা—এইটিই আমাদের পক্ষে ভাষার পর্যায় নির্ণয়ের প্রধান মানদণ্ড।

এই সামাজিক ভূমিকার দিক থেকে আধুনিক পৃথিবীর ভাষা গুলিকে মোটা-মুটি এরূপ ৭।৮ পর্যায়ে ভাগ করা হয়। দ্রষ্টব্য : 'ভাষা ও ভাষার বিকাশ—ভিক্টর ভিনোগ্রাদভ্ ও ইউনুস্ দেশেরিয়েভ্'—Victor Vinogradov & Tunu Desheriev, সোভিয়েত দেশ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৬৭ সাল।

"রাষ্ট্রীয় বাহন"

(১) প্রথম পর্যায়ে গণ্য যে-সব ভাষা একই কালে (ক) জাতীয় ভাষা, (খ) সরকারী ভাষা, এবং (গ) আন্তর্জাতিক আদান-প্রদানের কাজে সর্বাধিক ব্যবহৃত ভাষা। যেমন, ইংরেজি, রুশীয়, ফরাসী, হিস্পানী ও চীনাভাষা—এই ৪টি ভাষাই জাতিসংঘেরও সরকারী ভাষা। অর্থাৎ 'আন্তর্জাতিক সরকারী ভাষা'। ইংরেজির কথা তুলব না, রুশেরও না। হিস্পানীও বোধ হয় দক্ষিণ আমেরিকার বহু ব্যবহৃত বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তাতেই এ পর্যায়ে স্থান পেয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে ফরাসী ভাষা স্থান পেল কি করে? বহুদিন ধরে তা 'লিঙ্গোয়া ফ্রাঙ্কা' ও কোনো কোনো ঔপনিবেশিক জাতিদের কাছে এখনো স্বীকৃত প্রধান ভাষা। না হলে লোকবলে ফরাসী ভাষা জাপানী, হিন্দী প্রভৃতি অনেক ভাষারই পিছনে। আর সম্ভবতঃ 'জাতিসংঘে'র প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে যারা ছিল তাদের ভাষাই জাতি-সংঘের বিচারে সুবিধা লাভ করেছে। না হলে হিন্দী, জাপানী, জার্মান, ইতালীয় ভাষাকেও এ পর্যায়ে স্থান দেওয়া চলত। আরবী ভাষার ব্যাপারে একটু আপত্তি হতে পারত, তা মানি। (ক), (খ), (গ); তিনটি দফাতে না হোক। প্রথম দুটি দফার গুণ ও-সব ভাষার যথেষ্ট আছে—অন্ততঃ ফরাসী বা হিস্পানীর থেকে তা কম নয়। আর তর্ক করলে বলতে পারি—এ তিন গুণই কি বাঙলারও নেই। তা বাঙালি (ক) জাতির ভাষা (খ) যা বাঙলা রাজ্যের রাজ্যভাষা, পাকিস্তানের বিকল্প রাষ্ট্র ভাষা, আর সে হিসাবেই (গ) আন্তর্জাতিক আদান-প্রদানের কাজে (পশ্চিম বাঙলায় ও পূর্ব পাকিস্তানে) ব্যবহার্য ভাষা। কিন্তু এ উক্তি তর্ক-সাপেক্ষ। কারণ, পঃ বঙ্গে কি সত্যই বাংলা রাজ্য ভাষায় পরিণত হয়েছে? কথা এই, বাঙলার স্থান এ পর্যায়ে হতে পারে, হয় নি। কিন্তু হতে পারে কি কোন দিন? তা নির্ভর করবে, পশ্চিম বাঙলা ও পূর্ব পাকিস্তান একযোগে যদি ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র দুটিকে দিয়ে আবার একযোগে বাঙলার (গ) বিষয়ক দাবি তোলাতে পারে, তার ওপর। তবে আপাতত এ প্রশ্ন অগ্রাধিকার পাবার মতো প্রশ্ন নয়। এ পর্যায় বিভাগে আরেকটা কথাও বিবেচ্য হয়—এসব ভাষার চারিত্রিক গুণ—এদের সরলতা (শব্দগঠনের শক্তি) ও সরলতা (সর্বকর্মে ব্যবহার যোগ্যতা, বাক্য-স্বচ্ছন্দ প্রভৃতি তার ফল)। সে আলোচনা এখানে থাক।

আরবী ভাষার সম্বন্ধে একটা কথা—সাহিত্যিক আরবীর 'সাধু' রূপ বহু বিস্তৃত। কিন্তু কার্যত আরবী, ইরাকে, সিরিয়ায়, কায়রো, আলজিয়ার্সে পৃথক পৃথক ভাষা।

(২) দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাষা হল তা যে-সব ভাষার ব্যাপক সামাজিক ভূমিকা

আজকের দিনের উপযোগী কয়েকটি বাংলা পুস্তিকা

কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক বৈঠক (পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)	...	দাম ২০	পয়সা
কমিউনিজম কি ও কেন? (চতুর্থ সংস্করণ)	...	„ ৩০	„
নয়া দুনিয়ার দর্শন (তৃতীয় সংস্করণ)	...	„ ১৫	„
মার্কস্‌বাদ : উৎস ও সারমর্ম (দ্বিতীয় সংস্করণ)	...	„ ৩০	„
সাম্রাজ্যবাদ এবং উপনিবেশবাদ : অতীত ও বর্তমান	...	„ ৪০	„
ভরুনদের গড়ে তোলার প্রসঙ্গে লেনিন	...	„ ৩০	„
সমাজতন্ত্রের সন্দেহাতীত শ্রেষ্ঠতা	...	„ ৪০	„

লেনিন শতবর্ষ (১৮৭০-১৯৭০) গ্রন্থমালা সিরিজ

লেনিনের জীবনের কয়েকটি পৃষ্ঠা	...	দাম ৫০	পয়সা
লেনিন যেমনটি পরিকল্পনা করেছিলেন	...	„ ৫০	„
লেনিনের দেশের নারী	...	„ ৫০	„

সোভিয়েত দেশ প্রকাশনীর যে-কোন পুস্তিকার জন্য স্থানীয় পত্র-পত্রিকা এবং সোভিয়েত দেশ প্রকাশনীর এজেন্টের নিকট খোঁজ করুন

অথবা

প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা, ওড়িয়া এবং অসমীয়া যে কোন নিচের ঠিকানায় অর্ডার দিন

পুস্তিকা পাঁচ বা ততোধিক কপি নিলে কমিশন দেওয়া হয়।
বিস্তারিত বিবরণের জন্য সরাসরি নিচের ঠিকানায় চিঠি লিখুন

সোভিয়েত দেশ প্রকাশনী

১।১, উড স্ট্রীট, কলিকাতা ১৬

আছে ও রাজ্য ভাষা এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্বও আছে—কিন্তু জাতিসংঘের সরকারী ভাষা রূপে তাদের চাপরাশ্ জোটে নি। এ রূপ ভাষাই জার্মান, জাপানী ও ইতালীয়। এ পর্যায়েও হিন্দী, বাঙলা তাই গ্রাহ্য নয়। কারণ, রাষ্ট্রনৈতিক গণনায় হিন্দী বা বাঙলা রাজ্যভাষা, 'রাষ্ট্রভাষা' নয়। হিন্দী ভারত-রাষ্ট্রের অবশ্য বিকল্প রাষ্ট্রভাষা। বাঙলা পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিকল্প রাষ্ট্র-ভাষা। তবু ইংরেজিই কার্যত দু' রাষ্ট্রের প্রধান রাজনৈতিক ভাষা, 'রাষ্ট্রিক বাহন' রূপে বাইরে পরিচিত। ভারত-রাষ্ট্রের স্বরূপ স্থির না হতে এ গ্রন্থিচ্ছেদ হবে না—অন্তত বাইরের পৃথিবীতে। তবে পাকিস্তানে বাঙলা প্রধান ভাষা হয়ে ওঠা অসম্ভব হবে না—যদি পূর্ব পাকিস্তান তার রাজনৈতিক সত্তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে। আর তা ঘটলে—পূর্ব পাকিস্তানের দৌলতেই বাঙলা এই দ্বিতীয় পর্যায়ে উঠে আসতে পারবে।—হিন্দীও সেখানে আসবে হয়তো হিন্দী রাজ্যসমূহের চাপে ভারতবর্ষের প্রধান ভাষা হিসাবে—ইংরেজি হবে তখন ভারতের প্রথম বিকল্প ভাষা (আর তামিল দ্বিতীয় ভাষা? তামিলও যদি ভারতের বিকল্প ভাষা হয়, তাহলে বাঙলা, তেলুগু, মারাঠী, উর্দু প্রভৃতি অপর ১৩টি ভাষাকে সে পদবীচ্যুত করা হবে কোন্ যুক্তিতে?)

(৩) তৃতীয় পর্যায়ে পড়ে যেসব ভাষার সামাজিক ভূমিকা আছে এবং যা বহু জাতিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা; কিন্তু এখনো 'রাষ্ট্রিক বাহন' রূপে সম্পূর্ণ সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। এই পর্যায়েই ধরা হয়ে থাকে ভারতের হিন্দী, পাকিস্তানের উর্দু, ইন্দোনেশিয়ায় (মালয় ভিত্তিক) ইন্দোনেশীয় ভাষা, এবং আরবী ভাষাকে। রাষ্ট্রভাষা হবার সুযোগ এদের লাভ হয়েছে ওসব রাষ্ট্রের স্বাধীনতা লাভের পরে। এর মধ্যে বাঙলাও গণ্য। কারণ, ভারতের তা রাষ্ট্রভাষা নয়, কিন্তু পাকি-স্তানে বাঙলা ভাষা সে মর্যাদা-লাভ করেছে। কিন্তু বাইরের পৃথিবী তা জানে না। পূর্ব পাকিস্তানের রাজ-নৈতিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত না হ'লে বাঙলাও পাকিস্তানে স্বীকৃত মর্যাদা কার্যত প্রবর্তিত করতে পারবে না। অর্থাৎ, জাতির রাজনৈতিক বাস্তব প্রতিষ্ঠা না থাকলে ভাষার সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভাবও সত্যই বাস্তব হয়ে উঠতে পারে না। তাহলে পশ্চিম বাঙলায় বাঙলাকে 'রাজ্যভাষা' করার আইন পাশ করাই যথেষ্ট নয়। বাঙলার মর্যাদা পঃ বঙ্গে যথোচিত ও বাস্তব করতে হলে (ক) রাজ্য সরকারের কাজে তা ব্যাপক ভাবে চালু করাও দরকার, এবং (খ) ভারত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও বাঙালির বিশিষ্ট রাষ্ট্রজাতি (nation) হিসাবে পরিচয় পরিষ্কার করে তোলা দরকার।—অর্থাৎ এ কথাটা পরিষ্কার করা দরকার ভারত uni-national রাষ্ট্র নয়, multi-national রাষ্ট্র, একজাতিক নয়, বহু-জাতিক দেশ।

বিশিষ্ট রাষ্ট্রজাতি'র অর্থ এ নয় যে আমরা ভারতীয় মহাজাতির থেকে পৃথক এক রাষ্ট্রজাতি, বরং তার অর্থ—ভারতীয় মহাজাতিরই অংশ এক বিশিষ্ট 'রাষ্ট্র-জাতি'—ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন সত্য সত্যই ইউনিয়ন অব ইণ্ডিয়ান স্টেটস্, বা সঙ্ঘ-রাষ্ট্র, বহুরাজ্যের মিলিত সত্তা—বলাবাহুল্য, যদি এ চেতনা সঙ্ঘ-রাষ্ট্রের না থাকে তাহলে একদিন বিশিষ্ট রাষ্ট্রজাতিগুলি পৃথক রাষ্ট্রও চাইবে—বিচ্ছিন্নতার দাবি করবে। সে সম্ভাবনা একেবারে নেই তা নয়।—রাজনীতিতে অসম্ভব কিছু নেই। না হলে পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল কেন? ভারতের রাষ্ট্র-চালকরা জবরদস্তির দ্বারা এই বিচ্ছিন্ন-তার চেতনাকেই বাড়িয়ে তুলছেন।

অনেকে পুরনো দিনের নজির তুলে বলেন—রাজনৈতিক স্বীকৃতি ছাড়াও তো বাঙলা ভাষা বরাবর চলে এসেছে—ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙলা অদ্ভুত বিকাশ লাভ করেছিল, আর ঊনবিংশ শতাব্দীতে তো কথাই নেই। তাদের মতে ভাষার শক্তি—ভাষার সাহিত্যিক সৃষ্টিসম্পদ। এ কথা সত্য কিন্তু অর্ধ সত্য—মূলের তত্ত্বটা মিথ্যা নয়—ভাষার শক্তি ও সৃষ্টিসম্পদ দিয়েই ভাষার স্থায়িত্ব ও মহত্ব। কিন্তু এসব মনস্বীদের রাষ্ট্র সম্বন্ধে ধারণাটা সেকেলে ও তাই ভুল। সেকালে রাষ্ট্র ছিল দুষ্টের শাসন ও রাজস্ব আদায়েই প্রধানতঃ ব্যাপৃত সীমাবদ্ধ। একালে রাষ্ট্র তদুপরি প্রজাপালন কর্মটাকে নতুন রূপে ব্যাপক করে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। প্রজাদের চাষ-বাস, শিক্ষা, উৎপাদন, বণ্টন, সাংস্কৃতিক উদ্যোগ সব কিছুতে হাত না দিয়ে পারে না। কাজেই ১৫শ ১৬শ কেন, ১৯শ শতকের রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ সাহিত্য-শিল্পের স্বরাজ স্বাধীনতাও এখন, এই ২০শ শতকে, আর সম্ভব নয়। সমাজ-তন্ত্রের নীতি-পদ্ধতি যতই প্রবর্তিত হচ্ছে ততই আধুনিক রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও অধিকার প্রসারিত হয়ে চলেছে। এ জন্যই ভাষা ও সংস্কৃতির পক্ষে উন্নতির পক্ষে, রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি শুধু নয়, বাস্তব রাষ্ট্রীয় সহায়তা লাভ করাও অন্যতম প্রধান শর্ত। পঃ বাঙলায় বাঙলা ভাষার তাই চাই পঃ বঃ রাজ্যের পূর্ণতম সহায়তা, এবং চাই ভারতরাষ্ট্রের নয়া দিল্লী থেকে সকল রাজ্যভাষার সমতুল্য সহায়তা লাভ, অন্তত প্রত্যেকের জনবল আনুপাতিক সহায়তা-লাভ।

যাই হোক। দেখা যাচ্ছে প্রধান পর্যায়ের ভাষা হতে হলে রাষ্ট্রীয় অধিকার চাই।

(৪) চতুর্থ পর্যায়ে গণ্য যে সব ভাষা স্বদেশে রাষ্ট্রীয় অধিকার নেই,—তবে শিক্ষা-দীক্ষায়, আদান-প্রদানে সামাজিক ভূমিকা বেশ আছে; কিন্তু সে সব ক্ষেত্রেই তা সীমাবদ্ধ। ইউরোপের চোখে এ পর্যায়ের ভাষা বলে গণ্য হয়—ওলন্দাজী (ডাচ্), বেলজিয়ামের সাহিত্যিক ভাষা (ফ্লেমিস্?) তুর্কী, গ্রীক (আধুনিক), ফারসী, দিনে-মারী, নরওয়েজীয় সুইডিশ প্রভৃতি ভাষা। এসব ভাষার অতীতে রাজনৈতিক ভূমিকাও কারও কারও ছিল (যেমন গ্রীক, ফারসী, তুর্কী ও ডাচ্ ভাষার ছিল); সকলেরই সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বেশ ভূমিকা বরাবর আছে; শিক্ষা-দীক্ষায় মর্যাদার আসন তাদের প্রাপ্য।

এ পর্যায়েও যে বাঙলা বা তামিল প্রভৃতি ভারতীয় প্রধান ভাষাগুলি গণ্য হয় না, তার কারণ ইউরোপীয় পণ্ডিত-দের অজ্ঞতা; এবং ভারতীয় রাজনৈতিক সামাজিক জীবন সম্বন্ধে তাদের স্পষ্ট ধারণার অভাব। আমরা অবশ্য মনে করি এ পর্যায়ে কেন, অন্তত দ্বিতীয় পর্যায়েই বাঙলা প্রভৃতি ভারতীয় কোনো কোনো আধুনিক ভাষা গণ্য। কিন্তু তবু জানা ভালো—বাইরে তা যেরূপ গণনীয় হয় নি। আর সেখানে তা গণনীয় হয়ে উঠবে যদি আমাদের ভাষাকে আমরা জ্ঞান ও সৃষ্টি-সম্পদে মহীয়ান করতে পারি এবং তার রাজনৈতিক মর্যাদাকে ও বাস্তব প্রতিষ্ঠা দান করতে পারি।

বুঝতেই পারি আরও যে-সব পর্যায় আছে তাতে পড়ে 'মাইনর' বা অপ্রধান ভাষাদের ভাষাগুলি। রাজনৈতিক কেন, সামাজিক ভূমিকাও তাদের সুপ্রশস্ত নয়। কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষায় তাদেরও কারও কারও প্রয়োগ দেখা যায়। শিক্ষা-দীক্ষায় প্রবৃত্তি দিয়েই তাদের পর্যায় বিভাগ। হিসাবটা দেখা যাক।

(৫) পঞ্চম পর্যায়ের ভাষা সে সব, যে-সব ভাষায় শিক্ষার প্রাথমিক ও মাধ্য-মিক পর্বের কাজ চলে।—বলা বাহুল্য, ভারতের অনেক ভাষারই এ সামর্থ্য আছে। যতদূর জানি—মৈথিলী, সিন্ধী(?), গোর্খালী মণিপুরী (?) গাড়ো, খাশী, মিজো ভাষাও এ পর্যায়ে গণ্য। সাঁওতালী মাধ্যমিক শিক্ষায় ব্যবহৃত হয় কিনা জানি না। আজ না হলেও কাল হবে,—আমি অন্তত তা আশা করি। তাকে সাহায্য করাও কর্তব্য মনে করি।

মনে রাখতে পারি—মৈথিলী, গোর্খালী প্রভৃতি ভাষার সাহিত্যও রচিত হয়েছে। (এম-এ পরীক্ষায়ও মৈথিলী পরিক্ষণীয় অন্যতম ভাষা বলে গ্রাহ্য)।

[শেষাংশ ২০৮ পৃষ্ঠায়]

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্র ও যুবকদের ভূমিকা

অনন্ত সিংহ

পৃথিবীর যে কোন দেশের বিপ্লবী ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে প্রতিটি দেশের বিপ্লবে বা স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্র ও যুবকরাই একটি বিশেষ ভূমিকা রচিত করেছে। ভারতবর্ষেও সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের দু'শ বছরের শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলন, সশস্ত্র সংগ্রাম ও গণ-অভ্যুত্থানের যে ইতিহাস আমরা পাই তার প্রতিটি পৃষ্ঠার ছত্রে ছত্রে ছাত্র ও যুবকদের ত্যাগ, বীরত্ব ও সংঘবদ্ধ অভিযানের কথা রক্তাক্ষরে লেখা আছে।

১৯০৫ সালে রুশ দেশে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে 'Moscow Insurrection'-এর সমকালে বাংলাদেশে লর্ড কার্জনের কু-খ্যাত সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে সহস্র সহস্র বাঙালীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠলো—"বন্দেমাতরম্!" লর্ড কার্জন বাংলার বৈপ্লবিক চেতনাকে দুর্বল ও শক্তিহীন করবার অভিপ্রায়েই অখণ্ড বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করবার আইনটি ঘোষণা করলেন। বিহার, উড়িষ্যা ও বাংলা নিয়ে বৃটিশ শাসিত যে রাজ্য ছিল তার রদবদল করতে চাইলেন বাংলার এক অংশকে বিহার ও উড়িষ্যার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে এবং বিভক্ত বাংলার অপর অংশকে আসামের সঙ্গে সংযোজিত করে।

বাঙালীর জাতীয়তা বোধ, বাঙালীর কৃষ্টি, শিল্প ও সংস্কৃতি, এক ভাষা এবং বাঙালী জাতির একাত্মবোধের বিরুদ্ধে অখণ্ড বাংলার ভৌগলিক অবস্থান ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপরে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই কঠোর কুঠারাঘাত বাঙালী জাতিকে বিচলিত ও বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন সুরু হ'ল। আন্দোলনের রূপ নিল—বৃটিশ পণ্যদ্রব্য বর্জন। বৃটিশের স্বেচ্ছাচারমূলক নীতির প্রতিবিধানে এই স্বদেশী আন্দোলনের পুরোভাগে দেখা গেল বাংলার বিপ্লবী তরুণ-তরুণীদের—দেশ-বরেণ্য নেতাদের উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল জনসাধারণকে বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এগিয়ে আসবার আহ্বান। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ বহু জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দ এই স্বদেশী আন্দোলন পরিচালিত করছিলেন। বাঙালীর এই তীব্র স্বদেশী আন্দোলনকে ধ্বংস করবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসকদের নিষ্পেষণ-নীতি চরম রূপ নিল। লর্ড কার্জন ঔদ্ধত্যের চরম সীমা লঙ্ঘন করে ঘোষণা করলেন—"Partition of Bengal is a settled fact"—(বঙ্গ বিভাগ একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত)। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের প্রতিনিধি লর্ড কার্জন ভেবেছিলেন বাংলার স্বদেশী আন্দোলন তাঁর গর্জনে ভীত-ত্রস্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করবে—এই ব্যাপক স্বদেশী আন্দোলন চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু এই সাম্রাজ্যবাদী ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কম্বু কণ্ঠ নিনাদিত হ'ল—"I will unsettle the settled fact."

স্বদেশী আন্দোলনের গতি ক্রমেই তীব্র হতে তীব্রতর হ'ল। বৃটেনে প্রস্তুত যাবতীয় পণ্যদ্রব্য বর্জন করে সরকারকে সমুচিত শিক্ষা দিতে বাংলার জনসাধারণ বদ্ধপরিকর। বাঙালী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করলো, জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তন ও দেশীয় শিল্পের, বিশেষ করে বস্ত্র শিল্পের উন্নতি করে জাতীয় শিক্ষা নতুন প্রণালীতে পরিচালিত করলো। সঙ্গে সঙ্গে 'Home-rule'-এর দাবি (স্বরাজের দাবি) উত্থাপিত হ'ল। বিলাতী পণ্য বর্জন, স্বরাজের দাবি ও জাতীয় শিক্ষা—এই তিনটি ধারায় আন্দোলনের গতি প্রবাহিত হ'ল। বাংলার এই বিরাট জাতীয় আন্দোলনকে 'স্বদেশী আন্দোলন' বলেই আমরা জানি। এই আন্দোলনের ঢেউ ধীরে ধীরে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়লো। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, বিখ্যাত নাট্যাচার্য দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ মনীষীরাও এই আন্দোলনের প্রবল প্রবাহের প্রভাবে আকৃষ্ট হলেন এবং নানাভাবে তাঁদের সমর্থন জানালেন। এঁদের সঙ্গে আব্দুর রসুল, লিয়াকৎ হোসেন প্রমুখ জাতীয়তাবাদী বাঙালী মুসলমান নেতারাও এই আন্দোলনে যোগ দিলেন।

বৃটিশ শাসক সম্প্রদায় কঠোর হস্তে এই প্রচণ্ড গণ-বিক্ষোভ দমনে তৎপর হলেন। ইংরেজ শাসনের এই নিপীড়ন-নীতির বিরুদ্ধে ছাত্র ও যুবকদের এক-অংশ বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতি গঠনের কাজে ব্যাপৃত হ'ল। এই নিদারুণ দমন-নীতির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে শ্রীঅরবিন্দ গুপ্ত-সমিতি গঠন করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই আমরা দেখতে পাই বাংলা তথা ভারতের বহু স্থানে বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সব সমিতির কর্মসূচী—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী অনুচরদের সমুচিত শিক্ষা দেওয়া এবং প্রয়োজনের খাতিরে তাদের বুকের রক্তে ভারতীয়দের রক্তের ঋণ পরিশোধ করা।

বাংলার ছাত্র-যুবক বোমা ও পিস্তল হাতে প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য ছুটে গেল। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর হাতের বোমা ও পিস্তলের গর্জন বাংলার তরুণদের সশস্ত্র ব্যক্তিগত আক্রমণের পথ দেখালো। বাংলার স্বদেশী আন্দোলন এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হ'ল যার প্রলয় বিভীষিকা লর্ড কার্জনের বঙ্গ বিভাগের অত দম্ভকেও ধুলোয় মিশিয়ে দিল—বঙ্গ বিভাগের সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত সম্পূর্ণ ব্যর্থ হ'ল। অখণ্ড বাংলা তার ভৌগলিক সীমা রক্ষায় সামর্থ্য হয়েছিল।

সেই যুগে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রাম একটি বিশেষ অধ্যায়। এই অধ্যায়টি অতিক্রম করে বিপ্লবের পরবর্তী পর্যায়ে যাওয়া বাস্তবে সম্ভব নয়। সেই হেতুই এই জাতীয়তাবাদী ধনিকশ্রেণীর নেতৃত্বকে ভারতবাসী তখন অস্বীকার করতে পারে নি। সেই সময় ভারতবর্ষে শ্রমিক ও কৃষক নেতৃত্ব গড়ে ওঠার মত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

ছিল না। তাই সেই যুগে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলন, জাতীয় সংগ্রাম ও যুবকদের জঙ্গী সংগ্রাম এবং বিপ্লবী যুবকদের সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ অনুচরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ নিরবচ্ছিন্নভাবেই চলেছিল। সংগ্রাম কখনও তীব্রতর ও প্রবলতর হয়েছে আবার কখনও বা মন্থর গতিতে চলেছে। কিন্তু বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনের পর থেকেই আন্দোলন যে গতিতে প্রবাহিত হয়েছে তাতে বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতির কার্যক্রম ক্রমেই বেড়ে চলেছিল।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী অনুচরদের ব্যক্তিগতভাবে হত্যা করে সন্ত্রাস সৃষ্টির পরিকল্পনা বিপ্লবীদের ছিল। সেই কর্মসূচী কার্যে রূপায়িত করতে গিয়ে বহু অমূল্য জীবন বৃটিশের রাইফেলের গুলীতে ও ফাঁসি কাষ্ঠে আত্মাহুতি দিয়েছে। ছাত্র ও যুবকদের এই বিরাট আত্মত্যাগ কী ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে এক অপরিহার্য ভূমিকা নয়?

"Terrorist ও Anarchist"—এই দুটি শব্দের পার্থক্য যারা বোঝে না সেই সব ইংরেজ-প্রভুরা ও তাদের অনুচরেরা বাংলার অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের না বুঝেই ঐ দুই আখ্যায় ভূষিত করেছেন। এমন কি রাজনীতিজ্ঞেরাও ব্যক্তিগত রাজনৈতিক হত্যাকে নিন্দা করে বিপ্লবীদের "Terrorist" বলে গালিগালাজ করতে কসুর করেন নি। আজকে বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে ভারতবাসী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ভারত জুড়ে কংগ্রেসের শান্তিপূর্ণ অসহযোগ ও আইন-অমান্য আন্দোলন বৃটিশের দমন-নীতির ফলে যখন স্তিমিত হয়ে এসেছিল তখন আন্দোলনে প্রাণসঞ্চার করতে প্রেরণা যোগাতে গান্ধীজীকেও অহিংসার রণ-নীতি বা রণ-কৌশলের প্রয়োগ ক্ষেত্রে তারতম্য করতে হয়েছিল। তিনিও বাস্তবতার সঙ্গে "Individual actions"-এর প্রয়োজনীয়তা মেনে নিয়ে ডাক দিলেন Individual সত্যাগ্রহের এবং প্রথম সৈনিক হিসাবে বাছাই করলেন বিনোবা ভাবেজীকে। এই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ভেবে দেখতে হবে গান্ধীজীর এই Individual সত্যাগ্রহের আরও প্রায় চল্লিশ বছর আগে বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক চেতনা কোন্ পর্যায়ে ছিল। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ কঠোর হস্তে ভারতবাসীকে শাসন করছে; স্কুল-কলেজে ছাত্র-যুবকদের সম্রাটের জয়-গান শেখানো হচ্ছে—বৃটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য কখনও অস্ত যায় না বলে ছাত্র-যুবকদের বিকৃত চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত করছে। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সভা-সমিতি, মিছিল প্রভৃতির কোনো সুযোগ-সুবিধে বা বৃটিশ শাসনমুক্ত হবার জন্য ভারতবাসীর পক্ষে কোনো সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার যখন এতটুকু সম্ভাবনাও ছিল না, তখন আমাদের গান্ধীজী কোথায় ছিলেন? গান্ধীজী ভারতের আন্দোলনে অবতীর্ণ হওয়ার প্রায় বিশ বছর আগে থেকে বাংলার ছাত্র-যুবকেরা, ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে আত্মাহুতি দিতে এগিয়ে এসেছে। দেশ-বরেণ্য সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন পাল, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ নেতাদের লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রচার বাংলার বিপ্লবী শক্তিকে যে উদ্বুদ্ধ করেছিল তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ নেতারা ছাত্র ও যুবকদের নিয়ে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুললেন। বাংলার তরুণ বিপ্লবী সমাজ বুঝেছিল প্রবল শত্রু ইংরেজের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র অহিংসা, প্রচার করলেই চলবে না—চাই চরম স্বার্থত্যাগ, দুর্জয় সাহস ও চরম আত্মত্যাগ। তারা বুঝেছিল সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের প্রচণ্ড সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে তাঁদের মুষ্টিমেয় শক্তি তুলনামূলকভাবে দেখতে গেলে হয়ত কিছুই নয়; তবু ব্যক্তিগতভাবে যদি এক একজন একটা ঘূর্ণি বা মহাঝঞ্ঝা বা প্রজ্বলিত উল্কা-পিণ্ডের মত সাহস ও বিক্রমের সঙ্গে

অগ্নিযুগের বিপ্লবী অনন্ত সিংহের চাঞ্চল্যকর সচিত্রগ্রন্থ

১ম খণ্ড ৯·০০ টাকা

"চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ"

২য় খণ্ড ১০·০০ টাকা

— অভিমত —

Amrita Bazar Patrika :: "We read the two volumes as though we were plodding through a Tolstoy epic. But this epic with all its distinguishing traits is based entirely on facts."

আনন্দবাজার পত্রিকা : "রক্তস্নাত দিনের কাহিনী—লেখক অনন্ত সিংহ নিজে সেই ঘটনার অন্যতম নায়ক, ভাষার সাহায্যে তিনি সেই ঘটনাকে আবার সে-রকম জীবন্ত ও মর্মস্পর্শী করে তুলতে পেরেছেন; তা সত্যিই বিস্ময়কর।.....পড়তে পড়তে শরীর নিষ্পন্দ করে।"

যুগান্তর : "চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধ মনে করিয়ে দেয়—হলদিঘাটের সেই যুদ্ধের কথা।.....অনন্ত সিংহের এই বিপুল প্রয়াস সমগ্র জাতির অভিনন্দন পাবার যোগ্য।..... এ এক জ্বলন্ত ইতিহাস—বিপ্লবী বাঙলার অনবদ্য মূর্তি। আর বর্ণনার ব্যঞ্জনায় রক্তক্ষরা মহাকাব্য।"

সাপ্তাহিক বসুমতী : "বইখানি বাংলাভাষার গ্রন্থভাণ্ডারে এক অমূল্য সংযোজন। বইটির সাহিত্যমূল্য যতখানি, ইতিহাস মূল্যও ততখানি।"

দেশ : "অগ্নিঝরা বিদ্রোহের কাহিনী সুপরিকল্পিতভাবে, এবং সুপ্রচুর নিষ্ঠা সহকারে লিপিবদ্ধ করতে উদ্যোগী হয়েছেন, এমন একজন ব্যক্তি, যিনি ঐ বিদ্রোহের অন্যতম নেতা, শ্রীযুক্ত অনন্ত সিংহ।.....লেখকের সরস ও প্রাণবান লেখনীস্পর্শে এই গ্রন্থদ্বয় যে কোন সৃষ্টিমূলক রচনার মতই প্রাণস্পর্শী।..... এ জাতীয় গ্রন্থের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা যতটা ব্যক্তিগত তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে জাতিগত।"

প্রকাশক : সেন এণ্ড কোং, শিবালয়, বরোদা এভিনিউ, গড়িয়া, ২৪-পরগণা ; ফোন : ৪৬-৫৮৭০

প্রাপ্তিস্থান : সকল বিশিষ্ট পুস্তকালয়।

অসংখ্য ভারতবাসী হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে বেছে বেছে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ রাজপুরুষদের ওপর কাঁপিয়ে পড়তে পারে তবে বিপ্লবী আদর্শের প্রভাবে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য লক্ষ লক্ষ নওজোয়ানকে উদ্বুদ্ধ করা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভংগী নিয়ে যদি পর্যালোচনা করে দেখতে হয় তবে দেখা যাবে গান্ধীজীর অহিংসা-অসহযোগ-আন্দোলন ও আইন-অমান্য-আন্দোলন যে ভূমিকা নিয়েছিল এবং তা বাস্তবে যতখানি ফলপ্রসূ হয়েছিল তার সঠিক মাত্রার গণ্ডি অতিক্রমের অধিকার ইতিহাসবিদ্‌দের নেই। আমরা যেমন স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীজীর অসহযোগ-আন্দোলনের কৃতকার্যতা সম্বন্ধে গণ্ডি নির্ণয়ের ইচ্ছে প্রকাশ করছি তেমনি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এটাও আমাদের নির্ণয় করতে হবে, যাদের আমরা সন্ত্রাসবাদী বলে আখ্যা দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে চাই, স্বাধীনতা সংগ্রামকে জয়যুক্ত করতে তাদের নিরবচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত ও সংঘবদ্ধ সশস্ত্র আক্রমণের সঠিক মূল্য কতখানি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জয় সূচিত হয়েছে ব্যাপক অহিংসা-আন্দোলনের মাধ্যমে এবং বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের আদর্শে ভারত জুড়ে জংগী সংগ্রামের কার্যকরী প্রভাবে। কেউ কী অস্বীকার করতে পারবেন, এমন কি গান্ধীজী যদি আজ বেঁচে থাকতেন তবে তিনিও কি অস্বীকার করতে পারতেন যে, ১৯২১ সালের অসহযোগ-আন্দোলন শান্তিপূর্ণ ও অহিংসার গণ্ডি অতিক্রম করে যায় নি? কেউ কি অস্বীকার করতে পারবেন ১৯৩০-৩২ সালের আইন-অমান্য আন্দোলনও যে অহিংসার গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল না? আবার জিজ্ঞাস্য—"Quit India"—'ভারত-ছাড় আন্দোলন' কি গান্ধীজীর অহিংসার স্বপ্ন-বিলাসের গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল? অবাস্তব চিন্তাধারার ভিত্তিতে অহিংসার স্বপ্ন-সৌধ নির্মাণ করা যায় বটে কিন্তু কোটি কোটি জনতার সংগ্রামকে অহিংসার মূলমন্ত্রে আবদ্ধ রেখে পরিচালনার মধ্যে ভাবপ্রবণতা থাকলেও বাস্তবতার অভাবকে অস্বীকার করা যায় না। গান্ধীজীর বৃটিশ পণ্য বর্জন ও অসহযোগ-আন্দোলন অহিংসা মন্ত্রে সংমিশ্রিত হয়ে ঘোষিত হবার প্রায় পনেরো বছর আগে বংগভংগের বিরুদ্ধে বাঙালী বৃটিশ পণ্য ও শিক্ষায়তন বর্জন প্রভৃতি কর্মসূচী নিয়ে গণ-সংগ্রাম করেছে। অবশ্য অহিংসার মহামন্ত্রটি তাতে নীতি হিসেবে ছিল না।

বৃটিশ শাসনের অধীনে ভারতবর্ষ তখনও শিল্পপ্রধান দেশ হিসেবে উন্নত হয় নি—কৃষিপ্রধান দেশ। শহরে শ্রমিকদের সংগঠন বা ইউনিয়ন খুব জোরদারভাবে গড়ে ওঠার সুযোগ ছিল না, কৃষকরাও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়ার পর্যায়ে আসে নি। ভারতের জাতীয় আন্দোলন ১৯২০-২১ সালে যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল তাতে শ্রমিক-কৃষকের নেতৃত্বের কথা চিন্তা করা নেহাৎই অবাস্তব। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব ছিল জাতীয়তাবাদী ধনিকশ্রেণীর হাতে। এতে নেতৃত্ব দিলেন গান্ধীজী, লোকমান্য তিলক, মতিলাল, বল্লভভাই প্যাটেল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মহম্মদ আলি জিন্না, আলি ভ্রাতৃদ্বয়, আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ প্রখ্যাত দেশভক্ত নেতারা। জাতীয় আন্দোলন এবং সংগ্রামের যে ঢেউ উঠলো তার পুরোভাগে দেখা গেল ছাত্র ও যুব-সম্প্রদায়কে। ছাত্র-যুবকের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে গান্ধীজীর সম্যক উপলব্ধি ছিল বলেই তিনি ছাত্রদের ডাক দিয়েছিলেন স্কুল-কলেজ বর্জন করে সংগ্রামে যোগ দিতে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের উদাত্ত কণ্ঠের আহ্বানে বাংলার স্কুল-কলেজ বন্ধ হ'ল, হাজার হাজার ছাত্র-যুবক বৃটিশ প্রভুত্বের উচ্ছেদকল্পে সংগ্রামের ময়দানে উপস্থিত হ'ল। সারা ভারতব্যাপী ছাত্র-যুবকের অভিযান এক বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করলো। বৃটিশ সরকার ১৯২১-২২ সালে, ১৯৩০-৩২ সালে ও ভারত-ছাড় আন্দোলনের তীব্র গতি রুদ্ধ করতে যতবারই তাঁদের কামান-বন্দুক আমদানী করেছেন ততবারই ছাত্র-যুবক এবং জনসাধারণের জংগী মনোভাব ও কার্যক্রম তীব্র হতে তীব্রতর হতে দেখা গেছে। ১৯২০-২১ সালের অভিযানে যদিও শ্রমিক ও কৃষকের প্রাধান্য ছিল না তবু জাহাজীদের, চা-বাগানের শ্রমিকদের ও ভারতের বিভিন্ন স্থানের রেলকর্মীদের ধর্মঘট এবং ঝরিয়া কয়লাখনির ধর্মঘট বুর্জোয়া নেতৃত্বেই সংঘটিত হয়েছে। শ্রমিকদের এই সব ধর্মঘটকে সফল করতে ছাত্র-যুবকরাও এতে অংশ গ্রহণ করেছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের বিস্তীর্ণ অধ্যায়ের বিভিন্ন স্তরে ছাত্র-যুব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ভূমিকার ইতিহাস বিদ্যমান আছে। পৃথিবীর ইতিহাসে ছাত্র-যুবকের অনবদ্য ভূমিকা যেমন অস্বীকার করা যায় না তেমনি ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে ছাত্র-যুবকের মরণপণ অসংখ্য সংগ্রাম ও তাদের চরম আত্মত্যাগের মহিমাও ভোলা যায় না। অগণিত জনসাধারণের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সংগে সমান তালে পা ফেলে একদিকে যেমন তারা সংগ্রাম করেছে তেমনি আবার তাদেরই এক অংশ বিপ্লবী প্রেরণা জাগাতে বোমা-পিস্তল নিয়ে শক্তিশালী বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসম সাহসে ও অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করেছে। ছাত্র-যুবক শক্তিকে শ্রদ্ধার সংগে আমাদের জানতে ও বুঝতে হবে। আবর্তন, বিবর্তন ও পরিবর্তনের সংগে ছাত্র-যুবক শক্তির ক্রমগতিকে কেউই রুখতে পারবে না—তাদের রথচক্রের অগ্রগতি জয়যুক্ত হবেই।

যাত্রীর লেখা অসংখ্য চিত্র শোভিত ও বহু তথ্য সমৃদ্ধ

'দেবভূমি হিমালয়ের দুর্গম তীর্থপথে'

প্রতিটি তীর্থযাত্রীর অপরিহার্য বই — ৫·৫০

প্রাপ্তিস্থান { প্রকাশক: উৎপল প্রভ সরস্বতী
৮৭।৫ রাজা এস. সি. মল্লিক রোড, কলি-৪৭ ফোন ৪৬-৫৪০৭
কথা ও কাহিনী: ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২

শান্তিনিকেতনে আমাদের সান্ধ্য আসরে যে যা পাবে গল্প বলে। সব নাকি সত্যি কথা। এটা আমাদের বন্ধু পতিতপাবনের গল্প। অর্থাৎ ঠিক তার গল্প না হলেও, টোবি বলে তার যে ভাগনে আছে, তার গল্প। টোবি নামকরা জীবতত্ত্ববিদ্।

টোবি নাকি তখন ডুন স্কুলে পড়ত। অনেক দিন আগের কথা। সেবার শীতের ছুটির পর যখন স্কুল খুলবে, বড় মাসি এসে মহা হাঙ্গামা করতে লাগলেন। ডেরাডুন থেকে সামান্য দূরে মুসৌরী যাবার পথে টোবির দাদামশায়ের কেম্ব্রিজের বন্ধু বুড়ো নর্টন সাহেব তার পোকা-মাকড়-প্রজাপতি নিয়ে বারো মাস থাকেন। অথচ এই তিন বছরের মধ্যে টোবির এতটুকু সময় হল না যে তাঁকে একবার দেখে আসে। আগে দাদামশাই প্রত্যেক বছর একবার যেতেন, এখন আর-ট্রেনের ধকল সহ্য হয় না বলে পারেন-না। টোবি ডেরাডুনে পড়ে অথচ খোঁজ নেয় না, একথা জানলে সাহেব বড়ই দুঃখিত হবেন।

টোবি বলল, 'তাহলে তাঁকে না জানালেই হল।' তাতে মা-ও বিরক্ত হয়ে উঠলেন, 'মিস্টার নর্টনের ঠিকানাটা ওকে দিয়ে দাও তো। গিয়েই প্রথম সুযোগে দেখা করে আসবে, টোবি। এর যেন অন্যথা না হয়।'

ছোটমাসি বললেন, 'পৃথিবীতে সব-চেয়ে ভালো রান্না হয় নর্টন সাহেবের বাড়িতে। বাবা এইরকম বলেন। যে একবার খেয়েছে, সে বারে বারে ফিরে যায়।'

বড়মাসি অবাক হলেন, 'তা হবে না কেন ? পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভালো রাঁধুনী যে ও'র বাড়িতে আজ চল্লিশ বছরের উপরে আছে।'

এবার টোবির একটু কৌতূহল হল, 'পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে ডেরাডুনের ঐ শহরতলিতে বাসা বাঁধবার মানেটা কি ? ওখানে তো রাতে একটা মোমবাতি জ্বাললেও হাজার হাজার পোকা এসে জমা হয়। কি অদ্ভুত দেখতে একেকটা, আর কি বিটকেল গন্ধ!'

বড়মাসি বললেন, 'ঠিক তাই। ঠিক সেই জন্যেই ও'র কাছে জায়গাটার এত আকর্ষণ। সাহেব নিজে নাকি সাত হাজার জাতের পোকার রঙিন ছবি এঁকে আর তাদের বর্ণনা লিখে, জীব-বিজ্ঞানের জগতে অমিতবীর হয়েছেন। নিজের দেশে অত পোকাও নেই, তাছাড়া সেখানে বাতে ভোগেন। এইখানেই ঘর বাড়ি করে সুখে আছেন। পোকা ছাড়া কিছু জানেন না। বোধ হয় ইতিমধ্যে দেশটা যে স্বাধীন হয়ে কালা-আদমীরা গদীতে বসেছে, সে খবরও রাখেন না।'

টোবি বলল, 'চীনে কুক্ নিশ্চয়?'

'মোটেই না, মোটেই না। স্রেফ লণ্ডনের ককলি। কি যেন নাম, মিসেস কুম্ব না টুম্ব, না ঐ-রকম একটা কিছু। বাবা বলেন আগের জন্মে ওর-ই নাম ছিল দ্রৌপদী। তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। লণ্ডনে নাকি ওর পাঁচটারও বেশি স্বামী ছিল।'

মা একবার টোবির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চ্ চ্ চ্ চ্!' মাসি থেমে গেলেন।

টোবি তখনি ঠিক করে ফেলল গিয়ে দেখতেই হবে। স্কুলে ফিরবার সময় একেবারে গার্জিয়ানের চিঠি সঙ্গে করে নিয়ে গেল, যাতে সাহেবের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেতে অসুবিধা না হয়।

গিয়েও ছিল যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি। খানিকটা মুসোরীর বাসে, বাকিটা হেঁটে। আগে থাকতে চিঠি দিয়ে, কেতা-দুরস্ত-ভাবে।

সেইদিন থেকেই সাহেবের সঙ্গে টোবির অদ্ভুত এক বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়ে গেল। কত যে পোকা-মাকড় চলল টোবি তার ঠিক নেই। কত যে ঘুঘুল বনে বনে সাহেবের সঙ্গে। পঁচাত্তর বছর বয়স হলে কি হবে, খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে বুড়ো তরতর করে উঠে যেত। তার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে টোবিও দেখতে দেখতে পোক্ত হয়ে উঠল।

আর ঐ মিসেস কুম্বটির কথা বলে টোবি শেষ করতে পারত না। মানুষের হাত থেকে এমন রান্না যে বেরুতে পারে, টোবির ধারণা ছিল না। বুড়ি সরকিছু ঘরে করত, রুটি, বিস্কুট, কেক, পাস্ট, পুডিং, প্যাটি। তার উপর বাগান করত। তাজা তরকারি, বিলিতী ফল ফলাত। বাড়িটা যেন স্বপ্নরাজ্য, ইয়ে কি বলে, একটা বিলিতী স্বর্গ বললেও চলে। সাহেব বলত, 'কি বললে ? মন কেমন করে কি না ? কেন করবে ? আমার এই বাড়ি, এই বাগান, চারদিকের এই দৃশ্য, কোনটা ইংল্যাণ্ডের চেয়ে কম শুনি ? বরং ঢের ভালো। সেখানে কে আমার জন্যে এত পোকা জোগাত ? বন্ধু সেখানে আমার পাঁচটা বোন আর তাদের পঁচিশটা ছেলেমেয়ে অষ্টপ্রহর শুধু দাও—দাও করে কানে তালা লাগিয়ে দিত। সব বেচে বুচে, সরকারি কাগজ বানিয়ে, এখানে সুখে আছি। মিসেস কুম্বের বন্ধু যে পায়, তার স্বর্গে যেতেও ইচ্ছে করে না।'

সত্যি খুব ভালোমানুষ মিসেস কুম্ব, টোবিরও খুব যত্ন করত। সে কি খেতে ভালোবাসে একবার জানতে পারলেই হল। তার জন্য গরম মোজা, গেঞ্জি বুনে উপহার দিত। আর লণ্ডনের ভেল্কিবাজ চোর-ছ্যাঁচড়দের বিষয়ে এমন সব রোমাঞ্চময় গল্প বলত যে টোবি নিশ্বাস বন্ধ করে শুনত। কোথা দিয়ে সময় কেটে বেত টের পেত না। খুব ভাব হয়েছিল বুড়ির সঙ্গে।

এ রকম গল্প সে কোত্থেকে জোগাড় করল জানতে চাওয়াতে, মুখ গম্ভীর করে মিসেস কুম্ব উঠে গেল। সাহেব একটু হেসে বলল, 'এ প্রসঙ্গ ওর সামনে তুলতে হয় না, টোবি। ওসব কথা ও ভুলে যেতে চায়। এখানে এসে ও সম্পূর্ণ বদলে গেছে। দেশের সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই। একরকম বলতে গেলে ওরই জন্যে আমিও প্রথমটা প্রবাসী হয়েছিলাম। পরে অবিশ্যি এত পোকা পেয়ে আর দেশে ফেরার কথা মনেও হয় নি।

বলব একদিন সে গল্প।

পরীক্ষা দিয়ে চলে আসবার আগে বিষণ্ণ মনে সাহেবের কাছে বিদায় নিতে যেদিন টোবি গেছিল, সেই শনিবারের সন্ধ্যা-টার কথা সে কখনো ভুলবে না। সাহেব ওর বাড়ির সামনের ঐ ঘাস জমিতে, আপেল গাছের নিচে বসলে মনে হয় যেন এ জায়গাটা ইংল্যাণ্ডেরই একটা টুকরো হতে পারত। মিসেস কুম্ব রান্নাঘরে রাতের খাবার তৈরি করতে ব্যস্ত ছিল। নর্টন সাহেব এতদিন পরে মিসেস কুম্বের গল্প বললেন। লণ্ডনের কাছেই একটা কলেজে তখন তিনি জীবতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। শহরতলির পাড়া, সবাই সবাইকে চিনত। সেখানকার লোকরা একটু সেকেলে ছিল, তাদের অনেক রকম কুসংস্কারও ছিল। বিলেতে কুসংস্কার নেই ইণ্ডিয়ানের এই ধারণাটা একেবারে ভুল। হঠাৎ একদিন গুজব উঠল, পাড়ায় একজন ডাইনী আছে। তার উপদ্রবে নিরাপদে কেউ নাকি দিন কাটাতে পারছে না। মুখে মুখে রটতে রটতে কথাটা তিল থেকে তাল হয়ে, সবার কানে উঠে গেল।

ডাইনী অর্থাৎ উইচ্‌টির বয়স নাকি পঁয়ত্রিশ, ওখানকার-ই মেয়ে। শোনা গেল আগেও তাদের বংশে অনেক ক্ষমতাশালী ডাইনী জন্মেছিল। ভগবানের দয়ায় তাদের নির্মূল করে দেওয়া গেছিল। এখন আইন-কানুন এমন হয়েছে যে সহজে এ সমস্যার সমাধান করা যাচ্ছে না, কিন্তু দিনে দিনে এমন দাঁড়াচ্ছে যে একটা কিছু না করলেও নয়।

শুনে নর্টন সাহেবের বেজায় কৌতূহল হল। সেই মেয়েটি-ই মিসেস কুম্ব। তার নামে থানায় রিপোর্ট হয়েছিল, কোর্টে কেস হয়েছিল। সে নাকি লোকের গোরু-ভেড়া নেই করে দেয়। জেলেদের জাল থেকে মাছ উড়িয়ে দেয়। সে তাকালে মুরগীরা ডিম দেয় না, দাঁড়ানো শস্য শুকিয়ে যায়, গোরুর দুধ বন্ধ হয়।

'গোরু-ভেড়া নেই করে দেয়' আবার কি ? অর্থাৎ তারা অদৃশ্য হয়ে যায়। আর শুধু গোরু-ভেড়া কেন, ওকে জিজ্ঞাসা করা হোক ওর স্বামীরা সব কোথায় গেছে ? একদিন রাতে বেজায় ঝগড়াঝাটির পর থেকে কেউ তাদের দেখে নি। মিসেস কুম্ব কেঁদেকেটে বলেছিল তারা তাকে ছেড়ে চলে গেছে। সে এখন একজন এক অসহায় মেয়ে, কারো কোনো অনিষ্ট করা তার ইচ্ছা নয়—ইত্যাদি। নর্টন সাহেব এখানে থামলেন, বোধ হয় টোবির মুখে বিস্ময়ের ছাপ দেখে। 'আহা, তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে ? ওরা তো কেউ ওর বিয়ে করা স্বামী ছিল না।'

শেষ পর্যন্ত স্থানীয় বিচারপতি বলেছিলেন, 'এর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে, সেগুলো সত্যি হলেও, কেউ কোনো প্রমাণ দেখাতে পারছে না। তবে জীবিকা অর্জনের কোনো প্রত্যক্ষ উপায় দেখাতে না পারার জন্যে—, এই অবধি শুনে, নর্টন সাহেব জামিন হয়ে তাকে ছাড়িয়ে এনে, নিজের রাঁধাবাড়া ও ঘরকন্না দেখার ভার দিয়ে-ছিলেন। ওখানে টেকা অবিশ্যি সম্ভব হয় নি, কাজেই ইণ্ডিয়াতে এসে কিছু গবেষণা করার একটা কাজের কথা শুনেই, সাহেব চলে আসেন আর সেই ইস্তক এখানেই আছেন এবং সুখেই আছেন। দেশে ফেরার তাঁদের কোনো ইচ্ছা নেই। সাহেব এইরকম উইল করেছেন যে এই বাড়ি আর ব্যাঙ্কে লক্ষাধিক টাকা যেন জীবনকালে মিসেস কুম্ব ভোগ করেন এবং তার অবর্তমানে, টোবি পাবে। তাছাড়া জীবতত্ত্বের বইটা থেকে যা আয় হয় এবং আয়টা খুব কম নয়, সেটাও টোবির নামে লেখা আছে। যদি সে জীবতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করে এই আশায়। চৌত্রির নাতি আর নর্টনের নাতি এক-ই কথা।

শুনে টোবি অভিভূত হয়ে পড়েছিল। কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। সাহেব তার অবস্থা বুঝতে পেরে, আস্তে আস্তে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই, মাই বয়। এবার সেই গল্প শোন। চল্লিশ বছর এখানে আছি, একদিনের জন্যেও মিসেস কুম্বকে সেই ব্যাপার সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করি নি। তাকে ঐ রকম কথাই দিয়েছিলাম। তবে নিজে ভেবে এখনো আশ্চর্য হই যে এমন একজন কর্তব্য-পরায়ণ নির্দোষ মেয়েকে ডাইনী অপবাদ দিয়ে দেশ-ছাড়া করতে, আমার অতিশয় আধুনিক দেশবাসীদের এতটুকু বাধল না। তুমিই বল, সরু লম্বা নাক আর কোটরে পোরা জ্বলজ্বলে চোখ থাকলেই কেউ ডাইনী হয়ে যায় ? এই পোকা-মাকড় ঘেঁটে ঘেঁটে অনেক বছর আগেই আমার সত্যের চোখ খুলে গেছে। উইচক্রাফ্‌টের মতো বুজরুগি, হাম্‌বাগের—'

শেষাংশ ২০৮ পৃষ্ঠায়

বাংলা প্রবর্তন

অন্নদাশঙ্কর রায়

সরকারী বে-সরকারী আপিস-আদালত কোম্পানী করপোরেশন প্রভৃতিতে ইংরেজীর পরিবর্তে বাংলা প্রবর্তন করতে হবে এ দাবী আজকের নয়। স্বাধীনতার সময় থেকেই শোনা যাচ্ছে। কিন্তু কাজ বেশিদূর এগোয় নি। কেন, তা ভেবে দেখা দরকার।

বাংলা প্রবর্তনের প্রস্তাব উঠলেই আমরা সর্বপ্রথমে তৈরি করতে বসে যাই পারিভাষিক শব্দ। তার জন্যে গ্রামে যাই নে, গ্রামের লোকের সঙ্গে কথা বলি নে, বাংলার বহমান ধারায় ডুব দিই নে। বাংলাভাষার পুথিপত্রও ঘাঁটি নে। মোল্লার দৌড় যেমন মসজিদ অবধি আমাদেরও দৌড় তেমনি ইংসংস্কৃত অভিধান অবধি। আপ্টে প্রমুখ মরাঠা পণ্ডিত ইংরেজীর প্রতিশব্দ যেমনটি লিখেছেন আমরাও তারই অনুরূপ রচনা করি। আর তারই নাম দিই বাংলা পারিভাষিক শব্দ।

ইতিমধ্যে ইংরেজী শব্দের সঙ্গে আমাদের দেশবাসীর পরিচয় দেড়শো কি দুশো বছর ধরে হয়েছে। বহু ইংরেজী শব্দ লোকমুখে তৎসম বা তদ্ভব হয়ে গেছে। তাদের বদলে সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দ সৃষ্টির সত্যিকার প্রয়োজনই নেই। আমাদের উদ্দেশ্য যদি হয় ইংরেজীর বদলে বাংলা তা হলে সংস্কৃতর কাছেই বা আমরা যাব কেন? তা হলে কি আমাদের লক্ষ্য বাংলা প্রবর্তন নয়, সংস্কৃত পুনঃপ্রবর্তন! সে চেষ্টা জনাকতক পণ্ডিতের প্রীতিবর্ধন করতে পারে, কিন্তু আজকের দুনিয়ায় সাধারণ মানুষের কাজে লাগবে না। সাধারণ লোক কংগ্রেসকে বা যুক্তফ্রন্টকে ভোট দেয়, সি পি আই বা সি পি আই এম-এর সভায় যায়। করুন দেখি, এগুলির সংস্কৃত ভাষান্তর? কেউ গ্রহণ করবে না। তেমনি ওরা ট্রামে বাসে চড়বে, রেলের স্টেশনে গিয়ে টিকিট কাটবে, তারপর প্ল্যাটফর্মে গিয়ে ট্রেন ধরবে, ব্যাঙ্কে গিয়ে চেক ভাঙাবে, দোকানে গিয়ে নোট ভাঙাবে, ব্যালান্স মিলিয়ে নেবে। শেখান দেখি ওদের সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দ?

অসংখ্য ইংরেজী শব্দ বাঙালীর মুখে থাকতে এসেছে। সুতরাং লেখনীর মুখেও থাকবে। তার পরিবর্তে সংস্কৃত কেউ মেনে নেবে না। অভিধানের শব্দ অভিধানেই থেকে যাবে। জীবনে প্রচলিত হবে না। সরকারের কাজকর্ম কি প্রচলিতকে নিয়ে, না অপ্রচলিতকে নিয়ে? সরকারী বাংলা কি কাজ চালানোর জন্যে, না শোভাবর্ধনের জন্যে? যদি কাজ চালানোকেই অগ্রাধিকার দিতে হয় তবে কথায় কথায় সংস্কৃত অচলিত শব্দের আশ্রয় না নিয়ে ইংরেজী চলিত শব্দের আশ্রয় নিতে হয়।

পারিভাষিক শব্দ তৈরি করার ভার বাইশ বছর আগে যাঁদের ওপর পড়েছিল তাঁরা কেবল ইংরেজীর নয়, আরবী-ফারসীরও পারিভাষিক শব্দ বানাতে আরম্ভ করেন। মুনসেফ কথাটি ইংরেজীও নয়, ইংরেজদের সৃষ্টিও নয়। অথচ তারও একটি সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দ চাই। এর মানে কি? মুসলমানী আমলটাকেই প্রক্ষিপ্ত বলে অস্বীকার করা? তা হলে তো দেওয়ানী ফৌজদারি জমিদারি আইনকানুনের ভাষা বেবাক বদলাতে হয়। উকিল মোক্তার সেরেস্তাদার নাজির পেশকার পেয়াদা চৌকিদার খাজাঞ্চি পোদ্দার প্রভৃতি ইংরেজ আমলের দেড়শো দুশো বছরেও বিলুপ্ত হয় নি। এবার তা হলে তারা পণ্ডিতদের কোপানলে ভস্ম হবে?

লোকের মনে যে পরিমাণ ইংরেজ-বিদ্বেষ ছিল সে পরিমাণ ইংরেজী-বিদ্বেষ ছিল না। তেমনি যে পরিমাণ মুসলমানবিদ্বেষ ছিল সে পরিমাণ আরবী-ফারসীবিদ্বেষ ছিল না। তাই লোকে তাদের পরিচিত ভাষাকে রাজভাষা বলে রাজার সঙ্গে সঙ্গে বিদায় দেয় নি। নিজেদের প্রয়োজনেই ভাণ্ডারে মজুত করে রেখেছে। এটাই সব দেশের রীতি। ইংলণ্ডের ইতিহাসেও এর নজীর আছে। রোমানদের বিদায়ের পরেও রোমান আইন ও লাটিন ভাষা থেকে যায়। নর্মান বিজয়ের পর ফরাসী ভাষা ফরাসী আচার এল। এখনো কি তার জের মিটেছে? লাটসাহেবের সঙ্গে আহারের নিমন্ত্রণ যতবারই পেয়েছি ততবারই দেখেছি মেনু ছাপা হয়েছে ফরাসী ভাষায়।

সব কিছু বিশুদ্ধ সংস্কৃত করতে গেলে তাই হবে যা হয়েছে হিন্দীর বেলা। ইংরেজীকে তাড়াবার নাম করে সে আরবী-ফারসীকে তাড়াচ্ছে। উর্দুর সঙ্গে তার এখন শত্রু-সম্পর্ক। এর ফলে হিন্দীর বিবর্তন হাজার বছর পিছিয়েই যাচ্ছে। কী-করে সে অগ্রসর চিন্তাকে ধারণ করবে? যার চোখ সামনের দিকে আর পা পেছনের দিকে তার প্রগতিকে ব্যাহত করে তার পশ্চাদ্‌গতি। বাংলা যে হিন্দীর পথ এখনো ধরে নি তার কারণ বাংলার ঐতিহ্য যাবনীমিশাল। ভারতচন্দ্রই পথ নির্দেশ করে দিয়ে যান। কিন্তু পারিভাষিক শব্দ তৈরি করার ভার যাঁদের ওপর পড়বে তাঁদের যদি যবানীমিশালে আপত্তি থাকে তা হলে বাংলার পথও হবে হিন্দীর মতো বিশুদ্ধ সংস্কৃত। সেটা আপাতত ইংরেজীর পরিবর্তে হলেও অতঃপর আরবী-ফারসীর পরিবর্তেও হবে। বিংশ শতাব্দীতে বাস করেও আমরা দ্বাদশ শতাব্দীর স্বাদ পাব। অমন করে ইতিহাসকে উজান-মুখী করার চেষ্টায় সময় নষ্ট করার চেয়ে ইংরেজীকে চালু রাখাও ভালো।

যায় সেই শব্দ দিয়ে কাজ চালানো-গোছের বাংলায় সরকারী বে-সরকারী চিঠিপত্র ও রিপোর্ট লেখা যদি সকলের সম্মতি পায় তবে কাল সকালেই বাংলা প্রবর্তন করতে পারা যায়। তার জন্যে অনির্দিষ্টকাল পদচারণ করতে হয় না। সে বাংলায় সংস্কৃত যেমন থাকবে তেমনি থাকবে আরবী ফারসী ও ইংরেজী। যেখানে যেটা মানায়।

তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে, বাংলা ভাষায় কেন্দ্রের সঙ্গে পত্র ব্যবহার চলবে না। তার জন্যে ইংরেজী বা হিন্দী। তেমনি। বাংলা ভাষায় বিহার সরকার বা আসাম সরকারের সঙ্গে পত্র ব্যবহার চলবে না। তার জন্যেও ইংরেজী বা হিন্দী। তেমনি বাংলা ভাষায় আন্তর্জাতিক বা আন্তঃ-প্রাদেশিক সওদাগরী সংস্থা বা শিল্প-সংস্থার সঙ্গে পত্রব্যবহার চলবে না। সেক্ষেত্রেও ইংরেজী বা হিন্দী। এমনি কয়েকটি ক্ষেত্র বাদে আর সব জায়গায় বাংলায় পত্রব্যবহার চলতে পারে। কলকাতার সঙ্গে মুর্শিদাবাদের পত্র-ব্যবহার কেন যে ইংরেজীতে হবে তার কোনো কারণ নেই। কলকাতার মহা-করণের সঙ্গে বিভিন্ন ডাইরেক্টরেটের পত্রব্যবহার বাংলাতে না হয়ে ইংরেজীতে হতে বাধ্য নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে কলকাতা করপোরেশনের পত্র-ব্যবহারও বাংলাতেই হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক বিভাগের সঙ্গে অপর বিভাগের পত্রব্যবহার বাংলাতেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যেখানে আইনকানুনের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার প্রয়োজন সেখানে অর্থাৎ হাইকোর্টে ও জেলা কোর্টে ইংরেজীর স্থান সামনের পঞ্চাশ বছরেও যাবার নয়। সেখানে যেটা সম্ভব সেটা একপ্রকার দ্বৈভাষিকতা। ইংরেজীতে ও বাংলাতে কাজ-কর্ম ভাগ-বাটোয়ারা করে নিতে হবে। ইংরেজ রাজত্বেও বাংলা ছিল আদালতের ভাষা। জজকেও বাংলায় জুরিদের চার্জ বুঝিয়ে দিতে হতো। আসামীকে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ বুঝিয়ে দিতে হতো। যেখানে জজ বাংলায় বোঝাতে পারতেন না সেখানে বাংলায় বোঝাতেন তার পেশকার। আমি তো উকিল মহাশয়দের বাংলাতেই সওয়াল করতে সুযোগ দিয়েছি, কিন্তু তাঁরা সে সুযোগ নেন নি। তার কারণ তাঁদের মক্কেলরা ঠাওরাবে যে উকিল মহাশয়রা ইংরেজীতে কাঁচা। তাই এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে হতো। জজ বাঙালী, উকিল বাঙালী, সাক্ষী বাঙালী, আসামী বাঙালী, অথচ সওয়াল চলেছে ইংরেজীতে। এর জন্যে ইংরেজরা দায়ী হতো। পরীক্ষা দিতে হতো। বাংলা আদালতের ভাষা তখনো ছিল, এখনো আছে।

আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি আইন-আদালতের ক্ষেত্রে ইংরেজীও থাকবে, বাংলাও থাকবে। প্রত্যেকটি বিচারককে ভালো করে ইংরেজী শিখতেই হবে। প্রত্যেকটি উকিলকেও। কিন্তু কথায় কথায় ইংরেজী ব্যবহার করার সত্যি কোনো দরকার নেই। বরঞ্চ যত বেশি বাংলা ব্যবহার করা হয় তত ভালো। বিচারটা কী ভাবে হচ্ছে সাধারণ লোকের সেটা জানা উচিত। সুবিচার হলো, অথচ লোকে বুঝতে পারল না, এটা ন্যায়শাস্ত্রের নীতি নয়। সুবিচারও হবে, লোকেও জানবে যে সুবিচার হলো, দুই-ই একসঙ্গে চলবে। তার জন্যে বাংলাই প্রশস্ত। যেখানে সকলেই বাঙালী সেখানে বাংলাকে তার অগ্রাধিকার দিতে হবে। কিন্তু ইংরেজীও বজায় রাখতে হবে এইজন্যে যে আমাদের অসংখ্য আইন রাতারাতি বাংলায় তর্জমা করা যাবে না, তর্জমা করলেও তার সূক্ষ্ম অর্থ প্রকাশ করা যাবে না। তা ছাড়া অসংখ্য নজীর, অসংখ্য রুলিং রয়েছে ইংরেজীতে। বাংলায় সেসব তর্জমা করতে যাওয়া পণ্ডশ্রম। কারণ বাংলা বই কজন কিনবে? তর্জমার মজুরি পোষাবে না। এক-একজন উকিলের চেম্বারে কী পরিমাণ আইনের কেতাব থাকে তা সকলেই লক্ষ্য

তারপর এক কিন্তু তখনকার অইডিয়াটাই ছিল। বাংলা করা হলে যারা ওসব কিনবেন তারা ইংরেজীও ভালো জানেন। ইংরেজী মূল গ্রন্থটাই তাঁদের কাছে প্রামাণ্য। সেটাই তাঁরা কম দামে কিনবেন। মনে করুন, সারা ভারতের জন্যে ক্রিমিনাল প্রোসিডিওর কোড এক। বাজারে যে সংস্করণ পাওয়া যায় তাতে বিভিন্ন হাইকোর্টের রুলিং দেওয়া থাকে। প্রতি বছরই সংস্করণ বদলে যায়। তার ইংরেজী সংস্করণ সারা ভারতজুড়ে বিক্রী। কিন্তু বাংলা তর্জমা কখনই বা বিকোবে? কেন তাহলে বছর বছর সংস্করণ বার করবেন? করলে তার দাম হবে ডবল।

আইন-আদালতের ওপর ইংরেজীর প্রভাব এখনো দু'-তিন পুরুষ ধরে চলবে। তার কোনো সংক্ষিপ্ত রাস্তা নেই। তবে হ্যাঁ বিপ্লব যদি হয় তা হলে সব একদিনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। গোটা সিসটেমটাই বদলাবে। কিন্তু তা যদি হয় আমাদের সংবিধানটাও কি থাকবে?

শুনতে পাই টাইপরাইটারের অভাবে বাংলা প্রবর্তন এগোতে পারছে না। সেটা অবশ্য একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ। কিন্তু কথায় কথায় টাইপরাইটার ব্যবহার না করে আগেকার মতো নকল-নবীশ নিয়োগ করা যেতে পারে।

টিকি কেটে টাই ৩·০০ টাকা

সরস সমাজচিত্র

লেখক : চিন্তাকুল শিরোপাণি

.....সার্থক স্যাটায়ার কঠিন জিনিষ; সাহিত্যে চটুল রসিকতার কিছু রচনা আছে, কিন্তু স্যাটায়ারের খুবই অপ্রতুলতা।.....বিষয়টী ঠিকই দৃষ্টিতে পড়েছে এবং বলবার ভিতর কৌতূহলেরও অভাব নেই। এক এক জায়গায় রীতিমত চমকপ্রদ।.....এই বইখানি নিঃসন্দেহে কালোপযোগী, অভিনব এবং স্যাটায়ার রচনার সম্ভাবনাপূর্ণ সংযোজনা। —যুগান্তর

.....বিধৃত পুস্তকটিতে দেশের সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতির অন্তরালে দুর্নীতির দুর্বার স্রোতের তাণ্ডবলীলা বর্ণিত হয়েছে তির্যক ভঙ্গীতে।.....আমরা বইখানার সুপ্রচার কামনা করি। —দৈনিক বসুমতী

কম্পাস পাবলিকেশন্স লিমিটেড

৩০।১ কলেজ রো (দোতলায়)।

কলিকাতা-৯

সেই সকালে

[১৩৮ পৃষ্ঠার পর]

যেই টান পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে বৈঠা রেখে তুলে আনল জাল—কী বড়ো বড়ো ইলিশ ছটফট করছে জালে—নীলচে-রুপোলি রঙ কতদূর থেকেও ঝিকমিক করে উঠল। নালা দিয়ে পর্যন্ত ছুটেছে বর্ষার জল—রাত্তিরে তাতে চারো পেতে সকালে তুলে নে—মাছে ভরে গেছে, ছটাছট করে লাফাচ্ছে চিংড়িগুলো—

আমি কান পেতে রূপকথা শুনতে লাগলুম।

সুমন্তদা উদাস চোখে চেয়ে রইল আকাশের দিকে। তারপর :

'তোর দেশে যেতে ইচ্ছে করে না মন্টু?'

'করে।'

'কখনো তো দেশ দেখিস নি?'

'না।'

'যাবি?'

'কী করে যাব? বাবা যদি কখনো নিয়ে যায়, কবে তো? বাবার তো সময়ই হয় না।'

'আমি যদি যাই, আমার সঙ্গে যাবি? নিজের বাড়ি দেখলি না, ঘর দেখলি না, বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে পুজো দেখলি না, শ্রাবণ মাসে তোদের মনসা-বাড়িতে রয়ানী শুনলি না, কোনো মানে হয়? চল্ এবার পুজোয়, মাসখানেক কাটিয়ে আসবি দেশে।'

আমার চোখে আরো নিবিড় হল স্বপ্ন। আমি কাতর হয়ে বললুম, 'আপনি বলবেন বাবাকে? তা হলে নিশ্চয় যেতে দেবেন আপনার সঙ্গে।'

মেঘলা আকাশ, হু-হু করে হাওয়া—গাছপালার মাতামাতি—বাগান থেকে ফুলের গন্ধ—আত্রাইয়ের ডাক। বাড়ির সজনে—পেঁপে-পেয়ারা গাছে খ্যাপামি জাগিয়ে ঝমঝমানি বেজে উঠল রান্নাঘরের টিনের চালে। ঝেঁপে বৃষ্টি নামল। আজ স্কুলে নির্ঘাত রেনি-ডে।

সুমন্তদা উঠে পড়ল দাওয়া থেকে—বৃষ্টির ছাট আসছিল। যেন ঘোর কেটে গেল তার।

'না রে, এখন দেশে যাওয়া যাবে না। পুজোর সময়ও না।'

দীপু বারান্দায় উঠে সমানে চ্যাঁচাচ্ছিল : 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেব মেপে।'

আমি ধমক দিয়ে বললুম, 'উঃ, থাম না। কেন দেশে যাবেন না সুমন্তদা?'

দীপু একটা ঘোড়ায় বসে পা দোলাতে শুরু করল : 'আয় রে আয় ছেলের দল, মাছ ধরতে যাই।'

তার দিকে একবার বাঁকাচোখে তাকিয়ে সুমন্তদা বললে, 'বুঝতে পারছিস না?'

'না তো।'

'সেই মা। আর কে?'

'কোন্ মা'—রান্নাঘর থেকে বৃষ্টির গন্ধ ছাপিয়েও নোনা ইলিশ ভাজার সুবাস আসছিল, আমি একটুখানি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলুম তাতে।

'কোন্ মা?' সুমন্তদা দাঁত খিঁচিয়ে উঠল : 'মা আবার কটা থাকে? তোকে বলি নি এর আগে? তোর এত মাথা মোটা যে কিচ্ছু মনে থাকে না। বললুম না যে-মা আমাকে কেবল বন্ধনে জড়াতে চায়?'

'ও—বন্ধন।'

শব্দটা আমার পক্ষে একটু গুরুপাক হয়েছে বুঝে সুমন্তদা গলা নামিয়ে বললে, 'বিয়ে—বিয়ে।' তারপর আড়-চোখে আবার চেয়ে দেখল দীপুর দিকে। কিন্তু সে এসব কিছুই শুনছিল না—ঘোড়ায় চুপ করে বসে বৃষ্টি পড়া দেখছিল এক মনে।

আমি বললুম, 'হ্যাঁ—হ্যাঁ—বিয়ে।'

'আঃ—আস্তে আস্তে। চ্যাঁচাস কেন গাধার মতো? মা আবার সেদিনও একটা চিঠি লিখেছে—তাতে খালি প্যান্‌পেনে কান্না। বাবা, তুমি বিবাহ করো, এখানেই চাকরির একটা ব্যবস্থা হইবে, বুড়া বয়সে আমরও তো-নীতি-পুতি—' বলতে বলতে সুমন্তদা থেমে গেল : 'মানে অনেক সব খারাপ কথা লিখেছে, তোর শুনে আর কাজ নেই। মানে বাড়ি গেলেই আর রক্ষে নেই, সঙ্গে সঙ্গে গলায় ফাঁস পরিয়ে দেবে।

দারুণভাবে বিদ্যুৎ চমকালো, তার-পরেই ভয়ঙ্কর এক মেঘের ডাক। তার রেশ থেমে গেলে সুমন্তদা বললে, 'লোকের মা হয় করুণাময়ী—জননী। আর আমার মা—দেখছিস তো?'

'কিছুই দেখছি না। তবু বললুম, হুঁ।'

'এইভাবে নিষ্ঠুরের মতো সন্তানকে বেঁধে রেখে—'

আমার এতদিনে কিছু বয়েস বেড়েছে, প্রতিবাদ করে বললুম, 'কিন্তু ছেলে সন্ন্যাসী হলে কোন্ মা'র ভালো লাগে?'

'খুব তো বক্তিয়ার হয়েছিস দেখছি!' —কটমট করে আমার মুখের দিকে তাকালো সুমন্তদা : 'কিন্তু সবাই যদি স্বার্থপর হয়, ছেলের কথা কেউ না ভাবে, নর নারায়ণের সেবার দায়িত্ব না নেয়, তা হলে কেমন করে গড়ে উঠবে স্বামীজীর ভারত? কেন তা হলে মুকুন্দ দাস ডাক দিয়ে বললেন—বান এসেছে মরা গাঙে, খুলতে হবে নাও, তোমরা এখনো ঘুমোও?'

'আমি বললুম, 'তা বটে।'

'নিজের চোখেই তো প্রবোধবাবুকে মরতে দেখলি—দেখিস নি? তুই আবার তাইতে অবাক হয়ে গেলি—তখন তোকে নিয়ে আরেক কাণ্ড। কিন্তু ভেবে দ্যাখ—শেষ মুহূর্তে এই মানুষটার সেবা করতে পারাও—'

সেই শনিবারের রাতটা মনে পড়তেই সেবা ব্রত, স্বামীজীর বাণী—সব মুছে গেল আমার মন থেকে। চোখের সামনে নিদারুণ দুঃস্বপ্নের মতো ভেসে উঠল সবটা।

বলে ফেললুম, 'ওরে বাবা!'

'ওরে বাবা?'—সুমন্তদা চটে গেল : 'এতদিন ধরে এই শিক্ষেই দিচ্ছি তোকে? "কাপুরুষ—ভয়ের আধার!" আজকাল পদ্য মেলাবার চেষ্টা করিস দেখতে পাই, ওই মিনমিনে কবিতাই লিখবি তুই এর-পর। তোর আর কিছু হবে না।'

দুমদাম করে চলে গেল নিজের ঘরে। একটু পরেই শুনলুম তার গলা উঠছে পর্দায় পর্দায় :

'Sanyesin bold—say, om—Tat Satom.

আকাশভাঙা বৃষ্টি—উঠোনে জল জমেছে, বৃষ্টির বড়ো বড়ো ফোঁটা টগ-বগ করছে তার ভেতরে, কয়েকটা ছোট ছোট ব্যাং সিঁড়ি বেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে আসতে চাইছে বারান্দায়। তারই ভেতরে রান্নাঘর থেকে নোনা ইলিশ ভাজার গন্ধ। আমি আর সুমন্তদার কথা ভাবছিলুম না, আমার মনে হচ্ছিল—আজ নিশ্চয় রেনি-ডে।

লনের ইউক্যালিপ্‌টাস্ আর সামনের নীলম্ রোড ছাড়িয়ে আমার সামনে সমুদ্র আর সমুদ্র। কী নীল, কী নীল তার রঙ, এত নীল দীঘায় নেই, বালেশ্বরে নেই, পুরীতেও না। এই নীলে অনিঃশেষ আকাশ, অতলান্ত সাগর। জীবনের কোনো ডানাই কুলিয়ে উঠতে পারে না তাকে, কোনো অবগাহনে তার তল মেলে না। না।

তা না হলে এস কে ঘোষম্? ঘড়ির দোকান? এই কি তৎ সৎ ওম্? এই কি 'উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ প্রাপ্য বরান্ নিবোধতঃ?' 'ওঠো, জাগো—বরেণ্য জনকে প্রশ্ন করে সত্যকে অধিগত হও?' কোনো বরেণ্য কি এই ভাবেই নিবোধিত করেছিলেন সুমন্তদাকে? কিন্তু ঘড়ির দোকানের সঙ্গে আমি কোথাও তো বীরবাণী কিংবা মুকুন্দ দাসের মিল খুঁজে পাচ্ছি না। 'ওয়াচ মেকার্স অ্যান্ড রিপেয়ারার্স'—এর মধ্যে কোথাও তো সন্ন্যাসের কোনো ইঙ্গিত আছে বলে জানি না আমি।

এই নীল—নীল-নীল সমুদ্রের মতো, আকাশের মতো জীবন। তাকে খুঁজতে গিয়ে ডানা নিমেষে ক্লান্ত—অবগাহন হাস্যকর। সুমন্তদা কেমন করে এস কে ঘোষম্ হয়ে যায়, কে বলবে!

কিন্তু হঠাৎ সেই বর্ষার দিনটার কথাই আমার মনে পড়ল কেন? কোন্ অনুষঙ্গে?

বুঝেছি। কল্যাণীদি।

সেদিনও ঝিরঝির করে বৃষ্টি। কিন্তু সকাল নয়—বিকেল। স্কুল থেকে ফিরে আর মাঠে খেলতে যাওয়া হল না। বাবা বাড়িতে নেই, এ সময় তিনি থাকেন না। সুমন্তদা আমাকে বলছিল, 'কাকা-মণিকে বলে তোর জন্যে ডাম্‌বেল আনাব —রোজ কষলে তোর রিস্টে জোর আসবে', দীপু পুতুল খেলছিল এক কোণায়। এই সময় মা আমাদের জন্যে চিঁড়ে ভাজা আর ফুলুরি নিয়ে এলেন।

দারুণ খুশি হয়ে সুমন্তদা বললে, 'খুড়িমা ঘটি হয়ে এইটেই সুবিধে, বুঝলি?'

'কী সুবিধে?'

'এই ফুলুরি—আলুর চপ-টপ। আমাদের দেশের মেয়েরা এ রকম করে এ সব ভাজতেই পারে না।'

আমরা চিঁড়ে আর ফুলুরিতে মন দিয়েছি, তখন গানটা এল। বৃষ্টির ঝিরঝিরানি ছাপিয়ে।

বাদল-বাউল বাজায়-বাজায়-বাজায় রে
বাজায় রে একতারা—'

দারুণ ভাবে চমকে উঠল সুমন্তদা।

'কে গাইছে রে?'

কথাটা কানে গেল দীপুর। সে-ই জবাব দিলে।

'কেন, কল্যাণীদি।'

'কে কল্যাণীদি?'

'বা রে, জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে এসেছে যে আজ ক'দিন হল। সোনাদির মামাতো বোন। রাজসাহী থেকে এসেছে, সেখানেই ওদের দেশ কি না।'

জ্যাঠামশাই মানে আমাদের প্রতি-বেশী ওভারসিয়ারবাবু হরেন সেন। সোনাদি তাঁরই মেয়ে।

'হার্মোনিয়াম বাজাতে পারে দেখছি।'

'পারেই তো।'—দীপু বললে, হার্মো-নিয়াম সঙ্গে করেই তো এনেছে। কী ভালো গাইতে পারে কল্যাণীদি। জানেন? সোনাদিকে রোজ সন্ধ্যেবেলায় সা-রে-গা-মা শেখায়।'

খবরটা আমিও জানি। কল্যাণীদিকেও দেখেছি। দু' দিন এসেছিল আমাদের বাসায়। শামলা রঙ, বড় বড় চোখ, খুব মিষ্টি করে হাসে। মা বলেছিলেন, 'আহা —মেয়েটার কী চুল! একেবারে কোমর ছাপিয়ে ভেঙে পড়েছে।'

সুমন্তদা এতদিন খেয়াল করে নি। সন্ধ্যের পর প্রায়ই সে বাড়িতে থাকে না —হয় ডাক্তারের পাশার আড্ডায়, নইলে আড়তদার শশীবাবুর ওখানে। তার মুখ দেখে বোঝা গেল, ভারী আশ্চর্য হয়েছে সে।

দীপু আরো কী বলতে যাচ্ছিল, সুমন্তদা থামিয়ে দিলে তাকে।

'দাঁড়া—গানটা শুনতে দে।'

ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে গান আসতে লাগল:

'আমের বনে ধানের খেতে
আপন তালে আপনি মেতে
নেচে নেচে হল সারা,
বাদল-বাউল বাজায়-বাজায়-
বাজায় রে—'

এ গান তো পরে আরো অনেক বার শুনেছি। কিন্তু আজও মনে পড়ে, সেই বর্ষার সন্ধ্যায় আশ্চর্য সুন্দর লেগেছিল গানটা। তার প্রায় প্রতিটি লাইন ধরা পড়ে গিয়েছিল আমার স্মৃতিতে:

'ঘন জটার ঘটা ঘনায় আঁধার
আকাশ মাঝে,
পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর—'

গানটা শেষ হলে একটু চুপ করে রইল সুমন্তদা। তারপর বললে, 'হুঁ, গলা মন্দ নয়। তবে তালে গোলমাল আছে।'

আমাদের ভাই-বোনের পক্ষে দুই সমান। এখানে এক যাত্রার দল ছাড়া আর কোথাও হার্মোনিয়াম দেখি নি আমি। এই গ্রামে কোনো মেয়ে কখনো গলা খুলে গান করে না। কেবল আমার ক্লাসের বন্ধু কেন্টলালের বাড়িতে দেখেছি, খুব কম্প দিয়ে ম্যালেরিয়া জ্বর উঠলে তার ঠাকুরমা চীৎকার করে গাইতে থাকে: 'মন একবার হরি বল্, হরি-হরি-হরি বলে ভবসিন্ধু পারে চল্—'

সুমন্তদা বললে, 'তালটাই ঠিক নেই। আরো শিখতে হবে।'

কল্যাণীদি আবার কী একটা গান ধরল—আমার ঠিক মনে নেই। বোধ হয় 'ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী' গোছের কিছু একটা হবে।

'আবার কেটে গেল তাল। বললুম তো, ওইখানেই গণ্ডগোল।'

দীপু প্রতিবাদ করল। এর মধ্যেই কল্যাণীদির ভক্ত হয়ে উঠেছে সে, বোধ হয় হার্মোনিয়ামের বেলোটা দু-একবার টেনে দেবার অনুমতি পেয়েছে কিংবা তাকেও সা-রে-গা-মা শেখাবার আশ্বাস দিয়েছে কল্যাণীদি। দীপু বললে, 'জানেন, কল্যাণীদি ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছে। ওর এখন বিয়ে দেবে কি না, তাই আর পড়ে নি।'

সুমন্তদা ধমকে উঠল: 'থাম্, তুই আর পাকা পাকা কথা বলিস্ নি। ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়লেই যেন সব জানা হয়ে যায়!'

আমি একটু আশ্চর্য হলুম। আমাদের ছেলেবেলায় ক্লাস নাইনে পড়া মেয়ের বেশ সম্মান ছিল, রীতিমতো বিদুষী বলেই মনে করা হত তাকে এবং ওই পর্যন্ত উঠতেই অধিকাংশ মেয়ের সতেরো-আঠারো বছর পেরিয়ে যেত—আর তার ঢের আগেই বিয়ে হয়ে যেত তাদের।

আমি বললুম, 'সুমন্তদা, তাল কাকে বলে?'

'পড়া না পারলে তোর পিঠে যা পড়ে, তাই—' একটু হেসে সুমন্তদা বললে, 'গানের সঙ্গে তবলা বাজায় দেখিস্ নি? তবলা দিয়ে গানের তাল ঠিক রাখতে হয়, নইলে গান খারাপ হয়ে যায়।'

তবলা আর দেখব না কেন, যাত্রার আসরে তো দমাদম্ পিটতেই দেখেছি। সুমন্তদা বেশ গান গায় সে তো প্রথম থেকেই জানি, কিন্তু তার মধ্যে যে আবার তাল-টালও আছে এর আগে কখনো বুঝতে পারি নি। মা তাকে প্রত্যেক বিষুদবার লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়তে দেন, বেশ সুন্দর করে সে পড়ে: 'দোল-পূর্ণিমার নিশা নির্মল গগন, মন্দ মন্দ বহিতেছে মলয়-পবন'—আর আমরা কলা-বাতাসার জন্যে ওৎ পেতে থাকি। কিন্তু সুমন্তদা যে এত তাল-টাল জানে—

আমি বললুম, 'আপনার গানে তাল ভুল হয় না সুমন্তদা?'

'তালে ভুল? কেন হবে?'—সুমন্তদার চোখ-মুখ জ্বলজ্বল করে উঠল: 'আমাদের গ্রামে একজন খুব বড় ওস্তাদ আছেন, জানিস? হর্ষনাথ দাশগুপ্ত। লাল টুক-টুকে পাকা আমের মতন রঙ, মাথার চুলগুলো সাদা হয়ে গেছে—আমরা তাঁকে রাঙাদাদু বলি। সারা জীবন কোলে তানপুরা নিয়েই কাটালেন। নীরব সাধক —নিজের মধ্যে ডুবে আছেন, কেউ তাঁকে জানেই না। দশ বছর বয়েস থেকেই তাঁর সাগরেদ আমি, তিনিই তো আমায় স্বামীজীর বই পড়িয়েছেন, এ সব গান শিখিয়েছেন। তিনিই তো বলেছেন— সুমন্ত, সত্যিকারের মানুষ হওয়া চাই। আরে, রাঙাদাদুই তো আমায় নেশা ধরিয়ে দিয়েছেন, সেই জন্যেই তো শেষ পর্যন্ত ম্যাট্রিক দেওয়া হল না আমার। সে যাক—তাল বুঝতে চাস? হুঁ—হুঁ—হুঁ—'

হাঁটু থাবড়ে সুমন্তদা শুরু করলেন:

'ভালে চন্দ্র, বদনে চন্দ্র,
নখরে চন্দ্র, শ্রীকরে চন্দ্র,
কোটি চন্দ্র সমান জ্যোতি—'

মা ঘরে ঢুকে বললেন, 'আর ফুলুরি দেব সুমন্ত? কী হল—সব পড়ে রয়েছে যে?'

'ও হো হো, ভুল হয়ে গেছে খুড়িমা—' সুমন্তদা জিভ কাটল: 'এই এদের একটু তাল—'

কল্যাণীদি

আশ্চর্য হয়ে মা বললেন, "তাল?"

মানে গানের তাল। ওই বাড়িতে যে মেয়েটি গান গাইছে, তার তালে ভুল হচ্ছিল কি না। সেই জন্যে—যাক গে, সে যাক। তা দিন খুড়িমা—আরো গরম ফুলুরিতে কোনো আপত্তি নেই আমার—'

.....সমুদ্রের ওপরে পাখির ঝাঁক। স্মৃতিতে ছবিগুলো ফুটে ফুটে উঠছে, মিলিয়ে যাচ্ছে, ছিঁড়ে যাচ্ছে আবার। এরই মধ্যে আর একটা বিকেল।

ফুটবল খেলে ফিরছি, সামনে কম্পাউণ্ডারবাবুর বাবা।

পালাবার রাস্তাও পাওয়া গেল না। সোজা আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি।

'এই মন্টু, কোন্ ক্লাস তোর এবার?'

ঢোক গিলে বললুম, 'ক্লাস এইট।'

'ওঃ—তা হলে তো দিগ্‌গজ হয়ে গেছিস। বল্ দেখি এসব লাইন কে লিখেছিলেন?

মূর্খ তুমি! মাটি কাটি লভি কোহিনূর
ফেলিয়া সে রত্ন হায়
কে ঘরে ফিরিয়া যায়—'

বললুম, 'জানি না। কিন্তু দাদু, এই ইংরিজি লাইনটা একটু বুঝিয়ে দেবেন? দি হরাইজেণ্টাল এক্সপেনডিচার অব পারপেনডিকুলার কন্সটারনেশন—'

এই পর্যন্ত বলতেই দাদু মুখ ভেংচে বললেন, 'ধুৎ!' তারপরেই হাত দুলিয়ে হন-হন করে এগিয়ে চললেন।

খুব খুশি হয়ে হেসে উঠতে যাচ্ছি, হঠাৎ চমকে উঠলুম। সুমন্তদার গানের আওয়াজ। যে গান রোজ শুনি, তা নয়। হার্মোনিয়াম বাজিয়ে গলা খুলে গাইছে সুমন্তদা। এবং গাইছে ওভারসিয়ার-বাবুর বাসায়।

'মুঠো মুঠো রাঙা জবা কে দিলে
তোর পায়ে—'

আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেলুম বাড়িতে।

'মা—সুমন্তদা গান গাইছে ওভার-সিয়ারবাবুর বাড়িতে।'

খবরটা মা-কে নতুন করে দেবার দরকার ছিল না। আমাদের বাড়ি থেকেই সে গান পরিষ্কার শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল।

মা বললেন, 'হুঁ। ও বাড়ির দিদি ডেকে নিয়ে গেছেন ওকে।'

'আমিও যাব?'

মা বললেন: 'ছিঃ। মেয়েরা ওকে গান শুনতে ডেকে নিয়ে গেছে, তুমি তার মধ্যে যাবে কেন?'—আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে খুব মিষ্টি করে বললেন, 'তুমি এখন বড় হয়েছ, তোমার আত্মসম্মান আছে। যাও—হাত-পা ধুয়ে পড়তে বোসো গে।'

দীপু বাড়িতে নেই, সে-ও সুমন্তদার সঙ্গে গেছে নিশ্চয়। আমার ওকে হিংসে হতে লাগল।

পড়তে বসলুম, কিন্তু পড়ার মন এল না। শুনতে পেলুম, সুমন্তদা নতুন গান ধরেছে : 'তা থৈয়া তা থৈয়া নাচে ভোলা'—

॥ সাত ॥

সামনে সমুদ্রের জল। পাখিরা ঝাঁক বেঁধে উড়ছে দুপুরের রোদে। সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে মৃদঙ্গ শুনছি : 'তা থৈয়া তা থৈয়া নাচে ভোলা—'

এর পর থেকে ছবিগুলোকে যেন একটা ধারার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি এখন। পর পর তারা সাজানো নেই, এখান-ওখান থেকে ঝরে পড়েছে—কিন্তু আজকের মন দিয়ে সেই ফাঁকগুলোকে ভরে নিতে পারি আমি, যারা নেই—মিলিয়ে নিতে পারি তাদের।

হাঁ, ওভারসিয়ারবাবুর বাড়িতে প্রায় নিয়মিত গানের চর্চা শুরু করল সুমন্তদা। তার তালজ্ঞানের খবর দাঁপুই পৌঁছে দিয়েছিল সন্দেহ নেই এবং ক্লাস নাইনে পড়া রাজসাহীর মেয়ে কল্যাণীদির অভিমানেও বোধ হয় ঘা লেগে থাকবে। তাই বোধ হয় পরীক্ষা করবার জন্যেই সুমন্তদার ডাক পড়েছিল। পরীক্ষায় সুমন্তদা যে কেবলা উতরে গেল তা নয়, তারা পর থেকে সে কল্যাণীদির গানের মাস্টার হয়ে উঠল।

এত সব হিন্দী গানও যে সুমন্তদার জানা আছে, তাই বা কে ভেবেছিল!

একদিন নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে আমি বললুম, 'সুমন্তদা, আমাকে গান শেখাবেন?'

লক্ষ্য করেছি, সুমন্তদা আজকাল প্রায়ই অন্যমনস্ক থাকে। আমার কথার জবাব দিল না।

আমি আবার ডাকলুম, 'সুমন্তদা?'

যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে সুমন্তদা বললে, 'আঁ? কী বলছিলি?'

'আমাকে গান শিখিয়ে দেবেন?'

সুমন্তদা বললে, 'তা হলে তো একটা হার্মোনিয়াম চাই।'

'বাবাকে বলব। বাবা আনিয়ে দেবেন দিনাজপুর থেকে।'

সুমন্তদা বললে, 'না—হার্মোনিয়াম আনলেও সুবিধে হবে না।'

'কেন?'

'তোর গলায় একদম গান নেই। তুই পুরোপুরি বেসুরো। হরির লুটের গানও তুই গাইতে পারিস না।'

শুনে আমি বিবর্ণ হলুম।

'বা-রে, বুঝি কল্যাণীদিই একা গান শিখতে পারে।'

কোত্থেকে কী হল জানি না, হঠাৎ বিশ্রীভাবে চটে উঠল সুমন্তদা।

'বড্ড বেশি জাঠা হয়ে গেছ মন্টু। বড়দের সঙ্গে কথা বলতেও জানো না।'

সুমন্তদা আজকাল প্রায়ই অন্যমনস্ক থাকে।

আমি ভয়ঙ্কর ঘাবড়ে গেলুম। এত দিনের মধ্যে সুমন্তদার এমন রূঢ় গলা কখনো শুনিনি। অভিমানে আমি গোঁজ হয়ে রইলুম, সুমন্তদা আর একটা কথাও বলল না আমাকে।

আজকাল প্রায়ই দেখি কল্যাণীদি আসে আমাদের বাড়িতে। পিঠভরা কালো চুল ছড়িয়ে, রঙিন শাড়ি পরে। রান্না-ঘরের দাওয়ায় পিঁড়ি পেতে বসে মা-র সঙ্গে গল্প করে, টানা-টানা বড় বড় চোখে তাকায়, মিষ্টি করে হাসে।

আর কল্যাণীদিকে আসতে দেখলেই উঠোনে বারান্দায় যেখানে থাকুক—সেখান থেকেই সোজা এসে ঘরে ঢুকে পড়ে সুমন্তদা। যদি আমাদের পড়াতে বসে থাকে, তা হলে বইয়ের মধ্যে আরো গুঁজে দেয় ঘাড়। যেন কল্যাণীদিকে সে চেনেই না।

একদিনের কথা মনে পড়ল। কল্যাণীদি এসেছে। মা জিজ্ঞেস করলেন, 'ক'দিন থেকে তো আর গান-টান শুনি না কল্যাণী।'

কল্যাণীদি বললে, 'গান আর কী করে হবে, সুমন্তদা তো যায়ই নি আজকাল।'

মা বললেন, 'কি রে সুমন্ত?'

সুমন্তদা যেন কি রকম থতমত খেলো।

'ক'দিন ধরে গলায় ব্যথা হয়েছে বুড়িমা, তাই—'

'গলায় ব্যথা? আজ ভোরেও তো চিৎকার করে কালীকীর্তন ধরেছিলি বাপু। গলার ব্যথা তো কিছু বোঝা গেল না।'

কল্যাণীদি খিলখিল করে হেসে উঠল: 'হাঁ, সে গান আমিও শুনেছি।'

সুমন্তদা হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। মা-র কথার জবাব না দিয়ে, পায়ে চটি গলিয়ে চটাস চটাস করে চলে গেল বাইরে। বললে, 'তোরা পড়, আমি এক্ষুণি আসছি।'

মা বললেন, 'ও ওই রকমই। পাগলাটে।'

বড় বড় চোখ দুটো সুমন্তদার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে একটু চুপ করে বসে রইল কল্যাণীদি। তারপর বললে, 'কাকিমা, আজ যাই।'

সুমন্তদার কী যে হল জানি না। স্বরাবর সন্ধ্যার পরে আমাদের একটু পড়িয়েই সে বেরিয়ে যেত, হয় ডাক্তার-বাবুর ওখানে পাশা খেলতে, নইলে গিয়ে বসত আড়তদার শশীবাবুর ওখানে—যিনি খুব সৌখিন লোক অথচ গীতা আর সাধু-সন্ন্যাসীদের নিয়ে আলাপ করতে ভালোবাসেন। কিন্তু এখন দেখছি, বেরোনোই প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। আমাদের পড়ানো হলেই সোজা চলে যায় নিজের ঘরে—পড়ে বীরবাণী, কখনো গীতা—কিংবা মাথা নামিয়ে বসে থাকে ঠাকুরের কথামৃতের ওপর।

দেখে-শুনে আমার কেমন ভয় করতে লাগল। একদিন আমি জিজ্ঞেস করতে গেলুম।

'সুমন্তদা, কথা বলব একটা?'

সুমন্তদা মাঠের একটা বকুল গাছে হেলান দিয়ে—বালুরঘাটের রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে—চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। আমাকে বোধ হয় আসতে দেখে নি, হঠাৎ চমকে উঠল। ফিরে চাইল আমার দিকে।

কিন্তু তার চাইতেও বেশি চমকালুম আমি। সুমন্তদার মুখ ফুলো ফুলো, চোখ লাল। বুঝতে অসুবিধা হল না, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে কাঁদছে।

সুমন্তদা কাঁদছে! এর চেয়ে অসম্ভব ব্যাপার হতে পারে কখনো? বাবার বকুনি খেয়ে কোনো সময় আমার চোখে জল এলে ধমকে বলত: 'ছি—ছি, তুই না পুরুষ মানুষ? পুরুষ কখনো কাঁদে? সে বীর, সে শক্তির সাধক। তার চোখে জল থাকে না—থাকে সংকল্পের আগুন। কী বলেছেন স্বামীজী?'

সেই সুমন্তদারই চোখে জল!

'আপনি কাঁদছেন সুমন্তদা?'

একটু চুপ করে থেকেই হেসে উঠল।

'কাঁদব কিরে? আমি কি দীপু? এই বিকেলবেলা কত সব পোকা ওড়ে, জানিস তো? তারই একটা এসে চোখে পড়েছিল। তাইতেই—'

কিন্তু কান্না আর চোখে পোকা পড়-বার তফাৎ বুঝতে পারি, অন্তত সে বয়েসটা হয়েছে আমার। এই আর একটা সত্য আমি নতুন করে আবিষ্কার করলুম। সুমন্তদাও মিথ্যে কথা বলে।

বোকার মতো একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে আমি বললুম, 'আপনি নিশ্চয় কোনো কারণে রাগ করেছেন আমাদের ওপর।'

'ধেৎ—বোকার মতো কথা বলিস নি।'

'নিশ্চয় আপনার মন খারাপ হয়েছে।'

চোখটা কোঁচা দিয়ে মুছে ফেলে বললে, 'হাঁ—মন মাঝে মাঝে খারাপ হয় বই কি। ভালো লাগে না রে। কি রকম যেন হয়ে যাচ্ছে সব।'

'আবার বুঝি দেশ থেকে জ্যাঠাইমা বিয়ে করবার জন্যে চিঠি দিয়েছে আপনাকে?'

'না—সে-সব কিছু না।'

'কী হয়েছে তা হলে?'

'তুই বুঝবি না?'

বকুলের গন্ধে ভরা মিষ্টি বাতাসের ভেতর কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলুম দুজনে। বেলা ডুবে গিয়ে ঘাসের ভেতরে ঝিঁঝির ডাক উঠছিল, পোকা ডাকছিল কিটির-কিটির করে—কোথায় অনেক দূরে সাঁওতালদের বাঁশি বাজছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সুমন্তদা বললে, 'মন্টু?'

'অ্যাঁ?'

'ডাকের আশায় বসে আছি, কিন্তু সে আসবে না। কোনোদিন না।'

'কেন সুমন্তদা?'

'মনটাই ঠিক হল না। আমি তৈরি হতে পারছি না। শুধু তাই না—নিজেকে আমার চাবুক মারা দরকার।'

'সে কি সুমন্তদা!'

'আমাকে ওই পাঠক দেউলের জঙ্গলেই যেতে হবে। না—কেবল অমাবস্যার রাত্রে নয়। আমি ওখানেই পড়ে থাকব মায়ের পায়ে মাথা দিয়ে। দিনের পর দিন। দেখি, কিছু হয় কি না।'

'তা কী করে হবে?'—আমি যতটা ভয় পেলুম, আশ্চর্য হলুম তার চাইতেও বেশি: 'জঙ্গলে থাকবেন কী করে? সেখানে কে খেতে দেবে?'

'খালি খাওয়া আর খাওয়া! ওই তো শিখেছিস কেবল। যা—যা, বাড়ি চলে যা এখন। আর বিরক্ত করিস নি আমাকে।'

...ছবিগুলোর মধ্যে অনেক ফাঁক। প্রত্যেকটা দিনের ভেতরেই যোগসূত্র ছিল, তখন, সুমন্তদা ক্রমেই যেন সুদূর আর অপরিচিত হয়ে উঠছিল আমাদের কাছে। এমন কি বাবা যে নিজের কাজের বাইরে বই ছাড়া কোনো কিছুর খবর রাখেন না। আর, তিনি একদিন সকালে সুমন্তদাকে ডেকে বললেন, 'তোর কী হয়েছে সুমন্ত?'

'কিছু তো হয় নি কাকামণি?'

'কিছু হয় নি?'—বাবা চোখ থেকে চশমাটা নাকের নীচে নামালেন: 'তা হলে কাল মাঝ রাত্তিরে আত্রাইতে সাঁতার কাটছিলি কেন তুই?'

মা আমাদের খাবার দিতে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমি আর দীপু অবাক হয়ে চাইলুম সুমন্তদার দিকে।

মা বললেন, 'কে মাঝ রাত্তিরে সাঁতার কাটছিল আত্রাইতে?'

'আর কে? সুমন্ত।'

'সে কি রে!'

সুমন্তদা মাথা নীচু করে দীপুর স্লেটে একটা অঙ্ক কষে দিচ্ছিল। তেমনি মাথা নামিয়েই বললে, 'আপনাকে কে বলেছে, কাকামণি?'

এই তো একটু আগে বলে গেল থানার চৌকিদার। টহলে বেরিয়ে সে তোমার নদীতে নামতে দেখেছে, সাঁতরাতে দেখেছে। রাত বোধ হয় তখন দেড়টা-দুটো হবে।'

মা বললেন, 'কী সর্বনাশ! এই ভাদ্র মাসের ভরা নদীতে!'

সুমন্তদার মাথা আরো ঝুঁকে পড়ল প্লেটের দিকে।

বাবা বললেন, 'ব্যাপারটা কী, রাত দুটোয় নদীতে স্নান করবার অভ্যেস হল কবে থেকে?'

'না, মানে হঠাৎ বড্ড গা জ্বালা করছিল—'

'গা জ্বালা করছিল বলে নদীতে স্নান করতে হবে? কেন—বাড়িতে ইঁদারা ছিল না? আর হঠাৎ গায়ের জ্বালাই বা কেন?'

সুমন্তদা জবাব দিল না।

'তসুখ-বিসুখ কিছু হয়ে থাকলে ডাক্তারকে বল। তার ওখানে তো প্রায়ই আড্ডা দিস।'

'না কাকামণি, ওষুধের দরকার হবে না।'

'দরকার না থাকে, খুব ভালো। কিন্তু এর পরে আর কোনোদিন মাঝ রাত্রে ও-ভাবে নদীতে নেমো না।' বর্ষার পর প্রায় প্রতি বছরই আত্রাই মানুষ নেয়। তা ছাড়া একটা কুমিরও এসেছে খবর পেয়েছি।'

মা প্রায় ডুকরে উঠলেন: 'লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি তোর?'

কী হয়েছিল সুমন্তদা-ই জানে। কতদিন অনেক রাত্রে বাইরে বদম গাছটায় হাওয়ার শব্দে আমার ঘুম পাতলা হয়ে যায়, আধখানা জেগে উঠি প্যাঁচার ডাকে; শুনতে পাই বহু দূর থেকে একটা এক-টানা গুন গুন শব্দ—বুঝতে পারি নিজের ঘরে আলো জেলে কিছু পড়ছে সুমন্তদা। হয়তো গীতা—হয়তো স্বামীজীর বই।

আর একটা দিন। ছুটির দুপুরে চলেছি ক্লাসের এক বন্ধুর বাড়িতে। লুডো খেলবার কথা আছে সেখানে।

একটা ডাক কানে এল: 'মন্টু।'

চেয়ে দেখি, কল্যাণীদি। একটা জানলার পাশে দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। খোলা চুলগুলো কাঁধের দু ধার দিয়ে কোমর ছাপিয়ে নেমে এসেছে। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল কল্যাণীদিকে।

'কোথায় চললি মন্টু?'

'কেশবদের বাড়িতে।'

'আচ্ছা যা।'

এক পা এগিয়েছি, আবার ডাক: 'মন্টু!'

'কী কল্যাণী দি?'

'সুমন্তদা কী করছে রে?'

'ঘরে বসে পড়ছে।'

'খুব পড়ে, না? কী পড়ছে বল্ তো?'

'স্বামীজীর বই। স্বামীজী কে জানেন তো?'—আমি উৎসাহভরে বলতে লাগলুম: 'স্বামী বিবেকানন্দ। তা ছাড়া ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথামৃত। আর—'

কল্যাণীদি হাসল: 'থাক, আর বলতে হবে না, বুঝতে পেরেছি।'—একটু চুপ করে থেকে বললে, 'একটা কাজ করতে পরিবি?'

'কী কাজ কল্যাণীদি?'

'সুমন্তদাকে একবার—বলতে বলতে কী ভেবে থেমে গেল: 'আচ্ছা, কিছু বলতে হবে না। তুই যা।'

মনে পড়ে এরই দু-একদিন পরে আবার হার্মোনিয়ামের সঙ্গে সুমন্তদার গলা বেজে উঠেছিল হরেনজ্যাঠার বাসায়:

'মুঠো মুঠো রাঙা জবা কে দিলে
তোর পায়—'

আর তারই সঙ্গে মিলে গিয়েছিল কল্যাণীদির গলা।

'এই শরৎ আলোর কমল বনে—'

আমার ঘোর ভাঙল।

'এই শরৎ আলোর কমল বনে
বাহির হয়ে বিহার করে যে ছিল
মোর মনে মনে—'

সামনে নীলমণি রোড, নারকেলের সারি আর সমুদ্র নয়—অনেক দূরের কলকাতা॥ পিসিমার দিবানিদ্রা শেষ হল বোধ হয়, ঘুম থেকে উঠে কলকাতা স্টেশন ধরেছেন। পরিচিত একটি প্রিয় মধুকণ্ঠ। গ্রামোফোন রেকর্ড।

আত্রাইয়ের ধারে ধারে কাশ ফুটেছে আবার। সন্ধ্যায়-রাত্রে মাথার ওপর দিয়ে হাঁসের ঝাঁক চলে যায় কোন্ দূরের নদীর চড়ায়, কোন্ জলায়, কোন্ পদ্ম-বিলের উদ্দেশে। আমাদের বাগানে দুটো গাছে শিউলির উৎসব, ভোরবেলা তার গন্ধে ভরে যায় বাড়িটা। স্কুলে পড়াতে পড়াতে কড়া মাস্টারমশাইয়েরাও অন্য-মনস্ক, কবে যে ছুটি আসবে পুজোর! আস্তর পড়তে শুরু হয়েছে। নাট-বারোয়ারী চণ্ডীমণ্ডপের সামনে, দেখি প্রতিমার খড়ের কাঠামোর ওপর মাটির আস্তর পড়তে শুরু হয়েছে। নাট-মন্দিরটা এতদিন ছিল গোরু-ছাগলের আস্তানা, সাফ করা হচ্ছে সে সব, আনা-গোনা চলছে বন্দরের সব মান্যগণ্য লোক-দের।

আর—আর এবারও যাত্রা আসবে।

হাওয়ায় যখন ছুটি, যখন পুজোর গন্ধ, তখন একদিন—

সারাটা রাত ধরে খ্যাপা শ্রাবণের মাতামাতি গেল আশ্বিনের অঙ্গনে। সকালবেলায় বাড়িতে হুলুস্থুলু কাণ্ড।

আমাদের বাড়ির কাছেই আত্রাইয়ের ধারে যে ছোট জংলা জায়গাটা—সেখানে ক'টা বাঁদর-লাঠি, পানিয়ালা, জিকে, নোনা, কবলা আর কুলগাছের জঙ্গল, সেইখানে পাওয়া গেল সুমন্তদাকে। কতগুলো বাবলার চারার ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, কাঁটায় সারা গা ক্ষত-বিক্ষত—কপালটা অনেকখানি ফুলে কেটে বীভৎস দৃশ্য একটা।

হৈ-চৈ পড়ে গেল। মা চেঁচিয়ে কান্না জুড়লেন। বন্দরশুদ্ধ লোক জড়ো হয়ে গেল আমাদের বাসায়।

জ্ঞান হওয়ার পর প্রশ্ন করলেন অমূল্য ডাক্তারই।

'ব্যাপার কী সুমন্ত?'

দু-হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে সুমন্তদা বললে, 'আমি জানি না।'

'জানো না? রাতের বেলা ওখানে গেলে কি জন্য? ওই বৃষ্টির ভেতরে?'

'কিছু জানি না, অমূল্যদা।'

'জানো না?' তোমাকে তো হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যায় নি ওখানে। তা ছাড়া কপালেই বা ও-রকম চোট লাগল কী করে?'

'সত্যি বলছি, কিছু জানি না অমূল্যদা। মনে হল বাইরে থেকে আমায় কে ডাকছে। উঠে বেরিয়ে গেলুম। তারপরে কী যে হল—'

মা চেঁচিয়ে উঠলেন: 'নিশ্চয় নিশির ডাক।' দিনরাত ধর্মের বই পড়ে, ঠাকুরের নাম করে, তাই বেঁচে গেল এ যাত্রা। নইলে—' শিউরে থেমে গিয়ে বললেন: 'হ্যাঁ রে, তিন ডাক পর্যন্ত সাড়া দিতে হয় কক্ষণো? তুই তো এত পড়িস, এই খবরটুকু জানিস নে?'

'হুঁ'—বলে ডাক্তার উঠলেন। তার-পর বললেন, 'এ সব গল্পই শুনতুম, কখনো বিশ্বাস করি নি। এখন দেখছি কেউ বলতে পারে না কিসে কী হয়।'

বাবাই কোনো কথা বললেন না, আগাগোড়া গম্ভীর হয়ে রইলেন।

সারা বন্দর দিন কয়েক জমাট হয়ে রইল নিশির ডাকের গল্পে। আমাদের বাড়িতে এসে একদিন স্কুলের হেড্ স্যার কি সব ইংরিজি বলতে লাগলেন, এখন সন্দেহ হয়, সেক্স-পীয়রের হ্যামলেট থেকে সেই অদ্বিতীয় পংক্তি দুটি আউড়েছিলেন তিনি। আর বন্দরের সবচেয়ে শৌখিন লোক—সোনার পশমা পরা, কোঁকড়া চুলে টেরিকাটা, গুড়ের আড়তদার শশীবাবু সুমন্তদাকে দেখতে এসে বলতে লাগলেন নানারকম রোমহর্ষক গল্প।

'বুঝলেন, সে হল ইটাহার থানার ওদিকে। রাত্তিরে যাচ্ছি গোরুর গাড়ি করে। রাত তখন বারোটা বেজে গেছে, একটু আগেই শেয়ালের ডাক উঠেছিল। কিন্তু হঠাৎ এক জায়গায় এসে—'

বলতে বলতে তাঁর সারা গায়ে কাঁটা দিল: 'এক জায়গায় এসে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। গাড়োয়ান যতই শাঁটা হাঁকড়ায়, গোরু আর নড়ে না। কেবল ফোঁস ফোঁস করে—গাড়ি ফেলে পালাতে চায়। কী বলব মশাই, ভয়ে গোরুগুলোর চোখ এই বড়ো বড়ো হয়ে গেছে যেন কী

বিভীষিকা দেখছে—কারা ভয় দেখাচ্ছে ওদের। তখন কি জানি—রাস্তার ধারেই মস্ত গোরস্থান একটা, আর যারা খবর রাখে, তারা পারতপক্ষে ও রাস্তায় গড়ি—'

রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখবার জন্য এই সবই যথেষ্ট আমাদের পক্ষে। বিছানায় শুয়ে খোলা জানলা দিয়ে তাকাবার সাহস হয় না আর, তার দরকারও হয় না, মা-ই সেটা বন্ধ করে রাখেন। আর বাইরে পাতা নড়লেই মা চমকে চমকে ওঠেনঃ কেউ ডাকল নাকি? খবর্দার মন্টু, খবর্দার দীপু—তিনবার ডাকের আগে সাড়া দিবি না কিন্তুতেই।

বাবা একদিন বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কী আরম্ভ করলে বলো দেখি?'

মা বললেন, 'তুমি তো কিছু বিশ্বাস করো না—কিন্তু সুমন্তকে ওভাবে—'

বাবা বললেন, 'বাজে বোকো না—রাতদিন ধর্মটর্মের বই পড়ছে—মাঝরাতে চেঁচিয়ে কালীর কীর্তন গেয়ে উঠছে, মাথায়ই গোলযোগ হয়েছে ওর। অন্ধকারে বেরিয়ে গিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে এই কাণ্ড। বেকুব!'

'দ্যাখো—'—

থামো। ওর হালচাল আমার ভালো লাগছে না। শেষকালে পাগল হয়ে গেলে কেলেঙ্কারী একটা। আমি ভাবছি, পুজোর পরে এখানে ওকে আর রাখব না। পাঠিয়ে দেব দেশে।'

'সে কি—জ্যাঠাইমা কী ভাববেন?'

'কিছুই ভাববেন না। তিনি তো ওকে পাঠিয়ে দেবার কথা কয়েকবারই লিখেছেন আমায়।'

'কিন্তু ছেলেমেয়ে দুটো যে ওর জন্যে পাগল। ভারী কষ্ট হবে ওদের।'

বাবা বললেন, 'বুঝি। কিন্তু আমার মনে হয়, এখানে কী একটা গোলমাল হয়েছে ওর। এখান থেকে চলে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। হাজার হোক পরের ছেলে। আমারও তো দায়িত্ব আছে একটা।'

মা বললেন, 'না-না, সে ভালো দেখাবে না।'

আচ্ছা, ভেবে দেখা যাবে পরে। কিন্তু তুমি এখন ওই জানলাটা খোলো দেখি। ভাপসা গরমে প্রাণ বেরিয়ে গেল।'

দীপু ঘুমিয়ে পড়েছিল, আমি কথাগুলো কান পেতে শুনেছিলুম ঘুমের ভাণ করে। সুমন্তদাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে শুনে আমার কান্না পেলো। তারপরেই মনে হল, ও শুধু কথার কথা—বাবা রাগ করে বলেছেন। সুমন্তদা আমাদের ছেড়ে কখনো যাবে না, কোনোদিন না।

আর সুমন্তদা।

একেবারে চুপ। গীতা পড়তে শুনি না, বীরবাণীও না। এমনকি ঝড়-বৃষ্টি-শীতে যা তার কোনদিন বাদ জ্বর হয় নি, সেই এক্সারসাইজ করাও তার বন্ধ হয়ে গেছে আজকাল। আমি বরং অভ্যাসে উঠে পড়ি—শুকতারা পশ্চিমে নেমে গেলে বিছানার ভেতরে বাবার গলা যখন গুনগুন করে ওঠেঃ 'অহল্যা-দ্রৌপদী-কুন্তী-তারা-মন্দোদরীস্তথা, পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং', তখন দরজা খুলে বেরিয়ে আসি, হাত-মুখ ধুয়ে, তৈরি হয়ে জন-বৈঠক দিই। আর কী আশ্চর্য, তখন অঘোরে ঘুমোয় সুমন্তদা।

'বুঝলি, উঠতে হয় ব্রাহ্মমুহূর্তে। শরীর শুচি হয়, মন পবিত্র হয়ে যায়। ভগবানের নাম করবি, শরীর-চর্চা করবি। স্বামীজী কী বলেছেন? নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।'

আশ্চর্য, নিজের উপদেশ সুমন্তদা নিজেই ভুলেছে।

ভেজা মাটির গন্ধ আসে, উঠোনের পেয়ারা আর সজনে গাছ থেকে টুপটুপ করে শিশির পড়ে। ছায়া ছায়া অন্ধকার তখনো—অদ্ভুত ভালো লাগে, শির-শিরানি হাওয়া দেয়, কোন কোনদিন ওদিকের ওভারসিয়ার বাবুর বাড়ি থেকে কল্যাণীদির গান আসেঃ

'নীল যমুনার জল, বল্ রে ওরে বল্
কোথায় আমার শ্যাম—'

হঠাৎ একটা ধড়াম করে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল সুমন্তদা।

'মন্টু!'

বৈঠক দিতে দিতে আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলুম।

'সুমন্তদা, আপনি তো আর এক্সারসাইজ করেন না কদিন ধরে।'

'আমার শরীর ভালো নেই। অসুস্থ শরীরে ব্যায়াম করা উচিত নয়।'—সকালের আবছা আলো ফুটছে তখন, সেই আলোয় সুমন্তদাকে কেমন অদ্ভুত লাগলঃ 'তোর বৈঠকি শেষ হল?'

'আর পাঁচটা বাকি আছে।'

'থাক গে। ওতে কিছু যায় আসে না। চল্ আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'বাইরে। তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।'

সুমন্তদার চোখদুটো যেন জ্বলছিল—আমার ভয় করতে লাগল। আমি বললুম, 'কোথায়?'

'নিশ্চয়ই দরকার আছে কোনো।'—সুমন্তদা মুখ বিকৃত করলঃ 'আর কানের কাছে পেত্নীর মতো সমাজে হাঁ হাঁ করে গান গাইছে ওই মেয়েটা, ভালো লাগে কারো?'

বিস্ময় অতল।

কল্যাণীদির গান পেত্নীর মতো। অথর্চ সবাই তো ভালো বলে। আমাদের বাড়িতে এসেও তো কদিন গান শুনিয়েছে, বাবা পর্যন্ত কত খুশি হয়েছেন। আর কতবার সুমন্তদা নিজে বলেছেন, 'মেয়েটার গলা খুব চমৎকার রে—যা দরকার তা হল একটু তালিম। খুব ভালো গাইতে পারবে তা হলে।

সেই কল্যাণীদির গান পেত্নীর মতো! আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম।

'বোকার মতো তাকিয়ে আছিস কী? ও গান যেখানে শোনা যায় না—চল্ সেখানে।'

কিছুই বুঝতে না পেরে—সদর খুলে আমি সুমন্তদার সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলুম।

খানিকটা হেঁটে—খেলার মাঠ আর বকুল গাছগুলো পার হয়ে আমরা আত্রাইয়ের ধারে এসে দাঁড়ালুম। চারদিক সাদা হয়ে আসছে, রঙ পড়েছে আকাশে, ওপার থেকে খেয়া ছেড়েছে বন্দরের দিকে। নদীর ওপরে একটা হালকা কুয়াশা—নৌকোটাকে, মানুষগুলোকে ছায়ার মতো দেখাচ্ছে এখান থেকে।

হাওয়ায় সুমন্তদার রুক্ষ চুলগুলো উড়তে লাগল, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর বললে, 'মন্টু।'

'উঁ।'

'মানুষ হয়ে জন্মানোর চাইতে কুকুর হওয়া ভালো, বুঝলি?'

'সে কি!'

সুমন্তদা জবাব দিল না। আবার একটু চুপ করে থেকে বললে, 'একদিন মাঝরাতে আমি আত্রাইয়ের জলে নেমেছিলুম। কেন জানিস?'

'আপনার গা জ্বালা করছিল।'

'পুড়ে যাচ্ছিল, পাপে পুড়ে যাচ্ছিলুম আমি। এত অশুচি হয়ে গিয়েছিলুম যে ভরা নদীতে আমি ডুবে যেতে চেয়েছিলুম—যেমন করে সাঁতার শেখার আগে ডুবতে যাচ্ছিলি তুই। কিন্তু ভুলে গিয়েছিলুম—যে সাঁতার জানে সে জলে ডুবে মরতে পারে না।'

শুনে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল।

'সুমন্তদা, কিসের পাপ আপনার? কেন ডুবে মরবেন আপনি?'

'বলতে পারব না তোকে, কাউকে বলা যায় না সে-কথা। আর—আর একদিন আগে মাঝ রাতে আমায় কে ডেকেছিল, জানিস? শিউরে উঠে আমি বললুম, 'নিশি!'

'না—নিশি-টিশি কিছু নেই, ও-সব একেবারে বাজে কথা। আমাকে ডেকেছিল আমার পাপ।'

'পাপ!'—শুনে আর একবার হাঁ করে রইলুম আমি। এক-আধটা ছোটখাটো পাপ আমিও যে করি না তা নয়—একদিন অকারণ কৌতূহলে একটা থার্মোমিটার দেখতে গিয়ে—সেটা ভেঙে ফেলে অম্লান

বদনে বলেছিলুম, 'আমি জানি না তো। একটা শাদা বেড়াল এসে জানলা দিয়ে লাফিয়ে টেবিলে পড়েছিল, সেই-ই ফেলে দিয়েছে হয়তো।' তা ছাড়া এক-আধটু আচার-আমসত্ত না চেয়ে আত্মসাৎ করা তো আছেই। কিন্তু সে-সব পাপ তো মাঝ রাত্তিরে এসে নাম ধরে ডাক দেয় না কোনোদিন।

সুমন্তদা ওপরের দাঁতের পাঁটি দিয়ে নীচের ঠোঁটটাকে চেপে ধরল।

'পাপ—আমার পাপ। মনে হল ছুটে যাই পাঠক-দেউলের জঙ্গলে—মায়ের পায়ে গিয়ে আছড়ে পড়ি। সেইজন্যেই বেরিয়ে পড়েছিলুম। বেরিয়েই বুঝতে পারলুম, আমি তো মানুষ নই, কুকুর হয়ে গেছি। এই অশুচি শরীর-মন নিয়ে কোথায় যাব—কার কাছে যাব? সাধকের ওই পীঠ-স্থানে আমি কি যেতে পারি আর? মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল, তবু যেন আমার সারা শরীর জ্বলে যেতে লাগল মশালের মতো। আমি কোথায় যাচ্ছি, কী করছি—কিছু বুঝতে পারলুম না। ছুটে গেলুম ছোট জঙ্গলটার ভেতরে, ইচ্ছে করছিল টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলি মাথাটাকে। পাগলের মতো মাথাটাকে আছড়ে দিলুম একটা গাছের সঙ্গে, তারপর—'

তারপর আর কিছু বলবার দরকার ছিল না। বাকীটুকু আমার জানা।

'কাউকে বলবি না মণ্টু?'

'না সুমন্তদা। কিন্তু—' আমি কেঁদে ফেললুম: 'এখন কী করবেন আপনি?'

'জানি না।'

'স্টিমারে সেই যে মহাপুরুষ স্বপ্ন দিয়েছিলেন—'

'জোচ্চার!'

'আঁ!'

'মেয়েমানুষের মতো কাঁদিস নি মণ্টু, বাড়ি চল।'

কিন্তু বাড়ির কাছে এসেও ঢুকল না সুমন্তদা। কল্যাণীদি তখনো গান করছিল:

'নয়ন যদিন বইবে বেঁচে, তোমার
পানেই চাইব গো,
কইতে কথা পারব যদিন—'

তীরবেগে ফিরে দাঁড়ালো সুমন্তদা।

'তুই বাড়ি যা মণ্টু। আমার কাজ আছে একটু।'

আমি থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম কিছুক্ষণ। তারপর মনে হল, বাবাই ঠিক বলেছিলেন—সুমন্তদা পাগল হয়ে যাচ্ছে।

॥ আট ॥

'নীল যমুনার জল, বল্ রে ওরে বল্—'

যমুনা আমি দেখেছি বড় হয়ে। নীল তার জল। কিন্তু তারও চেয়ে অনেক নীল সমুদ্র। যমুনার জলে যে জ্বালা নেবে না, এই সমুদ্র তাকে কোথায় মুছে নিয়ে যায়, কোন অতলের ভেতরে তলিয়ে দেয় তাকে। তাই কি এস কে ঘোষম্ এই সমুদ্রের ধারে এসেই আশ্রয় নিয়েছেন?

কিন্তু কল্যাণীদি? তারও যমুনা কি এই সমুদ্রে এসে মিশেছে শেষ পর্যন্ত? তারও কি জ্বালা ছিল সুমন্তদার মতো? কিংবা তার চাইতেও বেশি?

আজ বিকেলে গিয়ে—ঘড়িটা আনবার সময় আমি সে-কথা কি জিজ্ঞেস করতে পারি এস কে ঘোষম্‌কে? পারি কি?

তার আগে ছবির সারির শেষে এসে দাঁড়াই। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আর উজ্জ্বল ছবিটা। সেই ছবির সঙ্গে আমারও কী দারুণ দুঃস্বপ্ন জেগে আছে!

বারোয়ারি মণ্ডপে ঝলমল করছে প্রতিমা, ঝিকমিক করে জ্বলছে কাড়ের আলোয় ডাকের সাজ।

আর নাট-মন্দিরে জমাট অভিনয়। যত দূর মনে পড়ছে, পালার নাম 'নরমেধ যজ্ঞ।'

দীপু মা-র কাছে, ওদিকে চিকের আড়ালে। আমি এদিকে আসরের সামনের সারিতে, বাবার পাশে। সুমন্তদা আসে নি, শরীর খারাপ, আর এসব যাত্রা তার ভালোই লাগে না। দীপু নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে, ওটা বরাবরই একটু পরেই ঘুমিয়ে যায়। আমারও যে মধ্যে মধ্যে মাথা ঢুলে না এসেছে তা নয়—তবু প্রাণপণে ঘাড় সোজা করে বসে আছি আমি। অত্যন্ত বোমহর্ষক যাত্রা। রাত তখন বোধ হয় তিনটের কাছাকাছি। একটা নিদারুণ কিছু ঘটতে যাচ্ছে—জুরীদেব বেহালায় দ্রুত গতিতে চলেছে ছড়ের টান। একটা কিছু ঘটবে, ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে।

ঘটল। কিন্তু যাত্রার আসরে নয়।

হঠাৎ ভীড় ঠেলে কোথা থেকে পাগলের মতো ছুটে এলেন ওভারসিয়ার জ্যাঠা। হরেন সেন।

'শিবেন, শিগগীর এসো।'

চমকে বাবা বললেন, 'কী হয়েছে?'

জ্যাঠামশাই কী যেন বললেন বাবার কানে কানে।

বাবার মুখ ছাইয়ের মতো হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। একটা কথা বলতে পারলেন না মিনিটখানেক।

'অসম্ভব, হতেই পারে না। সুমন্ত—'

জ্যাঠামশাই আবার বললেন, 'তুমি এসো শিগগীর।'

বাবা আর দাঁড়ালেন না, উঠে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। আমাকে বললেন, 'তুই থাক মণ্টু, যাত্রা শেষ হলে চাকরটা তোকে নিয়ে যাবে। আমি তোর মা-কে ডেকে নিয়ে এক্ষুণি বাড়ি চলে যাচ্ছি।'

'কী হয়েছে বাবা—' আমি জিজ্ঞেস করার সময়ও পেলুম না। তার আগে বাবা চলে গেছেন আসরের বাইরে।

কিন্তু যাত্রা দেখার সুখ আমার চলে গিয়েছিল। সুমন্তদা! কী করেছে সুমন্তদা? সেদিনকার প্রত্যেকটা কথা আমার মনে পড়ে যেতে লাগল। সেই পাপ! যে পাপের জন্যে সে আত্রাইয়ের জলে ডুবতে গিয়েছিল, ঠুকে মাথাটা ভাঙতে চেয়েছিল একটা গাছের সঙ্গে, সেই পাপই কি আজও—

সুমন্তদা কি ডুবে মরেছে? টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলেছে নিজের মাথাটা?

বুকের ভেতর হিম হয়ে গেল আমার, কান্নায় ঝাপসা হয়ে গেল চোখ। যাত্রায় কী হচ্ছে, কী দেখছি কিছু বুঝতে পারলুম না। ইচ্ছে করছিল এখনি ছুটে যাই বাড়িতে, কিন্তু বাবা যাত্রা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসতে বলেছেন, আমাকে বসতেই হল। এমন যন্ত্রণা যেন জীবনে আর কখনো পাই নি আমি।

পাশ থেকে কে যেন বললেন, 'বাবা কোনো কাজে গেছেন, ভয় কী খোকা? কাঁদছ কেন?'

'না—না—কাঁদছি না তো!'

যাত্রা শেষ হতে না হতে তীরবেগে ছুটলুম আমি। চাকরের জন্যে অপেক্ষা করবার মতো মনের অবস্থা আর নয় তখন।

তারপরে সবটা যেন ঘূর্ণি।

হরেন জ্যাঠার বাড়ি থেকে কাদের যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ। মা ঘরের মেজেতে আঁচল বিছিয়ে মুখ ঢেকে শুয়ে আছেন। বাবা ইজিচেয়ারটায় কাঠ হয়ে বসে—বাড়ির সব কটা চেয়ারে মোড়ায় অমূল্য ডাক্তার, শশীবাবু, আরো কারা কারা সব বসে। একটি কথাও কেউ বলছেন না!

বেবী তাজমিশ্রি
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক
সর্বত্র প্রদর্শিত ও বিক্রীত
পামরিস্ট্রি এণ্ড কেমিক্যালস
কলিকাতা-৪৭

আমি কিছু বলেছিলুম, সুমন্তদা—

সব কটা চোখ ঘুরে গেল আমার দিকে। তারপর হঠাৎ ভয়ঙ্কর গলায় একটা ধমক দিলেন বাবা: 'চোপ! একটা কথাও না—শুতে যাও মন্টু।'

কিন্তু শোবার আর দরকার ছিল না। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই জানা হয়ে গেল। বাইরে ওঁরা কথা আরম্ভ করেছিলেন।

টুকরো টুকরো সেই সব আলোচনা থেকে বুঝতে কিছু বাকী রইল না আমার। সুমন্তদা শরীর খারাপ বলে যাত্রা দেখতে যায় নি। কল্যাণীদিরও নাকি খুব মাথা ধরেছিল, সে-ও যায় নি। মাঝ রাতে জ্যাঠাইমা ঝিকে পান আনতে পাঠিয়েছিলেন বাসায়। তারপর—

তারপর ঝিয়ের সন্দেহ ছিলই। একদিন নাকি কী সে দেখেও ছিল। কিন্তু সাহস করে বলতে পারে নি। সুমন্তদা অতি সচ্চরিত্র বলে বিখ্যাত, ধার্মিক মানুষ, ধর্মের গান গায়—তার কথায় কে বিশ্বাস করবে। মাঝখান থেকে ঝিয়েরই চাকরি যেত।

কল্যাণীদিকে বাসায় না পেয়ে সে আসে আমাদের বাড়িতে। এখানেও কেউ নেই। তারও পরে—

বাবা চেঁচিয়ে উঠলেন: 'রাস্কেল—রাস্কেল! আমি এখনি চৌকিদার পাঠাচ্ছি চারদিকে। ধরে আনুক, তারপর নিজের হাতে আমি গুলী করব হারামজাদাকে।'

জ্যাঠামশাই বোধ হয় কাঁদছিলেন। বললেন, 'না শিবেন, না। কেলেঙ্কারী বাড়িয়ে আর লাভ নেই। ওরা তো নাবালক নয়। যে চুলোয় গেছে যাক, আমরা ভাবব ওরা মরে গেছে। কিন্তু কেবল ভাবছি—কল্যাণীর মা-বাপকে—'

'আমিই বা কী বলব ওই শুয়োরটার মাকে!'

আমি আর সহ্য করতে পারছিলুম না। সারা রাত জেগে থাকা উত্তপ্ত মাথাটা যেন ফেটে যেতে চাইছিল আমার। ইচ্ছে হল, চিৎকার করে বলি না—না, এ সব মিথ্যে। সুমন্তদা কল্যাণীদিকে দেখতে পারে না, সে বলে ও পেত্নীর মতো গান করে। কল্যাণীদি যেখানে খুশি যাক, কিন্তু আমি জানি, সুমন্তদা কোথায় গেছে। আমি জানি পাঠক দেউলের জঙ্গলে গিয়ে মায়ের পায়ে আশ্রয় নিয়েছে সে—যে মা তার মনের সব দুঃখ, সব পাপ কোলে নিয়ে তাকে শান্তি দেবেন।

আমি চিৎকার করে বলতে চাইলুম, বলতে পারলুম না। জানি, কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না, আমি ছেলেমানুষ বলে এক ধমকে থামিয়ে দেবেন আমাকে। তা হলে—তা হলে তার আগে আমি সুমন্তদাকে ফিরিয়ে আনব। গিয়ে বলব, আপনি অন্তত একবারের জন্যে ফিরে আসুন, এই কদর্য মিথ্যাটাকে ভেঙে [illegible] আশ্রয় তো আপনার রইলই।

আমি বেরিয়ে এলুম ঘর থেকে।

তখনো সকাল হয় নি, তখনো আকাশে হীরের মতো ধক্ ধক্ করছে শুকতারা। উঠোনের ভিজে মাটির গন্ধ, বাগান থেকে শিউলির গন্ধ, ভোরের হাওয়ায় পেয়ারা আর সজনে গাছের পাতা থেকে টুপটুপ করে শিশির পড়া।

ওঁরা নিজেদের মধ্যে কথায় তন্ময়। আমাকে দেখলেন কি না জানি না। দেখলেও লক্ষ্য করলেন না কেউ।

ঝড় চলছিল আমার মাথার ভেতরে—পাঠক দেউলের জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছিলুম না। ছুটেই চলে যেতে চাইছিলুম, হঠাৎ দোরগোড়ায় দেখলুম শশীবাবুর সাইকেলটা। একবার জিজ্ঞেস করার কথাও মনে হল না—আর জিজ্ঞেস করলে কে যেতে দেবে! সেই সাইকেলটা নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লুম পাঠক দেউলের বনের দিকে।

তখনো কুয়াশা—আত্রাইয়ের এপার-ওপার ধোঁয়ায় ঢাকা। পথে যাত্রা-ফেরৎ মানুষের চলা। যাত্রার গানও গুনগুন করছিল তাদের কেউ কেউ। আমি কিছু দেখছিলুম না, কিছু শুনছিলুম না। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে প্যাডল করে চললুম বালুঘাটের রাস্তার দিকে।

হাওয়ায় শীত—কান দুটো কনকন করছে। গোরুর গাড়ির রাস্তায় সাইকেল চলতে চায় না, এখানে-ওখানে কাদা জমে আছে, দুবার পড়ে গেলুম সাইকেল নিয়ে। টের পেলুম আমার হাঁটু ছড়ে গিয়ে রক্ত পড়ছে, তবু আমার কোনো অনুভূতি ছিল না। ধুলো, মধ্যে মধ্যে কাদা—এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় সাইকেল চালাতে আমার পা দুটো ছিঁড়ে পড়ছিল, বুকে দম পাচ্ছিলুম না, থেকে থেকে ধোঁয়া-ধোঁয়া হয়ে আসছিল চোখ।

তবু থামবার উপায় নেই। এক মুহূর্ত থামতে পারব না আমি। কখন পেরিয়ে গেল সেই বোঁদের দোকান, কোথায় ফেলে এলুম সেই ভয়ঙ্কর পাকুড় গাছটা—যার তলায় কুষ্ঠরোগী বুড়ীটাকে শেয়ালে খেয়েছিল। তারপর পথ ছেড়ে, মাঠে নেমে, আরো দু-বার আছাড় খেয়ে আমি এসে পৌঁছে গেলুম পাঠক দেউলের জঙ্গলে।

না, পথ ভুল করি নি। রাস্তা থেকেই জঙ্গলের বড় বড় গাছগুলোকে দেখা যায়।

আর সাইকেল চলে না, ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে পথ নেই কোথাও। এখন আলো ফুটেছে, গাছপালার মাথার ওপর ঝিলমিলিয়ে উঠেছে নরম রোদ—কিন্তু এখানে ছায়া, শীতল কালো ছায়া, শ্যাওলা পড়া—পরগাছা দোলা গাছের সার। তলায় ঠাণ্ডা [illegible], অথচ তখনো সুমন্তদা অজানা, মাকড়সার জালে শিশির, গাছের পাতা থেকে শিশির টপছে। পাখির ডাকে ভরে গেছে সমস্ত বন—অথচ কী নির্জনতা—কী নির্জনতা!

একটা গাছের গায়ে সাইকেলটাকে ঠেসান দিয়ে আমি সেই নেশার ঘোরেই এগোতে লাগলুম মন্দিরটার দিকে। চলতে লাগলুম পাথর টপকে টপকে, একবারের জন্যে চোখে পড়ল সেই বেদীটার ধ্বংসস্তূপ—যেখানে এক সময় কত নরবলির রক্ত ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

সামনে মন্দির। কিছু দেখা যায় না—যেখানে দরজাটা ছিল, তার ভেতর দিয়ে হা-হা করছে অন্ধকার। সেই অন্ধকারে হাত ভাঙা পাথরের মূর্তিটা ছায়া হয়ে রক্ত জমা আতঙ্কের মতো দাঁড়িয়ে।

চিৎকার করে ডাকলুম, 'সুমন্তদা!'

গমগম করে উঠল চারদিক। কিন্তু কোনো সাড়া এল না।

আবার ডাকলুম, 'সুমন্তদা!'

নিজের গলার স্বরটাই এমন বিকৃত, এমন অচেনা ঠেকল যে আমি চমকে উঠলুম। না—কোনো সাড়া নেই কোথাও।

বাইরে থেকে অন্ধকার মন্দিরের সবটা দেখতে পাচ্ছি না তো। হয়তো এক কোণায় বসে আছে কোথাও—হয়তো—হয়তো আর কারো ডাকে সে সাড়া দেবে না।

কিন্তু সুমন্তদাকে আমার ফিরিয়ে নিয়ে যেতেই হবে। তার নামে এত বড় কুৎসা—এমন জঘন্য মিথ্যা আমি সইতে পারব না। জীবনকে তখনো আমি কিছুই জানি না, কিন্তু সেই বয়েস তো আমার এসেছে যখন সব অজানা বিস্ময় অচেনা রহস্যের ওপর প্রথম আলো পড়তে শুরু করে—যখন সব কিছুর ওপর একটা অস্পষ্ট বোধের ছায়া পড়তে শুরু করে। তা ছাড়া স্কুলের বন্ধুরা—যাদের ভেতর সম্পন্ন চাষী-গৃহস্থের দু-একটি বিবাহিত বয়স্ক ছেলেও ছিল, তাদের হাসি-ঠাট্টা, কথার ইঙ্গিত, নর নারীর নিভৃত জীবন সম্পর্কে টুকরো টুকরো মন্তব্য—তখনো আমার কাছে রূপকথা হয়েও একেবারে অবোধ্য ছিল না। সুমন্তদার কল্যাণীদিকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার কী অর্থ হতে পারে—

'সুমন্তদা!'

সাড়া এল না, কিন্তু আমি দেখতে পেলুম। অন্ধকারে তাকাতে তাকাতে অল্প বয়সের দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে এসেছিল অনেকখানি, ঠিক মনে হল, ভাঙা প্রতিমার একটা হাতের পাশ দিয়ে কী যেন পেছনে

সেদিনের আত্রাইয়ের জল এই সমুদ্রেও এসে মিশেছে—নিরন্তর এই নীলের মধ্যেও কোথাও সব হারানো দিনগুলো মিশে আছে আমার।

সরে গেল, তাকে নড়তে দেখলুম-যেন নিশ্বাসের শব্দও কানে এল।

লুকিয়ে আছে—প্রতিমার পেছনে লুকিয়ে আছে।

সিঁড়ি ছিল না, এক লাফে উঠে পড়লুম মন্দিরের চাতালে। ঢুকে পড়লুম মন্দিরের মধ্যে। ডাকলুম, 'সুমন্তদা, বেরিয়ে আসুন, আমি মন্টু, দারুণ দরকার—বেরিয়ে আসুন, আমি আপনাকে দেখতে—'

তখন বেরিয়ে এল সে। না—সুমন্তদা নয়।

প্রতিমার কাঁধের ওপর দিয়ে সে মুখ বার করল। তারপর দেখলুম, চিকচিক করে জ্বলছে তার চোখ, ফোঁস ফোঁস করে একটা নিশ্বাসের মতো আওয়াজ বেরুচ্ছে তার মুখ দিয়ে। আরো দেখলুম, প্রতিমার সারাটা গা জড়িয়ে পাকে পাকে বটের শিকড়ের মতো তার মোটা শরীর—সাপ। না—গোখরো নয়, তার চাইতে সে অনেক প্রকাণ্ড। অত বড় সাপ আমি কখনো দেখি নি।

কয়েক সেকেণ্ড আমি নড়তে পারলুম না—যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলুম। সাপের মুখটা প্রতিমার কাঁধ বেয়ে একেবারে মাথার ওপর উঠল, তারপর সেখান থেকে দুটো জ্বলজ্বলে স্থির চোখে চেয়ে রইল আমার দিকে।

চিৎকার করে আমি পেছন দিকে লাফ দিলুম, ভাঙা দরজা, ভাঙা চাতাল পেরিয়ে এলুম, আর এক লাফে নেমে পড়লুম নীচে। কিন্তু হাত-পা-মাথা কিছুই আর ঠিক নেই তখন—আমার মনে হল, কে যেন দুটো প্রকাণ্ড বাহুতে তুলে ধরে আছড়ে ফেলল মস্ত একটা পাথরের ওপর।

সিদ্ধ সাধকের মন্দিরে অনধিকারী ঢুকতে পারে না।

একবার আত্রাইয়ে ডুবতে গিয়ে। একবার প্রবোধ মণ্ডলের সেই মৃত্যুশয্যায়। আর একবার পাঠক দেউলের জঙ্গলে। এই তিনবার আমি জ্ঞান হারালুম। কিন্তু এবারে আর সুমন্তদা ছিল না।

* * *

কিন্তু এখন বুঝেছি সাপটা দাঁড়াশ। ওদের আকারটাই ভয়ঙ্কর—মানুষকে ওরা কামড়ায় না। আর আমাকে সেই সকালে সাইকেল নিয়ে পাঠক দেউলের জঙ্গলে ঢুকতে দেখে দূর থেকে আশ্চর্য হয়েছিল সেই লোকটি—যে সকালেই বেরিয়েছিল কাস্তে নিয়ে, যে জোলো ঘাস কেটে কেটে আমাদের ঘোড়া দুটোকে জোগান দিতে যায়।

তা নইলে আজ ত্রিশ বছরেরও পরে আমার সঙ্গে এস কে ঘোষমের আর দেখা হত না।

সামনে সমুদ্রের জলে রোদের রঙ নরম হয়ে এসেছে। লনের ইউক্যালিপ্‌টাসে হাওয়ার শব্দ, তাল-নারকেলের মর্মর, একটানা সমুদ্রের স্বর। সেদিনের আত্রাইয়ের জল এই সমুদ্রেও এসে মিশেছে—নিরন্তর এই নীলের মধ্যেও কোথাও সব হারানো দিনগুলো মিশে আছে আমার।

সুমন্ত ঘোষ—এস কে ঘোষম্। ওয়াচ মেকার্স অ্যাণ্ড রিপেয়ারারস। কিন্তু স্বামীজীর বাণী, কথামৃত, গীতা। মুকুন্দদাসের গান: 'তুই না জাগিলে শ্যামা, কেহ জাগিবে না।' যে ডাকের জন্যে ঘর ছেড়েছিলেন, যার জন্যে অপেক্ষা করে বসেছিলেন সেই ডাক?

কে বলতে পারে—কোন্ ডাক কার কাছে কখন এসে পৌঁছোয়। এই সমুদ্রের জলই তো আর একটু এগিয়ে গিয়ে আছড়ে পড়েছে বিবেকানন্দ শিলায়। সবাইকেই সন্ন্যাসী হতে হবে, কী মানে আছে তার? সেবা ধর্ম তো কেবল সংসার-ত্যাগীরই একচেটে নয়। 'জীবে প্রেম করে যেই জন।' 'দে অলসো সার্ভ হু অনলি স্ট্যাণ্ড্ অ্যাণ্ড ওয়েট।'

কিন্তু কল্যাণীদি?

আজ সন্ধ্যায়—কিংবা কাল সকালে ঘড়িটা আনতে যাব যখন, তখন কি সে কথা আমি জিজ্ঞেস করতে পারি এস কে ঘোষম্‌কে? পারি কি? প্রশ্ন করতে পারি কি, এই সমুদ্রে কি কল্যাণীদিরও মুক্তি ঘটেছে?

সমুদ্রের একটানা মৃদঙ্গ বাজছে: 'তা থৈয়া তা থৈয়া নাচে ভোলা।' জীবন-মৃত্যুর সব বিস্ময়ের উত্তর আছে সেখানে, সব কথা লুকিয়ে আছে তার ভেতরে। কিন্তু সে রহস্য বোঝা যায় না, একটা কথাও বোঝা যায় না তার।

একটা মোটর সাইকেলের আওয়াজ এগিয়ে আসছে নীলম্ রোড দিয়ে। পিসেমশাই ফিরে আসছেন অফিস থেকে।

॥ শেষ ॥

বিপথ গমন

রবীন্দ্র গুহ

আমার বাবা রোজ ভোরে গ্রামের পথে পথে প্রভাতী সঙ্গীত গেয়ে বেড়াত। একদিন ভুলো মনে গান গাইতে গাইতে পাহাড়ের দিকে গিয়েছিল, আর ফিরে আসে নি।

আমার ছোট ছোট দু ভাই খেলার ছলে ঘুরতে ঘুরতে অরণ্যের দিকে গিয়েছিল, আর ফিরে আসে নি।

এখন সংসারে আমি আর আমার মা।

আমার মার ভাগ্য মন্দ। গত বর্ষায় মাঠে কাজ করতে গিয়ে সে তার দুটি চোখ হারিয়েছে। এখন আর কিছু করা তার সাধ্যের বাইরে। শুধু হাত দুখানা বুকের ওপর রেখে উদাসভাবে ঘরের দাওয়ার ওপর বসে থাকে। এবং মুহূর্তকালের জন্য আমি আড়ালে গেলে তার প্রাণপাখি কেঁপে ওঠে। অতিশয় ভীত এবং ত্রাস্ত কণ্ঠে চীৎকার করতে থাকে—সোনা সোনা, কোথায় গেলি বাপ—

সন্তর্পণে কোনক্রমে উঠে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে, কাত হয়ে, হাত বাড়ায়। তার পায়ের গতি অসম্ভব অস্থির, সেই হেতু এলোমেলো। কণ্ঠস্বরে ক্রমশ ভয়াবহতা। সে মরিয়া হয়ে চীৎকার করতে থাকে—সোনা সোনা, কোথায় গেলি বাপ—

আমি তাই কোথাও যাই না। এক নিমেষের জন্যও মার নিকটছাড়া হই না। সারাক্ষণ তার পাশে বসে বসে গল্প করি। শরীরের লোলচর্মে হাত বুলিয়ে দি, জটিল রুক্ষ কেশরাশি এলোমেলো করে আবার সযত্নে গুছিয়ে দি। মা হাঁটুতে থুতনি রেখে কখনো ঝিমোয়, কখনো বা গুন গুন করে কথা বলে, অবিরাম কথা বলে যায়। আমার বাবার কথা, সেই হারিয়ে যাওয়া ছোট ছোট ভাই দুটির কথা, এবং কাঁদে, অঝোরে তার চক্ষু থেকে অশ্রু ঝরে।

এইভাবে দিন কাটে, রাত কাটে, মার কোলে মাথা রেখে আমি ঘুমোই। সন্তবণ-বিলাসী চাঁদ মেঘের আড়ালে হাসে, দোল খায় আবার নিপট গম্ভীর হয়ে যায়। আমরা দূর প্রান্তরের দিকে, অবশ্য পাহাড়ের দিকে—যেখানে, গান গাইতে গাইতে আমার বাবা এবং খেলার ছলে ঘুরতে ঘুরতে ছোট দুই ভাই চলে গিয়েছিল, কিন্তু আর ফিরে আসে নি, সেদিকে তাকিয়ে থাকি। জ্যোৎস্না লাট খেতে দেখি, অন্ধকার ঘন হতে দেখি—রিমঝিম উত্তেজনা জাগে বুকে।

এইরকম একটা রাতে, যখন রজনী গভীর ঘুমে সুপ্ত, আকাশময় স্তব্ধতা, তার মধ্যে, অজস্র তারার ধ্বনন, হঠাৎ বিশ্বচরাচর চমকে দিয়ে ভয়ঙ্কর শব্দে চীৎকার করে উঠল মা—সোনা সোনা, শীগগির ওঠ বাপ—

আমি ভীত হতভম্ব। বিদ্যুৎবেগে লাফিয়ে উঠে মাকে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিলাম।

ত্বরিতে মা আমার হাত সরিয়ে দিয়ে বলল—সোনা, তোর বাপ তোকে ডাকছিল, ওই—ওই যে পাহাড়ের যেখানে সবচেয়ে উঁচু দিকটা, সেখানে দাঁড়িয়ে কথা কইছিল—

মার সারা শরীর কাঁপছিল, কণ্ঠস্বর কাঁপছিল, চোখেমুখে ছিল আগুন-গরম ভয়াবহতা।

আমি ত্রাসিত শঙ্কিত কণ্ঠে বললাম—তুমি কি বলছ মা, ওই পাহাড়ে—মানে—

মা যুগপৎ ক্রুদ্ধ এবং উত্তেজিত।

সে বলল—আমি ঠিক শুনেছি সোনা, অবিকল তার গলা। সদর্পে তিনি বলছিল জানিস, আমি বেঁচে আছি, আমি বেঁচে আছি—

মা অধীর, অতি মাত্রায় অসহিষ্ণু। আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে দিতে বলল—যা সোনা, তুই এগিয়ে যা, তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আয়—

কিন্তু মা—আমি আমার ঘুম জড়ান চোখ দুটি সজাগ করে নিতে নিতে বললাম।

মা বিরক্ত হল—আঃ, দেরী করিস নে। ওই ভয়ঙ্কর বনের মধ্যে সে একা, কতদিন থেকে একা একা—উঃ—

ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠার মত একটা দম-আটকা শব্দ মার কণ্ঠনালী থেকে লাফিয়ে উঠল।

সে শুষ্ক জড়িত কণ্ঠে বলল—দেরী করিস না, দৌড়ে যা, দৌড়ে যা সোনা—

এরপর আর তর্ক চলে না। ইতাকার বাক্যে বুকের মধ্যে ঝড় নামল। আমি ঘরের দাওয়া থেকে তিন লাফে উঠোনে নামলাম, তারপর ক্ষণমুহূর্তের জন্য ঊর্ধ্বাকাশের পানে তাকিয়ে ভুবণকালী মাঠের দিকে দৌড় দিলাম। অন্ধকার শরীরময় ঝিলিপ ঝিলিপ লাট খেল। ঘাষ-বিচালি, শামুকের কুচির দানা বিমর্দিত হল পায়ের তলায়।

মাঠের পর অরণ্য। অরণ্যময় নিবিড় অন্ধকার। কোনদিকে বিন্দুমাত্র সাড়াশব্দ নেই। সর্বত্র জুড়ে শুধু এক আশ্চর্য অমোঘ স্তব্ধতা। এই সময় হঠাৎ আমার মনে পড়ল বাবার দেওয়া সেই বিচিত্র তাবিজটার কথা, যা সর্বদা আমার কোমরের সঙ্গে গাঁথা থাকে। যখন আমার মাসতিনেক বয়স, বাবা তখন কোত্থেকে যেন সংগ্রহ করে আনেন জিনিসটা। কিছুই না, তামার পাত দিয়ে মোড়া খেজুরের বিচির মতন একটা জিনিস। বড় হয়ে মার কাছে শুনেছি, এই তাবিজটা যতদিন আমার দেহ ছুঁয়ে থাকবে, ততদিন কোন বিপদ ঘটবে না, অমঙ্গল হবে না। আমি তাই, এই মুহূর্তে ত্বরিতে কোমরে হাত রাখলাম, প্রচণ্ড আবেগে চেপে ধরলাম, মাতৃময় জিনিসটা আমায় সত্যিই ভরসা দিল খুব।

পথ নেই, পা ফেলতে কষ্ট হচ্ছিল। সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত, রক্ত এবং ঘাম ঝরছে যুগপৎ। প্রচণ্ড তৃষ্ণা পেয়েছে। এখানে দাঁড়িয়ে কিছুই অনুমান করা যাচ্ছে না, পাহাড় এখনো কতদূর। আমার শরীর কাঁপছিল, কোমর নুয়ে আসছিল যন্ত্রণার প্রবল পীড়নে। তবু, প্রায় হাতড়াতে হাতড়াতে আমি দৌড়োচ্ছিলাম। যতই কষ্ট হোক আমাকে থামলে চলবে না, মা একা একা রাত জেগে বসে আছে। বাবাকে নিয়ে ফিরব আমি। কতদিন বাদে বাবা ঘরে ফিরবে, প্রায় দুই যুগ। তারা পরস্পর পরস্পরকে কাছে পাবে, দুঃখ-সুখের কথা হবে।

আমার বাবা গান গাইতে গাইতে পাহাড়ের দিকে গিয়েছিল, আর ফিরে আসে নি।

আমার ছোট ছোট দুই ভাই ঘুরতে ঘুরতে অরণ্যের দিকে এসেছিল, আর ফেরে নি।

আজ বাবাকে খুঁজতে আমি এসেছি।

বাবাকে পাবো কিনা জানি না। আমার ছোট ছোট ভাইরাও আর ফিরবে কিনা জানি না।

আমার মার ভাগ্য মন্দ। গত বর্ষায় মাঠে কাজ করতে গিয়ে সে তার দুটি চোখ হারিয়েছে।

সুতরাং, বাবা ফিরলেও মা তাকে দেখতে পাবে না। মা বাবাকে দেখতে না পেলেও চিনতে পারবে, কেন না, বাবার কণ্ঠস্বর মার খুব পরিচিত, বাবার পায়ের শব্দ, হাতের স্পর্শ, কিছুই সে ভোলে নি।

কিন্তু আমি কিভাবে চিনব বাবাকে? আমি দেখেছি যখন আমার বয়স মাত্র পাঁচ, এখন পঁচিশ। তখন আমি নিশির ডাক চিনতাম না, সুখ দুঃখ কি বুঝতাম না। এখন চিনি, বুঝি।

ঠিক এই মুহূর্তে কোন মানুষ যদি আমার সামনে এসে দাঁড়ায়, আমি কি করব, সরলচিত্তে তাকে শুধোব কি—তুমি কে? আমার বাবাকে দেখেছ এদিকে?

আমি তাকে খুঁজতে বেরিয়েছি। আমার মা তার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে আমি অরণ্যের আরো গভীরে এগোলাম। এখন আমার আর ভয় করছে না। এখন আমি মাঝে মাঝে মাথার ওপর বিচ্ছিন্ন আকাশ দেখতে পাচ্ছি, অসংখ্য তারকামালা, সপ্তরথবিলাসী চাঁদ। বনচর জন্তুরা আমার পাশ দিয়ে শাঁই শাঁই ছুটে পালাচ্ছে। ওরা ভীত, ত্রাসিত। কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি না। আমি এখন বনচর প্রাণীদের মতই সরলচিত্ত, নির্ভীক।

এমন সময় একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। একটু দূরে হুদতট থেকে একটি গানের আওয়াজ ভেসে এলো। এমন নিস্তব্ধ রজনীতে কে গান গাইছে?

আমি ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে গিয়ে একটি ঝোপের আড়ালে দাঁড়ালাম। একটা তুঙ্গ প্রস্তরের ওপর বসেছিল সে। শীর্ণ শরীর, দীর্ঘায়িত এবং কোমলতা শূন্য। গুচ্ছ গুচ্ছ শ্বেত-কৃষ্ণ কেশরাশি কপোলে ও গণ্ডে লম্বিত।

সম্ভবত সে আমার পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিল। তাই চকিতে এপাশ-ওপাশ তাকাল। তারপর দ্রুত অসহিষ্ণু পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে সোজা চলে এলো আমার দিকে।

কোন ভূমিকা না করে সরাসরি সে বলল—আমি জানতাম কেউ আসবে, ঈশ্বরের অসীম কৃপা—

আমি প্রতিবাদ করে বললাম—না, ঈশ্বরের কোন হাত নেই এতে। আমি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি—

সে বলল—চলার পথে সবাই একটা উদ্দেশ্য নিয়ে চলে এবং তাতে থাকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ। তোমার কথা শুনব সব, এখন তুমি ক্লান্ত, আপাতত চলো আমার সঙ্গে।

—না আমি ক্লান্ত নই। আমার অনেক কাজ, এখুনি ফিরে যেতে হবে।

বৃদ্ধ হাসল। অমন সুন্দর মুখে সে হাসি বড় কুটিল মনে হল। এত্তাবৎ আপনকার মুখে সযত্নে রক্ষিত অমলতা নিমেষে পরিবর্তিত হল।

সে বলল—এখানে যে আসে সে আর ফিরে যায় না। বিলম্ব করো না, আমার হাতে সময় নেই।

সে মুখ ফিরিয়ে চলতে থাকল। আমার এখন কি করা শোভনীয় তা বুঝতে পারলাম না। একবার অরণ্যের দিকে, অন্যবার সেই বিচিত্র মানুষটির দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে তাকেই অনুসরণ করলাম।

কয়েক পা এগোতেই পুনরায় ঘন অরণ্য। চতুর্দিক গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। নিশা বায়ুবেগে বৃক্ষলতাদি দুলছে অবিরাম। শাঁ শাঁ শব্দ হচ্ছে।

এইভাবে গভীরতর অন্ধকারের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে অসম্ভব কাতর বোধ করছিলাম আমি। বুকের মধ্যে ভয়ংকর ত্রাস। সারা শরীর ছিন্ন ভিন্ন, অনুভবে বুঝতে পারছি, রক্ত ঝরছে, যন্ত্রণা হচ্ছে।

অথচ সেই লোকটি, একটা অশরীরী ছায়ার মতন লম্বা লম্বা পা ফেলে অবলীলাক্রমে এগিয়ে চলেছে। এবং আমি তাকে মোহাচ্ছন্নের মত অনুসরণ করে চলেছি।

এইভাবে হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়ের সমতলে চলে এলাম আমরা। এখানে অটবী অনেক পরিচ্ছন্ন। অস্তমুখী মেঘের আড়ালে চাঁদ।

বৃদ্ধ আমাকে নিয়ে নিকটবর্তী একটি গুহার মধ্যে প্রবেশ করল। সামান্য এগোতেই পুনরায় অন্ধকারময় পথ, পরস্পরের মুখ দেখা যায় না। এখানে বৃক্ষলতাদির একটানা শন শন শব্দ নেই, জীবজন্তুর শব্দ নেই, সমস্ত জগত যেন মৃত, গভীর ঘুমে সুপ্ত।

সে বলল,—প্রভাতের অধিক বিলম্ব নেই, এবার বিশ্রাম কর।

বৃদ্ধ একটি প্রদীপ জ্বালাল। সেই আলোতে ভিতরের সকল জিনিস পরিষ্কার হল। আসবাব যৎসামান্য, বনবাসী মানুষের জন্য নিতান্তই যা প্রয়োজন, তাই।

আমি মাটিতে বসতে বসতে কাত হলাম। সমস্ত শরীর অবসন্ন, ক্লান্ত, বিধ্বস্ত।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুম এসে গেল।

ঘুমের মধ্যে আমি একটি নরম সুখদায়ক স্বপ্ন দেখলাম। আমার বাবা আমার মার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে। ঠিক যেমন, ঘরের দাওয়ায় বসে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে আমি মার কোলে মুখ গুঁজে আরামে ঘুমোই।

বাবা অতিশয় আহ্লাদিত। মার কোলের মধ্যে সুখে শৃঙ্খলিত শরীরটা বারংবার মুড়ে ফেলার প্রয়াস করছিল।

আমি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করলাম, মার মুখমণ্ডল বিশেষরূপে নিপট খুশি ছিল। আলু-থালু অঞ্চল প্রান্ত নিয়ে রাণীর মত বসে ছিল সে; চক্ষে অপ্রমেয় সুখলহরী, হৃদয় অতিশয় তুষ্ট এবং শরীর পুলকিত।

সে শরতের মোহমুক্ত সজল গীতটি গুণগুণ করে গাইছিল, কেন না, এই গীতটি বাবার খুব পছন্দ।

সহসা অসম্ভবভাবে ঘুম ভেঙ্গে গেল। ত্বরিতবেগে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে দেয়ালে আঘাত পেলাম। এবং অনুভব করলাম, আমি

অসুস্থ, তদুপরি আমার হাত-পা শক্ত করে বাঁধা।

গুহার ভিতর তখনো আলো ছিল না। তবে, বাইরে তখন দিন, তা বুঝতে পারলাম। অজস্র শব্দ ভেসে আসছে, ক্ষীণ, উচ্চ, উচ্চতর।

এক এক করে গত রাতের কথা মনে পড়ল। মার ব্যাকুলতা, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠার মত একটা দম-আটকা চিৎকার—দৌড়ে যা, দৌড়ে যা সোনা—

তারপর অরণ্য মধ্যে সেই বৃদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ভৌতিক কথাবার্তা। মানুষটা কি চায় আমার কাছে?

বাইরে ক্রমশ ভীত ভয়াবহ আওয়াজ। একটি মৃত্যুমুখী জন্তুর শেষ আর্তনাদ ভেসে এলো। মুহূর্তে স্থানটি বীভৎস হয়ে উঠল আমার কাছে, চকিতে এদিক-ওদিক চক্ষু ফেরালাম, চতুর্দিকে মৃত্যুতিক্ত অন্ধকার।

বৃদ্ধ এলো একটু পরেই। মাটির ওপর দিয়ে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে টেনে নিয়ে এলো একটি বিগতপ্রাণ হরিণ। মুখখানা সম্পূর্ণ থেতলানো, পাঁজর ভাঙা, বোঝা গেল বিশাল পাথরের চাঙর ছুঁড়ে হত্যা করা হয়েছে জন্তুটিকে।

আমি প্রায় অন্ধকারে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় চুপ করে বসে রইলাম। বৃদ্ধ প্রথমে আমাকে লক্ষ্যই করল না, মৃত জন্তুটিকে একপাশে ঠেলে রেখে সোজা টান এল, হয়ত বা শরীরের ক্লান্তি দূর করার জন্য লম্বা নিঃশ্বাস টানল। তারপর কোমর থেকে চকচকে ধারাল একখানি অস্ত্র বার করে হরিণের শরীরে চিড়িক্ করে ঢুকিয়ে দিল। বেশ অভিজ্ঞ হাতে টেনে টেনে খানিকটা মাংস কেটে নিল।

এইসব দেখে-শুনে সম্ভবত আমার কণ্ঠ থেকে কোন শব্দ নির্গত হয়েছিল, তাই শুনে সে চমকে উঠল, আর আশ্চর্য, এ সময় তার চোখে উচ্ছিষ্ট প্রসন্নতা ছিল, শরীরে প্রভূত আহ্লাদের ভাব।

সে পুনরায় টানটান হয়ে বলল,—ঈশ্বরের সন্তানের জন্য এ খাদ্য। তুমি কি ভয় পেয়েছ?

আমি চুপ করে রইলাম।

সে ফের বলল—জগতে মৃত প্রাণীদের কোন দুঃখ নেই, অভাব নেই, কিন্তু যারা অসহায়, ভাগ্যদোষে পরাধীন, তাদের প্রতি কিছু কর্তব্য আছে।

আমি উত্তেজিত কণ্ঠে সরাসরি বললাম—কিন্তু এই যে হরিণটি, যাকে তুমি হত্যা করেছ, সেও তো অসহায় দুর্বল প্রাণী, তার জন্য কোন বেদনা অনুভব করছ না?

সে হাসল—আমি আরো মহৎ কিছু ভাবছি, ক্ষুদ্রতর সুখ দুঃখ আমার জন্য নয়।

আমি ফের শুধালাম—তুমি যার কথা বলছিলে, সেই যে ঈশ্বরের সন্তান, সেও কি মনুষ্যপ্রাণী?

—না।

—জীবজন্তু?

—না।

—তবে কি?

—সে ভারী অলৌকিক একটি জীবন। শরীরে চন্দনের আভা, চক্ষে বিদ্যুৎ রোশনী, কণ্ঠনালীতে বিধাতার অপূর্ব—

সে বলতে বলতে থামল, নিজের খুশিতে নিজেই উল্লসিত রইল। শেষে ফের বলল—আজ থাক, সময় মত সব বলব। ঈশ্বর তোমাকে পাঠিয়েছেন, তার জন্য উৎসর্গীকৃত তোমার প্রাণ—

আমি আঁৎকে উঠলাম—আমার প্রাণ?

সে বেশ স্পষ্ট ও স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল—হ্যাঁ, একটি অলৌকিক জীবনের জন্য তোমার জীবন।

তারপর আর দাঁড়াল না। একতাল মাংস-পিণ্ড নিয়ে হন্ হন্ করে বাইরে বেরিয়ে গেল।

আমি তখন অন্ধকারে জবুথবু। ত্রাসিত বুক, ওষ্ঠাধর রক্তহীন।

বৃদ্ধের শেষ কথাগুলি বার বার মনে পড়ছিল—একটি অলৌকিক জীবনের জন্য তোমার জীবন—মানে কী?

তবে কি আমাকে এখানে নিয়ে আসার পিছনে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আছে?

কথাটা মনে হতেই নিমেষে আমার শরীরের রক্ত হিম হয়ে এলো। বুকে যেমত বা অতর্কিত অস্ত্রের আঘাত। ওই হরিণটির মতই আমার শরীরে চকচকে ধারাল অস্ত্র চিড়িক্ করে ঢুকিয়ে দেবে, তখন দারুণ যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠবে বুক। আমি মরে যাবো।

আমি মরে যাবো, আমার মা আর আমায় দেখতে পাবে না। অথচ কত অপেক্ষা করে সে বসে আছে।

আমি ঠিক সময়মত ফিরতে পারলাম না বলে মা কি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে? মার মুখখানা বেশ স্পষ্ট চোখের ওপর ভেসে উঠল, তার লোলচর্ম, দৃষ্টিহীন চক্ষুদ্বয়—ভীত ত্রাসিত। মাঝে মাঝেই সে মরিয়া হয়ে চীৎকার করছে—সোনা সোনা, কোথায় গেলি বাপ?

রাত হল, অন্ধকার ঘনতর হল গুহার মধ্যে। গভীর আচ্ছন্নতার ভিতর ডুবে যেতে যেতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন বৃদ্ধ যথারীতি হরিণের শরীর থেকে আরো কিছু অংশ কেটে নিয়ে হন্-হনিয়ে গুহা থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

আমার মাথার মধ্যে রাশি রাশি চিন্তা পুনরায় বাঘের থাবার মত দুলে উঠল। যে কোনো ভাবে সম্ভব এ নরক থেকে পালাবার কথা ভাবছিলাম আমি। এবং সত্যি সত্যি এক সময় গড়িয়ে গড়িয়ে গুহামুখের দিকে এগুতে থাকলাম, যেহেতু হাত-পা বেদমভাবে রুদ্ধবন্ধ ছিল, ভয়ঙ্কর অন্ধকার ছিল সর্বত্র, আহত জন্তুর মত বুকে মাটি টেনে টেনে এগোতে লাগলাম, এ জন্য শরীরের মাংস অংশ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। জ্বালা করছিল। তবু, এত কষ্ট সত্ত্বেও, আমি যখন গুহা-মুখের প্রায় কাছাকাছি, তখন একটি ছোট্ট স্মিতহাস্যের শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। বুকের সমস্ত আশা মুহূর্তে নির্বাপিত হল।

সামনেই ভয়ংকর চোখে বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে।

এইভাবে কত সকাল, সন্ধ্যা, বিকেল গত হল। মৃত পচা হরিণের পাশে শুয়ে সময় কাটতে লাগল। আমার মৃত্যুর পর, এইভাবে একটু একটু করে আমার শরীর থেকেও মাংস কেটে নিয়ে যাওয়ার পর ক্রমশ বাকী অংশ পচে উঠবে, দুর্গন্ধ ছড়াবে। তখন হয়ত আবার অন্য কেউ আসবে—একটা বন্য জন্তু, কিংবা একটা মানুষও হতে পারে।

যাই হোক, একদিন, তখন আমি প্রায় মৃত অবস্থায়, বৃদ্ধ গুহার ভিতর এসে আমাকে টেনে তুলল। অসম্ভব একটানা চোখের চাহনি, মণি দুটো একীভূত হয়ে জ্বলছিল। মুখখানা সাঁসার মত, দৃঢ় ও কঠিন।

সে বললে—ঈশ্বর আজ কৃপা করেছেন, এসো, দেখবে প্রাণী মাত্রেই ঈশ্বরের কিছু মানে আছে।

আমি কাতর কণ্ঠে শুধালাম—আমাকে কি তুমি হত্যা করবে?

এ প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই তার দেহ টান-টান হল, আমার চোখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিল। বুঝলাম, সে বিব্রত, চঞ্চল হয়ে পড়েছে। বুঝিবা কিছু ভাবছে, কিন্তু এসব খুব অল্পক্ষণের জন্য। মুহূর্তকালের জন্য সে নিজেকে সামলে নিল। পুনরায় আমার দিকে ঝুঁকতে ঝুঁকতে বলল—হত্যা বলে কোন কথা নেই, ঈশ্বরের বিধান অনুসারে মৃত্যু সাধিত হয়—

আমি হাঁপাচ্ছিলাম, টানা হ্যাঁচড়া করার জন্য শরীরটা কাঁপছিল, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা, ম্লান। একটা পাথরের ওপর ভর রাখতে গিয়ে সেটা গড়িয়ে পড়ল, শব্দ হল প্রচণ্ড-বেগে যেন বা গুলির আওয়াজ। কাত হতে হতে উভয়ে গুহার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলাম। হাতে-পায়ে তখনো বাঁধন ছিল, কোমরের নিচে অসম্ভব জ্বলন ছিল। চলতে গিয়ে দুই উরুতে ঘষা লাগছিল, এবং সেজন্য কষ্ট হচ্ছিল। ইচ্ছা হল, পথের ওপর গড়িয়ে পড়ি। ক্রমে হলও তাই, আমি প্রায় মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চললাম। এ জন্য পথের কাঁটা এবং পাথরের কুচিতে শরীরের চামড়া ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাচ্ছিল, নিচের দিকে তাকিয়ে রক্ত দেখলাম আমি।

আমরা যতই পাহাড়ের চূড়ার দিকে এগোচ্ছিলাম তৃণ এবং বৃক্ষলতাদির চিহ্ন মুছে যাচ্ছিল, চতুর্দিকে কঠিন পাথর আর

পাথর। লালচে-কালচে দাগ, কোথাও বা ভেজা নরম শ্যাওলা, তার ওপর স্বল্পায়ু তৃণ।

সে আমাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে এলো, যেখান থেকে দূর সমতলের বহুকিছু বেশ স্পষ্ট চোখে পড়ে। অরণ্য, সরোবর, ধূলোমাখ প্রাচীন সুদূরের পথ, কিছু কিছু ঘরবাড়ি, ওরই কোথাও আমাদের গ্রাম, ছোট্ট জীর্ণ কুড়েঘরে, মা হয়ত দাওয়ার ওপর বসে।

সে ভাবছে প্রতিমুহূর্তে এবার তার সোনা ফিরবে। সোনা সোনা, কোথায় গেলি বাপ—

এমন সময় দারুণ বিকট একটা আওয়াজ, চমকে পায়ের দিকে তাকাতেই সমস্ত শরীর শির শির করে উঠল। সম্মুখে বিশাল এক গহ্বর, ছায়া-ছায়া অন্ধকার, তার মধ্যে ভয়ংকর দর্শন একটি জীব, কুমিরের মত লম্বা শরীর, ছোট ছোট পা, কখনো বুকের মধ্যে গুটিয়ে নিচ্ছে, কখনো প্রকাশ করছে।

অভুক্ত ও বুভুক্ষু জানোয়ারের মত শরীরে পাক দিচ্ছিল আর আর্তনাদ করছিল, যখন হাঁ করছিল, আলজিভ জ্বলছিল, যেন অবিকল একখণ্ড হীরককুচি। তার আলোয় ঝিলিক দিচ্ছিল চতুর্দিক।

বৃদ্ধ আমার কোমরে একটা লম্বা দাড় বাঁধতে বাঁধতে বলল—ওইখানে, ওই গহ্বরের মধ্যে নেমে যেত হবে তোমাকে—

আমি আঁৎকে উঠলাম—ওই জানোয়ারটার সামনে?

সে বলল—হ্যাঁ, ওর ওই আলজিভের কাছে যে জিনিসটা দেখছ, ওটা বিধাতার চোখ, সারা দুনিয়ার মানুষের প্রাণের খোঁজ আছে ওতে, ওটা তোমাকে তুলে আনতে হবে। ভয় পেও না, ঈশ্বর তোমার সহায় আছেন—

আমি করুণ কণ্ঠে চিৎকার করে বললাম—না না, আমি তা পারব না, আমায় ক্ষমা কর, আমায় ছেড়ে দাও ঠাকুর—

বলতে বলতে ভয়ংকর ত্রাসে, শঙ্কায়, জড়তায় আমার সারা দেহ বিমর্দিত হতে থাকল।

কিন্তু বৃদ্ধ নির্বিকার। সব ব্যবস্থা শেষ করে গহ্বরের একেবারে মুখের কাছে টেনে আনল আমায়। আমি প্রাণপণ শক্তিতে আত্মরক্ষার জন্য যত্নবান হলাম। কিন্তু বৃদ্ধ আমার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। সে এমন এক বিচিত্র কায়দায় আমাকে আঘাত করল, আমি টাল সামলাতে না পেরে উল্টে পড়লাম। কোনক্রমে একটা পাথরের কিনারা ধরে ঝুলতে ঝুলতে, উপরের দিকে তাকাতেই সহসা মনে পড়ল একদা বাবার দেওয়া সেই বিচিত্র তাবিজটার কথা, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা হাত নামিয়ে নিয়ে কোমরের কাছে রাখলাম। তাই দেখে বৃদ্ধের মনে সন্দেহ জাগল, ত্বরিতে সে ঝুঁকে পড়ে আমার মুঠো করা হাতটা খামচে ধরে মরণপণ ঝাঁকি দিল, কিনার থেকে জর্জরিত হাতটা খসে যেতেই আমি দ্রুত খাদের মধ্যে নেমে গেলাম, এবং আমার কোমর থেকে সেই অলৌকিক তাবিজটা ছিঁড়ে বৃদ্ধের হাতে চলে গেল।

এখন আমি সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখোমুখি, শরীরে বিন্দুবৎ শক্তি নেই, দেহ ছুঁয়ে বাবার দেওয়া সেই বিচিত্র তাবিজ নেই।

খাদের মধ্যে সর্বত্র ভয়ঙ্কর দুঃসহ গলিত ঘৃণ্য কদর্য গন্ধ। শরীরে পাক দিয়ে দিয়ে দারুণ উত্তপ্ত চোখে জানোয়ারটা এগোচ্ছিল আমার দিকে। তীক্ষ্ণ মর্মভেদী শব্দ করে শেষবারের মত আকাশের দিকে মুখ তুলতেই দেখলাম—আমার চাইতেও অধিকতর ত্রাসিত কম্পিত চোখে বৃদ্ধ সেই অলৌকিক তাবিজটার দিকে তাকিয়ে আছে।

উৎসবে ঋতু শুরু হল

নীল আকাশ আর সোনা-সোনা রোদে দূরের হাতছানি। ক্লান্ত দিনগুলির স্মৃতিকে পেছনে ফেলে এই তো বেড়িয়ে পড়বার সময়। আর, ঘরছাড়া মানুষেরাও তো ঘরে ফেরার জন্য উদ্‌গ্রীব। তাঁদের যাত্রাপথ শুভ ও নির্বিঘ্ন হোক।

পূর্ব রেলওয়ে

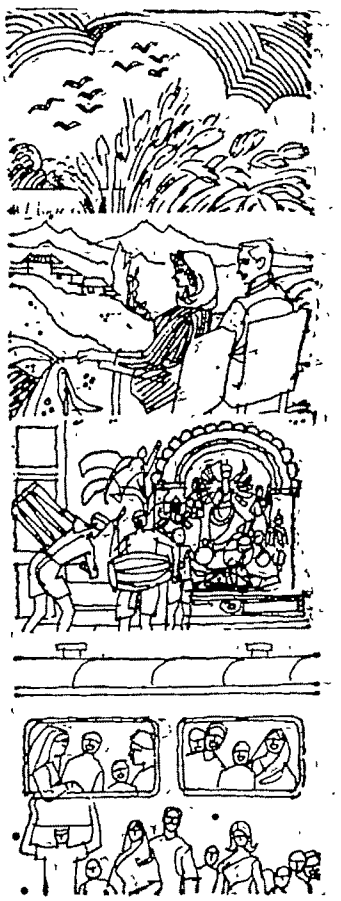

বাংলা ভাষা কোথায়

[১৮৬ পৃষ্ঠার পর]

অবশ্য, জ্ঞান-গর্ভ লেখার ও সাহিত্য সমাজের হিসাব এসব পর্যায় বিভাগে গৌণ বলে মনে করা হয়েছে, তা লক্ষ্য করা উচিত।

(৬) ষষ্ঠ পর্যায়ের ভাষার কাজ প্রাথমিক শিক্ষাতেই সীমাবদ্ধ। দৃষ্টান্ত উপরেই দিয়েছি! যথা, সাঁওতালী।

(৭) সপ্তম পর্যায়ের ভাষা আরও কম শক্তির ভাষা, হয়ত তা লেখা হয়েছে, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার নিম্নতম স্তরের বেশি তাতে এখনো শিক্ষাদান করা হয় না।

(৮) অষ্টম পর্যায়ের ভাষা আরও মজার—তাতে সাহিত্য আছে, সম্ভবতঃ এক-আধটুকু জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাও চলে, গল্প (উপন্যাস?) লেখাও হয়, কিন্তু বিদ্যালয়ে শিক্ষার তা মধ্যম নয়। এমন ভাষা ভারতেও আছে—সকলের কথা জানি না—কিন্তু নেওয়ারী, এরূপ ভাষা, ভোজপুরী ও লোকগীত ও লোকগাথায় সুসম্পন্ন। অথচ স্কুলে তাদের স্বীকৃত নেই। হয়ত উপভাষা নামে উপেক্ষিত।

এখানেই প্রশ্ন উঠবে 'ভাষা' আর 'উপভাষার' তফাৎ কি? মনে রাখতে পারি—এটি ভাষাবিজ্ঞানের প্রশ্ন। ভাষাতত্ত্বে এখনো তর্কাতীত মীমাংসা তার হয় নি। বাঙলা ভাষার বর্তমান জিজ্ঞাসায় এটি জরুরী প্রশ্নও নয়। আমাদের ভাষার রূপ আমরা জানি,—কলকাতা অঞ্চলের ভাষা ভদ্রশ্রেণীর কথায়-আলোচনায় চলিত, তাই হল বাঙলা ভাষা।

আর, মোটামুটি উপভাষাগুচ্ছ এসব—রাঢ়ী, বরেন্দ্রী, বঙ্গালী, কামরূপী ঝাড়খণ্ডী। এই ৫টি; এসবেরও নানা স্থানীয় বিভাগ আছে। কিন্তু পশ্চিম বাঙলায় ও পূর্ব পাকিস্তানে একই ভাষা সমভাবে স্বীকৃত ও অনুশীলিত। কাজেই উপভাষার আলোচনা বাঙলার পক্ষে ভাষাতত্ত্বের বিষয়-মাত্র।

এই আট পর্যায়ের পরেও নিশ্চয় আরও পর্যায় থাকে। এমন ভাষা ভারতের পূর্বাঞ্চলে, হিমালয় অঞ্চলে ও মধ্য-ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে, দক্ষিণ ভারতেও আছে, যা নানা আদিবাসী জাতির ভাষা, যার লিপিও নেই। সে সব ভাষার ভবিষ্যৎ কী বলা কঠিন। সম্ভবতঃ তাদের কোনো বড় বিকাশ ঘটবে না। কারণ অনেক স্থানেই তা বিচ্ছিন্ন ও অনুন্নত নানা আদিবাসীর বা কৌমের ভাষা, যতই সভ্যতা বিস্তৃত হবে, তাদের বিচ্ছিন্নতা দূর হবে, এরা নিকটস্থ প্রধান-প্রধান মনুষ্যগোষ্ঠীর সঙ্গে আদান-প্রদানে জড়িত হবে, ততই অনেকাংশে তারা সে সব নিকটবর্তী প্রবলতর ভাষা শিখে ফেলবে এবং তা শেখাই সুবিধাজনক মনে করবে। এমন কি, সাঁওতালদের মধ্যেও তা ঘটছে। তবে তারা যথেষ্ট সংখ্যাবলিষ্ঠ জাতি, এখন নিজের ভাষার প্রতি তাদের শিক্ষিতরা মমতাশীল হচ্ছেন। সে সূত্রে আবার কেউ কেউ মনে করছেন তাঁদের একটা নতুন সাঁওতালী লিপি সৃষ্টি করতে হবে। এটা হবে তাঁদের উল্টো ভুল। কারণ, যেখানেই সাঁওতালরা থাকুন তাঁদের রাজ্যের প্রধান ভাষা শিখতে হবে—সে ভাষার লিপিতে (পঃ বঃ বাঙলায়, বিহারে, নাগরীতে), তারপরে লেখাপড়া শিখলেই ইংরেজিও পড়তে হবে দ্বিতীয় এক লিপিতে (রোমক), ঐরূপ ক্ষেত্রে সাঁওতাল ছেলেদের জন্য গোড়াতেই আরও একটা লিপির বোঝা আবার সৃষ্টি করা কেন? হয় রাজ্যভাষার লিপি, নয় রোমক লিপিতে সাঁওতালী শেখাই সুবুদ্ধির কাজ।

যাই হোক, বাঙলা ভাষা কোথায়...? এই পর্যায় বিভাগ থেকে আমরা কিন্তু সম্পূর্ণ তা বুঝতে পারি না। বুঝতে পারি—বাঙলা ভাষা কোথায় এখন? তা দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্যায়ে এখনো স্থান পাচ্ছে না। এই আলোচনা থেকে যদি কোনো কথা স্পষ্ট হয়ে থাকে তবে তা এই (১) বাঙলা রাজ্যে বাঙলা ভাষা কার্যতঃ সরকারী ভাষা না হলেই নয়। (২) বাঙলার শিক্ষা-দীক্ষায় সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষার প্রাধান্য ও অবিলম্বে প্রতিষ্ঠা করা চাই।

কিন্তু বাঙলা ভাষা দাঁড়িয়ে নেই, কোনো ভাষাই তা থাকে না। বাঙলা ভাষা কোথায় যাচ্ছে এবং যেতে পারে, তা এ ছাড়াও নির্ভর করবে (১) নানা রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবর্তনের ওপর—বিশেষ করে তার ব্যবসায়, কর্মে ব্যবহারের ওপর (২) জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থ রচনার ওপর এবং (৩) লেখকদের দায়িত্ববোধ ও সৃষ্টিশক্তির ওপর।

মিসেস কুম্ব

[১৯১ পৃষ্ঠার পর]

অস্তগামী সূর্যের আলোতে লম্বা একটা ছায়া ওঁদের সামনে পড়ল। টোবি চমকে ফিরে দেখল মিসেস কুম্ব। হয়তো রান্নার বিষয়ে কিছু বলতে এসেছিল। কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে টোবির সর্বাঙ্গে কাঁটা দিল। এ যেন অন্য একজন মিসেস কুম্ব। সরু লম্বা নাকটা ঠোঁটের উপর ঝুলে পড়েছে, গর্তে-বসা চোখ দুটো ধিক্-ধিক্ করে জ্বলছে।

মিসেস কুম্ব সাহেবের দিকে চেয়ে চাপা গলায় বলল, 'শেষ পর্যন্ত কথা ভাঙলে? বাইরের লোকের কাছে বলে দিলে তাও ক্ষমা করতে পারতাম। কিন্তু যা আমাদের বংশের গর্ব আর গৌরব, তাকে বুজরুগি বলা—'

সাহেব আর অপেক্ষা করলেন না, টোবিকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে লবেল গাছের পিছনে গা ঢাকা দিলেন। একটু পরে উঁকি মেরে টোবি দেখল সাহেবের পায়ের কাছে কুকুরটা শুয়েছিল, সে আর সেখানে নেই। মিসেস কুম্বকেও কোথাও দেখতে পেল না।

গেল তো গেল, কুকুরটার আর মিসেস কুম্বের কোনো চিহ্নই আর পাওয়া গেল না। টোবিরা যখন কলকাতায় ফিরল, সাহেবও তার কদিন বাদেই এলেন। এসেই দেশে ফেরার ব্যবস্থা করতে লেগে গেলেন। বললেন, 'যাই বল, নিজের দেশই ভালো। উইলটা কিন্তু রইল। আর কয়েক বছর বাদে তো ইংল্যাণ্ডেই তোমার সঙ্গে দেখা হবে। তুমি জীবতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করবে, এই আমার স্বপ্ন।

হয়েও ছিল তাই এবং কতদিনে জীববিজ্ঞানের ভালো ছাত্র বলে টোবির নামও হয়েছিল। সাহেবের বয়স প্রায় আশী, তবু তার কি উৎসাহ টোবিকে দেখে। পঁচাশীতে সে যখন চোখ বুজল, তখন ঐ সম্পত্তি আর টাকা টোবির হল। তাইতেই ওখানে গবেষণাগার চালানো সম্ভব হয়েছে।

তোমরা তো সব কিছুতেই কালো টাকার গন্ধ পাও—এই বলে আমাদের বন্ধু পতিতপাবন উঠে পড়ে, ছাতাটা তুলে নিল। অসীম বলল, 'কে যেন বলছিল ঐ বাড়িটা আগে স্যার ইউ পাণ্ডের ছিল, টোবির বাবা সস্তায় পেয়ে কিনেছেন।'

শ্যামরতনদা বললেন, 'যেতে দাও। গল্প কৃত্রিম হলেও, পোকামাকড়গুলো যে জীবন্ত সত্য, আমি ওখানে একবার গিয়েই টের পেয়েছি।'

পতিতপাবন ততক্ষণে অনেকটা এগিয়ে গেছে।

স্বর্ণ শিমূলের চরে

[১৮০ পৃষ্ঠার পর]

থেকে নেমে পড়ল। চন্দন বললে, 'চলো পদ্মদিদি—চলো উঠোনে।'

নীলকণ্ঠ ইতিপূর্বে ঘরের পাশে মনসা বনে রাখা তার রামচরণকে লাঠি ঠুকে ঠুকে নিয়ে আসতে লাগল উঠোনে। পদ্ম সভয়ে চিৎকার করে উঠে বললে, 'ও মা এ যে মড়ার মাথা!'

রাখালেরও বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল। কিন্তু তাহলেও সে পুরুষ ছেলে। সাহস করে দাঁড়িয়ে রইল। কোন কথা বললে না। পদ্ম চন্দনকে জড়িয়ে ধরে পিছু হেঁটে দাওয়ার দিকে সরে এলো। নবেন জলঘরের দোকানে যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়েছিল—আড়চোখে একবার রামচরণের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললে, 'তোরা ঐ কর!'

নীলকণ্ঠ বললে, 'আর দেখবি পদ্ম?'

'না না', সভয়ে বলে উঠল পদ্ম। চন্দন বললে, 'ভয় কি পদ্মদিদি—মড়ার মাথাটা তো আর জ্যান্ত নয়!'

পদ্ম বললে, 'তবে নড়ছে কি করে?'

চন্দন বললে, 'ও তো দাদা মন্তর দিয়ে নড়াচ্ছে—'

রাখাল জিজ্ঞাসা করলে, 'হ্যাঁরে নীলু—।'

নীলকণ্ঠ সগর্বে বলে উঠল, 'কেউ জানতে পারেগা নেই।'

নন্দরাণী রাঁধতে রাঁধতে ধমক দিয়ে বললে, 'রাখ তোর জানতে পারেগা নেই—যা চান করে আয় ভাইটাকে নিয়ে।' তারপর রাখাল ও পদ্মর উদ্দেশ্যে বললে, 'পদ্ম তোরা চান কদ্দিচিস্ তো?'

পদ্ম বললে, 'আমি রোজ সকালেই মায়ের সঙ্গে চান করি। দাদা করে নে।'

'তবে যা বাবা রাখাল', নন্দরাণী বললে, 'নীলু আর চন্দনের সঙ্গে তুইও চান করে আয়।'

চন্দন তো আহ্লাদে আটখানা। দাদার সঙ্গে, রাখালদাদার সঙ্গে সে আজ চান করতে যাবে! কি মজা!

মজাটা সত্যিই খুব।

স্বর্ণশিমূলের চরে পোদ্দারবাবুদের সেই ঘাটে—পাশে যেখানে তাদের নৌকো-খানা চড়ায় লাগিয়ে বাঁধা, নীলকণ্ঠরা চান করতে এল সেইখানে। মুহূর্তের মধ্যে নেশায় পেয়ে বসল তাদের। গামছা ছাড়না দিয়ে গুড়ো চিংড়ি ধরল। নৌকোর ওপরে সাজিয়ে রাখা ঝুরের বড়শিতে সেগুলোকে টোপ করে লাগালো। তারপর নৌকো করে গিয়ে মেলে এল নদীর বুকে এবং একদিক-কার শাঁশর দড়িটা নিয়ে এসে বেঁধে রাখল নৌকোবাঁধা লগিতে। বৈকালের দিকে এসে তুলবেই হবে।

চন্দন ওদের সঙ্গে নৌকোয় করে নদীর বুকে ঘুরে এল। কম আনন্দ তায়! কখনো বাবা, মা, এমন কি দাদাও তাকে নৌকো চাপতে দেয় নি। সাঁতার না শেখা পর্যন্ত তার নৌকোয় ওঠা বারণ ছিল। আজ নেহাৎই তার ভাগ্য ভাল—তাই দাদা তাকে সাঁতার না শেখা সত্ত্বেও নিয়ে গিয়ে-ছিল। জীবনে এই প্রথম সে নৌকো চাপল। আঃ নৌকোটা জলে কি সুন্দর দোলে।

এই সব কারণে চান করে ফিরতে তাদের দেরি হয়ে গেল। হয়তো এই দেরির জন্যে প্রচণ্ড বকুনি হত তাদের কিন্তু তারা সবাই বেঁচে গেল একটি লোকের জন্য। দাওয়ায় বসে গোপালকাকা।

নীলকণ্ঠ আনন্দে বলে উঠল, 'কাকা কখন এসেছো!'

'এই কতক্ষণ রে!'

নন্দরাণী বললে, 'তোর কাকা এসেই চলে যাচ্ছিল রে। ধরে রেখিচি!'

'বেশ করেচো মা,' বলে নীলকণ্ঠ গোপালের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু হঠাৎ এমন সময়ে কি মনে করে কাকা?'

'আরে বাজারে বোমবাজি খুনোখুনির পরেই আমি এসে পড়েছিলুম,' গোপাল বলতে লাগল, 'শুনলুম নরেনদা নাকি বোমায় আহত হয়েছে। ছুটে আসছিলুম তক্ষুনি কিন্তু বাজারের লোকজন সব আমাকে কিছুতেই আসতে দিলে না। তারা বললে, এই গুণ্ডামির একটা বিহিত করতে হবে। এ যে আমাদের প্রাণ নিয়ে বাস করা দায় হ'ল। তাই তাদের নিয়ে মিটিং করতে একটু দেরি হয়ে গেল। তা এসে শুনলুম নরেনদা খুব জোর বেঁচে গেছে—লাগে নি!'

'তা মিটিং করে কি হ'ল সব?'

'গেলুম দল বেঁধে থানায়!'

'তারপর?'

'তারপর আর কি পুলিশ খুব সাধু সাজলে—'

'তুমি আর কিছু করলে না?'

'করব আর কি—ওপরে একটা টেলি-গ্রাম করে জানিয়ে রাখলুম। এরপর লক্ষ্মণ বিড়িওয়ালা, নগেন দোকানী, ভবেন বয়াট, নিত্যানন্দ বিষয়ী মায় যত দোকানদার আছে সবাই মিলে সব একদিন যাওয়া হবে যুক্ত-ফ্রন্টের পুলিশমন্ত্রীর কাছে।

'হ্যাঁ, তাই যাওয়া উচিত। ব্যাটারা সব বড্ড বাড়িয়েছে।'

নরেন বললে, 'যাক কাকাকে আর বকাস নি। তোরা ভিজে কাপড় ছেড়ে শীগ্‌গির আয়—তোর কাকার পেটে ইঁদুর ডন দিচ্ছে।'

'আচ্ছা এখুনি আসছি' নীলকণ্ঠ খুশিতে যেন উপচে পড়ল। কাকা আজ তাদের বাড়িতে খাবে। কাকা বললে খাবার খোঁজ করার জন্য এসে পড়েছিল—তারপর নিশ্চয়ই মা ও বাবা আর যেতে দেয় নি। ঠিকই করেছে। কাকা তাদের বাড়িতে খাবে, এ কি তাদের কম ভাগ্যের কথা। নীলকণ্ঠ রাখালকে বললে, 'চল তুই আমার একখানা কাপড় পরবি।'

পরক্ষণেই পাশের ঘরে গিয়ে কাপড় ছেড়ে এসে নীলকণ্ঠ চন্দন ও রাখাল এসে পড়ল। নন্দরাণী দাওয়ায় আসন পেতে জায়গা করেছিল—ছেলেদের, গোপালের আর নরেনের। পদ্ম কিছুতেই বসতে রাজি হয় নি ছেলেদের সঙ্গে বসতে। সে নন্দরাণীর সঙ্গে বসবে।

আসনের সামনে সারি সারি সব কলা-পাতায় খেতে বসল ওরা। নন্দরাণী ও পদ্ম দুজনে মিলে পরিবেশন করতে লাগল। গোপালের কাছে এসে নন্দরাণী বললে, 'সত্যি ঠাকুরপো আমার কি ভাগ্যি—তোমাকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ানোর ক্ষমতা আমার নেই। তাছাড়া তোমাকে ধরাও মুশকিল।'

গোপাল হাসতে হাসতে বললে, 'তোমার ক্ষমতা না থাক—আমার ক্ষমতা আছে তোমার হাতের রান্না খাওয়ার। দেখলে তো কেমন টিপ্ করে এসে পড়লুম!'

'হ্যাঁ ওকথা আর বোলো না। ভাগ্যিস বোমা ফাটাফাটি হয়েছিল আর ভাগ্যিস শুনেছিলে তোমার দাদার কথা, তাই তুমি এসেছিলে। তা না হলে তুমি কি আসতে?'

'কিন্তু এলুম তো আর নেমন্তন্নটাও বাগালুম তো। এখন বলো কৃতিত্বটা কার?'

নীলকণ্ঠ হাসতে হাসতে বললে, 'কাকার সঙ্গে কথায় পারবে না মা—কাকা কত লেখাপড়া জানে জানো?'

'তুই জানা' নন্দরাণী বললে, 'আমি যখন এ বাড়িতে আসি তোর কাকা তখন—তুই এখন যত বড়টা—তার চেয়েও ছোট। ইস্কুল পালিয়ে আমাদের এই মনসা বেড়ার পাশে এসে দাঁড়িয়ে থাকত। ঠাকুর এসে এক-একদিন ধরে ফেলতেন, কি মার মারতেন। অনেকদিন আমি রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে আগলে আগলে টেনে আনতুম। কি ঠ কুরপো মনে পড়ে সে সব কথা?'

'খুব মনে পড়ে বৌদি,' গোপাল বললে, 'সেদিন বাবা অমনি করে মারত বলেই শেষ পর্যন্ত যা হোক লেখাপড়াটা হয়েছিল!'

এবার নরেন বললে, 'শুধু কি লেখা-পড়াই হয়েছিল তোমার গোপাল—আজ এই তল্লাটের সমস্ত মানুষগুলো তোমাকে খোঁজে কেন? সেটা কি করে হ'ল, বলো?'

নরেনদা সেটা ঠিক বাবার জন্যে হয় নি। ওরা যদি আমাদের জমি-জায়গাগুলো জলে ডুবিয়ে দিয়ে মেছোঘেরী না করতে

তা হলে বোধহয় কোনদিনই আমি এ-পথে আসতুম না!'

খেতে খেতে সবাই গোপালের কথাগুলো শুনছিল। গোপাল বলতে লাগল, 'কি জানো নবেনদা—মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচারই মানুষকে পথ দেখায়। এ জেলাটের সমস্ত মানুষ অত্যাচারিত। তারা সবাই নড়ে উঠেছে। তারা চলতে শুরু করেছে। আমিও একজন অত্যাচারিত—আমি সকলের সঙ্গে আছি মাত্র।'

মুগ্ধ হয়ে নীলকণ্ঠ কথাগুলো শুনছিল। সে ভাবল, হয়তো এটাই ঠিক।

'খুব মনে পড়ে বৌদি'—গোপাল বললে

কয়েকদিন পরের কথা। খাওয়া-দাওয়ার দিনটা নন্দরাণীর কেমন যেন অদ্ভুত ভাল লেগেছিল। বাস্তবিক সে যা চেয়েছিল তা যেন ঐ একটা দিনের ঘটনাতে অনেকখানি কাছকাছি এসে পড়েছিল। প্রথমতঃ পদ্মর আসাটা তার কাছে খুবি প্রয়োজনীয় ছিল। দ্বিতীয়তঃ যাকে সে সেদিন আশা করে নি সে-ও অবশেষে এসে পড়েছিল এই দুয়ে মিলে কটা দিনই যেন তার মনটা এক অননুভবনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

তারই প্রকাশ দেখা গেল ক'দিন পরে।

সন্ধ্যাবেলায় নরেন কারখানা থেকে ফিরে যথারীতি হাতমুখ ধুয়ে এসে জলখাবার খেতে বসেছিল। পাশে চন্দন মাদুরে বসে পড়তে পড়তে ক্রমাগত লণ্ঠনের সামনে চুলছিল। নীলকণ্ঠ বুঝি গিয়েছিল বাজারের দিকে। আগামীকাল সেখানে ওদের বিরাট জনসভা হবে। বড় বড় সব বক্তা আসবেন। আর বিভিন্ন দিক থেকে আসবে অসংখ্য মিছিল। এর জন্যে বাজারের কাছে প্রকাণ্ড মাঠটার বিরাট এক মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছে। মণ্ডপটাকে অসংখ্য পতাকা আর হাতে আঁকা রঙ-বেরঙের ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছে। নীলকণ্ঠ হয়তো সেখানেই ব্যস্ত।

নন্দরাণী বললে, 'এবার কি করবে?'

'কিসের?'

'বুঝতে পারছ না?'

'খুলে বলো তবে তো বুঝব।'

নন্দরাণী অবাক হয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু চন্দন এমনভাবে ঢুলে পড়ছিল যে আরেকটু হলেই লণ্ঠনের মাথার ওপর পড়ত, তাই নন্দরাণী ঝপ্ করে তাকে ধরে ফেল বললে, 'না পড়িস অমন করে ঢুলিস নি। লণ্ঠনের ছ্যাঁকায় শেষকালে ফোস্কা পড়াবি?'

চন্দন চোখ বুজেই একটু হাসল। নন্দরাণী কপট রাগের ভঙ্গীতে বললে, 'আর অমন করে হাসতে হবে না—সব মিষ্টিমুখো জোচ্চোর!'

আসলে চন্দনের সারাদিন দুষ্টুমির যোগফল এই ঢুলুনি। সারাদিন ধরে দাদার রঙ আর কাগজ নিয়ে পোস্টার লেখার চেষ্টা করেছে। রামচরণ নিয়ে খেলা দেখাবার কসরৎ করেছে। এখনও গালে, হাতে, পেটে পোস্টারের রঙ লেগে। নরেন বললে, 'খেয়েছে?'

'হ্যাঁ, এই তো খেলে!'

'তবে শুইয়ে দাওনা ঘরে।'

'সেই ভাল,' নন্দরাণী ঘরে বিছানায় শুইয়ে রেখে এল চন্দনকে। ঘর থেকে ফিরে এসে বসতেই নরেন জিজ্ঞাসা করলে, 'কি বলছিল বলো দিকি ভাল করে?'

এবার নন্দরাণী আর কোন হেঁয়ালী না করে সোজাসুজি বলে উঠল, 'তুমি যদি কিছু বোঝো। ছেলেটার বে-থা দিতে হবে না?'

'এক্ষুনি?'

'সে কি গো! ছেলে বড় হচ্ছে না?'

'কত আর বড় হয়েছে?'

'সে যত বড়ই হোক আর না হোক, নন্দরাণী এবার একরকম দৃঢ়তার সঙ্গে বললে, 'ছেলের মাথায় জল দিয়ে আমি বউ ঘরে আনব। আমি আর ক'দিন এমন করে একলা-একলা সংসারের বোঝা টেনে বেড়াবো?'

নরেন জলখাবার শেষ করে হাত-মুখ ধুতে ধুতে বললে, 'আহা কি বোঝাই টানছ সংসারের?'

'না, সংসারের বোঝা টানছি না,' নন্দরাণী অনুযোগের সুরে বললে, 'দুটো ছেলের ধকল তোমাকে পোয়াতে হত তো বুঝতে পারতে। পরক্ষণেই পাছে কথার পিঠে অন্য কথায় চলে যায় তার বক্তব্যটা, সেই ভয়ে আবার সে বললে, 'যাক্ সংসারের বোঝা টানি আর নাই টানি, আমি ঘরে বউ আনব। তোমার কি বলবার আছে বলো?'

নরেন গামছায় মুখ মুছতে মুছতে মাদুরে বসে পড়ে বললে, 'আমার তো অমত নেই—তবে কি জানো ছেলেটাকে একটা কিছু কাজ-কর্ম যোগাড় করে দিয়ে যদি রেন্টা দিতে পারতুম!'

'আরে সে তো তুমি আমি রয়িচি। ধরো যদি আমার একটা মেয়েই থাকত!'

'সে কথা বলে এখন আর লাভ কি? মেয়ে তো আর হয় নি—'

'না সে কথা আমি বলছি না। আমি শুধু বলছি, তাকে কি আমাদের খাওয়াতে হত না?'

'মেয়ে থাকলে খাওয়াতে হত ঠিক। কিন্তু আমি কি শুধু ঘরের বউয়ের খাওয়ার কথাটাই ভাবছি? বউকে ঘিরে যে সংসারের মধ্যে একটা নতুন সংসার গড়ে উঠবে, তাকে চালিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতাটা তৈরি করে দিতে হবে তো ছেলেটার!'

কথাটা স্বামী নিন্দের বলে নয়। নন্দরাণী কথাটা অনুমোদনও করে। তবে সে মনে করে যে ও ক্ষমতা ছেলের আপনা-আপনিই তৈরি হয়ে যাবে। সেজন্যে সে বলে উঠল, 'তার জন্যে ভাবনা কি—ও ক্ষমতা তৈরি করে নিতে ছেলেদের বেশি দেরি হয় না।'

নরেন দেখলে ঝোঁক যখন নন্দরাণীর চেপেছে তখন আপাততঃ সে কোন যুক্তি শুনবে না। তাই তাকে নিরস্ত না করে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু শুনি পাত্রীটা কোথাকার?'

'সে কি তুমি জানো না?'

নরেন হাসতে হাসতে বললে, 'পদ্ম!'

'হ্যাঁ।'

'তা এ আর আমি বুঝতে পারব না কেন? সেই খাওয়া-দাওয়ার দিনটাতে তুমি যেন কি একটা বলতে চাইছিলে না?'

'তাহলে তুমি লক্ষ্য করেছিলে সেটা?'

'কেন লক্ষ্য করব না। তাছাড়া পদ্মকেও তো লক্ষ্য করেছিলুম—সেও কেমন যেন লজ্জায় ঘাড় নিচু করে ফেললে।'

'তা হলে তোমার চোখ থেকে কিছুই ফস্কায় নি দেখছি,' নন্দরাণীর চিন্তার পালে অনুকূল হাওয়া লেগেছে দেখে সে বলে উঠল, 'এখন বলদিকি পদ্ম কেমন পাত্রী হবে?'

পাত্রী হিসেবে তো ভালই হবে, নরেন বললে, 'অমন পাত্রী পেলে অনেক তাবড় তাবড় লোক ওকে লুফে নেবে।'

'শুধু কি তাই গো,' এবার নন্দরাণী কেমন যেন একটু উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, 'মেয়েটাও জানো নীলু অন্ত প্রাণ। শুনবে মজার কথা—এরি মধ্যে মেয়েটা স্বর্ণশিমুলের বালিশ তৈরি করতে লেগেছে—'

'বলো কি! নরেন জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ গো!'

নরেন কি যেন চিন্তা করলে। তারপর বললে, 'আচ্ছা ছেলের মতি-গতি কি এ সম্পর্কে?'

ছেলের মতি-গতি! নন্দরাণী এতক্ষণ যেভাবে সোৎসাহে কথা বলছিল তা যেন

কেমন একটু স্তিমিত হয়ে এল। যত সহজে পদ্মকে ঘরের বউ করা যাবে বলে নন্দরাণী বলে আসছিল, ঠিক তত সহজে নীলকণ্ঠকে পদ্মর সঙ্গে বিয়ে দেয়া যাবে কিনা তা সে যেন বলতে পারছে না বলে মনে হ'ল। বস্তুতঃ ছেলের মতি-গতি সম্পর্কে নন্দরাণী কেমন যেন চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছিল।

বাস্তবিক এতদিন নীলকণ্ঠর কোন পরিবর্তন বা তার চরিত্রের যা বৈশিষ্ট্য তার কোনরকম ব্যতিক্রম নন্দরাণী লক্ষ্য করে নি। কিন্তু হঠাৎ এই গত কয়েকটা দিনে সে যেন একেবারে বদলে গেছে মনে হ'ল। এই তো কটাদিন আগে বিন্দুঠাকরুণকে মাছ দিয়েও সে বাস্তায় গিয়ে আবার তা কেড়ে নিয়েছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য সেই সেদিনে, সেই নরেনের কারখানায় না গিয়ে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করার দিনটাতে সন্ধ্যের কিছু আগে যখন বিন্দুঠাকরুণ তাদের বাড়ি এল তখন নীলকণ্ঠ তার সঙ্গে যা ব্যবহার করল, সে ব্যবহার ঐ দুরন্ত ডান-পিটে ছেলে যে কোনদিন করবে, এ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না।

দুপুরবেলা চান করতে গিয়ে নীলকণ্ঠ আর রাখাল কুর ফেলে এসেছিল নদীতে। চন্দনও সঙ্গে ছিল। বৈকালের দিকে গিয়ে তারা আবার সেটা তুলে আনল। মাছ মোটা-মুটি পেয়েছিল। মাছ নিয়ে বাড়ি আসতেই তারা দেখল বিন্দুঠাকরুণ বাড়ির দাওয়ায় বসে।

নীলকণ্ঠকে দেখে বিন্দুঠাকরুণ বলে উঠলেন, 'কিরে বাবা নরিন্দরের ছেলে তোরা কি আর মাছটাছ ধরতে যাস না?'

নীলকণ্ঠ বললে, 'কেন যাব না পিসি?'

'তবে তোদের আর দেখতে পাই না।'

'এ কটা দিন যাই নি' বলে নীলকণ্ঠ হাতের মাছগুলোকে দেখিয়ে বললে, 'তবে আজ গেসলুম।'

'তাহ'লে ধরিচিস মাছ?'

'ধরিছি বৈ-কি পিসি!'

'আহা তপ্‌সে মাছ—মাছের রাজা মাছ।'

নীলকণ্ঠ বললে, 'মাছ কিছু নে যাবে পিসি?'

'তা তুই দিলে নিয়ে যাব না বাবা, সেকি একটা কথা হ'ল,' বিন্দুঠাকরুণ বললেন, 'হাজার হোক তোরা আমার ভায়ের ছেলে, মানে ভাইপো। তা তোরা একটা ভাল-মন্দ জিনিস দিলে আমি নিয়ে যাব না একি হতে পারে বাবা?'

'তবে নিয়ে যাও কুড়িখানেক মাছ!'

'কু-ড়ি-খা-নে-ক,' বিন্দুঠাকরুণ এই আশাতীত প্রাপ্তি যোগে একগাল হেসে বললেন, 'আহা-আ বেঁচো থাকো বাবা, বেঁচে থাকো। রাজা হও, হিংস্রজীবি হও।' প্রাণ থেকে স্বত উৎসারিত এই কথাগুলি বিন্দুঠাকরুণ বলবার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আসল জায়গাটায় নিশ্চিত হবার জন্য পুনরায় বললেন, 'কিন্তু বেটা দিয়ে আবার কেড়ে নিবি না তো?'

নীলকণ্ঠ বললে, 'ছিঃ ছিঃ পিসি! কক্‌খনো নয়। সেদিন হঠাৎ রাগের বশে ওরকম করে ফেলেছিলুম বলে তুমি কিছু মনে কোরো না। আমি তার জন্যে খুবি দুঃখিত পিসি!'

পিসি, সত্যি-মিথ্যে তিনিই জানেন, তবে নীলকণ্ঠর এই আন্তরিকতাপূর্ণ এবং সংস্বীকারোক্তিতে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, 'এই তো বাবা মহৎ ছেলের কথা!'

নীলকণ্ঠ সেদিন বিন্দু ঠাকরুণকে এককুড়ি তপসে মাছ ভাল করে বেঁধে সঙ্গে দিয়ে আরও বলেছিল, 'পিসি তুমি ভুলে যেও সেদিনকার কথা!'

এই ঘটনায় নন্দরাণী সত্যিই আনন্দিত হয়ে উঠেছিল। তার সতীন ছেলে নীলকণ্ঠ যে অমানুষ হয় নি এজন্য সে গর্ব অনুভব করেছিল শুধু তাই নয় এতে তার শ্বশুর-কুলের মুখোজ্জ্বল হবে বলে সে মনে মনে তৃপ্তিও বোধ করেছিল। কিন্তু সেই-জন্যেই হয়েছিল তার সবচেয়ে বড় চিন্তা। কেন না ছেলে এবার নিজেকে বুঝতে শিখেছে, কর্তব্যবোধ জেগেছে তার। এতে করে তার একটা নিজস্ব ভঙ্গী অথবা ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে। তাই এই রূপান্তরিত নীলকণ্ঠ কি রাজি হবে পদ্মকে বিয়ে করতে? মনে মনে এমন কথাও যে নন্দরাণীর ফেনিয়ে ফেনিয়ে ওঠে নি, তা তো নয়। কাজেই.....

তা ছাড়া আরও একদিনের কথা—সেটাও এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। ঘটনাটা ঘটে গত পরশু না তার আগের দিন। নরেন ঘটনায় কি বুঝেছিল তা সেই জানে, কিন্তু নন্দরাণী যা বুঝেছিল তাতে তার বুকপাখ একদিকে যেমন আশা ও আনন্দের ঢেউ বয়ে গিয়েছিল মনে, তেমনিই চমকে উঠেছিল সে তার ভবিষ্যৎ ভেবে।

বুড়ো বিপদভঞ্জন এসেছিলেন পুনরায় নরেনের কাছে ছেলেদের কারখানায় যাতে কাজ হয় তার তাগাদা দিতে। আবার তেমনি করে সন্ধ্যাবেলায় দাওয়ায় মাদুর পেতে নরেন বসতে দিয়েছিল তাঁকে। বুড়ো বসে পৈতেটাকে ভুঁড়ির ওপর থেকে ভাঁজ করে কাঁধে তুলে দিয়ে বললেন, 'বাবা নরেন কিছু সুবিধে করতে পারলি?'

নরেন বললে, 'জ্যাঠামশাই সুবিধে করার তেমন কোন সুযোগই নেই আজকাল কলকারখানায়।'

'কোন রকম কুলি-কামারীরও কাজ একটা আধটা হয় না?'

'না জ্যাঠামশাই। সেদিন আর নেই। আগে সায়েবরা ছিল লোকজনকে টেনে টুনে নিয়ে যা হয় করে ভর্তি করা যেত কিন্তু আজকাল সব মাড়োয়ারী মালিক—তাছাড়া ওয়েলফেয়ার অফিসার, লেবার অফিসার কত কি হয়েছে। সেখানে আমাদের আর কোন কথাই চলে না।'

'সবই তো বুঝলুম রে বাবা,' বিপদ-ভঞ্জন কেমন যেন হতাশায় ভেঙে পড়ে বললেন, 'আমি আর পারছিনা রে নরেন। শুধু এবার মরণটা হলেই বাঁচি।'

'বুঝি জ্যাঠামশাই' নরেন বললে, 'কিন্তু করি কি বলুন তো?'

এরপর চুটি চুপি বিপদভঞ্জন বললেন, 'বাবা বলতে লজ্জা করে। বলবই বা কাকে। সারাটা দিন আজ পেটে অন্ন পড়ে নি। যদি তুই কিছু মনে না করিস তো বলি—'

'মনে করব কেন। আপনি বলুন না!'

'যদি আজকের মত তোরা আমায় দু-মুঠো খেতে দিস বাবা!'

নীলকণ্ঠ ঘরে ছিল মায়ের কাছে। সে বিপদভঞ্জনের কথা শুনে চুপি চুপি নন্দ-রাণীকে বললে, 'মা শুনতে পাচ্ছো?'

'পাচ্ছি।'

'আমাদের বেশি রান্নাবান্না আছে?'

'সে রকম তো কিছু রাঁধি নি' আমাদেরই খাবার মত যা কিছু আছে।'

নীলকণ্ঠ বললে, 'তাই থেকেই দাও। আমি না হয় মুড়িটুড়ি কিছু খেয়ে থাকব।'

নন্দরাণী বললে, 'তুই মুড়ি খেতে যাবি কেন? আমি থাকতে?'

'না না তোমাকে না খেয়ে থাকতে আমি দেব না,' নীলকণ্ঠ বললে, 'বুড়ো মানুষ সারাদিন না খেয়ে আছে। আহা কত কষ্ট হচ্ছে। তুমি আমার খাবারটা অন্ততঃ দাও মা। দেরী কোরো না।'

নন্দরাণী নীলুকে পরীক্ষা করার জন্যে বললে, 'তুই কি বলচিস নীলু—ঐ বুড়োর ওপর তুই মায়া দেখাচ্ছিস—অ'র ওরই ছেলেরা তোকে সেদিন মারতে এসেছিল। সে কি তুই ভুলে গেলি?'

'ছেড়ে দাও সে কথা মা,' নীলকণ্ঠ বললে, 'তারা অমানুষ হয়েছে বলে কি আমাকেও অমানুষ হতে হবে?'

ছেলের মনে দরার মায়ার এই প্রাবল্য এবং বিপদভঞ্জনের ছেলেদের অবিবেচনা প্রসূত কাজের বিরুদ্ধে তার অবিবেচনা না দেখানোর এই যে তুলনামূলক ব্যবহার এতে আশা ও আনন্দে বুকখানা না দুলে উঠবে কোন মায়ের? তবে নন্দরাণীর একথাও মনে হয়েছিল যে, ছেলে তার সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে উঠছে। একে ঘরমুখী করা হয়তো খুবি মুস্কিল হয়ে পড়বে তার। তাই স্বামী যখন নন্দরাণীকে জিজ্ঞাসা করলে ছেলের মতিগতি কি পদ্মর সম্পর্কে তখন জোর করে সে তেমন কিছু বলতে পারল না। নরেন নন্দরাণীকে চিন্তান্বিত দেখে পুনরায় বললে, 'তাড়া-হুড়ো করার দরকার নেই। ভেবে-চিন্তে দেখা যাকনা কি করা যায় এরপরে।'

এমন সময় বাইরে কে যেন হাঁকল, 'নরেন আছো—নরেন?'

নরেন বলে উঠল, 'কে যেন ডাকল না?'

নন্দরাণী বলল, 'সেই রকমই তো মনে হল।'

'না-রে-নু,' অবাব বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল। নরেন সাড়া দিলে, 'কে—?'

'একবাব এ-সা ইদিকে—'

অতঃপর নরেন বাইরে গেল।

কয়েক মুহূর্ত পরেই নবেন ফিরে এসে নন্দরাণীকে বললে, 'আমার জামা আর জুতোটা দাও দিকি—'

নন্দরাণী বললে, 'কোথায় যবে?'

'ভাস্করবাবু লোক পাঠিয়েছিল!'

'কেন গো?'

'তা বলতে পারব না। যে এসেছিল সে বলে গেল খুব জবুরী দরকার ভাস্কর-বাবুদের বাড়ীতে আজ সকলকে। কেন জানি না ডাক করা হয়েছে—'

সকলকে ডাক করা হয়েছে, নন্দরাণীর মনটা যেন কেমন চিন্তায় সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। নরেন তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়ল। নন্দরাণী বাড়ীর বাইরেকার অ.গড় পর্যন্ত গেল এবং বলে উঠল, 'বেশি দেরী কোরো না যেন।'

'আচ্ছা।'

নবেন বেরিয়ে যেতে এ'টো বাসন প্রভৃতি সব পুকুর ঘাটে নিয়ে মাজতে ধুতে বেশ খানিকটা সময় গেল নন্দরাণীর। তার-পর ঘর-দোর ঝেড়ে-মুছে পরিস্কার করে বিছানা প্রভৃতি প্রস্তুত করতে লাগল। এর মধ্যে বাজার থেকে নীলকণ্ঠ বাড়ী ফিরল। সঙ্গে তার রাখাল। নীলকণ্ঠ মাকে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা কোথায় মা?'

নন্দরাণী যথাযথ উত্তর দিলে। মায়ের উত্তর শুনে চমকে উঠল, 'সে কি বাবা ভাস্করবাবুদের বড়ী গেল কেন?'

'ওরা যে ডাকতে এসেছিল!'

'ডাকতে এসেছিল!'

'হ্যাঁ।'

নীলকণ্ঠ কেমন যেন একটু বিরক্ত ভরেই বললে, 'বাবার যাওয়াটা ঠিক হয় নি। ওরা সবাইকে ডাক-ডোক করছে ওতো আমাদেরই বিরুদ্ধে সবাইকে কু-মন্ত্রণা দেবার জন্যে—'

'তা তোর ছেলে কি করে জানবে বল,' নন্দরাণী বললে, 'কারখানা থেকে ফিরে রোজ যেমন জলটল খায় তেমনি খেলে। তারপর কে একটা লোক এসে ডাকলে। তা যখন ডেকেছে একটা অমন লোক, না গিয়েই বা কি করে বাপু। তাই গেছে। সে তো আর সবকিছু জানে না।'

নীলকণ্ঠ বেশ বিরক্তভরেই বলে উঠল, জানা উচিত ছিল বাবারা ওদের সম্বন্ধে কিছু কি অজানা আছে'

নন্দরাণী ছেলের কথায় নিজেকে যেন অপরাধী অনুভব করল। নরেন না হয় ভদ্রতার খাতিরে বাবে বলে বেরিয়ে পড়েছিল কিন্তু নন্দরাণী কেন তাকে বরণ করে নি? তারও তো বোঝা উচিত ছিল—ওরা বড়-লোক, কাজ নেবার জন্য ওরা ডেকে, ওদের ওখানে না যাওয়াই ভালো। কিন্তু এমনই মনের ভুল যে নন্দরাণীর মাথায়ও তখন কথাটা আসে নি। সে বললে, 'যাই হোক আসুক তারপর বুঝিয়ে বললেই হবে।'

'বোঝাবার কিছু নেই' নীলকণ্ঠ বললে, 'তবে বাবা ওদের কু-মন্ত্রণায় ফাঁসবে না এ আমি জানি।'

নন্দরাণীর মনটা যেন শান্ত হল।

'যাক এখন কাজের কথা বলি শোন রাখাল।' নীলকণ্ঠ বললে, 'তোকে যে জন্যে ডেকেছি। তুই বাজারে যা। সেখানে দেখবি লক্ষ্মণ বিড়িওয়ালা, নগেন দোকানী, ভুবেন বরাট, নিত্যানন্দ বিষয়ী সব সভা মণ্ডপের আয়োজন করছে। তুই গোপালকাকার বাড়ীতে অনেকগুলো পতাকা আছে সেগুলো নিয়ে গিয়ে দিবি আর বলবি মণ্ডপের প্রত্যেকটা খুঁটিতে সেগুলো লাগাতে। আমার বড্ড খিদে পেয়েছে। দুটো খেয়ে নিয়েই যাচ্ছি—

'ওরা কোথায় থাকবে—ওদের দোকানে?'

নীলকণ্ঠ কপট রাগের ভঙ্গীতে বললে, 'গাধা আর কাকে বলে। শুনলি ওরা সভামণ্ডপের আয়োজন করছে—তা ওরা কি ওদের দোকানে সভাটা করবে?'

রাখাল বললে, ঠিক মন দিয়ে শুনি নি অতটা—'

'এখন শুনিলিস তো?'

'হ্যাঁ।'

'তবে যা।'

রাখাল চলে যেতে নন্দরাণী বললে, 'খিদে পেয়েছে বললিস—রিকেলে কিছু খেয়ে যেতে পারতিস তো এসো।'

'কি করে আসি মা' বে-কাজটানা নিজে দেখব, সেটা হবে না। লোক মেলা কিন্তু কাজ করনেওলা খুব কম। শুধু বাক্-চাতুরী।'

'যাক আয় খেতে দিই।'

খিদে পাওয়াটা এমন জিনিস যে মেজাজটা কেও তিরিক্ষে করে দেয়। কয়েক গ্রাস ভাত পেটে যেতেই নীলকণ্ঠর মনটা কেমন যেন প্রশান্তিতে ভরে উঠল। সে নন্দরাণীকে উদ্দেশ করে বলে উঠল, 'জানো মা সভাটা এমন হবে—যে এ তল্লাটে কখনো এমন সভা হয় নি।'

'খুব লোক হবে?'

'খুব লোক 'মানে—লোককে জমায়েত দিতে পারলে হয়।'

'নরবাবাই বললো, রবিলস ফিরে?'

'হ্যাঁ মা। তোমরাও যাবে।'

'বলিস তোর ছেলেকে।'

'বাবাকে আবার কি বলব। তুমি মা—তুমি বাকে ছেলেদের সভায় তা আবার বাবাকে বলাব কি দরকার?'

'তা হলেও—'

'তা হলেও কি—সে বলতে হয় তুমি বোলো।'

'যাক সে দেখা যাবে' বলল—আরও সবাই যাবে তো?'

'নিশ্চয়ই।'

হঠাৎ আগড় ঠেলার শব্দে নীলকণ্ঠ ও নন্দরাণী দুজনেই সচকিত হয়ে উঠল। আবার কে এল? নীলকণ্ঠ ভাবল, বোধ হয় রাখালই ফিরে আসছে। মা গঙ্গা, যদি কোন একটা কাজ ওকে দিয়ে হয়। নন্দ-রাণী ভাবল, হয়ত বা বিপদভঞ্জন। কে জানে হতভাগা বুড়োর বোধহয় আজও খাওয়া হয় নি। কিন্তু তাদের দুজনকেই বিস্মিত করে দিয়ে নরেন সোজা এসে ঢুকল বাড়ীর ভিতরে। খেতে খেতে নীলকণ্ঠ অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, 'বা-বা!'

নন্দরাণী বলে উঠল, 'এ কি তুমি হঠাৎ ফিরে পড়লে যে বড়?'

'অরে ছ্যা-ছ্যা ওসব জায়গায় আমাদের মত লোককে কখনো যেতে আছে' বলে নরেন মাদুরটা টেনে নিয়ে বসলে, 'দেশের যত ওঁচাটে লোকদের নিয়ে ভাস্করবাবুদের মিটিং!'

নন্দরাণী জিজ্ঞাসা করলে, 'মিটিং—কিসের মিটিং?'

চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে উঠল ভাস্করবাবুদের হলঘরের সেই সভাটা;

প্রকাণ্ড হলঘরটার দেয়ালে সর্বত্র ফ্লেস্কের চিহ্ন। মোজেইকের মেঝের ওপর বিছানো কার্পেট।

সারি সারি সব গদি আঁটা চেয়ার, চেয়ারের সামনে এক একটা কার্পেট মোড়া ছোট টেবিল। টেবিলের ওপর ছাইদানি আর ষ্টেতে দামী-দামী সিগারেট। সমস্ত হলঘরটায় নিওন লাইটের ঝলকানি। হলের শিলিং-এ ঘুরছে অনেকগুলো ফ্যান—স্ট্যান্ডের ওপরে ঘরের চারদিকে কতকগুলো ফ্যান তো আছেই।

হলঘরে ভাস্করবাবু তো ছিলেনই। তাছাড়া যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন তাঁদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল মহকুমা শাসক শ্রীলাহিড়ী, পুলিশের সার্কেল ইন্সপেক্টর শ্রীবক্সী, থানার বড়বাবু শ্রীঘোষাল, বি-ডি-ও শ্রীরায়, জেল-এল-আর ও শ্রীচক্রবর্তী, বিগত নির্বাচনে পরাজিত কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীবিশ্বতোষবাবু প্রভৃতিকে। আর যাঁরা ছিলেন তাঁরাও নামা-জাদা লোক। ছিলেন প্রীতিম সিং, ছিলেন তাঁর সহকারী জানকী সাউ আর পিনাকী বোস। বিপদভঞ্জন চাটুয্যের ছয় ছেলে, অর্থাৎ বাঁটুল-সাঁটুলদেরও সেখানে বেশ প্রভাব-প্রতিপত্তি—তারাও সশরীরে বিরাজ করছিল।

নরেন যেতেই দেখলে জলধর হলঘরের একটা দরজার কাছে লণ্ঠন নিয়ে দাঁড়িয়ে। ভাস্করবাবু নরেনকে দেখতে পেয়েই নিজেই বেরিয়ে এসে বললে, আরে নরেন এসো এসো। তারপর জলধরকে দেখতে পেয়ে বললে, 'আবে তুমিও যে! চলো চলো সব ভেতরে চলো—।' প্রায় একরকম ঠেলে-ঠুলেই সে তাদের হলঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। সেখানে দুখানা চেয়ারে দুজনকে বসিয়ে

তাদের হাতে সিগারেট তুলে দিয়ে, তারপর নিজের গ্যাস লাইটারটা খচ্ করে জেলে বললে, 'ধরাও। আর দ্যাখো চলে যেও না যেন খাওয়া-দাওয়া করে তারপর যাবে। মনে থাকে তোমরা আমার স্বজাতি।'

এতক্ষণে নবেনের তেমন কিছু মনে হয় নি। কিন্তু 'স্বজাতি' কথাটা বলতেই তার বুকখানা যেন কেমন ছাঁৎ করে উঠল। যেদিন সমস্ত চাষের জমি আর গ্রামের পর গ্রামগুলো ভাসিয়ে দেয়া হয়েছিল, সেদিন সেই চাষের জমি আর গ্রামগুলো ছিল কাদের? তারা কি ছিল না পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়, রাজবংশী, তিওর আর বর্গক্ষত্রিয়—স্বজাতি ও স্বজাতির সমতুল্য মানুষ? তবে আজ অতো স্বজাতি বলে খাতির কিসের? নবেন ভাবল, নিশ্চয়ই কোন মতলব আছে।

মতলব ছাড়া ধনীরা কখনো কোন দরিদ্র মানুষকে ডাকে না।

একটু পরেই সে মতলব বোঝা গেল। ভাস্করবাবুই প্রথম বললে, 'আজ আমার কি সৌভাগ্য যে আপনারা এই গরীবের বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন। আমি আজ শুধু আপনাদের কাছে একটি কথা নিবেদন করব—'

মহকুমা শাসক শ্রীলাহিড়ী বললেন, 'তাহলে বলে ফেলুন।'

'এখন সার আমরা আর গ্রামে বসে করতে পারব না।'

সার্কেল ইন্সপেক্টর শ্রীবক্সী বললেন, 'কেন ভাস্করবাবু?'

'প্রতিদিন সার আমাদের শাসানো হচ্ছে।'

থানার বড়বাবু শ্রীঘোষাল বললেন, 'আপনি পর পর কয়েকটা ডায়েরী করে রাখুন আমার থানায়।'

ভাস্করবাবু বললেন, 'তাও তো করি নি বড়বাবু?'

মহকুমা শাসক বললেন, 'তাতে কিছু হয় নি?'

বড়বাবু ঘোষাল বললেন, 'বুঝতেই তো পারছেন স্যার। ইউনাইটেড ফ্রন্ট গবর্ণমেণ্ট এখন—'

'তাহলেও' মহকুমা শাসক লাহিড়ী বললেন, 'ল এ্যাণ্ড অর্ডার তো মেনটেন করতে হবে।'

ভাস্করবাবু কথাটা লুফে নিয়ে বললেন, 'স্যার ঠিক এই কথাটাই আমি আপনাদের সুমুখে নিবেদন করতে চাইছি।'

শ্রীলাহিড়ী বললেন, 'শাসানির নেচারটা কি রকম?'

'এই জমি বেনামি করেছো, জমিতে জল ঢুকিয়ে মেছোভেরী করেছো—ধানের বাঁধ কেটে আমরা সব জল বের করে দোবো, জমিতে ফ্ল্যাগ পুঁতবো, তারপর দেখিয়ে দেবো মজা!'

'তা আপনাদের এরকম বেনামি জমি আছে নাকি,' শ্রীলাহিড়ী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিংবা মেছোভেরী?'

ভাস্করবাবু বললে, 'এই তো স্যার জে-এল-আর-ও শ্রীচক্রবর্তী, বি-ডি-ও শ্রীরায় রয়েছেন জিজ্ঞাসা করুন এঁদের।' শ্রীচক্রবর্তী ও শ্রীরায় ঘাড় নেড়ে উঠলেন, অর্থাৎ ঠিকই বলছেন উনি।

মহকুমা শাসক শ্রীলাহিড়ী অতঃপর বললেন, 'তাহলে এক কাজ করুন। আপনি আমাকে, ডি-এম-কে, ডিভিশনাল কমিশনারকে আর হোম সেক্রেটারীকে রুয়েকখানা দরখাস্ত দিন এই মর্মে যে, আমাদের লাইফ মিসারেবল হয়ে উঠেছে। তারপর আমরা স্টেপ নিচ্ছি—?'

ভাস্করবাবু নামজাদা অভিনেতার মত হাত জোড় করে কোমর থেকে নুয়ে পড়ে বললে, 'স্যার চিরকৃতজ্ঞ থাকব আমরা—স্যার চিরকৃতজ্ঞ থাকব আপনার কাছে।'

সার্কেল ইন্সপেক্টর শ্রীবক্সী বললেন, 'আরও একটা কাজ আপনাকে আমি করতে বলি ভাস্করবাবু, আপনারা একটা আর-জি পার্টি তৈরী করুন। লোকজনের তো আপনার অভাব নেই। তাছাড়া প্রীতম সিংয়ের মত বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রয়েছেন,

ভাস্করবাবু কথাটা লুফে নিয়ে বললেন, স্যার ঠিক এই কথাটাই আমি বলতে চাইছি।

জ্ঞানকী সাউ আর পিনাকী বোস মশায়ের মত সমাজসেবীরা রয়েছেন, বিশ্বতোষবাবুর মত সদাশিব পলিটিসিয়ান রয়েছেন, কাজেই আর-জি পার্টি এখানে ভালই হবে।'

'ঠিক বলেছেন স্যার।'

বিপদভঞ্জন চাটুয্যের অপোগণ্ড প্রধান রাঁটুল দাঁড়িয়ে উঠে বললে, আর-জি পার্টির ক্যাপ্টেনেরও অভাব হবে না স্যার আমি রাঁটুল চাটুয্যে এ বিষয়ে খুবি অভিজ্ঞ। স্যার ভাস্করদা ভাল করেই জানেন আমাকে।'

রাঁটুলকে উঠতে দেখেই সাঁটুল উঠে দাঁড়ালো। তারপর রীতিমত শ্লেষাত্মক ভঙ্গীতে বললে, 'স্যার আমার আগে যে বললে ওকে যদি ক্যাপ্টেন করেন তো কেঁদে কুলোতে পারবেন না এই আমি বলেদিলুম। স্লা আমার বড় ভাই হলে কি হবে, আমাকে তো পাবলিক ইন্টারেস্ট দেখতে হবে। আপনি স্যার চার শেলের হোক আর আট শেলেরই হোক, বে-টাই দিন না ওকে—ও স্লা জানলা দিয়ে লোকের ঘুমন্ত বৌকিকে ফোকাস করে করেই টর্চের বারোটা বাজিয়ে দেবে। শেষকালে টর্চে তো জ্বলোতেই পারবেন না আর লোকেও আর-জি পার্টির ওপর মারমুখো হয়ে উঠবে।

সাঁটুলের উক্তিতে রাঁটুল আর ক্রোধ সংবরণ করতে পারল না। ছুটে গিয়ে তার জামার কলার ধরে বললে, 'স্লা তোর বাবও যেমন, তুই স্লাও তেমনি!'

সাঁটুল বললে, 'স্লা আমার বাবা তোরও বাবা নয় রে স্লা?'

'তাহলে তুই আমাকে এই স্যারেদের সামনে এমন করে অপমান করছিস ক্যানো?'

'এতে অপমানের কি আছে,' সাঁটুল বললে, 'আমি বলতে চাই তোকে ক্যাপ্টেন না করে আমাকে ক্যাপ্টেন করা হোক—কারণ স্বভাব-চরিত্তির আমার সকল দিক থেকেই ভালো।'

'আহা-আ কি চরিত্তিরের আমার রাঁটুল বললে, 'পুরনো ব্যাটারীগুলো দিয়ে রোজ নতুন ব্যাটারীগুলো নিয়ে যেতিস রে স্লা আর সেগুলো বিক্রী করে..... তারপর বলব?'

'বলনা দেখি স্লা।'

'তাহলে চরিত্তিরে একেবারে ফুল ফুটে যাবে স্লা—'

মহকুমা শাসক শ্রীলাহিড়ী আর সার্কেল ইন্সপেক্টর শ্রীবক্সীতে কি যেন কথাবার্তা কইলেন। বোধ করি তাঁরা এই চালু মালগুলিকে দুজনে তারিফই করলেন। কারণ এই রকম মালই আজকাল দরকার। কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে বিপদ আছে অনুমান করে শ্রীবক্সী বললেন, 'ক্যাপ্টেন কে হবে পার্টি হলে তখন দেখা যাবে। এখন তোমরা চুপ করো।'

ভাস্করবাবু এসে বললে, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ এখন তোরা চুপ করে যা।'

ওদের রকম-সকম দেখে এবং এদেরই মাঝে মহকুমা শাসক পদস্থ পুলিশ অফিসার এসে সভা-সমিতি করে দেখে দেশের সাধারণ প্রশাসন কোথায় নেমেছে তা যেমন নরেনের বোধগম্য হল তেমনি বোধগম্য হল সভার উদ্দেশ্য সম্পর্কে। আসলে ভাস্করবাবুদের তাঁবেই এঁরা কাজ করে যাবেন। এই রকমের একটা মুহড়াই এখানে দেয়া হচ্ছে। তবু এসব ছাপিয়েও বিপদভঞ্জন-নন্দনদের বেহায়াপানাটায় সে যারপর নাই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল এবং পাশে জলধরকে উদ্দেশ করে বলে উঠেছিল,'

'দেখছিস জলধর একেই বলে ঘরেতে ছুঁচোর কেত্তন—বাইরেতে কোঁচার পত্তন এখানে ক্যাপ্টেনি বাত ঝাড়ছে।'

কথাটা শুধু জলধরই শোনে নি, তার

মত অনেকের সঙ্গে বাঁটুল সাঁটুলও শুনেছিল।

কিন্তু তারা কি জানি কেন নরেনকে ঘাঁটাতে সাহস করে নি। এরপর নরেন এক ফাঁকে জলধরকে সঙ্গে নিয়ে 'আসছি' বলে চলে এসেছিল।.....

নন্দরাণী ও নীলকণ্ঠ নরেনের মুখ থেকে সব শুনল। শোনবার পর নন্দরাণী বলে উঠল, 'নীলু ঠিকই ধরেছিল তা'হলে কেন ওরা সবাইকে ডাক করেছে।'

নরেন বললে, 'সে নীলু কি বলবে—আমি কি আর বুঝিনি?'

নীলকণ্ঠ বললে, 'প্রীতম সিং, জানকী স.উ, পিনাকী বোস কি করতে এসেছিল সভায়?'

'ডেকেছিল বোধহয়।'

আশ্চর্য! এরাই আজকাল মহকুমা শাসক, জে-এস-আর-ও, বি-ডি-ও, পুলিশের বড়কর্তা, বিশ্বতোষবাবুদের চলার পথের সাথী। অথচ এরা কি, গতকাল কলকাতায় মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করে আসার পথে সে নিজে চোখে দেখে এসেছে।

নীলসোনা গ্রামে সেই রাত্রিতে সভায় স্থির হয়েছিল গোপালপুরে কোদিন সভা হবে তার দু'দিন আগে মন্ত্রীর কাছে প্রতিনিধি দল যাবে বে-আইনীভাবে তাদের জল চুরিয়ে মেছোভেরী করার প্রতিকার করার জন্য এবং এ ছাড়াও গোপালপুরের দোকানদাররা স্থির করেছিল তাঁরাও যাবেন গোপালকাকার সঙ্গে সেই বাজারে বোমাবাজীর বিরুদ্ধে পুলিশমন্ত্রীর কাছে বলার জন্য—এই দুই ব্যাপারে মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখা করার পর খুশি মনেই তারা ফিরছিল।

খুশির কারণ আর কিছুই নয়। ভূমি-রাজস্বমন্ত্রী তাঁদের কথা ভালভাবে শুনেছেন। শুধু তাই নয় তাঁদের বলে দেয়া হয়েছে এই সরকার জনসাধারণের সংগ্রামের পাশে থাকবে। লোকে যদি সংগ্রাম করে, তাদের ওপর অত্যাচারের প্রতিকার করতে চায়, তবে এই সরকার অন্ততঃ বাধা দেবে না। পুলিশমন্ত্রীও বলেছেন, সমাজ-বিরোধীদের শুধু পুলিশ আমলা দিয়ে দমন করা যাবে না, মানুষকে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। আমলাদের ওপর নির্ভর করলেই সমাজ-বিরোধীরা সুযোগ নেবার চেষ্টা করবে।

কথাগুলো খুবি সত্যি।

সেই চাষীদের পক্ষ থেকে নীলসোনা গ্রামের জটাধারী অজামিল মণ্ডল, কাঞ্চন-ডাঙার যুধিষ্ঠির নেয়ে, চন্দ্রদ্বীপের সনাতন খেলো, ইদিলপুরের উত্তম নস্কর গিয়েছিল—আর গোপালপুর বাজারের দোকানদারদের পক্ষ থেকে গিয়েছিল লক্ষ্মণ বিড়িওয়ালা, নগেন দোকানী, ভবেন বরাট, নিত্যানন্দ বিষয়ী। এদের সঙ্গে ছিল গোপালকাকা আর নীলকণ্ঠ নিজে।

খুশি মনে তারা গিয়েছিল। ট্রেণ অন্ততঃ রাত দশটা নাগাদ পৌঁছুবে। বিরামনগর থেকে শেষ বাসখানায় তারা নিশ্চয়ই গোপালপুরে ফিরতে পারবে এই ছিল তাদের আশা। কিন্তু আশ্চর্য—তাদের সে আশা ব্যর্থ হয়ে গেল বিরামনগরের আগের স্টেশন থেকে ট্রেণখানা ছেড়ে সামান্য কিছুটা আসতেই। হঠাৎ ট্রেণখানা থেমে গেল ব্রেক কষে। তারপর ছাড়ার আর লক্ষণই দেখা গেল না।

ব্যাপার কি?

শোনা গেল আরও কিছুটা দূরে বিরামনগরের দিকে যেতে মালগাড়ী থামিয়ে ওয়াগন ভাঙা হচ্ছে। নীলকণ্ঠরা যে ট্রেণে আসছিল সেই ট্রেণের সার্চলাইট পড়েছে অনেক দূর অবধি। তীব্র আলোয় সুস্পষ্ট-ভাবে দেখা যাচ্ছে লাইনের ওপর অনেক লোক ছুটোছুটি করছে। লাইনের মাঝখানে, ধারে এক-একবার অনেকগুলি বেগুনি আলো জ্বলে উঠছে—সে আলোয় সমস্ত চত্বরটা একেবারে রঙীন হয়ে উঠছে।

এমনি করে প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। আর দেরী করা যায় না। এগারোটা বেজে গেছে। এরপর যদি আরও ঘণ্টাখানেক দেরী হয় তাহলে এমনিতেই বারোটা হয়ে যাবে, তারপর হেঁটে বাড়ী পৌঁছুতে অন্ততঃ দুটোর কম হবে না। তাছাড়া অজামিল মণ্ডল, যুধিষ্ঠির নেয়ে, সনাতন খেলো আর উত্তম নস্করকে যেতে হবে স্বর্ণশিমুলের চর হয়ে খাড়ি আর খালের পথে দীর্ঘ পথ। অর্থাৎ বেচারাদের যেতে রাত পুইয়ে যাবে।

গোপাল বললে, 'কি করা যায় বলদিকি নীলু?'

নীলু বললে, 'চল কাকা হাঁটি।'

লক্ষ্মণ বিড়িওয়ালা বললে, 'এক কাজ কর না বিরামনগর পর্যন্ত তো যাই—তারপর ভবেনদার মহাজন নন্দীদের তো লরী রয়েছে। কি গো ভবেনদা?'

ভবেন বললে, 'তা বললে নন্দীরা যে লরীখানা দেবে না তা নয় তবে—'

'তবে কি?'

'ড্রাইভার পাওয়া মুস্কিল হতে পারে!'

লক্ষ্মণ বললে, 'সে একটা কথা বটে।'

নিত্যানন্দ বিষয়ী বললে, 'কিন্তু এ কি' অরাজকতা, এতক্ষণ ধরে মালগাড়ী আটক করে ওয়াগন ভাঙা হচ্ছে পুলিশের কি কোন কর্তব্য নেই?'

'কর্তব্যটা ওদের ওয়াগন ভাঙা বন্ধ করার নয়, কর্তব্যটা ওদের অন্য কিছু, গোপাল বললে, 'গত বিশ-একুশ বছরে ওরা এইটেই ভাল করে শিখেছে।'

অনেক প্যাসেঞ্জারই ছিল সেখানে। সকলেই কথাটা অনুমোদন করল।

অতঃপর আর দেরী নয়। সকলেই লাইন ধরে বিরামনগরের দিকে হাঁটতে লাগল। খোয়া আর পাথরে, লোহা-লক্কড় আর কাঠে পায়ে লাগল কতজনের, তবু চলতে হল কারণ এছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

ক্রমশঃ সেই মালগাড়ীর কাছে এসে পড়ল তারা। অদ্ভুত বেগুনি আলো। চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লোক এক সঙ্গে কাজে ব্যস্ত। খোলা ওয়াগন থেকে লোহার বড় বড় জয়েন্ট নামাচ্ছে কিছু লোক। সঙ্গে সঙ্গে অক্সিজেন সিলেণ্ডার টিউব লাগিয়ে জয়েন্টগুলোকে মাঝখান থেকে চক্ষের নিমিষে পুড়িয়ে দিয়ে লোহাকাটা করাত দিয়ে ঠিক তেমনই ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দু'খানা করে ফেলছে। তারপর টুকরো গুলোকে বয়ে বয়ে নিচে মেঠো রাস্তায় লরীতে বোঝাই করছে। আরও এগিয়ে গেল তারা। এক জায়গায় অসংখ্য চারের পেটি নামানো হয়েছে। সব দেখে-শুনে মনে হল, রাতের মধ্যে মাল-গাড়ীকে মালগাড়ীই সাফ হয়ে যাবে বোধ হয়। রেলের ওপরে মালগাড়ী অচল বটে কিন্তু রেলের বাঁধের নিচে মেঠোপথে লরীর ধাতব-ইঞ্জিনের যেন বিশ্রাম নেই, গত বাইশ বছরের সযত্নলালিত সভ্যতা দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে উধাও হয়ে।

অক্সিজেন সিলেণ্ডারের পাইপ থেকে বেরিয়ে আসা বেগুনি আলোর হঠাৎ একটা গাছতলার নিচে জনতিনেক লোককে দেখা গেল। নীলকণ্ঠ বললে, 'কাকা ওখানে আবার তিনটে লোক কি করছে?'

গোপাল পিছন থেকে তাকে চিমটি কাটলে।

একটা লোক পিস্তল উঁচিয়ে বাজ-খাঁই গলায় বলে উঠল, 'নাকের সিধে চলে যাও—পেঁয়াজী কোরো না।'

ভয়ে ভয়ে লোকে সেখানটা পার হয়ে এল। তিনটে লোকের মধ্যে একজনের বর্ণনা বাবার কাছে নীলকণ্ঠ শুনেছিল। সে প্রীতম সিং। সেই বাবরি চুল, সেই গালপাট্টা। আর দু'জনকে সে চিনতে পারল না। কিন্তু মুখগুলো তার মনে কোঁদা হয়ে রইল। মালগাড়িটা পেরিয়ে এসে নীলকণ্ঠ বললে, 'কাকা একটা তো প্রীতম সিং বেশ বুঝতে পারা গেল। বাকি দু'জন কে বল তো?'

গোপাল বললে, 'যার হাতে পিস্তল দেখলি ওর নাম পিনাকী বোস আর ওর ডান পাশে যে ছিল সে হল জানকী স.উ।'.....

তাই বাবার মুখে মহকুমা শাসক, পুলিশ অফিসার প্রভৃতিকে ওদের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আর সমাজসেবী বলতে শুনে নীলকণ্ঠর যার-পর-নাই হাসি পেল এবং সে হাসি যে ঘৃণামিশ্রিত নয়, একথা জোর করে কে বলতে পারে? নীলকণ্ঠ এবার সবকিছু একসঙ্গে উপলব্ধি করে বললে, 'ওরা অর্থাৎ ভাস্করবাবুরা, বিশ্বতোষ-

যাবরা, সরকারী আমলা অর্থাৎ মহকুমা শাসক, ডি-ডি-ও, জে-এল-আর-ও পুলিশের কর্তারা, ওয়াগন ব্রেকাররা সব একসঙ্গে তৈরি হচ্ছে—সাধারণ গরীব মানুষের বিরুদ্ধে। যাক্‌গে এখনই খবরটা গোপাল-কাকাকে দিয়ে রাখতে হবে। তাছাড়া আরও কতকগুলো কাজ রয়েছে। আমি একবার বেরোই—

নন্দরাণী বললে, 'খুব রাত করিস নি যেন—সেই তো সকাল থেকে চরকির মত ঘুরছিস। তাড়াতাড়ি ফিরিস!,

রাখাল গাধাটা যে কি করেছে তা সেই জানে।

গোপালকাকার বাড়ি থেকে পতাকা-গুলো সভামণ্ডের জন্য লক্ষ্মণ, নগেন দোকানী প্রভৃতিকে দিয়ে এসেছিল কি না তা নীলকণ্ঠ জানতেও পারল না। যাই হোক গোপালকাকার বাড়ির আগেই ওদের বাড়ি। যাবার সময় একবার হয়ে গেলেই হবে। অন্ধকার পথ। কিন্তু এত চেনা এই অন্ধকার, কখনও নীলকণ্ঠ কোন অসুবিধা বোধ করে নি। মনে তার আজ কদিনই কেমন একটা উত্তেজনা। অনবরত পরিশ্রম করতে হচ্ছে তাকে, সেজন্য কিছুটা ক্লান্তিও নেমে আসছে, শরীরে কিন্তু আশ্চর্য মনটা চলেছে যেন তীব্রবেগে এগিয়ে।

মাথার ওপর সুন্দর কৃষ্ণ কালো আকাশ। শিশুর কপালে সোনালি টিপের মত অজস্র নক্ষত্র। বাতাসও যেন কেমন মিষ্টি মধুর। কতবার এমনিতরো কত রাত তার কেটেছে নদীর বুকে নৌকোর দুলুনিতে, নিঃসীম আকাশের দিকে তাকিয়ে কত আজ-গুবি কল্পনা করেছে সে। কিন্তু আজ এ রাতের অর্থ তার কাছে যেন সত্যিই অন্যরকম। কাল এখানে সভা হবে—কতবড় সভা হবে। যখন সবাই বলবে কি করে এমন সভা করা সম্ভব হ'ল তখন গোপালকাকা হয়তো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে তাকে। বলবে, এমনতরো পরিশ্রমী আর নির্ভরযোগ্য ছেলে থাকলে কি না করা যায়। কি অদ্ভুত এই গোপালকাকা। নিজে কত লেখাপড়া করেছে কোন অহংকার নেই, জীবনের কোন বাহুল্য নেই, পরিশ্রমে কোন কাতরতা নেই—মায়ের মত মমতামাখানো হৃদয়খানা তার কত যে দরাজ, কত যে প্রশস্ত, তার যেন ঠিক-ঠিকানা নেই। সেই গোপালকাকা যখন সকলের কাছে তার পরিশ্রমকে মর্যাদা দেবে তখন সে যে তার কি আনন্দ হবে, তা সেই জানে। তাই সবকিছু মিলিয়ে তার মনে যেন কেমন এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর পরিস্থিতি! শুধু তাই নয়, সে যেন তার আবেগে কেবলই পা ফেলে চলেছে। কে জানে এই আবেগের প্রেরণায় রাতে তার ঘুম হবে কি না!

যাক্‌ সে এসে পড়েছে রাখালদের বাড়ির সুমুখে।

বাড়িতে ঢুকতেই দেখল, রাখালের ঠাকুরমার সামনে বসে লণ্ঠনের আলোয় গল্প করছে পদ্ম। নীলকণ্ঠ বললে, রাখাল কোথায় রে পদ্ম?

পদ্ম বললে, 'তোমার রাখালবাবু তো এখনও ফেরে নি!'

'সে কিরে! সে কি এখনও তাহলে মিটিং-এর জায়গাতেই আছে নাকি?'

'হবে হয় তো।'

'আচ্ছা বোকা! তাকে আমি বলেছিলাম দ্যাখ সভামণ্ডের জন্য কতকগুলো পতাকা দিয়ে আসবি ব্যস্‌। তাকে তো আমি সেখানে থাকতে বলি নি?'

'কে জানে ফিরে এলে যদি তুমি বকো,' পদ্ম বললে, 'তোমার বকুনিকে দাদা ভয়ানক ভয় করে।'

অতঃপর আর দেরী নয়। সকলেই লাইন ধরে হাঁটতে লাগল।

নীলকণ্ঠ বললে, 'তোর দাদা ভয় করে—আর তুই করিস না?'

'একটুও না।'

'আচ্ছা দেখা যাবে' বলে নীলকণ্ঠ যেমন এসেছিল তেমনিভাবেই বেরিয়ে যেতে গেল। পদ্ম বললে, 'দাঁড়াও একটু আলোটা ধরি!'

'আলোর কি দরকার?'

'চলো না—'

রাস্তায় এসে নীলকণ্ঠ বললে, 'যা—এইবার যা।'

হঠাৎ পদ্ম এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললে, 'তুমি একটু শোনো—'

'কি?'

'তুমি কিছু শুনেছো?'

'কি শুনব?'

'পদ্ম বললে, আমার সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা?'

নীলকণ্ঠ চোখ কপালে তুলে বললে, 'তোর সঙ্গে আমার বিয়ে! আরে তুই বিয়ের কি বুঝিস?'

পদ্ম বললে, কেন আমি মাথায় কাপড় দিয়ে তোমার সঙ্গে গট্‌ গট্‌ করে এখানে-সেখানে যাব!'

'আমিও অমনি চটাস্‌ চটাস্‌ করে তোকে চাঁটাবো, বলে সত্যিই পদ্মর মাথায় নীলকণ্ঠ চাঁটি মেরে চলে যেতে লাগল। চাঁটিটা বোধহয় একটু জোরই হয়ে গিয়ে-ছিল—পদ্ম কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, 'আচ্ছা এর শোধ আমি তুলব!'

সত্যি সব কিছু যেন মুখর হয়ে উঠেছে। মুখর হয়ে উঠেছে যুগ-যুগান্তের পৃথিবী। এখানে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল জমি-জায়গা ঘর-বাড়ি, গ্রামকে গ্রাম। হৃত-সর্বস্ব নিরুপায় মানুষের নীরবে মেনে নেয়া ছাড়া কোন পথ ছিল না। শাসন-যন্ত্রের জগদ্দল পাথরে একেবারে চাপা পড়ে গিয়েছিল এদের কণ্ঠস্বর। রাতের নিদ্রিত পাখী, অত্যাচারী রাত জাগা পাখীর নৃশংসতায় যদি বা আর্তনাদ করে উঠেছে, এরা সেটুকু করবারও অবকাশ পায় নি। মুষ্টিমেয় লোকের নিরবচ্ছিন্ন একটানা সামগ্রিক বুদ্ধাভিযানের রথচক্রে এরা নিষ্পিষ্ট; মৃত্যুপথযাত্রী—তবু কোথাও এতটুকু আশার আলো, জীবনের কোন স্পর্শটুকু পর্যন্ত এরা পায় নি।

সেই মানুষ আজ নড়ে উঠেছে, মুখর হয়ে উঠেছে। রাত্রি প্রভাত হলে তারই প্রকাশ দেখা যাবে দিকে দিকে।

গোপালকাকার বাড়ি হয়ে, সভামণ্ডপের কাছে ঘুরে নীলকণ্ঠ বাড়ি এসে দেখলে রাখাল বসে আছে তাদের দাওয়ায়। নীল-কণ্ঠ বললে, 'কিরে—তোর তো আচ্ছা বুদ্ধি!'

'কেন?'

'কেন কি—তোকে আমি বললাম ওগুলো তুই পৌঁছে দিবি ওদের। ব্যস্‌ তাহলেই কাজ শেষ। তারপর দেখি তুই বাড়িও নেই, বাজারে মিটিং-এর জায়গাতেও নেই—আর এসে বসে আছিস একেবারে আমাদের বাড়িতে।'

'কি করব তোকে খবরটা দিতে হবে!'

'কেন আমি যাব বলি নি?'

'তা অতো আমার মনে নেই, রাখাল বললে, তবে আমি শুধু তোকে পতাকা পৌঁছে দেবার কথাই বলতে আসি নি। আরও একটা কথা বলতে এসেচি—'

'কি কথারে, জিজ্ঞাসা করেই নীলকণ্ঠের কেমন ভয় হ'ল। রাখাল যা বোকা এখনই হয়ত মা-বাবার সামনেই সে বলে ফেলবে

পদ্মর সঙ্গে তার বিয়ের কথাটা। তাই সে বললে, চ—রাস্তায় চ।'

'না রাস্তায় নয়। এখানেই বলি।'

কি মুস্কিল! নীলকণ্ঠ মনে মনে প্রমাদ গুণল। সে বললে, 'তবে খুব চুপি চুপি বল।'

'হ্যাঁ, চুপি চুপি বলছি, গলার স্বর নিচু করে বললে, কাল ভাস্করবাবুরা আমাদের মিটিং-এ বোমা মারবে?'

'কোত্থেকে শুনলি?'

'ওদের কে একজন পিনাকী বোস বলে লোক আছে। সেই লোকটা একটা রেশন ব্যাগে করে তিনটে বোমা ম্যাথরা চোলাই-ওলার চায়ের দোকানে চাটুয্যেদের বাঁটুলকে দিয়ে গেল।'

'তুই কি করে জানলি?'

'আরে আমি তোর জন্যে সভামণ্ডপে বসে বসে যখন তুই আর এলি না তখন ম্যাথরার চায়ের দোকানের বেঞ্চিটায় বসলুম। হাঠৎ দেখি বাঁটুল এল। তারপর ঐ পিনাকী বোস—'

'তুই পিনাকী বোসকে চিনলি কি করে?'

'আরে,' রাখাল বললে, 'বাঁটুল যে পিনাকীদা বলে ডাকলে—'

'ও,' নীলকণ্ঠ আশ্বস্ত হয়ে অন্যমনস্কভাবে বললে, 'তারপর।'

'তারপর পিনাকী বললে,' রাখাল বলতে লাগল, 'তিনটে আছে ওতে—সভা আরম্ভ হবার মুখে একটা মঞ্চে, একটা মধ্যিখানে, আরেকটা শেষদিকে ঝাড়বি। মঞ্চেরটা বেশ টিপ্ করে ঝাড়বি।'

নীলকণ্ঠ বললে, 'তোকে বুঝতে পারে নি ওরা।'

'কক্ষাই করে নি'—রাখাল বললে, ম্যাথরার দোকানের আলোটা ওরই দোকানের আগড়ে আটকে গিয়ে বেঞ্চিটাকে একেবারে অন্ধকার করে রেখেছিল।'

'তারপর ওরা কি করলে?'

'দুজনে বোধহয় নেশা করেই এসেছিল—'

'হ্যাঁ তার আগে ভাস্করবাবুদের বাড়ি এদের খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল।'

'তাই হবে,' রাখাল বললে, 'কেন না পিনাকী বললে কি না শালার বিলিতি খেয়ে তেমন জমে নি—ম্যাথরা বোতলখানেক মনো দে দেখি। সঙ্গে সঙ্গে বাঁটুলও বললে, শলা পিনাকীদা মনের কথা টেনে বলেছে। তখন পিনাকী বললে, দ্যাখ বাঁটুলে, বামুনদের মধ্যে চাটুয্যে আর কয়েতদের মধ্যে মিত্তির—এ দুই নিষ্কির ওজনে যায়। আমি বাবা 'বোস' কায়েত উঞ্ছবৃত্তি করি না। তুই শালা চাটুয্যে বেই শুনেচিস বোতলের কথা, অমনি লাফিয়ে উঠিচিস—'

'তারপর?'

'তারপর বাঁটুল,' রাখাল তার সুন্দর বর্ণনাভঙ্গী দিয়ে বললে, 'চোঁ চোঁ করে আধবোতলটাক ঢেলাই খেয়ে বলে উঠল, মাইরি পিনাকীদা এ খেয়ে আমি তোমার বোমা নিয়ে যেতে পারব না শলা। যদি শলা ঠিক্‌রে পড়ি তবে, বাঁটুল চন্দোর একেবারে তিন বোমায় সতীর বাহান্ন পিঠ! ওর কথা শুনে পিনাকী বললে তোকে নিয়ে যেতে কে বলেছে ও ম্যাথরার দোকানেই থাক না। তারপর ম্যাথরাকে বললে, কিরে ম্যাথরা। ম্যাথরা বললে, হ্যাঁ, হ্যাঁ এখানে যমও আসবে না।

অবাক বিস্ময়ে নীলকণ্ঠ রাখালের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'তারপর তুই কি করলি—'

'তারপর কি করিছি শোন্,' রাখাল বললে, 'বোমাগুলো যখন ওরা ওখানে রাখলে আমি জেনে গেলুম তখন আর আমি ওখানে বসলুম না। কি জানি যদি দেখে ফেলে আমাকে তাহ'লে বোমাগুলো সন্দেহ করে সরিয়ে ফেলতে পারে। তাই বেঞ্চি থেকে উঠে পশ্চিমদিকে গিয়ে মাঠে নেবে পড়লুম। সেখান থেকে দেখলুম ওরা চলে যাবার সময় কিছু নিয়ে গেল কি না। দেখলুম কিচ্ছু নিয়ে গেল না—তখন সোজা চলে এলুম তোদের বাড়িতে।

নীলকণ্ঠ আনন্দের আতিশয্যে রাখালকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'রাখাল আমি তোকে চিরকাল বোকা ভেবে এসেছি—এ তুই আজ যা করেছিস এর তুলনা হয় না।

নন্দরাণী ঘর থেকে বলে উঠল, 'কি করেছে রে রাখাল।'

'সে পরে শুনো মা,' নীলকণ্ঠ বললে, 'রাখাল চ গোপালকাকাকে খবরটা দিই গে।'

নন্দরাণী বললে, 'আবার যাবি? রাত যে অনেক হয়েছে।'

'যেতেই হবে মা।' দুজনে তারপর বেরিয়ে পড়ল।

গোপালকাকাদের বাড়ি কিছুক্ষণ আগে নীলকণ্ঠ যখন ভাস্করবাবুদের বাড়িতে মহকুমাশাসক, পুলিশ অফিসার আর ওয়াগন ব্রেকারদের সম্মিলিত সভার খবর দিতে এসেছিল তখন সে দেখে গিয়েছিল কাকাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ মিটিং হচ্ছে, এবারেও যখন এল দেখল সে, সেই মিটিংই চলছে। সম্ভবতঃ মেহোঘেরীর ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত কি করতে হবে তারই আলোচনা চলেছে পূর্ণোদ্যমে।

রাখালকে উঠোনে দাঁড় করিয়ে রেখে নীলকণ্ঠ সোজা ঘরের দরজার কাছে গিয়ে ডাকল, 'কাকা?'

'কিরে?'

'একবারটি বাইরে এসো।'

গোপাল বাইরে আসতেই নীলকণ্ঠ সবকথা বললে, সব শুনে গোপাল বললে, 'আজ তো আর কিছু করা যাবে না। তাছাড়া এখানকার পুলিশ দিয়েও হবে না। কাল সকালে দেখা যাবে। যা এখন তোরা বাড়ি যা অনেক রাত হয়ে গেছে।'

পরদিন এখানের মানুষের জীবনে যেন নেমে এল সোনালি সকাল।

এই সোনালি সকাল অস্তসূর্যের রক্ত-রাঙা দীপ্তিতে যখন অগ্নিবর্ণ হয়ে উঠবে, গোপালপুরের বাজারে তখন লক্ষ মানুষের মেলা। সে মেলায় শাসনের বেদীতলে জীবনের ব্যাকুল কামনা : ওগো আমরা বাঁচতে চাই। এমন সুন্দর, রূপসী, ঐশ্বর্যময়ী পৃথিবীর বুকে আমরাও চাই একটু ঠাঁই, এতটুকু ভালবাসা, প্রাণধারণের গ্লানি দূর করার জন্য শুধু দুটি খেটে খাওয়ার ব্যবস্থা। এই পৃথিবীর জল, বাতাস, আলো, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত—এতে আমাদেরও উত্তরাধিকারত্ব আছে, এ থেকে আমরা বঞ্চিত হতে চাই না। আর চাই না তেমনিভাবেই মাতৃজঠর থেকে পৃথিবীর আলো দেখার সঙ্গে সঙ্গে যে পুণ্যভূমিতে ভূমিষ্ঠ হই তারও একটি কণা থেকে বঞ্চিত হতে। কারণ সে তো শুধু মাটি নয়—দিনক্ষণ, সপ্তাহ, মাস, বৎসর পার হয়ে, শতাব্দীর চক্ররেখায় যুগ-যুগান্ত ধরে, লক্ষ, হাজার বছরের একসাথে মিশে যাওয়া অনন্ত-রূপিনী, স্নেহময়ী জননীর মমতায় পরিপূর্ণ সভ্যতার মাতৃক্রোড়। কাজেই এ মাটির মুক্তি সভ্যতার প্রাণের এক আদি ও অকৃত্রিম দুরন্ত কামনা।

এ কামনাকে তোমরা আইনের শিকল পরিও না, পাইক-পেয়াদা, লাঠিয়াল কিংবা সঙ্গীনধারীদের দিয়ে এর দেদীপ্যমান শিখাকে তোমরা নিভিয়ে দিতে যেওনা অথবা বিচারসভার প্রহসনের কালো ভুষো ছিটিয়ে এর ভাস্বর শিখাকে ব্যঙ্গ কোরো না।

কারণ মানুষ তো থামবে না।

সত্যিই থামে নি সেদিন মানুষ। কাতারে কাতারে মানুষ এল ইঁদিলপুর, চন্দ্রদ্বীপ, কাঞ্চনডাঙা, নীলসোণা, গোপালপুর, বিরামনগর আরও দূর-দূরান্তরের সব গ্রাম থেকে। সেই নন্দনপুর, কল্পনা, পাটেশ্বরী, বনগ্রাম, সন্ধ্যাতারা, রাখালিয়া প্রভৃতি কত সুন্দর সুন্দর গ্রামের নাম উচ্চারিত হ'ল সেদিন সভায়।

সভাস্থলে বিরাট মঞ্চ। মঞ্চের মাথায় পত্ পত্ করে উড়ছিল অনেকগুলো পতাকা। আরও কত পতাকা সভার মধ্যে—পতাকার পতাকায় যেন ছেয়ে গেছে সমুদ্র সমান সেই সভাটা।

সেদিন ঘরে কেউ থাকতে পারে নি গোপালপুরে। নন্দরাণী, পদ্ম, চন্দন, পদ্মর

মা, ঠাকুরমা, গোপালকাকার মা সবাই-ই এসেছিল। মঞ্চের নিচে সামনেই তাদের দেখাও গেল।

মঞ্চের ওপরে দেখা গেল গোপালকাকা, অজামিল মণ্ডল, যুধিষ্ঠির নেয়ে, সনাতন খেলো, উত্তম নস্কর, লক্ষ্মণ বিড়িওয়ালা, নগেন দোকানী, ভবেন বরাট, নিত্যানন্দ বিষয়ী আরও কয়েকজনকে, যাদের নীলকণ্ঠ নাম জানে না কিন্তু চেনে। গত রাত্রিতে ওঁরাই মিটিং করছিলেন গোপালকাকাদের বাড়িতে।

ওদিকে স্বর্ণশিমুলের চরে নৌকোয় নৌকোয় হুয়লাভ। দূর-দূরান্তর থেকে নৌকো করে সব এসেছে। সত্যিই নৌকোর যেন মেলা বসে গেছে। ওর মধ্যে অনেক-গুলো নৌকো আবার খুব সাজানোও। কেউ সাজিয়েছে বাঁশ-বাঁখারি লতাপাতা দিয়ে, কেউ সাজিয়েছে ময়ূরপঙ্খী করে। আর সব নৌকোতেই বাঁশের ওপর ঝাণ্ডা উড়ছে পত্ পত্ করে। স্বর্ণশিমুলের চরেও সে যেন এক দেখবার জিনিস।

বলাবাহুল্য সারা গোপালপুর গ্রামখানা যেন অতিরিক্ত উৎসাহে ফেটে পড়েছিল। সভাস্থলে লোক, বাজারের দোকানে দোকানে লোক, পথ-ঘাট একেবারে লোকে লোকারণ্য। উৎসাহটা অতিরিক্ত হবার কারণটাও অবিশ্যি ঘটেছিল। এই সভাকে পণ্ড করার জন্য ভাস্করবাবুদের নোংরা প্রচেষ্টাটা ব্যর্থ হয়েছিল বলে। লোকে চমকে উঠেছিল ওদের মূর্তিখানা দেখে। গোপাল সকাল বেলাতেই কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ করে ম্যাথরা চোলাইওলাব চরের দোকানে মজুত সেই বোমা তিনটিব ব্যবস্থা করে। সোজা ওপর থেকে পুলিশ এসে ম্যাথরাকে বামালসুদ্ধ ধবে ফেলে। পিনাকী ও বাঁটুলকে তারা খুজে পায় না। শুধু ম্যাথরাকে নিয়ে চলে যায়। ম্যাথরা যে কি চীজ এবং কাদের সঙ্গে তার আঁতাত এ দেশের লোকের কারো জানতে বাকি নেই। কাজেই লোকে উৎসাহিত না হবে কেন।

তবু ভাল মন্দ যাতে কিছু না ঘটে যায়, সেজন্যে গোপালরাও যেমন সতর্ক ছিল, তেমনি সাধারণ মানুষও ছিল সজাগ। সর্বত্র ভলাণ্টিয়ার পাহারা ছিল।

উদ্বেলিত জনসমুদ্রের মত একটা সভা। সেটা তো বড় কথা নয়। অনেক নরম-গরম বাগ্মীতার কসরও সেখানে হতে পারে কিন্তু তার চেয়েও বড়কথা এতগুলো মানুষকে একসঙ্গে জড়ো করা এবং সেটা যে কতবড় কঠিন কাজ আর সাংগঠনিক কৃতিত্বের পরিচয়, সেই কথাই লোকে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল।

সভার মর্মকথা উপলব্ধি করে সেদিন মানুষ এইটুকু বুঝল, যেখানে বে-আইনী করে তাদের জীবন ও জীবিকা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, সেখানে সেই অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হলে সংগ্রাম তাদের করতেই হবে এবং যেমন করে জল ঢুকিয়ে মেহোঘেরীর সৃষ্টি করা হয়েছে ঠিক তেমনি করেই জল বের করে দিয়ে আবার তাকে জমিতে রূপান্তরিত করতে হবে। তারপর যার যেখানে জমি ছিল, সেইখানে তাকে গিয়ে দখল নিতে হবে।

সত্যিই এর চেয়ে আর সহজ কথা কি হতে পারে? কথা সহজ কিন্তু কাজে করতে গেলে? সেই জন্যই তো এই লক্ষ মানুষের মেলা।

মানুষ সভা থেকে ফিরল যেন দ্বিগুণ-তরো উৎসাহ নিয়ে।

কিন্তু এরই পর। হ্যাঁ ঠিক এরই পর। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে নেমে এসেছে অন্ধকার। কালো আকাশের নিচে মানুষের হাসির মত দিকে দিকে জ্বলে উঠেছে আলো—গোপাল-পুরের দোকান-পাটে, গৃহস্থের বাড়িতে বাড়িতে। পথে পথে পারে পারে দৃপ্ত মিছিল চলেছে, জীবন্ত বলিষ্ঠ মানুষ। এবার তাদের ঘরে ফেরার পালা। ঘরে ফিরবে কত আশা নিয়ে আনন্দ নিয়ে—ভবিষ্যতের কত স্বপ্নের সোনালি জাল বুনে। দূরগামী যারা হয়ত বাড়ি পৌঁছবে তারা অনেক রাতে। গৃহিণী এসে যখন জানতে চাইবে 'হ্যাগো কি হল,' তখন ঘরে ফিরে তাবাও গৃহিণীদের সুমুখে এঁকে যাবে স্বপ্নেব সোনালি জাল। কে জানে সেদিন আর কতদূর?

পায়ে পায়ে তারা এসে পড়ল স্বর্ণ-শিমুলের চরে। চরের বুকে সেই অসংখ্য নৌকোর মেলা—সেই বাঁশ-বাঁখারি লতাপাতা আর পতাকা দিয়ে সাজানো, সেই ময়ূরপঙ্খী করে নিয়ে আসা। চর ডাঙার দিকে ঘন অন্ধকার। অন্ধকারে ভালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে স্বর্ণশিমুলের গাছটা। ওদিকে নদীর বুকে অন্ধকার অনেক ফিকে—জলের সহজ দ্যুতিতে অনেকটা স্বচ্ছও বটে। এখান দিয়েই যেতে হবে নীলসোণা, কাঞ্চনডাঙা, চন্দ্র-দ্বীপ, ইন্দিলপুর, যেতে হবে নন্দনপুর, কল্পনা, পাটেশ্বরী, বনগ্রাম, সন্ধ্যাতারা আর রাখালিয়া গ্রামের মানুষদের। তাই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পোদ্দারবাবুদের সেই ঘাটের উপরটা ভিড়ে ভিড় হয়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল তাদের শত শত কণ্ঠে সম্মিলিত শ্লোগান।

অন্ধকারে চরের ঘাটে নামতে অসুবিধা হবে বলে পূর্বাহ্নেই দুটো হ্যাজাক ঠিক করে রাখা হয়েছিল। নীলকণ্ঠ আর রাখাল সে দুটোকে নিয়ে এল। একটা আলো ঘাটের নিচে, আরেকটা ওপরে নিয়ে দুজনে

অগ্নিযুগের পটভূমিকায় লিখিত শৈলেশ দে'র অবিস্মরণীয় গ্রন্থ

বিনয়-বাদল-দীনেশ

(অনুশীলন সমিতির প্রখ্যাত নেতা শ্রদ্ধেয় নলিনীকিশোর গুহের ভূমিকা সম্বলিত)

বৃটিশ সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ঘাঁটি রাইটার্স বিল্ডিং-এর অভ্যন্তরে ঐতিহাসিক 'অলিন্দ যুদ্ধ'। একদিকে অগণিত গুর্খা ফৌজ সহ বৃটিশ ভারতের শ্রেষ্ঠ সমরবিদগণ, অন্যদিকে বাংলার মৃত্যুঞ্জয়ী কিশোর বিনয়-বাদল-দীনেশ। তারপর?..... ৫·০০

লেখকের আর একটি অনন্যসাধারণ গ্রন্থ

ক্ষমা নেই

দেশদ্রোহীর ক্ষমা নেই। আজ হোক, কাল হোক, চরম শাস্তি তাকে পেতেই হবে। কেউ কি সেদিন রেহাই পেয়েছিল মরণজয়ী বিপ্লববীদের পিস্তলের নল থেকে? ৪·০০

আর একটি অগ্নিযুগের পটভূমিকায় লিখিত বিশ্ব বিশ্বাসের অবিস্মরণীয় গ্রন্থ

বিপ্লবী সূর্য সেন (মাস্টার দা)

১৯৩০ সন। ১৮ই এপ্রিল। রাত দশটা। সহসা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে গোটা চট্টগ্রাম কেঁপে উঠল থর থর করে। তার পরই বাংলার আবালবৃদ্ধবণিতার কণ্ঠে রব উঠল ধন্য মাস্টারদা! পরাধীন দেশের মহাবিপ্লবী তোমায় শতকোটি নমস্কার। রক্ত দিয়ে লেখা মাস্টারদা সূর্য সেনের অবিশ্বাস্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের কাহিনী.....অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য ছবি সহ..... ৪·০০

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস। ৫/১এ কলেজ রো, কলি—৯

দাঁড়ালো। রাখাল রইল ওপরে, নীলকণ্ঠ নিচে।

আলোয় বিশেষ কারো অসুবিধা হ'ল না।

নীলকণ্ঠ হঠাৎ অজামিলকে সামনে দেখতে পেয়ে বললে, 'আচ্ছা বলুন তো অজামিলদা' ঐ ময়ূরপঙ্খী নৌকোগুলো কাদের?

অজামিল বললে, 'একটা আমাদের নীল-সোনা গ্রামের, একটা কাঞ্চনডাঙার, একটা চন্দ্রদ্বীপের আর একটা ইঁদিলপুরের—বাকি-গুলো ঠিক বলতে পারব না।

পাশ থেকে একজন বলে উঠল, 'আমি যাবার সময় গুণিছি মোট আটখানা ময়ূর-পঙ্খী আছে। চারখানা যদি অজামিলদাদের ওদিককার হয় তাহ'লে বাকি চারখানা আমাদের ওদিককার!'

নীলকণ্ঠ জিজ্ঞাসা করলে, 'কোন কোন গ্রামের—'

লোকটি বলতে লাগল, 'কক্কনা, পাটে-শ্বরী, সন্ধ্যাতারা আর রাখালিয়া গ্রামের।'

নীলকণ্ঠ বললে, কি সুন্দর নাম আপনাদের গ্রামের।

লোকটি বললে, 'আর তোমাদের গ্রামের? যেমনি গোপালপুর নাম তেমনি এ গ্রামের সোপাল। গোপাল আর নীলকণ্ঠ। তুমি তো নীলকণ্ঠ।

নীলকণ্ঠ ঘাড় নাড়ল। লোকটি বললে, অজামিলদার পর এমন কর্মী আমরা অনেক-দিন পাই নি! কি বলেন অজামিলদা—'

অজামিলদা বললেন, 'এখন আমাদের ভাগ্য।'

ভাগ্য কিন্তু তাদের অনুকূল নয়।

সভাস্থলে আক্রমণ হতে পারে বলে তারা কড়া পাহারা রেখেছিল কিন্তু বিপদ যে পথ দিয়ে আসতে পারে সে পথের কথা বোধহয় কেউই ভাবে নি। একটা প্রতিষ্ঠিত সরকার মানুষকে আক্রমণ করেছে, সে তবু বোঝা যায় কিন্তু দেশের আইন ও শৃঙ্খলাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে স্বার্থসম্পন্ন ডাকিরা কে কখন আক্রমণ করবে সে কি বোঝা যায়? হয়তো তাই তারা বুঝতে পারে নি।

সহসা দূর থেকে দেখা গেল লঞ্চের সার্চলাইট পড়েছে নদীর জলে। রূপসী জল রূপোর মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তীর-বেগে লঞ্চখানা এগিয়ে আসতে লাগল স্বর্ণ-শিমুলের চরের দিকে। কাছাকাছি, আরও কাছাকাছি এসে পড়ল লঞ্চখানা।

অজামিল বললে, 'এতো সেই ভাস্কর-বাবুদের লঞ্চ। সেই মেছোঘেরী সৃষ্টি করার দিনে এই লঞ্চটাকেই আমি দেখেছিলুম।'

'হ্যাঁ, এই লঞ্চই রাত নেই, দিন নেই নদীর বুকে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়,' নীলকণ্ঠ বললে কারণ তার মনে পড়ে গেল মহাযোগি-

সেই মা, একটি পাখীর মত— নীরব হয়ে গেছে তারা

নীর মহাশ্মশানে যেদিন তাদের নৌকোখানা চুকে গিয়েছিল সেদিন সে এই লঞ্চটাকেই দেখেছিল দূরে চলে যাবার সময়। কে জানে আজ কি মনে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু শুধু মুহূর্তের মধ্যে সুঁই, সুঁই, সুঁই করে গোটাতিনেক শব্দ শুনতে পেল লোকে। লঞ্চের সার্চলাইট ঘুরে গেছে অন্যদিকে, ঘাটের হ্যাজাক নিভে গেছে। অন্ধকার, চারিদিকে শুধু অন্ধকার। কটা ক্ষীণ আওয়াজ উঠছে, কা—কা! কা—কা!

'নী-লু-উ! নী-লু-উ!'

'গো-পা-ল-দা!'

* * *

পরদিন প্রভাতী সংবাদপত্রে লোকে পড়ল : 'অনেকদিন ধরেই বিখ্যাত নস্কর-বাবুদের পরিবারবর্গের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। তাঁরা বার বার থানার দারোগা থেকে মহকুমা শাসক, জেলা শাসক, বিভাগীয় কমিশনার এমন কি স্বরাষ্ট্র-দপ্তরেও প্রার্থনা জানিয়েছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হয় নি। এই সব প্রার্থনা পত্র-গুলি আমাদের দপ্তরেও আছে। ঘটনার দিন সংঘর্ষকারীরা এই সম্ভ্রান্ত পরিবারটির বাড়ি চড়াও হলে জনতা তাদের তাড়া করে নদীর চরে নিয়ে যায় এবং সেখানে কে বা কারা দুষ্কৃতকারীদের ওপর তিন রাউণ্ড গুলী চালায়। ফলে তিনজন ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। নিহতদের নাম :(১) নীলকণ্ঠ—বয়স, ১৯, (২) রাখাল—বয়স, ১৬ এবং (৩) অজামিল—বয়স, ৬০।' সংবাদপত্রের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য 'অন্য পক্ষের বিবরণ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে:

একটি জনসভা থেকে ফেরার পথে তাঁরা আক্রান্ত হন।

কিন্তু যেকথা সংবাদপত্রে বেরুল না সে কথা বলবে কে?

স্বর্ণশিমুলের চরে শুধু থোকা থোকা রক্ত, উপরে, নিচে সর্বত্র। যেন স্বর্ণশিমুলের নিচে রক্ত শিমুলের মেলা!

আর ওদিকে? সেই মা, মলমূত্র ঘেঁটে ছেলেটাকে যে এতবড় করেছিল আর যার সদাই ভয় ছিল ছেলের অযশ হলে লোকে কি বলবে, সেই মা, একটি পাখীর মত বোলফোটা ভাই আর তার বাবা দাওয়ায় বসে। নীরব হয়ে গেছে তারা। সামনে ছড়িয়ে রয়েছে একটা মড়ার মাথা, একটা লাঠি আর একটা তীর-ধনুক।

আর সেই মেয়েটা, যে মেয়েটা চন্দনকে জড়িয়ে ধরে ভেবেছিল তার মত যদি তার একটা ছোট ভাই থাকত, ছোট ভাই দূরে যাক্ সে তো তার নিজের ভাইকেও হারালো। আর কি হারালো তা সেই জানে। মাথায় কাপড় দিয়ে সে কি আর তার সঙ্গে গট্ গট্ করে এখানে-সেখানে যাবার কল্পনা করবে, না তার মাথায় চাঁটির শোধ সে তুলতে পারবে? সামনে পড়ে রয়েছে তার স্বর্ণ-শিমুলের বালিশটা। কে জানে স্বর্ণশিমুলের

শেষ

সুকান্ত স্মরণে

প্রান্তোষ ঘটক

অন্তর্দাহে জ্বলছে অহোরাত্র, কিন্তু কোন রকম বহিঃপ্রকাশ নেই। অন্তরে দাউ দাউ আগুন বাইরে সদাহাস্য। সারল্যের প্রতীক যেন সেই মুখ। দেখলেই মনে হবে, পার্থিব কলুষ থেকে সে যেন মুক্ত। হাসিমুখে কথা বলতে বসতে সহসা স্তব্ধতায় গম্ভীর হয়ে ওঠে। জানলার বাইরে প্রোজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি চালিত হয়। কী অমন নির্নিমেষ দেখছে কে জানে। কৈ কিছুতো নেই ঐ অদূরে। দুপুরের খটখটে শুভ্র আকাশে গোটা দুই চিল, স্থির ডানা মেলে ভেসে ভেসে পাক দিচ্ছে। লক্ষ্য করলাম ক্ষণেকের মধ্যে সেই নিষ্পলক চোখ দুটিতে যেন বিদ্যুতের ঝলক ফুটে উঠলো। সুদূর শূন্যে হিমস্নিগ্ধ মেঘের বুকে ঐ আরামে আর আনন্দে ভাসমান চিল দুটো যেন লক্ষ্য-ভ্রষ্ট না হয়, এমনই দৃষ্টিবান হানছে চিরকিশোর সুকান্ত। জন্মগত অধিকারে শুধু ঐ হিংস্র আর রক্তপায়ী চিলজোড়াটা আসমানের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবে, বিদ্রোহী কবিচিত্ত কী সহজে মেনে নিতে পারে? ধনতন্ত্রের দেশে আবার নরখাদক চিলই জাতীয়পক্ষীর সম্মানিত আসন পেয়েছে। কবিমানস তার, ধনুর্বাণ ধারণ করে না হাতে, তবে তীক্ষ্ণধার তরোয়ালের চেয়ে অধিকতর ক্ষুরধার লেখনীচালনার দক্ষতা সে দখল করেছে। বেশ খানিক নিঃসাড়, নিশ্চুপ সুকান্ত। মুক্ত জানলা থেকে নৈদাঘ তপ্তরৌদ্রের ধারালো এক খণ্ড-রেখা ছড়িয়েছে সম্পাদকীয় দপ্তরের টেবিলে।

আজ মনে নেই, সুকান্তর সঙ্গে ছিল কে। ছিল কেউ একজন। কেন না সুকান্ত একা কোনদিন আসে না। সঙ্গীসাথী কেউ একজন সহযাত্রী থাকে। শূন্য কলস নয়, প্রতিভাধর; অনন্য কবিত্বশক্তির অধিকারী। তাই সবাই যেন বিনয়নম্র, লজ্জা আর সঙ্কোচে একটু যেন বেশি সুস্থির। অহেতুক আত্মপ্রচারের ধান্দায় ঘোরাঘুরি করে না। ক্বচিৎ কখনও নিঃশব্দে আসে সুকান্ত। সঙ্গে থাকে কোনদিন তার দুই বন্ধুর যে কোন একজন। নয় কবি অরুণাচল বসু কিম্বা হয়তো কবি সিদ্ধেশ্বর সেন।

সুকান্তকে দেখলে, তাকে কাছে পাওয়া গেলে যেন এক অভিনব আবেগে - প্রিয়সঙ্গ-সুখের আস্বাদ পাই। কিছুদিন দেখা না পেলে অদর্শনের ব্যথা বাজে মনে। কলকাতার শহরতলীতে সকান্তদের বাসায় গিয়ে হাজির হই। লেখা কৈ? তুমি কৈ? অবিশ্রান্ত শ্রাবণধারায় ডুবু ডুবু বেলেঘাটা অঞ্চল। গাড়ি যাওয়ার পথ নেই আর। জলে জলময়; যেন এক বন্যাঞ্চল। হাঁটু-ভর্তি নোংরা জলে পথ-ঘাট নালা-নর্দমা থৈ থৈ। দেখে যেন বিশ্বাস করতে পারে না সুকান্ত, মধুর আপ্যায়নের হাসি ফোটে তার মুখে। লেখার খাতা বের করে। নতুন লেখা ধরিয়ে দেয় হাতে। শান্তকণ্ঠে বলে,—আপনার যেটা পছন্দ হয়। বেশি তো লিখতে পারি না।

আমি বেছে নিলাম 'চারা-গাছ'। গদ্য কবিতা, কিন্তু একটি অসাধারণ বলিষ্ঠ কাব্যসৃষ্টি। নিপীড়িতদের চিরকালীন ক্ষুব্ধ অনুভূতির আত্মপ্রকাশ এই চারা-গাছের ছত্রে ছত্রে। কয়েকটি পঙক্তি:—

ভাঙা কুঁড়ে ঘরে থাকি :
পাশে এক বিরাট প্রাসাদ
প্রতিদিন চোখে পড়ে;
সে প্রাসাদ কী দুঃসহ স্পর্ধায় প্রত্যহ
আকাশকে বন্ধুত্ব জানায় :
আমি তাই চেয়ে চেয়ে দেখি।
চেয়ে চেয়ে দেখি আর মনে মনে ভাবি
ঐ অট্টালিকার প্রতি ইটের হৃদয়ে
অনেক কাহিনী আছে অত্যন্ত গোপনে,
ঘামের রক্তের আর চোখের জলের। ***

বসুমতীতে প্রকাশিত ঐই কবিতাটি সুকান্তর 'হাড়পত্র' গ্রন্থে গ্রথিত হয়েছে।

কথায় কথায় বললাম,—এবার পূজায় কোথায় কোথায় লিখবে?

সলজ্জায় মাথা নামালো সুকান্ত। নম্রস্বরে বললে,—শারদীয়া আজকাল, স্বাধীনতা, পরিচয়, রংমশাল আর শরদীয়া বসুমতীতে যদি আপনি—

কথা শেষ করে না সুকান্ত। চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দেয় আমাকে। একজন বর্ষীয়সী মহিলা, সস্নেহে বললেন,—বৃষ্টি-জল ভেঙে এসেছো, একটু চা খাও বাছা।

সুকান্ত বললে,—ইনি লেখিকা সরলা বসু। কবি অরুণাচলের মা।

মা, যেন সর্বকালের ভিনি। এঁর কিছু কিছু লেখা পরে বসুমতীতে ছাপা হয়েছে। তিনি আবার বললেন,—শুধু চা খেও না, মিষ্টিমুখ কর একটু।

রেকাবীতে দুটি সন্দেশ। একটি নিজে খেলাম। অন্যটি সুকান্তর হাতে ধরিয়ে দিলাম। সে কী লজ্জা তার! প্রচুর হাসলো সে। নিষ্পাপ সরল হাসি। একটা সন্দেশ খাবে, তাও কত সঙ্কোচ।

—কবে যাবে তুমি?

চায়ের পেয়ালা মুখের কাছে তুলে প্রশ্ন করলাম।

সুকান্ত বললে,—আপনি বলুন কবে যাবো।

বললাম,—হেমেন্দ্রকুমার রায় তোমাকে দেখতে চেয়েছেন।

আনন্দের অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস ফুটলো সুকান্তর বুদ্ধি-দীপ্ত মুখে বললে,—শিশু-সাহিত্যের দিকপাল উনি। ওঁর অনেক লেখা আমি পড়েছি। ভীষণ ভাল লাগে। আলাপ হলে সুখী হবো।

—একটা ডেট দাও, হেমেনদাকে খবর দেবো। তিনি আসবেন বসুমতীতে।

—সামনের সোমবারে যদি যাই?

—অসুবিধা হবে না। হেমেনদা বললে গেলে প্রায় প্রত্যহই আসেন।

সুকান্ত বললে,—শুনেছি উনি শিশির-কুমার ভাদুড়ীর খুব বন্ধু।

বললাম,—হ্যাঁ, এক গেলাসের বন্ধু যাকে বলে।

ভাগ্য ভাল যে সরলা দেবী তখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন।

আবার হাসলো সুকান্ত। বিরাট একটা রসিকতা শুনেছে সে যেন। হাসি থামিয়ে সুকান্ত বললে,—শিশিরকুমার একজন দুর্লভ প্রতিভা। বাংলা দেশের গৌরব। আসল নাটক দেখা যায় তাঁর অভিনয়ে।

'চারাগাছ' পকেটে রেখে বললাম,—তা হলে সুকান্ত, ঐ কথা রইলো। সামনের সোমবারে তুমি আসছো।

—হেমেন্দ্রকুমার কখন আসবেন?

—উনি সাধারণত দুপুরের দিকেই আসেন।

—আমিও যাবো ঐ সময়ে।

তক্তাপোষ ছেড়ে উঠতেই সুকান্ত অতি অন্তরঙ্গ সুরে বললে,—সুকুমারদা ভাল আছেন? (সাংবাদিক সুকুমার মিত্র, বর্তমানে মস্কোয় গেছেন)

—হ্যাঁ।

—বিমলদা ভাল আছেন? তাঁকে বলবেন আমার কথা। (কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ)।

—হ্যাঁ।

—বিনয়দা ভাল আছেন? (সাহিত্যিক সাংবাদিক বিনয় ঘোষ)

শুধু একটি মূলরহস্য

দেবতোষ বসু

শুধু একটি মূলরহস্য জানতে চেয়েছিলাম আমি
নাট্যকারের কাছে,
এড়িয়ে গিয়ে আমায়, তিনি চরিত্রদের দিকে
তাকিয়েছিলেন, পাছে
ওরা আমায় ভয় দেখায়, হাত-পা নেড়ে-চেড়ে
ফাঁদায় এবং হাসায়
ঝোপের মতন এগিয়ে আসে, কবর খোঁড়ে পাগলবেশে
এবং শুকনো খোসায়
ঢাকে আমার অন্তঃসার, আমার শরীরব্যবস্থার
ত্রুটিপূর্ণ ফাঁকে
চুকিয়ে দেয় রোগের সব অনবতত বীজাণুগুলি
জটিল পাকে পাকে
এবং আমায় মহৎ করে মহত্তর কষ্ট দিয়ে
বুক পোড়ানো আঁচে—
শুধু একটি মূলরহস্য জানতে চেয়েছিলাম যখন
নাট্যকারের কাছে।

দেবীসংহিতা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

তখনো তোমার পায়ে বেজেছে হংসক।
ক্ষৌম বস্ত্রে সূর্যের সাতটি আলো স্ফুট করে আনতনয়না
তুমি নৃত্যস্থলী ছেড়ে গেলে দেবশর্মা ঋষিদের
সমস্ত ধ্যানের ধৈর্য, ত্রিপুণ্ডক, বিচলিত করে।

তাই তৃতীয় অক্ষির অগ্নি জ্বলে উঠল;
ধ্বনিহীন স্থবির অধরে অকস্মাৎ ফুটে-ওঠা অক্ষরপ্রবালী যেন
মানুষের
ইতিহাস ঘ্রাণ করে নিয়ে গেল
অবিরল দেবীসংহিতায়।
আর তুমি মহার্ঘ স্খলন সব
জয়ে জড়ো করে দেখালে কি করে নৃত্য
হয়ে ওঠে মৃদঙ্গের দ্রোহিণী সন্তান।

—হ্যাঁ, সবাই ভাল আছেন। শুধু তুমিই ভাল নেই।

আবার নিঃশব্দ হাসি। হাসতে হাসতে বলে,—মাঝে মাঝে ভাল থাকি।

এখানে উল্লেখ্য, উল্লিখিত তিনজনেই তখন বসুমতীর সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করছেন।

আগেই বলেছি অবরে-সবরে সুকান্তর আবির্ভাব ঘটতো পত্রিকার কার্যালয়ে। লেখা দিতে আসতো, লেখার সম্মানদক্ষিণ নিতে আসতো। লক্ষ্য করেছি, উপস্থিত সকল খ্যাতিমান সাহিত্যিকরা মুগ্ধচোখে দেখতেন সুকান্তকে। যেন এক দুষ্প্রাপ্য দুর্লভ। বয়স স্বল্প, লেখেও অল্প, তবু বয়স্কদের কাছে সে স্বীকৃত বরেণ্য।

সেদিনও সে এসেছিল মধ্যাহ্নবেলায়। সঙ্গে কে ছিল আজ মনে নেই। যতদূর মনে পড়ে কবি অরুণাচল বসু।

ঘরে আরও অনেকে। বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের মধ্যে ছিলেন সজনীকান্ত দাস, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, শিবরাম চক্রবর্তী। হাসি আর আড্ডার তুফান বইছে ঘরে।

একখানি চেয়ার দখল করে বসে পড়লো সুকান্ত। যেন কত শ্রান্ত-ক্লান্ত। মুখখানি একটু বিমর্ষ।

—লেখা এনেছো কিছু?

বললাম সম্পাদকীয় কর্তব্যে।

এপাশে-ওপাশে মাথা দোলালো সুকান্ত। মুখে সেই অমলিন হাসি। মাথিয়ে ধীরকণ্ঠে বললে,—না, দেখা করতে এসেছি। যাদবপুরে টি বি হাসপাতালে বেড পেয়ে গেছি একটা। আসছে সপ্তাহে ভর্তি হবো। এখন থেকে চিঠি, পত্রিকা, টাকাকড়ি সবই ওখানে পাঠাবেন। ভর্তি হয়ে চিঠি দেবো বেড নাম্বার জানিয়ে।

সাহিত্যিক রসালাপ চলছিল। হঠাৎ যেন করুণরসের রাগিণী বেজে উঠলো সুকান্তর কথায়।

বললাম,—কতদিন থাকতে হবে? ডাক্তার কী বলছেন?

আর কোনো জবাব নেই সুকান্তর মুখে। সে যেন মূক। নির্বাক।

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। সকলেই স্তব্ধবাক। কবি অরুণাচল বসু খানিক বাদে বললেন,—চলো সুকান্ত, আজ ওঠা যাক।

উঠে পড়লো সুকান্ত। অরুণাচল চুপি চুপি আমাকে বললেন,—ও শুনতে পাচ্ছে না। আপনার কথা। জানেন তো সুকান্ত ইদানীং আর কানে শুনতে পায় না।

জবাব মিললো না সুকান্তর।

কিছুকাল পরে জবাব এলো এক চিঠিতে। লিখলে, ডাক্তাররা জবাব দিয়ে গেছেন।

তারপর আর হাসপাতাল থেকে ফিরলো না চিরকিশোর সুকান্ত। কোথায় যে গেলো কে জানে!

আজও মধ্যে মধ্যে সুকান্তর লেখা চিঠিগুলি পরশমণির মত নাড়াচাড়া করি। বুঝতে পারি, কখনও কখনও চোখের জল কোন বাঁধ মানে না।

একমাত্র সান্ত্বনা, সুকান্ত বাংলা সাহিত্যে তার নিজেরই প্রতিভার কৃতিত্বে স্থায়ী আসন অধিকার করেছে। এবং সে আসন অনড়, অটল, অক্ষয়, অব্যয়।

নতুন দিন

(১৫৯ পৃষ্ঠার পর)

'আয় আয়, একটু চা খাওয়া যাক।'

অমূল্য আপত্তি করল না। দু জনে হাত ধরাধরি করে কাছেই একটা চায়ের দোকান ছিল, ঢুকে পড়ল।

অফিস ছুটির সময়। এখানেও দারুণ ভিড়। তা হলেও কোণার দিকে দুটো খালি চেয়ার পেয়ে দু জনে বসে পড়ল।

'দুটো অমেলট দু কাপ চা।' বাসুদেবই অর্ডার দিল।

'তারপর?' অমূল্যর দিকে চোখ তুলে বাসু আর একবার গাল ছড়িয়ে হাসল। 'কেমন আছিস?'

'কেটে যাচ্ছে।' অমূল্য হাসল না।

'হুঁ, কেটে তো যাচ্ছেই, সেটা কি সব—' বাসুর মুখের হাসিও অবশ্য তখনই মিলিয়ে গেল। একটা ঢোক গিলে যেন একটু ইতস্তত করে বলল, 'আগের অফিসেই আছিস?'

'আর যাব কোথায়?' অমূল্য বড় করে নিশ্বাস ফেলল। একটু থেমে থেকে পরে আবার বলল, 'তোর বিজনেস চলছে কেমন?'

'ভাল। চা এসে গেছে। বাসু বলল, খা।'

দু জনে নীরব থেকে চামচ দিয়ে ভেঙে ভেঙে ডিম খেতে লাগল। বয় কাচের গেলাসে জল রেখে গেল। অমূল্য তৎক্ষণাৎ একটা গেলাস তুলে চোঁ করে সবটা জল শেষ করল।

বাসুদেব জল না খেয়ে সরাসরি চায়ের কাপে লম্বা করে চুমুক দিল। ঘামছিল সে খুব। মোটা মানুষ। রংটা মিশমিশে কালো। তার ঘাড়ে গলায় ঘাম চিকচিক করছিল। পকেট থেকে রুমাল বের করে বাসু ঘাড় গলা মুছতে লাগল। সেদিক থেকে অমূল্য অনেক ভাল। রোগা পাতলা মানুষ। ঘাম-টাম বিশেষ হয় না। তার রংটাও একটু ফরসার দিকে। অমূল্যর মতন এমন আবলুসের রং না। কাজেই সময় সময় একটু-আধটু ঘাম জমলেও সেটা চোখে পড়ে না।

তা হলেও বাসুদেবের দেখাদেখি পকেট থেকে রুমাল তুলে অমূল্য কপাল ও ঘাড়ের পিছনটা মুছে ফেলল।

'এখন কাঠের ব্যবসার খুব সুদিন, বাসু বলল, আজকাল মানুষের ঝোঁক কেবল ফ্যাশানের দিকে। তুই দেখবি, ভাল করে খেতে পায় না, এমন মানুষও একখানা খাট একটা ড্রেসিং টেবিল কিনতে কেমন ঝুঁকে পড়ে।'

বাসুদেবের কথা শুনে অমূল্য অল্প হাসল।

'কেবল কি ফার্নিচারস, সব ব্যাপারেই এমন। আমিও দেখেছি, বস্তির মানুষ, কারখানায় চাকরি করে, পুজোর সময় হয়তো বোনাস বাবদ একসঙ্গে কিছু টাকা পেয়ে গেল। বাস, সবটা টাকা খরচ করে বৌয়ের জন্য ছেলেমেয়ের জন্য নাইলন-টেরিলিন সিফন জর্জেট সব কিনে নিয়ে এল। ছেলের স্কুলের পঠাবই কিনে দিতে পারে না, দেখা গেল বাবু রেডিও কিনে বসেছেন।'

'হুঁ, পারলে রেডিওগ্রাম কিনে ফেলে। ঠিকই বলেছিস। স্টাইলের দিকে মানুষের ঝোঁক এত বেড়ে গেছে। সিগারেট খা।' বাসুদেব পকেট থেকে দামী সিগারেটের প্যাকেট বের করে অমূল্যর সামনে ধরল। অমূল্য একটা সিগারেট তুলে নিল। বাসু লাইটার জেলে অমূল্যর মুখের সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে নিজেও একটা ধরাল।

'যাক গে, তোর কাঠের ব্যবসার এখন তেজী অবস্থা শুনে খুসী হলাম।'

'তোর বাবার শরীর কেমন?'

'এই একরকম। তোর মার শরীর কেমন?'

'এখনো টিকে আছে।' বাসুদেব আস্তে বলল। অমূল্যর যেমন মা নেই, বাবা আছে। তেমনি বাসুদেবের বাবা বেঁচে নেই, মা আছে। 'শোন, তোকে কদিন থেকেই আমি মনে মনে খুব খুঁজছি।'

'আমাকে!' যেন অমূল্য বিশ্বাস করল না। 'না কি রাস্তায় দেখা হল, আর অমনি বললি।'

'না রে, আমি অবিশ্যি সময় করতে পারছি না, না হলে তোর বাড়িতেই একদিন যেতাম।'

'কি ব্যাপার শুনি?' অমূল্য কিছুটা উৎসুক হল। ভুরু কুঁচকে বন্ধুর মুখটা দেখল।

কিন্তু বাসুদেব তখনই কিছু বলল না। মন দিয়ে সিগারেটটা টানল। চা খাওয়া হয়ে গেছে দু জনের। বয় এসে শূন্য কাপ-ডিস সরিয়ে নিয়ে গেল।

'শোন্।' বাসুদেব শরীরটা সামনের দিকে কুঁকিয়ে দিল। 'ব্যবসা করবি?'

'কিসের ব্যবসা?' বলার সঙ্গে সঙ্গে অমূল্য আবার বলল, 'ব্যবসা করব আমার টাকা কোথায়।'

'আহা, টাকার জন্য আটকাবে না, কিন্তু তুই করবি কিনা সেটাই বড় কথা।'

'কিসের ব্যবসা শুনি?'

'থানার ওদিকে খুব সস্তায় একটা জমি পাচ্ছি। খুব বড় প্লট। প্রচুর কপি হয়, কপির সময় কপি; এখন কুমড়োর সিজন, এত কুমড়ো হয়েছে, বেগুনও হয়েছে প্রচুর। এখন তুই যদি রাজী হোস জমিটা আমি কিনে ফেলি। কাঠের কারখানা ছেড়ে অন্যদিকে মন দিতে পারছি না, একেবারেই সময় হয় না, অথচ জমিটা দেখে খুব লোভ হচ্ছে। চমৎকার আনাজের ব্যবসা হয়। উহুঁ, তোকে নিজে কিছু করতে হবে না, লোক দিয়ে সব করাবি, কপি, বেগুন, লঙ্কা, যখনকার যেটা—বলকাতার বাজারে চালান দিবি। তোর আমার মধ্যে আধা-আধি বখরার ব্যবস্থা থাকবে।'

অমূল্য চুপ করে শুনছিল।

'খুব লাভ আনাজের ব্যবসায়।' বাসুদেব নতুন সিগারেট ধরাল। অমূল্য হাসল।

'যদি লোকসান দিতে হয়?'

'আমি দেব—লোকসানটা আমার যাবে তোর কিছুই যাচ্ছে না।'

আর একটু চুপ করে থেকে বাসুদেবের চোখ দুটো দেখতে দেখতে অমূল্য হঠাৎ মাথা ঝাঁকাল।

'ব্যবসা-টেবসা আমি বুঝি না বাসু, আমাকে দিয়ে এসব হবে না।'

শুনে বাসুদেব খুব একটা অবাক হল না। যেন এমন একটা উত্তরই সে বন্ধুর মুখ থেকে আশা করছিল।

'তার মানে ঐ অফিসটার মায়া তুই ছাড়তে পারবিনা।' বাসুদেবের চোখে-মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল।

কথা না বলে অমূল্য একটা লাজুক হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে দিল।

ওস্তাদ আলাউদ্দীন সঙ্গীত-মহাবিদ্যালয়

(ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন অফ মিউজিক কর্তৃক অনুমোদিত)

অভিজ্ঞ শিক্ষকবর্গ—বৈজ্ঞানিক পাঠক্রম

শিশু প্রতিভা উন্মেষের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দান।

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ সেতারীয়া

শ্রীঅজয় সিংহরায়—প্রেসিডেন্ট

শ্রীহরিদাস বিশ্বাস—সেক্রেটারী

ডেভিড হেয়ার নার্সারী এন্ড কিণ্ডারগার্টেন

২০৫, নগেন্দ্রনাথ রোড, নতুন পল্লী, সাউথগাছি, কলিকাতা-২৮, ৪৭-৩৫৫৩

'না না, আমি বুঝতে পারি না, ওখানে তোর কী প্রোস্পেক্ট—কজুসের একশেষ ওই গুজরাটা জাতটা। এখন কেমন দিচ্ছে শুনি?'

'মোটেই আশাপ্রদ না।' অমূল্য আস্তে বলল মুখটা কালো করে। বাসুদেব চুপ করে রইল।

অমূল্য তখন আর হাসছিল না।

অমূল্য কোথায় চাকরি করে, কদিন আগেও সে কত মাইনে পাচ্ছিল, কতদিন ধরে ওই ফার্মটায় সে আছে, সবই বাসুদেব জানে। এবং জানে বলেই যে হঠাৎ আজ দেখা হতে একটা ব্যবসার কথা তুলে বন্ধুর উপকার করতে চাইছে সে তা-ও অমূল্য বুঝতে পারছিল। বাসুদেব—ওরা মস্ত বড়লোক। বাপ-দাদার আমল থেকেই তাদের কাঠের ব্যবসা। নারকেলডাঙ্গায় অমূল্যদের বাড়ির পাশেই বাসুদেবদের প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ি আজও রয়ে গেছে। এখন অবশ্য ভাড়া খাটছে। বেলেঘাটায় তারা নতুন বাড়ি করেছে। নতুন বাড়ি করার পরও বাসুদেব তার মাকে নিয়ে নারকেলডাঙ্গার পুরোনো বাড়িতেই ছিল। যেন অমূল্যর জন্যই ছিল। ছেলেবেলা থেকেই দু জনের বন্ধুত্ব।

অমূল্যদের সংসারের অবস্থা, অমূল্যর চাকরি এবং মাইনে কিছুই বাসুর অজানা ছিল না। এদিকে বড় হয়ে অমূল্য যখন চাকরি করছিল আর বাসুদেব তার বাবার কাঠের কারখানা দেখছিল তখন থেকেই বাসু বুঝতে পারছিল, অমূল্যর পক্ষে সংসার চালান কঠিন হয়ে পড়েছে। মনে মনে বন্ধুকে সে অনুকম্পা করত কি? তা হয়তো না। তবে অমূল্যর বাবা রিটায়ার করার পর থেকে তাদের সংসারে অভাব-অনটনটা বাসুর চোখে বেশি পড়ছিল। স্বচ্ছলতা অবশ্য অমূল্যদের কোনোদিনই ছিল না। তা হলেও বরস হবার পর বাসু জিনিসটা যত বুঝতে পারছিল, যত লক্ষ্য করছিল, ছোট সময়ে ততটা সে বুঝত না। ছেলেবেলায় কে-ই বা—এত সব লক্ষ্য করে। তখন খেলার সাথী হিসাবেই অমূল্যকে সে দেখেছে। তার অন্য কোনো দিকের কথা সে ভাবে নি।

যাই হোক, নারকেলডাঙ্গায় থাকতেই বাসু সময় সময় অমূল্যর উপকার করতে চাইত। অনেক সময়, যেমন বাড়ির কারো অসুক-বিসুক হলে, বাসু টাকা-পয়সা দিয়েও অমূল্যকে সাহায্য করতে চাইত। অমূল্য অবশ্য কোনোদিনই বন্ধুর কাছ থেকে এ ধরণের সাহায্য নিত না। বাসু যে তাকে সাহায্য করতে চাইছে—কেবল এইটুকু ভেবেই সে মনে মনে তৃপ্তি পেত। বন্ধুর কাছে হাত পাততে সে কষ্টবোধ করত। তার অহংকারে বাধত।

'আমার কি মনে হয় জানিস?' মুখ থেকে সিগারেটটা নামিয়ে বাসু বলল, 'তোর অ্যাম্বিশান বলে কিছু নেই, আমি বড় হব, প্রচুর অর্থ উপার্জন করব সে রকম কোনো ইচ্ছাই তোর ভেতরে কোনদিন জাগে না।'

'তুই ঠিক আমার ওয়াইফের মতন কথা বলছিস, রেখার মতন, রেখাও আমাকে রাত দিন ঐ বলে, কেরানীগিরি করতে জন্ম নিয়েছি, সারা জীবন ঐ করব।'

'বলবেই তো।' বাসুর চোখ দুটো হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ঝুঁকে বসেছিল। পেঠ টান করে ঘাড় সোজা করে বসল। 'তোর ওয়াইফ খুব বুদ্ধিমতী যে, সংসারটাকে তোর চেয়ে অনেক বেশি ভাল বোঝে।' একসেকেণ্ড চুপ থেকে বাসুদেব হাসল। 'রেখাও এই বলে, তাই না?'

অমূল্য হাসি হাসি মুখ করে মাথা নাড়ল।

'রেখার শরীর কেমন আছে?' বাসু আর একটা সিগারেট অমূল্যর দিকে বাড়িয়ে দিল। সিগারেটটা দেবার সময় তার হাতটা সামান্য কাঁপল। অমূল্য সেটা লক্ষ্য করল।

'আছে এক রকম, খাটা-খাটনি তো আর কমছে না। একা মানুষ। একটা ঝি রাখতে পারছি না।'

'কেন, ঝি তো তোদের একটা ছিল যেন।'

'সে অনেক দিন তুলে দিয়েছি।'

বাসু একটু সময় গম্ভীর হয়ে থাকে।

'তোর স্ত্রী কেমন আছে?' অমূল্য পাল্টা প্রশ্ন করল।

'কে, মুন্নি, ভাল আছে, কেবল ভাল না—দারুণ ভাল আছে।' বাসু মুচকি হাসল। 'সারাদিন—হৈ-চৈ গান-বাজনা আমোদ-ফুর্তির মধ্যে থাকে।'

'গাইতে বাজাতে পারে বুঝি?'

'হুঁ, ঐ তো ওর ফুড, গান-বাজনা ওর খাদ্য বললে ঠিক হয়। সারাদিন ঐ নিয়ে মাতোয়ারা।'

বাসুদেবের স্ত্রীকে অমূল্য দেখেনি। বেলেঘাটার নতুন বাড়িতে গিয়ে বাসু বিয়ে করেছিল। রেখাকে বাসু দেখেছে। একদিন না অনেক দিনই দেখেছে। এমন একটা দিন গেছে যখন বাসু দু বেলাই অমূল্যদের বাড়িতে আসত। পাশাপাশি বাড়ি। ছেলেবেলায় তো আসতই। মাঝখানে আসাটা একটু কমে গিয়েছিল। তারপর অমূল্যর বিয়ের পর খুব কদিন বাসু তাদের বাড়িতে আসতে আরম্ভ করেছিল।

'তোর হেলেমেয়ে কটি একটু ইতস্তত করে অমূল্য প্রশ্ন করল।

'কটি মানে?' বাসুর চোখ কপালে উঠল। 'একটি, তা-ও অনেক কষ্টে মুন্নিকে রাজী করিয়েছিলাম। তোর?'

অমূল্য হাতের তিনটি আঙুল শূন্যে তুলে ধরল। মুখে বলল। 'থ্রি।'

'সে কি রে!' বাসু টেবিলের কোণাটা শক্ত করে চেপে ধরল। 'তিন তিনটি এর মধ্যে করে ফেলেছিলস? অ্যাঁ, তুই কি মানুষ না আর কিছু?'

একটু আগের লজ্জুক হাসিটা অমূল্যর ঠোঁটে উঁকি দিল। তালুর সঙ্গে জিভ ঠেকিয়ে বাসু কেমন একটা শব্দ করল। তারপর হাসল।

'আমি তো মোটে একটি দেখে গিয়েছিলাম, তোদের একটি সন্তান জন্মতাম।' বাসুদেব বিড়বিড় করে উঠল।

'হুঁ,' সিগারেটের ছাই ঝেড়ে অমূল্য বলল, 'এই নিয়েই তো আমাদের অশান্তি যাচ্ছে—রেখা আমার চুল ছিঁড়তে বাকি রাখছে। কতদিন এই নিয়ে যুদ্ধ—এ'টাকে খাওয়াতে পার না, তিনটাকে নিয়ে এসেছ—'

'বলবেই তো, বলা উচিত—তোর যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকত—দাঁড়া—'

বয় ছুটে গিয়ে বিল নিয়ে এল।

বাসুদেব পকেট থেকে টাকা বের করে বিল মিটিয়ে দিল। এবার সে অমূল্যর দিকে চোখ ফেরাল। 'আয়, ওঠা যাক।'

দুজন রাস্তায় নেমে এল।

'তুই কি সোজা বাড়ি যাচ্ছিস?'

'না, হ্যারিসন রোডে এক উকিলের বাড়ি যেতে হবে।'

'তার মানে?' বাসু ভুরু কুঁচকাল। 'তোর আবার কি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা বেধে গেল?'

'মামলা-মোকদ্দমা না। ছুটির পরে ঘণ্টা দুই উকিলমশায়ের বৈঠকখানায় গিয়ে বসতে হয়। কিছু কাগজপত্র টাইপ করে দেই।'

'একস্ট্রা চাকরি?' বাসু মৃদু হাসল।

'তাছাড়া উপায় কি।' অমূল্য বিড়বিড় করে উত্তর করল।

'আজ ওটা বাদ দে—তোকে নিয়ে এক জায়গায় যাব এখন। এই ট্যাক্সি—' যেন বরাতগুণে তখনি একটা ট্যাক্সি এসে গেল।

'কোথায় যাবি?'

'আয় না শালা—' অমূল্য সবশা তখনই বুঝে গিয়েছিল। বাসু তাকে হাত ধরে টানতে টানতে ট্যাক্সির দরজার কাছে নিয়ে গেল। অমূল্য আর আপত্তি করল না। দুজন ভিতরে উঠে বসল।

'গ্যালাক্সি।' বাসুদেব একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করল। ট্যাক্সিওয়ালা ঘাড় কাত করে গাড়ি নিয়ে ছুটল।

'এখনো ছাড়তে পারিস নি।' অমূল্য আস্তে বলল।

'এখন আরো বেড়ে গেছে।'

অমূল্য চুপ। এই বাসুদেবই একদিন তাকে মদের হাতেখড়ি দিয়েছিল। দুজনে মিলে মাঝে মাঝে বার-এ গেছে। পয়সা বাসুই দিত। সেটা অবশ্য অমূল্যর বিয়ের আগেই আরম্ভ হয়েছিল। গোলমাল বাধল তার বিয়ের পরে। রেখা প্রথম দু-একদিন টের পায় নি। একটা ওষুধ ওষুধ গন্ধ পেত অমূল্যর মুখে—এই পর্যন্ত। কিন্তু পরে

একদিন সে বুঝে গেল। চালাক মেয়ে। তারপর আর কি—যেদিনই মদ খেয়ে অমূল্য বাড়ি ফিরেছে, সেদিনই তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে দিত সে। তার মদের দোসরটা কে—এত টাকাই বা কে দিচ্ছে বুঝতে, সাত-পাঁচ ভাবতে হল না রেখার।

তখন থেকে বাসুর ওপর রেখা বজ্রহস্ত। বাসুদেব বাড়িতে ঢুকলেই সে লাফালাফি সুরু করত। অবশ্য বাসুর সামনে না।

বাসু চলে যাবার পর রেখা তার সম্পর্কে যে কী না বলত। একটা লোফার, একটা পাকা বদমায়েশের সঙ্গে অমূল্যর বন্ধুত্ব।

আগে আগে রেখা বাসুর সামনে এসেছে—কিন্তু যেদিন থেকে সে টের পেয়ে গেল অমূল্যকে সে মদ খাওয়াতে নিয়ে যায় সেদিন থেকে রেখা অমূল্যর বন্ধুটির সামনে আসত না।

অবশ্য রেখার রাগ অভিমান কান্না-কাটি লম্ফঝম্ফ উত্তরোত্তর বাড়ছিল বলে অমূল্য বাসুদেবের সঙ্গে বার-এ যাওয়া কমিয়ে দিতে আরম্ভ করল। এবং কমাতে কমাতে শেষটায় দুমাস চারমাস পর এক আধাদিনে গিয়ে ঠেকেছিল।

কিন্তু তা-ও রেখা সহ্য করত না।

রেখা চাইছিল বাসুদেবের সংস্রব অমূল্য একেবারে ত্যাগ করুক।

যেন তখন মদ খাওয়ার চেয়েও বাসুর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব রেখে চলাটাই রেখার চোখে বেশি অপরাধের হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

একদিন রেখা এমন একটা বিশ্রী কাণ্ড করে বসল। অমূল্যর ঘরে বসে বাসু গল্প করছিল। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রেখা বাসুকে শুনিয়ে শুনিয়ে পরিষ্কার বলল, লোফারটা আবার এসেছে, এখনি চা করতে হবে—আমার আর ভাল লাগে না। এমনভাবে রেখা বলছিল যেন তাদের আড়াই বছরের মেয়েটির সঙ্গে সে কথা বলছিল। যেন লোফারটাকে চা তৈরী করে দিতে হবে এই রাগে মেয়েটার গালে জোরে সে চড় বসিয়ে দিয়েছিল। ভ্যাঁ করে মেয়েটা কেঁদে উঠেছিল।

ভাগ্যিস মেয়েটা কাঁদছিল। তারপর বকবক করে রেখা আরো কি সব বলছিল এ ঘর থেকে শোনা যায় নি।

কিন্তু মেয়ে কেঁদে ওঠার আগে স্ত্রীর যে দুটো কথা অমূল্যর কানে এসে পৌঁছেছিল তা-ই যথেষ্ট। অমূল্যর মুখটা লাল হয়ে গিয়েছিল। বাসু কিন্তু, যেন জিনিসটা সে বুঝতে পারে নি, এমন চেহারা করে সিগারেট টানতে টানতে দিব্যি স্বাভাবিক গলায় কথা বলে চলেছিল।

কিন্তু বাসু ঠিক বুঝতে পেরেছিল। কেননা তারপর আর একদিনও অমূল্যদের বাড়িতে সে আসে নি।

অমূল্যও আর বাসুর খোঁজখবর বড় একটা রাখত না। রেখার ভয়েই রাখত না।

এর ঠিক মাস দুই পরে বাসুদেব তার মাকে নিয়ে তাদের বেলেঘাটার নতুন বাড়িতে উঠে যায়।

বাসু নেই, তারপর অমূল্য কি আর কোনোদিন মদ খায় নি। খেয়েছে। অত্যন্ত সতর্কভাবে খেয়েছে। সুযোগ বুঝে, বিলিতি খাবার তো পয়সা ছিল না, তাই দু দুবার বাচ্চা হবার সময় রেখা যখন হাসপাতালে গেছে, সেই দু-তিনদিন অমূল্য খানিকটা করে দেশী মদ খেয়েছে। কিন্তু এই জিনিস তার ভাল লাগত না।

কাজেই বাসু নারকেলডাঙ্গা ছেড়ে চলে যাবার পর রেখার দু দুবার হাসপাতালে যাওয়ার ঐ দু-তিনদিন ছাড়া এই তিন বছর সাড়ে তিন বছরের মধ্যে অমূল্যর আর মদ খাওয়া হয় নি।

আজ হঠাৎ বাসুর সঙ্গে একটা দামী বার-এ মদ খেতে যাচ্ছে। কথাটা চিন্তা করে তিন বছর সাড়ে তিন বছর আগের সব কথা অমূল্যর মনে পড়ল। তাছাড়া বাসুকে অপমান করার জন্য মেয়ের ওপর রেগে গিয়ে রেখা সেদিন দরজার ওপারে দাঁড়িয়ে, যে কথাগুলি বলেছিল বিশেষ করে সেই ঘটনাটা মনে পড়তে অমূল্যর এত লজ্জা করছিল। এতক্ষণ চায়ের দোকানে বসে এই জিনিসটা তার একবারও মনে পড়ে নি। ট্যাক্সিতে বসে এই বাসুদেবের মুখে 'গ্যালাক্সি' শব্দটা শোনার পর সেদিনের সমস্ত ছবিটাই যেন অমূল্যর চোখের সামনে ভেসে উঠল।

কিন্তু আবার এই ভেবেও অমূল্যর অবাক লাগছিল, রেখা সম্পর্কে বাসুদেব যে সুরে কথা বলছিল, যে কোনো মানুষের মনে হতে পারত, যেন রেখার জন্য তার এই বন্ধুটির সমবেদনার অন্ত ছিল না।

তার একটু বিবেচনা করে চলা উচিত, এর মধ্যে আরো দুটো বাচ্চা—শুনে সত্যি এত খারাপ লাগছে।'

'আরে না', অমূল্য তাড়াতাড়ি বলল, 'তারপর থেকে আমি প্রিকশন নিচ্ছি।' একটু থেমে থেকে অমূল্য আবার বলল, 'সত্যি, যা দুর্দিন, রেখা ঠিক কথাই বলেছে, একটাকেও ভাল করে খেতে দিতে পারছি না, তার ওপর আবার দুটো—'

আমি খেতে দেওয়া না দেওয়ার কথা ভাবছি না, হু, সে তো আছেই—কিন্তু যে জিনিসটা আমাদের পুরুষদের সকলেরই বিবেচনা করা উচিত, এদিক থেকে মুন্নি কড়া হয়ে ভালই হয়েছে, তোর ওয়াইফের একটু কড়া হওয়া উচিত ছিল, পুরুষ তেমন কড়া হতে পারে না। মুন্নির পাল্লায় পড়ে আমাকেও কড়া হতে হয়েছে। যাক গে—যা বলছিলাম, এই দুর্দিনের বাজারে খাওয়া পরার সমস্যা তো আছেই—কিন্তু দুঃখ লাগছে তোর স্ত্রীর জন্য—একটা ঝি চাকরও নেই তোদের—একলা মানুষ বেচারা। সারাদিন সংসারের খাটুনি তো রয়েছেই, তার ওপর তিন তিনটে শিশুকে সামাল দিয়ে চলা কি চাট্টিখানি কথা।'

'সত্যি।' অমূল্য বিড়বিড় করে উঠল।

'তুই তো সারাদিন বাইরে বাইরে থাকিস।' বাসুদেব বলল। অমূল্য ঘাড় কাত করল।

'যা বলেছিস, এদিক থেকে রেখার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমি আর কতক্ষণ বাড়িতে থাকতে পারি—কতটা সময়ই বা বাচ্চা-গুলোকে দেখি।'

'গ্যালাক্সির' বহুবর্ণ আলোর বিজ্ঞাপন চোখের সামনে ঝলসে উঠল। বাসুদেব চুপ করে গেল। ট্যাক্সিটা 'গ্যালাক্সির' দরজা ঘেঁষে দাঁড়াল।

বাসুদেব আগে নামল।

অমূল্য পিছনে।

'একদিন আয় না আমাদের বাড়ি।' অমূল্য হঠাৎ বলে ফেলল।

আশ্চর্য, বাসুদেবও সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'কদিন ধরেই আমি ভাবছি, একবার নারকেলডাঙ্গা যাব, তোর ওয়াইফকে অনেক-দিন দেখি না। তোর বড় মেয়েটার বয়স কত হল যেন ?'

'মিঠুর ? ছয়ে পড়ল।' গ্যালাক্সির সিঁড়ি বেয়ে বাসুর সঙ্গে অমূল্য দোতলায় উঠছিল। হঠাৎ যেন সে দাঁড়িয়ে পড়তে চেয়েছিল। হঠাৎ যেন তার দু কান লাল হয়ে গরম হয়ে উঠতে চেয়েছিল।

তারপর মনে হচ্ছিল, কেবল তাকে বার-এ টেনে এনে মদ খাওয়াত বলে বাসু-দেবের ওপর রেখার রাগ ছিল না, কেবল ঐ একটা কারণের জন্য রেখা তার স্বামীর এই বন্ধুটিকে লোফার বলত না, বদমায়েশ বলত না।

নিশ্চয় আরো কোনো গূঢ় কারণ ছিল।

যে জন্য, যে কারণে, অমূল্যদের বাড়ি আসা বাসুর বন্ধ করতে রেখা একদিন দরজার ওপার থেকে গালিগালাজ করে তাকে অপমান করেছিল। তা না হলে এতবড় অপমানটা বাসুদেবই বা ভুলে যায় কি করে।

অপমান হওয়া সত্ত্বেও রেখাকে সে দেখতে চাইছে।

ভয়ঙ্কর অবাক হতে গিয়ে এবং সেই সঙ্গে অতিমাত্রায় বিব্রত হয়ে পড়তে গিয়ে অমূল্য ঠোঁট টিপে টিপে হাসছিল, যেন এমন জায়গায়, এমন সময়ে একমাত্র এভাবে হাসা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

কোনোরকমে চা খেয়ে গোকুলবাবু বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

সেই রাত থেকে তাদের স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া আরম্ভ হয়েছে। ঝগড়ার জের এখনও চলছে।

কেনই যে সে এসব ছাই ভস্ম গিলতে যায়—নিজের পয়সায় খায় না বটে, যে পয়সা সে রোজগার করে তার সবটাই তার স্ত্রীর হাতে তুলে দিতে হয়। বেখা খুব কড়া মেয়ে। একটা নয়া পয়সারও হিসাব রাখে। কাজেই কোনো বন্ধুবান্ধব গোছের মানুষের পাল্লায় পড়ে যে অমূল্য রাত্রে খেয়ে এসেছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। যেমন আগে প্রতাপ রায়ের ছেলে বাসুদেবের সঙ্গে কদিন সে খেতে আরম্ভ করেছিল। বাসুদেব এখন নেই। হয়তো অন্য কোনো বন্ধু কাল জুটে গিয়েছিল। কিন্তু গোকুলবাবু ভেবে পান না, রেখা যেখানে রাতদিন সংসারের পাঁচটা অভাব অসুবিধা নিয়ে স্বামীকে মুখ করছে সেখানে অমূল্য কোন্ সাহসে মদ খেয়ে বাড়ি ফেরে।

গোকুলবাবু ভালতেও নেই মন্দতেও নেই। নিজে যখন উপায় করেন না, ছেলের রোজগারের ওপর খেতে হয়, সেখানে তিনি ছেলেকেও কিছু বলতে পারেন না, বৌমাকেও না। চুপ করে থাকেন।

অবশ্য কতগুলি ব্যাপারে রেখার বাড়াবাড়িটা অসহ্য মনে হয়।

কাল তো তিনি তাঁর ঘরে বসে শুনলেন শ্রীমতী গেলাস বাটি ছোঁড়া ছুঁড়ি করছিল, যেন কিলচাপড়ের শব্দও তাঁর কানে এসেছিল।

অমূল্যটা একটু বোকা। আসলে ও বৌ-ন্যাটা।

হুঁ, তিনি বেশ টের পান রেখা তাকে মারধোর পর্যন্ত করে। আর ভেড়াটা চুপ করে থাকে। না হয় কাল একটু খেয়ে এসেছিল—এই বয়সে সব পুরুষই একটু এদিক সেদিক করে। দেখতে হবে যে জিনিসটা তার নেশায় দাঁড়িয়েছে কিনা। না, অমূল্যর সে ধরণের নেশা নেই—উদয়াস্ত সে এই সংসারের জন্য খাটছে—সারাদিন একটা অফিসে খেটে আবার আর এক জায়গায় গিয়ে কাজ করে আসছে। স্ত্রীর জন্য ছেলেমেয়েদের জন্যই তো এত পরিশ্রম তাকে করতে হচ্ছে। কাজেই এক আধদিন যদি একটু—

মানুষের মন। একটু আমোদ ফূর্তি একটু বিশ্রাম সে আকাঙ্খা করে বৈকি।

কিন্তু রেখা সেটা সহ্য করবে না। আসলে পুরুষের ক্ষোভ তার জ্বালা, তার মনস্তাপটা যে কোথায় গোকুলবাবু কি আর বোঝেন না। যথেষ্ট বয়স হয়েছে।

রেখা আশা করেছিল স্বামী তার খুব একটা বড়লোক হবে, অঢেল অর্থ উপার্জন করবে, বাড়ি হবে, গাড়ি হবে, দু' পাঁচটা ঝি চাকর থাকবে।

কিন্তু মানুষ কি চাইলেই সব পায়। ভাগ্য যদি অনুকূল না থাকে—এই নিয়ে সারাজীবন মাথা কুটলেও কিছু হবে না।

হয়তো টাইপ করার মতন, বেয়ারাগিরি করার মতন লেখাপড়াই তাকে শিখিয়েছিলেন গোকুলবাবু। কাজেই ক্ষমতা অক্ষমতাটা সেদিক দিয়েও বেমানান করতে হবে বৈকি।

না হয় সে অক্ষমই। সংসারে সবাই কিন্তু সক্ষম হতে পারে না। ঈশ্বর সকলকে এক-রকম মগজ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠান না। কিন্তু দেখতে হবে সে পরিশ্রম করছে কি না। তার খাটুনির মধ্যে আন্তরিকতা আছে কিনা। নিষ্ঠা আছে কিনা। সেদিক থেকে অমূল্যর বিন্দুমাত্র ত্রুটি আছে বলে কায়ো মনে করা উচিত নয়।

হুঁ, বেচারা উদয়াস্ত খাটছে। কিন্তু তার খাটুনির উপযুক্ত মূল্য সে পাচ্ছে না। সুযোগ-বাদী লোকেরা তাকে খাটাচ্ছে, খাটিয়ে তার ন্যায্য পারিশ্রমিক তাকে দিচ্ছে না। এখানেই তো রাষ্ট্রের অব্যবস্থা, সমাজের দুর্নীতি। ধন-বৈষম্যটা আসছে কোথা থেকে।

এতসব বুঝবার, বিচার করবার ক্ষমতা রেখার অবশ্য নেই। তাই স্বামীকে সে চব্বিশ ঘণ্টা গালিগালাজ করছে, অপদার্থ অকর্মন্য ইত্যাদি কত কি বলছে।

ঐ যে, দিন বদলে গেছে, তা না হলে এই গোকুলবাবু, তিনি নিজে সারাজীবন একটা কাগজের অফিসে পড়ে থেকে প্রুফ দেখলেন। কর্ত তার উপার্জন ছিল? কিন্তু তাঁর এই সামান্য আয় নিয়ে কোনোদিন তিনি অমূল্যর মাকে মনস্তাপ করতে, কপাল চাপড়াতে দেখেন নি। স্বামী যা ঘরে আনত তাই নিয়ে সে সন্তুষ্টই থাকত। কোনোদিন ভুলেও সে স্বামীকে মুখ করে নি।

আর আজ অমূল্যর কী অবস্থা!

কথাটা গোকুলবাবু প্রায়ই চিন্তা করেন। এই যে নিরন্তর রেখার মনে ক্ষোভ অসন্তোষ, অতৃপ্তি জাগছে, এটা এই যুগের ব্যধিও একটা। তার কারণও আছে। ধন-বৈষম্যটা এত বেড়ে গেছে, অসমতাটা সমাজে এত ছড়িয়ে পড়েছে। কালো টাকার জোরে হোক কি চাতুরীর গুণে হোক তোমার পাশের মানুষগুলি হুট-হাট বাড়ি করছে, গাড়ি করছে, দামী আসবাব ব্যবহার করছে, ভাল ভাল জামাকাপড় পরছে, ভাল খাচ্ছে, আর তাই দেখে চব্বিশ ঘণ্টা তোমার অন্তর্দাহ মর্মজ্বালা।

গোকুলবাবুর আমলে কি ধনী গরীব ছিল না। ছিল। কিন্তু এতটা যেন ছিল না। তখন মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পয়সা ছিল, বিত্তবান বলতে শ'য়ে হয়তো একটি ছিল, আরো কম, হাজারে একটি।

এখন 'আছের দলটাও যেন 'নেই দলের' মতন ভাবি হয়ে উঠছে। পা বাড়ালেই যেন তুমি গরীবের দেখা পাচ্ছ, তেমনি পা বাড়াতে ধনীও তোমার সামনে পড়ছে। বিশেষ করে এই শহর অঞ্চলে।

কাজেই সংখ্যায় দিন দিন দুটো দলই পাল্লা দিয়ে বেড়ে যাচ্ছে। ফলে ঈর্ষা, হিংসা, অসন্তোষ, কলহ।

শ্যামবাজার সামলদার ছিল, কাজেই তার পুত্র জমিদারি চলে চলবে, তার পৌত্র-প্রপৌত্রও সেই সুখভোগের অধিকারী হবে। এই নিয়ে দুঃখ করার, হিংসা করার কিছু নেই।

রাজার ছেলে রাজা হবে, আবার যখন ছেলে হবে তখনও সে রাজাই থেকে যাবে—এই নিয়ে ঈর্ষা করার কিছু নেই। মানুষ ঈর্ষাই করত না।

কিন্তু যেখানে সুখেন গায়েনের বাবা গামছা ফেরি করে অতি কষ্টে পেট চালাত, সেখানে সুখের চারতলা বাড়ি হাঁকছে, গাড়ি চড়ে বেড়াচ্ছে, কাজেই চারদিকে ঈর্ষার, হিংসার ছড়াছড়ি।

সুখেনের ছেলে পারছে, তুমি পারছ না কেন। সুখেনের ছেলেও তেমন একটা লেখা-পড়া শেখে নি, যা করেছে সে তার সাধারণ বুদ্ধির জোরে, ক্ষমতার জোরেই করেছে। কাজেই সেই বুদ্ধি সেই ক্ষমতা তোমার নেই কেন অমূল্য—

না, রেখা বুঝবে না, যে বুদ্ধিকে সে বুদ্ধি বলে ধরে নিচ্ছে, যে ক্ষমতাকে সে ক্ষমতা বলে মেনে নিচ্ছে তার উৎসাহটা কোথায়।

সেই ধরনের বুদ্ধি, সেই জাতের ক্ষমতা অমূল্যর নেই। চালাকি করতে সে শেখে নি, দুর্নীতি কাকে বলে সে জানে না।

সকালে ঘুমের থেকে উঠে গোকুলবাবু দরজা খুলেই তার ঘরের সামনে খালি বারান্দায় অমূল্যকে বালিশের অভাবে একটা হাতের ওপর মাথা রেখে ঘুমোতে দেখেছিলেন।

তখনই তিনি বুঝে নিয়েছিলেন, রাত্রে রেখা তাকে ঘরে শুতে দেয় নি। অথবা এমন গালিগালাজ অপমান করা হয়েছিল তাকে, শেষ পর্যন্ত আর ঘরের বিছানায় না শুয়ে অভিমান করে অমূল্য বারান্দার খালি সিমেন্টের ওপর এসে আশ্রয় নিয়েছিল।

ছেলের এই দুরবস্থা দেখে এত কষ্ট হয়েছিল গোকুলবাবুর। এবং যেন তখন অমূল্যর ওপরে তাঁর পাল্টা রাগ হয়েছিল। এমন মানুষের এই হয়, তিনি মনে মনে বলে-ছিলেন, যে পুরুষ স্ত্রীর দাবীই মেনে নেয় তাকে চিরকাল দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এসব ক্ষেত্রে পুরুষকে নির্মম হতে হবে নিষ্ঠুর হতে হবে বিদ্রোহী হতে হবে।

কিন্তু অমূল্য বুঝি কোনোদিনই তা হতে পারবে না।

সব দেখে শুনে খুবই অস্বস্তি লাগছিল। কোনোরকমে চা-টুকু গলাস ঢেলে গোকুলবাবু তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন।

গোকুলবাবুর ডাইনে বাঁয়ে দু দুটো হচ্ছে

এত খবরকাগজ সাইকেলের হ্যাণ্ডেলবারে বেঁধে নিয়ে সোঁ সোঁ করে বেরিয়ে গেল।

তিস্তার জল আজ কতটা হ্রাস পেল কে জানে। ইন্দিরা গান্ধীর কলকাতা আসার তারিখ পাকাপাকি হল কি। মঙ্গলগ্রহের নতুন কোনো তথ্য জানা গেল কিনা কে বলবে। আরব-ইস্রাইলের সংঘর্ষটা কতদূর গড়াবে কে জানে।

হাতের কাছে খবরকাগজ নেই। কাজেই দেশ-বিদেশের খবরগুলি অন্ধকার ঘুঁটি চালবার মতন মগজের মধ্যে চালতে চালতে গোকুলবাবু আজ আবার প্রহ্লাদের চায়ের দোকানে গিয়ে বসবেন কিনা চিন্তা করছিলেন।

দোকানটা নিরিবিলি। কিন্তু ঐ যে তিনটি মস্তানের সঙ্গে ঠিক ওখানেই দেখা হয়ে গেল কাল।

আজও যে ওরা বসে না আছে কে বলবে।

হয়তো রাধু গুণ্ডাও দোকানে বসে আছে। কাগজখানা মন দিয়ে পড়ছে। অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে গোকুলবাবু হাঁটছিলেন।

আশ্বিনের বোদ হাসছে। আকাশটা বড় সুন্দর। এখনও হাওয়ায় হিমের আমেজ লেগে আছে। একটু পরেই রোদ চড়ে যাবে। ঠাণ্ডাটুকু আর থাকবে না।

গোকুলবাবু পার্কে ঢুকলেন না। ফ্ল্যাট বাড়িগুলি বাঁয়ে রেখে পার্কের লাগোয়া বাঁধান সড়কটা ধরে তিনি যেন শেষ পর্যন্ত প্রহ্লাদের দোকানের দিকেই হাঁটছিলেন। অন্তত কাগজের হেডিংগুলির ওপর তো চোখ বুলিয়ে আসা যাবে। আর মস্তানের দলটা যদি না থাকে তবে তো কথাই নেই। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব খবর তিনি পড়ে আসবেন।

দশ নয়া এক ভাঁড় চা তেমন কিছু না। এক কপি কাগজ কিনতে গেলেও আঠারো নয়া।

কাজেই চায়ের জন্য যখন পয়সা দিতে হবে, কাগজটা একবার হাতে পেলে কর্মখালি টেণ্ডারের বিজ্ঞাপন থেকে আরম্ভ করে একেবারে শেষ পৃষ্ঠার ছোটদের পাততাড়ি পর্যন্ত কোনো খবর কোনো লেখাই তিনি পড়তে বাদ দেবেন না। এখন আর বাড়িতে কাগজ রাখা হয় না, তাই তাঁর কাগজ পড়ার ক্ষুধাটা যেন শতগুণে বেড়ে গেছে। কথায় আছে না—দরিদ্রের সংসারে ক্ষুধার আগুন জ্বলে বেশি। এ-ও অনেকটা তাই। চিন্তা করে গোকুল মনে মনে হাসলেন।

ফ্ল্যাট বাড়িগুলি শেষ হয়েই ছোট ছিমছাম একটা মাঠ। মাঠের ওপর তেঁতুল গাছ।

দুপুরে বেলা ধোপারা এখানে দড়ি টানিয়ে কাপড় শুকোয়।

কিন্তু এই সকালে সেসব ঝামেলাই নেই। তাড়াতাড়ি প্রহ্লাদের দোকানে পৌঁছান যাবে চিন্তা করে উনি মাঠ কোণাকুণি ছুটছিলেন। তেঁতুল গাছটার কাছে এসে থমকে দাঁড়ালেন।

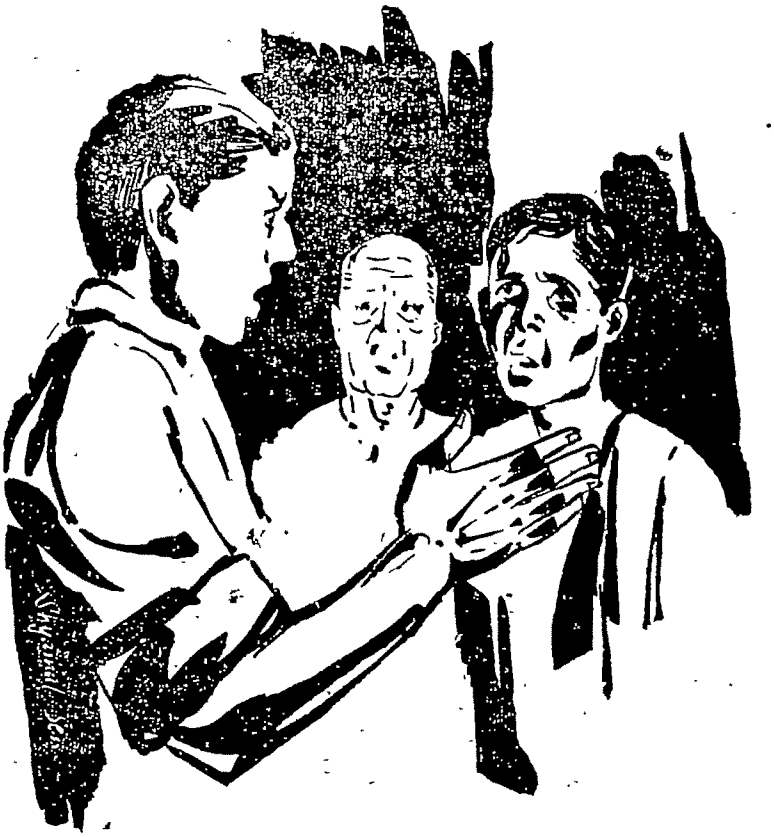

মস্তা মেরে তোর ঘাড়ের শলা ভেঙ্গে দেব

গাছতলায় বসা লোকটা তাঁকে দেখে হেসে ফেলল। বেশবাস দেখে গোকুলবাবুর মনে হল ভিক্ষুক-টিক্ষুক হবে। পাগলও হতে পারে।

এক ফালি ন্যাকড়া শুধু কোমরে জড়ান। সারা গায়ে আর সুতোর চিহ্নটি নেই। পাকান বড় বড় চুল। চোখ দুটো কা।

বি লেও চোখের মনি দুটো কেমন বে জ্বলছে। তেমনি, যখন মানুষটা হাসল, গোকুলবাবু তার উজ্জ্বল ঝকঝকে দাঁতের চেহারা দেখে বিস্মিত হলেন।

দাঁত চোখ সব ঠিক আছে। শরীরটা জীর্ণ হয়ে গেছে। বুকের হাড়গুলি গোনা যায়। যেন ক্রমাগত রোদ বৃষ্টি হিম লেগে গায়ের চামড়া কুঁচকে কালো রং ধরেছে। আর তেল-জল না পড়ে মাথায় চুলের ঐ দশা।

'হাসছিলে কেন?' গোকুলবাবু নিজেও একটু হাসলেন।

কিন্তু গাছতলার মানুষটা তখনই তাঁর কথার উত্তর দিল না। আকাশের দিকে চোখ রেখে হা-হা করে খানিকটা হাসল। তারপর চোখ নামিয়ে বলল, 'বুড়োকর্তাকে দেখে হাসছি।' পাগল সন্দেহ নেই, গোকুলবাবু মনে মনে বললেন।

'এই কোথায় থাকিস তুই, তোকে তো এ পাড়ায় দেখিনি।' গোকুলবাবু আর না হেসে কড়া সুরে প্রশ্ন করলেন।

'আমি নতুন এসেছি কর্তা।' জ্বলজ্বলে চোখ দুটো গোকুলবাবুর মুখের ওপর মেলে ধরে লোকটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।

'অবাক হচ্ছেন কর্তা?' গোকুলবাবু চুপ করে আছেন দেখে লোকটা জোরে মাথা ঝাঁকাল, থুতনি নাড়ল।

'না, অবাক হবার আছে কি।' এবার গোকুলবাবুও মাথা ঝাঁকালেন। নিজের মনে বললেন, এই তল্লাটে নতুন নতুন বাড়ি হয়েছে, নতুন সব বড় মানুষরা এসেছেন, নতুন নতুন গাড়ি রাস্তায় ছুটোছুটি করছে, তোমার মত একটি নতুন মুখ আমদানী হবে এ আর বিচিত্র কি। 'তা আমায় দেখে তোর হাসি পেল কেন?'

'কর্তা যেমন হন হন করে ছুটে যাচ্ছিলেন মনে হল যেন টেরেন ধরবেন।'

'দূর পাগলা, এ যুগে কি আর ট্রেন ধরতে মানুষ তাড়িঘড়ি করে ছোটে।' সারা সকাল মনটা তার ছিল, এই যেন একটু হালকা হবার জন্য গোকুলবাবু পাগলের সঙ্গে রগড়ে আলাপ জুড়ে দিলেন। 'শীগগির চাঁদে যাবার মঙ্গলে যাবার রকেট চালু হচ্ছে। রকেট ধরতে মানুষ এভাবে ছুটবে।'

'কর্তার রকেট বুঝি তৈরী হয়ে গেছে?'

'হুঁ, আমার রকেট পেহ্লাদের চায়ের

দোকানে পৌঁছে গেছে। পেহ্লাদের দোকান চিনিস?'

'চিনি।' এক সেকেণ্ড গোকুলবাবুর মুখের দিকে চেয়ে থেকে গাছতলার মানুষটা কিছু যেন ভাবল। তারপর সাদা ঝকঝকে দাঁতগুলি ছড়িয়ে দিয়ে হা-হা করে হাসল।

'এবার আমি বুঝে গেছি, এখন আমি ধরে ফেলেছি।'

'কি বুঝে গেছিস শুনি!' গোকুলবাবু মিটিমিটি হাসছিলেন।

'চায়ের দোকানে সকালের খবরকাগজ খানা পৌঁছে গেছে। কাগজের রকেটে চড়ে কর্তা দিল্লী-মস্কো আন্দিস আবাবা বেড়াতে যাচ্ছেন।'

'সাবাস! গোকুলবাবু খুশি হলেন, অবাকও হলেন কম না। লোকটা যেন শিক্ষিত, আধুনিক যুগের বুদ্ধিজীবি, মানুষ, হয়তো কপালের ফেরে গাছতলায় এসে ঠাঁই নিয়েছে।

'এ্যাদ্দিন তুই ছিলি কোথায়?'

'ঐ যে—আকাশের দিকে আঙুল তুলে দেখাল লোকটি। 'ওখানে ছিলাম।'

গোকুলবাবু বুঝতে পারলেন আকাশ বলতে উঁচু বাড়ি-টাড়ি কিছু বলতে চাইছে সে। হয়তো এককালে সুখেই ছিল। অবস্থা-বিপাকে ভাল ছিল।

'তা ধপাস করে মাটিতে ছিটকে পড়া হল কবে?' গোকুলবাবু ভুরু কুঁচকোলেন।

'সে তো আমার আর জন্মের কথা কর্তা সব কি মনে টনে আছে।'

লোকটা টেনে টেনে হাসল। 'মাটিতে খসে পড়ার তারিখটা স্রেফ ভুলে গেছি।'

'তা আর জন্মই বলুক আর দু চার পাঁচ বছর আগের কথাই বলুক, মানুষটার বয়স যে বেশি হয় নি দাঁত ও চোখ দেখে গোকুলবাবু তার প্রমাণ পাচ্ছিলেন, কেবল চামড়াটা বুঁড়িয়ে গেছে, শরীরটা জীর্ণ হয়ে গেছে।

'তা এখানে লাগছে কেমন, এই নতুন আস্তানায়?'

'আহ চমৎকার, কেমন আমার ঘরের চাল দেখুন না।' আঙুল তুলে সে মাথার ওপর তেঁতুল গাছটা দেখাল। 'কেমন নরম আমার বিছানা খানা।' আঙুল নামিয়ে নিচের কচি দূর্বাঘাস দেখাল সে। বড় সুখে আছি গো বড়োকর্তা, পরমানন্দে আছি। আমি এখন রাজা।'

তাতো বটেই। গোকুলবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আনন্দটা মনের কাছে। রাজভোগও সময়ে তেতো ঠেকে, বিষের মতন মনে হয়, আবার পান্তাও এক সময় অমৃতের স্বাদ দেয়। চারতলার ঘরে যদি দম বন্ধ হয়ে আসে আর ঐ ঘরের খাট-পালঙ্কের বিছানা কাঁটা মনে হয়, গাছতলার মাঠের বিছানা ফুলশয্যার সুখ দেয়। মানুষের মনের অবস্থা কখন কি দাঁড়ায় কে বলতে পারে।

'কাল রাতে রাজার খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল কোথায়?'

'ঐ যে!' আঙুল দিয়ে সে দূরের একটা ভাঙা টোলখাওয়া প্রকাণ্ড টিনের ড্রাম দেখাল। ড্রামের ভিতর থেকে জঞ্জাল উপচে পড়ছে। ডিমের খোলা, মুরগির পালক, পাউরুটির মোড়ক, গুঁড়ি ভাঁড় কত কি চারপাশে ছড়িয়ে আছে। বোঝা গেল ওধারের বড় বড় বাড়ির ডাস্টবিন ওটা। সমস্ত এঁটো আবর্জনা ওখানে এনে ফেলা হয়। এই সাত সকালেই দুটো বেওয়ারিশ কুকুর এসে জুটেছে। ড্রামটার চারদিকে ঘুরে ঘুরে গন্ধ শুঁকছে। ঘনঘন লেজ নাড়ছে। যেন দুটিতেই আশা করছে এখনো ভাল করে খুঁজলে ওটার ভিতর থেকে মূল্যবান খাদ্য-টাদ্য টেনে বের করা যাবে।

গোকুলবাবু কতক্ষণ সেদিকে চোখ রেখে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর গাছতলার রাজাটির দিকে ঘাড় ফেরালেন।

'সকালে চা-টা কিছু হয়েছে?' সত্যিকার সহানুভূতির সুর জাগল গোকুলবাবুর গলায়।

মানুষটা হঠাৎ কথা বলছিল না। কেন গোকুলবাবু আর হাসছে না, মুখটি গম্ভীর করে ফেলেছে দেখে সে বিশেষ খুশি হল না। একটা ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে কান খোঁচাতে লাগল।

'কি হল রাজা, চা-টা হয়েছে?' গোকুলবাবু গলার সুরটা আগের চেয়েও নরম করে ফেললেন।

'যান তো কর্তা, যে পথে যাচ্ছিলেন চলে যান। আমার চা নিয়ে আপনাকে মাথা না ঘামালেও চলবে।' দাঁত মুখ খিচে মানুষটা ভেংচি কাটার মতন চেহারা করল। তারপর এক দলা থুথু ফেলল। যেন খুব রেগে গেছে গোকুলবাবুর ওপর। একটা ভয়ংকর তিক্ত বাজ ছিল তার কথায়।

স্বাভাবিক, গোকুলবাবু চিন্তা করলেন, কেবল মৌখিক সহানুভূতি দেখাচ্ছেন তিনি। তার দুরবস্থার জন্য তাকে তিনি একটু অনুকম্পা করেই কাজ শেষ করতে চাইছেন, সাধারণ ভিক্ষুক হলে এতটা চটত না, কিন্তু এই মানুষ যে সেই জাতের নয়। কথাবার্তা শুনে যা বোঝা যাচ্ছিল—শিক্ষিত মহলে কোনোদিন সে বাস করত, হয়তো ভাল ঘরের ছেলে, কাজেই এই যুগের শিক্ষিত ভদ্রলোকের যে কী তা তার ভাল জানা আছে। রাস্তার ভিক্ষুক দেখলে মুখে একটু সহানুভূতি জানিয়ে বা নিতান্তই কৃপা করে একটা দুটা পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে চলে যায়। তার বেশি কিছু তারা করে না। কৃপা এই দাক্ষিণ্য এই মানুষ ভাল চোখে দেখবে কেন

একটু ইস্তত করে গোকুলবাবু পকেট থেকে একটা দশ নয়া তুললেন।

'শোন ভাই।' এবার তিনি তুমি করে সম্বোধন করলেন। 'আমি পয়সা দিচ্ছি—তুমি চা খেও।'

'ভারি আমার দাতা রে।' লোকটা তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। দয়া করে আমায় চা খাওয়াচ্ছেন উনি—আগের চেয়েও বড় একটি ভেংচি কাটল সে এবং আর একদলা থুথু ছিটোল মাটিতে। 'যাও তো কর্তা—তোমার রাস্তায় তুমি যাও, আমাকে পয়সা দিতে হবে না।'

গোকুলবাবুর মুখটা কালো হয়ে গেল। তিনি আর দাঁড়ালেন না। পয়সাটা পকেটে চুকিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলেন।

ছেঁড়া জামা ছেঁড়া জুতো—তিনি আমায় দান করতে এসেছেন। আহা রে আমার দাতাকর্ণ।'

যেন গালে একটা চড় খেলেন গোকুলবাবু। কথাটা তিনি শুনলেন। কেন না চেঁচিয়ে লোকটা বলছিল।

এবং কথাটা সত্য। তাঁর শার্টের একটা ফিতে ছিঁড়ে গেছে। সুতো দিয়ে কোনো-রকমে বেঁধে নিয়ে কাজ চালাচ্ছেন। তাঁর জামার পিঠটা দু জায়গায় ছেঁড়া। অমূল্য দেখছে, বেবা দেখছে। দেখে তারা চুপ করে আছে। একটা নতুন জামা তৈরী করাতে গেলে কি কিনতে গেলেও কমপক্ষে আটটি টাকা।

গোকুলবাবুও উচ্চবাচ্য করছেন না। কেন না নতুন জামার কথা বলতে গেলে, আর কারো না, অমূল্যের ওপরই চাপ পড়বে। তিনি চাইছেন না অমূল্যকে চাপ দিতে।

বেচারা দু জায়গায় চাকরি করেও খরচের কূল কিনারা পাচ্ছে না।

সেজন্য রাতদিন বৌয়ের কিল খাচ্ছে। অথচ তার মুখে শব্দ নেই। যাকে বলে কিল খেয়ে কিল চুরি করছে অমূল্য।

তেঁতুলতলা পিছনে ফেলে মাত্র কয়েক পা এগিয়েছিলেন। হঠাৎ একটা চিৎকার শুনে গোকুলবাবু ঘাড় ফেরালেন।

লোকটা ঘাসের ওপর বসে পড়েছে। যেন প্রচণ্ড রাগ হয়, হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে, মাটিতে ঘুষি মারছে। আমি দয়ার পাত্র নই, কোনো শালার দান আমি নেই না, আমার জিনিস আমি ঠিক আদায় করব—ষোল আনা আদায় করব।'

যেভাবে সে চিৎকার করছিল আর ঘাসের ওপর পর পর ঘুষি চালাচ্ছিল, প্রহ্লাদের দোকানের সেই গোঁফওয়ালাকে মনে পড়ল গোকুলবাবুর। নাম নাকি রাবু—রাধাগুণ্ডা। এমন করে টেবিলে ঘুষি চালাচ্ছিল কাল। বলছিল, এই করে সমস্যার সমাধান করতে হয়।

গাছতলার এই মানুষটিও কি এভাবে সমস্যার সমাধান করবে। তাছাড়া ঘুষির অর্থ যে কেবল ঘুষি না। কাল রাধু দোকান থেকে বেরিয়ে যাবার পর মাস্তান ছোঁড়াগুলি

গোকুলবাবুকে তাই তো বুঝিয়েছিল। বোমা রিভলবার স্টেনগান টমিগান।

হয়তো তেঁতুলতলার এই রাজাও সেই অপেক্ষায় আছে। ভাস্টবিনের জঞ্জাল ঘেঁটে খাবার খুঁটে খেলে হবে কি। ভিতরে জেদ রাখে আগুন রাখে।

আগুন নেই অমূল্যের। আগুন নেই—আবার গামছা ফেরিওয়ালার ছেলে সুখেনের মতন চাতুর্যও জানে না।

জানে শুধু একটা অফিসে বসে সারাদিন টাইপ করতে। তারপর বাড়ি ফিরে বৌয়ের কানমলা খেতে। কানমলা খেয়ে চুপ করে থাকতে।

খাঁটি বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে।

রেন নিজের ওপর একটা ঘেন্না এল গোকুলবাবুর। কেন না তাঁর ঔরসে অমূল্যর জন্ম।

তিনিই তো সেই খাঁটি মধ্যবিত্ত।

দশ বছর কি পাঁচ বছর আগে হলেও এত ধিক্কার তাঁর মনে আসত না।

আজ যে চতুর্দিকে সাংঘাতিক প্রতিযোগীতা। কার আগে কে ছুটবে, কাকে মেরে কে খাবে। অমূল্য নিশ্চিন্ত মনে টাইপ করছে। আর তিনিও নিশ্চিন্ত মনে খবরকাগজ পড়ছেন। দিল্লীর খবর পড়ছেন, ইন্দিরার খবর পড়ছেন কোসিগিন পড়ছেন ভিয়েৎনাম্ পড়ছেন।

মাস্তানের দলটা কাল ঠিকই বলেছিল।

তার চেয়ে রাস্তার ভুট্টা বেচে লোকটাকে দাঁড়িয়ে দেখুন। ছাগলের মতন সারাদিন খবরকাগজ চিবিয়ে রাজনীতির রস গিলে কিছুই হবে না।

গোকুলবাবু প্রহ্লাদের দোকানের দিকে গেলেন না। অন্য রাস্তায় পা বাড়ালেন।

অমূল্য কিন্তু মনে মনে হাসে। যেদিন অফিসে টাইপরাইটার নিয়ে কাজ করতে বসেও হাসছিল। সত্যি সে বৌয়ের কিল খেয়েছিল রাত্রে। একটু রাগ করে নি, গরম হয়নি, অস্থির হয় নি। চুপ করে বাইরে বেরিয়ে এসে বারান্দায় শয্যা নিয়েছিল।

তার যে ধৈর্যের শেষ নেই।

যেমন অফিস থেকে বেরিয়ে ট্রাম বাস ধরতে না পেরে একটা স্টপ ছেড়ে আর একটা স্টপের দিকে ধৈর্য নিয়ে হাঁটে। সেখানে যদি কোনো গাড়ি ধরতে না পারে, আবার সামনের স্টপের দিকে বাদাম চিবোতে চিবোতে এগোয়।

সময় সময় বিরক্ত হয় ক্লান্ত হয়, কিন্তু হতাশ হয় না।

সে জানে যদি এই স্টপেও গাড়ি ধরতে না পারে আর একটা স্টপে পারবেই। সেখানেও সফল না হলে তার পরের স্টপে গিয়ে ঠিক গাড়ি ধরবে। মাঝ রাস্তায় কিছু পড়ে থাকবে না। লক্ষ্যে সে পৌঁছোবেই।

এককালে বাসুদেবের সঙ্গে সে মদ

লোফারটা আবার এসেছে, এখনি ফোন করতে হবে—আমার আর ভাল লাগে না।

খেত, বাড়ি ফিরে রেখার গালিগালাজ শুনত, কিল চড় খেত, তখন ধৈর্য ধরে কাঁদন সে চুপ করে রইল।

তারপর আবার একদিন বাসু চোখের ইশারা করতে তার সঙ্গে গিয়ে ইচ্ছামতন টেনে এল।

বাড়ি ফিরতেই আবার রেখার লম্ফঝম্ফ চোখ রাঙ্গানি ও শেষ পর্যন্ত প্রচুর চড়-চাপড় পুরস্কার পেল।

অমূল্য সব হজম করল এবং তারপর আবার কদিন খাওয়া বন্ধ রাখল।

এবার অনেকদিন বন্ধ রাখার পর কাল রাত্রে গলা পর্যন্ত খেয়ে বাড়ি ফিরেছিল।

হুঁ, তার বিবেক তাকে এই কথা বলে, তার ঈশ্বর সর্বদাই তাকে এই পরামর্শ দেয় —ধৈর্যই তার একমাত্র অস্ত্র। গোকুলবাবু মনস্তাপ করুক। সেদিকে মন রাখলে তার চলবে না। ধৈর্যের সঙ্গে সে দশটা-পাঁচটা টাইপিস্টের চাকরি করবে, আবার উকিলের বাড়ি গিয়েও খানিকক্ষণ কাজ করবে। ধৈর্যের সঙ্গে বাসুদেবের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলবে এবং দরকার হলে তার সঙ্গে বসে মদও খাবে।

এক বছর হয় নি, দু বছর হয় নি, চার পাঁচ ছ বছর পার হয়েছে, সাত বছর পুরতে চলল রেখাকে সে বিয়ে করেছে। তার এই সাত বছরের দাম্পত্য জীবনে সে কেবল বৌয়ের বকুনি খেয়েছে কানমলা খেয়েছে। কিন্তু কিছু করতে পারে নি। তবু সে ধৈর্য হারায় নি। সে জানে ধৈর্যই তার অস্ত্র।

সে জানে এমন একটা লজ্ঝড় অফিসের চাকার রেখে এবং এমন এক মদ্যপ বাসুদেবের সঙ্গে বন্ধুত্ব চলতে চলতে একদিন সে রেখার মন জয় করবে।

রেখার মন জয় করতে পারলে অর্ধেক ব্রহ্মাণ্ড জয় করা হয়ে গেল।

তখন একটা বাড়ি করতে কি গাড়ি করতে তার বেগ পেতে হবে না।

ধৈর্যই তার সমস্যার সমাধান করে দেবে। এইজন্য তাকে স্টেনগান ধরতে হবে না, রিভলবার ছুঁড়তে হবে না।

গোকুলবাবু যেমন দেখছেন, চারদিকে রেস আরম্ভ হয়েছে ঠিকই, অমূল্য পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। একদিন এই গোকুলবাবুই দেখবেন অমূল্য রেসে জিতে গেছে।

বেলা সাড়ে বারো পর্যন্ত অমূল্য ঘাড় গুঁজে খটাখট্ টাইপরাইটার চালিয়ে কাজ করে গেল। তারপর কাগজপত্র গুটিয়ে রেখে মেশিনে ঢাকনা পরিয়ে উঠে পড়ল। তারপর হাত মুখ ধুয়ে এসে টিফিনের কৌটো খুলে টিফিন খেতে বসল।

রাগারাগি করে রেখা আজ তার টিফিন তৈরী করে দেয় নি। পরটা ও আলু ভাজার পরিবর্তে কৌটোয় করে সে পাউরুটি ও

আঙুর তুলে দেখাল লোকটা।

চিনি নিয়ে এসেছিল। তৃপ্তির সঙ্গে তাই এখন আহার করল। তারপর পেট ভরে জল খেল। এবার রুমাল দিয়ে মুখটা মুছতে মুছতে মিটিমিটি একটা হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে বড়বাবুর টেবিলের কাছে চলে গেল।

বড়বাবু এ সময় আফিসে থাকেন না। বাইরে লাঞ্চ করতে যান। অমূল্য নিঃসঙ্কোচে টেলিফোন তুলে ডায়াল করে বাসুদেবকে ডাকল।

'কি ব্যাপার ?

'কিছুই না, হঠাৎ খেয়াল হল, তোকে ডাকলাম।'

'বৌ কাল তোকে কী বলল ?'

'সুখে গন্ধ নিয়ে বাড়ি ফিরলে যা ও চিরকাল বলে।'

'তুই কি আমার নাম করেছিলি ?'

'করেছি বৈকি। দু ঘণ্টার মধ্যে চল্লিশ টাকা বেরিয়ে গেল, এত ভাল জিনিস, তার সঙ্গে পেট ভরতি গরম গরম চিকেন পকৌড়ি—আমার সাধ্য কী এমন রাজসিক চলে ভিক্ষে করে বাড়ি ফেরা. কাজেই

'ওখানে ছিলাম।'

দোসরটির নাম বলতে হল।'

'তারপর ?' যেন বাসুদেবের গলাটা ঈষৎ কেঁপে উঠল। 'আমার মুণ্ডপাত করল না তোর বৌ ?'

'না রে।' অমূল্য তখনও মিটিমিটি হাসছিল। 'অনেকদিন পরে তো। আমাকেই বকল, দু একটা কিল চড়ও পিঠে পড়ল। কিন্তু তোর সম্পর্কে একেবারে চুপ করে গেল।'

'আশ্চর্য তো!'

'আশ্চর্যের কিছুই না, তোর সম্পর্কে তো কোনদিনই ওর খুব একটা খারাপ ধারণা ছিল না।'

'তাই নাকি ?'

'হুঁ, তারপর তুই কবে আসছিস বল।'

'একথাও বলেছিস নাকি ?'

'আহা, সেভাবে কি আর বলেছি, বললাম বাসু এত খরচপত্র করে খাইয়ে দিলে, একদিন তাকে বাড়িতে এনে মাংস ভাত খাইয়ে দেব।'

'কি বলল তখন রেখা ?'

চুপ করে রইল।

'তার মানে মৌনং সম্মতি লক্ষণম্।' বাসুর খুশি খুশি গলা ভেসে এল।

'শোন্—এই রোববার আমার বাড়ি চলে আয়।'

'আজ তো বুধবার।'

'হুঁ, আজ একুশে, পাঁচশ তারিখ তুই আমার বাড়ি আসছিস, দুপুরে এখানে খাওয়া-দাওয়া করবি, সন্ধ্যালবেলা চলে আসবি—তোর ডায়েরীতে নোট করে রাখ।'

'নোট করতে হবে না, এমনি আমার মনে থাকবে।' বাসুদেব শব্দ করে হাসল।

তা কি আর আমি বুঝি না, অমূল্য নিজের মনে বলল, শালা তোমার বুকের মধ্যে তারিখটা খোদাই হয়ে থাকবে।

'তাহলে এখন ছেড়ে দি।'

'তোর বাবা কেমন আছে ?'

ভাল। অমূল্য মনে মনে বলল, আমার বাবার জন্য তোমার কত ভাবনা। রিসিভার নামিয়ে রেখে সে তার টেবিলে ফিরে এসে একটা চারমিনার সিগারেট ধরাল। তার মনে পড়ল কাল রাত্রে গ্যালাক্সির মদের টেবিলে বসে সে একলাই অমূল্যর আড়াই প্যাকেট কর্ক টিপ্‌ড উইলস্ খেয়ে শেষ করেছে। এমন বন্ধু ক'টি পাওয়া যায়।

অফিস ছুটির পর অমূল্য হ্যারিসন রোডে উকিলের বৈঠকখানায় গিয়ে যথারীতি কাজ করল, তারপর বাড়ি ফিরে গেল।

বাসুদেব আসছে। তাকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে। রবিবার দুপুরে সে রেখার হাতের রান্না মাংস ভাত খাবে।

রেখাকে কিন্তু অমূল্য কিছুই বলল না।

শুনলে এখনই রেখা রণচণ্ডী মূর্তি ধরবে। ঘটি বাটি ছোঁড়াছুড়ি করবে, তারপর অমূল্যর চুল ধরে টানবে, তারপর চড় কিল ঘুষি।

রেগে গেলে শ্রীমতী যা কাণ্ড করে।

কাজেই দেখা যাক না রবিবার পর্যন্ত কী হয়। বাসুদেব তো আসুক। তখন যদি, আর একদিন যা করেছিল রেখা, দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে মানুষটাকে সে অপমান করে—করবে। কিন্তু এখন থেকেই ভয় পেলে তো চলবে না।

আর একটা স্টেপে অমূল্যকে গিয়ে দাঁড়াতেই হবে। বলা যায় না, বাসটা হয়তো সেখানে ধরবে, হয়তো ফুটবোর্ডও ফাঁকা থাকবে। চুপ করে হ্যাণ্ডেল ধরে অমূল্য উঠে পড়বে। ফুটবোর্ড ফাঁকা না থাকলেও একবার হ্যাণ্ডেল ধরতে পারলেই হল। দিব্যি ঝুলতে ঝুলতে সে চলে যাবে। রবিবার বাসুদেব এলে আগের মতন রেখা মেজাজ খারাপ না-ও করতে পারে। যদি সেদিন হাসতে হাসতে স্বামীর বন্ধুকে সে অভ্যর্থনা জানায় ?

[শেষাংশ ২৬১ পৃষ্ঠায়]

অবশ্যই চলচ্চিত্র মানবিক শিল্পমাধ্যম

কল্পতরু সেনগুপ্ত

মৌচাকে ঢিল মারা বলা ঠিক হবে না। কারণ মৌচাকে মধু থাকে। মধু সুপেয় এবং বলকারক। এক্ষেত্রে বলা উচিত আবর্জনা স্তূপে ঢিল মেরেছে। দেখছেন না, মাছিগুলি কি রকম ভ্যান ভ্যান করছে। পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠাগুলি এই ভন ভনানিতে ভরা। কোন কোন মতলবি পত্রিকাওয়ালা বিশেষ সংখ্যা পর্যন্ত বার করছে চিত্রতারকাদের যৌন আকর্ষক ছবির সঙ্গে তাঁদের মন্তব্য যোগ করে। সিনেমায় নগ্ন নারীদেহ দেখাবার দস্তুর মত মহড়া শুরু করেছে ওরা কাগজের পাতায়। ভাবটা দেখাচ্ছে যেন ওরা মতামত প্রকাশের ব্যবস্থা করে গণতান্ত্রিক দায়িত্ব বোধের পরিচয় দিচ্ছে। আসলে এই গণতন্ত্র বোধ হচ্ছে গণতন্ত্রের প্রতি ব্যঙ্গ, ব্যাভিচারের স্বাধীনতা। শারদীয় উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত এক শ্রেণীর পত্র-পত্রিকায় বড় বিশ্রী রকমের ভ্যান ভ্যানানি শুরু হয়েছে। নোংরা বা দুর্গন্ধের সন্ধান পেলে মাছি যেমন তৎপর হয়ে উঠে। এরা তেমনি নগ্নতা বা অশ্লীলতার কথা শুনলে চঞ্চল হয়ে উঠে। তাই এদের সঙ্গে মাছির তুলনা মনে আসে।

কথা হচ্ছে খোসলা কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে। ভারত সরকার প্রাক্তন বিচারপতি খোসলাকে সভাপতি করে এক চলচ্চিত্র তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল। এই তদন্ত কমিটি অন্যান্য অনেক সুপারিশের সঙ্গে মত প্রকাশ করেছে যে শিল্পের প্রয়োজনে ভারতীয় ছবিতে নগ্নদেহ প্রদর্শন বা চুম্বন চলতে পারে। আর যায় কোথায়। মাছিরা সব আবর্জনা থেকে বেরিয়ে আসছে ভন ভন করে। নগ্নদেহ! চুম্বন! ওদের কি মজা! এমন করে ছবি সাজাচ্ছে অথবা সংবাদ সাজাচ্ছে যাতে পাঠকরা তাঁদের প্রিয় চিত্রতারকাদের নগ্নদেহে দেখার কল্পনা করতে পারেন। তাঁদের চুম্বনের দৃশ্য কল্পনায় উপভোগ করতে পারেন। সেসব চিত্রতারকাদের তারা পত্রিকার পাতায় হাজির আনছে যাদের গ্ল্যামার আছে। বিকৃত রুচির চূড়ান্ত প্রকাশ। এই বিকৃত মানসিক লোকগুলি এমন ভাব দেখাচ্ছে, ভারতীয় ছবির এই যেন একমাত্র সমস্যা। এদুটি ব্যাপারে বাধা থাকার জন্যই বুঝি এতদিন ভারতীয় ছবির বিকাশ বন্ধ হয়ে ছিল। ভারতের সিনেমাটোগ্রাফিক বিধিতে নিঃসন্দেহে রক্ষণশীল মানসিকতা আছে। সেন্সর বিধির সুযোগ নিয়ে সেন্সর বোর্ডের সদস্যরা ছেলেকে মায়ের আদর করে চুমু দেওয়াতে আপত্তি করেছে। কিন্তু এই রক্ষণশীলতার জন্য কয়টা ভাল ছবিতে কাটাকুটি হয়েছে? সেরা পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের কোন ছবি ত' বাধা পায় নি। এমন একটি ছবির নামও করা যাবে না যে ছবিতে চুম্বন ও নগ্নদেহ দেখাতে না দেবার জন্য ছবির শিল্পমান কমে গেছে, অথবা ছবি দুর্বল হয়েছে। বরঞ্চ ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সদস্যরা এই তুলনায় অনেক বেশি লালাতঙ্কে আক্রান্ত হয়েছেন। যার জন্য মৃণাল সেনের 'নীলাকাশের নিচে' থেকে অনেকের ছবিতে কাটাছাঁটা হয়েছে। আর ডি বনশালের একটি ছবিতে 'স্বাধীনতা' পত্রিকাটি দেখানোতে আপত্তি হয়েছিল। যেহেতু 'স্বাধীনতা' কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা। এমন নির্বোধ হস্তক্ষেপের দৃষ্টান্তের অভাব নেই। এভাবে রাজনৈতিক দুষ্ট বুদ্ধি অথবা সেন্সর বোর্ডের সদস্যদের নির্বুদ্ধিতার জন্য ছবির বক্তব্য দুর্বল হয়েছে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। কিন্তু চুম্বন বা নগ্নদেহ দেখাতে না পেয়ে শিল্পবোধ-সম্পন্ন কোন পরিচালকের অসুবিধা হয় নি। ভারতীয় বা বাংলা ছবির বিকাশে বাধার কারণ অন্য, তার অন্য সমস্যা।

গুরু বাগচী পরিচালিত 'সমান্তরাল' চিত্রে ললিতা চ্যাটার্জী

ইতর চিন্তার পত্রিকা থেকে রেডিও পর্যন্ত এই দুটি শব্দকে নিয়ে পরিচালক ও শিল্পীদের প্যারেড করাচ্ছে। পরিচালকদের মধ্যে কয়েকজন তাঁদের বক্তব্যে চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। অন্য কয়েকজন এমন ভাব দেখিয়েছেন যেন ভাল ছবি করার ফর্মুলা এবার হাতে এসে গেছে। খোসলা কমিটি যেন ভারতীয় ছবিকে মুক্তি দিলেন। মুক্তি আর স্বাধীন মতামত কথাগুলি আজকাল বড় বেশি শোনা যায়। 'স্বাধীন শিল্প', 'স্বাধীন সাহিত্য' আমাদের জানা হয়েছে এবার বুঝি স্বাধীন চলচ্চিত্র দেখার পালা। লক্ষ্য করার ব্যাপার যে চীন-ভারত সংঘর্ষের পর থেকে যাঁরা স্বাধীন কথাটিকে বড় বেশি ব্যবহার করেছেন

শ্লথ ও রৌদ্র ছবিতে হাসু ব্যানার্জী

তাঁরাই মুক্তমেলা করেছেন, রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনা নিয়ে হৈ চৈ করেছেন। আবার তাঁরাই নগ্নদেহ আর চুম্বনের ওকালতিতে উঠে পড়ে লেগেছেন। এ না হলে যেন চলচ্চিত্র আর চলচ্চিত্র হবে না। তাই ব্যাপারটা তেমন স্বতস্ফূর্ত মনে হচ্ছে না। তথাকথিত এই 'স্বাধীন' মার্কাদের দেখলেই বুঝতে হবে অন্তরালে আরো কিছু আছে। সুতোটা বাঁধা আছে অন্য কোথাও।

ইউরোপ, আমেরিকার ছবিতে চুম্বনের স্থান কাল নেই। তা বলে বছরে কয়টা ভাল ছবি ওরা তৈরি করতে পারে। কেনই বা বৃটেন, ফ্রান্সের ছবি আমেরিকার কাছে মার খেল। যুদ্ধের পরে ইউরোপের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ভারসাম্যের পরিবর্তন হয়েছে। বৃটেন আর ফ্রান্স কলোনী হারিয়েছে। সুতরাং ছবির বাজার তাদের ছোট হয়ে গেছে। তার ওপর সমুখে শমনের মত উপস্থিত হয়েছে টেলিভিশন। অনেক সিনেমা বন্ধ হয়ে গেছে টেলিভিশনের প্রতিযোগিতায়। সিনেমার সঙ্গে বহু লোকের জীবিকা জড়িত সুতরাং সিনেমাকে বাঁচাবার জন্য নানাভাবে চিন্তা ও চেষ্টা চলল। ইতালীয় নিউ রিয়ালিজম, ফ্রান্সের নিউওয়েভ, বৃটেনের নিউ সিনেমা মুভমেন্ট ইত্যাদি কত কি? এতে ভালোয় মন্দয় চলচ্চিত্র বিকশিত হল নিঃসন্দেহে। এই সঙ্গে এল নগ্নতা। নগ্নদেহ যতটা আর্ট ফিল্মে দেখাবার প্রয়োজন হয়েছে তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়েছে কমার্শিয়াল ছবিতে। কেবল নগ্নতা নয়, নরনারীর যৌনসঙ্গমের দৃশ্যটা পর্যন্ত না দেখালে যেন বক্তব্যটা বুঝান যাচ্ছে না। নরনারীর দাম্পত্য জীবনে যা নিতান্ত গোপন, যা একান্তভাবে দুজনার ভিতরে সীমাবদ্ধ, তৃতীয় জনের দেখার ব্যাপার নয়। যে গোপনীয়তার মধ্যে দুটি জীবনের সম্মান, অন্তরঙ্গতা, ভালবাসার প্রশ্ন জড়িত, তাও এল পর্দায়। নগ্নতা ও যৌনতার ছবি পূর্বেও ছিল। তবে তা দেখান হত গোপনে। সমাজের লম্পট এবং ধনীরা গোপনে ওসব ছবি দেখে তাদের বিকৃত কামতৃষ্ণা মিটাত। সেই ছবিগুলি আর্ট ছবির ছাপ মেরে এবারে বাজারে এল। এ ব্যাপারে ফরাসী কয়েকজন তরুণ পরিচালক এবং সুইডেনের বার্গম্যান দর্শনের নামাবলী গায়ে দিয়ে সবাইকে টেক্কা দিয়েছে। ফিল্ম সোসাইটি মুভমেন্টের কল্যাণে আর্ট ফিল্মের নামে এসব ছবির কিছু নিদর্শন আমরা দেখেছি। কিন্তু এই চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাবার পরও ওরা কি চলচ্চিত্র শিল্পে নতুন কিছু দিতে পেরেছেন, ছবিকে চিরায়ত ছবির পর্যায়ে তুলতে পেরেছেন? পারেন নি। আজো ভাল ছবির নাম উল্লেখ করতে আমেরিকার গ্রিফিথের নাম করতে হয়, চার্লি চ্যাপলিনের কথা এসে যায়, আইকোস্টাই, ডবজেঙ্কো, কার্টব, ডনস্টয়, পুডোভকিনকে স্মরণ না করে পারা যায় না। ভাল চিত্রের কথায় ল্যাসার, ডি-সিকা, কুরোশাওয়া প্রমুখের উল্লেখ করতে হয়। তবে নগ্নতার স্বাধীনতা নতুন কি সৃষ্টি করল?

এই নগ্নতার ও চুম্বনের স্বাধীনতা নতুন কথা নয়। ফরাসী দেশে একশ' বছর আগে যৌন সাহিত্যও নগ্নতার বেনো জলে ভেসে যাবার উপক্রম হয়েছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল ফরাসী বিপ্লবের প্রেরণা থেকে মানুষকে পেছনে টেনে নেওয়া। সে সময় রম্যা রঁলার মত মনীষী লেখনি ধরেছিলেন মানুষের আত্মবিশ্বাস জাগাবার জন্য, হতাশা ও নৈরাজ্যবাদী চিন্তার বিরুদ্ধে। তিনি নাটক লিখে পিপলস থিয়েটার মুভমেন্ট শুরু করেছিলেন। যখনই বিপ্লবের পরিস্থিতি আসে তখনই ধনিক শ্রেণী যৌনতা, মুক্তমেলা আর হিপির উৎসাহ জোগায়। শুধু কালে কালে তার রূপ বদলায় মাত্র। উদ্দেশ্য ও ঘটনা একই থাকে। তাই আমাদের দেশেও যৌন-সাহিত্য বাজারে এসেছে। 'স্বাধীন' সাহিত্যিকরা নারীকে যৌন-সম্ভোগের যন্ত্র ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছেন না। তাঁদের কল্পনায় পুরুষ ভণ্ড জীব, এক বিশেষ ঋতুর কুকুরের সমতুল্য। পিতা পুত্রীর সম্পর্ক নিয়ে পর্যন্ত তাঁরা প্রশ্ন তুলছেন। ঠিক এ সময়ে খোসলা কমিটি চলচ্চিত্র শিল্পে স্বাধীনতা দানের সুপারিশ করেছেন। এই সুপারিশ উদারতা না তার পেছনে আরো কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে ভেবে দেখা দরকার। প্রথমে ভাবা দরকার কি ধরণের ছবি ভারতে হচ্ছে। সাধারণত দু-রকমের ছবি—সামাজিক ও ধর্মীয়প্রধান। সামাজিক ছবিগুলি বড়লোকদের জীবনের সৌন্দর্য প্রচার, বড়লোকদের জীবন সম্পর্কে মোহ সৃষ্টি আর যৌন আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে তৈরি। বাংলা ছবিগুলি মোটামুটি মধ্যবিত্ত জীবনকেন্দ্রিক হলেও ঐ একই ছকে চলে। তবে আর্থিক অসঙ্গতির জন্য জাঁকজমক কিছুটা কম থাকে। বাংলা ছবিতে যত বেশি করে সমরেশ বসু, বিমল মিত্র এবং 'বাজারী' সাহিত্যিকরা আসছেন বাংলা ছবি ততই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও যৌনতা আশ্রিত হয়ে উঠছে। সমাজের পয়মাল যারা তাদের গুণগান করা হচ্ছে। অথবা পুরনো ধ্যানধারণাগুলিকে আঁকড়ে থাকার কথা বলছে। ছবিতে সমসাময়িকতা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ইত্যাদির সাক্ষাৎ একেবারেই মিলে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা চলে—পশ্চিমবঙ্গে এত বড় রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়ে গেল দু-দুটো নির্বাচন হল, গ্রামাঞ্চল ও শহরের অর্থনৈতিক জীবনে কত ঘটনা ঘটল। ছবিতে তার কোন প্রতিফলন দেখা গেল কি? যতক্ষণ চলচ্চিত্র ওসব সাহিত্যিক নির্ভর থাকবে ততক্ষণ সত্যিকার সমসাময়িক ছবি তৈরি হতে পারে না। ছবির জগতে নতুন নতুন সৃষ্টিশীল প্রতিভা বিকাশের সুযোগ থাকছে না। শুধু সমসাময়িক ঘটনা কেন—গত কুড়ি বছরে ভারতে কি অনেক কিছু ঘটে নি? কিন্তু ছবিতে তার কি প্রতিফলন আছে! হলিউডের অন্ধ অনুকরণ ছাড়া? বাংলা বা ভারতীয় ছবির আসল সমস্যা এখানেই। বক্তব্য ও বিষয়বস্তুতে সমৃদ্ধ হওয়া, দেশ ও কালের পরিচয় বহন করার পরিবর্তে মেকি রঙে চঙে সাজিয়ে তাকে পণ্যে পরিণত করা হয়েছে। কাজেই শিল্প কথাটা অন্তত সততার খাতিরে না তোলাই ভাল।

অবক্ষয়ী শিল্পে বর্তমানে চারদিক ছেয়ে আছে। ব্যবসায়ী বিজ্ঞাপন, আর তথাকথিত সমালোচনার সুকৌশলে মানুষ এই অবক্ষয়ী ছবি দেখতে বাধ্য হচ্ছে। এই ছবিগুলিতে পচনশীল সমাজের কুৎসিৎ দিকগুলিকে রূপোলী আবরণে দেখাচ্ছে। দর্শক যেন আসল সত্যকে বুঝতে না পারে। কারণ বিশ্বব্যাপী আজ পুঁজিবাদের মরণ-ঘণ্টা বেজে উঠেছে। লাতিন আমেরিকা থেকে

ভিয়েৎনাম, আফ্রিকায় দেশগুলিতে আজ এক নতুন জাগরণ ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। বলিভিয়া, কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা থেকে আসছে রাইফেলের আওয়াজ। তাই কেবলমাত্র নিষ্ঠুর হিংসা দিয়ে তাকে ঠেকানো যাবে না বুঝতে পেরে দুনিয়ার পুঁজিবাদী শক্তি মানুষকে বিভ্রান্ত করার পথ নিয়েছে। যুবকরা যাতে রাইফেল না ধরে গাঁজার কল্কি ধরে, তাই হিপি চিন্তার সূত্রপাত করা হয়েছে। তাই এই অশ্লীলতা মস্ত-সংস্কৃতি। এমন এক শিল্পরীতি যা কাজকে বাদ দেয়, ভাবকে বিকৃত করে; এমন এক দেহজ কামনার সঙ্গীত সৃষ্টি করে, যার একমাত্র সত্য নারীর যৌন অঙ্গ। কামলালসার পাশব সত্যকে প্রকাশ করা। এই শিল্প এমন লোকদের সৃষ্টি যারা মুনাফা লুণ্ঠনের ব্যবস্থাকে সমর্থনের জন্য সাম্প্রদায়িকতা ও জাতি বিদ্বেষ থেকে হত্যা, নিষ্ঠুরতা, নগ্নতা ইত্যাদির জন্য ন্যায় নীতি বিসর্জন দিয়েছে। বাক-চাতুরীতে মানুষকে বিভ্রান্ত করা, বিপ্লব-চিন্তা থেকে সরিয়ে নেওয়া এবং মুনাফার জন্য ওরা শালীনতা, মানবতা, বুদ্ধিবৃত্তি সব কিছুকেই ধ্বংস করেছে। এই ধ্বংসের প্রয়োজনে সঙ্গীত, নাটক, চলচ্চিত্রকে বিকৃত করছে। নগ্নদেহ, চুম্বন আর শৃংগার রসের কেরাস ধরেছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার ওদের এই অবক্ষয়ী শিল্পরূপ হচ্ছে ওদের মৃত্যু পরোয়ানার সব চেয়ে বড় নিদর্শন। পৃথিবীর সব দেশের মানুষ এই অবক্ষয়ী শিল্পরীতির চালাকি ধরে ফেলেছে। এদের নাটের গুরু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দেশে শিল্পী সাহিত্যিকরা অবক্ষয়ী শিল্পরীতির বিরুদ্ধে রাস্তায় মিছিল বার করেছে। পাল্টা গণ-সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছে। মানুষ ক্রমে সেই নতুন সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। যে সংস্কৃতি সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণ-বিদ্বেষ আর কুসংস্কার বিরোধী। বিপ্লবী মানবতা ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বাণীবাহক। এই শিল্পীরা গ্রহণ করেছে ভণ্ডামীর মুখোস টেনে ছিঁড়ে ফেলা এবং সমাজের বাস্তব অবস্থাকে সঠিকভাবে দেখাবার শিল্পরীতি। নতুন মানব সমাজ গড়ার স্বপ্ন।

শিল্পে ও চলচ্চিত্রে এই বিপ্লবী মানসিকতার প্রকাশে পুঁজিবাদীরা তাদের কৌশল পরিবর্তন করেছে। শিল্প ও চলচ্চিত্রকে কেবল পণ্যের পর্যায়ে রাখবার জন্য 'শিল্প ও চলচ্চিত্রে স্বাধীনতা' কথাটা আমদানী করা হয়েছে। নতুন-ভাবে মোহ সৃষ্টি করার জন্য এসব কথা ও উদারতার ভঙ্গী দেখিয়ে চলচ্চিত্র স্রষ্টা-দের আর্থিক উৎসাহ দেবার চেষ্টাও হচ্ছে। বৈষয়িক উৎসাহ দিয়ে চলচ্চিত্র স্রষ্টাদের 'ক্রয়' করা এবং ছবিকে পুঁজি-বাদী সমাজ ব্যবস্থার প্রতি মোহ বিস্তারের কাজে লাগন হচ্ছে। যখন সমাজতান্ত্রিক চেতনার গান রচিত হচ্ছে, যখন চলচ্চিত্রে সমাজতান্ত্রিক শিল্পরীতির কথা ভাবা হচ্ছে তখন পুঁজিবাদীরা শিল্পে স্বাধীনতার নামে নৈরাজ্যবাদী ও যৌনাবেগ সর্বস্ব গান, যৌন-ঘটিত ছবি দিয়ে মানুষের চিন্তার ক্ষমতা, বিদ্রোহের মানসিকতাকে পঙ্গু করে দিতে চাচ্ছে। তাই খোসলার রিপোর্টে নগ্নদেহ আর চুম্বনের প্রতি এই উদারতা। শিল্পের দোহাই দিয়ে অবক্ষয়ী শিল্পকে রক্ষার এবং অপ-সংস্কৃতির মোহ ছাড়বার চেষ্টা। চলচ্চিত্রের ব্যবসায়ীরা 'পুষ্পপ্রীতি' 'প্রেম' 'মানবতা' 'আধুনিকতা' ইত্যাদি যত কথাই বলুক না কেন এই অমানবিক সমাজব্যবস্থায় সেসব কথা শুধু ধোঁকা দেওয়ার কাজই করে। ওরা আসলে প্রেম, প্রীতি মানবিকতার কি বুঝে? প্রেম, মানবতা আর নারীকে ওরা ব্যবসার উপাদান হিসাবেই জানে। কিন্তু আমাদের অনেকে সে কথা বুঝে না। বুঝতেও পারে না যে মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষ হয়ে ওরা পুঁজিবাদীদের দালালী করছে। তাই অন্ধকারের বিষাদ-নিয়ে 'আপনজন'-এর পর 'সাগিনা মহাতো'র মারাত্মক পথে পা বাড়ায়। আর খোসলা কমিটির রিপোর্টকে অভিনন্দন জানায়। যেন অবক্ষয়ী রীতির ছবি তৈরির জন্যই এদের এতদিনের প্রস্তুতি ও প্রতীক্ষা। এই অবক্ষয়ী পথে ওরা যাবে কতদূর? নগ্নতা—আর চুম্বন ওদের শিল্পী প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারবে না, প্রতিভাকে বাজারে বিকাবে মাত্র। পুঁজিবাদী এই অমানবিক সমাজব্যবস্থায় সত্যিকার শিল্পের বিকাশের সুযোগ থাকে না। তাই চলচ্চিত্র স্রষ্টা ও চলচ্চিত্রকে হয় অবক্ষয়ীতার স্রোতে গা ভাসাতে হবে অথবা অবক্ষয়ীতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে, বিদ্রোহ করতে হবে। মধ্যবর্তী কোন পথ নেই।

তাই 'শিল্পের স্বাধীনতা', 'চলচ্চিত্রের স্বাধীনতা'র খেলা চলতে দেওয়া যায় না। খোসলা কমিটি দেশের বিপ্লব ধূমায়িত মুহূর্তে কেন চুম্বন আর নগ্নতা দেখাতে দেবার জন্য উৎসাহ দিচ্ছেন, কেন বুর্জোয়া রক্ষণশীলতার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসছেন, সে কথা আমরা বুঝতে পেরেছি। তার পূর্বাভাস দেখা গেছে সিনেমায় 'নাইট সিরিজে'র এবং 'আন্তর্জাতিক চক্রান্তমূলক যৌনসর্বস্ব' বিদেশী ছবি দেখাতে দেবার উদারতায়। সিনেমায়

ইন্দর সেন পরিচালিত 'প্রথম কদম ফুল' চিত্রে সৌমিত্র চ্যাটার্জী

মার্কিন অপসংস্কৃতির দ্বার খুলে দেওয়ায়। বোম্বাই ছবিগুলিতে 'নাইট ও স্পাই' সিরিজের অশালীন অনুকরণে। যাঁরা এই অমানবিক সমাজ ব্যবস্থাকে আর একটুও দীর্ঘজীবি করতে দিতে রাজী নয়, যাঁরা অবক্ষয়ী শিল্প ও চলচ্চিত্রের বিরোধী, যাঁরা অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে ভয়ানক ক্রুদ্ধ, তাঁরা এই 'স্বাধীন' 'স্বাধীন' খেলার মুখোস খুলে ফেলবেন। এই খেলা শেষে করে দেবেন। চলচ্চিত্রে ও শিল্পে এই সমাজব্যবস্থার বিকল্প শক্তিকে তাঁরা বিকশিত করে তুলতে চাইবেন। যে চলচ্চিত্র ও শিল্প মানুষের মর্যাদাবোধ ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলবে। ফুল, প্রেম, আধুনিকতা ও সংস্কৃতির অর্থ যথার্থভাবে হৃদয়ংগম করতে সাহায্য করবে। প্রেমকে পবিত্র জ্ঞান করতে শেখাবে। এরূপ বিপ্লবী শিল্পী এবং চলচ্চিত্র স্রষ্টাদের অভিনন্দন জানাবার জন্য আমরা অপেক্ষা করে রয়েছি।

চলচ্চিত্রে সেন্সরশিপের ব্যবহারবিধি সম্পর্কে খোসলা কমিটির রিপোর্টের যে আংশিক বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে তা-ই নিয়ে চলচ্চিত্রমহলে, শিল্পী-জগতে, সাহিত্যসমাজে, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। খোসলা কমিটির রিপোর্টে চলচ্চিত্রে চুম্বন ও নগ্নতার যৌক্তিকতার বিষয়টি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলা হয়েছে, "গল্প বলতে গিয়ে যদি দেখা যায় যে, গল্পের প্রয়োজনেই আবেগোদ্বেল চুম্বন কিংবা নিরাবরণ মানবদেহ দর্শনো ন্যায়সংগত, প্রাসঙ্গিক ও আবশ্যক; তা হলে তেমন দৃশ্য ছবি থেকে বাদ-দেবার কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না। অবশ্য ছবির বিষয়টি রুচিসৌকুমার্য ও সংবেদনশীলতার সঙ্গে চিত্রিত করতে হবে।"

কাগজে এই নিয়ে বিস্তর লেখালেখি চলছে। খোসলা কমিটির সুপারিশের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিজাল বিস্তার করে দুই বিরুদ্ধ মতের তালঠোকাঠুকি চলছে খবরের কাগজের স্তম্ভ ও বেতারের বায়ু-তরঙ্গ আশ্রয় করে। চলচ্চিত্রের শিল্পী-সমাজ এই প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত। কেউ বলছেন, চলচ্চিত্রে চুম্বন ও নগ্নতা অবশ্যই অনুমোদিত হওয়া উচিত। কেউ বলছেন কদাচ নয়, কারণ ওটা ভারতীয় ঐতিহ্যের বিরোধী। চলচ্চিত্রের অতি বাঘা-বাঘা অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও এই বিতর্কে যোগ দিয়েছেন। এই প্রশ্নে তাঁদের পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গীর অনৈক্য সুস্পষ্ট।

আমি আমার আজকের এই আলোচনায় সেই বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ করব না। এমনিতেই যথেষ্ট কথার কোলাহল উত্থিত হয়েছে। সেই কোলাহলে আর শব্দ-সংযোজনের অভিপ্রায় আমার নেই। তবু যে প্রসঙ্গটি নিয়ে লেখনী ধারণ করেছি সে শুধু এই নিবেদন করবার জন্য যে, খোসলা কমিটির সুপারিশের অংশ-বিশেষের উপরই এ পর্যন্ত সকল মনোযোগ ন্যস্ত হয়েছে, সুপারিশের যে-অংশে তিনি সর্ত আরোপ করেছেন সেই অংশটির প্রতি লোকের মনোযোগ তেমন করে পড়ে নি।

অথচ সেটা পড়া উচিত ছিল। নয় তো খোসলা কমিটির রিপোর্টের অনুচিত অর্থ করা হয়, পাঞ্জাব হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি আন্যবর মিঃ জি ডি খোসলা ও তাঁর সহ-রিপোর্ট প্রণেতাদের প্রতি অবিচার করা হয়। রিপোর্টটি পার্লামেন্টে বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হয়েছে। কিন্তু তার সম্পূর্ণ বয়ান এখনও পাওয়া যায় নি। সংবাদপত্রে রিপোর্টের একটি সার-সংক্ষেপমাত্র প্রকাশিত হয়েছে। তারই উপর নির্ভর করে প্রবল বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হওয়ার মধ্যে তথ্যনিষ্ঠা প্রকাশ পায় না, স্বকপোলকল্পিত পছন্দ-অপছন্দ, অনুরাগ-বিরাগের ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র। যাঁরা সাহিত্যে ও শিল্পে কোনোরকম আব্রু রক্ষা করে চলবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না, নগ্নতায় যাঁদের উল্লাস, তাঁরা খোসলা কমিটির রিপোর্টের এই সার-সংক্ষেপটি হাতে পেয়ে এমন মাত্রাতিরিক্তভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন যে, তাঁদের সেই অবস্থা, গ্রীক দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস যখন নবাবিষ্কারের আনন্দে "ইউরেকা" বলে চিৎকার করে বিশেষ এক মূর্তিতে স্নানঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে রাস্তা দিয়ে ছুটছিলেন, তাঁর তখনকার সেই ভাবোন্মাদ অবস্থাকেও হার মানায়। অথচ আমরা জানি, খোসলা কমিটির রিপোর্টের যে সার-সংক্ষেপ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে তা পূর্বপ্রসঙ্গ-বর্জিত, নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত। এমনতরো অসমাপ্ত, আংশিক রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে পক্ষে-বিপক্ষে কোনো দিকেই মন্তব্য করা যায় না, করা উচিত নয়। স্বীয় ইচ্ছার রঙে রঞ্জিত করে মত প্রকাশ করলে তার মধ্য দিয়ে নিজের রাগ-বিরাগের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু সত্যচর্চা হয় না।

সম্প্রতি অমৃতবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগে (২৮-৯-৬৯) মিঃ জি ডি খোসলার সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। তা থেকে দেখা যাচ্ছে, মিঃ খোসলা তাঁর ও তাঁর সহকর্মী-দের রচিত যুক্ত রিপোর্টে চলচ্চিত্র নির্মাতার শিল্পবোধ ও সৌন্দর্যানুভূতির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। রিপোর্টের যে অংশটি কাগজে মুদ্রিত হয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে তাতেও দেখা যায় তাঁরা রুচিসৌকুমার্য ও সংবেদনশীলতার সর্ত-

সাপেক্ষেই মাত্র ছবিতে চুম্বন ও নগ্নতার অনুমোদন করেছেন। নিছক চুম্বন ও নগ্নতার তাঁরা পোষকতা করেন নি।

ওই সাক্ষাৎকারের বিবরণ থেকে আরও জানা যায়, রিপোর্টে তাঁরা অশ্লীলতা ও মার্কিনীরা যাকে বলে "sexploitation", তার তীব্র নিন্দা করেছেন। দর্শকদের নিম্নস্তর রুচির গায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে শুধুমাত্র পয়সা পিটবার মতলবে যৌনতার কড়া মশলা মিশিয়ে যে সকল ঝাঁঝালো ছবি তৈরি করা হয় তার বিরুদ্ধে কঠিন মন্তব্য প্রয়োগ করে রিপোর্টের প্রণেতারা এই-জাতীয় কিছু কিছু ব্যবসায়িক ভারতীয় ছবির উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে, ওই ছবিগুলি প্রদর্শিত হতে দেওয়া উচিত হয় নি, অন্ততঃ আঠারো বৎসরের নিম্নবয়স্ক দর্শকদের বেলায় ওই সব ছবির প্রদর্শন নিষিদ্ধ হওয়া উচিত ছিল। এই থেকে বোঝা যায়, খোসলা কমিটি অশালীন বা 'ভালগার' ছবি আর শিল্পরুচিসম্মত ছবি—এই দুইয়ের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্যরেখা অঙ্কন করবার চেষ্টা করেছেন। পার্থক্যটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এর ভিতর দুই মেরুর ব্যবধান লুকিয়ে আছে। অথচ কার্যক্ষেত্রে দেখা যচ্ছে এই পার্থক্যরেখাটির কথা আমরা বেমালুম বিস্মৃত হয়েছি, বিস্মৃত হয়ে চুম্বন ও নগ্নতার পক্ষে খোসলা কমিটি চালাও ছাড়পত্র মঞ্জুর করেছেন ভেবে আনন্দে মুক্তকচ্ছ হবার উপক্রম করেছি। সাহিত্যে যাঁরা অশ্লীলতা সমর্থন করেন, তাঁদের শিবিরে সে কী উল্লাসের সমারোহ। যেন একটা যুদ্ধ জয়ের উত্তেজনা তাঁদের শিরায় শিরায় বইছে এমনি তাঁদের হাবভাব। কিন্তু এটা যে আত্মপ্রবঞ্চনা ভিন্ন আর কিছু নয় তা উপরের প্রদত্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলেই ধরা পড়বে। চুম্বন ও নগ্নতার পক্ষীয়দের উল্লাসের মত্ততা বুদ্বুদের ফেনায় ভরা, একটু টোকা দিলেই ওই বুদ্বুদ শূন্যে মিলিয়ে যেতে বাধ্য।

শিল্পের ধর্ম ও সৌন্দর্যানুভূতি বজায় রেখে ছবি তুলতে গেলে দেখা যাবে চুম্বন ও নগ্নতার দৃশ্য প্রদর্শন করেও সেই ছবিতে শালীনতা অক্ষুণ্ণ আছে। তার কারণ শিল্পের ধর্মই হল সংযম, সৌন্দর্যের মূল কথা হল পরিমিতিবোধ, ছন্দসুষমা। খোসলা কমিটি যখন বলছেন "রুচিসৌকুমার্য" ও "সংবেদনশীলতার" সর্ত মেনে নিয়ে তবে ছবিতে চুম্বন ও নগ্নতা দেখানো চলবে, তখন প্রকারান্তরে তাঁরা এই সংযম আর পরিমিতিবোধের দিকেই তাঁদের অঙ্গুলিনির্দেশ করছেন। সংযম, পরিমিতি আর ছন্দ রক্ষা করে ছবি তোলার মানেই হল ছবির 'ভালগার' হওয়ার সম্ভাবনা প্রতিরুদ্ধ হওয়া, ছবিতে সুরুচির মান রক্ষিত হওয়ার নিশ্চয়তালাভ। শিল্পবোধযুক্ত আর শিল্পবোধহীন ছবিতে রুচির আকাশ-পাতাল তফাৎ। এই পার্থক্যরেখাটিকেই খোসলা কমিটি তাঁদের রিপোর্টে সুচিহ্নিত করতে চেয়েছেন পূর্বোক্ত সর্ত যোজনা করে।

অবশ্য মাননীয় মিঃ জি ডি খোসলাকেও আমরা রেয়াৎ করব না। তিনি প্রাক্তন বিচারপতি, তিনি এদেশের মানুষের মনোভঙ্গীর সঙ্গে বিলক্ষণ পরিচিত অভিজ্ঞতার সূত্রে। তিনি যখন জানেন যে, চুম্বন ও নগ্নতার পক্ষে যা-ই তিনি রায় দিলেন, তারপর যতই কেন-না তিনি তাতে সর্ত যোজনা করুন, ওই সুপারিশের বৈপ্লবিকতাকে "যদি" আর "কিন্তু" অব্যয়ের দ্বারা নমনীয় করবার চেষ্টা করুন, ব্যবসায়ী চিত্র নির্মাতারা তাঁদের প্রবণতা অনুযায়ী তার স্বার্থদুষ্ট ব্যাখ্যা করবেই এবং শিল্পসম্মত চিত্র নির্মাণের অজুহাতে অশালীন ছবিই কুড়ি কুড়ি তৈরী করবে: তখন ওই সুপারিশ করবার আগে তাঁর আরও তিনবার চিন্তা করা সমীচীন ছিল—এই আমাদের বিনীত বক্তব্য। তিনি তো ভালো উদ্দেশ্যেই চুম্বন ও নগ্নতার অনুকূলে সুপারিশ করেছেন, কিন্তু লোকে যদি তাঁর ভালো উদ্দেশ্যের মর্ম গ্রহণ না করে তার কদর্থ করে, তবে তাঁদের তিনি নিবৃত্ত করবেন কী উপায়ে? সেন্সর-শিপের কড়াকড়ি করে? সেটা কি মদের দোকান খোলবার অনুমতি দিয়ে তারপর মদাবিরোধী অভিযানে বহির্গত হওয়ার সামিল হবে না?

আমার এ কথায় কেউ যদি অপরাধ না নেন তো সসংকোচে বলি, বিচারকদের মধ্যে প্রায়শঃ একটা অদ্ভুত মিশ্র মনোবৃত্তির খেলা চলে— একদিকে রক্ষণশীলতা, অন্যদিকে অত্যাধুনিকতা এই দ্বৈধতার টানাপোড়েনে আলোড়িত হয়ে কখনও তাঁদের বিচার এই প্রান্তে ঝোঁকে নয় তো সম্পূর্ণ বিপরীত প্রান্তে ঝোঁকে। রাষ্ট্রসমাজ ও অর্থনীতি সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রায়শঃ তাঁরা স্থিতাবস্থার—Establishment-এর সমর্থক: কিন্তু যা-ই তাঁরা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রসঙ্গে আসেন, তখন তাঁরা যে শিল্পীদের চেয়ে বিদ্রোহী-চেতনায় ও বৈপ্লবিকতায় কিছু কম যান না, সেটা প্রমাণ করতে অতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। হয়তো জীবনে এককালে শিল্পী কবি হবার সাধ ছিল। সে সম্ভাবনা কার্যগতিকে রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁরা এ ভাবে শিল্পের স্বাধীনতার (প্রায়শঃ অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা) অনুকূলে রায় দিয়ে নিজেদের অতৃপ্ত শিল্পপ্রীতি চরিতার্থ করবার চেষ্টা করেন। অনেক সময় এর পিছনে এক ধরনের প্রদর্শনবাদও লুকিয়ে থাকে, চলতি কথায় যার অর্থ দাঁড়ায় "দেখানোপনা"। ভাবখানা এই যে, 'আইন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে কী হবে, দেখ শিল্পবোধেও আমি কিছু কম যাই না। চিন্তার উদারতায় ও সংস্কার মুক্তিতে শিল্পীরাও আমাকে পরাস্ত করতে পারবেন কিনা সন্দেহ।'

বিচারকদের এই মনস্তত্ত্ব জগৎ জুড়ে। পাশ্চাত্ত্য দেশে সাহিত্য গ্রন্থের শালীনতা ও অশালীনতার প্রশ্নে যত মামলা হয়েছে তাতে বিচারকদের একই ভূমিকা। তাঁরা শিল্পী, কবি, সাহিত্যিকদের চেয়েও যে উঁচুদরের রসিক এ কথা প্রমাণে তাঁরা সদা-সচেষ্ট। বিচারপতি কার্টিস-বক, বিচারপতি স্টেবল, বিচারপতি উলসী প্রমুখের রায় এ কথার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আমাদের সবিনয় অভিমত হল এই যে, চুম্বন ও নগ্নতার পক্ষে সুপারিশ ব্যক্ত করবার আগে খোসলা কমিটি আরও একটু সতর্কতার পরিচয় দিলে পারতেন। কদর্যের সম্ভাবনা আছে এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অভিমত প্রদান করবার কালে আর একটু রক্ষণশীলতার ধার ঘেঁষে গেলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হত না।

জানি না এ সব কথায় আবার আদালত অবমাননার দায়ে পড়তে হবে কি না। তবে বাঁচোয়া এই যে, মিঃ খোসলা এখন আর বিচারপতি নন, তিনি ভূতপূর্ব বিচারপতি। আর তাছাড়া, বিচারপতির ভূমিকায় তিনি খোসলা কমিটির রিপোর্ট প্রণয়ণ করেন নি, করেছেন তাঁর ব্যক্তিগত ভূমিকায়। In office অথবা out of office বিচারকের বিরুদ্ধে কোনো কথাই বলা যাবে না, এ যদি হয় তো বড়ো মুশকিল!

সেন্ট্রাল পোল্ট্রী স্টোর্স

৩৩নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

(মেডিকেল কলেজের সম্মুখে)

ফোন : ৩৪-২৩৬২

পোল্ট্রীর ডিম, মাংস, ঔষধ, খাদ্য, সরঞ্জাম, পুস্তক ও পত্রিকা এখানে পাওয়া যায়। পোল্ট্রী গ্রোয়ার্সদের নিকট হইতে ডিম ও মাংস ক্রয়-করা হয়। অবিলম্বে উক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

কোলকাতার দেহাতী গীত

হেমন্ত বিশ্বাস

কলকাতার পিচ্‌গলানো রোদ্দুরে কাঁঠালঠাসা বাসে বসে কোনদিন কি লক্ষ্য করেছেন—এক ঠেলাগাড়ির উপরে গামছা-মাথায় আদুলগায়ে হাতের তালুতে কাপ লাগিয়ে কোনো দিনমজুর, কী অসীম নিরাসক্তিতে তারার সপ্তকে গান গেয়ে চলেছে?

আমাদের বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের কেবল হাসির রসদ যুগিয়েই সে চলেছে। এর মধ্যে যদি কোনো বিদগ্ধজন থাকেন তবে তিনি রাজপথে 'কালচারের' এই সোচ্চার উপস্থাপনায় মর্মাহত হবেন, আর যদি তিনি সুরজ্ঞ ব্যক্তি হন, তবে সঙ্গীতের সময়, পরিবেশ স্থান ও কালের নিয়মভঙ্গে বিক্ষুব্ধ হবেন। অধিকাংশ বাঙালী শিক্ষিত শ্রেণীই নিজেদের সংস্কৃতির গর্বে এইসব "প্রচণ্ড রামা হো মার্কা" গানে কেবল "ছাতুর মাহাত্ম্য"ই দেখে থাকেন। এক কথায় তাঁরা জানেন—এ হলো দেহাতী গীত।

দেহাত থেকেই এসেছে দেহাতী। দেহাত মানে যদি হয় গ্রাম, দেহাতী হলো গ্রাম্য। কিন্তু তা বলে বাংলার গ্রামকে বুঝায় না। বিহার ও উত্তরপ্রদেশের গ্রামাঞ্চলকে আমরা জানি দেহাত বলে। কলকাতার আশেপাশে শিল্পাঞ্চলে কিংবা কলকাতার উপরে যে সব গাছ-গতরে-খাটা অবাঙালী মেহনতী মানুষ আছে এদের অধিকাংশই বিহার কিংবা উত্তরপ্রদেশের। এরা কারখানার শ্রমিক কিংবা দিনমজুর হলেও এবং এদের অধিকাংশই ভূমিহীন হলেও এঁদের আসল পরিচয় কিন্তু দেহাতী।

আমাদের বাবুদের অনেকে বলে থাকেন—এরা বাংলা দেশ থেকে উপার্জন করে লাখ লাখ টাকা প্রতি মাসে দেহাতে পাঠিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এঁরা দেখেন না এই দেহাতীরা বাংলাদেশে শ্রমশক্তি বিক্রী করে যে বাড়তি মূল্য পয়দা করে তা দিয়ে এখানে উঠছে আবাশচুম্বী ধনের চূড়া। যাক, সে হলো অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্যার কথা। যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম এই যে দেহাতী, এদের গীতমাতই কলকাতা মহানগরের লোকসঙ্গীত। আমার এই কথাটা অনেকেরই কাছে লাগবে আজগুবি নতুন। তাই এ বিষয়েই সামান্য আলোচনা করবো।

এঁদের গীতকে দেহাতী বললেও বুলিকে আমরা বলি হিন্দুস্থানী। এখানেই আমাদের আরেক মস্ত ভুল। এঁদের ভাষা ও সংস্কৃতি যে আঞ্চলিক সীমারেখাগুলিতে চিহ্নিত তার নাম মৈথিলী, মগধী বা মগহী, ভোজপুরী ইত্যাদি। পাটনা ও গয়াকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল হল মগধী বা মগহী, দ্বারভাঙ্গাকে কেন্দ্র করে উত্তর-পূর্বাঞ্চল হল মৈথিলী, আরাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমাঞ্চল হল ভোজপুরী। এগুলি আর উপভাষা নয়, পরিপূর্ণ ভাষা হিসাবে বিকাশ লাভ করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পূর্ণভাষার স্বীকৃতি দাবী করে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে। বিদ্যাপতির কৃপায় আমরা সবাই মৈথিলীকে জানি, কিন্তু অন্যান্য ভাষা সম্পর্কে আমরা ততটা ওয়াকিবহাল নই। কিন্তু এইসব ভাষাতে আজ পত্র-পত্রিকা এমন কি চলচ্চিত্র তৈরি হচ্ছে। "গঙ্গা মাঈ তু হে পিয়ারী চঢ়াইব" এই ভোজপুরী সবাক ছবিটি কলকাতার বাঙালী দর্শকদের মধ্যেও জনপ্রিয় হয়েছিল। কলকাতায় দেহাতীদের মধ্যে ভোজপুরী অঞ্চলের লোকই বেশী।

এইসব অঞ্চলের খেটে-খাওয়া মানুষগুলি যে কলকাতায় দেহাতী গান গায় তা সুরে ও বক্তব্যে যেমন বিচিত্র কাব্যেও অনুপম। বিভিন্ন ঋতুতে, বিভিন্ন পর্বে সে সব গাওয়া হয়। শুধু দেহাতী বললে তো হয় না—'কাজরী', 'চৈতী', 'বিরহ', 'বিদেশিয়া' কত কিছু? আবার 'আলহাব' মতো কতো বীরত্বপূর্ণ কাহিনীমূলক ব্যালাড! দিনের বেলায় যারা ট্রামের কনডাক্টার, ঠেলাগাড়িওয়ালা, রিক্সা-ওয়ালা বা অফিসের দারোয়ান—রাতের বেলায় এঁরা সবাই এই সব বিভিন্ন রকমের দেহাতী গীতের রূপকার। 'রামা হো' তো একটা refrain বা ধুয়া মাত্র। এমন জীবনঘনিষ্ট এসব গান—এমন শুকনো মাটির গন্ধে ভরপুর যে যদি মন দিয়ে শুনবার বুঝবার চেষ্টা বাবুরা কেউ করেন, তবে তাঁদের বিচ্ছিন্নতার ব্যাধির অন্ততঃ সাময়িক উপশম ঘটবে।

এমনি একটি দেহাতী গীত শুনেছিলাম এবং শিখেছিলাম কলকাতাতেই।

বারো বাজে রাতিতক্‌ ধোবী ধোয়ে কাপড়া
মই ক্যা করু ভাই চলা যাঁউ ছাপ'রা।
হো রামা।
ছাপরা মে নাহি মিলে চাউল ঔর মকৈয়া
উসি লাগি গোসা করে হামরা ঐ সৈয়া।
আগে আগে বইলা চলে, পিছাসে কিষানোয়া
ক্ষেতোয়া জোতলারে কিষানোয়া।
শিরোপর পাগরীয়া, কান্ধেপর কোদালীয়া
ক্ষেতোয়া জোতলারে কিষানোয়া।
হো রামা।

ছাপড়া জেলার কোন এক অখ্যাত গাঁয়ের এক কিষান জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে কলকাতায় কোনো ধোবীর এখানে কাম নিয়েছে। সময়ের নিরিখহীন খাটুনি। তার মন পড়ে আছে সেই মাটিতে। সেখানে তো এরকম খাটুনি নয়, সেখানে মেহনতের ঘামে 'মকৈয়া' বা গেহু সবুজ পাতা মেলে দিত। সেখানেও জমিদার, মহাজনের শোষণ, বউ-এর গহনা বন্ধক, তবু প্রতি বৎসর "অগহনোয়া" বা অঘ্রাণ মাস নিয়ে আসতো মেহনতের প্রতিশ্রুতি। সেই স্বপ্নেই তো সে গান ধরে:—

সব দুঃখ ভাগল্‌কী আহল্‌
অগহনোয়া
ধানোয়াকে লাগল্‌ কাটোনোয়া।
হো রামা।
লেই লেই হসুয়া, সখীন্‌ সব চললী
ভোজকে মনমা মগনোয়া
অবকী বখারীমে ভরি ভরি ধানওয়া
ছুট যইছে বন্ধক গহনওয়া হো।
রামজী।

এই অঘ্রাণ মাসে বউ-এর বন্ধকী গহনা ছুটাতে পারব। এর চেয়ে বড় আশার বাণী আর কি থাকতে পারে? স্ক্রু, বল্ট্, হুইল পিনিয়নের রাজ্যে বসেও এরা দেখে ভুট্টাক্ষেতের স্বপ্ন:

মকইয়ারে তোহর গুণ গাইলো না
জালা।
আগে আগে হর চলে পাছে সে
বোয়ালা
তোক্‌রা পাছে হেঙা চলে তিন বের
সোহালা॥
ভাত করে খুটুর খুটুর রোটী
চিত্‌রালা
ভৈসি কে মঠ্ঠা'ম সট্‌সট্ ঘোটালা॥

কোথায় লাগে ভাত আর, কোথায় লাগে রোটী, মহিষের দুধের ঘোলের সঙ্গে ভুট্টা পিষে ঘুটে নিয়ে যদি একবার—আঃ। কলকাতার কানা বস্তির মাটির ভাঁড়ের চা-য়ে চুমুক দিয়ে একথা ভাবতে এ গান গাইতে কত ভাল লাগে!

অনেক সঙ্গীতানুষ্ঠানে লোকসঙ্গীত গাইবার জন্য আমার ডাক পড়ে। বিভিন্ন প্রদেশে লোকসঙ্গীত গাইতে গিয়ে যখনি এইসব দেহাতী গীত খাঁটি সুরে ও ঢঙে গাইবার চেষ্টা করেছি—তখনি দেখেছি ভদ্রশ্রোতাদের মধ্যে, চাপা হাসি ও মজা-তামাসার মনোভাব। ওঁরা হয়তো ভাবেন—এই ঠেলাওয়ালা, রিক্সাওয়ালাদের রামা হো গীত ওতো 'বিদগ্ধ প্রেক্ষাগৃহে' বেশ চালিয়ে দিচ্ছি। অনেকে অবশ্য এর ছন্দ ও সুরে মুগ্ধ হন। কিন্তু দেহাতী গীতের মাটির মরম অনুভব করেন কয়জন।

আরেকটি 'রামা হো' গীত শুনুন তবে।

ছাপক পেঁড় ছিহ্‌লিয়া হো রাম
তে' পতওন গহওর হো
তোহি তবে ঠাঁড়ি হরিনিয়া হো রাম,
তে' মন অতি অনমন হো॥
কি আহো তোরা চরহা ঝড়ান
কি পানী বিনা মরব্বাই লে হো॥
হরিণা আজু রাজাকে ছটি হা
তোহে মোরি দেই হেঁ হো।

হরিণী খলরিকে মঞ্জরী বানাইব
সে লাল মোবা খেলিহাই হো।

এই দেহাতী গীতটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক করুণ লোককাহিনী: রাজা হরিণশিশুকে শিকার করে নিয়ে গেছে। হরিণ-মাতা তার সন্ধানে পাগলী। এদিকে রাজা সেই হরিণশিশুর চামড়া দিয়ে রাজপুত্রের জন্য একটি খঞ্জরী বানিয়ে নিয়েছেন। হরিণ-মাতা পাগলিনী হয়ে যখন ঘুরে বেড়াচ্ছিল—তখন হঠাৎ সেই খঞ্জরীর বাজনা শুনতে পায়। বাজনার সাথে সাথে তার কলিজায় যেন পড়ে হাতুড়ীর ঘা। সে জানতে পারে ঐ খঞ্জরী তারই শিশুর চামড়ায় তৈরি। দেহাতী কবি এ কাহিনী গাওয়ার পর নিজের মন্তব্য দিয়ে শেষ করেন:—

হরিণা মুয়াইল মসোয়া সিঝাইল
খলরিকে খঞ্জরী বানাইল, হো রাম
যব যব বাজয়ী খঞ্জরীয়া, হো রাম
সুনি হরিণী অই করই হো।—

মাঝে মাঝে যখন রাজপুত্র খেলাচ্ছলে খঞ্জরী বাজায়—তার ধ্বনি পাগলিনী হরিণমাতার বুক এমনিভাবে বিদ্ধ করে।

গ্রাম্যজীবনে শ্রেণীসংগ্রামের—অত্যাচারী শোষকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের এমন গীত আমি খুব কমই শুনেছি। বাংলা লোক-সঙ্গীতেও এরকম দৃষ্টান্ত খুব বিরল।

বাংলাদেশের যাঁরা ট্রেড ইউনিয়ন নেতা তাঁরা শ্রমিকদের এই দেহাতী মানসিকতার কোনো খবরই রাখেন না। এক কথায় তাঁদের কাছে এ হলো 'ফিউডেল কালচার'। আমাদের মতো, লোকের সঙ্গে দেখা হলে 'শ্রমিক কালচার' গড়ার মতো গান নাটক দিবার জন্য বক্তৃতা দেন বা দাবী জানান। ওদের দেহাতী অর্থাৎ National Regional Form আঞ্চলিক ভাষা সংস্কৃতির হদিস না রাখলে এবং প্রধানত সেই আঙ্গিকের আশ্রয় না নিলে Proletarian Culture বা শ্রমিক শ্রেণীর ধ্যান-ধারণা গড়ে তোলা যায় না। এই রূপান্তরের কিছু নমুনা আমাদের গণনাট্য আন্দোলনের অতীত ইতিহাসে আছে।

১৯৩৬ সালের পর থেকে গান্ধী-বাদের শ্রেণীসমন্বয়ের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে সারা ভারতের কৃষকশ্রেণী যখন লাল ঝাণ্ডার নীচে সংগঠিত হতে লাগলো তার অগ্রসারিতে ছিল বিহারের বলিষ্ঠ কৃষক-শ্রেণী। তাদের দেহাতী সংস্কৃতিতেও তার ফলে বহেছিল এক নতুন প্রবাহ। একটি গান তখন সর্বভারতীয় গণনাট্য আন্দোলনে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল:—

কেক্‌রা কেক্‌রা নাম বাতাউঁ
ইস্ জগমে বড়া লুটেরোয়া হো।
মলিক ঔর মহাজন লুঠে, লুঠে
ঘুষখোরোয়া হো,
মিলওয়ালা লুঠে, জমিদার লুঠে
মুরগিয়া কিষান মজদুরোয়া হো
পাণ্ডা ঔর পূজারী লুঠে, ঔর লুঠে
ঘুষখোরোয়া হো,
গুরু ঔর পুরোহিত লুঠে সাধু
লুঠে ঔর চোরোয়া হো।

এই গানেরই অবলম্বনে পরবর্তী সময়ে কলকাতার একজন দেহাতী রচয়িতা রচনা করেন

"কেক্‌রু কেক্‌রু নাম বাতাউঁ
জগমে বড়া লুঠেরোয়া হো
দেখশনকর কুছ না কহ না
গালে সাথী রাম ভজনোয়া হো।

কারখানামে মেহনৎ করকে
খুন বিয়া পসিনা হো
বুড়াপনমে ছাঁটাই ভইল্‌বা
বড়ে দয়াল মালিকোয়া হো॥

না মিলে লুগা' না মিলে লহঙ্গা
কালে বাজারমে ছপ্‌পাল্ হো
নও হাত শাড়ী চৌদা রুপায়া
বড়ে রসিক দুকানিয়া হো॥

বাচ্চেকো মেরা ভইল্ বুখারোওয়া
কহে লে যা হাসপাতালোয়া হো
গড্, মড্ আংরেজী ডাগ্‌তাব কহিলা
ঘুষ মাঙ্গিলা বিশ রুপাইয়া হো॥

রেশন লেনে কণ্ট্রোল যাউঁ
সেরমে ছটাক ভোরাইলা হো
বাপ দাদাকে নাম পুছবার
ডাঁটিয়ে ইন্‌স্পেক্টরোয়া হো॥

ভারতে নাকি দ্রুত শিল্পায়ণ হচ্ছে। কিন্তু শিল্পায়ণ যতো হচ্ছে ততই বিদেশীর নিকট অর্থনৈতিক বশ্যতা বাড়ছে। গরীব আরো গরীব হচ্ছে—ধনী আরো ধনী হচ্ছে। আজব কারবার। একটি দেহাতী গানের কলি শুনছিলাম:

বক্সহার মে বিজলী তার গৈল
হামনিকের উজার ভৈল।—

ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার এমন সুন্দর 'কমেন্টারী' আর কি হতে পারে? গ্রামে আসছে 'বিজলী তার ভাইয়া আমরা হচ্ছি উজাড়।'

কোলকাতার শিল্পী সাহিত্যিক সব বিচ্ছিন্নতার ব্যাধিতে ভুগছেন। সমষ্টি-চেতনার সুস্থ মিডিয়াম নেই। বিভক্ত বাংলার গ্রামের 'কমিউনিটি সঙ্গ'—আমরা হারিয়ে ফেলেছি। কোলকাতাতে বা আশে-পাশের কলোনীতে নিত্য কাজে, ব্যবসায়ে জীবিকা সংগ্রামে আত্মগত-প্রাণ কখনো কখনো সমষ্টি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবার মতো লোক-সঙ্গীতের মাধ্যমগুলি নির্জীব হয়ে গেছে।

যেমন বসন্ত উৎসবের হোলী। আদি রসাত্মক, উল্লাস উদ্দীপনা ও জীবনবাদের সমষ্টি—সঙ্গীত। আমাদের অঞ্চলে গ্রামে দেখেছি এক সঙ্গে দেড়শ' দু'শজন সারা রাত্রি ছড়ানো আবিরের মধ্য ঢোলক ও করতাল নিয়ে সবাই গাইছে—

দুরন্ত বসন্ত আর যে আসে না
তারে কইরোগে মানা—
আইলরে বসন্তকাল
দুখিনীর দুঃখের কপাল
প্রাণকান্ত—বিনে আর প্রাণ তো বাঁচে না।
তারে কইরোগো মানা।...

(শেষাংশ ২৪৩ পৃষ্ঠায়)

পূজোর আকর্ষণ — সঙ্গীত

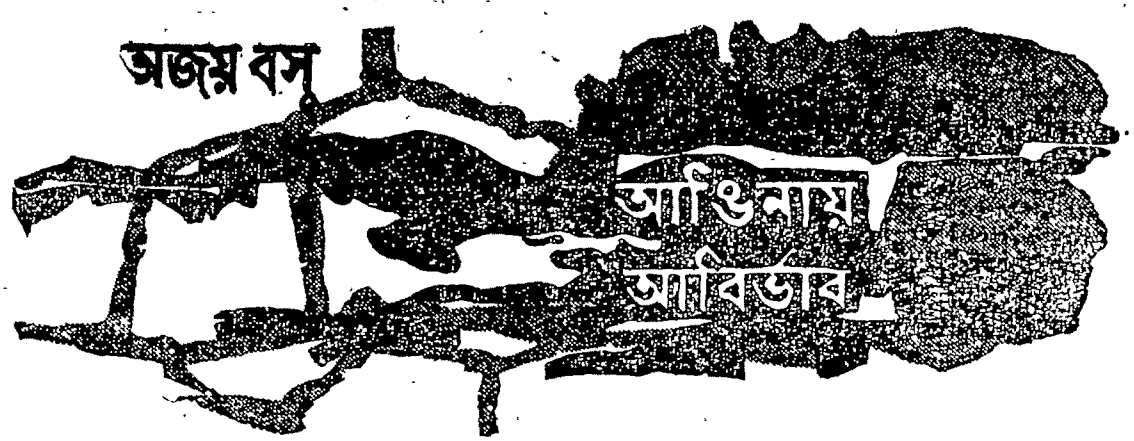

সাল ১৯৩২। শনিবার, ২৫শে জুন। আরম্ভ, আবির্ভাব ওই লগ্নেই।

ক্রিকেটের মহাতীর্থ লর্ডস মাঠ সেদিন টেস্ট ক্রিকেটে এক নতুন শরিককে স্বাগত জানিয়েছিল। মুহূর্তটি ঐতিহাসিক। তাই দিনক্ষণ আমাদের মনের মুকুরে জ্বলজ্বল করছে। সেদিনের কাহিনী ও সেই আসরের নায়কদের কীর্তিকথা আজও তাই মনকে নাড়া দিয়ে যায়।

কিন্তু আরম্ভেরও আরম্ভ আছে।

এই শতকের তিনদশকে এসে ভারতীয় ক্রিকেট টেস্ট খেলার হাত ধরে ইতিহাসের সহযাত্রী হবার প্রথম সুযোগ পেলেও, তারও অনেক কাল আগে থেকেই ভারতের মাঠ ও মাটি ক্রিকেটকে বুক দিয়ে আগলে রেখে আসছিল।

ঠিক ঠিক হিসেবে পার্শীরাই পথিকৃৎ।

তাঁদের উৎসাহ, অনুরাগ সিঞ্চিত ব্যাট ও বল পশ্চিম ভারতের ঘাসে ঘাসে প্রাণের হিল্লোল জাগিয়ে তুলেছিল গত শতাব্দীর সায়াহ্নেই। তাঁরা যে শুধু দেশের মাটিতেই বাড়তি প্রাণশক্তিকে নিংড়ে দিতে চেয়েছিলেন, তাইই নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বেলা ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই দু-দুবার (১৮৮৬ ও ১৮৮৮) সাগর পেরিয়ে ইংলণ্ড পর্যন্ত ঘুরে এসেছিলেন।

বলতে গেলে, টেস্টে না হলেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে, তা যে নাম ও সংজ্ঞাতেই হোক, ভারতের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল গেল শতাব্দীতেই।

তারপর যতোদিন কেটেছে ঘরোয়া আর প্রতিনিধিমূলক আসর ঘিরে ভারতীয় ক্রিকেটও ততোই পরিণতির দিকে ঝুঁকেছে। পার্শীরা ছাড়া রাজা মহারাজাদের দরাজ পৃষ্ঠপোষকতা, ১৮৯০ সালে জি এফ ভার্নলের নেতৃত্বাধীন বাছাই ব্রিটিশ দলের ভারত সফর, ১৯১১তে পাতিয়ালা দলের ইংলণ্ড পরিক্রমণ, পশ্চিম ভারতে আয়োজিত চতুর্দলীয় প্রতিযোগিতা, সবকটি ঘটনাই জোট বেঁধে ভারতীয় ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

এমনি করেই আমাদের ক্রিকেটের সামনে আন্তর্জাতিক মহলের সিংদরজা ধাপে ধাপে শিথিল হয়ে গিয়েছে।

ওই যুগে পি বালু, ডাঃ কাপ্পা, মেজর কে এম মিস্ত্রী, আর পি মেহবজী, জে এস ওয়ার্ডেনেরা ছিলেন ঘরোয়া আসরের নায়ক। ন্যাটা স্পিনার বালুর খ্যাতিতে অবশ্য ইংলণ্ডের উপকূলও কল্লোলিত হয়েছিল। কারণ, পাতিয়ালা দলের সঙ্গে ইংলণ্ডে গিয়ে তিনি নয় নয় করে ১১৪টি উইকেট পেয়েছিলেন। হঠাৎ পায়ে আঘাত না পেলে আরও বেশ ক'টি উইকেট তিনি নিজের ব্যাগেও পুরতে পারতেন, সন্দেহ নেই।

কিন্তু তখনকার দিনে, সেই প্রাক্ প্রথম মহাযুদ্ধের আমলে ভারতকে ঘিরে প্রচারযন্ত্রটি সক্রিয় হয়ে ওঠার প্রেরণা পায় নি। তাই আন্তর্জাতিক মহল সেদিন ভারতীয় সম্ভাবনাকে গ্রাহ্যে আনে নি। তাই বালু-মিস্ত্রী-কাপ্পা-মেহবজীর কালে ভারতকে টেস্ট খেলায় অধিকার দেওয়ার কথা এম সি সি ভাবতে পারে নি। সেই চিন্তার ইন্ধন প্রথম যোগালো ১৯২৫-২৬ সালে এম সি সির ভারত সফরের বৃত্তান্ত।

সেবার পূর্ণাঙ্গ সফরে জববদস্ত এম সি সি দলের হাত ধরতে ছিলেন ইংলণ্ডের জাতীয় দলের নায়ক আর্থার গিলিগ্যান। সঙ্গে ছিল ওয়াষেট, অ্যাস্থি স্যান্ডহাম, জর্জ গিয়ার্বি, ডব্রিউ অ্যাসটিলের মতো প্রথম সারির খেলোয়াড় এবং সর্বকালের নিরিখে বিশ্বের সর্বোত্তম পর্যায়ের অন্যতম সিম বোলার মরিস টেট্।

সুবিখ্যাত মরিস লেল্যান্ড ও ডলফিনও তখন ভারতে। প্রয়োজনে তাঁরাও এম সি সিকে মদত জুগিয়েছিলেন। এতো সব নক্ষত্র মার্কা ক্রিকেটারের দক্ষতা ও সঙ্গতির মূল্যায়ণে যাঁদের ভুল হবার কথা নয় তাঁরা আজও ভাবেন, এমন শক্তিশালী এম সি সি দল আর কোনোদিন ভারতে এসেছে কি!

দলটি ভারতে এসে কোনো খেলাতে হারে নি সত্যি। কিন্তু এদেশের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত টহল দেবার ফাঁকে গিলিগ্যানের জহুরীর দৃষ্টি ব্যাটসম্যান অধ্যাপক দেভধর, সি কে নাইডু, ওয়াজির আলি এবং বোলার রামজী, চন্দ্রানা, নাজির আলির সম্ভাবনাকে চিনে নিতে কোনো ভুল করে নি। সেই চেনা-জানার ভিত্তিতে ভর রেখে দেশে ফিরেই গিলিগ্যান যে রিপোর্ট পেশ করেন তারই সূত্রে ভারতীয় সরকারীভাবে ১৯৩২ সালে ইংলণ্ড সফরে আমন্ত্রণ পায়। এই আমন্ত্রণই আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি। টেস্ট খেলার সংবাদে সেই বছরেই ভারত কুলীনের মর্যাদায় টেস্ট পরিবারে জাতে ওঠে।

কোনো সন্দেহ নেই যে ১৯২৫-২৬ সালে বিশ্ব-শ্রেষ্ঠ মরিস টেটের বলে গুণে গুণে এগারোটি ছক্কা হাঁকিয়ে সি কে নাইডু সেদিন যদি এক নতুন বিশ্ব রেকর্ড না গড়তে পারতেন অথবা আজগীরের ম্যাটিং উইকেটে বামজীর আচমকা ছোবল তোলা বলগুলি এম সি সির দুষে ব্যাটসম্যানদের বুকে-পিঠে যদি না ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিতো, তাহলে অতো তাড়াতাড়ি ভারতীয় ক্রিকেটকে জাতে তোলায় এম সি সি আগ্রহ দেখাতো না।

সি কে নাইডুর আগেও ভারতীয় ক্রিকেটে স্মরণীয় চরিত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। তবু নাইডুকেই আমরা বলি ভারতীয় ক্রিকেটের 'জনক'। কারণ তিনি শুধু সেকাল-একালে জীবন্ত যোগসূত্রই নন, বোম্বাইয়ের হিন্দু জিমখানা মাঠে তেরোটি বাউণ্ডারী ও এগারোটি ছক্কার হাঁক তুলে তিনি ভারতীয় ক্রিকেটকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিদানে এম সি সিকে বাধ্য করিয়েছেন।

পূর্বসূরীরা অপরিসীম ক্ষমতার সদি নবজাতককে লালন-পালন করে থাকেন, তাহলে নাইডু তাঁর একার বাহুবলেই জাতককে জৌবনযাত্রা অভিমুখী করে দিয়েছেন। তাই তিনি 'জনক'। উত্তরপর্বেও তিনি থমকে দাঁড়ান নি, যদিও নাইডুর

॥ সি কে নাইডু ॥

অতিক্রান্ত যৌবনেই ভারতীয় ক্রিকেট অন্যকালে মানে টেস্ট ম্যাচের যুগে পা বাড়িয়েছিল।

তবে নাইডু প্রসঙ্গ থাক। সরিয়ে রাখা যাক ভারতীয় ক্রিকেটের 'প্রাগৈতিহাসিক' আমলের আলোচনাও। আমাদের কারবার ইতিহাসের সেই ক'টি প্রাণময় মুহূর্ত নিয়ে, যে মুহূর্তে ভারতীয় ক্রিকেট নিজের ঐশ্বর্যে আকর্ষণীয়, হারে-জিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতামুখী, চরিত্রের উত্তাপে মোহনীয়—যা দেখে ও উপলব্ধি করে স্বনামধন্য স্যার নেভিল কার্ডাস লিখেছিলেন, 'এই উষ্ণ পরশকেই বলে খ্যাতি, গৌরবমণ্ডিত ঐতিহ্য, বলে জয়লাভ!'

আগেই বলেছি, খ্যাতির সিঁড়ি ভাঙার প্রথম পরীক্ষা দিতে ভারতীয় দলকে নামতে হয়েছিল মহাতীর্থ লর্ডসে। হাতেখড়ির লগ্নেই এতোবড় ঝামেলা।

ঝামেলা? নয়তো কি? সব ক্রিকেটারের কাছেই লর্ডস লর্ডসই। তার জীবনেতিহাস, তার ঐতিহ্য, আভিজাত্যের কথা শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। ওখানকার দর্শকেরা বহুদর্শী, ক্রিকেটে বিদগ্ধ। লর্ডসের ঘাসে ঘাসে যুগ-যুগান্তের জাত ক্রিকেটের চিহ্ন জড়ানো। তাই লর্ডস নতুন খেলোয়াড়কে স্বাগত জানাবার সময়ও তাঁদের মনে জুজু-বুড়োর শঙ্কা জাগাতে ভোলে না।

লর্ডসকে যাঁরা জানেন ও চেনেন, প্রথম খেলার অভিজ্ঞতা তাঁদের কাছে স্বস্তিকর নয়। ঐতিহ্যের শাসানি, পণ্ডিতদের শ্যেনদৃষ্টির কষ্টিপাথরে আসল নকল যাচাই হবার সেই ব্রাহ্ম-মুহূর্তে ভারতীয় দলের বুকের ভেতরটা কোনো অজানা আশঙ্কায় যে সেদিন ঢিব ঢিব করে ওঠে নি, তাই বা কে হলপ করে বলতে পারে!

কেনই বা করবে না? সেদিনে আন্তর্জাতিক আসরে ভারতীয় ক্রিকেটের পরিচয়ই বা কি! কতোটুকু! দেশের বাইরে পা বাড়িয়েই মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে ক্রিকেটে নৈকষ্য কুলীন ইংলণ্ডের সামনে। একেবারে বাঘের মুখে পড়ে মড়ার মতো অবস্থা আর কি!

ইংলণ্ডের ক্রিকেটের অবস্থা তো তখন রীতিমতো বোলবোলাও। ন্যাক হব্‌স (পরে স্যার) সরে দাঁড়ালে কি হবে ওয়াকি হ্যামণ্ড, ফ্র্যাঙ্ক উলি, হার্বার্ট সাট্‌ক্লিফ, জগলাস জার্ডিন, এডি পেটার, সেসিল এম্‌স, বিল ভোস, বাওয়েস, আর ভিভিয়ন ভি রবীন্সরা স্বমহিমায় ভাস্বর। জনে জনে দিক্‌পাল সব। সবাইই হাজির লর্ডসে। তাঁদের সামনে অজ্ঞাতকুলশীল ভারত কি দাঁড়াতে পারবে?

পারবে না, এই রায় দিয়েই দর্শকেরা প্রথম দিন মাঠের সঙ্গে আড়ি পাতিয়ে-ছিলেন। কিন্তু ভুল ভাঙতে সময় লাগে নি। দু হাজারের জনতা যে কখন ফুলে ফেঁপে কুড়ি হাজারে পরিণত হয়েছিল কে তা হিসাব রাখে!

তিনদিনের টেস্টে ভারত জিততে পারে নি। হেরেছিল। হেরেছিল ১৫৮ রানে। কিন্তু হার মানার আগে প্রহরে প্রহরে হার মানাবার অঙ্গীকার জাগিয়ে অনিশ্চয়তায় সুন্দর যে ক্রিকেট তার মূল্য ধরে দিতে চেয়েছিল। চেয়েছিল, ওপক্ষের আক্রমণ হজম করে পাল্টা ঘায়ে প্রতি-দ্বন্দ্বীকে অস্থির করে তুলতে।

ঘাত-প্রতিঘাত, আঘাত-প্রত্যাঘাতের ছোঁয়ায় লর্ডসের নির্লিপ্ত মেজাজ সেদিন চমকে উঠেছিল। যেমন করে দু হাজার দর্শক সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বিশ হাজারে রূপান্তরিত হয়েছিল।

হারে-জিতে কিবা আসে যায়। লর্ডসে ভারত জিতেছেই বা কবে! কিন্তু লড়িয়ে মন আর নিঃশঙ্ক চরিত্র নিয়ে সে-দিন মাঝ মাঠে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছিল নিশ্চয়ই। শক্তিধর ইংলণ্ড টেস্ট ক্রিকেটে নবাগত ভারতকে হারিয়েও তার উঁচু মাথা ধুলোয় টেনে নামাতে পারে নি।

সেই হার তাই অগৌরবের নয়। হারতে হারতেও ভারত সেদিন সমীহ আদায় করেছে। পণ্ডিতদের সপ্রশংস অভিমতকে টেনেছে নিজের দিকে। অপরিচয়ের, অখ্যাতির ঘাটতি পোষাতে স্বীকৃতির স্বর্ণাভ সার্টিফিকেটটিকে আঁকড়ে ধরেছে বজ্রমুঠির দুই বাঁধনে। সেই হারের স্মৃতি ধরা আছে পরি-সংখ্যান কেতাবে। কিন্তু নেই প্রত্যক্ষ-দর্শীদের মনের পাতায়। সহৃদয় মন উলটে ভারতীয় ক্রিকেটের চারিত্রিক উষ্ণতায় ভরে উঠছিল।

এই উষ্ণ চরিত্রের সন্ধান পেতেই তো আমাদের ক্রিকেট মাঠে ছোটাছুটি। ইতিহাসের পাতা ওল্টানো। হারজিত আছে। থাকবেও। কিন্তু তার দাম কতো-টুকু! আসলে দামী বস্তু হলো সততা-মাখানো সুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সেই প্রতি-দ্বন্দ্বিতার শাণিত চাহিদাই ক্রিকেটারকে চরিত্রবান করে তোলে। হারা-পার্টিকেও মোহনীয় সাজে সাজায়। পদে পদে পরীক্ষা নিয়ে বাজিয়ে দেখে পাস-ফেলে কে সফল হলো, আর কেই বা পিছিয়ে রইলো।

সন্দেহ নেই, ১৯৩২ সালে লর্ডসে ভারতীয় ক্রিকেটকে অবিকল সেই নির্দয় পরীক্ষার সামনে দাঁড়াতে হয়েছিল।

লর্ডস টেস্টের আগে ভারতীয় দল-পতি পোরবন্দরের মহারাজা ও সহ অধিনায়ক লিম্বডির রাজকুমার ঘন-শ্যামজী নেতৃত্বভার কাঁধ থেকে নামিয়ে বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছিলেন। বছর চারেক পর বিজয়নগরের মহারাজ-কুমার বা সংক্ষেপে 'ভিজি' কিন্তু ওঁদের মতো স্বচ্ছ ধারণা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির তারিফ অনুভব করতে পারেন নি। তবে সে অন্য কাহিনী।

পোরবন্দর আর লিম্বডির রাজা রাজকুমারের সরে দাঁড়াতে নেতৃত্বভার তুলে নিতে এগিয়ে এলেন সি কে নাইডু। কষ্টিপাথরে খোদাই করা দীর্ঘকায় নাইডু। বলনে সংযত। চলনে গম্ভীর, অভিজাত। ভারী সমীহ জাগানো অস্তিত্ব। যেন জন্মসূত্রেই নেতৃত্বভার ওঁরই প্রাপ্য।

ওই নাইডুর নেতৃত্বের নমুনা দেখে ক্রিকেট পত্রিকা উইজডেন (১৯৩৩) স্বতঃস্ফূর্তভাবে ডাগর ডাগর অক্ষরে লিখেও ফেললেন 'উদ্দেশ্যে অবিচল দৃঢ়চেতা সি কে নাইডুকে দলে পাওয়া পরম ভাগ্য। নাইডুই ছিলেন দলের সেরা ব্যাটসম্যান এবং যে দক্ষতা ও প্রত্যয়ে তিনি লর্ডস টেস্টে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাও প্রশংসনীয়। যে দল হেরেছে সেই দলকে যোগ্য নেতৃত্বে উজ্জীবিত করা বড় কম কথা নয়! সময়ে বোলার বদল ও বোলার ব্যবহার করায় এবং ফিল্ডিং সাজানোর ব্যাপারে নাইডু যে মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন তা অনস্বীকার্য।'

একদিকে মহম্মদ নিসার নির্ভেজাল ফাস্ট বোলাব, অন্যদিকে কঞ্জীর ঝাঁকানি ও আঙুলের টানে সিম্‌-কাটারে অস্ত্র শানাতে ওস্তাদ অমর সিং—এই দু'জনকে দিয়ে কাজ সুরু করালেন নাইডু। পাকা হাতের কাজ। এক এক ধাক্কায় প্রথম

ছোটে সামাল সামাল রব উঠলো লর্ডসে। কি আশ্চর্য! অখ্যাত এক দল তীর্থভূমিতে এসে এমন হুলুস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে বসবে তা কেই বা আগে ভেবেছিল!

ইয়র্কশায়ারের হার্বার্ট সাটক্লিফ আর পার্সি হোমস কদিন আগে প্রথম উইকেটে ৫৫৪ রানের জুটি বেঁধে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের একজনও দু' অক্ষরে পৌঁছতে পারেন নি। তার আগেই মহম্মদ নিসার (তিনি টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের পক্ষে প্রথম বলটি দিয়েছিলেন) তাঁদের ফিরিয়ে দেন। মিনিট কয়েক পর ক্রিকের সর্বকালের অন্যতম সেরা ন্যাটা ব্যাটসম্যান ফ্র্যাঙ্ক উলিও আউট।

বিস্ময়ের পর আরও বিস্ময়। লর্ডসের আত্মতুষ্ট দর্শকেরা এবার বুঝি চোখ-মুখে হেলান দেওয়া দেহটাকে টান্‌টান্ সোজা করে তুলে ধরার তাগিদ অনুভব করলেন। বোর্ডে তখন কতো রানের নিশানা? সব মিলিয়ে মাত্র উনিশ।

চতুর্থ উইকেটে জুটি বাঁধলেন ওয়ালি হ্যামন্ড আর ডগলাস জার্ডিন। হ্যামন্ডের নামে তখনকার দিনে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়। কিন্তু অমর সিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে তিনিই যেন কুঁকড়ে গেলেন। অপরকে বাগে আনার চেষ্টা ছেড়ে হ্যামন্ড নিজেই ধরলেন পোষমানা মিনমিনে চেহারা। তবুও ধোপে টিকলেন মাত্র পঁয়ত্রিশেই মেয়াদ শেষ। অমর সিংয়ের ইয়র্কার হ্যামন্ডের উইকেট ছিটকে দিল।

সাবাস অমর সিং। ছ'ফুটের ওপর তোলা মাথা। হাত দু'খানি আজানুলম্বিত। আঙুল কটিও সাঁড়াশীর মতো। সাঁড়াশী দিয়ে জড়িয়ে ধরে বলটির কানে কানে কি মন্ত্র যে দিতেন তা তিনিই জানেন। তবে ছাড়া পেয়েই বলের স্ফূর্তি দ্যাখতো। বিচিত্র খেয়ালে মেতে ওঠে হেলে দুলে বাঁক ফিরিয়ে সেই বল ব্যাটসম্যানদের ভুলের ফাঁদে জড়িয়ে ধরতোই।

বোলিং আরম্ভে অমর সিংয়ের দৌড়বার রীতিটি নিঃখাঁজ ছিল না। কেমন যেন হোঁচট খাওয়া ভাব, অথচ লাফিয়ে লাফিয়ে চলা। সাবলীল গতি বলতে যা বোঝায়, অমর সিংয়ের রান-আপ তা ছিল না। দৌড় দেখে শ্রদ্ধাই জাগতো না। কিন্তু বলের গুণে কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ জলে বকিয়ে উঠতে দেরী করতেন না কেউই। স্পিনধরা পিচে বা ম্যাটিং উইকেটে অমর সিংয়ের মুখোমুখি হতে তাবড় ব্যাটসম্যানেরও বুক কেঁপে উঠত।

শোনা যায়, ম্যাটিং উইকেটে অমর সিংয়ের বিরুদ্ধে খেলতে হবে শুনে সেকালের অনেক নামী ব্যাটসম্যানই একটির ওপর আরও কয়েকটি ম্যাট বিছোবার অনুরোধ রাখতেন। যাতে যাতে গুটিকয়েক ম্যাট বিছানো পিচ জলঢোঁড়া সাপের মতো নির্বিষ হয়ে পড়ে। সত্যিই অমর সিংয়ের মতো আক্রমণাত্মক সিম্ বোলার আমাদের দেশে হয় নি। অন্য দেশেই বা এমন বোলার ক'জন হয়েছেন?

এ হেন অমর সিংয়ের সেম্-কাটারের, মহম্মদ নিসারের ফাস্ট বোলিং আর নাইডুর অফ স্পিন ও ফ্লাইট মিশে গিয়ে লর্ডসে সেদিন ইংলণ্ডকে কি নাকালই না করে ছাড়লো। পাঁচ-পাঁচটি উইকেট পড়লো ১৪৯ রানের মধ্যেই। টেস্ট ক্রিকেটে নবজাতক বিনা পরিণত প্রতিদ্বন্দ্বীর মর্যাদায় কসালো শক্ত বাহুর টান্।

চারিদিকে গেল গেল রব সোচ্চার। এমনি সময়ে হঠাৎ রুখে দাঁড়ালেন ডগলাস জার্ডিন। পাশে নিষে লেসলি এম্‌স্‌কে।

আশ্চর্য কঠিন ধাত এই জার্ডিনের। বিপদ যখন সবচেয়ে তখনই যেন জার্ডিনের অস্তিত্ব আকাশ ছাপিয়ে উঠতো। মাস ছয়েক পর অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে লারউড আর ন্যাটা ভোসের বডিলাইনে ডন ব্র্যাডম্যানকে পঙ্গু করে দেবার চক্রান্ত আঁটার সময় জার্ডিনের কঠিন ধাতটিকে আরও ভাল করে চেনা গিয়েছিল।

কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে লর্ডসে রুখে দাঁড়াবার দিনেও তাঁর কাঠিন্য এতোটুকু শিথিল হয় নি। জার্ডিন ব্যাটসম্যান হিসেবে হ্যামন্ড, উলির মতো শিল্পী নন। সাটক্লিফের নির্ভরতাও তাঁর মধ্যে নেই। কিন্তু ইংলণ্ডের বিপদ। মাতৃভূমির মুখ রাখতেই হবে। অতএব জার্ডিন দাঁড়িয়ে গেলেন। নিসার-অমর সিং-নাইডুর বোলিংয়ের বিধ্বংসী হাওয়ায় দলের হাল, পাল, দাঁড় ছিন্নভিন্ন হতে বসেছিল। কিন্তু ডগলাস জার্ডিন নোঙরটিকে শক্ত করে সেই যে মাটিতে পুঁতে ছিলেন, ২৫৯ রানের আগে সেটিকে আর টেনে তোলা গেল না। বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে পড়ার মতো অতর্কিত ব্যাপার নয়, জার্ডিন দু-দু ইনিংসেই দলের পরিত্রাণকর্তার ভূমিকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়বারেও সাটক্লিফ, হোমস, হ্যামন্ড, উলি তাড়াতাড়ি বিদায় নেন। তারপর আবার জার্ডিন মাথায় রঙ-বেরঙা হাবলিকুইন ক্যাপ এঁটে দাঁতে দাঁত কষে সেই যে মাঠ জুড়ে দাঁড়ালেন আর তাঁকে নড়ানো গেল না! পেস বোলিংয়ের ধমক, আলতো বলের লোভ, পাকা ধরানো স্পিনের ফাঁদ, কিছুতেই টলানো গেল না জার্ডিনকে। দলের ভাঙা ভাগ্যকে নিজের হাতেই নতুন করে গড়ে দিলেন তিনিই। সে হাত যে কতো পাকা স্কোরবোর্ডই তার সাক্ষী।

মানতেই হবে, টেস্ট খেলার আঙিনায় আবির্ভাব লগ্নে ভারতীয় বোলার ও ফিল্ডসম্যানেরা তাঁদের ওপর নাস্ত

॥ মহম্মদ নিসার ॥

দায়িত্বের মূল্য ধরে দিতে পেরেছিলেন। কেউই বা দক্ষতা দেখিয়েছিলেন, আশার আকাশের সীমানা পেরিয়ে। কিন্তু ব্যাটসম্যানেরা পারেন নি অক্ষমতার অবক্ষয়কে ডিঙিয়ে যেতে। হারের হেতু এই অপারগতাই।

'ক্রিকেট পঞ্জিকা' উইজডেন, দি টাইমস, দি ডেইলি এক্সপ্রেস, দি ডেইলি টেলিগ্রাফ, দি ডেইলি হেরাল্ড, দি ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান পঞ্চমুখে ভারতীয় বোলিংয়ের প্রশংসা করেছিল। বহুদর্শী ইংলিশ ক্রিকেটারদের কেউ কেউ প্রকাশ্যে ঘোষণাও করেন 'অমর সিংয়ের মতো ওস্তাদ বোলার যুদ্ধোত্তরকালে ইংলণ্ডের মাঠে আর দেখা যায় নি'।

তাঁরা ভারতীয় গ্রাউন্ড ফিল্ডিংকে 'ফাইনেস্ট' অভিধায় অভিনন্দিত করেন। ফিল্ডসম্যানদের মধ্যমণি ছিলেন লাল সিং। মাথায় পাগড়ী এঁটে জ্যান্ত হরিণ-শাবকের মতো মাঠে ছোটাছুটি করতেন। যাঁরা তাঁকে দেখেন নি, কথা দিয়ে কথার জাল বুনেও লাল সিংয়ের ফিল্ডিংয়ের মহিমা তাঁদের বোঝানো যাবে না। এই একজন ফিল্ডসম্যানই পথের বহর অমন দুশ্চেতা ডগলাস জার্ডিনের মনে এমনই কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিলেন যে, ভারতের পক্ষে লাল সিংয়ের সেনার বৈধতার প্রশ্ন তুলে সেবার জার্ডিন নিজের মতলব হাসিল করে নেন।

লাল সিং জন্মেছিলেন মালয়ে। সুতরাং তিনি কেন ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন? এই প্রশ্ন তুলে জার্ডিন লাল সিংয়ের দলভুক্তির পথ রুখে দেন। এ প্রশ্নের যৌক্তিকতা কথা হয়তো আজকে কেউ স্বীকার করতো না। কিন্তু ১৯৩৩-৩৪ সালে ভারতের পক্ষ থেকে জার্ডিনে উত্থাপিত বৈধতার প্রশ্নের ল্যাজ উলটে

(শেষাংশ ২৮২ পৃষ্ঠায়)

মাই ডিয়ার গোপালদা

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ভবানীপুর টেন্টের এক কোণে ক্যানটিনটা হওয়ায় আমাদের যতো অসুবিধেই হোক না কেন, গোপালদার নিঃসন্দেহে খুব সুবিধে হয়েছে। চপ, কাটলেট, কিম্বা মাংস-টাংসর কথা ছেড়ে দিলাম—নতুন ক্যানটিনটায় যা সিঙ্গাড়া করে না—আঃ....., নাম করলেই জিবে জল।

ইদানীং নানা কারণে অনেকদিন আর মাঠে-টাঠে যাওয়া হয়ে উঠছিল না। সেদিন বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে হাজির হলাম। ফাঁকা মাঠ, ফুটবলের আসর শেষ। ক্রিকেটের নেট-প্রাকটিশ আরম্ভ হতেও এখনো অনেক দেরী। তাই ভবানীপুর টেন্ট ফাঁকা।

ফাঁকা বলেই খুশী হলাম। আরো খুশী হলাম গুপ্ত আর সিধুদাকে চুপ-চাপ বসে বসে সিগারেট টানতে দেখে। সন্তোষ এখনো আসে নি। এক্ষুণি আসবে নিশ্চয়ই। ওর খোঁজেই তো আসা। বসবো, না বাইরে গিয়ে দাঁড়াবো ভাবতে না ভাবতেই সিধুদা বলে উঠলেন,

"ওরে আয়, আয়--অনেকদিন পরে এলি। বোস...।"

ভবানীপুর টেন্টের বারান্ডার বাঁ দিকে ফাটা টেবিলটার চারদিকে ছড়ানো নড়বড়ে চেয়ারগুলোর একটা টেনে নিয়ে শেষ পর্যন্ত বসেই পড়লাম।

দূর থেকে ক্যানটিনের ভোলাকে দেখতে পেয়ে গুপ্ত ইশারায় কাছে ডাকল তাকে।

"ছ'টা সিঙ্গাড়া আর তিন কাপ চা নিয়ে আয় শিগ্‌গীর।"

বর্ষার বিকেলে ভবানীপুর টেন্টের আশ-পাশে প্যাচ-পেচে কাদা। আজ সারাদিন বৃষ্টি হয় নি, কিন্তু রোদের তেজও ছিল না মোটে। আকাশে টুকরো-টুকরো কালচে মেঘের পাশ দিয়ে শরতের সাদা মেঘগুলো যেন লুকোচুরি খেলছে। মনুমেন্টের তলায় ভিড়। হয়তো কোন মিটিং-টিটিং ছিল। সিধুদা অনেকক্ষণ থেকে সেই দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। গুপ্তদের সিনেমার কাগজটার পাতা উল্টোচ্ছিলাম আমি। গুপ্ত নিজের মনে কি যেন লিখছিল। হঠাৎ আমাকে আর গুপ্তকে চমকে দিয়ে সিধুদা বলে উঠলেন,

"দ্যাখ্ তো চেনা-চেনা মনে হচ্ছে.....।"

সিধুদার দৃষ্টি অনুসরণ করে আমি আর গুপ্ত চেনা-চেনা কাউকে খুঁজতে শুরু করলাম মনুমেন্টের তলার ভিড়ে। কিন্তু কই—সবাই তো অচেনাই।

"ওদিকে না, ওদিকে না—স্পোর্টিং ইউনিয়ন টেন্টের সামনে দেখ..।"

আমরা দেখলাম, আমাদের অতি-পরিচিত একটা মূর্তি হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে ভবানীপুর মাঠের প্যাচ-পেচে কাদার ওপর দিয়ে থপ থপ করতে করতে এগিয়ে আসছে। বগলে ফোলিও ব্যাগ আর দু' হাতে কাপড়ের খুঁট ধরা

টেবিলের ওপর রাখা সিগারেটের প্যাকেটটা গুপ্ত পকেটে পুরে ফেললো। সিধুদার দেশলাইটা চলে গেলো তাঁর ব্যাগর মধ্যে।

আমরা ভেবেছিলাম গোপালদা আসবেন, গোপালদা বসবেন। কিন্তু আমরা নিজের থেকে কিচ্ছু বলবো না। দেখাই যাক গোপালদা কি বলেন, কিম্বা কি করেন।

কিন্তু ভোলাই সব ভেস্তে দিলো। গোপালদা চেয়ার টেনে বসতে না বসতে ট্রে হাতে ভোলা এসে হাজির।

"তোর কথাই ভাবছিলাম রে.....।"

কথা বলতে বলতে ট্রে'র ওপর থেকে গোপালদা এক কাপ চা আর একটা সিঙ্গাড়া তুলে নিলেন।

"বুইলি, সিঙ্গাড়াটা এরা বেশ ভালোই করে।"

ততোক্ষণে সন্তোষ এসে দাঁড়িয়েছে। গোপালদার খাওয়ার বহর আর আমাদের অবাক না হয়েও বিস্ময়ের ভান করার চেষ্টা দেখে ও হাসছিল।

গুপ্ত আর কি করে, ভোলাকে যেন বাধ্য হয়েই বললো,

"যা আরো দু' কাপ চা আর চারটে সিঙ্গাড়া নিয়ে আয়.....।"

গোপালদা তখন হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে নড়বড়ে চেয়ারে পা তুলে বসেছেন। দ্রুত করে চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন,

"বুইলি অনেকদিন আগে একবার এই রকম আরাম করে চা আর সিঙ্গাড়া খেয়েছিলাম। সেদিন আমার সংগে শিবে আর বিজেও ছিল। সে অবশ্য অনেক দিন আগের কথা।"

গোপালদাকে কথার খেই ধরে দেবার ভান করে সন্তোষ জিজ্ঞেস করলো,

"শিবে-বিজে কে গোপালদা?"

গোপালদা থ। এমন ভাব করলেন যেন জীবনে এর চেয়ে বেশী অবাক তিনি কখনো হন নি।

"সে কি রে—শিবে-বিজের নাম শুনিস নি? এই তোরা স্পোর্টস রিপোর্টার! নাঃ তোদের নিয়ে আর পারা যায় না। শিবে-বিজে হলো

মোহনবাগান ক্লাবের শিবদাস আর বিজয়দাস। ঐ যে ভাদুড়ী ব্রাদার্স।"

এতোক্ষণে মুখ খুললেন সিধুদা। সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে, মুখ থেকে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন,

"আপনি আবার ওদের সংগে চা-সিঙ্গাড়া খেলেন কবে?"

"কেন একবার নাকি? খেলার শেষে আমরা প্রায়ই একসংগে চা-সিঙ্গাড়া খেতাম। সিঙ্গাড়া খেতে ওরা দু'জনে যে ভীষণ ভালোবাসতো।"

"আপনি আবার ওদের সংগে ফুটবল খেলতেন না কি?" একটু যেন অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করে গুপ্ত।

গুপ্তর অজ্ঞতায় ভীষণ অবাক হয়ে যান গোপালদা। বিস্মিত চোখে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকেন গুপ্তর দিকে। তারপর গোপালদার অনুসন্ধানী দৃষ্টি অনেকটা যেন টর্চের মতো ঘুরে যায় আমাদের মুখের ওপর দিয়ে। শেষকালে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে গোপালদা আক্ষেপের সুরে বললেন,

"নাঃ, তোদের নিয়ে আর পারা যায় না। কোন খবরই রাখিস নে তোরা। শিবে-বিজুর সংগে খেলার কথাতেই অবাক হচ্ছিস—এর পরে যদি শুনিস যে, ১৯১১ সালের আই· এফ· এ শীল্ডের ফাইন্যালে আমারও খেলার কথা ছিল। নেহাৎ শিবদাস ভাদুড়ী অনেক করে বললেন তাই খেললাম না। বিশ্বাস না হয় তো ব্রজ কিম্বা ঘনাকে জিজ্ঞেস করে দেখিস।"

এবার আর শুধু অবাক হওয়া নয়, আমরা ক'জন এক সংগে চমকে উঠলাম ভীষণ ভাবে। পর মুহূর্তে একটু খুশীও হলাম, কারণ মনে হচ্ছে অনেকদিন পরে গোপালদা বোধহয় মুডে আছেন। আজ মনে হচ্ছে জমাটি কিছু ছাড়বেন।

ভোলা অনেকক্ষণ আগেই চা আর সিঙ্গাড়া দিয়ে গিয়েছিল। এখন কাপ-ডিস নিয়ে যাবার জন্যে এসে বোধহয় গোপালদার শেষ কথাগুলো শুনেছিল। তাই তার জের টেনে জিজ্ঞেস করলো,

"বাবু ১৯১১ সালের আই· এফ· এ শীল্ডের ফাইন্যাল খেলা দেখেছিলেন নাকি?"

ভোলার কথা শেষ হলো না, লাফিয়ে উঠলেন গোপালদা।

"বলিস কি রে—সে খেলায় যে আমার খেলার কথা ছিল।"

গোপালদার কথা বিশ্বাস হলো না ভোলার। সে অবাক চোখে গোপালদাকে খানিকক্ষণ দেখে বললো,

"বাবু আপনার বয়েস.....।"

পাছে সব মাটি হয়, অর্থাৎ গোপালদার মেজাজ চড়ে গিয়ে রসালো কিছু বলা বন্ধ করেন তাই তাড়াহুড়ো করে আমরা সেখান থেকে ভোলাকে সরিয়ে দিলাম।

সন্তোষের সংগে আমার এক জায়গায় যাবার কথা। একটু তাড়া ছিল। অথচ গোপালদার গল্পটা শোনার লোভও সামলাতে পারছি না। সন্তোষ একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো,

"আসল ব্যাপারটা কি—তাই বলুন না গোপালদা!"

গুপ্তর কাছ থেকে একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে গোপালদা তখন মেজাজে টানছিলেন। সন্তোষের কথা শুনে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন,

"দাঁড়া, একটু দাঁড়া! কতোদিন আগেকার কথা বল! মনে করার সময় দিবি তো?"

গোপালদা মেজাজে সিগারেট টানতে লাগলেন। ওদিকে সন্ধ্যে হয় হয়। রাস্তার আলোগুলো পটাপট জ্বলছে একটার পর একটা। আকাশ পরিষ্কার। মনে হচ্ছে আর বোধহয় বৃষ্টি হবে না। গুপ্ত 'ফস' করে একটা সিগারেট ধরালো। আর অনেকটা যেন সেই শব্দর সংগে তাল দিয়ে গোপালদা মুখ খুললেন,

"অনেকদিন আগের কথা বুইলি। আমার বয়েস তখন আর কতো। মেরে-কেটে বারো-তেরো হবে। গ্রাম থেকে সবে কলকাতায় এসেছি মনে বড় শখ যে বড় টিমে খেলবো। বড় টিম বলতে তখন অবশ্য ভারতীয় দলগুলোর মধ্যে একমাত্র মোহনবাগানকেই বোঝাতো। কিন্তু মোহনবাগানে খেলা তখন চাট্টিখানি কথা নয়। গোরা আর সাহেবী দলগুলোর সংগে মোহনবাগান তখন রীতিমত পাল্লা দিচ্ছে। খেলার ইচ্ছে নিয়ে মোহনবাগান ক্লাবের আশে-পাশে ঘোঁষাও তখন দায়।

"কিন্তু আমাকে মোহনবাগানে খেলতেই হবে—তা সে যে করেই হোক না কেন। তবে এ বিষয় আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম যে, একবার যদি আমি খেলা দেখানোর সুযোগ পাই তাহ'লেই হবে। আর কিচ্ছু চাই না। কারণ আমার পায়ে যে একটা সাংঘাতিক জিনিষ আছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। খেলা দেখানোর সুযোগ আর আসে না।

"অথচ সেবার আই· এফ· এ শীল্ডের ফাইন্যালে উঠেছে মোহনবাগান। দুর্ধর্ষ দল ইস্টইয়র্কের বিরুদ্ধে খেলতে হবে। তাই একদিন ট্রেন্স-ট্রেস করে সকালবেলায় মোহনবাগান ক্লাবের খেলোয়াড়দের প্রাকটিশের সময় সোজা গিয়ে ঢুকে পড়লাম মাঠে। বুইলি তখন তো আরো রোগা ছিলাম—আর মাথায় খাটো তো চিরকালই। ওদিকে মালকোচা

জুত করে চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন,

মারা ধুতির ওপর গেঞ্জি আর পায় একটা বড় আকারের বুট। সে যা দেখাচ্ছিলো না আমায়!

"ঐ ভাবে আমায় মাঠে ঢুকে পড়তে দেখে সকলে হাঁ হাঁ করে ছুটে এলো। আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে, আমাকে মাঠ থেকে বের করে দেবার জন্যই সকলে ছুটে আসছে। আমি আর উপায় না দেখে সেন্টারের কাছে বসানো বলটা ধাঁই করে গোলে মেরে দিলাম। গোলে ছিল হীরালাল মুখার্জী। শুন্যে লাফিয়ে পড়ে সে গোলো বলটা ধরতে। কিন্তু তার হাতের তল দিয়ে বুলেটের মতো জোরে বলটা বেরিয়ে গেলো।

"তাই দেখে সকলে থ। যারা আমায় মাঠ থেকে বের করে দিতে আসছিল তারা হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। তখন শিবদাস ভাদুড়ী এগিয়ে এলেন কাছে। বললেন "খোকা তোমার পায়ে এতো জোর!" আমি মাথা নাড়লাম, 'হ্যাঁ' বলে। তারপরে বললাম, "আমার নাম গোপাল।" "তা তুমি হঠাৎ মাঠে নামলে কেন?" এবার আমি হাসলাম। তারপর নামকরা খেলোয়াড়দের মত চাল দিয়ে বললাম, "কেন আবার খেলবো বলে!"

"খেলবে...মোহনবাগানে?" শিবদাস ভাদুড়ীর চোখ তখন কপালে। তাই দেখে বললাম, "আমি মাঠের যে কোন জায়গা থেকে গোল করতে পারি। দেখলেন তো একটু আগে।" "তাই নাকি?" আমার মনে হলো শিবদাস ভাদুড়ী বুঝি খুব অবাক হয়েছেন। আমি খুব মাথা নাড়তে লাগ-

এক সাধুর দয়ায় বুটটা এই গুণ পেয়েছে।

লাম; "দেখবেন নাকি? এক্ষুণি দেখাতে পারি।" ক্যাপ্টেন শিবদাসের নির্দেশে হীরালাল গোলে গিয়ে দাঁড়াল। হাফ-ব্যাকরা যেখানে দাঁড়ায় বলটা সেইখানে পাঠানো হলো। তারপর শিবদাস ভাদুড়ী বলতেই, ছুটে গিয়ে ধাঁই করে মারলাম। "ও হরি, এ কি সকলের সংগে আমিও অবাক। কিকের পর বলটা সাঁ সাঁ করে ওপরে উঠতে লাগলো, উঠছে তো উঠছেই। ঘাড় উঁচু করতে করতে ব্যথা হবার জোগাড়। তারপর বলটা নামতে শুরু করলো—গোল লক্ষ্য করেই। গোলের মুখে ড্রপ পড়তে যাচ্ছে দেখে হীরালাল এগিয়ে এলো বলটা ধরতে। কিন্তু বলটা হীরালালের মাথা টপকে সোজা গিয়ে ঢুকলো গোলে। আমি কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম আর ফিক ফিক করে হাসছিলাম। গোলটা হতেই শিবদাসের দিকে তাকিয়ে বললাম, "দেখলেন তো!" ওঁদের মুখে তখন কথা নেই। বলটা তখন আমি অন্যদিকের গোলের কাছে বসিয়ে দুম করে কিক করলাম। মাঠ শুদ্ধ হাঁ করে আমার কীর্তিকলাপ দেখছে। বলটা তখন ঠিক ধনুকের মতো গোল লক্ষ্য করে ছুটে চলেছে! হীরালাল বলটা ধরবে বলে তখন রেডি, কিন্তু বলটা হঠাৎ নীচু হয়ে তার দু'পায়ের মধ্যে দিয়ে সুড়ুৎ করে ঢুকে গেলো।

"শিবদাস ভাদুড়ী ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে ধরলেন। আমি ভাবলাম, কোপ্পা মেরে দিয়েছি। তাই নিশ্চিন্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আমি তাহ'লে চান্স পাচ্ছি দলে!"

"নিশ্চয়ই...নিশ্চয়ই। তাতে কোন সন্দেহ আছে নাকি?"

"তারপর আমায় নিয়ে গিয়ে মাঠের একপাশে বসলেন। তারপর এ-কথা সে-কথায় হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলেন যে কি করে আমি ঐ রকমভাবে বলে বলে গোল করি।

"আমি তখন আমার বুটটা দেখিয়ে বললাম—এই যে, এইটার জন্যে।"

ভাদুড়ী মশাই খুব অবাক হলেন। "তার মানে?"

"তার মানে এই বুটটা পায় দিয়ে আমি গোল মনে করে কিক করলে গোল হবেই। দেখলেনই তো একটু আগে।"

"সে কি কথা? কোথায় পেলে বুটটা?"

সে কথা আমি আর ভাঙলাম না। বল ট্রেড সিক্রেট কি আর সকলকে বলা যায়। শুধু বললাম যে এক সাধুর দয়ায় বুটটা এই গুণ পেয়েছে।

আমার কথা শুনে শিবদাস ভাদুড়ী গুম হয়ে গেলেন। আমি ভাবলাম, কি রে বাবা আবার রাগ-টাগ হলো নাকি? আমি কি বলবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। তখন শিবদাস ভাদুড়ী বলে উঠলেন, "গোপাল আমি তোমায় দলে নিতে পারবো না। ফুটবল খেলা হলো নির্ভেজাল স্পোর্টস। এখানে খেলে আর পরিশ্রম করে গোল দিতে হবে। মন্ত্রের জোরে ফাঁকতালে গোল দেওয়া যাবে না। ঐ বুট না পরে যদি খেলতে পারো তাহ'লে তোমায় নিতে পারি।"

এবার আর পালানো ছাড়া আর কোন উপায় থাকলো না। আমি তো জানি ঐ বুট ছাড়া কিক করলে দশ গজও যাবে না বল...তবে হ্যাঁ তারপর থেকে ওদের সংগে খুব ভাব হয়ে গেলো। চা-সিঙ্গাড়া রোজ বিকেলেই.....

কথা বলতে বলতে গোপালদা উঠে দাঁড়ালেন। গুপ্ত জিজ্ঞেস করে বসলো, "সে বুটটা এখন কোথায় গোপালদা?"

গোপালদা হতাশ ভঙ্গী করে বললেন, "আর বলিস নে, বরানগরের বাড়িতে যাবার সময় সে বুটটা হারিয়ে গেছে...গুপ্ত একটা সিগারেট দে তো।"

গুপ্ত প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করার আগেই গোপালদা ছোঁ মেরে গুপ্তর হাত থেকে পুরো প্যাকেটটা তুলে নিলেন তারপর টেবিলের ওপর থেকে সিধুদার দেশলাইটা নিয়ে পেছনে ফিরে হাঁটতে শুরু করলেন।

গুপ্ত আর সিধুদা করুণ চোখে তাকিয়ে থাকলো সেইদিকে....।

সন্তোষ হাসিমুখে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "চল এবার যাওয়া যাক....."

আঙিনায় আবির্ভাব

(২৩৯ পৃষ্ঠার পর)

দেখা হয় নি। তাই ১৯৩৩-এ লালা সিং জার্ডিন পরিচালিত ইংলণ্ডের বিপক্ষে খেলতে পান নি। কিন্তু তাঁর সরে যাওয়ার দৃষ্টান্তে এই কথাই জানাজানি হয়ে যায় যে নামমাত্র একজন ফিল্ডস-ম্যানও তাহলে এক ঝাঁঝা দলের মনে জুজু-বুড়োর ভয় জাগিয়ে তুলতে পারে।

লর্ডসে সেদিন নাইডু হাতে বড় রকমের চোট পেয়েছিলেন। পেশী সংকোচনে নাজির আলি ও নালিয়া প্রায় খোঁড়া। তাই দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের বিপর্যস্ত অবস্থার কিছুটা কৈফিয়ৎ খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রথম ইনিংসের কৈফিয়ৎ কি? নাইডু, ওয়াজির আলি, নাতমল, কোলা ছাড়া বাকী সবাই শুধু যেন আসা ছড়ায়ে পথেরই পথিক!

একেবারে শেষ লগ্নে, অমর সিংয়ের ব্যাট ক্ষণিকের জন্যে বিদ্রোহ করেছিল। নিভে যাবার আগে যেন দপ করে জ্বলে ওঠার চেষ্টা। রবীন্সের বলে পর পর তিনটি বাউণ্ডারী হাঁকাবার পরক্ষণেই ব্যাটের আর এক ঘায়ে তিনি চতুর্থ বলটিকে টপকে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দেন। মিনিট চল্লিশ উইকেটে ছিলেন, সেই ফাঁকেই অমর সিং লাল সিংয়ের সহযোগিতায় সপ্তম উইকেটে চুয়াত্তরটি রান জুড়ে দেন। অপ্রত্যাশিতভাবে এই অমূল্য চুয়াত্তরটি রান কুড়িয়ে না পাওয়া গেলে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের দৈন্য সেদিন আরও বেশি করে ফুটে উঠতো, সন্দেহ কি?

কিন্তু ব্যাটিং নয়, আসলে ইংলণ্ড সফরকারী প্রথম ভারতীয় দলের বৈভব ছিল বোলিং ও ফিল্ডিং। আর সেই সংগতির মূল্যায়ণেই বিশেষজ্ঞরা সেদিন ভারতীয় ক্রিকেটের সম্ভাবনা সম্পর্কে উচ্চকণ্ঠে ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়ে বলেছিলেন, হারল্রে কি হবে, ক্রিকেটে ভারতীয় সম্ভাবনার আদি অন্ত নেই। টেস্ট ক্রিকেটের আরম্ভে যাঁরা সাড়াজাগানো ঘটনার নায়ক সাজতে পারেন, তাঁদের ভবিষ্যৎ তো খোলা দৃষ্টির সামনেই পড়ে রয়েছে।

কথাগুলি আমাদের মনকে নাড়া দেয় বটে। কিন্তু সত্যিই কি সেদিনের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছে? ভারতীয় ক্রিকেট কাল থেকে কালান্তরে আসার পথে সুযোগ-সুবিধে পেয়েছে অনেক। তবু ছ-সাত দশকের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আমাদের জিজ্ঞাস্য, নিস্সার-অমর সিং-নাইডুরা টেস্ট ক্রিকেটের আরম্ভে যে প্রতিশ্রুতি জাগিয়ে তুলেছিলেন, উত্তরসূরীরা কি তার মূল্য ধরে দিতে পেরেছেন? পারেন নি। তাই আমাদের হাহাকার সোচ্চার, সেই দিনটি কোথায় হারিয়ে গেল!

মোজাইক হাউস

(১৮ পৃষ্ঠার পর

কিন্তু সত্যি তোকে একটু চা খাওয়াতে পারলাম না। আসিস আর একদিন। এই যে এদিকে। আমাদের এনট্রেন্স হচ্ছে এই প্যাসেজ দিয়ে। সেই যে পাশে গেট দেখলি?'

মোনামামার পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্যাসেজে পড়বার জন্যে সিঁড়ির তলার দরজার দিকে ধাবিত হই।

মোনামামা উদার গলায় বলেন, প্যাসেজটায় পর্যন্ত মোজেক টালি বসিয়ে দিয়েছি। সাধে কি আর বাড়ির এমন নাম রেখেছি। গেটে দেখলি তো নেমপ্লেট? 'মোজাইক হাউস।' খুব নতুন হয়েছে না?

মোনামামা হয়তো সপ্রশ্ন দৃষ্টিতেই তাকান, কিন্তু আমি উত্তর-দৃষ্টিতে তাকাতে ভুলে যাই। প্যাসেজে পা দিয়েই মনে হয়, মামার সেই রাগী কুকুরটা, যেটা এখনো ওপরে ঘেউ ঘেউ করছে, যেন সামনে এসে দাঁত খিঁচিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

অবশ্য দাঁত খিচুনিটা কুকুর-টুকুরের নয়, একটা জড়বস্তুর। দাঁত-খিঁচুনি একটা ভাঙা দেওয়ালের। লম্বা প্যাসেজটার একটা ধার আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে যে বাউন্ডারি ওয়ালটা।

দেখলে ধরে ফেলতে দেরী হয় না—এই পাঁচিলটার জীবন কখনোই কোনো দিন বালির আস্তরণে সমৃদ্ধ হয় নি। ওর যৌবনের দিনেও না। ইঁটের খাঁজে খাঁজে খানিকটা করে সুরকির চাপড়া মারা ছিল, কালের ভারে তার অধিকাংশই খসে পড়ে ফোকরের সৃষ্টি হয়েছে।

অবাক হয়ে যাই।

দাঁড়িয়ে পড়ি।

বলি, 'মামা এই বাড়িতে এটা কি?'

সঙ্গে সঙ্গে ধিক্কারের গলায় বলে ওঠেন মামা, 'আর বলিস কেন! যে আসে সে-ই এই প্রশ্ন করে! লজ্জায় মাথা কাটা যায়। কাণ্ডটা কি জানিস? ওধারের ওই জমিটা একটা লক্ষ্মীছাড়া বুড়ির! বুড়িরই বাউন্ডারি ওয়াল। তা বলে বলে হদ্দ হয়ে যাচ্ছি, পাঁচিলটায় একটু বালি ধরাবে না বুড়ি। দ্যাখ্ পাজীমো, আমার স্কাড়িটা কী কুচ্ছিৎ হয়ে বসে আছে।'

গভীর দুঃখের নিশ্বাস ফেলেন মামা।

থতমত খেয়ে বলি, 'কিন্তু এ যে বড় বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে মামা।'

মামা উদাস গলায় বলেন, 'বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে, সেটা তুই বলবি তবে জানবো? দেখছি না অহরহ? মনের অগোচর পাপ নেই, দু'বেলা বুড়িকে শাপ-শাপান্ত না করে তো জলগ্রহণই করি না। কি করবো, নিরুপায়।'

আমি অবাক হয়ে মোনামামার ওই নিরুপায় মুখের দিকে তাকিয়ে বলি, 'কিন্তু একটা উপায় তো তোমার নিজের হাতেই রয়েছে। ওদিকটা যা থাকে থাক, পাঁচিলের এদিকটা তো তুমি নিজেই বালি ধরিয়ে সুশ্রী করে নিতে পারো।'

'আমি! নিজেই! বালি-টালি ধরিয়ে—'

মোনামামা আমার থেকেও দশগুণ অবাক গলায় বলেন, 'বললাম না পাঁচিলের সবটাই ওই বুড়ির। ওরই বাউন্ডারি ওয়াল!'

'তা তো বললে! কিন্তু এতো যখন বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে—'

মোনামামার মুখে বিস্ময়ের সঙ্গে একটু ব্যাঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে। সে হাসিকে পরতে পরতে ছড়িয়ে দিয়ে মোনামামা বলেন, 'তুই যে আমায় তাজ্জব করলি রে! বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে বলে অন্যের দেওয়ালে বালি ধরাতে বসবো আমি গাঁটের কড়ি খরচা করে? আমি কি পাগল?'

কোলকাতার দেহাতী গীত

(২৩৫ পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তা হারিয়ে গেছে। রাজধানী কোলকাতার যুবক শ্রেণী বসন্তকে হোলী গানে আবাহণ করতে জানে না, তাই তারা হয়ে যান তখন 'হুলি গান'।

গত বৎসর হোলীতে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম—লাল রঙ, রঙ বদলিয়ে কিরকম কর্পোরেশনের নর্দমার জলের রঙে রূপান্তরিত হয়। কাদা ছড়াছড়ি—তারপর—হানাহানি—তারপর কোনো কোনো জায়গায় খুনাখুনি। বাংলা সংস্কৃতির কী রূপান্তর! আমার ঘরের সামনেই বিহারের মজফ্‌ফরপুরের মুচিদের একটি ছোট্ট ডেরা। সেদিনই হোলীর সন্ধ্যায় সেখানে রাস্তার উপরে ত্রিশ-চল্লিশজন কোলকাতা-বাসী হোলীমত্ত দেহাতীর আসর বসলো। মূল গায়েন মুচিদের জোয়ান ছেলে চন্দ্র-রাম। দিনের নর্দমার 'সংস্কৃতির দুর্গন্ধ' মুছে ফেলে এলো বিহারের শুকনো মাটির সুবাস।

"রাম খেলে হোলী, লছমন খেলে হোলী
লঙ্কাগড় মে রাবণ খেলে হোলী—হোরামা
হোলী হ্যায়
হোলী হ্যায়!...

সবাই গায়েন। ঢোলকের বোলবাণী ও বহু করতালের মিলিত মুখরতার সঙ্গে সবাইকার বলিষ্ঠ দেহের পেশীগুলি তালে তালে নেচে নেচে শ্রমশক্তির সুসঙ্গতি ও সমষ্টিচেতনায়, নিঃসঙ্গতাবোধে আক্রান্ত বুদ্ধিজীবীর কোলকাতাকে জয় করেছিল, অন্তত একটি সন্ধ্যায়।

তাই বলছিলাম কোলকাতার লোকসঙ্গীত হলো "দেহাতীগীত"॥

বিশ্ববিশ্রুত
জ্যোতির্বিদ
জ্যোতিষ-সম্রাট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জ্যোতিষার্ণব, সামুদ্রিকরত্ন, এম্-আর-এ-এস্ (লণ্ডন), ৮৮-২ রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড, "জ্যোতিষ-সম্রাট ভবন" কলিকাতা-১৩। সময় বৈকাল ৫—৭টা। ফোন: ২৪-৪০৬৫। প্রেসিডেন্ট—দি অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটী (স্থাপিত ১৯০৭ খৃঃ)। দিব্যদেহধারী এই মহাযানবের বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী, হস্তরেখা ও কোষ্ঠী বিচার, তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ ভারতের জ্যোতিষ ও তন্ত্র-শাস্ত্রের ইতিহাসে অদ্বিতীয়। তাঁর গৌরবদীপ্ত প্রতিভা শুধুমাত্র ভারতে নয়,—বিশ্বের বিভিন্ন দেশে (ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, জার্ম্মানী, জাপান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর) পরিব্যাপ্ত। গুণমুগ্ধ চিন্তাবিদেরা শ্রদ্ধাপ্লুত অন্তরে জানিয়েছেন স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন। প্রশংসাপত্র সহ ক্যাটালগের জন্য ৭৫০ পয়সার ডাকটিকিট পাঠাইবেন। বহু পরীক্ষিত কয়েকটি অত্যাশ্চর্য্য কবচ।

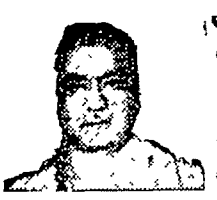
জ্যোতিষ-সম্রাট

ধনদা কবচ—সর্বপ্রকার আর্থিক উন্নতির জন্য ১১-৪৩, বৃহৎ ৪৪-৫৪, মহাশক্তিশালী ১৬২-১১। বগলামুখী কবচ—শত্রুনাশ, মামলায় জয়লাভ ও কর্মোন্নতি হয় ১৩-৬৮, বৃহৎ ৫১-১৮, মহাশক্তিশালী ২৩০-৩১, মোহিনী কবচ—ধারণে চিরশত্রুও মিত্র হয়—১৭-২৫, বৃহৎ: ৫১-১৮, মহাশক্তিশালী—৪৮৪-৮৪, সরস্বতী কবচ—বিদ্যোন্নতি ও পরীক্ষায় সুফল ১৪-৩৪, বৃহৎ: ৫৭-৮৪।

বিবেকানন্দ ও গান্ধী

(২৪ পৃষ্ঠার পর)

দেখেছিলাম, আমি ভেবেছিলাম, তা বৃটিশ ঐতিহ্যের একেবারে বিরোধী; বিশ্বাস করেছিলাম যে, ও-বস্তুটা নিতান্ত সাময়িক এবং স্থানীয় ব্যাপার। সুতরাং আমি রাজসিংহাসনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে ইংরাজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছিলাম। সযত্নে, চেষ্টা সহকারে জাতীয় সঙ্গীতের সুর শিখে নিয়েছিলাম, এবং যেখানেই তা গাওয়া হত তাতে যোগ দিতাম। রাজানুগত্য প্রকাশের সুযোগ ঘটলেই বাইরের আড়ম্বর, হৈ-চৈ না করে, সেই সকল কিছুতেই তৎপর হয়ে যোগ দিতাম।

এইভাবেই আমার বাড়ির ছোট ছেলে-মেয়েদের (বৃটিশ) জাতীয় সঙ্গীত শিখিয়েছিলাম। স্থানীয় ট্রেনিং কলেজের ছাত্রদের তা শিখিয়েছি, তাও মনে পড়ে। তবে (ভিক্টোরিয়ার) জুবিলী উৎসব বা রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক, কোন্ সময়ে তা শিখিয়েছিলাম, তা আমার ঠিক মনে নেই।"

(আত্মজীবনী, ১৯২৭ সং, প্রথম খণ্ড)

পুনশ্চ :

"(বুয়র) যুদ্ধ ঘোষিত হবার সময়ে আমার ব্যক্তিগত সহানুভূতি ছিল বুয়রদের পক্ষে কিন্তু তখন মনে করতাম, এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে সামনে এগিয়ে আনার অধিকার আমার নেই। .....একথা বললেই যথেষ্ট হবে, বৃটিশ শাসনের প্রতি আমার আনুগত্য ঐ যুদ্ধে বৃটিশদের পক্ষে অংশগ্রহণে আমাকে প্রণোদিত করেছিল। আমি অনুভব করেছিলাম যে, বৃটিশ নাগরিক হিসাবে যদি আমি অধিকার দাবি করি, তাহলে বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষায় অংশগ্রহণ করা আমার কর্তব্য হবে। তখন আমার এ-সাধনাও ছিল, ভারত বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকেই তার পূর্ণ মুক্তি লাভ করবে।" (ঐ)

॥ চার ॥

এইখানে, ছেড়ে-আসা নিবেদিতা-গান্ধী সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গে ফেরা যাক। আমরা দেখেছি, গান্ধীজী লিখেছেন, নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময়ে তিনি 'তাঁর চারপাশের জাঁকজমকের চেহারা দেখে স্তম্ভিত' হয়ে গিয়েছিলেন। নিবেদিতা, যিনি বাগবাজারের বস্তি গলির অন্ধকূপে বাস করতেন, গ্রীষ্মের দুপুরে প্রচণ্ড মাথা ধরার মধ্যে অসহ্য কষ্টে কাজ করে যেতেন ভারতবাসীর কল্যাণের জন্য, নিজের আহার্য তুলে দিতেন অপরের মুখে—তাঁর বিষয়ে ঐ ধরনের অশোভন মন্তব্যে যে দায়িত্বহীনতা ছিল, তা কঠোরভাবে সমালোচিত হয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মডার্ন রিভিউ ও প্রবাসীতে। প্রবুদ্ধ ভারত, উদ্বোধন ও বেদান্ত কেশরীও যোগ্য প্রতিবাদ করে। আরও নানাস্থানে প্রতিবাদ বেরিয়েছিল। নিবেদিতা যে তখন আমেরিকান কনস্যুলেট অতিথি-রূপে বাস করছিলেন, তা জানবার চেষ্টা করেন নি গান্ধীজী। নিবেদিতা সম্বন্ধে তিনি আর একটি আপত্তিকর শব্দ প্রয়োগ করেন—*'Volatile'*—যা গোখলে নাকি নিবেদিতা সম্বন্ধে প্রয়োগ করেছিলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যখন *Volatile* শব্দের আভিধানিক অর্থগুলি তুলে ধরে প্রশ্ন করেন—এর মধ্যে কোন্ অর্থটি নিবেদিতা সম্বন্ধে প্রযোজ্য?—এবং সেই সঙ্গে কোনো অর্থই যে সত্য নয় তা দিবালোকের মত স্বচ্ছ করে তোলেন নিতান্ত স্পষ্টভাষী এক রচনায়—তখন গান্ধীজী ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় এক লেখায় ত্রুটি স্বীকার করেন। তিনি বলেন, মূলে গুজরাটিতে 'তেজ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছিল, যা অনুবাদের গুণে *Volatile* হয়ে দাঁড়িয়েছে।৯ শ্রীঅরবিন্দ পরবর্তীকালে নিবেদিতা সম্বন্ধে ঐ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বলে অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন।

৯ গুজরাটিতে 'তেজ' শব্দের অর্থ কি জানি না, কিন্তু বাংলা অর্থে বস্তুটি নিবেদিতার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বর্তমান ছিল। পঞ্চভূতের মধ্যে 'তেজ'ই নিবেদিতার নিজস্ব বস্তু, সেকথা গোখলে নিবেদিতার শোকসভায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন :

"Sister Nivedita's personality was a wonderful striking personality—so striking indeed, that to meet her was like coming in contact with some great force of nature. Her marvellous intellect, her lyric powers of expression, her great industry, the intensity with which she held her beliefs and convictions and last but not least, that truly great gift—capacity to see the soul of things straightway—all these would have made her a most remarkable woman of any time and in any country."

এখন প্রশ্ন, নিবেদিতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে গান্ধীজী অতখানি অসতর্ক হয়েছিলেন কী করে, যেখানে তিনি আত্মজীবনীতে সত্যের সন্ধানের পক্ষে তথ্য সংগ্রহের মূল্যের কথা জোর দিয়ে বলেছেন! উত্তর খুবই সহজ—গান্ধীজীই বলেছেন—'in our conversation there was not much meeting ground'—এই মনস্তাত্ত্বিক কারণের জন্যই নিবেদিতা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহে গান্ধীজীর উৎসাহ হয় নি।

নিবেদিতার ব্যক্তিত্বে সত্যই উগ্রতা ছিল—মহিমার সঙ্গে। প্রথম সংঘাতে নিবেদিতা জ্বলে উঠতে ভালবাসতেন। তাঁর অন্তরঙ্গতা পেতে হলে সেই অগ্নি-পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হত। নচেৎ ভুল বুঝবার সম্ভাবনা ছিল প্রচুর।১০ গান্ধীজী সেই ভুল বুঝেছিলেন।

ইয়ং ইণ্ডিয়ার পূর্বোক্ত রচনায় গান্ধীজী বলেছেন, নিবেদিতার সঙ্গে আলোচনার বিষয়গুলি তাঁর স্পষ্ট মনে

১০ নেভিনসন, ব্লেয়ার প্রভৃতি নিবেদিতার সমকালীন বিখ্যাত ইংরেজ লেখক-সাংবাদিকগণ নিবেদিতা যে মোটেই শান্তস্বভাব কোনো মহিলা ছিলেন না, তা সবিশেষ জানিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথও তাই লিখেছেন। প্রথম সাক্ষাতে নিবেদিতা কি রকম অপ্রত্যাশিত আক্রমণ চালিয়ে স্তম্ভিত করে দিতেন, অনেক সময়ে সে-ব্যাপারে প্রচলিত ভদ্রতার ধার ধারতেন না, সে বিষয়ে ইংরেজ লেখকেরা সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। নেভিনসনের অনন্করণীয় বর্ণনার কয়েক লাইন :

"It is as vain to describe Sister Nivedita in two pages as to reduce fire to a formula and call it knowledge. There was indeed, something flame-like about her, and not only her language but her whole vital personality often reminded me of fire. Like fire, and like Shiva, Kali and other Indian powers of the spirit, she was at once destructive and creative, terrible and beneficent. There was no dull tolerance about her, and I suppose no one ever called her gentle. Even with friends her disagreement could be vehement, and her contradiction was very direct. In the face of enemy her eyes turned to glowing steel and under anger they deepend in colour, like

আছে। বিষয়গুলি কি ছিল তা কিন্তু জানান নি। আমরা অনুমান করতে পারি।

আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে হিংসা-অহিংসা, কালীমন্দিরে বলি, মাংসাহারের ঔচিত্যের প্রশ্ন থাকতে পারে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ ও তার সঙ্গে কিভাবে সংগ্রাম চালানো যায়—নিশ্চয় তা ছিল। যদি এইসব কথা উঠে থাকে, তাহলে উভয়ের মধ্যে মিলবার কোনো সাধারণ ক্ষেত্র ছিল না, তাতে সন্দেহ নেই। কল্পনা করে নিতে পারি, গান্ধীজীর শান্ত স্বভাবের উপরে নিবেদিতা কি পরিমাণে অগ্নি উদ্‌গিরণ করেছিলেন। ভারতীয় যুবকদের মুখ থেকে নিবেদিতা সবচেয়ে যা অপছন্দ করতেন তা হল, সাম্রাজ্যবাদের আনুগত্য—এবং গান্ধীজীর তা ছিল।

পরবর্তীকালে স্বদেশী আন্দোলন ও বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে যে-নিবেদিতার ঘনিষ্ট সংযোগ ছিল তাঁর রাজনৈতিক ধারণার কথা বলার প্রয়োজন নেই, কিন্তু এই কালের অর্থাৎ ১৯০২ সালের গোড়ার দিকের মধ্যে উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে স্বামীজীর কি ধরনের মনোভাব নিবেদিতা দেখে-ছিলেন, তার অল্প কিছু পরিচয় নিবেদিতার লেখা থেকে উপস্থিত করা যায়।

বৃটিশ জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি ভারতীয় গান্ধীর সবিশেষ ভক্তির রূপ দেখে এসেছি। এবার দেখা যাক, ইংরাজ নিবেদিতা ভারতীয় বিবেকানন্দের শিষ্যা হবার পরে কী ঘটেছিল। স্বামীজীর কাছে দীক্ষা লাভের পরদিনের ঘটনা নিবেদিতা লিখেছেনঃ

> "স্বামীজীর তদানীন্তন শিষ্য গণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ছিলেন একজন ইংরাজ রমণী। তিনি যে ইংরাজ—চিন্তাক্ষেত্রে এই ব্যাপারটির গুরুত্ব কতদূর, কত প্রবল পক্ষপাতিত্ব নিয়ে ইংরাজরা ভারতকে বুঝতে চান, নিজ জাতি, নিজেদের ইতিহাস ও কীর্তিকলাপকে তাঁরা কিরূপ অন্ধ গৌরবের চোখে দেখেন—সে বিষয়ে উক্ত শিষ্যাকে মঠে দীক্ষিত করার পরদিন পর্যন্ত স্বামীজীর কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। সেদিন স্বামীজী তাঁকে উল্লাসের সঙ্গে প্রশ্ন করেছিলেন, 'তুমি এখন কোন্ জাতি-

নিবেদিতা

ভুক্তা? উত্তর শুনে স্বামীজী বিস্মিত হলেন, দেখলেন—তিনি ইংরাজের জাতীয় পতাকাকে কী প্রগাঢ় ভক্তি ও পূজার চোখে দেখেন, দেখলেন যে, একজন ভারতীয় রমণীর ইষ্টদেবতা সম্বন্ধে যে-ভাব, পতাকার উপরে উক্ত শিষ্যারও সেই ভাব। স্বামীজীর তৎকালীন বিস্ময় ও আশাভঙ্গ প্রকাশ পেল না বললেও হয়। একটি বিস্ময়ের চাহনি মাত্র, আর কিছু নয়, এবং উক্ত শিষ্যা কি রকম উপর-উপর ভাবে তাঁর দলভুক্ত হয়েছেন তা জেনেও বাংলা দেশে অবস্থানের বাকি কয়েক সপ্তাহে তাঁর আস্থা ও সৌজন্যের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নি।" (স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে)

এরপর আমি নিবেদিতার 'দি মাস্টার অ্যাজ আই স' হিম' গ্রন্থ থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত করছিঃ

> "স্বামীজীর মতে অন্যায়ের প্রতি-কার করাই গৃহীর কর্তব্য, আর অপ্রতিকার সাধুর ধর্ম। সাধারণের পক্ষে শক্তিলাভই শ্রেষ্ঠ লাভ। ...যখন সহজে জয়লাভ করতে পারবে তখন ক্ষমা করো, কিন্তু জয় সম্বন্ধে সন্দেহ থাকলে শুধু কাপুরুষই এক গালে চড় খেয়ে অন্য গাল ফিরিয়ে দেবে।"
>
> "আমাদের আলমোড়ায় বাসকালে একজন প্রৌঢ় নিরীহপ্রকৃতি লোক স্বামীজীর কাছে এসে কর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। প্রশ্ন এই—যদি কেউ কর্মের ফেরে বলবানকে দুর্বলের উপর অত্যাচার করতে দেখে, তবে তার কী করা উচিত? বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে স্বামীজী উত্তর দিলেন—'কেন, বলবানকে পারলে ছিঁচে দেবে—তাতে কোনো সন্দেহ আছে? কর্ম-ব্যাপারে তুমি নিজের কর্তব্য ভুলে যাচ্ছ। বিদ্রোহে তোমার চির অধিকার।"
>
> "মায়ের দক্ষিণ হস্ত অভয়দানে উত্তোলিত, বাম হস্তে উদ্যত খড়্গ। ...তাঁর শাপই তাঁর বর।.....অন্ত-রঙ্গ ভক্তগণের নিভৃত হৃদয়ে মায়ের রক্তরাঙা অসি ঝকমক করে। তারা মাতার খড়্গধারিণী মূর্তির আজন্ম উপাসক।"
>
> "তিনি সর্বদাই বলতেন, আমি ঘোর-রূপের উপাসক। .....সকলেই সুখের আশায় কর্মে প্রবৃত্ত হয়, একথা মনে করা ভুল। যত লোক সুখ চায় ঠিক সেই সংখ্যার মানুষই দুঃখ খোঁজে। এসো, আমরা নিষ্কাম-ভাবে মায়ের ভয়ঙ্করী মূর্তির উপাসনা করি।"
>
> "তিনি বললেন,...আমি ভয়ঙ্করকে ভয়ঙ্কর বলে ভালবাসি, নৈরাশ্যকে নৈরাশ্য বলে ভালবাসি, দুঃখ-দারিদ্র্যকে দুঃখ-দারিদ্র্য বলে ভাল বাসি। লড়াই করো, ক্রমাগত লড়াই করো, প্রতিপদে পরাজয় তবু লড়াই করো। এই হল আদর্শ—এ-ই আদর্শ।"
>
> "একদিনের কথা মনে পড়ছে। সেদিন তাঁকে আমি বলেছিলাম, ভারতে অপরাধীর সংখ্যা খুব অল্প। তৎক্ষণাৎ দুঃখিত মনে তিনি বললেন, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এর বিপরীত যদি আমাদের দেশে হত, তাহলে পরম মঙ্গল হত। আসলে এই ধর্মভীরুতা মৃত্যুরই লক্ষণ।"
>
> "স্বামীজী বললেন, সেজন্য আমি শুধু উপনিষদই প্রচার করি।..... আবার উপনিষদের মধ্যে একমাত্র শক্তির ভাবটুকু গ্রহণ করেছি। শক্তি—এই একটিমাত্র শব্দে সকল শাস্ত্রের সার নিহিত। বুদ্ধ অহিংসা প্রচার করেছিলেন। তাঁর প্রচারের মূল ভাব অহিংসার বদলে 'শক্তি' কথার দ্বারা অধিক প্রকাশ পায়। অহিংসার পিছনে একটি মারাত্মক দুর্বলতার ভাব আছে। দুর্বলতা থেকেই হিংসার বাধা দেওয়ার ভাব আসে। একছিটে জল গায়ে লাগলে আমরা কেউ ভয় পেয়ে চাই না, তাকে গ্রাহ্যের মধ্যে কেউ ধরি না। কিন্তু একটা মশার কাছে ঐ এক ছিটে জল মারাত্মক। আমাদের তাই সেই শক্তি অর্জন করতে হবে, যা পেলে যে-কোনো শত্রুতাকেই তুচ্ছজ্ঞান করতে পারব।"
>
> "তিনি বলতে লাগলেন, বুদ্ধ মারাত্মক ভুল করে ভেবেছিলেন—সমগ্র জগৎকে উপনিষদের আদর্শে উন্নীত করা যেতে পারে। ফলে স্বার্থপরতা এসে সব নষ্ট করল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চেয়ে বিজ্ঞ ছিলেন, কারণ

Garibaldi's... For a spirit like hers was not likely to meet with anything but battle in this world, and it is as a soldier in the War of Liberation that I remember her—a soldier with a flaming sword."

তিনি দেশ-কাল-পাত্র বুঝে কাজ করে গেছেন।"

"শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ বহুভাবের একত্র সমাবেশ; তার তুলনায় বুদ্ধের সন্ন্যাস তো একরূপ দুর্বলতা। গীতা কী অদ্ভুত গ্রন্থ। .....সেই আসন্ন যুদ্ধের বর্ণনা—যুদ্ধও আবার যেমন-তেমন যুদ্ধ নয়—এবং শ্রীকৃষ্ণের 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা অর্জুনকে প্রবোধদান—এ সবল কী মহান, কী তেজঃপূর্ণ!"

"একবার তিনি সহসা বলে উঠেছিলেন—যতই বয়স হচ্ছে, ততই মনে হচ্ছে পৌরুষ কথাটির মধ্যে জাতি বা ধর্ম সবকিছুর সার নিহিত।"

॥ পাঁচ ॥

নিবেদিতার কাছে কথিত ঐসব কথা স্বামীজীর রচনাবলীর অন্যত্রও যথেষ্ট পরিমাণে পাব। কিন্তু নিবেদিতার কাছে কথাগুলি বলা হয়েছিল, তার বিশেষ তাৎপর্য এইখানে—নিবেদিতা জীবন দিয়ে কথাগুলি গ্রহণ করেছিলেন এবং ভারতীয় উত্থানের মন্ত্ররূপে কথাগুলিকে পরবর্তীকালে জ্বলন্ত অক্ষর উপস্থিত করেছেন।

এখন, স্বামীজীর সঙ্গে গান্ধীজীর যদি সাক্ষাতে আলোচনা হত তাহলে গান্ধীজীকেও স্বামীজী ঐসব কথা বলতে পারতেন—বলতেনই বলে মনে হয়।

যদি বলতেন, তাহলে স্বামীজীর সম্বন্ধে গান্ধীজী ভবিষ্যতে কী বলতেন? কি বলতেন তা নিশ্চয় ঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়, কিন্তু নিবেদিতার বিষয়ে যা বলেছেন তা বলতে পারতেন না বলেই মনে হয়, কারণ স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব ছিল অপরিমেয়। স্বামীজীর সাক্ষাৎ যদি পেতেন, তাহলে গান্ধীজী তৎকালীন ভারতের তো নিশ্চয়ই হয়ত তৎকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্বের সম্মুখীন হতেন। বিবেকানন্দের চিরশত্রুরাও বিবেকানন্দকে কখনো এই একটি মহিমা থেকে বঞ্চিত করেন নি—তাঁর ব্যক্তিত্বে সত্যই চৌম্বক-শক্তি ছিল।

কিন্তু ভারতের একালের ইতিহাসে স্বামীজীর পরেই বড় ব্যক্তিত্ব গান্ধীজীর। ১৯০১ সালেও সেই ব্যক্তিত্বের স্থির প্রকাশ দেখা গেছে। ব্যক্তিত্বের বড় স্তম্ভ আদর্শনিষ্ঠা—যার জন্য সর্বস্ব পণ গান্ধীজী কবে গিয়েছেন। বহু মানুষের সংস্পর্শে তিনি এসেছেন, বহু মত জেনেছেন, মন খোলা রাখতে চেয়েছেন—কিন্তু নিজের সত্যবোধের ভিত্তিতেই সবকিছু স্থাপন করেছেন। বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বকে নমস্কার জানিয়েও তাঁর পক্ষে সরে যাওয়া সম্ভব ছিল।

যদি সরেও যেতেন, বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কী বলতেন—যেখানে তিনি বলেছেন, "স্যার ফিরোজ শা মেটাকে আমার মনে হল হিমালয়, লোকমান্যকে মহাসাগর!"

কোনো শেষ কথা বলা এখানে সম্ভব নয়। শুধু বলতে পারি, মানবহৃদয়ে প্রবেশের ঐশ্বরিক অধিকার ছিল বিবেকানন্দের। সে ক্ষমতা তিনি কদাচিৎ প্রয়োগ করতেন—কিন্তু ভারতের ভাবী গণ-মন-অধিনায়ককে কি তিনি চিনতে পারতেন না—এবং তাঁর ভবিষ্যতের মধ্যে নিজ দিব্যদৃষ্টিকে প্রেরণ করতেন না? তাছাড়া আমার বিশ্বাস, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী নামক দক্ষিণ আফ্রিকার তরুণ ব্যারিস্টারকে নামে অন্ততঃ তিনি জানতেন। নিশ্চয় সংবাদপত্রে তাঁর একক বীরত্বের কথা পড়েছেন। সেই মানুষটির ভিতরকে দেখে নেওয়া তাঁর পক্ষে আশ্চর্যের কিছু ছিল না।

আচার্য বিবেকানন্দ অবশ্যই গান্ধীজীর মধ্যে সমাদরের এবং সমর্থনের বহু বিষয় দেখতে পেতেন। ধরা যাক, কংগ্রেস ব্যাপারটিই। আলোচনা কংগ্রেস নিয়েও হতে পারত। স্বামীজী কংগ্রেসের আবেদননীতি ও বক্তৃতাবাজির বিরোধী, জনগণের প্রতি কংগ্রেসের সহানুভূতির অভাবের সমালোচক—কিন্তু ভারতবাসী সমবেত হয়ে একটা কিছু যে বলছে, তার মূল্যগ্রাহী। গান্ধীজীও কংগ্রেসের মূল্য স্বীকার করতেন, না হলে নাটাল কংগ্রেস গঠন করতেন না, বা কংগ্রেসে যোগ দিতে আসতেন না। কিন্তু কংগ্রেসের শূন্য আড়ম্বর দেখে তাঁর মনে খুবই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল।—

> "কয়েক দিনের মধ্যে আমি কংগ্রেসের কার্যপ্রণালী জানতে পারলাম। অধিকাংশ নেতার সঙ্গেই দেখা করলাম। গোখলে, সুরেন্দ্রনাথের মত স্তম্ভস্বরূপ যাঁরা, তাঁদের রীতিনীতিও লক্ষ্য করলাম। কংগ্রেসে সময়ের বিপুল অপচয়ও দেখলাম। আরও দেখলাম, তখনি যার জন্য দুঃখ পেয়েছি—আমাদের কাজকর্মের ব্যাপারে ইংরেজী ভাষার মাত্রাতিরিক্ত প্রাধান্য। কংগ্রেসে শক্তির সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে খুবই কম মনোযোগ ছিল।"
>
> (আত্মজীবনী)

গান্ধীজী যে সময়ের কথা বলেছেন, তার প্রায় এক বছর আগে, ১৯০১-এর জানুয়ারী মাসে স্বামীজীর পত্রিকা প্রবুদ্ধ ভারতে একই বিষয়ে তির্যক মন্তব্য করা হয়:

> "This is the age of congresses, conferences and meetings. They are the fruits of the season; for the law is that word precedes work. To question their usefulness is to betray one's lack of growth. But one should never forget that action—not talk, individual examples—not collective resolutions—impregnate the masses with ideas which bear."

কথাগুলি ধ্রুববাক্য এবং দিগ্‌দর্শক, নিঃসন্দেহে। গান্ধীজীর জীবন তার পক্ষে শ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে উপস্থিত আছে।

স্বামীজীর মতের সঙ্গে গান্ধীজীর মতের বহু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—বলা উচিত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উভয়ের ভাবনার ঐক্য ছিল, এবং সেই চিন্তাগত ঐক্য যখন পরবর্তীকালে কর্মে পরিব্যক্ত হতে আরম্ভ করে তখন থেকেই ভারতের যথার্থ বন্ধন-মোচনের সূত্রপাত—তা হল: ভারতবর্ষ বলতে বোঝায় ভারতীয় জনগণ। বিবেকানন্দের ভারতবর্ষীয় চিন্তা ও বাণীর মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিস—PEOPLE। গান্ধীজীর ক্ষেত্রেও তাই।*১১

এই জনগণের কথা যিনি ভাবতে আরম্ভ করবেন, তিনি জনগণের কাছে জনগণের ভাষাতেই কথা বলবেন, তাই

১১* মানবাত্মার বৃহৎ প্রকাশে উল্লাস বোধ করলেও, বিবেকানন্দের কাছে নিঃশব্দ আত্মদানের সুনিশ্চিত বীরত্বই চরম মূল্য পেয়েছে। ভারতের সকল পতন ও প্রাণহীনতার মধ্যেও শ্রমজীবীকুলের মধ্যে যে প্রতি মুহূর্তের সেবাশক্তি প্রকাশিত হচ্ছে, তা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। তারা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন, তিনি বলেছিলেন, এক মুঠো ছাতু পেলে তারা দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে। তাঁর অবিস্মরণীয় কথাগুলি, যা নিবেদিতাকে বলেছিলেন—

"যত বয়স বাড়ছে, ততই আমি ছোট ছোট কাজে মহত্ত্বের বিকাশ দেখতে চাইছি। ..উচ্চপদে উঠলে যে-কেউ মহতের আচরণ করতে পারে। পাদপ্রদীপের আলোর সামনে অতি বড় কাপুরুষও সাহসী হয়ে ওঠে—সারা জগৎ যে তার দিকে তাকিয়ে আছে! তখন কার হৃদয় না নেচে ওঠে, কার না শিরায় রক্তস্রোত দ্রুত বয়ে চলে, তখন কি কেউ সম্পূর্ণ শক্তির বিকাশ না ঘটিয়ে থাকতে পারে?

"নগণ্য কীটের মত কাজ করে যাওয়াই আমার কাছে প্রকৃত মহত্ত্ব বলে বোধ হচ্ছে। কীট যেমন নীরবে, অবিচলিতভাবে, মুহূর্তে মুহূর্তে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় অবিরাম কাজ করে যায়—সেই রকম।"

স্বাভাবিক। গান্ধীজী কংগ্রেসে ইংরেজী ভাষার প্রাধান্য দেখে পীড়িত হয়েছেন দেখতে পাই; স্বামীজীও কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথাবার্তার সময়ে সম্ভব ক্ষেত্রে হিন্দী বলেছেন, তা আমরা অন্যত্র দেখে এসেছি। ভাষার প্রশ্নের সঙ্গে জাতীয়তার প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। যে-বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্যের ভাব গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত বাহু প্রসারিত করে রেখেছিলেন, তিনি আত্মবোধহীন দাসসুলভ পরানুকরণ দেখে কতখানি যন্ত্রণাবোধ করেছিলেন তার অব্যর্থ দৃষ্টান্ত পাই মৃত্যুর মাত্র দুদিন পূর্বে নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা থেকে। তাঁর শেষ নির্দেশের মধ্যে এগুলি পড়ে। নিবেদিতা লিখেছেন:

"হাতে করে খাওয়া ইত্যাদি হিন্দুজীবনের সহজ রীতিগুলি ইউরোপীয় শিষ্যগণকে শেখাতে তিনি অসম্ভব যত্ন নিতেন।—'মনে রাখবে, যদি ভারতকে ভালবাসতে চাও, তাহলে সে যেমন আছে সেই-ভাবে তাকে মেনে নিয়ে ভালবাসবে, নিজের মনোমত ভেঙে নিয়ে নয়'—তিনি প্রায়ই বলতেন। বাস্তব ভারতীয় জীবনযাত্রার মর্যাদার পক্ষে তাঁর প্রচণ্ড দৃঢ়তা পর্বতের মত উন্নত মহিমায় বর্তমান থেকে তাঁর অনবরত ইউরোপীয় শিষ্যগণের নিকটে যে-অপরূপ কাব্যের সৌন্দর্য ও শক্তিকে উন্মোচন করেছে—তার নাম ভারতের সাধারণ মানুষের জীবনকাব্য। সদ্য দাঁত-ওঠা কোনো মত বা পথের পক্ষে সোৎসাহ সমর্থন জানানোর মত ব্যাকুলতা তাঁর কখনো ছিল না। প্রতি দেশের সর্বোত্তম বস্তু তাঁকে উৎসর্গ করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি পরনো হিন্দুই থেকে গিয়েছিলেন: সরল জীবনের সৌন্দর্যে এতই গর্বিত ছিলেন যে, পরিবর্তনের প্রয়োজন স্বীকার করেন নি।—'রামকৃষ্ণের পর আমি বিদ্যাসাগরের অনুবর্তী'—মৃত্যুর দুদিন পূর্বে বলেছিলেন। একথা বলার পরে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বহুবার বলা গল্পটি আবার বললেন: কিভাবে সেই বৃদ্ধ পণ্ডিত ধুতি-চাদর গায়ে খড়ম ঠক ঠক করতে করতে ভাইসরয়ের আলোচনা কক্ষে হাজির হয়েছিলেন এবং তাঁর বেশ-বাস আপত্তি করা হলে বৃদ্ধ সবিস্ময়ে বলেছিলেন—'যদি আমার চালচলন এত অপছন্দ তাহলে আমাকে ডাকা হয়েছে কেন!'

"অন্যে যে-যাই ভুল করুক, তাঁর কাছে এদেশ নবীন। ভারতের ভাষা-সমূহ অর্চিত, সম্ভাবনায় নমনীয়। ভারতের প্রাণশক্তি অব্যবহৃত। তাঁর স্বপ্নের ভারত ভবিষ্যতের গর্ভে।... তাঁর মতে ভারতের আশার উৎস তার নিজের মধ্যে, বিদেশে নয় কদাপি।"

(নিবেদিতার *The National Significance of the Life of the Swami Vivekananda* প্রবন্ধ থেকে অনূদিত।)

এর পাশে রাখা যাক, গান্ধীজীর এই সময়ের মনোভাবের ও আচরণের কিছু পরিচয়। তাঁর আত্মজীবনীতে পেয়েছি, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় পাগড়ির জন্য তাঁকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। কলকাতায় কার্জন দরবারে সমাগত ভারতীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের পোষাক দেখে তিনি লিখেছিলেন:

"লর্ড কার্জন এই সময়ে তাঁর দরবার করেছিলেন। দরবারে আহূত কিছু রাজা ও মহারাজা এই ক্লাবের (কলকাতার ইণ্ডিয়া ক্লাব, যাতে গান্ধীজী ছিলেন) সদস্য ছিলেন। ক্লাবে দেখতাম, তাঁরা সব সময়ে চমৎকার বাঙালী ধুতি-পাঞ্জাবি ও চাদর পরতেন। দরবারের দিন তাঁরা পরলেন হোটেলের খানসামাদের উপযুক্ত ট্রাউজার ও চকচকে বুট। দেখে ব্যথা পেলাম। তাঁদের একজনকে এই পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করলাম।

"তিনি উত্তরে বললেন, 'আমাদের দুর্ভাগ্য অবস্থার কথা শুধু আমরাই জানি। ধনরত্ন আর খেতাব জোগাড় করতে কত অপমান সহ্য করতে হয়, তাও হাড়ে হাড়ে বুঝি।'

"আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু তাই বলে এই খানসামার পাগড়ি আর চকচকে জুতো?'

"'খানসামাদের সঙ্গে আমাদের কোনো তফাৎ আছে মনে করেন?' তিনি উত্তরে বললেন, 'তারা আমাদের খানসামা, আমরা লর্ড কার্জনের খানসামা। দরবারে যদি হাজিরা না দিই তাহলে তার ফল আমাকে ভোগ করতে হবে। যদি আমি নিজের স্বাভাবিক পোষাকে উপস্থিত হই, সেটা অপরাধ বলে গণ্য হবে। আর আপনি কি মনে করেন, এত করেও লর্ড কার্জনের সঙ্গে আমি কথা-বার্তা বলার খানিক সুযোগ পাব? মোটে নয়।"

এখানে বলা যায়, খানসামা পোষাক পরার জন্য আত্মগ্লানিযুক্ত যে-অভিজাত ভদ্রলোককে গান্ধীজী দেখেছিলেন, তিনি অল্পসংখ্যকের অন্যতম, গৌরবান্বিতেরাই ছিলেন দলে ভারী।

ভারতে ইংরেজী শিক্ষার অশুভ ফল সম্বন্ধে উভয়ের চিন্তায় আপাত একা অন্ততঃ দেখা যায়। বিদেশী শিক্ষা যে আমাদের মধ্যে পরানুকরণ বাড়িয়ে আত্ম-মর্যাদার শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলেছে, সে-সম্বন্ধে স্বামীজীর মত ছিল সুস্পষ্ট। বহুবার সেকথা বলেছেন। তাঁর থেকে বড় আন্তর্জাতিক কল্পনা করা যায় না, বাইরের দান গ্রহণে তিনি সর্বদা উৎসুক, কিন্তু জাতীয় বৈশিষ্ট্যের বিনিময়ে নয়। গান্ধীজীও তাই বিশ্বাস করতেন। সেই বিশ্বাসকে অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে কাজে পরিণত করতে গিয়ে কিছুটা সংকীর্ণতা এসে গিয়েছিল, আদর্শের বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে তা ঘটেই থাকে। এক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত উপস্থিত করছি। ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে গান্ধীজী উড়িষ্যায় এক ভাষণ প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন, ২৩ এপ্রিলের ইয়ং ইণ্ডিয়ায় তার সারমর্ম বেরিয়েছিল।—

"উড়িষ্যায় এক জনসভায় গান্ধীজীকে প্রশ্ন করা হয়, ইংরেজী শিক্ষাকে কি (অমিশ্র মন্দ না বলে) মিশ্র মন্দ বলা যায় না, যেহেতু লোকমান্য তিলক, রাজা রামমোহন রায় এবং শ্রীযুক্ত গান্ধী এই ইংরেজী শিক্ষারই উৎপাদন? শ্রীযুক্ত গান্ধী নিম্নলিখিত উত্তর দেন—

"'...এই শিক্ষাপদ্ধতি অনপনেয় পাপ। এই পদ্ধতিকে ধ্বংস করতে আমি আমার শ্রেষ্ঠ শক্তি প্রয়োগ করেছি। একথা আমি কদাপি বলতে পারি না যে, এই পদ্ধতি থেকে কোনো সুবিধা আমরা পেয়েছি। যেসব সুবিধা পেয়েছি, তা এই পদ্ধতি ব্যতিরেকেই পাওয়া গিয়েছে। যদি ইংরেজ না আসত তাহলে ভারত পৃথিবীর অন্যান্য অংশের সঙ্গে একসঙ্গে চলত। এদেশে মোগল-শাসন বহাল থাকলেও কিছু লোক ইংরেজী ভাষাকে ভাষা রূপে শিখত, তার সাহিত্যের জন্যও শিখত। বর্তমান পদ্ধতি আমাদের দাস করে রেখেছে—ইংরেজী সাহিত্যকে নির্বাচন করে গ্রহণ করতে তা দেয় না। আমার প্রশ্নকর্তা বন্ধু, তিলক, রামমোহন ও আমার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। আমার কথা ছেড়ে দিন, আমি হতভাগ্য বামন ছাড়া কিছু নই। কিন্তু তিলক ও রামমোহন আরও অনেক বিরাট পুরুষ হতে পারতেন যদি না তাঁদের মধ্যে এই শিক্ষা সংক্রামিত হত। (করতালি)। আমি আপনাদের বাইরের করতালির সমর্থন চাই না, যুক্তি ও বুদ্ধির সমর্থন চাই। ইংরেজী শিক্ষাকে অন্ধ মোহবস্তু করার আমি বিরোধী। তাই বলে আমি ইংরেজী শিক্ষাকে

ঘৃণা করি না। যদি আমি বলি, সরকারকে আমি ধ্বংস করতে চাই, তখন আমার এই অভিপ্রায় নয় যে, ইংরেজী ভাষাকেও ধ্বংস করব। একজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী হিসাবে আমি ইংরেজী ভাষাশিক্ষা করব। জনসাধারণের উপর প্রভাবের দিক দিয়ে চৈতন্য, শঙ্কর, কবীর ও নানকের তুলনায় রামমোহন ও তিলক (আমার কথা ছেড়ে দিন) বামন ছাড়া কিছু নন। ঐ সব বিরাট ব্যক্তিদের পাশে রামমোহন ও তিলক সত্যই বামন। একা শঙ্কর যা করতে পেরেছিলেন, ইংরেজী-জানা সকল লোক জুটেও তা করতে সমর্থ হন নি। দৃষ্টান্ত আমি বাড়িয়ে যেতে পারি। গুরু গোবিন্দ কি ইংরেজী শিক্ষার উৎপাদন? নানক একটি সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেছিলেন, সাহসে ও আত্মত্যাগে যার দ্বিতীয় নেই—এই নানকের পাশে দাঁড় করাবার মত ইংরেজী-জানা একজন ভারতীয়কেও কি পাওয়া যাবে? রামমোহন রায় কি দলীপ সিং-এর মত একজন শহীদও সৃষ্টি করতে পেরেছেন? রামমোহন ও তিলককে আমি গভীর শ্রদ্ধা করি। আমার বিশ্বাস, রামমোহন ও তিলক যদি ইংরেজী শিক্ষা না পেয়ে জাতীয়ভাবে শিক্ষিত হতেন, তাহলে তাঁরা শ্রীচৈতন্যের মত বৃহত্তর ব্যাপার ঘটাতে পারতেন।"

গান্ধীজীর এই মন্তব্য তিক্ত বিতর্কের সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন সম্বন্ধে pigmy শব্দ ব্যবহারের তীব্রতম প্রতিবাদ করেন। গান্ধীজী জানান, তিনি সর্বাত্মক অর্থে বামন শব্দের ব্যবহার করেন নি, আপেক্ষিক অর্থে, অর্থাৎ চৈতন্যাদির সঙ্গে তুলনা করে ঐ কথা বলেছেন। সর্বাত্মক বা আপেক্ষিক, কোনো অর্থেই রামমোহন বা তিলক সম্বন্ধে বামন শব্দের ব্যবহার সঙ্গত নয়, এবং স্বামীজী যেখানে রামমোহনের মনীষা সম্বন্ধে বিপুল শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, ('A man of gigantic intellect'), দূরদৃষ্টি সম্বন্ধেও, এবং তিলক সম্বন্ধে যাঁর গভীর সম্ভ্রমবোধ ছিল, সেখানে তাঁদের বিষয়ে ঐ শব্দটির প্রয়োগ তাঁর পছন্দ না হতে পারে—কিন্তু, এখানে সুস্পষ্ট ভাবে জানানো উচিত, চৈতন্যাদি, যাঁদের স্বামীজী 'আচার্য' মনে করতেন তাঁদের তুলনায় রামমোহন প্রভৃতি বুদ্ধিজীবী সংস্কারকদের স্থান সম্বন্ধে গান্ধীজীর বক্তব্যের তাৎপর্যে (শব্দে নয়) তাঁর আপত্তি ছিল না। অন্ততঃ বর্তমান লেখকের তাই ধারণা। গান্ধীজী অগণ্যবার বলেছেন, আধ্যাত্মিক নেতারাই ভারতের যথার্থ নেতা। 'আধ্যাত্মিক নেতা' শব্দটি গান্ধীজী এখানে ব্যবহার না করলেও যাঁদের নাম করেছেন, সেই শঙ্কর, চৈতন্য, নানক, কবীর—সকলেই অধ্যাত্মবীর।

বিবেকানন্দের সামনে রামমোহনের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্র ছিল। রামমোহন বিবেকানন্দের বুদ্ধিকে তৃপ্ত করতে পারেন (সামাজিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারেই মাত্র)—বিবেকানন্দের আত্মাকে গঠন করেছিলেন রামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন বিবেকানন্দ—বিবেকানন্দের জন্য নিবেদিতা থেকে সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত অগণ্য বীরচরিত্র। গান্ধীজীর সামনেও শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্র ছিল। গান্ধীজী জানতেন, পূর্বকালের চৈতন্যাদির মত একালের রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতির সৃষ্টি করেছেন। যদি গান্ধীজী রামকৃষ্ণের নাম না করে থাকেন তার কারণ, অত্যন্ত নিকট কালের কারো নাম করে অধিকতর বিতর্কে তিনি জড়িয়ে পড়তে চান নি। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল নিম্নোক্তরূপ:

"রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন কাহিনী ধর্মকে বাস্তবে রূপায়ণের কাহিনী। তাঁর জীবন ঈশ্বরের মুখোমুখি দাঁড়াতে আমাদের সাহায্য করে। তাঁর জীবনকথা পড়লে একথা অনুভব না করে কেউ পারবেন না যে, একমাত্র ঈশ্বরই সত্য, আর সবই মায়া। রামকৃষ্ণ ছিলেন সদ্‌গুণের জীবন্ত বিগ্রহ। তাঁর উপদেশগুলি নিছক পাণ্ডিতের উক্তি নয়, 'জীবন-গ্রন্থের'ই পৃষ্ঠা সেগুলি। সেগুলি তাঁর নিজ অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিরই প্রকাশ। তার ফলে, পাঠকচিত্তকে অনিবার্যভাবে তা অধিকার করে। এই সংশয়ের যুগে রামকৃষ্ণ জ্যোতির্ময়, জীবন্ত বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সহস্র সহস্র নরনারী—যারা হয়ত আধ্যাত্মিক আলোক না পেয়েই জীবন কাটাত—তাদের কাছে রামকৃষ্ণের জীবন পরম সান্ত্বনার বিষয় হয়েছে। সে জীবন অহিংসার আদর্শ দৃষ্টান্ত। তাঁর প্রেম সীমাহীন, ভৌগোলিক বা অন্যবিধ বন্ধনকে তা স্বীকার করেনি। তাঁর জীবনীর পৃষ্ঠাগুলি যাঁরা পড়বেন তাঁদের কাছে তাঁর দিব্য প্রেম যেন প্রেরণার উৎস হয়।"

(অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনীর ভূমিকা)

এখানে এটুকু স্বচ্ছন্দে বলা যায়, আধ্যাত্মিক ধারনার ব্যাপারে বিবেকানন্দের সঙ্গে গান্ধীজীর যেসব ঐক্য রয়েছে বলে মনে হয়, সে ঐক্য আসলে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে। ঐক্য যথেষ্টই ছিল—যেমন ব্রহ্মচর্য ধারণায় কিংবা সর্বজনীন ধর্মবোধে। বিবাহিত জীবনে গান্ধীজীর ব্রহ্মচর্য, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের ধারাপথেই এসেছে। শ্রীরামকৃষ্ণে যার উচ্চতম অধিকার, গান্ধীজীর ক্ষেত্রে তার ক্রমোপার্জন। সর্বধর্মের প্রতি গান্ধীজীর শ্রদ্ধা, তাদের সত্যকে অঙ্গীকার করায় তাঁর আগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর প্রয়োগ রূপকেই যেন দেখিয়ে দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে গান্ধীজী 'অহিংসা'র পূর্ণতম প্রকাশ দেখেছিলেন। গান্ধীজীর সম্বন্ধে আমরা যদি সামান্য কিছুও জানি তাহলে নিশ্চয় স্বীকার করব, অহিংসার পূর্ণ প্রকাশ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে ঘটেছে, একথা গান্ধীজী যখন বলেছেন, তখন তিনি তাঁর সর্বোচ্চ শ্রদ্ধাই প্রকাশ করেছেন। অকারণে তা করেন নি, শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন থেকে অজস্র দৃষ্টান্ত তুলে দেখিয়ে দেওয়া যায় গান্ধীজীর ধর্মজীবনের আদর্শপুরুষ কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ হয়েছেন।*১২

১২* ১৯৩৬ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতায় ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হয়। মহাত্মা গান্ধী ধর্মমহাসভার সাফল্য কামনা করে সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা-বার্তা পাঠান। ওয়ার্ধা থেকে কাকা কালেলকর এসেছিলেন একদিনের অধিবেশনের সভাপতিত্ব স্বীকার করে। তাঁকে ধর্মমহাসভায় গান্ধীজীর প্রতিনিধি বলে ধরে নেওয়া যায়। ক্ষুদ্র উদ্বোধনী ভাষণে তিনি পৃথিবীতে ধর্মের সংকট এবং সেই সংকট দূরীকরণে ধর্মমহাসভার গুরুত্বের বিষয়ে বলেন। "ধর্ম মানবজীবনের সর্বপ্রধান ঐক্যবন্ধনের শক্তি। আমি আনন্দিত যে, এখানে আমরা ভারতের বিরাট অধ্যাত্মপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নামে মিলিত হয়েছি। সকল ধর্ম সত্য, গ্রহণযোগ্য এবং সমভাবে উন্নয়নের ক্ষমতাসম্পন্ন—একথা তিনিই আমাদের কাছে প্রমাণ করেছেন, মনীষার দ্বারা নয়, নানাপথে আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা। সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণের নামেই ধর্মমহাসভা আহূত হওয়া উচিত। ১৮৯৩ সালে চিকাগোয় প্রথম ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের সুবিখ্যাত শিষ্য ভারতের প্রতিনিধিরূপে সেখানে গিয়েছিলেন। ধর্মমহাসভা আজ এসেছে ভারতবর্ষে এবং তা অনুষ্ঠিত হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের নামে।"

ঐ সভায় ভাষণের মধ্যে কাকা কালেলকর মহাত্মা গান্ধীর একটি চিঠি পড়ে শুনিয়েছিলেন। চিঠিটি হিন্দীতে লেখা হয়েছিল, কালেলকর তার ইংরাজি অনুবাদ উপস্থিত করেছিলেন। "শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য নামে" সভা আহূত বলে গান্ধীজী আশা করেন "ধর্মসভা সত্যই এমন কিছু করবে যা সর্ব ধর্মের মানুষকে পথনির্দেশ ও নেতৃত্ব দেবে।" কালেলকরের অনুবাদে চিঠিটি ছিল এই:

"You are going to the *Dharma Sabha*—the Parliament of Religions. It is associated with the holy name

সুতরাং ধর্মের ক্ষেত্রে গান্ধীজী বিবেকানন্দকে যেখানে গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন—তা বিবেকানন্দের মধ্যস্থিত রামকৃষ্ণই, তাতে সন্দেহ নেই। তাছাড়া বলা যায়, ধর্মের সুগভীর তত্ত্বালোচনায় গান্ধীজীর সমধিক আগ্রহ ছিল না। ধর্মজীবন তাঁর মধ্যে সংসারজীবনের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে বিকাশলাভ করেছে। অপরদিকে, বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে, ধর্ম ও ঈশ্বরই জীবনসাধনা। সুতরাং তিনি কখনই ধর্মের গভীর রহস্যের মধ্যে ডুব না দিয়ে থাকতে পারেন নি—তাঁর মধ্যে প্রবুদ্ধ প্রেরণাপুরুষের ভাব থাকতই—গান্ধীজী সেখানে নীতিবাদীর ভূমিকা নিয়েছেন।

॥ ৬ ॥

বিবেকানন্দকে গান্ধীজী বিশেষভাবে গ্রহণ করেছেন দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের ক্ষেত্রে। বিবেকানন্দের সম্বন্ধে যখন কিছু বলেছেন তখন ঐসব দিকেই জোর ছিল। এই দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের ব্যাপারে বিবেকানন্দের প্রভাব গান্ধীজীর জীবনে সুগভীর। তা তিনি স্বীকারও করেছেন। এ বিষয়ে প্রথমে আমরা ১৯২১ সালের ৩০ জানুয়ারী তারিখে স্বামীজীর জন্মোৎসবে অকস্মাৎ বেলুড় মঠে তাঁর আগমন ও সংক্ষিপ্ত ভাষণের উল্লেখ করব। প্রবুদ্ধ ভারতের মার্চ, ১৯২১ সংখ্যার বিবরণ এইরূপ:

"The 59th anniversary of the birthday of Swami Vivekananda was celebrated on Sunday, Feb., 6, at the Belur Math with great success.... An incident of the day was the unexpected arrival of Mahatma Gandhi with some ladies who came to pay a tribute of homage to Swami Vivekananda's memory—the patriot-saint of India. The Mahatma and his companions asked many questions—as to how many institutions the Mission had, how many workers—the Mayavati Ashram on the Himalayas, how to go there and so forth. They then visited the temple-room which was strewn with roses, the offerings of devotees and gaily decorated, and enquired of the method of worship, not overlooking even the figure of Mahavir in the temple-room. The attention of the Mahatma was then drawn to the figure of Sri Ramakrishna's wife and on enquiry he was told of the life led by her madonnahood,—her life-long purity. They then visited the 'Sayan Ghar' or resting house of Sri Ramakrishna lying alongside, where some of the articles used by Sri Ramakrishna are still preserved with great care and reverence. Mahatma Gandhi touched the mattress used by Sri Ramakrishna and was shown the handwriting of Sri Ramakrishnadev as preserved in 'Mahabir Pala' written by him. The Mahatma and his companions were astonished to see the fairness and neatness of writing of him who could with difficulty write his name out and spoke about his unlearned wisdom."

উদ্বোধনের ১৩২৮ সালের বৈশাখ মাসের 'সংবাদ'-এ উপরি-উক্ত বিষয়ে পাই:

"স্বদেশ সেবক মহাত্মা গান্ধী সস্ত্রীক এই দিবস শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন এবং (স্বামীজীর) উৎসবে যোগদান করেন। তাঁহার সহিত শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহরু, মৌলনা মহাম্মদ আলি এবং অপরাপর দেশনায়করা আগমন করেন। জনসাধারণের অনুরোধে মহাত্মা গান্ধী হিন্দীতে একটি বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, "আচার্যের বাক্যাবলী তাঁহার জীবনে নূতন আলোক আনয়ন করিয়া নূতনভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। তোমরাও এই পুণ্যদিবসে তাঁহার মন্দির হইতে নূতন ভাব ও আলোক লাভ করিয়া স্বদেশসেবায় নিযুক্ত হও।"১৩

of Sri Ramakrishna. I do hope that the *Sabha* will do something this that will give a lead and will guide the followers of all Faiths. What will the Parliament say in respect of all the religions? Are all the religions equal as we hold or is there any one particular religion which is in the sole possession of truth. the rest being either untrue or a mixture of truth and errors as many believe? The opinion of the Parliament in such matters must prove helpful guidance for us." (*The Religions of the World*, Vol. I)

১৩ উদ্বোধনের ঐ সংবাদে আরও ছিল—"তাঁহার বক্তৃতা সম্বন্ধে অনেক অলীক কথা বহু দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহার প্রতিবাদও করিয়াছি। হিন্দী ভাষায় অনভিজ্ঞতা হেতু বোধহয় অনেকে অনেক কথা কল্পনা করিয়া লইয়াছেন।"

সমকালীন দৈনিক সংবাদপত্রের মধ্যে অমৃতবাজার বা বেঙ্গলীতে সন্ধান করে প্রথমে কোনো রিপোর্ট আমাদের চোখে পড়ে নি।

আমরা ৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯২১-এর পর থেকে নানা সংবাদপত্র সন্ধান করেছিলাম। প্রবুদ্ধভারত ও উদ্বোধনের সংবাদে বেলুড় মঠে গান্ধীজীর আগমনের তারিখ ৬ই দেওয়া ছিল। বেঙ্গলী ও অমৃতবাজারে গান্ধীজীর বেলুড় মঠ দর্শন সংবাদ কিন্তু সত্যই বেরিয়েছিল, তবে ৬ই ফেব্রুয়ারীর পরবর্তী কোনো তারিখে নয়, ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে, করণ গান্ধীজী ৩০শে জানুয়ারী তারিখে বেলুড় মঠে যান, এবং প্রবুদ্ধভারতে ভুল তারিখ ছাপা হয়েছিল। বেঙ্গলীতে প্রকাশিত এই রিপোর্টের সন্ধান আমাকে দেন শ্রদ্ধেয় শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। সেই সঙ্গে উক্ত রিপোর্টের তথ্যভ্রান্তির প্রতিবাদ করে ১ মুখার্জি লেন, বাগবাজারের দেবেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী সংবাদপত্রে যে প্রতিবাদপত্র পাঠান তার অনুলিপিও তাঁর কাছ থেকে পাই। বেঙ্গলীতে বেরিয়েছিল—

Swami Vivekananda
Birthday Celebration at Belur
Mr. Gandhi's address to
Students and Policemen

The birthday of the late Swami Vivekananda was celebrated on Sunday afternoon at the Belur monastery. There was a huge gathering. Messrs. Gandhi, Mohamad Ali and Pandit Nehru were present. A meeting was held at the

রামকৃষ্ণ মিশনের অন্য কেন্দ্রেও গান্ধীজী গিয়েছেন, এবং অল্পবিস্তর ভাষণ দিয়েছেন।

১৯২১ সালের ১৪ মার্চ তারিখে রেঙ্গুনে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের ৯৪তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে গান্ধীজী সভাপতিত্ব করেন। সেখানে বলেছিলেন—

"যেখানেই আমি যাই, রামকৃষ্ণের অনুগামীরা আমাকে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য আহ্বান করেন। সারা ভারতে তাঁদের সেবাকাজের বিস্তার। ভারতের এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে তাঁরা ক্ষুদ্র বা বৃহৎভাবে প্রতিষ্ঠিত হন নি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তাঁরা আরও বিস্তারলাভ করুন। যাঁরা পবিত্র-চিত্ত, যাঁরা ভারতকে ভালবাসেন, তাঁরা সকলে এঁদের সঙ্গে মিলিত হোন।"

গান্ধীজীর পরে মৌলনা মহম্মদ আলীও বিবেকানন্দের মহিমার কথা বলেন।

(রোলাঁর বিবেকানন্দ-জীবনী)

১৯২৭ সালে সিংহল ভ্রমণকালে কলম্বো বিবেকানন্দ সোসাইটিতে ১৩১১ ২১ তারিখে প্রদত্ত তাঁর ভাষণের অংশ :

"আপনারা যে অভিনন্দনপত্র এবং তৎসহ টাকার তোড়া দিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। যে অল্পসময় পেয়েছি তারই মধ্যে আপনাদের সমিতির মুদ্রিত কার্যবিবরণীতে চোখ বুলোবার চেষ্টা করেছি। আপনাদের কার্যাবলীর জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিবেকানন্দের নাম যাদুমন্ত্রস্বরূপ। ভারতবর্ষের জীবনে তিনি অনপনেয় প্রভাব রেখে গেছেন। ভারতের নানা স্থানে তাঁর নামে স্থাপিত সমিতি দেখা যায়—রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা-গুলির কথা বাদ দিয়েই বলছি।

"এই সভায় আপনাদের বেশীক্ষণ আটকে রাখা ঠিক হবে না দেখতে পাচ্ছি। বাইরে অধৈর্য জনতা অপেক্ষা করছে। এখন শুধু এইটুকু বলতে চাইছি—আমি এই সমিতির সাফল্য কামনা করি, সেই সঙ্গে যোগ করে দিচ্ছি, আপনাদের কার্যাবলী অসম্পূর্ণ

---

monastery. Mr. Gandhi in Hindi appealed to the students to pledge themselves on the holy place not to go back to their colleges who had already left them. Those who were still hesitating to come out were asked to make the same pledge by withdrawing from their colleges at once. Mr. Gandhi also spoke a few words to some Police constables who kere there, urging them to give up their jobs and to join the present movement for country's cause and thereby attain 'Swaraj'.

Mr. Mohammad Ali and Pandit Nehru also spoke at length on the subject, and the meeting terminated with shouts of 'Gandhi Maharaj-ki-jai'."

অমৃতবাজার পত্রিকায় অতঃপর আমরা সন্ধান করে দেখেছি একই তারিখে হুবহু একই রিপোর্ট বেরিয়েছিল।

রিপোর্টটি কিছু বিচিত্র। এই রিপোর্ট সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর প্রতিবাদ-পত্র ৩রা তারিখে বেঙ্গলীতে বেরিয়েছিল। দেবেন্দ্র গাঙ্গুলী লিখেছিলেন, রিপোর্টার হিন্দী ভাষায় অনভিজ্ঞ হওয়ায় গান্ধীজীর বক্তব্য ভুলভাবে প্রকাশ করেছেন। গান্ধীজী কখনই পুলিশ কনস্টেবলকে কর্মত্যাগ করতে বলেন নি, বরং বলেছিলেন, তারা যেন বর্তমানে কাজ না ছাড়ে। পরে অবশ্য তাদের কাজ ছাড়বার সময় সত্যই আসতে পারে, কিন্তু সে সময় এখনো আসে নি। পুলিশ যেন মনে রাখে, সে সরকারের ভৃত্য নয়, জনসাধারণেরই ভৃত্য। জন-সাধারণের প্রতি তাদের ব্যবহার যেন সহৃদয় হয়। মতিলাল নেহরু ও মহম্মদ আলি বেলুড়ে বক্তৃতা করেছিলেন, একথা একেবারেই ভুল, দেবেন্দ্র গাঙ্গুলী জানিয়েছিলেন।

অমৃতবাজারে ওঁর পত্র একদিন পরে বেরিয়েছিল। তাতে বেঙ্গলীর পত্রের অতিরিক্ত কিছু কথা ছিল। "He did not ask the students to take any oath about leaving their colleges at that holy place but asked them to take inspiration from that holy place sanctified by the memory of the late Swami Vivekananda."

সংবাদপত্রের রিপোর্টকে বিচিত্র বলেছি এই জন্য যে, স্বামীজীর জন্মোৎসবে বক্তৃতা করতে উঠে গান্ধী বিবেকানন্দের বিষয়ে কিছু না বলে ছাত্রদের স্কুল-কলেজ ছাড়তে এবং পুলিশকে কাজ ছাড়তে প্ররোচনা দেবেন, এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন গান্ধীজী কখনই ছিলেন না। স্বামীজী সম্বন্ধে তিনি নিশ্চয় কিছু বলেছিলেন, অথচ উদ্বোধনে সামান্য এক লাইন ছাড়া অন্যত্র তার কোনো পরিচয় নেই। আমরা দেখতে পাই রোমা রোলাঁ আরও কয়েক বছর পরে বিবেকানন্দ-জীবনীতে এই বক্তৃতাটির উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছিলেন—

"On January 30, 1921, Gandhi went on pilgrimage with his wife and several lieutenants (Pandit Matilal Nehru, Maulana Muhammad Ali, etc.) to the sanctuary of Belur for the anniversary festival of Vivekananda's birth; and from the balcony of his room declared to the people his veneration for the great Hindu, whose word had lighted in him the flame of love for India." (রোলাঁর বিবেকানন্দ-জীবনীর পরিশিষ্ট)।

বিবেকানন্দ-জীবনীর মধ্যে রোলাঁ আর একজায়গায় লিখেছেন—

"Gandhi affirmed in public that the study of the Swami's books had been a great help to him and that they had increased his love and understanding of India."

রোলাঁর বিবেকানন্দ-জীবনী বিখ্যাত, ভারতবর্ষে বহু পঠিত; গান্ধীজী স্বয়ং সে গ্রন্থ না পড়তে পারেন, কিন্তু তাঁর অন্তরঙ্গগণ নিশ্চয় পড়েছিলেন এবং গান্ধী-সংক্রান্ত ভুল কিছু তথ্য থাকলে নিশ্চয় জানতেন।

গান্ধীজী, স্বামীজীর রাজযোগ বইখানি খুব যত্ন করে পড়েছিলেন একথা টেন্ডুলকরের গান্ধী-জীবনী থেকে পাই।

যাই হোক, স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রণীত *History of the Ramakrishna Math and Mission* গ্রন্থে ঐ বক্তৃতার যে সারমর্ম পাই তা হল :

"The Mahatma said . . . . that he had not come there to preach either Non-co-operation or the spinning wheel, but that he had come that day to pay his respects and homage to the sacred memory of Swami Vivekananda on the occasion of his birthday celebration; that he had carefully read the works of the Swami, as a result of which his love for the country had become intensified; and that his request to the young men was that they should not leave that day without imbibing some inspiration from the place where Swami Vivekananda had lived and breathed his last."

স্বামী গম্ভীরানন্দ জানিয়েছেন, এই বক্তৃতার সারমর্ম তিনি 'মহাপুরুষ শিবানন্দ' গ্রন্থ থেকে নিয়েছেন।

থেকে যাবে যদি না আপনারা যে-কাজের দ্বারা দরিদ্রনারায়ণের যথার্থ সেবা হবে, তা করেন। চরকার মর্মবাণীর সম্বন্ধে আপনাদের সমাদরের নিদর্শন আপনাদের প্রদত্ত এই টাকার তোড়া। বিবেকানন্দের নামে যখন আপনাদের প্রতিষ্ঠানের নাম, তখন আপনারা ভারতের নিরন্ন মানুষকে উপেক্ষা করতে পারেন না। সর্বত্র এই বিশ্বাস জেগেছে যে, চরকা ভিন্ন ভারতের কোটি কোটি মানুষের সেবা করা সম্ভব নয়।" (মহাদেব দেশাইয়ের *With Gandhiji in Ceylon* গ্রন্থ থেকে গৃহীত ও অনূদিত)।

১৯৩৪ সালে মাদ্রাজে রামকৃষ্ণ মঠ পরিচালিত অস্পৃশ্যদের সেবার জন্য সংগঠিত প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে সেখানকার কার্যাবলী দেখে তিনি খুশি হন, সারা ভারতে রামকৃষ্ণ মিশন যেসব সেবাকাজ চালাচ্ছেন তার জন্য অভিনন্দন জানান, রামকৃষ্ণ মিশন আন্দোলনকে 'হিন্দু ধর্মের বিশুদ্ধি আন্দোলন'রূপে চিহ্নিত করেন এবং এই মহৎ আন্দোলনে অধিক পরিমাণে অংশ গ্রহণের জন্য যুবকদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান।১৪

১৪ "During his short stay Madras, Mahatma Gandhi responded to the call of the Harijan inhabitants of three Cheris in which the Thondor Sangam, organised by the R. K. Math, Madras, has been doing reconstruction work on the lines laid down by Swami Vivekananda... At about 9 a.m., on the 21st of December 1933, Mahatmaji motored to the place and was received by the Swamis, the members of the Sangam and the Harijans. An address was presented and the Mahatma gave a fitting reply which will be enshrined in the hearts of all those present on the happy occasion. He congratulated the Mission on the good work it is doing throughout India, and stressed that the Ramkrishna Mission is a "movement for self-purification within Hinduism." In the end he exhorted young men to take part in large numbers in this noble work." (*Vedanta Kesari*, Jan. 1934).

গান্ধীজীর লেখায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বিক্ষিপ্ত উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি স্মরণীয় উল্লেখ আছে ১৯৩৩ সালের ৬ই মে তারিখের হরিজন পত্রিকার মূল সম্পাদকীয় রচনায়, যার নাম—"His will be done!" বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে হরিজনদের পৃথক করবার জন্য ম্যাকডোনাল্ড অ্যাওয়ার্ডে যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তার প্রতিবাদে আমৃত্যু অনশন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন গান্ধীজী। তাঁর এই মারাত্মক সিদ্ধান্ত শুনে বাথার্ত নিষেধের ধ্বনি উঠেছিল সারা দেশে। গান্ধীজী প্রতিজ্ঞায় অবিচল থাকেন। জীবনের সে সংকট লগ্নে যে-সব মৃত্যুঞ্জয়ী বীরদের তিনি স্মরণ করেছিলেন তাঁরা হলেন—রামকৃষ্ণ ও দয়ানন্দ, বিবেকানন্দ ও রামতীর্থ। গান্ধীজীরও রচনার কিয়দংশ মূলে উদ্ধৃত করছি:

> "....I therefore feel confident that in the end these kindest friends will recognise the correctness of the action I am about to take. And this whether I die or live. God's ways are unscrutable. And who knows that He may not want my death during the fast to be more fruitful of beneficial results than my life? Surely it is highly depressing to think that a man's ability to serve dies with the dissolution of the body which for the moment he is inhabiting. Who doubts that the spirits of Ramkrishna and Dayananda, Vivekananda and Ramathirth are to-day working in our midst? It may be that they are more protent to-day than when they were in our midst in the flesh! It is not true that 'the good that men do is oft buried with them.' We burn the evil that men do with their mortal remains. We treasure the memory of the good they do, and distance only magnify it."১৫

১৫ ইয়ং ইণ্ডিয়ার, হরিজন পত্রিকার, এবং মহাদেব দেশাইয়ের 'উইথ গান্ধীজী ইন সিলোন' গ্রন্থের উদ্ধৃতিগুলি আমি শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার বসুর কাছ থেকে পেয়েছি। এজন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ।

॥ সাত ॥

গান্ধীজীর উপরে স্বামীজীর প্রভাব নির্ণয় করতে হলে প্রধানতঃ ভারতবর্ষের সামাজিক সমস্যার দিকেই দৃষ্টি দিতে হবে। সেই ক্ষেত্রে গান্ধীজীর উপরে স্বামীজীর বিপুল প্রভাব গান্ধীজীর সহকর্মী ও জীবনীকাররা স্বীকার করেছেন। গান্ধীজীকে অহিংসার ঋষি হতে বিবেকানন্দ সাহায্য করেন নি, সেবাভাবও গান্ধীজীর মধ্যে পূর্ব থেকে বর্তমান ছিল, কিন্তু ভারতের দুটি মূল সমস্যা—জাতিভেদজাত অস্পৃশ্যতা এবং দারিদ্র্য—এই দুই ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের যন্ত্রণাময় চিন্তার উত্তরাধিকার গান্ধীজী নিয়েছিলেন। গান্ধীজীর রাজনৈতিক জীবনের প্রধান অংশ এই দুই সমস্যার সমাধানে নিযুক্ত ছিল। তাঁর হরিজন আন্দোলন ও চরকাতত্ত্ব এই জন্যই। এর সঙ্গে গান্ধী-আন্দোলনের ফলে নারী জাগরণের কথা ভাবলেও আমাদের মনে পড়বে স্বামীজীর বাণী। ভারতের অভ্যুত্থান ভারতীয় জনগণের অর্ধাংশকে বাদ দিয়ে সম্ভবপর নয়—একথা তাঁর থেকে জোরের সঙ্গে আর কে বলেছেন? এখানে ভগিনী নিবেদিতার রচনা থেকে এই বিষয়ে সামান্য কিছু উদ্ধৃত করছি:

> "আমাদের আচার্যদেব যে সংঘভুক্ত ছিলেন, তাহার বিষয়ে মনে করিতেন, নারী ও জনগণের উন্নতি করাই এই সংঘের ব্রত।...বিদেশে যখন তাঁহার মনে হইয়াছে মৃত্যু বুঝি সন্নিকট, তখনি সমীপস্থ শিষ্যকে বলিয়াছেন —'কখনো ঐ আসল কথাটা ভুলবে না —নারী ও জনগণ।'...
>
> "স্বামীজীর মতে সমাজের উচ্চশ্রেণীর বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানলাভের যেমন অধিকার আছে, তাঁহাদের নিম্নশ্রেণীর ভ্রাতৃগণেরও তেমনি রহিয়াছে। শিক্ষা পাইলে তাহারা স্বাধীনভাবে নিজেদের ভাগ্য নিজেরা নির্ধারণ করিবে। ভারতে এখন আধুনিক যুগের অভ্যুদয়কাল। ভারতবাসীরা এখন ঐহিক জ্ঞানের দ্বারা মানুষ হইতে শিখিবে। সুতরাং জনগণের মধ্যে কিভাবে ঐহিক জ্ঞানের বিস্তার ঘটানো যাইতে পারে তাহা স্বভাবতই স্বামী বিবেকানন্দের নিকট সর্বাপেক্ষা গুরুতর প্রশ্ন হইয়াছিল।
>
> "তিনি বুঝিয়াছিলেন, ভারতে পুনরায় ঐহিক সম্পদের অভ্যুদয় ঘটাইতে হইলে সমগ্র জাতির শক্তি ও সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। আর তিনি বেশ জানিতেন যে, ঐহিক সম্পদের

পুনঃপ্রতিষ্ঠাই সর্বাগ্রে আবশ্যক। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিতার সঙ্গে বলিয়াছিলেন—'যে-ঈশ্বর ইহজীবনে আমাকে একটুকরো রুটি দিতে পারেন না, তিনি পরজীবনে আমাকে স্বর্গরাজ্য দিবেন একথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না।' তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন যে, একমাত্র জনশক্তির দ্বারাই, সমগ্র দেশ যে মহান্ চিন্তা ও ধর্মোৎকর্ষের উত্তরাধিকারী হইয়াছে, তার প্রতি শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে। যাহাই হউক না কেন, সর্বসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার বিরাট আন্দোলন উপস্থিত করিতে পারিলেই উচ্চশ্রেণীগুলির ধমনীতে নবজীবন সঞ্চারিত হইতে পারিবে। তাঁহার বিশ্বাস ছিল—উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিলেই মানুষ নেতৃত্বের সনদ লাভ করে, এই ধারণাকে সর্বতোভাবে পরিহার করিতে হইবে। অনুশীলনের দ্বারা সুমার্জিত যে সহজ বুদ্ধিকে প্রতিভা আখ্যা দেওয়া হয়, তাহার উদ্ভব ব্রাহ্মণ বা কায়স্থের মধ্যে যেমন, হওয়া সম্ভবপর, সামান্য দোকানদার বা লাঙলধারী কৃষকের মধ্যেও তেমনি সম্ভবপর। সাহস ব্যাপারটা যদি ক্ষত্রিয়েরই একচেটিয়া সম্পত্তি হইত, তাহা হইলে তাঁতিয়া ভীল কোথায় থাকিতেন? তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, বিধাতা যেন সমগ্র ভারতবর্ষকে গলাইবার পাত্রে স্থাপন করিতে উদ্যত—তাহার ফলে শক্তি ও মহিমার কোন্ কোন্ নবরূপ সৃষ্টি হইবে তাহা এখন বলা সম্ভব নয়।'

"তিনি পরিষ্কার বুঝিয়াছিলেন, ভারতীয় শ্রমিকদের শিক্ষা দেওয়া ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই কার্য, অপর কাহারও নয়। বিদেশীর দ্বারা বিদেশজাত জ্ঞানের প্রচলন করিলে তাহাতে যে কী অশেষ বিপদের সম্ভাবনা আছে, তাহা তাঁহার নিকট গোপন ছিল না।" ('স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি')

আলোচ্য বিষয়ে গান্ধীজীর উপরে স্বামীজীর প্রভাব সম্বন্ধে আমরা কয়েকটি সূক্ষ্মের উল্লেখ করব। আচার্য বিনোবা ভাবে গান্ধীজীর সাধনার শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারীরূপে বর্তমানে স্বীকৃত—তিনি লিখেছেন:

> "শ্রীরামকৃষ্ণের এই সমন্বয়ে বিবেকানন্দের বিশেষ দান হইল তিনি অদ্বৈতের সহিত দরিদ্রনারায়ণকে যুক্ত করিলেন। দরিদ্রনারায়ণ শব্দটি বিবেকানন্দের বিশেষ সৃষ্টি।...দরিদ্রনারায়ণ শব্দটি লোকমান্য তিলকের নিকট খুবই প্রিয় ছিল এবং বিবেকানন্দের পরে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ইহাকে জনপ্রিয় করিয়া তোলেন,—মহাত্মা গান্ধী ইহাকে ভারতের প্রতি গৃহে বহন করিয়া লইয়া যান এবং ইহার অনুসরণে গঠনমূলক কাজ শুরু করেন।.....
>
> "দুর্গতের সেবাই যে ঈশ্বরের সেবা—এই সত্যকে বাণীতে ও নিজ জীবনে প্রমাণ করার ব্যাপারে যীশুখ্রীস্টের দান সর্বাগ্রগণ্য। তাঁহার পূর্বে গৌতম বুদ্ধ আরও গভীরভাবে ভারতকে এই শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার ছিল সর্বাত্মক করুণা—সর্বজীবে পরিব্যাপ্ত। নিঃসন্দেহে তাহা সুমহান প্রেরণা, কিন্তু মানুষকে প্রত্যক্ষ সেবার যে-ব্রতের কথা আমরা বলিয়া থাকি তাহা খ্রীস্টের শিক্ষার মধ্যে প্রথম ব্যাপক ও বিশিষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। আমি খ্রীস্টকে যত দূর বুঝিয়াছি, তাহাতে মনে হয় তিনি ছিলেন অদ্বৈতবাদী, যদিও শঙ্করাচার্যের মত দার্শনিকভাবে নন।...দার্শনিক বিচার বাদ দিলে খ্রীস্টের প্রকাশ্য ভূমিকা অদ্বৈত বৈদান্তিকের।.....কিন্তু ভারতীয় বেদান্তের কথা ভাবিলে একথা বলিতেই হইবে, বিবেকানন্দই বেদান্ত ও অদ্বৈতের মধ্যে সমন্বয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই বিরাট কাজের ফলেই ভারতবর্ষ জীবনের ক্ষেত্রে সমন্বয়াদর্শ লাভ করিয়াছে, যাহাতে অদ্বৈত বিজ্ঞানের সঙ্গে বিভিন্ন অর্চনারীতি, নরসেবা এবং সর্বজীবসেবা সম্বলিত হইয়াছে।" (বিশ্ববিবেক)

গান্ধীদর্শনের বিশেষজ্ঞ, গান্ধীজীর এককালীন প্রাইভেট সেক্রেটারী অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু একটি প্রবন্ধে বলেছেন:

"গান্ধীজী প্রায় ৪০ বৎসর পরে তাঁহার অস্পৃশ্যতাবর্জন আন্দোলনে স্বামীজীকে অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং বিবেকানন্দের বাস্তব সুপারিশসমূহ বহুলাংশে গ্রহণ করিয়াছিলেন। গান্ধীজীও সকল জাতিকেই সমপর্যায়ভুক্ত করিবার প্রয়াসী ছিলেন, যে-শূদ্রগণ কায়িক পরিশ্রমে মানবজাতির সেবা করে, তাহাদের উপর তিনি দেবত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন যে, কায়িক পরিশ্রমে সমভাবে সকল জাতিই অংশ গ্রহণ করিয়া একটি জাতিতে পরিণত হইবে। উন্নত ধরনের শ্রমই হইবে অস্পৃশ্যদের মূল্য। কিন্তু প্রত্যেকেই মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবিকা অর্জন করিবে।"

(রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ প্রকাশিত বিবেকানন্দ স্মারক গ্রন্থ থেকে)

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত গান্ধীজীর উপরে স্বামীজীর প্রভাব বিষয়ে বলেছেন—

"ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য মহাত্মা গান্ধী যে-আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন তার ভিত্তি গঠনে বিবেকানন্দের প্রভাবই সম্ভবতঃ সর্বাধিক শক্তিশালী। স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ ও শিক্ষার মধ্যে বহু সমধর্মী জিনিস পাওয়া যাবে—তাদের কতকগুলি এমন কি বাইরের আকারের দিক দিয়েও প্রায় এক। ঈশ্বরমুখী ধর্মগুলির ভাবৈক্য, নিঃস্বার্থ ফলাকাঙ্ক্ষাহীন মানবসেবাকে—যা ঈশ্বরসেবারই নামান্তর—চরম মূল্যদান, সর্বপ্রকার দাসত্ব ও বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্ভয় সংগ্রাম, সকলের প্রতি ভালবাসা, শত্রুর প্রতিও,—এইগুলি হল স্বামীজী ও মহাত্মাজীর মধ্যে মূলগত যেসব প্রত্যয়ে ঐক্য ছিল তাদের কয়েকটি। বিবেকানন্দ ভয়হীন, স্বার্থবোধহীন সেবার যে-আহ্বান জানিয়েছিলেন, তা যেন মহাত্মাজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। উভয়েই দরিদ্রনারায়ণের পূজারী; তাঁরা মানবসেবার দ্বারাই ঈশ্বরসেবা করা হয়, এই কথায় বিশ্বাস করতেন; উভয়েই কুসংস্কার ও ধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন; এবং তাঁরা নিজ দেশবাসীর মধ্যে আত্মমর্যাদার ভাব ও সুমহৎ ভবিষ্যতে বিশ্বাসের ভাব জাগিয়ে তোলায় অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন।.....তাই বলে একথা আপনাদের বিশ্বাস করতে বলছি না যে, মহাত্মাজীর ধর্মীয় ও সামাজিক ধারণা গঠনের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দেরই একমাত্র প্রভাব। রাজনৈতিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে ঐ প্রভাব তো আরও কম, কারণ বিবেকানন্দ কখনই প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে লিপ্ত হন নি। কিন্তু এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, গান্ধীজীর রাজনৈতিক মতের সামাজিক ভাবনার অংশে বিবেকানন্দের শিক্ষা ও বাস্তব দৃষ্টান্তের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব প্রচুর পরিমাণে রয়েছে।"

(প্রবুদ্ধ ভারত, মে, ১৯৬৩)

গান্ধীজীর সহকর্মী বা ভক্তদের লেখা থেকে এই জাতীয় আরও বক্তব্য সহজেই হাজির করা যায়। কুমারাপ্পা বা কৃপালনীর লেখায় তার নিদর্শন আছে, পিয়ারীলালের লেখাতেও। গান্ধীজীর আমেরিকান জীবনীকার ভিনসেন্ট শীনের গান্ধীজীবনীতে (*Lead, Kindly Light*), এই প্রসঙ্গটি বহুল আলোচিত। রোমা রোলাঁও এক্ষেত্রে মূল্যবান মন্তব্য

করেছেন। ১৯৩১-এর ডিসেম্বরে গান্ধীজীর সঙ্গে আলাপের বিবরণ দিয়ে রোমা রোলাঁ যে দীর্ঘ চিঠি লেখেন তার মধ্যে এক জায়গায় 'সত্য' সম্বন্ধে গান্ধীজীর ধারণার সঙ্গে বিবেকানন্দের মনোভাবের ঐক্যের কথা বলেছেন।*১৬ রোমা রোলাঁ তাঁর বিবেকানন্দ-জীবনীতে ভারতীয় মহাজাতি গঠনে বিবেকানন্দের ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে পরবর্তীকালের উপরে তাঁর প্রভাব প্রসঙ্গে বলেছেন:

"বহু শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত শতেক জাতি লইয়া গঠিত একটি মহাজাতির ঐক্যের মূর্ত প্রকাশ তিনি (বিবেকানন্দ) ছিলেন। ঐ মহাজাতির মধ্যে প্রত্যেকটি জাতি আবার বহু বর্ণে ও উপবর্ণে বিভক্ত ছিল। যুদ্ধে ব্যক্তির রক্ত যেমন অতীব তরল থাকে এবং ঘনীভূত হয় না, তেমনি ছিল ঐ সকল জাতি। এবং বিবেকানন্দের আদর্শ ছিল কর্মে ও চিন্তায় ঐ জাতিগুলির মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা। তিনি কেবল যুক্তি দিয়া ভারতের ঐক্যকে প্রমাণ করেন নাই, তিনি আলোকের চকিত উদ্ভাসের মধ্য দিয়া ঐ ঐক্যকে ভারতের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন। উহাতেই নিহিত ছিল তাঁহার মহানত্বের দাবি। চিত্তাকর্ষক এবং উদ্দীপনাময় শব্দগুলিকে চিত্তের চক্ষুতে পিটাইয়া পুড়াইয়া গড়িয়া তুলিবার একটি প্রতিভা তাঁহার ছিল—ঐ সকল শব্দ হাজার হাজার মানুষের হৃদয় ভেদ করিয়া পৌঁছিত। তাঁহার একটি বিখ্যাত কথা, যাহা সর্বাপেক্ষা গভীরভাবে রেখাপাত করিত, তাহা হইল 'দরিদ্রনারায়ণ।' "যে একমাত্র ভগবান আছেন, যে-একমাত্র ভগবানে আমি বিশ্বাস করি— তিনি হইলেন সকল জাতির দুঃখী ভগবান, দরিদ্র ভগবান।" সঙ্গতভাবেই বলা চলে যে, ভারতের ভাগ্যকে বিবেকানন্দ পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার শিক্ষা সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল।...

"ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের (একটি বিশুদ্ধ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান) স্বরাজ্য দল যখন মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলে জয়লাভ করিলেন, তখন তাঁহারা সমাজসেবার জন্য একটি কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া তাহার নাম দিলেন 'দরিদ্রনারায়ণসূচী।' ঐ হৃদয়গ্রাহী কথাগুলি পুনরায় গান্ধীজী গ্রহণ করেন এবং সেগুলিকে তিনি অবিরাম ব্যবহার করিতে থাকেন। একই সঙ্গে ধর্মীয় ধারণার সহিত নিম্নশ্রেণীর মানুষের সেবাকে গ্রন্থিবদ্ধ করা হইয়াছিল। "তিনি সেবাকে এক দিব্য জ্যোতি দিয়া ঘিরিয়া তুলিয়াছিলেন এবং তাহাকে ধর্মের মহিমা দিয়াছিলেন।" ঐ ভাবটি ভারতের কল্পনাকে পাইয়া বসিয়াছিল। দুর্ভিক্ষে, বন্যায়, অগ্নিকাণ্ডে ও মহামারীতে সাহায্যদান, সেবাশ্রম ও সেবা-সমিতি সমস্ত দেশময় হু-হু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছিল। অথচ ত্রিশ বৎসর পূর্বে দেশে উহা একরকম অজ্ঞাতই ছিল।"

অসাধারণ ভাষায় ভারতবর্ষের নেতৃবৃন্দের জীবনে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাবের রূপটিকে রোলাঁ উন্মোচন করেছেন:

"এই 'মহত্তর ভারত', এই নতুনতর ভারত—যাহার বিকাশের কথা রাজনীতিকরা ও পণ্ডিতেরা উট পাখির মত আমাদের নিকট এতদিন লুকাইয়া আসিয়াছেন এবং যাহার বিস্ময়কর প্রভাব এখন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে—রামকৃষ্ণের আত্মায় তাহা পরিপূর্ণ। পরমহংসের, এবং যে বীর পরমহংসের চিন্তাকে কর্মে পরিণত করিয়াছিলেন, উভয়ের যুগল নক্ষত্র বর্তমান ভারতকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করিতেছে। তাঁহাদের উল্কজ্যোতি ভারতের মৃত্তিকার মধ্যে ময়ানের মত কাজ করিয়া তাহাকে উর্বর করিতেছে। ভারতের বর্তমান নেতারা—মনীষীদের রাজা, কবিদের রাজা ও মহাত্মা—অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী—ঐ রাজহংস ও ঈগলের যুগ্ম নক্ষত্রের আলোকে বিকশিত, কুসুমিত ও ফলভারাক্রান্ত হইয়াছেন। অরবিন্দ ও গান্ধী প্রকাশ্যে একথা স্বীকারও করিয়াছেন।"

ধর্মসমন্বয়ের আদর্শকে কিভাবে গান্ধীজী গ্রহণ করেছেন সে বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনার পরে রোলাঁ বলেছেন, মানব জাতির পক্ষে প্রত্যেক ধর্মের বাঁচিবার অধিকার মেনে না নিলে ত্রাণ নেই। গান্ধীজী তাকে মেনেছিলেন। "প্রত্যেক ধর্মের বাঁচিবার সমান অধিকার আছে; প্রতিবেশী যাহাকে শ্রদ্ধা করে তাহাকে শ্রদ্ধা করিবার সমান দায়িত্বও প্রত্যেক মানুষের। আমার মতে গান্ধীজী যখন অকপটভাবে এই কথাগুলি বলিতেছিলেন, তখন তিনি নিজেকে রামকৃষ্ণের উত্তরাধিকারীরূপে প্রকাশ করিতেছিলেন।" "গান্ধী-প্রদত্ত এই মহান্ শিক্ষা—এই শিক্ষাই বিবেকানন্দ এবং অধিকতরভাবে রামকৃষ্ণ দিয়া গিয়াছেন।"

বিবেকানন্দ-জীবনীর উপসংহারে বিবেকানন্দ ও গান্ধীর প্রতিভা ও চরিত্রগত ঐক্য ও পার্থক্যের মূল কথা যে অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে রোলাঁ প্রকাশ করেছেন, তা তাঁর পক্ষেই করা সম্ভব: "কিন্তু গান্ধী ও বিবেকানন্দের মধ্যে এই পার্থক্য চিরদিন থাকিবে—বিবেকানন্দ বিরাট মনীষী, আর মনীষা গান্ধীর সামান্যমাত্রও ছিল না।

---

*১৬ ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে রোমা রোলাঁ তাঁর 'আমেরিকান বন্ধু'কে লেখা চিঠিতে 'সত্য' সম্বন্ধে গান্ধীজীর ধারণার বিষয়ে লিখেছিলেন—গান্ধীজীকে যখন ঈশ্বর বলতে তিনি কী বোঝেন তা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, হিন্দু শাস্ত্রে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে-সব গুণারোপ করা হয়েছে, তার মধ্যে 'সত্য'কে ঈশ্বরের আসল স্বরূপ-নির্দেশক বলে তিনি যুবক বয়সেই মনে করেছিলেন। পূর্বে গান্ধীজী 'ঈশ্বর সত্যস্বরূপ'—এমন বিশ্বাস করতেন; দু' বছর আগে তাঁর ধারণা হয়—'সত্যই ঈশ্বরস্বরূপ।' কারণ, "নাস্তিকেরাও সত্যের শক্তিতে অবিশ্বাস করে না; সত্য আবিষ্কারের বাসনায় নাস্তিকেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্যন্ত অগ্রাহ্য করতে দ্বিধা করে না এবং সেই দিক থেকে তারা সঙ্গত কাজই করে।" গান্ধীজীর ধর্মীয় ধারণার এই সাহস ও স্বাধীনতা'র প্রশংসা করার পরে (যে সাহস প্রাচ্যের সহজাত) রোলাঁ বলেছেন—'বিবেকানন্দের মধ্যেও আমি এই গুণ লক্ষ্য করেছি।'

সত্য সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের নির্ভয় মনোভাব ধর্মের ইতিহাসে এক অত্যুজ্জ্বল অধ্যায়। অনবদ্য ভাষায় নিবেদিতা লিখেছিলেন — পৃথিবীর প্রয়োজন ছিল এমন একটি ধর্মের যা সত্যে ভীত নয়—বিবেকানন্দ তা দিয়েছিলেন। সত্যের জন্য বিবেকানন্দের অনন্ত যন্ত্রণা ও যন্ত্রণাময় উক্তির পরিচয় এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। তাহলেও আমরা কয়েক লাইন উদ্ধৃত না করে পারছি না:—"যে ব্যক্তি সমাজের সঙ্গে আপস খাওয়াইয়া চলে, তাহার পথ কুসুমাবৃত, আর যিনি তাহা করেন না তাঁহার পথ কণ্টকাকীর্ণ। কিন্তু লোকমতের উপাসকেরা নিমেষেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়, আর সত্যের তনয়গণ চিরজীবী। আমি সত্যকে একটা অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ক্ষুরধার পদার্থের সঙ্গে তুলনা করি। উহা যেখান পড়ে সেখানেই ক্ষয় করিতে করিতে নিজের পথ করিয়া লয়।...আমি যে প্রত্যেক ঘোর মিথ্যার সহিত মিষ্টমুখে আপোষ করিতে পারি না তাহার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত, কিন্তু কি করিব, পারি না। সারাজীবন তাহার জন্য ভুগিয়াছি, কিন্তু পারি নাই। ...ঈশ্বর মহিমাময়, তিনি আমাকে ভণ্ড হইতে দিবেন না।...যৌবন ও সৌন্দর্য নশ্বর, জীবন ও ধনসম্পত্তি নশ্বর, নাম ও যশ নশ্বর, এমন কি পর্বতও চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ধূলিকণায় পরিণত হয়—একমাত্র সত্যই চিরস্থায়ী। হে সত্যরূপী ঈশ্বর! তুমিই আমার একমাত্র নিয়ন্তা হও!..হে সন্ন্যাসিন্, তুমি নির্ভয়ে দোকানদারি ত্যাগ করিয়া, শত্রু-মিত্র ভেদ না রাখিয়া, সত্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ থাক।' এই মুহূর্ত হইতে আমি ইহামুত্রফলভোগবিরাগী হইলাম—ইহলোক ও পরলোকের যাবতীয় অসার ভোগবিলাসকে পরিত্যাগ করিলাম। হে সত্য, একমাত্র তুমিই পথপ্রদর্শক হও।"

তাই বিবেকানন্দ, গান্ধীর মত নিজেকে বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাপদ্ধতি হইতে মুক্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহারা উভয়ে সমস্ত ধর্মের সত্যতা স্বীকার করিলেও বিবেকানন্দ তাহাকে তাঁহার মতবাদের ও শিক্ষার বিষয়বস্তুতে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি অকপটভাবে সকল প্রকার আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব হইতে দূরে থাকিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সূর্য তাহার কিরণমালার উত্তাপ বড়-একটা কমাইতে পারে না।...নায়কত্বের পদ পরিত্যাগ করিবার অধিকার সকলের থাকে না। বিবেকানন্দের মত লোকেরা এমনকি যখন নিজের উদ্দেশ্যেও কিছু বলিয়া থাকেন, তখন তাহা সমস্ত মানবজাতির উদ্দেশ্যেই ব্যক্ত হইয়া থাকে। তাঁহারা চুপিচুপি কিছু বলিতে চাহিলেও পারেন না, আর বিবেকানন্দ তো তাহা চান নাই। আকাশ পূর্ণ করিবার জন্যই এই মহা কণ্ঠধ্বনির সৃষ্টি হইয়াছিল। সমস্ত পৃথিবীই ছিল ইহার রণনযন্ত্র। বিবেকানন্দের রীতি গান্ধী হইতে স্বতন্ত্র। গান্ধীর স্বাভাবিক আদর্শ তাঁহার স্বভাবের অনুপাতে সহজ, সঙ্গত, পরিমিত ও সাধারণ। রাজনীতির মতই ধর্মেও শুভেচ্ছাপ্রণোদিত মানুষদের লইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দিকে ছিল তাঁহার মনের প্রবণতা। অপরদিকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিবেকানন্দ সম্রাটের মতই প্রতিভাত। তাঁহার লক্ষ্য ছিল স্বতন্ত্র অথচ সমমর্যাদাসম্পন্ন আধ্যাত্মিক অধিরাজ্যগুলিকে "একের" অধীনে সুশৃঙ্খল করিয়া তোলা। তিনি যে-কর্মের সূত্রপাত করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারই পরিকল্পিত পথে অগ্রসর হইয়াছিল।" (ঋষি দাশ অনূদিত)

॥ ৮ ॥

আগেই বলেছি, স্বামীজী হয়ত গান্ধীজীকে নামে জানতেন। একজন ভারতীয় অপরিসীম বীরত্ব দেখাচ্ছেন দূর আফ্রিকায়—সে সংবাদে আনন্দবোধ করাই তো বিবেকানন্দের সবচেয়ে আনন্দের কাজ। তা ছাড়াও, আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থা বিষয়ে তাঁর মনোযোগের কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর একটি পত্রে। ১৮৯৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বর স্বামীজী শিবানন্দ-স্বামীকে যে-পত্রটি লেখেন, তার সুগভীর তাৎপর্যের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পত্রটি এই ঃ

"মাদ্রাজে থাকিতেই বোম্বে গিরগাঁওয়ের যে মিঃ শেতলুরের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছিল, তিনি আফ্রিকাতে যে সকল ভারতীয় বাসিন্দা রয়েছে, তাদের আধ্যাত্মিক অভাব দূরীকরণের জন্য কাহাকেও পাঠাইতে লিখিয়াছেন। অবশ্য তিনিই মনোনীত ব্যক্তিকে আফ্রিকায় পাঠাইবেন এবং আবশ্যকীয় সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিবেন।

কাজটি আপাতত খুব সহজ কিংবা নির্ঝঞ্ঝাট হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু এ-কাজে প্রত্যেক সৎ লোকেরই এগিয়ে যাওয়া উচিত। আপনি বোধ হয় জানেন, ওখানের শ্বেতকায়েরা ভারতীয়দিগকে মোটেই ভাল চোখে দেখে না। তাই সেখানকার কাজ হচ্ছে, ভারতীয়দের তত্ত্বাবধান করতে হবে, অথচ এমন ধীরভাবে, যাতে আর বিবাদের সৃষ্টি না হয়। হাতে-হাতে অবশ্য এ কাজের ফল পাওয়ার আশা করা যায় না। **কিন্তু পরিণামে দেখবেন যে, আজ পর্যন্ত ভারতের কল্যাণের জন্য যত কাজ করা হয়েছে, সে সকলের চেয়েও এতে বেশি উপকার হবে।** আমার ইচ্ছা, আপনি একবার এতে আপনার ভাগ্যপরীক্ষা করে দেখুন। যদি রাজি থাকেন, তবে এই পত্রের উল্লেখ করে শেতলুরকে আপনার সম্মতি জানাবেন এবং আরও খবর চেয়ে পাঠাবেন। 'শিবাঃ বঃ সন্তু পন্থানঃ।' "

(স্থূলাক্ষর লেখক-নির্দেশে)

এই চিঠি স্পষ্ট দেখিয়ে দেয় স্বামীজী আফ্রিকায় ভারতীয়-সমস্যা সম্বন্ধে কতখানি সচেতন ছিলেন। তাহলে, সেখানকার আন্দোলনের ভারতীয় নেতার কার্যকলাপের বিষয়েও অবহিত ছিলেন, তাও ধরে নেওয়া যায়। লক্ষণীয়, স্বামীজী সেখানকার সমস্যা সমাধানে ধীরতা ও বিচক্ষণতার প্রয়োজনের উপর জোর দিয়েছেন। ঐ দুটি জিনিস গান্ধীজী যথেষ্ট দেখিয়েছিলেন, এবং মনে হয় গান্ধীনীতির প্রতি স্বামীজীর সমর্থন ছিল। বিবেকানন্দ, ভারতের ক্ষেত্রে শাসকদের সঙ্গে ব্যবহারে সর্বাবস্থায় ধীরতার পক্ষপাতী ছিলেন মনে হয় না, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়রা যেহেতু প্রবাসী, তাদের অবস্থান সেখানকার ইউরোপীয় শাসক শুধু নয়, কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীদের অভিরুচির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল—তাই যাতে হঠকারিতা না ঘটে, এমন কি ভয়ানক কোনো বিদ্রোহও না হয়, যার কোনো শুভ ভবিষ্যৎ নেই—সে বিষয়ে সম্ভবত সতর্ক ছিলেন। যাই হোক, এই চিঠির মধ্যে একটি আশ্চর্যজনক অংশ আছে, স্বামীজী বলেছেন—'পরিণামে দেখবেন যে, আজ পর্যন্ত ভারতের কল্যাণের জন্য যত কাজ হয়েছে, সে সকলের চেয়েও তাতে বেশি উপকার হবে।' স্বামীজী একথা বলতে পারলেন কী করে? সমসাময়িক অবস্থার বিচার করে? কিন্তু গান্ধীজী আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ১৮৯৬ সালে কলকাতায় তাঁকে কোনো গুরুত্বই দেওয়া হয় নি, বোম্বাই ও মাদ্রাজ তাঁর কিছু কথা শুনেছিল। ১৯০১ সালেও কলকাতা কংগ্রেসে গান্ধীজী গুরুত্ব পান নি। এ কথা ঠিক, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের সঙ্গে স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, আফ্রিকার ভারতীয়রা প্রধানত ঐসব অংশেরই অধিবাসী, সুতরাং তিনি আফ্রিকায় ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং পত্রে যে-শেতলুরের উল্লেখ করেছেন—তিলকের বন্ধু মহারাষ্ট্রীয় শেতলুর বিবেকানন্দেরও বন্ধু—তাঁর কাছ থেকে আফ্রিকায় ভারতীয় সমস্যার সর্বশেষ রূপ সম্বন্ধে সংবাদ পেতে পারেন, অবশ্যই পেয়েছিলেন—কিন্তু তাহলেও স্বামীজীর ভবিষ্যৎবাণীর কারণ যথাযথ ব্যাখ্যাত হয় না। ঐ কথাগুলি কি তিনি এই ভেবে বলেছিলেন—বাইরের আন্দোলনের তরঙ্গ ভারতে প্রতিহত হয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করবে? স্বামীজী হয়ত ভেবেছিলেন, ভারতে যে-ধরনের নিরেট শাসন বর্তমান, ভারতবাসীরা দীর্ঘদিনের কূপমণ্ডূকতায় আবদ্ধ থেকে যেভাবে আশা-ভরসা ও স্বাধীন দৃষ্টি একেবারে হারিয়ে ফেলেছে, তাতে তারা অবিলম্বে কোনো আন্দোলন করতে পারবে না; তার তুলনায় বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগের জন্য আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়রা স্বাধীনভাবে আন্দোলনে সমর্থ, যা ভারতবাসীদের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ হতে পারবে। এসব কথা বলা যায় আমরা জানি, কিন্তু এও জানি, ঐ রহস্যময় উক্তির সঙ্গত ব্যাখ্যা একটিই—এটি আর একটি বিবেকানন্দীয় ভবিষ্যৎবাণী, যা সত্যই সফল হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার রণক্ষেত্র থেকে ভারতবর্ষ একদিন সত্যই তার স্বাধীনতা সংগ্রামের অভিনব অস্ত্র পেয়েছিল, যা এক যুগে অভূতপূর্ব গণজাগরণ সম্ভব করেছিল।

তাই, পুরনো কথায় ফিরে যাচ্ছি এই প্রসঙ্গের শেষে—গান্ধীজী যদি সত্যই স্বামীজীর সামনে দাঁড়াতে পারতেন, তাহলে স্বামীজী গান্ধীজীর মধ্যে ভারতের মুক্তির আয়োজনকে নিশ্চয়ই চিনে নিতে পারতেন—নিশ্চয়ই।

এবং গান্ধীজীকে স্বামীজী দেখেছিলেনও—তাঁর দীপ্ত চর্মচক্ষের চেয়েও দীপ্ততর ধ্যাননেত্রে—গান্ধীজী সম্বন্ধে যার থেকে অব্যর্থ রচনা সম্ভব নয়—

"তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী। বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।"

"ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর—তোমার রক্ত তোমার ভাই।"

বিবেকানন্দের বাণীই গান্ধীর জীবন।

সেই কেপে-নামা বৃষ্টির ভেতর এক ঝাঁক ডিজেল তেলের গন্ধ নাকে নিয়ে ছোট্ট রাস্তাটা পেরুল মমতা।

কতটুকুই বা রাস্তা! কমুহূর্তেই পার হতে লাগে! তবু চশমার কাঁচে জল। দৃষ্টিটা ঝাপসা।

এর আগের দিন চেনা হয়ে গিয়েছিল জায়গাটা। অন্তত এখানে যে মাথা গুঁজে রোদ-বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার একটা আস্তানা আছে—সেটা জানা ছিল। ছিটকে-পড়া জল আর কাদার ছিটেফোঁটা শাড়িতে মেখে সেই আটচালাটায় ঢুকে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল মমতা।

বাসটা আবার গর্জন করে উঠেছে। এখানকার তেমাথার মোড়ে তার টাইম-নেওয়া শেষ। ঘড়িবাবু তার ঘড়ি মিলিয়ে চার্টে লিখে দিয়েছে টাইম। ছাড়পত্র পেয়েছে বাস।

সেদিন এই আটচালার তক্তাপোষের ওপর বসে ঘড়িবাবুর সঙ্গে আলাপ জমিয়েছিল মমতা। ভদ্রলোক আধবুড়ো হিন্দুস্থানী। বেশ মিশুকে।

সে-ই তো বসতে বলেছিল মমতাকে। ঝুঁকে পড়ে বাক্সবন্দী ঘড়িটা দেখে আর চার্টটার আঁকিবুঁকির সঙ্গে কি যেন হিসেব করে বলেছিল, এখন ত' সাত মিনিট দেরী আছে কলকাতা যাবার বাসের।

শাড়ির আঁচলে আলগা করে মুখটা মুছল মমতা। হাতের ব্যাগ খুলে একটা রুমাল বার করে চশমার কাঁচটা মুছল,

তারপরেই সে এই আটচালার দ্বিতীয় আশ্রয়প্রার্থী সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল। তক্তাপোষটার শেষপ্রান্তে যে বসে আছে নিঃশব্দে, সে কে!

আঁচলটা দিয়ে ডান কাঁধ ঢেকে নিল মমতা। তারপর দ্বিতীয়বার তাকাল এই ঘরের দ্বিতীয় প্রাণীটির দিকে।

বুঝতে বাকি রইল না তক্তাপোষের ওপর দাঁড় করানো চামড়ার ফোলিও ব্যাগটি তারই।

কিন্তু ইনি কি তারই মতন একই উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছেন! তার প্রতিদ্বন্দ্বী। তার মতন সেও যাবে হরি-প্রসন্ন মহাবিদ্যালয়ে।

মুহূর্তে চোখের দৃষ্টি কঠিন হল মমতার। একটা কাঠিন্য নেমে এল চিবুকে। নাকের প্রান্তে একটা গাম্ভীর্য, সমস্ত মুখে যেন দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রতিযোগি-তার আহ্বান।

এই ঘরের নিস্তব্ধতা ভাঙল ভদ্র-লোকের কণ্ঠস্বরে,—দাঁড়িয়ে থাকবে কতক্ষণ, বসো। বৃষ্টির যা গতিক, সহজে থামবে বলে মনে হচ্ছে না।

তাহলে চিনতে পেরেছে তাকে। এবং হয়তো এতক্ষণ তাকেই লক্ষ্য করেছে সে। মমতা আবার তাকাল।

আটচালাটার তিনদিক বন্ধ। সমুখের খোলা পাল্লা দিয়ে যেটুকু স্তিমিত আলো এসে পড়েছে তাতে মুখের একটা দিক আলোকিত। একটু প্রৌঢ়, বিষণ্ণ, খানিকটা বিবর্ণ, যেন ক্লান্ত অনেক পরি-শ্রমে, অথচ আলো-এসে-পড়া চোখটায় বেশ বিস্ময় এবং কৌতূহলের ইঙ্গিত।

কাপড়টা একটু টেনেটুনে বসল মমতা। লোকটা বলল বলে নয়, এর আগের দিনও সে বসেছিল এবং আজ বসবার জন্যেই এখানে প্রবেশ করেছিল।

বেশ একটা আশার দোলায় এখানকার বাসে উঠেছিল সে। হয়তো হয়ে যেতে পারে। তার অভিজ্ঞতা আছে শিক্ষকতা বিষয়ে। এম-এ পরীক্ষায় ফলও তার ভালো। আর যদি ব্যক্তিত্বের কথা বলো, মমতা ভাবল, তার সহকর্মীরা বলে এবং ছাত্রীরাও বলে, মমতাদির পার্সন্যালিটি নাকি খুব শ্লীজিং।

এ ছাড়াও অন্যান্য দিকে কোনো বন্ধন নেই মমতার। ইচ্ছে করলে সে এখানকার কোনো কোয়ার্টারে থকতে পারে। নয়তো পেয়িং গেস্ট হয়েও।

কিন্তু এখন আশা বৃথা। দুষ্টগ্রহের মতন লোকটা তার পিছু নিয়েছে। তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলবার পরও লোকটা তার প্রতিদ্বন্দ্বী। মমতা ভাবল, হোক না প্রতিদ্বন্দ্বী, তাই বলে হাল ছাড়ব কেন?

ভাবল বটে, কিন্তু মনের ভেতর জোর কমে গেছে অনেক। মুষড়ে পড়েছে সে—সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না।

অথচ কেন, কেন সে এতদিন পরে আবার তার জীবনে দুর্গ্রহের মত হাজির হয়েছে। আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে অনেকটা চুরি করে লোকটার দিকে তাকাল মমতা।

লোকটা বাইরের বৃষ্টির দিকে চেয়ে রয়েছে। দৃষ্টিটা শূন্য। যেন কোনো ভাবনায় ভাবনায় সমাহিত। মমতার মনে হল, নিশ্চয়ই, হ্যাঁ নিশ্চয়ই সমীর ভাবছে। ভাবছে বারো বছর আগেকার কথা—না তেরো বছরের।

সামনে অনেকখানি আকাশ আচ্ছন্ন করে বৃষ্টির একটানা ঝালর। গাছপালা ঝাপসা ঝাপসা। পথ নির্জন। নিঃশব্দ। কেবল অসংখ্য বৃষ্টির কণা

রাস্তায় পড়ে ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে ছিটকে যাচ্ছে।

যাই ভাবুক সমীর, মমতা ভাবল, ওসব ভাবনা মিছে। তাকে সামনে রেখে তারই পুরনো স্মৃতি নিয়ে সমীর ভাববে —তা অসহ্য। একটু শব্দ করে নড়ল-চড়ল মমতা। তারপর প্রশ্ন করল, তুমিও কি তারাপ্রসন্ন মহাবিদ্যালয়ে যাবে?

সমীর ঈষৎ চমকে ফিরে তাকাল মমতার দিকে। ক্ষণকাল চেয়ে রইল। তারপর ছোট্ট করে বললে, হ্যাঁ।

আমি জানতাম। আমি জানতাম। মনে মনে বলল মমতা। তোমার ওই ফোলিও ব্যাগ দেখেই আমি অনুমান করেছি। না হলে, এই প্রায় গণ্ডগ্রামে তোমার দেখা পেতাম না।

আশ্চর্য, ভাবল মমতা। যোগাযোগটা বড় অদ্ভুত। জলপাইগুড়ির মাস্টারী ছেড়ে চব্বিশ পরগণার এই গ্রাম। এবং সেখানে কিছুদিন প্রতিষ্ঠিত এই মহাবিদ্যালয়ে ইংরেজির অধ্যাপিকা হবার বাসনায় আগমন। অথচ এরই মধ্যে সমীর পথ রোধ করে দাঁড়াবে, ভাবতে পারে নি মমতা।

—তোমাকে এমন একটা জায়গায় এমন একটা পরিস্থিতিতে দেখব, আশা করি নি—সমীর আলাপ করবার চেষ্টা করল।

—তুমি কি মনে কর, আমি করেছিলাম, অন্য দিকে তাকিয়েই উত্তর দিল মমতা।

—তা নয়, আমি জানতাম তুমি মালদহে আছ—

সমীর কি এখনও তার খোঁজ-খবর রাখে নাকি? মালদহে সে থাকত ঠিকই, তবে বছর তিনেক আগে। ঠোঁটটা বেঁকাল মমতা। এবং সেই বাঁকা ঠোঁটেই বলল, আমার খবরাখবর রাখো এটা আমার মোটেই পছন্দ নয়—

হয়তো আরও কিছু বলত মমতা। কিন্তু এই একটি বাক্য উচ্চারণ করেই সে যেন হঠাৎ হাঁপিয়ে উঠল। এবং সেই নিমেষে ক্লান্ত ও ম্লান দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল বাইরের দিকে।

আর তখন, ঠিক তখনই হাঁপাতে হাঁপাতে কলকাতাগামী একটা বাস এসে দাঁড়াল। ভস্ ভস্ করে ভারী বাতাসের মধ্যে ডিজেলের বোঁটকা গন্ধটা ছড়িয়ে পড়ল। আর দরজার সামনে একটা দীর্ঘ ছায়া অকস্মাৎ কথা বলে উঠল, বাস রে বাস, বহুৎ বহুৎ পানি—

ঠিক তখনই রাস্তার ওপাশের চায়ের দোকান থেকে একটা চীৎকার ভেসে এল, এ কর্তার সিং—ইধার আ যা ভাই—

বাঁহাতে মণিবন্ধে রুমাল-বাঁধা ঘড়িটা দেখা দরকার। বোধ হয় একটু চঞ্চল হল সমীর। দেখল ঘড়িটা। দেখল বাইরের বৃষ্টি। তারপর চুপ্‌সে কুঁজো হয়ে পা দুটো তক্তাপোষের ওপর তুলে আয়াস করে বসল।

এবার আর আড়চোখে নয়, সোজা সমীরের দিকে চেয়ে সব দেখল মমতা। আগের চেয়ে বেশ রোগা হয়ে গেছে সমীর। হাতের শিরাগুলো কেমন ফুলে ফুলে উঠেছে। রঙের সে জেল্লা যেন আর নেই।

—সাতদিনের ছুটি নিয়ে জলপাইগুড়ি থেকে এসেছি এই ইন্টারভিউটার জন্য—জানো এটাই আমার কলেজে চাকুরি পাবার প্রথম ইন্টারভিউ—

হ্যাঁ। মনে মনে ভাবল মমতা, সমীরকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া দরকার, সে-ও একজন ক্যান্‌ডিডেট। এবং অনেক দূর থেকে এসেছে এই চাকুরিটার জন্যই।

—এম-এ কি প্রাইভেটেই দিয়েছ, না রেগুলার হয়ে—সমীর প্রশ্ন করল।

—রেগুলার হয়েই দেবার ইচ্ছে ছিল, ছুটি পেলাম না অত দিনের। তবে রেজাল্টটা—একটু থামল মমতা, একটু হাসল, একটু জিরিয়ে জিরিয়ে উচ্চারণ করে বললে, খুব খারাপ হয় নি।

—খুব ভালো হয়েছে—সমীর বেশ পরিষ্কার হাসল, সেকেন্ড ক্লাশ থার্ড এবং থার্ড, ইন অর্ডার অব মেরিট।

অসহ্য। এত খবর কেন এখনও রাখে সমীর! একবার ভাবল, বলে, এত খবর রাখো আর এই খবরটা রাখো না যে হরিপ্রসন্ন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা হতে চাই আমি।

কিন্তু যার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই আর নেই, তার খোঁজ-খবর রাখা উচিত নয়। কই মমতা তো তার সন্ধান নেয় নি কোনোদিন। সমীর কোথায়, কি কাজ করে, কার সঙ্গে এখন থাকে অর্থাৎ বিয়ে করেছে কিনা ফের, এরকম ঢের প্রশ্ন তো তার জানার প্রয়োজন হত।

দরকার বোধ করে নি মমতা। ওই মিস্টি চেহারার জাদু মমতার চোখ ভোলালেও মন ভোলাতে গিয়ে হল ব্যর্থ; রাতের পর রাত মনোমালিন্যের নিত্যনতুন অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ, সন্দেহের বিষবাষ্প সাপের মত কুটিল ফণা তুলে ছোবল মারতে উদ্যত, গড়ে ওঠার মুখেই সম্বন্ধে প্রচণ্ড চিড় এবং শেষ পর্যন্ত আদালতের শরণাপন্ন।

না, সমীর তার চরিত্রে সন্দেহ পোষণ করে নি। সমীরের সেই শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠস্বর, যদিও তখন আবেগে কাঁপছিল, সে কথা এখনও সুস্পষ্ট মনে আছে মমতার।

—আমি বিশ্বাস করি, মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, তুমি কখনও কোনো পুরুষমানুষকে ভালোবাসতে পারবে না মমতা।

মমতাও অবিশ্বাস করতে পারে নি সমীরকে। ও অবাক হয়ে ভাবত, এই লাজুক নম্র আপাত ভালোমানুষ লোকটা মেয়েদের কৃপার পাত্র হতে পারে, ভালোবাসার নয়।

আমি ভালো যদি সমীর কোনো মেয়েকে বেসেই থাকে, সে তার মনের ভীরু কামনার কল্পলোকেই নির্বাসিত, বাস্তবে তা প্রকাশ পাবার মতন মানসিক বল সমীরের নেই।

থাকতে পারে না, এ শুধু ধারণা নয়, অভিজ্ঞতাও মমতার। কলকাতার মাঝারি গোছের একটা কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক সমীরের নিকট সান্নিধ্যে আসবার আগে পর্যন্ত কল্পনা করাও শক্ত ছিল, লোকটা যে কত ভণ্ড। এত বড় অক্ষমতা যার দেহে, তার বিবাহে অরুচি হয় নি! একটা মেয়ের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে দ্বিধা আসে নি!

এখন সেসব দিনের কথা আর ভাবে না মমতা। ভাবলেও আর আগেকার মতন শিউরে ওঠে না। সমীর ওই শিরাওঠা আঙুলে যে ফোলিও ব্যাগটা ধরে বৃষ্টি পড়া দেখছে, ওই হাতে তখন শিরা দেখা যেত না, পুরু নরম মাংসের হাতের চেটো দুটো কত সুন্দর মনে হয়েছিল একসময়। কিন্তু ক'দিনই বা! দেখতে দেখতে প্রমাণ হয়ে গেল ও হাত কত অক্ষম পুরুষের। পুরুষ!

অজ্ঞাতেই মমতার ঠোঁটের কোণে একটা বিদ্রূপের হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল। পুরুষ! যার পৌরুষত্ব আছে, সেই তো পুরুষ।

না, সমীরের কোনো কৈফিয়ৎই গ্রাহ্য হয় নি মমতার কাছে। দুর্বলের যুক্তি দুর্বল বলেই মনে হত।

তাকে অপেক্ষা করতে উপদেশ দিয়েছিল কেউ কেউ। মমতা অনন্তকাল অপেক্ষা করতে প্রস্তুত, যদি না তার মধ্যে ছলনা থাকে। তাকে যে ঠকাবে, সে তার পয়লা নম্বরের শত্রু।

অথচ, মমতা ভাবল, তার জীবনটা কি বিচিত্র, সেই পয়লা শত্রুই এখন তার কর্মক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী।

সেদিনের সমস্যা ছিল জীবনমরণের। মান অপমানের। ব্যক্তিত্ব আর ব্যক্তিত্বলোপের। সে সমস্যার সমাধান যদিও হল আদালতে, তবুও মমতা জিতেছিল। মমতা জানত সে জিতবে। জানত, সে হারতে পারে না।

কিন্তু এখন! ওই পেটমোটা ফোলিও ব্যাগে যে দীর্ঘদিনের অধ্যাপনার সাক্ষীস্বরূপ কাগজপত্র রয়েছে। তা ছাড়া ধরাধরি কি আর করে নি সমীর! কিন্তু, মমতা ভাবল, সমীর এত জায়গা থাকতে এই গণ্ডগ্রাম বেছে নিল কেন? তাহলে যেখানে ছিল সেখানে কি সে সুখী ছিল না!

সমীরের সুখ আর অসুখকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলবার জন্য উঠে পাঙ্খাটার কাছে এল মমতা।

বৃষ্টির বেগ কমে নি। একনাগাড়ে সমস্ত দিগন্ত জুড়ে অবিশ্রাম ধারাপতনের শব্দ।

বড্ড মুশকিলে পড়া গেল তো? ভাবল মমতা। এদিকে ইন্টারভিউ-এর সময় হয়ে এল। কজন কর্মপ্রার্থীকে এঁরা ডেকেছেন, তাই বা কে জানে? এবং ইতিমধ্যে কজন কলেজে পৌঁছে গেছে তার খবরই বা এখানে বসে কেমন করে জানতে পারবে মমতা।

শুনেছিল, ওদিক দিয়ে নাকি আরেকটা বাসরুট আছে, তাতে করে হয়তো কেউ কেউ এসেছে। এদিক দিয়ে মমতার আগে কি আর কলেজে কেউ পৌঁছেছে! কে জানে?

কী ভাগ্যি, কাউকে কিছু জানায় নি মমতা। জলপাইগুড়ির স্কুলের হেড-মিস্ট্রেস মমতা। সেক্রেটারীকেও কিছুছু বলে নি। না বলে ভালোই করেছি, মমতা ভাবল।

—বসো, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে—সমীরের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

ফিরে তাকাল মমতা। গলার স্বরটা কিন্তু বদলায় নি। মানুষটা! আপন মনেই হাসল সে। পুরুষ মানুষের প্রতি তার কোনো আস্থা নেই। দে ক্যান ডু এনিথিং।

—ভয় নেই, এখানকার চাকুরি তোমার হয়ে যাবে, সমীর হাসল।

যেন ভবিষ্যৎবাণী করছে সমীর, মমতা ভাবল, নাকি, তার প্রতি দাক্ষিণ্য দেখাতে চায় সমীর। নিজে সরে দাঁড়িয়ে মমতার পথ পরিস্কার করতে চায়!

ভয় অভয় আমার অনেকদিন চলে গেছে, মমতা বলল, বরাতও মানি না, যদি কর্তৃপক্ষকে বোঝাতে পারি আমি এ পদে সম্পূর্ণ উপযুক্ত, তবে চাকুরি আমি পাবোই —একটু থেমে বেশ একটু জোর দিয়ে বললে, সেটুকু বিশ্বাস নিজের ওপর রাখি।

মমতা এবার বসল। বাইরের দিকে মুখ করে। ওই মিস্টি চেহারাখানা অসহ্য লাগছে। কী আস্পর্ধা সমীরের, এতদিন পরে আজ ও অভয়ের কথা শোনাচ্ছে! যেন সমীর না নিলেই মমতার চাকুরিপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত।

এতই যদি পরের ওপর দয়া করবার প্রবৃত্তি, তবে বিয়ে করেছিলে কেন? তোমার অক্ষমতা সম্বন্ধে তুমি কি অচেতন ছিলে? অপদার্থ।

এসব ভালোমানুষির অপর নাম গয়তানি—বিচারক বলেছিলেন, শিক্ষিত মানুষের এইরূপ কার্যকলাপকে আমি তীব্র ভাষায় নিন্দা করি।

আদালতের এই অপমান মেখেও মিস্টি মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছ! লজ্জা তো তোমার নেই।

মমতা এবার অনেকখানি ভরসা পেল মনে। একটা ইনভেরটিব্রিট লোককেই সে ভয় পাচ্ছিল! আরও আশ্চর্য এই লোকটার সাহস! বলে কি না এখানকার চাকুরি তোমার হয়ে যাবে।

আবার একটু কাত হল মমতা। লোকটার মুখখানা দেখল। ভাবলেশহীন। কিন্তু একবার মনে হল, সমীর নিঃশব্দে হাসছে। হাসছে না বিদ্রূপ করছে।

বিদ্রূপই বোধ হয় করতে চাইছে। নইলে হাসির রেশ কখনো আসতে পারে না ওই মুখে। বিশেষ করে মমতার সামনে।

সমীর বলল, নিজের ওপর বিশ্বাস রাখার চেয়ে মহৎ গুণ আর নেই, তবে দিনকাল বড় খারাপ—অনেক সময় লোকে মর্যাদা দিতে ভুল করে।

তোমার কথার মধ্যে কোনো যুক্তি আমি খুঁজে পেলাম না, মমতা বলল, আমার চেয়েও ভালো ক্যান্ডিডেট্ থাকতে পারে তো।

এবার বেশ স্পষ্ট হাসির ঝিলিক দেখা গেল সমীরের মুখে। উঠে দাঁড়াল সে। জুতোটা পায়ে দিয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, কমে এসেছে বৃষ্টির বেগ, মনে হচ্ছে অল্পক্ষণের মধ্যেই থেমে যাবে।

উত্তর নিষ্প্রয়োজন। মমতা ভাবল, আশ্চর্য-কত সহজ হয়ে কথা বলছে সমীর। শুধু তাই নয়, বিয়ের পর কিছুদিন মাত্র একত্র থেকেছিল তারা। তারপর এই এতক্ষণ এক জায়গায় কখনো পরস্পর বসে নি তারা। আরও আশ্চর্য, সমীরের ব্যবহার। এত অপমান গায়ে মেখেও এত সহজ কেউ হতে পারে!

ওপাশের দোকান থেকে কেউ বোধ হয় কোনো কথা বলেছিল। সমীর চেঁচিয়ে বলল, না, চায়ের দরকার নেই।

তারপর গলা নামিয়ে মমতার দিকে ফিরে বললে, তুমি তো চা খেতে না আগে, এখন কি খাও?

এই লোকটা তাকে চা খাওয়াতে চাচ্ছে! এবং সে কথা সে সুস্পষ্ট উচ্চারণ করছে বারো বছর পরে—পৃথিবীতে অবাক বলে বোধ হয় সত্যি কোনো শব্দ নেই।

মমতা ঠোঁটটা বেঁকিয়ে বললে, কে খাওয়াবে, তুমি?

ক্ষতি কি—সমীর বলল, যে লোকটাকে ঘৃণা করতে সে তো তোমার স্বামী আর এখন যে লোকটা তোমার সামনে দাঁড়িয়ে সে আর যাই হোক তোমার স্বামী তো নয়।

একটু থামল সমীর। বলল, তা ছাড়া এখানে চাকুরি করতে গেলে চা তো খেতেই হবে, যদি অবশ্য চা খাওয়া অভ্যেস করে থাক।

বিদ্যুৎ চমকের মতন একটা চিন্তার সূত্র ঝিলিক দিয়ে উঠল মনে। দু চোখের দৃষ্টি মর্মভেদী হয়ে উঠল।

সমীর হাতখানেক ব্যবধানে দাঁড়িয়ে মমতার উত্তেজনার কারণটা বোধ হয় বুঝতে পারল। পাম্পার বাইরে একটা পা দিয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে এদিক-ওদিক দেখল। বলল, একটা রিক্সা আসছে। তুমি কি যেতে চাও আগে।

—সে কি? তোমাকে ফেলে রেখে রিক্সাওয়ালা আমায় নেবে?

—অনর্থক উত্তেজিত হচ্ছ মমতা। সমীর বলল, পরিস্থিতি, সম্পর্ক, বয়স সব বদলে গেছে—তা ছাড়া এটুকু বিশ্বাস করতে পারো, পুরনো প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ মৃত আমার কাছে।

কী করে নাম ধরে ডাকবার সাহস পেল সমীর। মনে মনে কেমন যেন অসহায় বোধ করছে মমতা। কে জানত, প্রিন্সিপ্যাল এস কে মুখার্জি মানে সমীরকুমার মুখার্জি। কে ভাবতে পেরেছিল, চাকুরি দেবার অন্যতম মালিক সমীরই।

একটা অপদার্থ লোক কি করে একটা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হল, ভেবে বোধ হয় খুব আশ্চর্য হচ্ছ, সমীর বলল, কিন্তু কাজ করতে গেলে দেখবে লোকটাকে যতটা অক্ষম ভাবতে, বোধ হয় ততটা নয়।

বোধ হয় সমীর একবার ম্লান হাসল। হাত তুলে সাইকেল রিক্সাটাকে কাছে আসতে বলল। তারপর কোনো কথা না বলে রিক্সায় উঠল। বলল, আমার কথার কোনো দাম তোমার কাছে আছে কি না, জানি না —তবে কথা দিচ্ছি হরিপ্রসন্ন মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা যদি কর, আমার দিক থেকে কোনো বাধা আসবে না—আর—

একটু থামল সমীর, ইতস্তত ভাবটা বোধ হয় কষ্ট করে কাটাল। বলল, মৃত অতীতের যেটুকু পরিচয় পেলে, তাকে এই মুহূর্ত থেকে মৃত অবস্থাতেই পাবে।

রিক্সায় উঠে বসল সমীর। রিক্সাওয়ালা সমীরের মুখের দিকেই তাকিয়েছিল। ঘাড়টা ঈষৎ কাত করে সমীর বললে, চলো।

প্যাডেলে চাপ পড়তে রিক্সা নড়ল। চেয়ে চেয়ে দেখছিল মমতা। সমীর ঠিক সেই মুহূর্তে ফিরে তাকাল। কেমন ফ্যাকাসে হাসি হেসে হাত দুটো বুকের ওপর একত্র করল।

এমন সময় সগর্জনে ভোঁস ভোঁস করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সবেগে ছুটে এসে ব্রেক কষলো কলকাতাগামী বাস।

মমতার মনে হল, তাকেই নমস্কার জানাল সমীর। যেন বললে, চলবাম মিস চ্যাটার্জি।

মমতা আর ভাববার সময় পেল না। কিংবা তার আর ভাববার কিছুই ছিল না। সে দ্রুতপদে কলকাতার বাসে উঠে বসল।

আরো কাছে এসো

(২৮ পৃষ্ঠার পর)

মনে হচ্ছে ছায়ামূর্তি
যতো কিছু কঠিন বাস্তব।
অবাস্তব, অবাস্তব সাধারণ
জাগতিক কথা।
তুমি আমি এ মুহূর্তে
কাছে আছি,—এই অভিজ্ঞতা
সর্বাধিক সত্য এই কলকাতার
সজল বাতাসে।
নশ্বরের জ্বলে-ওঠা নৈসর্গিক
গভীর আলোতে।

অণিমা—কতক্ষণ জ্বলবে?

সরিৎ—যতক্ষণ এই সত্যের আয়ু।
যতক্ষণ তুমি-আমি একযোগে জেগে
আছি।

অণিমা—এ সত্যকে ভাল লাগে, অসীম
ভাল লাগে, কিন্তু এর ওপর নির্ভর
করতে ভয় হয়।

সরিৎ—আমরা নৈসর্গিক। আমাদের অন্য
কোনো নির্ভর নেই।

অণিমা—যদি আলো নিভে যায়?

সরিৎ—সেই ঝড়ের বিরুদ্ধে আমরাই।

অণিমা—যদি হাওয়া বন্ধ হয়ে যায়?

সরিৎ—সেখানে ঝড় আনবার জন্যেও
আমরাই।

অণিমা—কী আমাদের অস্ত্র? কতোটুকু
আমাদের শক্তি?

সরিৎ—বিশ্বাস এবং সঙ্গ,—তার বেশি
নেই দাবি-দাওয়া
ব্যক্তির গভীরে সুখ ভালোবাসা—
আরো কাছে পাওয়া।
জন্তুর দস্তুর সঙ্গে নিরন্তর
অবিশ্বাস নয়,—
এ নয় দাসত্ব, দৈন্য,—
নয় অন্তহীন মৃত্যুভয়।

অণিমা—বৃহৎ বিপ্লব ছাড়া বর্তমান
অবস্থা ফিরবে না।
কুচক্রীর করজোড় দেখিনি কি
প্রতি নির্বাচনে?

সরিৎ—জানি, জানি,—মানি তাই,—এও
জানি সত্য অনুকূল।
প্রকৃতির স্থির জলে প্রদাহের
চাই শুশ্রূষা-স্নান।
কবন্ধের অতিসঙ্গে অস্তিত্বের
প্রত্যেক মিনিট
পঙ্কিল, পিচ্ছিল,—ক্লিন্ন,—
আবিল, আবিল।

অণিমা—ছুঁচোমুখ, বোঁটকা-গন্ধ কী
অসংখ্য ঘর্মাক্ত শরীর!
নিরন্তর এ-শহরে ভাপে
রান্না হচ্ছে দেহ-মন।

সরিৎ—ভালোলাগা অসম্ভব এ বৃহৎ
বেলেল্লা-বাজার।
এ পাপ দুরূপনেয়।
প্রাণ চায় প্রাণের নায়িকা।

অণিমা—সে নায়িকা কোথায়?

সরিৎ—সমনেই।

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো অণিমা।
কোর্নাক-মন্দিরের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে,
সরিতের চোখ এড়িয়ে শাড়ির আঁচলে চোখের
জল মুছলেন।

অণিমা—এই দৃশ্যের সঙ্গে নিজেকে
মেলাচ্ছিলুম তুমি আজ এখানে
আসবার আগে। দু'ছত্র কবিতা মনে
এলো—শুনবে?

সরিৎ—বলো।

অণিমা—রাগ করতে পারবে না, কিন্তু।
আগে বলো, রাগ করবে না?

সরিৎ—এতো কুণ্ঠা কেন? তুমি তো
অসংখ্য কবিতায় কথা বলতে পারো।

অণিমা—মাঝে মাঝে মনে হয় তোমার-
আমার ভাষাই কবিতা—একটা
আশ্চর্য সত্য কাব্যনাটক আমাদের
দু'জনের এই অস্তিত্ব।

সরিৎ—দোহাই তোমার, — নিজেকে
প্রশংসা করো, কিন্তু আমাকে নয়।
তোমরা পুরুষমানুষ এবং কবি।
চমৎকার সব ভাবতে পারো। কতো
দূরে দূরে চলে যাও। যেন এই
মন্দিরের শিয়রে দাঁড়ানো নর্তকীর
মাথার ওপর দিয়ে ভেসে-যাওয়া
মেঘ,—যেন তাদের পাথরের গা
বেয়ে গড়িয়ে যাওয়া বৃষ্টির ধারা।
আমরা—আমাদের মতো মেয়েরা
দাঁড়িয়ে আছি মজে-যাওয়া কলকাতার
প্যাচ্‌পেচে রাস্তায়, — দাঁড়িয়ে
দাঁড়িয়ে কী বে টন্‌টন্ করে
পা-দুটো। বিচ্ছিরি লাগে সমস্ত
শরীর। আজ আমার বলতে খুবই
খারাপ লাগছে,—ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।
সরিৎ, তুমি রাগ কোরো না।
আমাদের বিয়ে হবে না। এ অসম্ভব।

সরিৎ—বেশ, শুধু একটি কথা বলো—
কেন হতে পারে না?

অণিমা—সত্যি কাছে থাকতে হবে বলে।

সরিৎ—হেঁয়ালি বুঝতে পারি না—অণু,
দয়া করো, স্পষ্ট করে বলো।

অণিমা—আমার চাকরিটা নেই। আজই
চিঠি পেয়েছি—আজ থেকেই শেষ।
আর, আমার মা'র শরীরটা ভাল
যাচ্ছিল না—জানো তো। আজ
ডাক্তার বলে গেছেন—ক্যান্‌সার।

সরিৎ—অণু, দয়া করো।

অণিমা—শোনো সেই দু'ছত্র কবিতা—
একদিকে মহাশূন্য, অন্যদিকে
ছাতাঅলা গলি।
বর্ষার মঙ্গল-লেনে মলিনারও
নাকে রসকলি!

সরিৎ—বিদ্রূপ সংহরো—দ্যাখো কোন্
আলো লাগে চেতনাতে,
এ যেন দাবাগ্নি,—দ্যাখো
ঘনমর এ কোন্ রক্তিমা।
তরুণ তন্তুতে জল,—
ধরণীর চিরন্তনী স্রোত।
আগুন অঙ্গার করে,—
এ পৃথিবী তবু শ্যামলিমা।
ফুলে-ফুলে ছেয়ে যায় প্রত্যেক
বসন্তে বনস্থলী,
আকাশের নীলাঞ্জন শান্ত করে
সংকোচের জ্বালা।
বিশ্বাসে মিলয়ে যদি, বলো এ-ই
অটুট, অক্ষয়।
কে বলে এ ক্ষণ আয়ু? জানে প্রেম,
অনন্ত সময়।

অণিমা—ভাল লাগে, ভাল লাগে,—
কেন তুমি সম্মোহের মতো
দুর্বলের অঙ্গীকারে হানো এই
চৈত্রের ফুৎকার?
ঝরে পড়ে আত্মস্থিতি নিরুদ্দেশ
দুরন্ত বাতাসে,
যেন মিথ্যা মনে হয়
পরিচিত সমস্ত অতীত।
এই মধ্যরিত্ত প্রাণ সভ্যতার
স্রোতের পরবলে
যতো রুদ্ধ হয় তবু রক্তের
দুর্বার স্রোতোবেগ।
সত্য আর অসত্যের অগ্নিভস্ম
দুর্বোধ্য জীবন।
আজন্মের জৈবতায় সময় কী
নিরন্ত প্রহরী!

সরিৎ—এ দর্শন দৃষ্টি নয়,—
ক্লিষ্ট করে কঠোর দলন।
সময়ের অন্ধকার এ।
এ-মঞ্চে কোথায় নিষ্ক্রমণ?

শোনো আমার কবিতা—

পকেট থেকে কাগজ টেনে নিয়ে পাঠ—

এ বিস্ময় মৃত্যুহীন,—
এ শপথ তোমার আমার—
জন্মের যন্ত্রণা সত্য—
দ্যাখো তাই নক্ষত্রে নক্ষত্রে
নৈসর্গিক আলোতেই জন্মে
জন্মে জীবনে জীবনে.
বৃহৎ আকাশ সাক্ষী,—
সাক্ষী সনাতন জীবকোষ,
যেমন সমুদ্র থেকে জেগে ওঠে
সূর্যের গোলক,
এ গভীর ব্যক্তিমনে
তেমনি নিশ্চিত এই বোধ।

ছায়ামূর্তি নিশাচর ক্ষয় হোক,—
আরো কাছে এসো।
শূন্যের তমিস্রা থাক্—
ঘিরে থাক্ সূর্যের মন্দির।

অনিমা সরিতের পায়ে হাত রেখে
প্রণাম করলো। বাহুবদ্ধ দুটি মূর্তিতে
পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নির্বাক।
মহাশ্বেতা ঘরে এলেন।
দু'জনে প্রণাম করলো মহাশ্বেতাকে।

॥ যবনিকা ॥

অতিক্রান্ত

অমিয় চক্রবর্তী

দশটা সাগর বারোটা দেশ
পার হয়েছি হাওয়াই যাহে—
পরবাসী তবু জানে
দেশ পেরোনো যায় না।
চিরদিনই সেই অনিমেষ
প্রাণ রয়েছে গঙ্গাতীরে,
চেয়ে থাকি মেঘলা নীরে
ফোটে ভোরের আয়না—
প্রাচীন দেউল, শিমুল ছায়া
বুকের ঘাটে বাংলা মায়া
সুধার অতল পায় না—
দেশ পেরোনো যায় না।
শ্রীরামপুরের জলমলগন
মার্কিনে এই বিদায় গগন
শেষের দিনে মেলাবে মন
আর কিছু তো চায় না—
পুজোর হাওয়ায় সানাই বাজায়,
দেশ পেরোনো যায় না॥

কলকাতা-নিউইয়র্ক ১৮ই সেপ্টেম্বর,
১৯৬৯

ফাঁসি

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রলম্বিত ফুলডোরে, রজ্জুফাঁস কদমের গাছে!
ভাবি এতে শিল্পী বুঝি ফুলডোরে বানাবে কুলনা—
শিল্পী ওরা, অনুক্ষণ কল্পনার জগতেই আছে।
আমাদের মতো তো না, নিজে ওরা নিজেরই তুলনা!
যেই দাঁড় ছুঁতে গেছি—নিজ গৃহ-বাতায়ন থেকে
দেখেই চ্যাঁচালো শিল্পী—'আরে, না, না, খুলো না ওটাকে!'
শুনে থতমত খাই। ফিরে চাই জানালার ফাঁকে।

মূর্তির নির্মাণে রত দেখি শিল্পী একাগ্র তন্ময়না—
কিছুই হয় নি যেন। আমার দিকে সে আর ফিরে তাকালো না।
গেলাম শিল্পীর ঘরে। গিয়ে শুধোলাম—
'গড়ছো যে নারীমূর্তি সুন্দর, সুঠাম—
আমাকে বেচবে ওটা? বলো ঠিক কতো চাও দাম?'
শিল্পী বলে— 'কেটে পড়ো, বিরক্ত কোরো না;
কোনো চড়া দামেতেই ওটা বেচবো না।'

বলি—'ভ্যান্ গোর কাছে ক্রিস্টিনের যা ছিলো ভূমিকা
তেমনি কি কিছু নাকি তোমার মূর্তির এই সুন্দরী নায়িকা?
ভালোবেসেছিলে বুঝি?' প্রশ্ন করি—ও তোমার কে?
শিল্পী বলে—'কেউ নয়, ও কেবল আজীবন ফাঁসালো আমাকে।
ক্ষমা নেই, ক্ষমা নেই, আজ তাই ফাঁসি দেবো ওর।'
ব'লে শিল্পী থেমে গেলো। দেখলাম চোখে তার ও কিসের ঘোর!
মুগ্ধচক্ষে মূর্তিটাকে প্রাণ ভ'রে যতবার দেখি—
মূর্তিময়ী সরলতা! মনে হলো নেই ওতে লেশমাত্র মেকি।
অনবদ্য শিল্পসৃষ্টি, সবিস্ময়ে দেখবারই মতো।

তাই তাকে পেড়াপীড়ি করি ক্রমাগত—
বলি—ঢের টাকা পাবে, শোধ হবে যত আছে বাজারের দেনা,
তবুও কি মূর্তিটাকে তুমি বেচবে না?'
শিল্পী বলে—'না হে যাও। বেচবো না; ফাঁসি দেবো ওকে।
ফাঁসি দেবে?—শুধোলাম বিস্ফারিত চোখে।
ব'লে উঠি—'সে কি কথা? এ যে বুড়ো আজব সংবাদ,
নিজেরই সৃষ্টির তুমি শেষে হবে নিজেই জহ্লাদ?'
সে বলে—হাঁ, হই যদি তাতেই বা কী বলার আছে?
ফুলদোল নয় আজ ফাঁসি হবে উঠোনের কদমের গাছে।

মন্ত্রবলে
অরুণ ভট্টাচার্য

যদি কিছু মন্ত্র জানতাম
তোমার হৃদয় থেকে কিছুটা ভালোবাসা
যদি কিছু জাদু জানতাম
তোমার করবী থেকে কিছুটা সুগন্ধ
এই সব একত্র করে রঙিন ফানুসে,
উড়িয়ে দিতাম আকাশে

ভাসতে ভাসতে
কোন সমুদ্রের ওপর কোন পাহাড়চূড়ায়
নিঃসঙ্গ নিবিড় হয়ে চিরকাল
ফানুসটি আমার গোপন সাক্ষ্য হয়ে রইত।

ঝড় উঠলেও
জয়ন্তী সেন

ঝড় উঠলেও আমি অরণ্য তোমার
তোমার ইচ্ছাকে মেনে চির হাহাকার।
ঝড় উঠলেও আমি সমুদ্র তোমার
অবিশ্রাম অনুভূতি ঢেউ-এর আকার
অথচ তুমিই ঝড়
ঊর্ধ্বশ্বাসে ভেঙেছো বাসর।

ঝড় থেমে গেলে আমি তোমার বাগান
সান্ত্বনা বিকেল সুখী স্থায়ী সমাধান।
ঝড় থেমে গেলে আমি তোমার নদীর
প্রশান্ত শরীরে মানি শাসনের তীর।
তুমিই ঝড়ের শেষ
সান্ত্বনার অব্যক্ত আদেশ।

সাঁকো
সুনীলকুমার নন্দী

'ঠা-ঠা মাঠ, কাঁটাগুল্মে আমি বেশ আছি'
বলতে বলতে সরে গেলো, সরে গেলো
কার কণ্ঠ...কার মুখ...মুখের আদল
কেমন ফুটতে-না-ফুটতে রহস্য শর্বরী
ছড়ায় কুন্তলরাশ, আলুথালু অন্ধকারে
আমি ভাসতে থাকি—

অথচ মেলে না উৎস, এ কোন কাহিনী! যেন
অন্ধচড় অন্তরাল আলগোছ আঙুলে খুলে
যেই-না সেই ঘষা কাঁচ আবছা-আবছা আদল ছুঁই-ছুঁই
ঝমঝম, আওয়াজে ওই নড়বড়ে সাঁকোটি
অতর্কিতে
ভেঙেচুরে ছুটে যায় দূরগামী ট্রেন—

ধর্ষার প্লাটফর্মে এই মধ্যরাত, আমি একা,
চারিদিক
অদ্ভুত ধাতবকণ্ঠে বাজতে থাকে অন্ধকার :
'ঠা-ঠা মাঠ, কাঁটাগুল্মে আমি বেশ আছি'।

খেলাঘর
বরুণ মজুমদার

হে আহত প্রসন্নতা, ঘনান্ত বিষাদের ঘরে
কিছু প্রেম, কিছু স্মৃতি, কিছু ভালবাসা
উদ্ভাসিত করে দাও। বুকের অন্তরালে আজ
একটি নন্দিত মুখ ঢেকে রাখো। কেন না এখন
আমি ক্লান্ত বড় ক্লান্ত এই ব্যর্থ যৌবনের ভারে।

মাটির পুতুলে দ্যাখো জীবনের কত রূপকথা—
কাঁদে পিতা, কাঁদে মাতা। অথচ এ সব সত্য নয়।
অথচ অবোধ নয় বোঝে নাকো পৃথিবীর কথা।
অনেক অনেক বেশি জানে নাকো জীবনের দাম।
কেন না আমরা সব রঙীন আশার মোহ নিয়ে
পৃথিবীতে বানিয়েছি আমাদের প্রিয় খেলাঘর।

নতুন দিন

[২২৮ পৃষ্ঠার পর]

কাজেই আর একবার চান্স নিতে দোষ কি। কতদিন তো কত স্টপে দাঁড়িয়ে অমূল্য বাস ধরতে পারে না, তা বলে হেঁটে হেঁটে আর একটা স্টপের দিকে সে এগিয়ে যায় না।

অমূল্য আশাবাদী। তার অসীম ধৈর্য।

তাছাড়া, বুধবার রাত থেকে শনিবার রাত পর্যন্ত একটা কথা তার মগজের মধ্যে ঘুরছিল। 'তের ওয়াইফকে অনেক দিন দেখ না।'

গ্যালাক্সির সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বাসুদেব কেমন চেহারা করে কথাটা বলেছিল।

শনিবার রাত্রেও চেহারাটা অমূল্যর চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছিল। অথচ বন্ধুর এই 'ওয়াইফ' বাসুদেবকে একদিন কুৎসিত ভাষায় অপমান করেছিল।

কাজেই অমূল্য ধরে নিতে পারে, অপমানের পরেও যখন বাসুদেব রেখাকে দেখতে আসছে, রেখাকে দেখবার একটা প্রবল আকাঙ্খা এতদিন বুকে নিয়ে সে বসেছিল, নিশ্চয়ই রবিবার সেভাবে সে তৈরী হয়েই আসবে। যাতে রেখা তাকে আর অপমান না করে। যাতে রেখা হাসি হাসি মুখে আদর করে তাকে ঘরে বসায়।

খুবই বিস্ময়ের কথা। গোকুলবাবু কাগজ পড়া ছেড়ে দিয়েছেন। অন্য কোনো চায়ের দোকানে বা মুদির দোকানে কাগজ রাখে কিনা এবং কাগজখানা হাতে হাতে না ঘুরে ভাঁজ করা অবস্থায় পড়ে থাকে কিনা একবারও তিনি উঁকি দিয়ে দেখছেন না।

সেই কৌতূহলটাই চলে গেছে।

তিনি মাঠে ঘাটে ঘুরেছেন।

তাঁর এখন ধারণা, নেতা নেত্রীদের বাণী পড়ার চেয়ে ও কাগজে তাঁদের ছবি দেখার চেয়ে রাস্তার মানুষ দেখা ঢের ভাল। তাতে অনেক বেশি জ্ঞান সঞ্চয় হয়, অভিজ্ঞতা বাড়ে।

অমূল্যর বৌ কাগজটা বন্ধ করে দিয়ে ভালই করেছে, অমূল্যর বৌ তাঁর কাগজ বন্ধ করেছে দেখ বন্ধ করেছে।

অমূল্য সংসারের কিছু না। উদয়াস্ত খেটে দুটো পয়সাই শুধু আনে।

আসলে সংসার চালায় রেখা।

যাই হোক কাগজের এবার আর কোনো মোহ নেই গোকুলবাবুর।

তিনি কদিন ধরে ঘুরে দেখছেন বাদামওয়ালা কেমন করে বাদাম ভাজে, ভুট্টাওয়ালা কেমন করে ভুট্টার দানাগুলি আগুনে সেঁকে নেয়।

ধোপারা কাপড় কাচে, মাঠের ঘাড়তে কাপড় শুকোয়, তিনি দাঁড়িয়ে দেখেন।

পাথরের খোয়া ছড়িয়ে তার ওপর গরম পীচ ঢেলে কর্পোরেশনের লোকেরা রাস্তা মেরামত করে, ইলেকট্রিক মিস্ত্রীরা মাটি খুঁড়ে ইলেকট্রিক লাইন বসায়, মই বেয়ে খুঁটির মাথায় চড়ে টেলিফোন মিস্ত্রীরা খুটখাট শব্দ করে কাজ করে, তিনি দাঁড়িয়ে দেখেন।

'নেই দলের' লোকদের খেটে খাওয়া মানুষদেরই তিনি তাকিয়ে দেখেন। অমূল্যর সঙ্গে তাদের মিল আছে। অমূল্যর মতন তারা মুখ বুজে সারাদিন খেটে যায়, পেটে পড়ে সামান্যই, লজ্জা নিবারণের মতন একটু কাপড়চোপড় গায়ে থাকে শুধু, অতিরিক্ত কিছু না।

উঁহু, গোকুলবাবু এখন আর ভুল করেও উঁচু বাড়িগুলির দিকে তাকান না, বা ঝকঝকে নতুন গাড়ি চড়ে যারা বেড়াতে বেরোয় কি সস্তে লেকে জমি কিনতে যায়, সেসব গাড়ি বা মানুষ দেখলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিকে চোখ সরিয়ে নেন।

কুলিকামিনরা বটতলায় বসে পাথর ভাঙছে, সেদিকে তাকিয়ে থাকেন। দরকার হলে একটু এগিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে দুটো একটা কথাও বলেন।

এভাবে ঘুরতে ঘুরতে নিচুতলার মানুষগুলিকে দেখতে দেখতে গোকুলবাবু সেদিন রেল লাইনের প্রায় গায়ে একটা পাকুড় গাছের নিচে একটা ছোট খোলার ঘরের কাছে চলে এলেন।

হুঁ, নতুন জমকালো সব বাড়ি নতুন নতুন রাস্তা যেমন হয়েছে, তেমনি পুরোনো দিনের কিছু কিছু চিহ্ন এই তল্লাটে এখনো রয়ে গেছে।

এই খোলার ঘরটাও তাই।

ত্রিশ বছরের ওপর গোকুলবাবু এ পাড়ায়। বেড়াতে বেরিয়ে পাকুড়তলার এই ছোট ঘরটা যে তাঁর চোখে না পড়েছে এমন না. কিন্তু কোনোদিন তিনি ঘরটার এত কাছে আসেন নি।

তবে তিনি শুনেছেন ওটা একটা তাড়িখানা। যাদের পয়সা-কড়ি কম, দামী নেশা করতে পারে না, তারা এখানে ঢুকে অল্প পয়সায় তাড়ি গিলে যায়।

একটা টকো মিষ্টি গন্ধ নাকে লাগল গোকুলবাবুর। পায়ের তলায় ভাঙ্গা খুড়ি ভাঁড় মুড়মুড়ে শব্দ করে গুঁড়িয়ে গেল। তাড়ি খেয়ে মাটির পাত্রগুলি ওরা যেখানে সেখানে ছুঁড়ে ফেলে, তাই চারদিকে এত ভাঙ্গা ভাঁড়ের ছড়াছড়ি। চিন্তা করে গোকুলবাবু ঘরটার পাশ কাটিয়ে একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে চলে যাচ্ছিলেন।

'এই যে বুড়কর্তা!'

চমকে উঠে গোকুলবাবু ঘাড় ফেরালেন।

সেই তেঁতুলতলার রাজা। গোকুলবাবু চিনতে পারলেন।

'এখানে কী!' হাসতে গিয়ে তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন।

'কেন, এখানে কি মানুষ আসে না?' গর্তে ঢোকা জ্বলজ্বলে চোখ দুটো তুলে ধরে গোকুলবাবুর মুখের দিকে তাকাল মানুষটা।

এ-কথার কী উত্তর দেবেন। গোকুলবাবু চুপ করে রইলেন।

'আজ গেহ্লাদের দোকানে রুকেট চড়তে যান নি?'

'নাঃ।' গোকুলবাবু মাথা নাড়লেন।

'যান, শীগগীর চলে যান, মস্কো, পিকিং দিল্লী আমেরিকা ঘুরে আসুন, তা না হলে দুপুরে কর্তার খাওয়াটা হজম হবে না, পেটটা জয়ঢাক হয়ে ফুলে উঠবে হা-হা।'

পাগল! সত্যি লোকটার মাথা খারাপ চিন্তা করে গোকুলবাবু চুপ করে রইলেন।

'কই, আজ আর পয়সা দিলেন না চা খেতে?'

'না বাবু, তুমি যেদিকে যাচ্ছিলে যাও।' তার মুখে তাড়ির গন্ধ পাচ্ছিলেন গোকুলবাবু। একেবারে মুখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি এক পা পিছনে সরে দাঁড়ালেন। যেন আজ এর সঙ্গে খুব বেশি কথা বলতে তাঁর ভয় হচ্ছিল। চোখ দুটো লাল হয়ে আছে। বলা যায় কি। পাগলের মর্জি। হঠাৎ কি করে বসে!

'শুনুন কর্তা শুনুন।' গোকুলবাবু জায়গাটা পার হয়ে যাচ্ছিলেন। পাগল বাধা দিল। 'কাগজ পড়া কি ছেড়ে দিয়েছেন?'

'হুঁ, ছেড়ে দিয়েছি।' গোকুলবাবুর মনে যা-ই থাকুক, যেন আপাতত পাগলকে খুশি করতে তিনি তৎক্ষণাৎ হেসে ঘাড় কাত করলেন। 'একেবারে ছেড়ে দিয়েছি।'

'সাবাস সাবাস! আসুন কর্তা আপনাকে একটা চুমু খাই। আপনি এখন ভদ্রলোক হয়ে গেলেন, খাঁটি মানুষ হয়ে গেলেন।' আকাশ ফাটিয়ে লোকটা চেঁচিয়ে উঠল এবং এমন করে দু হাত বাড়িয়ে দিল, সত্যি বুঝি গোকুলবাবুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাবে, গোকুলবাবু আর এক পা পিছনে সরে দাঁড়ালেন। 'উঁহু, ভয় পাবেন না কর্তা, আমাকে দেখে আপনার ভয়ের কিছু নেই। আমি ভেড়ার চেয়েও ইনোসেন্ট, ছাগলের চেয়েও হার্মলেস। কেন না আমি কাগজ পড়ি না. পলিটিকস্ করি না পার্টি করি না হা-হা।'

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন গোকুলবাবু লোকটার কথা শুনে। ইংরেজী জানে। সেদিন তিনি যা অনুমান করেছিলেন তাই। বেশ শিক্ষিত লোক, কথাগুলি দামী সন্দেহ কি।

তিনি ভাবছিলেন, আর ঠিক সেই

ম[illegible] ত্যাডখানার ভিতর থেকে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে আর একজন বেরিয়ে এল। গোকুলবাবু মানুষটাকে চিনলেন। সেদিন প্রহ্লাদের দোকানে বসে কাগজ পড়ছিল। সেই গোঁফওয়ালা। যার নাম রাধু গুণ্ডা।

'এই যে কর্তা।' গোকুলবাবুকে দেখেই রাধু দু হাত একত্র করে চিরকে ঠেকাল। আজ কাগজ পড়তে যান নি প্রহ্লাদের দোকানে?

'না।' গোকুলবাবু মাথা নাড়লেন।

'ছোঁড়াগুলো আপনাকে ভয়ানক জ্বালাতন করছিল। ওখানে বসে কাগজ পড়ার অসুবিধা আছে।'

গোকুলবাবু অল্প হেসে চুপ করে রইলেন।

'উঁহু, রাধু বাঁ হাতে গোঁফ চুমড়াল, সেদিন আমি রুকবাজগুলোর কাণ্ড-কারখানা দেখলাম। কিছু বললাম না। আপনি যারেন, আপনি দোকানে বসে কাগজ পড়বেন, আর একদিন যদি ডেঁপোগুলো আপনাকে জ্বালাতন করে বাছাধনদের এমন টাইট দেব—ধন্দের নাম ভুলে যাবে।'

'উঁহু, উনি কাগজ পড়বেন না। উনি আমন্ত্রক কথা দিয়েছেন, উনি ভদ্রলোক হয়ে গেছেন, খাঁটি মানুষ হয়ে গেছেন।' সেই তেঁতুলতলার পাগল তখনও দাঁড়িয়ে। কথাটা বলেই হা-হা করে হাসল।

রাধু কটমট করে সেদিকে তাকাল।

'আপনার তো কাজ হয়ে গেছে, আপনি এখন চলে যান।'

'হ্যাঁ, আমার কাজ হয়ে গেছে, আমি চলে যাচ্ছি ভাই—তবে কিনা উনি আর নিউজ পেপার পড়বেন না, পলিটিক্যাল খবর দেখবেন না, আমাকে কথা দিয়েছেন।'

'হ্যাঁ, আপনাকে কথা দিয়েছেন, উনি আর কাগজ পড়বেন না, আপনি চলে যান।'

'হ্যাঁ ভাই, তুমি যখন বলছ, চলে যাচ্ছি—তোমাকে আমি গুরু মেনেছি।'

পাগল আর দাঁড়াল না। হন হন করে হাঁটতে শুরু করল। যেন সেই মাঠের দিকে তেঁতুলতলার দিকে চলে যাচ্ছিল।

'আপনি লোকটাকে চেনেন?' রাধু গোকুলবাবুর দিকে চোখ ফেরাল।

'না আমি কি করে চিনব—সেদিন দেখলাম ওদিকের একটা মাঠে গাছের নিচে বসে আছে। মনে হল শিক্ষিত।'

'হুঁ, খুবই শিক্ষিত। ফরেন-টরেন ঘুরে এসেছে। এখন কী অবস্থা দেখুন।'

'আহা, এমন হল কেন!' গোকুলবাবু আর একবার চোখ ঘুরিয়ে দূরে পাগলকে দেখলেন। আকাশের দিকে মুখ তুলে কি যেন বিড়বিড় করতে করতে রেল লাইনের পাশ দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে।

রাধু বলল, 'মাথাটা একদম খারাপ হয়ে গেছে লোকটার। বীরেশ্বর মুখার্জি। দমদমে ওর বাড়ি আছে। নিজের বাড়ি। কিন্তু এখন সেই বাড়ির দরজা তার জন্য বন্ধ।'

'কেন?' গোকুলবাবু ভুরু কুঁচকোলেন।

'মামাতো ভাই বাড়িখানা কায়দা করে হাত করেছে। বীরেশ্বর এখন রাস্তায়, গাছ-তলায় রাত কাটায়।'

'বাড়িখানা বেদখল হয়ে গেল?'

'বৌয়ের জন্য হয়েছে এটা। বৌটার চক্করে। আমায় তখন সব বলছিল। বৌয়ের সঙ্গে মুখার্জির ওই মামাতো ভাইয়ের খাতির।'

'ছি ছি, কী জঘন্য ব্যাপার—' গোকুলবাবু নাকের ডগা কুঁচকোলেন। 'মামাতো ভাইটা কার কী।'

রাধু হাসল।

'আপনি নাক কুঁচকোচ্ছেন বুড়োকর্তা, কিন্তু মামাতো ভাইটা যে-সে লোক নন। পলিটিক্স করেন। একজন নামী লীডার। দু দুবার এম এল এ হয়েছেন। হয়তো আর একবারের ইলেকশনে মন্ত্রী হয়ে যাবেন।'

'তা হলেও শয়তান লোক, পাপী লোক।' গোকুলবাবু মাথা ঝাঁকালেন।

রাধুও মাথা ঝাঁকল।

'পাপী না হলে শয়তান না হলে যে এ-দিনে বড় হওয়া যায় না। আপনি বড় হতে পেরেছেন!'

রাধুর কথাগুলি বড় ভাল লাগল। চুপ করে রইলেন তিনি। ভাবলেন, আমার দিন তো একভাবে কাটিয়েছি। আবার অমূল্যরও এই অবস্থা। পাপ করতে শিখল না শয়তানী করতে জানল না।

'বুঝেছেন বুড়োকর্তা, মুখার্জি জার্মেনীতে ছিল। কি একটা জিনিস নিয়ে রিসার্চ করছিল সেখানে। খুব পণ্ডিত লোক। ছ সাত বছর ছিল বিদেশে। দেশে ফিরে এসে দেখে এই অবস্থা। বিষয়সম্পত্তি গেছে, বৌটাও ঝুলে পড়েছে একটা লম্পটের সঙ্গে।'

'অথচ তিনি একজন নেতা, পলিটিক্স করেন, দুবার এম এল এ হয়েছেন।' গোকুল-বাবু একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেললেন।

'আমি নেতাগিরি করা বার করে দিচ্ছি—এমন টাইট দেব শালাকে, একটা নিরীহ মানুষকে এভাবে রাস্তায় দাঁড় করান, ঐ মেয়ে-ছেলেটাকে শিক্ষা দিতে হবে। এতক্ষণ আমায় সব বলল মুখার্জি। বুঝুন, কত দুঃখে এই মানুষ আমাদের মতন লোকের সঙ্গে বসে তাড়ি খেতে আসে।'

গোকুলবাবু চুপ করে রইলেন।

'বৌ আর ঐ শালা মামাতো ভাই এখন প্রমাণ করতে চাইছে বীরেশ্বর মুখার্জির মাথা খারাপ, অপ্রকৃতিস্থ সে, কাজেই তাকে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হবে না—অথচ তার নিজের বাড়ি, বুঝুন কত বড় শয়তানি চক্রান্ত দুজনের—' রাধুর হাতের মুঠ শক্ত হয়ে উঠল, চোখ দুটো পেঁয়াজের মতন লাল লাল হয়ে উঠল। আবার নাম রাধু, বুঝেছেন বুড়োকর্তা। আমার অনেক বদনাম, অনেক কুকাজ করি। কিন্তু সুকাজও করি—যদি দেখি একটা লোক বিপদে পড়েছে, শয়তানের খপ্পরে পড়েছে—তবে শয়তানের মাথা আমি বোমা মেরে উড়িয়ে দেবই—চলি কর্তা।'

গোকুলবাবু স্তব্ধ হয়ে রইলেন। গোঁফ চুমড়াতে চুমড়াতে রাধু উল্টোদিকের রাস্তা ধরল।

একটু সময় সেদিকে চেয়ে থেকে গোকুলবাবু হাঁটতে আরম্ভ করলেন। তিনি চিন্তা করলেন, এমন মানুষেরই এখন দরকার। রাধুর মতন গুণ্ডা দেশে যত বেশি তৈরী হয় তত মঙ্গল। তবেই যদি সমাজটার সংশোধন হয়। দুর্নীতির মাত্রাটা কমে। তাই তো, কত রকম শয়তানী কত রকম পাপ কত দুর্নীতি চলেছে চারদিকে, আর এসব যারা করছে তারাই সুখে আছে আনন্দে আছে তারা। সমাজে সম্মান পায় ভোট পায় মালা পায়। আর অমূল্যর মতন মানুষেরা বীরেশ্বরের মতন মানুষেরা ভেড়া হয়ে থাকে। তারা পায়ে পায়ে নিগৃহীত হয়, পিষ্ট হয়। নেই দলের খাতায় নাম লিখিয়ে চিরদিন ফ্যা-ফ্যা করে রাস্তায় ঘোরে।

গোকুলবাবু এ-ও চিন্তা করলেন, রাস্তার পাগল বীরেশ্বর কেন কাগজের ওপর এত খাপ্পা। কেউ রাজনীতির খবর পড়ছে, নেতাদের বক্তৃতা পড়ছে হবি দেখছে শুনলে কেন এত খেপে যায়—রাধুর মুখে সব শুনে জিনিসটা তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

তাইতো, তিনি ও তাঁর অমূল্য একভাবে বঞ্চিত, বীরেশ্বর আর একভাবে।

দেশে এমন হাজার হাজার লাখ লাখ, বীরেশ্বর অমূল্য জুতোর তলায় পড়ে কাঁদছে, আর বীরেশ্বরের মামাতো ভাইয়েরা জুতো পায়ে গাড়ি চড়ে বাবতীয় আরাম সুবিধা সুখ সম্মান লুঠছে।

শুক্রবার রাত্রে অমূল্য বাসুদেবকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে খাওয়ার কথাটা তুলল।

কেন না এই কদিন যা সে ভেবেছিল—এখনি রেখাকে কথাটা বলা হবে না। অনেকটা যেন দৈবের ওপর নির্ভর করে সে চুপ করে ছিল। রবিবার বাসুদেব তো আসুক, উপস্থিত ক্ষেত্রে যা হয় হবে। স্বামীর পুরোনো বন্ধুটিকে দেখে শ্রীমতী যদি উগ্রমূর্তি ধারণ করেই তখন যা-হোক একটা ব্যবস্থা করলেই চলবে। আর যদি—সেই যদি'র ওপর নির্ভর করে অমূল্য তিন দিন চুপ করে ছিল।

হুঁ, যদি কোনো কারণে বাসুদেবের ওপর রেখা হঠাৎ প্রসন্ন হয়ে ওঠে।

এই কারণটা যে কী অমূল্য অবশ্য তা ঠিক করে উঠতে পারছিল না। কারণটা তখনও অন্ধকার।

তবে অমূল্য আশা করছিল, বাসুদেব

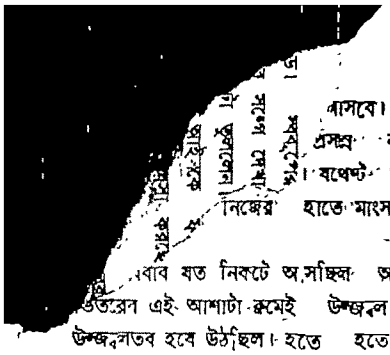

আসবে। তাকে প্রসন্ন না হয়, । যথেষ্ট সমাদর নিজের হাতে মাংস রান্না

রবিবার যত নিকটে আসছিল অমূল্যর অন্তরের এই আশাটা ক্রমেই উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছিল। হতে হতে শুক্রবার রাত্রে এমন হল, ভয়ানক লোভ হল তার খেয়ে দেয়ে শোবার সময় বেখাকে সে বলেই ফেলল।

কিন্তু বলল এভাবে, অনেকদিন পর বাসুদেবের সঙ্গে সেদিন হঠাৎ রাস্তায় দেখা। দেখেই তাকে জড়িয়ে ধরল। জড়িয়ে ধরে তার বাবার কথা জিজ্ঞেস করল, ছেলেমেয়েদের কথা জিজ্ঞেস করল। তারা কেমন আছে। তারপর অমূল্যকে একটা চায়ের দোকানে বাসু টেনে নিয়ে গেল। সেখানে বসে একথা-সেকথার পর বাসু যখন জানতে পারল, অমূল্য সেই তার পুরোনো অফিসেই পড়ে আছে মাইনে-টাইনে কিছুই বাড়ছে না, তখন সে অমূল্যকে একটা বিজনেস-এর প্রস্তাব দিল।

'কিসের বিজনেস?' চোখের তারা তীক্ষ্ণ করে বেখা অমূল্যর মুখটা দেখছিল।

'এখনো বাসু সেটা বলে নি, বলল যে খুব লাভের ব্যবসা, আমি যদি করতে চাই তবে সে তার ব্যবস্থা করে দিতে পারে।'

রেখা চুপ করে ছিল।

অমূল্য লক্ষ্য করল, আগের মতন 'বাসু' নামটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই রেখা লাফিয়ে উঠল না; নাক সিঁটকাল না।

একটু আশ্বস্ত হয়ে অমূল্য তখন বলল, 'রবিবার বাসুদেব আসতে পারে—'

'কখন আসবে?' বেখার চোখের তারা আবার তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

'এই সকালের দিকে—আমি কিছু বলিনি অবিশ্যি, কেন না তোমাকে জিজ্ঞেস না করে হুট করে তাকে বাড়িতে আসতে বলব,—বুঝতে পাচ্ছ না?'

'না, বাড়িতে আসতে তো আমার আপত্তি নেই। তবে মদটদ খায়, তোমাকে কদিনই টেনে নিয়ে গেছে—এই জন্য ওকে আমি দু চোখে দেখতে পারি না।'

'এখন কমিয়ে দিয়েছে; এখন এক রকম খায়ই না।' অমূল্য মিষ্টি করে হাসল।

রেখা আবার চুপ করে রইল।

অমূল্য আর একটু আশ্বস্ত হল।

'রবিবার এসে ব্যবসার কথাটা ভাল করে বলবে। খুব লাভের নাকি। বলছিল, এভাবে একটা বাজে অফিসে সারা জীবন পচে মরার কোনো অর্থ হয় না।'

এবার রেখার দুচোখ বড় হয়ে উঠল। 'আমি সমানে তোমাকে কী বলছি—একটু এদিক-ওদিক তাকাতে' অন্যভাবে চেষ্টা চরিত্র কর—কত লোক কত কিছু করে রাতারাতি দিন করে ফেলছে—শাক ভাত জুটছিল না; দেখা গেল সেই মানুষই কী করে যেন ধাঁ ধাঁ করে উঠে গেল; বাড়ি-গাড়ি সবই করল—তোমার মতন এমন মড়া হয়ে কেউ এদিকে লজ্‌ঝড় অফিসে কামড় খেয়ে পড়ে থাকে না।'

যেন দাউ দাউ করে রেখার কামনা বাসনা, সাধ আহ্লাদের চাপা আগুনটা নতুন করে উথলে উঠল।

অন্যদিনের মতন অমূল্য মুখ ভার করল না, এবার কাটা কাটা কথা শুনে মনে ওপর বিরক্ত হল না। বরং গলা ছড়িয়ে হাসল।

'আসল কথা হল সময়—সুযোগ—সময় না হলে সুযোগ না এলে কারো কিছু হয় না। হয়তো এই সুযোগটাই আমার জন্য এতদিন অপেক্ষা করছিল। তা না হলে এতকাল পর বাসুর সঙ্গে হঠাৎ রাস্তায় দেখা হবে কেন—আর দেখা হবার সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা প্রস্তাব আসবে কেন। অথচ আগে তো নিত্য দেখা হয়েছে, যখন ওরা পাড়ায় ছিল, কোনোদিন তো সে আমাকে এই পরামর্শ দেয় নি।'

বোঝা যাচ্ছিল রেখার ভিতরের আগুন তখনও সমান তেজে জ্বলছে। আগুনের আভা আজ তার চোখে মুখে লেগেছে। চোখ দুটো ঝলমল করছিল।

'তোমার বন্ধু লোক হিসেবে খারাপ, আমি তো সেকথা বলছি না, কোনোদিন বলিও নি—কেবল ঐ মদ খাওয়া নিয়ে—এইজন্যই মানুষটার ওপর আমি সময় সময় একটু যা বিরক্ত হয়েছি—তা না হলে বন্ধু বন্ধুর বাড়ি আসবে, খুবই আনন্দের কথা। তুমি কাল অফিসে গিয়ে টেলিফোন করে বলে দাও রোববার সকালে যেন চলে আসে। এখানে চা খাবে।'

অমূল্য মাথা নেড়ে হাসল।

'আমি তো ভেবেছি বাসুকে মাংস ভাত খাইয়ে দেব। কেন না নিজের মুখে যখন আমাকে ব্যবসার কথা বলছে—কেবল তাই না, বলছে, টাকার জন্যে তোকে ভাবতে হবে না। আমি যখন পেছনে আছি, সেই দারিদ্র আমার—তুই চাকরি ছেড়ে এ-লাইনে আসতে চাস কিনা সেটা ভেবে দ্যাখ।'

'তবে তো হয়েই গেছে।' রেখা রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'বোঝা যাচ্ছে তোমার বন্ধুই ফিনান্স করবে, কারবারী মানুষ ওরা; হয়তো আর একটা ব্যবসা মাথায় এসেছে—একলা সব দিক সামলে দিতে পারছে না—তাই তোমাকে সঙ্গে রাখতে চাইছে।'

'তাই।' অমূল্য মাথা ঝাঁকাল। 'তার মানে ফিফটি ফিফটি ব্যবস্থা থাকবে আমাদের মধ্যে—অমূল্য থাকবে স্লিপিং পার্টনার হয়ে, আমি হব অ্যাক্টিভ পার্টনার। রোববার সে এখানে আসুক—সব খোলাখুলি আলোচনা হবে।'

'হুঁ, ভাত খেতেই বলে দাও। কথা-বার্তা বলতে বলতে বেলা হয়ে যাবে। এখানেই বাসুবাবু দুপুরে খাওয়া দাওয়া করবেন।'

এমন একটা আভাস সে দিয়েও ছিল—বলছিল তোর বৌ তো শুনছি ভাল মুরগির রোস্ট রাঁধতে পারে, একদিন খাওয়া যাবে।'

'কার কাছে উনি শুনলেন আমি ভাল রোস্ট রাঁধতে পারি?' খুশি খুশি চোখে রেখা স্বামীর চোখের দিকে তাকাল।

'আমিই যেন একদিন কবে কথায় কথায় বলেছিলাম।'

অন্যদিন হলে রেখা ভয়ানক রেগে যেত। তাকে নিয়ে একটা মাতালের সঙ্গে অমূল্য কথা বলছে, কিছুতেই সে এটা সহ্য করত না। বরং আজ যেন রেখা জিনিসটা উপভোগই করছিল।

'এখন ঈশ্বরকে ডাক, যদি ব্যবসার লাইনে গিয়ে তোমার কপাল খোলে, চাকরি ছাড়া আজকাল উপায় আছে নাকি—মানুষের মতন বেঁচে থাকতে হলে ব্যবসা ছাড়া গতি নেই, আমার দিদির এক দেওর, শুনলে অবাক হবে, সিমেন্টের ব্যবসা করে রাজা হয়ে গেছে। কলকাতায় দুটো বাড়ি করেছে, দুটো গাড়ি কিনেছে।'

'হুঁ, হুঁ, আমিও যেন শুনেছিলাম।' ছোট বাচ্চাটা ঘুমের ঘোরে হঠাৎ কেঁদে উঠতে অমূল্য বিছানার ওপর ঝুঁকে বাচ্চাটাকে আদর করছিল। 'কিন্তু সেই ভদ্রলোক তো সিমেন্টের ব্ল্যাক মার্কেট করে কালো রাজারী ব্যবসা।'

'তোমার যেমন কথা—তুমি শ্বশুরমশায় একরকম।' রেখা ভুরু কুঁচকোলো। 'এদিনে আবার কালো বাজার আর সাদা বাজারের বাছবিচার—কচ্চা বাচ্চার একটা জোটে না, বৌয়ের একখানা ভাল কাপড় জোটে না কোথাও পরে বেরোবার—তোমরা কেবল আছ মানুষের নিন্দে করতে খুঁত ধরতে, অমুকে ব্ল্যাক মার্কেট করছে, অমুকে ঘুষ খাচ্ছে। খুব একটা সৎ থেকে সাধু হয়ে থেকে উপোস করলাম, বাচ্চাগুলোকে শুকিয়ে মারলাম—এর মধ্যে যে বাহাদুরীটা কী আমার মাথায় ঢোকে না। বলে কিনা যে দেশে গভর্নমেন্টই চুরি শেখাচ্ছে, কালোবাজারী শেখাচ্ছে, ঘুষ খেতে শেখাচ্ছে, সেখানে তোমাদের বড় বড় কথা বলে হাত পা গুটিয়ে ঘরের ভেতর বেড়াল হয়ে থেকে লাভ কী হচ্ছে বুঝি না। শ্বশুরমশায় তো শুনি কোন্ এক খবরকাগজের অফিসে পোকা বেরেই জীবন কাটিয়ে দিলেন, তুমিও এমন একটা শুকনা কাঠ কামড়ে ধরে বসে আছ—এর নাম চাকরি—ছি ছি, আমি হলে করে—'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' রেখা যখন এসব কথা আরম্ভ করে, থামতে চায় না। তার চোখে মুখের অবস্থা অন্যরকম হয়ে ওঠে। আজ অবশ্য চেহারাটা তত বিকৃত

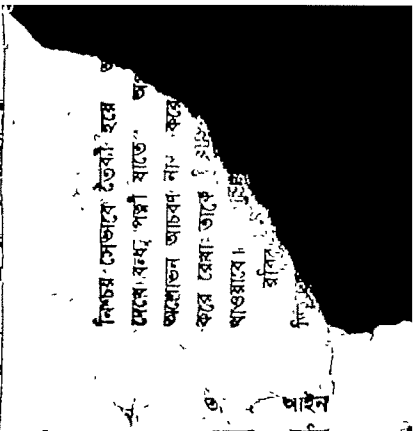

করল না, কিন্তু জিভের ধার সমান ছিল। অমূল্য তাকে সান্ত্বনা দেবার মতন সুর করে বলল, 'বিজনেস ইজ বিজনেস, আমি ব্ল্যাক মার্কেটও বুঝি না হোয়াইট মার্কেটও বুঝি না, বাস্ যেমন বলবে তাই করব—ঠিকই তো, আমরা কি মানুষের মতন বেঁচে আছি। চারদিকে লোকে কত কী করে ফেলছে। দেখতে দেখতে আমাদের এই তল্লাটে কত বড় বড় বাড়ি উঠে গেল—আমাদের চোখের ওপর, আর আমরা বোকারাম হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে শুধু দেখলাম। না না, এবার আমাকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াতে হবে। বাবার মতন ছেঁড়া চটি পরে ছেঁড়া জামা গায়ে চড়িয়ে সারাজীবন কাটিয়ে দেওয়া আমার দ্বারা হবে না।'

রেখার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। স্বামীর এতদিনে সুমতি হয়েছে।

'মুরগির রোস্ট করতে বলছ তোমার জন্য—মুরগি কোথা থেকে আসবে?'

'কেন, বাজার থেকে?' বাচ্চাটার কান্না থামছিল না, অমূল্য তাকে কোলে নিয়ে বলল। 'বাজারে মুরগির অভাব কি।' রেখার চোখে চোখ চেয়ে রেখে সে প্রফুল্ল হাসি হাসল।

'উঁহু, আমার মনে হয় এদিকের বাজারে রোস্টের উপযোগী মুরগি তুমি পাবে না—তা হলে তোমাকে যেতে হবে নিউ মার্কেটে।

'তবেই সেরেছে।' অমূল্য বিড়বিড় করে উঠল।

'উঁহু, অতদূরে তোমাকে যেতে হবে না।' রেখা গম্ভীর হয়ে বলল, 'তাছাড়া অসম্ভব চড়া দাম নেবে সেখানে একটা মুরগির জন্য। বরং আমি যা ভাল বুঝি—আমাদের এই নারকেলডাঙ্গায় তুমি মুরগি পাবে—সেদিন লেকে বেড়াতে গিয়েছিলাম—দেখলাম ঘোষপাড়ার ওরা বাড়ি বাড়ি মুরগি পুষছে, তারা নাকি কিছু কিছু মুরগি বেচেও দেয়।'

'সেই ভাল।'

বাচ্চাটা এতক্ষণে ঘুমিয়েছে। অমূল্য তাকে বিছানায় শুইয়ে দিল। 'এসো, শুয়ে পড়া যাক, রাত হল, আলোটা নিবিয়ে দাও।'

আলো নিবিয়ে রেখা বিছানায় চুকে পড়ল।

স্বরূপ ঘোষের জমজমাট অবস্থা।

দশ কাঠা জমি নিয়ে প্রকাণ্ড বাড়ি। বাপ ঠাকুর্দার আমলের বাড়ি। অবশ্য আগে কাঠা ছয়েকের মতন জমি ছিল তাদের।

কিন্তু স্বরূপ ঘোষ আরো কিছু জমি কিনে বাড়ির চৌহদ্দী বাড়িয়ে দিয়েছে। ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট চারদিকে ঘর বাড়ি ভাঙ্গতে আরম্ভ করার আগেই বাড়ির লাগোয়া কচা বস্তির ঘর-স্বরূপ বুদ্ধি করে কিনে রেখেছিল।

স্বরূপের বাড়ি ভাঙ্গা পড়ে নি। বিষয়ী লোক। বেটারমেন্ট ফীজ দিয়ে সে বাড়ি রেখে দিয়েছিল কেন না এই তল্লাটে জমির দাম বাড়ির দাম যে একদিন আকাশে গিয়ে ঠেকবে স্বরূপ সেটা আগেই বুঝতে পেরেছিল।

তার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি মিথ্যা হয় নি। এখন এক কাঠা জমির দাম এখানে বিশ হাজার টাকা। যাই হোক বাড়ির সঙ্গে খাটাল—এত গরু মোষ স্বরূপের। তার জমির দরকার ছিল। অথচ সবাই বলত, স্বরূপের এই রকম অবস্থা থাকবে না। গভর্ণমেন্ট খাটাল তুলে দেবে। এমন ভাল জায়গা হয়ে গেছে এটা। বস্তি সাফ হয়ে গেছে, পচা মাটি দিয়ে বুজিয়ে ফেলে চাবধারে আণ্ডারগ্রাউণ্ড পাইপ বসান হল। ভাল ভাল লোকেরা এখন এসব জায়গায় জমি কিনে বাড়ি তুলছে। স্বরূপকে খাটাল রাখতে দেবে কেন।

স্বরূপের অপরাধ সে দুধে জল মেশাচ্ছে, আর সেই জল মেশান দুধ গলাকাটা দামে লোকের কাছে বিক্রী করছে।

উঁহু, এই তল্লাটে এখনো সরকারী দুধের ডিপো খোলা হয় নি। কাজেই স্বরূপের জল মেশান দুধই মানুষকে খেতে হচ্ছে। খেতে তারা বাধ্য। অবশ্য যারা দুধ খায়। দুধের ঘটি নিয়ে তারা আর কোথায় ছুটোছুটি করবে।

এইজন্য তাদের রাগ স্বরূপের ওপর। জল দুধ খেয়ে তারা দিনরাত স্বরূপকে অভিশাপ দিচ্ছে—সরকার তার খাটাল ভেঙ্গে দিল বলে। নয়তো স্বরূপের গোয়ালের সব কটা গরু মোষ শীগ্‌গীরই ব্যারাম হয়ে ছটফট করে মরবে। অবশ্য স্বরূপকে যারা শাপসন্যি করছে তারা এখানকার পুরানো লোক। কিন্তু দেখা গেল তাদের অভিশাপের কোনোটাই ফলে নি। আজ পর্যন্ত স্বরূপ বহাল তবিয়তে রয়ে গেছে। পয়সাওয়ালা লোকেরা এসে চড়া দাম দিয়েই তার জলো দুধ গিলছে। তার এখন পয়সার ছড়াছড়ি। খাটালের গরু মোষের সংখ্যা ডবল হয়েছে। গভর্ণমেন্ট তার খাটাল ভেঙ্গে দেয় নি। বরং খাটালটা এখন আগের চেয়ে অনেক বড় করে ফেলেছে স্বরূপ। আজ পর্যন্ত তার গরু মোষের কোনো ব্যারাম হয় নি। একটা পশুও মরে নি।

তা গরু মোষ না মরুক। কিন্তু আইনকে ফাঁকি দিয়ে স্বরূপ কেমন করে তার খাটালটা এখনো এখানে রাখতে পারছে সেটাই রহস্য। অথচ চারদিকের কত খাটাল উঠে গেল। স্বরূপের খাটালে সরকার হাত লাগাতে পারছে না।

সেদিন ওই রাস্তা দিয়ে গোকুলবাবু হাঁটছিলেন। রাধুর সঙ্গে হঠাৎ রাস্তায় দেখা। স্বরূপ নতুন বিল্ডিং তুলেছে। প্রকাণ্ড

[illegal] নিশ্চয় সেভাবে তৈরী হয়ে [illegal] দেখে বন্ধ পড়ী যাতে [illegal] অযোগ্য না করে [illegal] করে রেখা তাকে [illegal] আওয়াজে।

[illegal] আইন [illegal] আছে নাকি এই নচ্ছার দেশে।'

'কি বরম?' গোকুলবাবু হঠাৎ কথাটা বুঝতে পারছিলেন না।

'বীরেশ্বরের মামাতো ভাইয়ের মতন হোমড়াচোমড়া একটা দুটা এম এল এ টেম এল এ-কে হাত করে রেখেছে স্বরূপ। যারা খাটাল ভাঙ্গতে আসে তারা ফিরে যায়। তাদের হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিলেই হল। ওপর থেকে যখন তেমন একটা চাপ আসছে না, তারাও ভাবছে, এই তো বেশ আছি, ফি-বার আমরা খাটাল ভাঙ্গতে আসব, কিন্তু স্বরূপ বলবে সুবিধামত জায়গা পাচ্ছি না খাটাল সরাবার, কাজেই দাদাবা, এবারও কিছু জলখাবার মত পকেটে গুঁজে নিয়ে যাও। খুশি হয়ে পকেটে কিছু গুঁজে নিয়ে তারাও ফি-বার ফিরে ফিরে যায়।'

চোখ কপালে তুলে গোকুলবাবু বললেন, 'মাসের পর মাস বছরের পর বছর এই করে স্বরূপ খাটাল ধরে রেখেছে?'

'তাছাড়া আর কি,' রাধু মুখের বিড়িটা ফেলে দিল। 'চোরের দেশে এর চেয়ে সুব্যবস্থা আপনি আশা করেন কেন।'

'অরাজকতা, সর্বত্র অরাজকতা, গোকুলবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। 'যাদের টাকার জোর আছে মামার জোর আছে তাদেরই রমরমা, অবস্থা তারা বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকবে, বাদ বাকী মানুষ মরে যাবে।'

'মরে কি আর যাবে কর্তা,' রাধু গোঁফটা চুমরে নিয়ে নিচু গলায় হাসল। 'পাকা ঘরের পাকা ঘুরবে—এই এর কাছে, এই জিনিসের কাছে সব সমান হয়ে যাবে।' বলতে বলতে রাধু তার হাতের ঘুষি শূন্যে নাচিয়ে গলার নিচের চাপা হাসিটা উঁচু করে দিল। উঁচু করতে করতে হাসিটাকে যেন সে আকাশের গায়ে ঠেকিয়ে দিল।

জায়গাটা অপেক্ষাকৃত নির্জন। তাছাড়া অন্ধকার হয়ে এসেছিল। তখনো রাস্তার আলোগুলি জ্বলে ওঠে নি। এমন হা-হা করে হাসছিল রাধু, আর মুঠ পাকিয়ে হাতটা শূন্যে নাচাচ্ছিল, গোকুলবাবু একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন।

অবশ্য রাধুকে এভাবে ঘুষি পাকিয়ে উত্তেজিত হতে সেদিন প্রহ্লাদের দোকানেও

তিনি দেখেছেন, কিন্তু এভাবে হাসতে শোনেন নি। আগের দিন ভাড়ির দোকানের সামনে পাগল বীরেশ্বরের মামাতো ভাই সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে রাধু চোখ লাল করেছে, ঘুষিও পাকিয়েছে, কিন্তু এভাবে সে হাসে নি।

গোকুলবাবু হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, রাধুর উঁচু গলার হাসির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপ ঘোষের চারতলার একটা জানালা ফটাশ শব্দ করে খুলে গেল। সেখানে কোমল নীলাভ আলো জ্বলছিল। একটি মুখ চকিতে জানালায় গলা বাড়িয়ে দিয়ে তখনই আবার জানালা থেকে সরে গেল। মুখখানা ভারি সুন্দর।

সম্ভবত স্বরূপ ঘোষের মেয়ে। গোকুলবাবু চিন্তা করলেন, ভাল খায় দায়, সুখে আছে, তাই এমন লাবণ্যযুক্ত মিষ্টি চেহারা। যেন ক্ষীর ননী দিয়ে গড়া শরীর।

তা তো হবেই। লোককে জল মেশান দুধ খাইয়ে স্বরূপ টাকা করেছে। দুধের চেয়ে জল বেচেই সে বেশি টাকা জমিয়েছে। লোকের গলা কেটে তার প্রাসাদের মতন বাড়ি। সুন্দর মুখটা দেখবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কদর্য চিন্তা গোকুলবাবুর মনে উদয় হল।

ঘেন্নায় উনি মুখটা সরিয়ে নিলেন।

'আমি সব সমান করে দেব—দুদিন সবুর করুন বুড়োকর্তা—দেখবেন, কোথায় যায় স্বরূপ ঘোষ, কোথায় যায় বীরেশ্বর মুখার্জির মামাতো ভাই, আর কোথায় বা যায় ভুঁড়ি মোটা মোটরগাড়ি চড়নেওয়ালা বড় বড় বাবুর দল।'

রাধুর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ওদিকটায় স্বরূপের খাটালের কাছে, হেলাটায় ডুমুর ঝোপে, দু-তিনটি মানুষ দাঁড়িয়ে কি নিয়ে যেন গলা চড়িয়ে কথা বলছে, যেন ঝগড়া করছে তারা, কথা কাটাকাটি চলেছে তাদের মধ্যে।

রাধুর সঙ্গে সাইকেল ছিল। স্বরূপের বাড়ির কাছে গোকুলবাবুকে দেখে সে সাইকেল থেকে নেমে পড়ে। এতক্ষণ সাইকেলটা এক হাতে ধরে রেখে সে কথা বলছিল।

'কি ব্যাপার ওখানে?' গোকুলবাবু বিড়বিড় করে উঠলেন।

'আসুন একটু এগিয়ে যাই।' সাইকেলটা হাত দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে রাধু হাঁটতে লাগল। গোকুলবাবুও সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিলেন।

খাটালের সঙ্গে স্বরূপের হাঁস-মুরগির ঘর। তারের বেড়ি দিয়ে ঘেরাও করা ছোট ছোট অনেকগুলি ঘর। পিছনটায় ডুমুর ঝোপ। ঝিঁঝি ডাকছিল। জায়গাটাও অন্ধকার। হাঁসেরা সারাদিন ধরে কাছের পুকুরে ডোবায় ছিল। এখন ডোবায় ফিরে প্যাক্ প্যাক শব্দ করে জায়গাটা গরম করে তুলেছিল। মুরগির ঝাঁকও ঘরে ফিরে এসেছে। তবে তারা এত চেঁচামেচি করছিল না। তাদের ডাকবার চেঁচাবার একটা নির্দিষ্ট সময় থাকে।

গোকুলবাবু থমকে দাঁড়ালেন। রাধুও দাঁড়িয়ে পড়ল। গোকুলবাবু ভাবতে পারছিলেন না, অমূল্য এখানে কেন, স্বরূপের খাটালের একটি কর্মচারীর সঙ্গে সে কথা বলছে বললে ভুল হবে, বেশ যেন কথা কাটাকাটি করছে। আর একদল ওপাশে দাঁড়িয়ে। মনে হল স্বরূপের ছেলে টেলে কেউ হবে। অল্প বয়স। ধোপদুস্ত জামা কাপড় পরা।

'অমূল্য!' গোকুলবাবু পিছন থেকে ডাকলেন।

অমূল্য ঘাড় ফেরাল। গোকুলবাবু দেখলেন ছেলের হাতে একটা মুরগি ঝুলছে। বোঝা গেল মুরগি কিনতে অমূল্য স্বরূপের খাটালে চলে এসেছিল।

'কি হয়েছে?' গোকুলবাবু দু-পা এগিয়ে গেলেন। সাইকেলটা ধরে রেখে রাধু এক-জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে মানুষগুলিকে দেখছিল, কথা শুনছিল। 'কি হয়েছে?' গোকুলবাবু রীতিমত চেঁচিয়ে উঠে অমূল্যর মুখের দিকে তাকালেন। মুরগি নিয়ে একটা বেশ গোলমাল চলছে বুঝতে তাঁর অসুবিধা হল না।

'পাঁচ টাকা দাম ঠিক হল, খাঁচা থেকে মুরগিও বের করে দিল— এখন কিনা আবার বলছে ওই দামে মুরগি হবে না।' অমূল্য যে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে তার গলার স্বরই তা বলে দিল। যেন রেগে গিয়ে সে কাঁপছিল।

'কী মুস্কিল, কার সঙ্গে দাম ঠিক হয়েছিল শুনি?' যেন রেগে গিয়ে গোকুল-বাবু ছেলেকেই পাল্টা ধমক লাগালেন।

'এই তো এর সঙ্গে।' অমূল্য আঙুল দিয়ে খাটালের কর্মচারীকে দেখাল। 'এখন তার বাবু এসে বলছে, না হবে না। আরো দেড় টাকা দিতে হবে।'

শুনে গোকুলবাবু হঠাৎ কী বলবেন ঠিক করতে পারছিলেন না, স্বরূপের ছেলের দিকে চোখ দুটো স্থির করে ধরে রেখে চুপ করে রইলেন।

এবার রাধু এগিয়ে এল।

'কি রে মেঘনা, কী হয়েছে শুনি?'

মেঘনা মানে খাটালের কর্মচারীটি হঠাৎ গলার সুরটা নরম করে বলল, 'বাবুকে দুটো মুরগি খাঁচা থেকে বের করে দিলাম, বললাম পছন্দ করুন, বললাম একটার জন্য আপনাকে পাঁচ টাকা দিতে হবে, আর একটা সাইজে বড়, বললাম, যদি এটা নেন দেড় টাকা বেশি লাগবে।'

'মিথ্যা কথা, বাজে কথা,' অমূল্য আবার গলা চড়িয়ে দিল। 'এই, এইটার জন্য সে পাঁচ টাকা চাইছিল,' হাতের মুরগিটা সে রাধুকে তুলে দেখাল। 'আমি টাকা বের করছি, হুম হুম করে তার বাবু বেরিয়ে এসে বলে কিনা, উঁহু, পাঁচ টাকায় হবে না, এই মুরগি সাত টাকার কম বেচা হবে না, যাই হোক, আপনি পাড়ার লোক, যখন হাতে তুলে নিয়েছেন; আট আনা কম দেবেন।'

'আপনি মোটেই সত্য কথা বলছেন না অমূল্যবাবু।' এবার স্বরূপের ছেলে মুখ খুলল, 'এই মুরগির জন্য প্রথমেই আপনার কাছে সাড়ে ছটাকা চাওয়া হয়েছিল—'

'কি, আমি মিথ্যা কথা বলছি, মুখ সামলে কথা বলবে ধনুবাবু, তোমাদের দুটো পয়সা হয়েছে বলে লোকের সম্পর্কে যা-তা রিমার্ক করবে না, তোমার কর্মচারী এই মুরগি আমার হাতে তুলে দিয়ে পাঁচ টাকা দর চাইলে, এখন তুমি কিনা দিনকে রাত করতে চাইছ, এ্যাঁ, ভাবছ এ-ও দুধে জল মেশানর মতন একটা কিছু।'

'আপনি চুপ করুন।' এবার রাধু হাত তুলে অমূল্যকে ছোট করে একটা ধমক দিল, তারপর স্বরূপের ছেলের দিকে চোখ ফেরাল। 'কি হে ধনুবাবু, খুব পেট মোটা হয়েছে দেখছি, এইটুকুন একটা মুরগি— বলি, আমরা কি বাজারে টাজারে যাই না— আমরা কি মুরগির দাম-দর কিছুই জানি না। যদি ইনি পাঁচ টাকা বলে থাকেন, অনেক বলেছেন, এটার জন্য আর একটি পয়সা তোমাদের চাওয়া উচিত না।'

কথা শেষ করে রাধু পর পর দুবার গোঁফ চুমড়াল। অন্ধকার হয়ে গেলেও বোঝা গেল তার চোখ দুটো জবাফুলের মতন লাল হয়ে উঠেছে।

ধনু চুপ করে রইল।

ধনুর কর্মচারী মেঘনা রাধুর দিকে চোখ তুলে বলল, 'এটা আপনি অন্যায় বলছেন বাবু—'

'এই শালা, লাঠি মেরে তোর মাথার খুলি উড়িয়ে দেব—কদিন এখানে কাজ করছিস, কোথায় দেশ তোর।' রাধু এমন একটা হুঙ্কার ছাড়ল, গোকুল পর্যন্ত ভয় পেলেন।

আর সেই মুহূর্তে পাঁচ ব্যাটারির একটা প্রকান্ড টর্চ হাতে ঝুলিয়ে খাটালের ভিতর থেকে বেরিয়ে বিশালকায় একটি পুরুষ হেলতে দুলতে সেখানে এসে দাঁড়াল।

'কি হয়েছে ধনু,' প্রথমটা ছেলের দিকে তারপর গোকুলবাবুদের দলটার দিকে চোখ ফেরাতেই মানুষটা যেন একটু চমকে উঠল। যেন রাধুকে দেখেই বেশি চমকে উঠল। 'রাধুবাবু যে, নমস্কার নমস্কার নমস্কার।'

রাধু কটমট করে মানুষটাকে দেখছিল। শব্দ করছিল না।

'কি হয়েছে রাধুবাবু? মুরগি নিয়ে গোলমাল হয়েছে? এটা পছন্দ হচ্ছে না বুঝি বাবুদের?'

আড় চোখে অমূল্যর হাতের মুরগিটা একবার দেখে নিয়ে মোটা লোকটি আবার রাধুর চোখের দিকে তাকাল।

গোকুলবাবু অনেকটা অনুমান করলেন, স্বরূপ ঘোষ, এতকাল এ-পাড়ার কেউও কিন্তু তিন মানুষটাকে ঠিক চোখে দেখেনি, নাম শুনেছেন, এই পর্যন্ত।

'শোনো, স্বরূপদা,' কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে রাধু চড়া সুরে বলল, আমরা এপাড়ার মানুষ, গোকুলবাবু এপাড়ার পুরোনো বাসিন্দা। তাঁর ছেলে অমূল্য মুরগি কিনতে এসে তোমাদের কাছে অপমানিত হবে এটা কি একটা কথার কথা হল!'

ছি ছি ছি—না এমন হবে কেন।' বেন দাঁত দিয়ে জিভ কাটল স্বরূপ। 'কি হয়েছে ধনু, এই মেঘনা কি বলছিস বাবুদের।'

মেঘনা ও ধনু কথা বলছিল না।

রাধু সব খুলে বলল।

'হুঁ, তাই নাকি! এতখানি আস্পর্দা তোদের?' স্বরূপ ঘোষ এক পায়ের চটি খুলে নিয়ে ছেলের দিকে ছুটে গেল।

'আহা আহা, কি করছ ভাই, ছেলেমানুষ, না হয় একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছে—তা বলে, তা বলে—'

গোকুলবাবুর কথায় স্বরূপ আর ছেলেকে চটির বাড়ি মারল না ঠিকই, কিন্তু চটি হাতে রেখে শাসাতে লাগল, 'খবরদার, ফের যদি কোনোদিন পাড়ার লোকের সঙ্গে এমন ধারা ব্যাভার করছিস তো তোর গলা আমি আজগা করে দেব—এই মেঘনা, শুনছিস?' শালা তোমাকে আমি জুতিয়ে লম্বা করে দেব—ভদ্দরলোকের সঙ্গে ব্যাভার করতে না পারলে তো এখান থেকে চলে যা, দরকার নেই আমার এমন চাকরের। বলে কিনা ভদ্দরলোকদের সঙ্গে আমার চব্বিশ ঘন্টার কারবার—ছোটোলোকোমী করতে হয় অন্য ঘাটালে গিয়ে চাকরি নাও, স্বরূপ ঘোষের খাটালে এমন লোকের ঠাঁই নেই।' রাধুবাবু! আমাকে ক্ষমা করুন ভাই, কোনোদিন আর এমনটি হবে না—আপনাদের যখনই হাঁস-মুরগির দরকার হবে আমাকে বলবেন, আমি পালের সেরা পাখিটি আপনাদের হাতে তুলে দেব। আমাকে ক্ষমা করবেন বুড়োকর্তা—স্বরূপ ঘোষ হাত জোড় করে রাধু ও গোকুলবাবুর দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

'ঠিক আছে, ছোটছেলেরা—ওরা আর তেমন কি বোঝে—' স্বরূপের দিকে চোখ তুলে গোকুলবাবু অল্প হেসে ঘাড়টা কাত করলেন। 'আচ্ছা ভাই, চলি—'

সাইকেলটা ঘুরিয়ে নিয়ে রাধু আগেই হাঁটতে আরম্ভ করে দিয়েছে। গোকুলবাবু এসে রাধুর সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলেন। অমূল্য মুরগি নিয়ে দুজনের পিছনে হাঁটছিল।

স্বরূপ ঘোষের বাড়ির চৌহদ্দী পার হয়ে রাধুর সঙ্গে গোকুলবাবু বড় রাস্তায় উঠে এলেন।

'ঐ তোমাকে দেখেই স্বরূপ ঘোষ ভিজে বেড়ালটি হয়ে গেল রাধুভাই।' গোকুলবাবু শব্দ করে হাসলেন, 'তা না হলে অমূল্যর কাছ থেকে ওরা ঠিক দেড় টাকা আদায় করে ছাড়ত।'

রাধু গম্ভীর হয়ে হাসছিল।

'বোঝনি অমূল্য।' গোকুলবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে ছেলের দিকে তাকালেন। 'রাধু ছেলেটা চাকরটা তোকে আজ আরো অপমান করত, নাকাল করে ছাড়ত।'

অমূল্য কথা বলছিল না।

'ভুই রাধুকে চিনিস?'

'হুঁ, আমরা তো একসঙ্গেই স্কুলে পড়েছি ছেলেবেলায়।' পিছন থেকে অমূল্য উত্তর করল।

'আচ্ছা!' অবাক হবার মতন গলার সুর করলেন গোকুলবাবু। 'তাই নাকি রাধু, তুমি অমূল্যর সঙ্গে স্কুলে পড়েছিলে!'

রাধু অল্প হাসল।

'ঐ প্রাইমারী ক্লাস, তারপর তো আর আমার লেখাপড়া হয় নি—ছেড়েছুড়ে দিয়ে গুণ্ডামী গুণ্ডামীতে লেগে গেলাম।'

'বেশ করেছ, খুব ভাল করেছ—' গোকুলবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। 'তোমার মতন গুণ্ডাই এখন দেশে দরকার—কি হবে হাইস্কুল কতগুলো পাঠ্যবই মুখস্ত করে—কেরল কেরাণী তৈরী হচ্ছে। অমূল্য তো দু দুটো পাশ দিয়েছে—কী হল তাতে। একটা লজঝড় অফিসে দশটা পাঁচটা টাইপ করে মরছে। না, আমি তোমাকে গুণ্ডা বলি না, তুমিই দেশের আদর্শ ছেলে রাধু, তোমার মতন ছেলেই এখন বাংলা দেশে চাইছে, দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন তোমাদের মতন ছেলেদের দ্বারাই সম্ভব। লেখাপড়া জানা ছেলেরা কিছুই করতে পারছে না। চতুর্দিকে দুর্নীতি, চুরি, চোরাকারবার ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে না, বে! যদি দেশটাকে ঢেলে সাজাতে হয়, যদি এই বাংলাকে আবার বাংলার মতন করে গড়তে হয় তো তোমাদের মতন ছেলে ঘরে ঘরে তৈরী হওয়া দরকার। রাবেশ্বরের মামাতো ভাই বল আর স্বরূপ ঘোষ বল, তোমরাই ওদের শায়েস্তা করতে পারবে, অমূল্যর মতন ছেলেরা পারবে না।'

মোড়ে এসে রাধু বলল, 'আচ্ছা চলি বুড়োকর্তা—আমাকে একটু উল্টাডাঙ্গার দিকে যেতে হবে।'

গোকুলবাবু ঘাড় কাত করলেন।

'আচ্ছা আচ্ছা, আবার দেখা হবে, সত্যি আজ তুমি অমূল্যকে ভয়ানক একটা অপমানের হাত থেকে বাঁচালে। আজ তাকে ওরা নাকাল করে ছাড়ত। একদিন এসো আমার বাড়ি, তুমে যে অমূল্যর সহপাঠী আমি কিন্তু জানতাম না। একদিন এসো গল্পসল্প করা যাবে।'

'চলি অমূল্য।' রাধু সাইকেলে চাপল।

'দেখা হবে।' অমূল্য সংক্ষেপে উত্তর করল। টুং টাং বেল বাজিয়ে রাধু ভি আই পি রোড ধরে উল্টাডাঙ্গার দিকে চলে গেল।

'খুব ক্ষমতা রাখে, শক্তিও রাখে গায়ে।' গোকুলবাবু বিড়বিড় করে উঠলেন।

'ও, আবার তোমার সঙ্গে জুটল কখন!'

'জুটল কখন মানে?' অমূল্যর কথার ধরনটা গোকুলবাবুর ভাল লাগল না। যেন তুচ্ছার্থে অমূল্য 'ও' শব্দটা প্রয়োগ করল।

'আমার সঙ্গে দুদিন আগেই আলাপ পরিচয় হয়েছে। এখন বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, রাস্তায় দেখা হল।'

অমূল্য আর কিছু বলল না।

গোকুলবাবু বললেন, 'আমি কি আর জানতাম, তোর সঙ্গে রাধু স্কুলে পড়ত। আমি জানতাম না।'

'এমন কত ছেলেই তো নিচু ক্লাসে আমার সঙ্গে পড়ত। কতজন ফেল করল, অনেকে এমনিতেই পড়া ছেড়ে দিল—কিছু কিছু ছেলেকে তো এখন আর চিনতেই পারব না।'

'খুব ভাল ছেলে রাধু—লেখাপড়া কি সকলের হয়—নানা কারণে নানা অবস্থার চাপে পড়ে অনেকের অল্প বয়সেই ওই জিনিস বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সেটা কথা নয়। দেখতে হবে, মানুষটা কেমন—অন্তরটা কেমন—রাধুর সঙ্গে আমি কথা বলে দেখেছি, দু একটা ব্যাপারে তার মনের পরিচয় পেয়েছি। ভেতরটা একেবারে খাঁটি সোনা। তেমনি আগুনও রাধুর ভেতরে। খুব তেজী ছেলে। কোনোরকম অন্যায় অসভ্যতা সহ্য করে না।'

একটু চুপ থেকে গোকুলবাবু আবার বললেন, 'হুঁ, গুণ্ডা, চলতি কথার গুণ্ডা শব্দের একটা মানেই আমরা বুঝি—আমরা আমাদের আমলে হিটলারকেও লোকে গুণ্ডা বলত। কিন্তু বলতটা কে—জার্মেনীকে যারা শত্রুর মতন দেখত, হিটলারের দেশের লোকে কিন্তু তাঁকে পুজোই করত। কাজেই রাধু যে কী ধরণের গুণ্ডা সেই খবর অনেকেই রাখে না।'

'তুমি কি আর একটু বেড়াবে?' বাড়ির দরজায় এসে অমূল্য বাবার দিকে ঘাড় ফেরাল। কেননা গোকুলবাবু বাড়িতে ঢোকার কোনো লক্ষণ দেখালেন না।

'হুঁ, আমি আর একটু হাঁটির—এখনই পায়রার খোপের ভেতর ঢুকে পড়তে ইচ্ছে করছে না।'

আর একটাও কথা না বলে বাঁ হাতের মুরগি ডান হাতে চালান দিয়ে অমূল্য বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ল।

গোকুলবাবু ফ্যালফ্যাল করে একটু সময় সেদিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে আবার হাঁটতে আরম্ভ করলেন।

এ খোপের ভেতর তোমার মধু আছে। তুমি সেখানে ঢুকে পড়। আমার কোনো মধু নেই যে আমাকে এখনই সেখানে

ঢুকতে হবে। তার চেয়ে রাস্তায় খোলা বাতাস গায়ে লাগালে আমার অনেক বেশি আরাম দেবে।

ভাবছিলেন আর অবাক হচ্ছিলেন গোকুলবাবু, রাতদিন তো বৌ-টা কানমলা দিচ্ছে, যা-ইচ্ছে-তা গালিগালাজ করছে, তবু ওই বৌয়ের গায়ের গন্ধ না শুঁকতে পারলে যেন অমূল্যর মাথা খারাপ হয়ে যায়। শনিবারের অফিস সেরে হ্যারিসন রোডের বাড়তি কাজ শেষ করে ছোঁড়া আজ একটু সকাল সকাল বাড়ি ফিরল। অর্থাৎ মধু টানছে। তা টানুক।

নিজের মনে একটু রসিকতাই করলেন গোকুল। তারপর মুরগির কথাটা চিন্তা করলেন।

হঠাৎ আজ একটা মুরগি কেন!

নিশ্চয় বৌ পরামর্শ দিয়েছে। বৌ পরামর্শ না দিলে অমূল্য কখনই পাঁচ টাকা খরচ করে মুরগি নিয়ে বাড়ি ঢুকতে সাহস পেত না।

হুঁ, অমূল্যর স্ত্রী জিভখানা মাঝে মাঝে দশ হাত লম্বা হয়ে পড়ে। গোকুলবাবু তার পরিচয় অনেক আগেই পেয়েছেন। গেল বার পুজোর সময় কী করেছিল অমূল্য। সাত টাকা খরচ করে বৌকে এনে ইলিশমাছ খাইয়েছিল। কিন্তু তার ফলে কী হল। একটানা পনেরো দিন পুঁই আর কুমড়ো খেতে হয়েছে। এক ফোঁটা মাছ আসে নি বাড়িতে।

একেই বলে অপরিণামদর্শিতা, অবিমৃষ্যকারিতা।

আজ পাঁচ টাকার মুরগি এসেছে। তার মানে আবার পনেরো দিন নিরামিষ চলবে। এভাবে একদিন বকসের মতন খেয়ে কী লাভ হয় গোকুলবাবুর মাথায় আসে না।

এই টাকায় চার দিন পাঁচ দিন মাছ খাওয়া চলত। রুই কাতলার কথা হচ্ছে না। পুঁটি-টেংরা খাওয়া যেত।

যা দিন পুঁটি টেংরা এখন রুই-কাতলার দরে বিকোচ্ছে।

ঐ বড়লোক, বড়লোকেরাই দেশের সর্বনাশ করছে। কালো টাকা দিয়ে দশ টাকা কেজির মাছ কিনে খাচ্ছে—গুলী কর, গুলী করে সব শেষ করে দাও রাধু, বোমা মেরে এদের ভূঁড়ি ফাটিয়ে দাও।

রাগে দুঃখে ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতগুলি জোরে জোরে ঘষতে থাকেন গোকুলবাবু।

নধর মুরগি দেখে রেখার চোখ বড় হয়ে উঠল। আনন্দে আত্মহারা হয়ে অমূল্যর বড় মেয়ে ও ছেলেটা মুরগির ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পায়ে দড়ি বেঁধে অমূল্য মুরগিটাকে বারান্দার এক কোনায় রেখে দিল।

'কাল সকালে বাসু এসে পড়লে আর সময় পাব না। ওর সঙ্গে আমি কথা বলব, না কি মুরগি কিনতে বেরোব।'

'বেশ করেছ, আজই কিনে এনে ভাল করেছ। কত দাম নিলে?'

'পাঁচ টাকা।'

'পাঁ—চ টা-কা।' রেখার চোখ কপালে উঠে গেল।

অমূল্য মৃদু হাসল।

'পাঁচ টাকা কিছুই না। হয়তো এই পাঁচ টাকা খরচ করে আমাদের পাঁচ লাখ টাকা আয়ের একটা পথ খুলে যাবে।'

'তা বটে!' বেখা গম্ভীর হয়ে মাথা কাঁকাল। 'এখন ঈশ্বরকে ডাক, যদি সকাল সকাল বাসুবাবু তোমাকে নিয়ে বিজনেসটা আরম্ভ করে দেন।'

'তা দেবে, ওর কথার কাজে নড়চড় হয় না। আমি রাজী হলেই বাসু ব্যবসা স্টার্ট করবে।'

'কখন উনি আসবেন?'

রেখা কি রকম অস্থির হয়ে উঠল। অমূল্যর মনের গভীরে বিস্ময় কৌতূহল এক সঙ্গে খেলা করছিল।

'কাল সকালে আটটার মধ্যে বাসু এসে যাবে। আজ ফোন করে আমি বলে দিলাম।'

'তবে তো চায়ের ব্যবস্থা করতে হবে।' রেখার চোখ গোল হয়ে উঠল।

'হুঁ, চা দিতে হবে বৈকি—সেই কোন্ বেলায় তোমার মুরগি-টুরগি রান্না হবে—হয়তো এর মাঝে দু-বার সে চা খাবে।'

'আচ্ছা, চা-টা তো বড় কথা না—দু কাপ চা করে দিতে আর কি। বলছি সকালে চায়ের সঙ্গে কিছু খেতে টেতে দিতে হবে তো—?'

'পরোটা। ভেজে দেবে?'

'ধেৎ, এমন বড় লোকের ছেলেকে দালদার পরোটা খেতে দেওয়া যায় নাকি।'

'তবে সিঙ্গাড়া আনিয়ে দিতে হবে।'

'হুঁ, সিঙ্গাড়া সন্দেশ দুটোই দিতে হবে।'

'তার মানে আরো একটা টাকা বেরিয়ে যাবে।'

'যাবেই তো। এক টাকায় কুলোবে না—এক সঙ্গে তুমি বসে চা খাবে। তোমাকেও একটা ডিশ সাজিয়ে দিতে হবে।'

অমূল্য মুখ কালো করে মাথা কাঁকাল।

'দোকানের ওসব খাবার টাবার বাড়িতে আনলে মিঠুকে সোনাকে এক-আধটু না দিয়েই বা তুমি থাকতে পারছ কেমন করে।'

'তা পারা যায় নাকি।' রেখা ফিক করে হাসল। এমন হালকা করে তাকে হাসতে অমূল্য কতদিন দেখে নি। 'ঐ দুটো টাকা জল খাবার বাবদ তোমাকে ধরে রাখতে হচ্ছে।' একটু থেমে আবার সে বলল, 'অভাবের সংসার—তা না হলে এসব কি একটা খরচ।'

'তা-ও বটে।' এবার অমূল্য হালকা করে হাসল। 'থাক এসব নিয়ে এখন আর মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই—যদি ব্যবসাটা স্টার্ট দেওয়া যায় আর শ্রীগণেশের কৃপায় একটু ভালর দিকে যায় তবে আর ভাবনার কিছু নেই।'

'আমিও তাই বলি। মনে ফূর্তি নিয়ে কাজে নেমে যাও। ঈশ্বর কি আর চিরদিন মানুষকে দুঃখে রেখে। এক সময় মুখ তুলে তাকায়।'

কিন্তু অমূল্য কি সত্যি ব্যবসার কথা ভাবছিল। বাসুর একটা কথার কথা বলে ছিল। আলুপ জমাবার জন্য সবাই এমন একটা দুটো জরুরী কথা দিয়ে গল্প আরও করে। ভাবতেও অমূল্যর হাসি পায়। আনাজের ব্যবসা করবে সে। বৈঠকখানা বাজারের ঝিঙ্গে বেগুন কপি কুমড়োর বেপারী হবে সে। যাই হোক, কথাটা জায়গা বিশেষে কাজ দিয়েছে। ঝিঙ্গে বেগুন কপি কুমড়োর কথা শুনলে রেখার মনের অবস্থা কেমন হত বলা মুশকিল, তার গালভরা 'বিজনেস' শব্দটা শুনে শ্রীমতীর মাথা ঘুরে গেছে।

এই মাথা ঘোরার পিছনে বিজনেস ছাড়াও অন্য কিছু আছে কিনা সেখানেই অমূল্যর কৌতূহল। কাল সকালে বাসুদেব বাড়িতে ঢুকলে রেখা দেবীর চেহারাটা কেমন হবে নতুন করে তার দেখার লোভ হচ্ছিল। সেই সঙ্গে বাসুদেবই বা কেমন চেহারা করে সকাল আটটায় অমূল্যর ঘরে এসে ঢোকে।

হুঁ, যে ঘরে বসে বাসু একদিন বন্ধুপত্নীর মধুর ভাষার গালিগালাজ শুনে সেই সুন্দর মুখখানা দেখতে যার বুক ছটফট করছিল। 'গ্যালারির' দোতলার ওঠার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মুখ থেকে কথাটা শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে তো পড়ল! বুকের মধ্যে কোনো মূল্যবান কথা পুষে রাখলে একসময় সেটা বেরিয়ে পড়বেই।

কাজেই খুব একটা মজার জিনিস দেখতে অমূল্যর এত লোভ। তাই বাসুকে ফোন করে ডেকে নেমন্তন্ন খাওয়ার ব্যবস্থা। আর এদিকে ঘরের গিন্নীকে দিয়ে মুরগির রোস্ট পাকাবার তোড়জোড়।

এই জন্য অফিস থেকে বেরিয়ে হ্যারিসন রোড উকিলের বাড়ি নম-নম করে দুখানা চিঠি টাইপ করে দিয়ে সে সোজা ছুটে এসেছিল স্বরূপ ঘোষের খাটালে।

পাঁচ টাকায় বেশ ভাল মুরগি পাওয়া গেল। অবশ্য এই ব্যাপারে রাধুই তাকে সাহায্য করেছে। যেন ঈশ্বরই রাধুকে ঠিক সময় জুটিয়ে দিল। এখানে অমূল্যই একটু চালাকি খেলেছিল। স্বরূপের চাকরটা প্রথম থেকেই মুরগিটার জন্য সাত টাকা চেয়েছিল।

একটু চেঁচামেচি করে কাজই হয়েছে। রাধু যেমন চোখ লাল করে বেটাদের শাসাতে আরম্ভ করেছিল।

অমূল্য যদি চালাকি করে কথা কাটা-

ভাটি না করত, চুপ করে থাকত, তবে রেখা কি আর সেখানে ছুটে যেত?

যেত না।

বুদ্ধি করে একটু চেঁচামেচি করে কাজ হয়েছে। অমূল্যর দুটো টাকা বেঁচে গেল। দুটাকা না বাঁচুক, দেড়-টাকা, তো বটেই। স্বরূপ ঘোষের ছেলে শেষটায় আট আনা ছেড়ে দিতে চেয়েছিল।

নিজের বুদ্ধির ওপর অমূল্যর চিরদিনই শ্রদ্ধা আছে। চুপ করে থাকে বটে। বছরের পর বছর একটা লজঝড় অফিসে মাথা গুঁজে সে টাইপ করে যাচ্ছে এও সত্য।

কিন্তু সুযোগ উপস্থিত হলে বুদ্ধি খাটাতে সে ইতস্তত করে না। ভবিষ্যতেও করবে না।

বিছানায় শুয়ে মুরগি কেনার ব্যাপারটি চিন্তা করে তার বেদম হাসি পাচ্ছিল। রেখাকে সে আর এত কথা বলল না।

লকেটটা সুন্দর। এত বড় সাইজ। গার্ডার সেট করা। ভিতরের কারুকার্যও দেখবার মতন। পাঁচ-ছশ টাকার কম হবে না নেকলেসটার দাম। অমূল্য তাই অনুমান করছিল।

তবে বাসুদেবকে সে এই নিয়ে কোনোরকম প্রশ্ন করে নি।

বরং চা খেতে খেতে দুবার সে বন্ধুকে গলাসল করার মতন সুর করে বলেছে, কোন মানে হয় না এত টাকা খরচ করে রেখাকে হুঠ করে একটা নেকলেস প্রেজেন্ট করার।

চায়ের কাপ থেকে মুখ তুলে বাসুদেব দুবারই উত্তর করেছে, 'তোর বৌকে কি আজ কোনদিন কিছু দিয়েছি। অথচ বন্ধুপত্নী হিসাবে ওঁকে একটা উপহার দেওয়া আমার অনেকদিন আগেই উচিত ছিল।'

'তা বলে এত টাকা খরচ করে—'

'আমি পারছি বলেই খরচ করছি, টাকা আছে বলেই এমন একটা জিনিস তোর বৌকে প্রেজেন্ট করতে পারলাম। তোর মতন যদি ছা-পোষা কেরানী হতাম তা হলে অবশ্য একটা কথা ছিল, তখন তুই আমাকে খুব গালমন্দ করতে পারতিস।'

অমূল্য হাসল। এর পরে আর কথা চলে না। সত্যি তো বন্ধুর টাকা আছে। অনেক টাকা। এই নিয়ে সে অহঙ্কার করতে পারে।

অবশ্য সরাসরি বাসুর মুখ থেকে এমন একটা দাম্ভিক উক্তি শুনে পিঁপড়ের কামড়ের মতন একটা জ্বালা যে সে অনুভব না করল তাও নয়। তা হলেও অমূল্যর মনে আহ্লাদের ঝড় বইছিল। এত টাকা দামের উপহারটা দেওয়া হয়েছে তার বৌকেই—আর কাউকে না।

প্রশ্নটা সেখানেই শেষ করে দিল অমূল্য। বাসুর সঙ্গে অন্য গল্প আরও করল।

দুই বন্ধু গল্প করছিল, আর ওদিকে মুখ লাল করে রেখা উনুনের ধারে বসে রান্না নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মাংসভাত একটা কথা। তা বলে কি মাংসের সঙ্গে অন্য কিছু খেতে দিতে নেই। কাজেই ঝাল-ঝোল ভাজা ডাল সবই তাকে রাঁধতে হচ্ছিল। একটা হাত। সকাল থেকে হাত চালিয়ে না করলে সব রেঁধে-বেড়ে শেষ করতে কত বেলা হত কে জানে।

অবশ্য ইতিমধ্যে দুবার বাথরুমে গিয়ে ছোট আয়নাটার ওখানে দাঁড়িয়ে গলার লকেটটা সে দেখে এসেছে। ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে। রাণীর মতন লাগছিল। তবুও তো এমন একটা স্যাঁৎসেঁতে জীর্ণ বাথরুম, কালি ঝুলে ভরতি রান্নাঘর, পাররার খোপের মতন মান্ধাতার আমলের এইটুকুন একটা অন্ধকার বাড়ি। যদি পরিবেশটা সুন্দর হত, নতুন ফ্ল্যাট বাড়ির মতন সাজানো-গোছানো ঝকঝকে একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকত তারা, এমন নেকলেস গলায় পরে সে-সব বাড়িতেই মানায়।

যাই হোক, এই নিয়ে এখন মন খারাপ করে কিছু লাভ নেই। ঈশ্বর যদি মুখ তুলে তাকায়, যদি দিন ফেরে—যদি অমূল্যর সঙ্গে বাসুবাবুর কথাবার্তা পাকাপাকি হয়ে যায়। অনেকক্ষণ তো দুজনে কথা বলছে।

খুব ইচ্ছে করছিল তার একটু দাঁড়িয়ে থেকে শোনে। কিন্তু ওদিকে গেলে এদিকে রান্না পড়ে থাকে।

অবশ্য সবই শুনবে সে। অমূল্য তাকে বলবে।

সাধারণ ব্যাপারেই বুদ্ধি-পরামর্শ নিতে অমূল্য পাঁচবার তাকে পাঁচটা কথা জিজ্ঞেস করে, আর এ-তো একটা বড় জিনিস।

বন্ধুর স্ত্রীর জন্য বন্ধু যেমন উপহার এনেছে তেমনি অমূল্যর ছেলে-মেয়েদের জন্যও সে প্যাকেট ভরতি করে রঙ-বেরঙের টফি এনেছে।

মিঠু, সোনার আজ আনন্দের শেষ নেই। সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে নেচে নেচে তারা টফি খাচ্ছিল। আজ তার মাকে একটুও বিরক্ত করছিল না। বরং ফাঁক পেলেই দোলনার কাছে ছুটে গিয়ে বাচ্চা বোনটাকে আদর করছিল। যেন বাচ্চাটাও বুঝতে পেরেছিল, আজ বাড়িতে আনন্দ-উৎসব চলেছে, আজ কাঁদতে নেই—সেই সকাল থেকে একবারও কাঁদছিল না।

এই জন্য রেখা আরো মন দিয়ে নিষ্ঠা নিয়ে ভাজা-ভুজি ঝাল-ঝোল রেঁধে শেষ করে সকলের শেষে মুরগির রোস্টটা পাক করতে বসল। দুপুরের মুখে, বিশেষ করে স্বামীর বন্ধুদের মুখে রান্নার সুখ্যাতি শুনতে সব গিন্নীরই লোভ জাগে।

তা ছাড়া এমন একটা উপহার যে দিল, তাকে খাইয়ে তুষ্ট করতে না পারলে মন আপনা থেকে ভীষণ খুঁত-খুঁত করবে।

অমূল্য যা অনুমান করেছিল, আনাজ-তরকারী কাঠ-লোহা সিমেন্ট—কোনো কিছুর ব্যবসা নিয়েই বাসু কথা বলল না। ব্যবসা-বাণিজ্যের মন নিয়ে তো সে এ-বাড়ি আসেনি। এসেছিল রেখাকে দেখবে, রেখার গলায় দামী নেকলেস পরিয়ে দিয়ে তার মন জয় করতে।

জয় করেছে ঠিকই। রেখা সেই সকাল থেকে হাসছে। নিজের হাতে চা-খাবার দিয়ে গেছে। গলাগাল করা দুবে থাক, স্বামীর মদ্যপ বন্ধুকে দেখে একটু ভ্রূকুটি পর্যন্ত আজ করল না।

এটাও সত্য রেখা তার হাসি-হাসি সুন্দর মুখখানি দুবার এ-ঘরে দেখিয়ে বাসুদেবের মন জয় করেছে। অমূল্যর বিছানার ওপর হাত পা ছড়িয়ে বসে গল্পে-গল্পে বাসু একেবারে জমে গেল। এত প্রথমুলে তাকে কথা বলতে হাসতে অমূল্য যেন আগে কোনোদিন দেখে নি।

মাঝে-মধ্যে দুবার-একবার অমূল্যর সন্দেহ হয়েছে, এটা কি তার চোখের ভুল কানের ভুল। কেবল কি ভদ্রতা করে বাসু এত জমিয়ে তার সঙ্গে কথা বলছিল, প্রাণ-খোলা হাসি হাসছিল। তা বাসুর ব্যাপারে যদি তার ভুল হয়ে থাকে, রেখাকে তো সে ভুল দেখল না, ভুল শুনল না। আজ সাত বছর যাকে সে চোখের ওপর দেখছে, যার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দটাও তার মুখস্ত হয়ে গেছে।

হুঁ, রেখার মুখে হাসি ধরছিল না, এ-ঘরের পাশ দিয়ে রেখা দুবার-একবার বাথরুমে যাচ্ছে। গুনগুনিয়ে সে গান করছিল। কতটা খুশি হবে, মেজাজ কত-খানি প্রসন্ন থাকলে তার ঘরের গিন্নী এমন গুনগুনিয়ে গান করে, পৃথিবীতে আর কেউ না জানুক, অমূল্য জানে, অমূল্যর চেয়ে রেখাকে এই জগতে কে বেশি বুঝেছে।

অমূল্য তো শুনেছেই, বাসুদেবও বেশ কান গুনগুন গান শুনেছে। সেই মুহূর্তে বাসু কথা বন্ধ করে সিগারেট ধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

অর্থাৎ রেখার গলার গুনগুনানি গান শুধু শুনতেই যে সে তাড়াতাড়ি সিগারেট ধরাবার ভান করে কানটা ওদিকে পেতে রেখেছিল অমূল্য পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে।

না, অমূল্য মন খারাপ করে নি। যদি মন খারাপ করত তো সেদিন গ্যালাক্সির সিঁড়িতেই সে মন খারাপ করতে পারত।

মন তো খারাপ করেই নি, বরং মনে সে স্ফূর্তি রেখেছে। স্ফূর্তি নিয়ে বন্ধুকে বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে ডেকে এনেছে, স্ফূর্তি নিয়ে কাল বিকেলে স্বরূপের খাটাল থেকে মুরগি কিনে এনেছে।

'ভাল কথা; তুই রাধুকে চিনিস?' তাদের নারকেলডাঙ্গার পুরোনো দিনের কথা উঠেছিল, এতক্ষণ তাদের ছেলেবেলার গল্পই করছিল দুজনে।

স্বাদু কে?' অমূল্যর চোখে চোখ
। বাসুদেব ভুরু কুঁচকোল।
'রাধু গুন্ডা। এই মোটা গোঁফ।'
ল্য শব্দ করে হাসল।
'ওরে বাপ্।' যেন এবার মানুষটাকে
তে পেরে বাসু সিউরে ওঠার মতন একটা
ভঙ্গি করল। 'নমস্য ব্যক্তি।'
'ও কিন্তু ফেলেকেলায় আমাদের সঙ্গে
স পড়ত।' অমূল্য তখনও হাসছিল।
বাসু মাথা নাড়ল।
'আ আমার মনে নেই। তবে খুব
াতিক আদমী।'
'মানে খুব বড়দরের গুন্ডা হয়ে গেছে
আজকাল?' অমূল্য আর হাসল না।
বড়দরের গুন্ডা তো বটেই। দুই
ন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে আমার
শানা আছে। কলকাতার পুলিশ
ক ডেঞ্জারাস ম্যান আখ্যা দিয়েছে।'
অমূল্যর চোখ গোল হয়ে উঠল।
'তবে তো সাংঘাতিক আদমী।' এমনি
তু বোঝা যায় না। শুনি দরকার হলে
ুষের উপকারও নাকি করে।'
'তা আমি জানি না; আমি তো
নকদিন নারকেলডাঙা ছেড়ে চলে গেছি।
তু রাধুর কথা প্রায়ই বেলেঘাটা গেলেই
ন। আমার ফ্রেন্ড সেই পুলিশ অফি-
টি বলছিল, গেলবার জুলাই মাসে
রা স্ট্রীটের ওপর দিনদুপুরে যে বড়
টস ডাকাতিটা হয়ে গেল তাতে নাকি
ু জড়িত ছিল, হাতে-নাতে তেমন কোনো
াণ পাচ্ছে না বলে পুলিশ কিছু করতে
ছে না। তার আগের বছর গ্যাস
টের একটি বাড়িতে ডাকাতি হয়।
নও পুলিশ রাধুকেই সন্দেহ করেছিল।
ারই তো লালবাজার ধরে নিয়ে গিয়ে
ক আটকে রাখা হয়েছিল। তারপর
ণের অভাবে ছেড়ে দিতে হয়েছে।'
'বাহাদুর বটে।' অমূল্য চোখ
কাল। 'একটার পর একটা কাজগুলো
য় যাচ্ছে, অথচ পুলিশ কিছুই করতে
ছে না।'
'করতে পারছে না, কিন্তু পুলিশ
া তাকে চোখে চোখে রাখছে!'
'ওর সাঙ্গপাঙ্গ আছে নিশ্চয়ই?'
'তবে কি একলা এত বড় এক-একটা
ু করতে পারে। কলকাতায় কলকাতার
রে—নানা জায়গায় ওদের ঘাঁটি নানা
রগায় ওদের লোকজন ছড়িয়ে আছে।'
অমূল্য এবার আরো শব্দ করে হাসল।
'তোর সেই পুলিশ বন্ধুটির কল্যাণে
নক কিছু খবর তুই পাস?'
'উপর কি!' বাসুও হাসল। 'রাত-
ন শহরে যেমন ছিনতাই ডাকাতি হচ্ছে—
দিকের খবর-টবর একটু জেনে রাখতে
। বৈকি। আমাদেরও তো রাত-দিন
া-পয়সা নিয়ে কারবার। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা
তে হচ্ছে—ব্যাঙ্কে টাকা পাঠাতে হচ্ছে,
মহাজনদের আড়তে টাকা পৌঁছে দিতে
হচ্ছে।'
'তা-ও বটে। কত বড় কাঠের বিজনেস
তোদের।'
'রাধুর সঙ্গে তোর কবে দেখা হল।'
'কাল।' স্বরূপ ঘোষের খাটালে
মুরগি কিনতে গিয়ে রাধুর সঙ্গে তার
দেখা হয়েছিল, রাধু তাকে সাত টাকার
মুরগি পাঁচ টাকায় কিনিয়ে দিয়েছিল—
বাসুর কাছে অমূল্য আর সে-সব কিছু
বলল না।
বাসু বলল, 'তা হলে বোধ হয় খুব
হালে রাধু কলকাতা এসেছে। আমার সেই
পুলিশ অফিসার বন্ধুটি সেদিনও বলছিল,
রাধু কলকাতায় নেই।'
'তোর ঘড়িতে ক'টা বাজে?' অমূল্য
হঠাৎ সময়-সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন।
বাসু হাতের ঘড়ি দেখল।
'বারোটা।'
'অনেক বেলা হল, দেখি রান্নার
কদ্দুর।' বেশির রান্নার খোঁজ করতে
অমূল্য ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জিনিসটা গোকুলবাবুর ভাল লাগে নি।
বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে তিনি চিন্তা
করছিলেন। দামী নেকলেস সন্দেহ নেই।
দুপুরে রেখা নিজেই একবার শ্বশুরমশায়কে
গয়নাটা দেখিয়ে গিয়েছে। গোকুলবাবু
তখন নিজের ঘরে বসে সিদ্ধান্ত পঞ্জিকাটা
নাড়াচাড়া করছিলেন। খবর কাগজের অভাবে
অবসর সময় তিনি পঞ্জিকাটা নেড়েচেড়ে
দেখেন।
না, তার সেটা খারাপ লেগেছে।
'অমূল্যর বাল্যবন্ধু এই বাসু।'
নতুন মানুষ না। এ বাড়িতে সে
অনেক এসেছে। বেলেঘাটা চলে যাবার পর
আর যেন আসে নি।
যাই-হোক, বেঁচে থাকলে এবং নিজেদের
মধ্যে তেমন কোনো কলহাবাটি সৃষ্টি হয়ে
বন্ধুত্ব নষ্ট না হলে বন্ধু বন্ধুর কাছে
আসবেই।
তাই আবার এসেছে বাসু।
কিন্তু বন্ধুপত্নীকে সোনার অলঙ্কার
উপহার দেওয়া কেন।
তিনি শুনেছেন, বাসুর কাঠের কারবার
এদিকে খুবই ফুলে-ফেঁপে উঠেছে,
জমজমাট অবস্থা এখন তার। বাবা যা
করেছিল, কারবারটা বাড়িয়ে তার ডবলেরও
বেশি নাকি করে ফেলেছে ছেলে। বোঝা
যায় প্রখর ব্যবসাবুদ্ধি।
এই ক্ষমতা উত্তরাধিকারীসূত্রে পাওয়া।
এই নিয়ে ঈর্ষা হিংসা চলে না।
তবে গোকুলবাবু কারবার-টারবার
জাতীয় জিনিসগুলি কোনোদিনই খুব একটা
পছন্দ করেন না। ব্যবসা করতে গেলেই
তোমাকে চুরি করতে হবে। ভেজাল দিতে
হবে। মানুষকে ঠকাবার দিকে একটা ঝোঁক
এসে যায়। তা মিষ্টির কারবার হোক কি
কাঠ, কাপড়, কয়লার কারবার হোক।
যাক গে, গোকুলবাবুর বাবা-দাদার
কেউ কারবারের লাইনে ছিল না—তিনি তো
না-ই, তার ছেলেও এসবে নেই। কিন্তু
কথা হচ্ছে, হুট করে বন্ধুপত্নীকে ছ'শ
টাকার গয়না উপহার দেওয়া কেন।
গোকুলবাবু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন,
এর মধ্যে একটা অহঙ্কার একটা দাম্ভিকতার
ভাব লুকিয়ে আছে। অর্থাৎ রামশরণের
ছেলে এ বাড়ির মানুষগুলিকে বোঝাতে
চাইছে, দ্যাখ, আগেও তো আমি তোমাদের
বাড়ি এসেছি, সেদিনের আসা আর আজকের
আসার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। আমি
একটি টিম্বার ওয়ার্কস-এর মালিক, আমার
এখন অনেক পয়সা। আগে হেঁটে তোমাদের
বাড়ি চলে এসেছি। আজ নিজের গাড়ি
নিয়ে এসেছি। তা বলে শুধু হাতে বন্ধুর
স্ত্রীর হাতের রান্না মুরগির মাংস খেতে
আসি নি। তার মনোহরণের জন্য দামী
নেকলেস উপহার এনেছি।
খুবই খারাপ লাগছিল এটা গোকুল-
বাবুর কাছে, এই উপহার দেওয়াটা। অর্থের
ক্ষমতার প্রতিপত্তির ঢাক পেটান ছাড়া এর
মধ্যে আর কিছু নেই।
প্রায় সারা দিনই বাসু এ-বাড়ি ছিল।
বাড়ির দরজার সামনে তার চকচকে কালো
রঙের গাড়িটা দাঁড় করান ছিল। যতবার
ওদিকে চোখ গেছে গোকুলবাবুর বুকের মধ্যে
একটা অস্বস্তি পাক দিয়ে উঠেছে।
গাড়িটাও অমূল্যর বন্ধুর বড়মানুষীর
একটা বিজ্ঞাপন।
পাড়ার এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে বাড়ির
দরজায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল।
কলকাতা শহরে কি গাড়ি জিনিসটা নতুন।
রাত দিন তারা দেখছে কত রঙ বেরঙের গাড়ি,
কত বিচিত্র আকারের গাড়ি রাস্তায় ছুটো-
ছুটি করছে। কিন্তু সেটা তো কথা নয়, তারা
অবাক হয়েছিল, এই একশ বি-র বাড়ির
দরজায় তো কোনোদিন গাড়ি দাঁড়ায় না।
মাঝে মধ্যে কারো অসুখ-বিসুখ হলে ডাক্তারের
গাড়ি কি এক আধটা এম্বুলেন্স এসে
দাঁড়িয়েছে, তা-ও আধঘন্টা পনেরো মিনিট
পর সে সব গাড়ি চলে গেছে। এমন সারাদিন
এ বাড়ির সামনে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকা—
তাদের কৌতূহলের শেষ ছিল না।
তা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা যাই ভাবুক, পাড়ার
বয়স্ক লোকেরা? হুঁ, তারা জেনে গেছে,
বাসুর গাড়ি, অমূল্যর বন্ধু বাসু নতুন গাড়ি
কিনে বেড়াতে এসেছে। গরীব বন্ধুর কাছে
বড়লোক বন্ধুর আসা মানেই একটু করুণা
একটু অনুকম্পা বিতরণ করতে আসা। এর
বেশি কিছু না। সকলেই জিনিসটা বোঝে।
বলতে কি, সেই ছেলেবেলা থেকে বাসুর
সঙ্গে অমূল্যর মেলামেশাটা গোকুলবাবুর
খারাপ লাগত। তোর পায়ের ছেঁড়া জুতো
গায়ের ছেঁড়া জামা কোনোদিনই খুঁচবে না।

তবে আর বড়লোকের ছেলের সঙ্গে ঘনাঘনি করার কী সার্থকতা আছে। গরীবের কাছে বড়লোকের আসার অর্থই হল তোমার মধ্যে একটা হীনমন্যতার ভাব জাগিয়ে দেওয়া। অমূল্য কি জিনিসটা বোঝে না।

নেকলেস গলায় দিয়ে অমূল্যর বৌ যখন আজ হাঁটাহাঁটি করছিল গোকুলবাবুর যেন লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল।

আর এই দান পেয়ে পুত্রবধূর প্রাণে আহ্লাদ কত। আগেও তিনি দেখতেন, বাসুর সামনে অমূল্যর স্ত্রী বড় বেশি একটা যেত না, ভাল করে কথাও বলত না, কিন্তু আজ ঐ সোনার হার পেয়ে সব বাঁধ যেন ভেঙে গেল। স্বামীর বন্ধুকে চা জলখাবার পরিবেশন করা, ভাত পরিবেশন করা—আজ একটা প্রচণ্ড উৎসাহ তিনি মেয়েটির মধ্যে আগাগোড়া লক্ষ করছিলেন। এমন কি উভয় পক্ষের মধ্যে বেশ হাসহাসি রসালাপ পর্যন্ত চলছিল।

অমূল্যটা বোকা।

মেয়েদেরকে এ ধরনের খাতিরদারী কোনোদিন দিতে আছে? কোনোদিন দিতে নেই। বিশেষ করে বড়লোক বন্ধুর সামনে তো নয়ই। তোর স্ত্রী অন্তত একবার হলেও, তোর সঙ্গে মনে মনে বাসুর তুলনা করেছে—এবং অন্তত মুহূর্তের জন্য হলেও একটা শ্রদ্ধা, একটা অনুরাগের দৃষ্টি নিয়ে ঐ পুরুষটির দিকে তাকিয়েছে। হ্যাঁ, দু মিনিটের জন্য হলেও তোর বৌ তোকে একটু অবজ্ঞা একটু ঘৃণার চোখে দেখেছে; বিশেষ করে রেখার মতন চরিত্রের মেয়ে। কিছুই হল না কিছুই পেলাম না করে রাতদিন যে হা-হুতাশ করছে।

বলতে কি, বিকেল হবার আগেই কেমন যেন অতিষ্ঠ হয়ে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। চা খাননি। স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে ধরতে গেলে সারা দুপুরই গল্প-গুজব করার পর বন্ধুটিকে চা খাওয়াবার উদ্যোগ করছিল পুত্রবধূ। অবশ্য গল্প-গুজবের সময় কি অমূল্য অনুপস্থিত ছিল, তা না, রেখা এত বোকা মেয়ে না, তবে অমূল্য আড্ডায় উপস্থিত ছিল এই পর্যন্তই, একটা কথা, তাকে বলতে শোনা যায় নি। অনর্গল কথা বলেছে ওরা দুজন। বাইরের একটি পুরুষের সামনে অমূল্যর স্ত্রীকে আজ প্রথম উচ্ছ্বসিতে হেসে উঠতে শুনে গোপালবাবুর দুকান লাল হয়ে উঠেছিল।

তখনই পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়িয়ে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন।

যেন আলোচনা চলছিল এবার পুজোর সময় অমূল্য, অমূল্যর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাসুদেব দীঘা না পুরী বেড়াতে যাবে।

অতিরিক্ত রেগে গিয়ে গোকুলবাবু মনে মনে বলেছিলেন, অমূল্যর আর যাবার দরকার কি। অমূল্য সঙ্গে না গেলেও ভ্রমণের আনন্দের কোনোরকম ব্যত্যয় ঘটবে না।

দোকানটা ফাঁকা দেখে গোকুলবাবু আকৃষ্ট হলেন। প্রতাপের ছেলে দোকানে ছিল না। কর্মচারীটি একটা টুলের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে একটা পুরোনো সিনেমার কাগজ নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল।

'এটা কোথায় পেলে সুধন্য?'

লাজুকে হাসি হেসে সুধন্য তৎক্ষণাৎ কাগজটা লুকোতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু গোকুলবাবু দেখে ফেলেছেন যখন, আর ওটা লুকিয়ে রাখার কোনো মানে হয় না। কাগজটা দুই হাঁটুর ভাঁজের মধ্যে রেখে দিয়ে সুধন্য আস্তে বলল, বাবু কিনে এনেছেন।'

তা তো আনবেই, গোকুলবাবু মনে মনে বললেন, প্রতাপের ছেলেও যুবক। যুবক মাত্রই সিনেমার পত্র-পত্রিকা পছন্দ করে। যা সব ছবি-টবি ছাপা হচ্ছে আজকাল!

'দে বাবা, ভাঁড়ে করে একটু চা দে।' একটা চেয়ার নিয়ে গোকুলবাবু বসে পড়লেন।

সুধন্য চা এনে দিল।

না, সিনেমাওয়ালাদের দোষ কি, গোকুলবাবু চিন্তা করলেন, সমাজে যা ঘটছে, ঘরে ঘরে যে-সব নাটক হচ্ছে, সিনেমার লোকেরা সে-সব চিত্রই তো চোখের সামনে তুলে ধরছে। তাঁর ঘরের পুত্রবধূটিই তো সিনেমার একটি চরিত্র। স্বামীর বন্ধু সোনার হার উপহার দিয়েছে, বিগলিত হয়ে তার সঙ্গে সারা দুপুর হেসে-চলে কথা বলা, অথচ মধ্যপ চরিত্রহীন বলে আগে যাকে প্রচুর ঘেন্না করা হত—গর্বায় দেখাবার উপযোগী সুন্দর বিষয়বস্তু, চমৎকার আখ্যান। তারপর যদি দীঘা কি পুরীর সমুদ্রসন্দর্শনে বন্ধুপত্নীকে নিয়ে যাওয়া হয় তবে তো আর কথাই নেই।

তাই বলো, যুগকে তুমি অস্বীকার করবে কেমন করে, নতুন দিনের হাওয়া গোকুলবাবুর গুহাভ্যন্তরেও শেষটায় প্রবেশ করল।

সাইকেলের বেল শুনে গোকুলবাবু চায়ের ভাঁড় থেকে মুখ তুললেন। রাধু সাইকেলটা দরজার গায়ে ঠেকিয়ে রেখে খুবই ব্যস্ততার সঙ্গে ভিতরে চুকল।

'এই, চা দে।' ধপ্ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে রাধু রুমাল দিয়ে ঘাড়-গলা মুছতে লাগল। 'চা ভাল না হলে তোমার পোঁদে আমি লাথি মারব কিন্তু বলা।'

রাধুকে যে প্রতাপের দোকানের এই ছোকরা কর্মচারীটি যমের মতন ভয় করে গোকুলবাবু সেদিনই দেখে গেছেন। তাড়াতাড়ি করে সুধন্য চা তৈরী করতে লেগে গেল।

রাধু যেন তখনও গোকুলবাবুকে দেখতে পায় নি। পকেট থেকে কলম ও ডাইরীর মতন ছোট একটা বই বের করে খুবই মনোযোগের সঙ্গে কি যেন টুকল। বইটা তখনই আবার পকেটে ঢোকাল। কলমটা বুক পকেটের মাথায় গুঁজে রাখল। তারপর আবার রুমাল দিয়ে ঘাড়-গলার ঘাম মুছতে লাগল। যেন খুবই ছুটি করা হয়েছে। প্রচুর মানুষটা

'কেমন আছ রাধু?' গোকুলবাবু কথা বললেন।

'এই যে বুড়োকর্তা।' খুব প পরিচ্ছন্ন একটা কাপে করে বেশি দ দিয়ে রাধুকে চা তৈরী করে দেওয়া কাজেই আজ আর চা নিয়ে সে কো হৈ-চৈ করেন নি। যেন খুব আরা কাপে একটা চুমুক দিয়ে হ গোকুলবাবুর দিকে চোখ তুলল।

'খুব ব্যস্ত মনে হয়?' হাসি মুখে গোকুলবাবু ঘাড়টা কাত করে

'এই আর কি।' রাধু দাঁত হাসল। 'কতক্ষণ এসেছেন?'

'এই তো, একলা বসে বসে এ খাচ্ছি।'

তারপর রাধু দু-মিনিট আর বলল না। কাপের বাকি চা-টুকু শেষ

একটা নতুন গাড়ি দেখলাম বাড়ির দরজায়?' কাপটা নামিয়ে রেখে আবার এদিকে তাকাল। গোকুলবাবু নাড়লেন।

'বাসু এসেছিল।' বাসু নতুন কিনেছে।'

'বাসু? বাসুটা কে?' কপালের কুঁচকে রাধু এক সেকেণ্ড চিন্তা তারপর কপাল টান করে মুখে হাসি তুলল। 'ও—হো, আমাদের বাসুদেব তো ওরা বেলেঘাটা আছে।'

'ওখানেই তো ওর কাঠের কার গোকুলবাবু এদিক ওদিক তাকিয়ে যেন খুবই একটা গোপন কথা র রাধুর চোখে চোখ রাখলেন। 'খুব জমাট অবস্থা এখন ওর—কারখানাও খুব বড় করেছে।'

'তা হবে।' রাধু এমন চেহারা যেন বাসুর বেলেঘাটার কারখানা স তার তেমন একটা উৎসাহ নেই, খোঁজ কিছু রাখে না। বাসু বুঝি এখানে দাওয়া করল?' রাধু হঠ করে প্রসঙ্গে চলে গেল।

গোকুলবাবু একটু অপ্রস্তুত এমন একটা অনুমান রাধু করল কেন বুঝি স্বাভাবিক, তখনি তিনি করলেন, রাধুর মতন পাড়ার আরো মানুষ ঠিক এই জিনিসই অনুমান বাসু দুপুরে এ বাড়ি খাওয়া করেছে, সকাল থেকে সারাদিন যদি দরজায় একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে, মানুষ আরো অনেক কিছু অনুমান পারে, তাদের দোষ দেওয়া যায় না।

'হুঁ', গোকুলবাবু সংক্ষেপে সারলেন। একটু ভেবে নিয়ে পরে ক অনেক দিন পর এসেছে।'

'কাল অমূল্য মুরগি কিনেছিল,

মান করেছি বাড়িতে একটা কিছু
াধু আবার দাঁত ছাড়িয়ে হাসল।
বাবুর কান লাল হয়ে উঠল।
বাড়িতে একটা কিছু হচ্ছে।
ী ঘটা করে মাংস রান্না করেছে,
রবে বাসুকে খাইয়েছে। কিন্তু
ুল্যর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছেলে-
। এমন উৎসবের মতন এর
ত তো কিছু হয় না। নিশ্চয়ই
ছেলেকে; এত খাতির যত্ন করার
া কারণ ঘটেছে। যদি কারণটাও
হয়ে গিয়ে থাকে তবে তো
।' বলা যায় কি, হয়তো রাধু
জেনেও গেছে অমূল্যর বৌ
উপহার পেয়েছে। পাড়ার
খোঁজখবর রাখে রাধু। সারাদিন
য় উঁহল দিয়ে বেড়ায়। পাড়ার
তা শহরের কোথায় কি হচ্ছে
তাও রাধুর অজানা থাকে না।
কলকাতা শহর গোটা পশ্চিম
ই হয়তো তাকে ঋখতে হয়। কে
হচ্ছে, কে গরীব হয়ে মাথা তুলতে
কারা শোষণ করছে, কারা শোষিত
কার আছে, আবার শোষিতের
্যও কারা বড়লোকদের তোষামোদ
ব রাধুর জানা। সে যে দেশের
ছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ছে—
ীকে শাস্তি দিতে সর্বদা হাতের
কিয়ে আছে, অমূল্যর মতন সে
কেরানী নয়, গোকুলবাবুর মতন
ঘড়গুদ্ধে খবরের কাগজের পোকা
জন্মগ্রহণ করেনি—বৃহত্তর জগত
কারবার, মানুষ নিয়ে তার চিন্তাশ
তা, মানুষের সুখ দুঃখ—
লবাবু কেমন যেন হিমসিম খেয়ে
সত্যি, যদি কোনোরকমে কথাটা
তে পারে, অমূল্যর বৌকে ছশ টাকা
বাসু নেকলেস প্রেজেন্ট করেছে—
সঙ্গে এই ঘষাঘষি করার অর্থ
নুকম্পার দান গ্রহণ করা কেন,
অমূল্যর বৌ দুজনে মিলে বাসু-
ষ মোদ করে কোন পরমার্থ লাভ

রাধু এসব প্রশ্ন করতে থাকে
কী উত্তর দেবেন?
সময় আধোবদন থেকে গোকুলবাবু
হাসলেন।

গতভাবে আমি এটা পছন্দ করি
। তুমি বড়লোক আছ, তুমি তোমার
ক, গরীবের সঙ্গে মেলামেশা করে
কিছু লাভ হবে না, যার সঙ্গে
স-ও কিছু লাভবান হচ্ছে না, তার
ড়া জামাই থাকবে, পুঁইচচ্চড়ি
কে ভাত খেতে হবে।'
তার কি অর্থ আছে।' রাধু
বা নিশ্বাস ফেলল। 'এমন বড়-
াছে যে তার গরীব বন্ধুকে এভাবে
শুভাবে সাহায্য করে, আপদে বিপদে তার
পাশে এসে দাঁড়ায়।'

'তা দাঁড়ায়, শুনেছি এভাবে সেভাবে
গরীব বন্ধুকে আত্মীয়কে কেউ কেউ সাহায্যও
করে থাকে।' গম্ভীর হয়ে গোকুলবাবু ঘাড়
নাড়লেন। 'কিন্তু এ ধরনের সাহায্য গ্রহণ
করা উচিত না। এর মধ্যে একটা দয়ার ভাব,
করুণার ভাব মেশাল থাকে। থাকবেই।
তুমি কি বল?'

রাধু চুপ থেকে গোঁফ চুমড়াতে লাগল।
গোকুলবাবু সামনের দিকে একটু ঝুঁকে
বসলেন।

'আমার খুব খারাপ লাগে বাসু যখন
অমূল্যর সঙ্গে মেশে। ব্যক্তিগতভাবে আমি
এটা পছন্দ করি না।'

'বাসু কি অমূল্যকে কোনোরকম
সাহায্য-টাহায্য করেছে, কোনদিন?' রাধু
ভুরু কুঁচকালো।

'নাঃ।' গোকুলবাবু জোরে মাথা ঝাকা-
লেন। 'সাহায্য অনেক রকম অর্থে হতে
পারে। তুমি কোন সাহায্যের কথা বলছ?
টাকা পয়সা দিয়ে? আমার তো মনে হয় না
বাসুদেব কোনদিন একটা পয়সা দিয়ে
অমূল্যকে সাহায্য করেছে, আর সেই সাহায্য
অমূল্য হাত পেতে কোনদিন নেবেও না, সেই
ছেলেই সে নয় আমার সন্তান—আমাকে
তো দেখছ। গায়ে ছেঁড়া জামা পায়ে ছেঁড়া
জুতো—তবু মাথা সোজা রেখে চলি, একটা
কানাকড়ির মত কোনোদিন গোকুল মিত্তির
হতে বাড়িয়েছে কেউ বলতে পারবে না
আমার আত্মসম্মানবোধটা একটু বেশি।'

রাধু আবার চুপ করে রইল।

'আর সাহায্য কি।' গোকুলবাবু তাঁর
শুকনো হাতের তেলোটা শূন্যে ঘোরালেন।
'কারো অসুখ-বিসুখ হলে বাসুদেব কোনো-
দিন উঁকি দিয়েছে কি খোঁজ-খবর নিয়েছে
এই জীবনে আমি দেখলাম না। এই যে
অমূল্য মুখ বুজে গাধার মতন বছরের পর
বছর একটা অফিসে খেটে যাচ্ছে, কোনো
ইনক্রিমেন্ট নেই প্রমোশন নেই—তার পরম
সুহৃদ বাসুদেব কোনোদিন এই নিয়ে তাকে
একটা কথা জিজ্ঞেস করেছে বলেও আমি
শুনি নি। তবে হ্যাঁ, বন্ধুর কাছে সে
আসে এই পর্যন্ত। আমার তো মনে হয়
এই আসাটা তার একটা বিলাসের মতন,
যেমন সিগারেট খাওয়া, যেমন পার্কে বেড়ান,
সিনেমা দেখতে যাওয়া—অর্থাৎ সময় কাটানর
জন্য এখানে একটু ঢুঁ মেরে যাওয়া, এতে
তোমার কী লাভ হয় জানি না; কিন্তু
অমূল্যর কোনো লাভ হয় না—হয়তো বাল্য-
বন্ধু হিসাবে তোমার উপর অমূল্যর একটা
টান আছে, দুর্বলতা আছে—কিন্তু দুঃখী
মানুষ অমূল্যর বাপ হয়ে আমি সেটা পছন্দ
করব কেন। তোমার দামী পোষাক, তোমার
গাড়ি, তোমার গলভরা কথা গালভরা হাসি
আমার বিরক্তি উৎপাদন করে। মিথ্যা বললাম
রাধু?'

'বাসুবাবু শুনেছি এখন মদের মধ্যে
ডুবে থাকে।'

'তাই নাকি?' পিঠ সোজা করে বসলেন
গোকুলবাবু। 'দেখটা তার বরাবরই ছিল
এখন বুঝি একেবারে—'

'লাগামছাড়া, অনেক পয়সা হয়ে এখন।'
রাধু গলার নিচ হাসল।

'তবেই দ্যাখো, এত উড়াচ্ছে, তবু কত
টাকা তার, কত মুনাফা লুটছে কারবারে
একবার কল্পনা কর।' চোখ দুটো কপালে
উঠে গেল গোকুলবাবুর।

'কেবল কি মদ—অন্য পথেও বাসুবাবু
জলের মতন পয়সা খরচ করছে এবং সেই
খরচটা মদের খরচের চারগুণ।'

রুদ্ধশ্বাস হয়ে রইলেন গোকুলবাবু।
রাধু আর একবার ঘামছিল। রুমাল
দিয়ে কপাল গলা মুছছিল।

গোকুলবাবু এদিক ওদিক তাকালেন।
তারপর চোখ দুটো ছোট করে ফেললেন।
তারপর নিচু গলায় বললেন, 'বাসুর কি
অন্য দোষও আছে?'

'তাই তো আমাদের কানে আসছে—
মেয়েমানুষ নিয়ে একেবারে লেপালেপি।'

কাঠের মতন শক্ত হয়ে রইলেন গোকুল-
বাবু।

'এমনও শুনেছি—রাধুর হাতের মুঠ
শক্ত হয়ে উঠল। 'ভাল ভাল ফ্যামিলির
বৌকে-মেয়েকে নষ্ট করেছে, সুন্দর মুখ-
চোখে পড়ল তো আর রক্ষে নেই, পাঁচ-দশ
হাজার, দরকার হলে লক্ষ টাকা খরচ করবে
সে ওই মেয়েছেলের পেছনে।'

'বলো কি তুমি, তবে তো এই মানুষ
অত্যন্ত বিপজ্জনক, একে বাড়িতে ঢুকতে
দেওয়া যে-কোনো পরিবারের পক্ষে আশঙ্কার
কথা।'

রাধু চুপ করে রইল।

অনেকদিন সে আসে নি অমূল্যর
কাছে। মাঝখানে একেবারে বন্ধ ছিল
বাড়িতে আসা। আজ আবার এল।' গোকুল-
বাবুর গলায় স্বর কাঁপছিল। 'কিন্তু ওই
মানুষ যে এমন লম্পট একটা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে
উঠেছে তা তো আমি জানি না, বোধ করি
অমূল্যও এতটা জানে না। বাল্যবন্ধু,
আগে আসত, তাছাড়া আগে এ পাড়াতেই
ছিল,—অনেকদিন পর এসেছে তাই খুশি
হয়ে অমূল্য একটু খরচপত্রও করেছে।'

'আমাদের সব খোঁজ রাখতে হয় বুড়ো-
কর্তা।' রাধু ঘাড় তুলে বাইরে রাস্তাটা
একবার দেখল। তারপর গলা নামিয়ে
আস্তে বলল, 'বদমাইশটা এদিকেই বেড়ে
গেছে, অনেক পয়সা হয়েছে তো এখন,
পয়সাটা কোনদিকে খরচ করলে ভাল লাগবে
ঠাহর করতে পারছে না।'

গোকুলবাবুর শুকনো চোয়াল দুটো
নড়ে উঠে আবার স্থির হয়ে গেল। যেন
তাঁর মুখের কথা আটকে যাচ্ছিল। তারপর
যখন মুখ খুললেন, গলা দিয়ে 'অ্যাঁ' শব্দটা

আগে কেরোলো। 'আ, তবেই ধ্যাখো ভগবানের বিচার, এমন অসৎ দুশ্চরিত্র লম্পটকেই কিনা দু'হাতে ঢেলে দিচ্ছেন—আর সংসারে যারা সৎ, ধার্মিক, নিরীহ—তাঁরা উপোস থাকছে, ছেঁড়া জুতো, ছেঁড়া জামা তাদের নিত্য সহচর। তারা উদরান্ত খেটে একখানা ভাল ঘরে বাস করতে পারছে না।'

'তবে বাসুর এই রমরমা অবস্থা আর বেশি দিন নেই।' রাধুর চোখ দুটো লাল হয়ে উঠল। সেদিনের মতন টেবিলে ঘুষি মারল না। ঘুষির মতন হাতটা মুঠো করে টেবিলের ওপর উঁচু করে ধরে রাখল। 'কারখানার কর্মচারীদের সঙ্গেও নাকি যাচ্ছে তা ব্যবহার করছে—ওরা খুবই ক্ষেপে গেছে, হয়তো খুব শীগগীরই তার কারখানায় স্ট্রাইক আরম্ভ হয়ে যাবে। বাসুকে ঘেরাও-ও করতে পারে।'

'হোক হোক।' গোকুলবাবুর ধূসর চোখ হঠাৎ চকচক করে উঠল। 'কবল স্ট্রাইক কেন, ঘেরাও কেন, ওর কারখানা লুঠ করে নিক কর্মচারীরা, ওর ঘরবাড়ি ধন-সম্পত্তি দখল করে নিক, নিয়ে নিজেরা ভোগ করুক, গরীব-দুঃখীদের মধ্যেও কিছু বিলিয়ে দিক, দেশের উপকার হবে, এমন একটা লম্পটকে এমন জঘন্য মানুষকে এত সুখ ভোগ করতে দেওয়া কিছুতেই উচিত না।'

'হবে হবে, সব ঠিক হয়ে যাবে।' রাধু তার হাতের ঘুষিটা শূন্যে নাচাতে লাগল। 'দিন এসে গেছে, বাসুর মতন অত্যাচারী-উচ্ছৃঙ্খল মালিক মুনাফাখোরদের বীরেশ্বরের মামাতো ভাইয়ের মতন শয়তানদের দুনিয়া থেকে লোপ করে দেওয়া হবে—'

'তাই দাও বাধু, তোমরা নিউ ব্লাড—তোমরাই একাজে অগ্রণী হবে, তোমাদের দ্বারাই একাজ সম্ভব, নতুন দিন আসুক হোক, দেশ আবার নতুন সূর্যের মুখ দেখুক, নতুন হাওয়া বইতে থাকুক—কড় বেশি পাপ জমে গেছে দেশে, চারদিকে অমানিশার ঘোর অন্ধকার—উত্তেজনার আবেগে গোকুল-বাবু থর থর করে কাঁপছিলেন। যেন তাঁর শুকনো ঠোঁট ভিজে উঠে টপটপ করে লালা ঝরছিল। রাধু তার ঘুষি পাকান হাতটা লজ্জাপর্ণে টেবিল থেকে সরিয়ে নিল।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে প্রহ্লাদের ছোকরা কর্মচারীটি হাঁ করে তাকিয়ে গোকুলবাবুর কথা শুনছিল।

'কি শুনছিস।' রাধু একটা ধমক লাগাল। সুধন্য তৎক্ষণাৎ উনুনের ধারে সরে গিয়ে ঘাড় গুঁজে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

আচ্ছা, আমি এবার উঠব বুড়োকর্তা' হাতের ঘড়ি দেখে রাধু চট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ' গোকুলবাবু ঘাড় কাত করলেন। 'তোমরা কাজের মানুষ—তোমাদের কত রকমের কাজ চতুর্দিকে, তোমরা কি চায়ের দোকানে বসে বাজে আড্ডায় সময় নষ্ট করতে পার—তোমার অনেকটা সময় আমি নষ্ট করলুম—কিন্তু তার কারণ তুমি নিজে না এলে—' তার আগেই সাইকেলটা নিয়ে সোঁ সোঁ করে দক্ষিণের রাস্তাটা ধরে তরুণ হয়ে গেল।

নিশ্চয় খুব জরুরী কাজ, গোকুলবাবু চিন্তা করলেন, তা না হলে কথার মাঝখানে এভাবে সে উঠে পড়ত না।

সুধন্য দরজার কাছে ছুটে গিয়েছিল। তারপর মুখটা কালো করে ফিরে এল।

'কি হল।' গোকুলবাবু থুতনি নাড়লেন। 'কি দেখলি বাইরে?'

'একটা পুলিশের গাড়ি ওদিকে ছুটে গেল।'

'তা যাক না, পুলিশ পুলিশের কাজ করছে, রাধু রাধুর কাজ করছে—এই নিয়ে তোর মাথা ব্যাথা কেন।'

'কিন্তু বাবু যে চায়ের পয়সাটা দিয়ে গেল না—'

'আরে দেবে দেবে—' ভেংচি কাটার মতন চেহারা করলেন গোকুলবাবু। 'তোর চায়ের পয়সা নিয়ে সে কিছু পালিয়ে যাবে না—হয়তো মনে নেই, ঘুরে এসে দেবে।'

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও সুধন্যর চেহারা মোটেই প্রসন্ন হল না।

'বুঝলি—' গোকুলবাবু তখন সুধন্যকে বোঝাতে লাগলেন। 'এরা হল ঈশ্বর, অসাধ্য সাধন করতে পারে, দেখবি রাধুরাই একদিন দেশের গভর্ণমেণ্ট চালাবে, পুলিশ এদের হাতে থাকবে, মিলিটারী এদের হাতে থাকবে, সেদিন দেশে কালোবাজার বলে কিছু থাকবে না, ভেজাল বলে কিছু থাকবে না, মুনাফাখোর দেখলেই গুলী করা হবে—বুঝলি সেদিন উচ্চ-নীচ সব সমান, এই যে ডি আই পি রোডের ওপর বড় বড় সব বিল্ডিং হয়েছে তুইও ওখানে থাকতে পাবি, আমিও একটা ফ্ল্যাটের মালিক হব হি-হি—সেইদিন আগত।' বুড়োকর্তা হেসে ফেলল। সুধন্যর চোখ দুটো চকচক করছিল।

কেন জানি ভিতরে একটা শক্তি অনুভব করছিলেন গোকুলবাবু, চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে হাঁটতে. হাঁটতে একেবারে লেক পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন।

স্বরূপ ঘোষের খাটালের পাশ দিয়ে যখন হাঁটছিলেন তখন স্বরূপের সঙ্গে দেখা। বুড়োকর্তাকে দেখেই স্বরূপ দুহাত কপালে ঠেকিয়েছিল।

'মুরগিটা কেমন খেলেন কর্তা?'

'খুব ভাল ছিল। চমৎকার মাংস।

স্বরূপ দাঁত ছড়িয়ে হেসেছিল।

'আমার বাড়ির পোষা মুরগি, কত খাবার পায়, কত যত্নে রাখি। দরকার হলে আবার ছেলেকে পাঠাবেন।'

'হুঁ' তা পাঠাব।' গোকুল মাথা নেড়েছিলেন। মনে মনে বলেছিলেন, 'আমার রোজ মুরগি খাবার কপাল কি থেকে একটানা পনেরো দিন চলবে।'

'আমার এখানে ন্যায্য দ. নিন, ডিম নিন, দুধ নিন—ভা লুটতে এখানে আসেন খুনি নি

তা তো ঠিকই, গোকুলবাবু বলেছিলেন, রাধুর একদিনের ঘোষ দাদা সেজা হয়ে গেছে।

বাড়ি ফিরতে একটু রাত

ভিতরে ঢুকে গোকুলবাবু বাড়িটা যেন বড্ড বেশি চুপচাপ বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে। অ এ-বেলা কী রান্নাবান্না করে রুটি আর পাতলা একটু মুগে এর বেশি কিছু আশা করা যায় অনেক খরচপত্র হয়েছে। বেশ হয়েছে।

সুতরাং এ-বেলার আহার সারা হবে গোকুলবাবু চোখ দিতে পারেন।

অমূল্যর ঘরের দরজাটা খোলা

ঘরটা কেমন যেন খাঁ খাঁ ক ভিতরে লোকজন নেই। না কি রেখে সব ঘুমিয়ে পড়ল। অ জ্বলছে।

নিজের ঘরে না ঢুকে সোজা অমূল্যর ঘরে ঢুকে পড়লেন

অমূল্যর একটা ইজি চেয়ার ছিঁড়তে ছিঁড়তে এমন দশা হয়ে যখন ওটাতে পা এলিয়ে দেয় ও কুমড়োর মতন কলে পড়ে প্রায় এসে ঠেকে।

তবু বাড়িতে যতক্ষণ থাকে চেয়ারে অমূল্যর শোয়া চাই।

গোকুলবাবুর পায়ের শব্দ শু চোখ খুলল। যেন ঘুমিয়ে করমচার মতন লাল হয়ে গেছে ত

গোকুলবাবু দেখলেন বিছা তিনটি সন্তান হাত পা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছে।

গোকুলবাবু পুত্রবধূকে দে না।

'তাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে অমূল্য মাথা নাড়ল।

'আমি খাই নি, মিঠুদের খাইয়ে

গোকুলবাবুর একটু সন্দেহ হ

'বৌমা কোথায়?'

'ও তো সেই বিকেলেই বেরিয়ে

'কোথায় গেছে?'

'ওই যে, মহাবোধি সোসাইটি হ নৃত্য হচ্ছে, বাসু যাচ্ছিল, রেখাও গেল।'

'বাসু যাচ্ছিল রেখাও সঙ্গে বিড়বিড় করে উঠলেন গোকুলবাবু, হতভম্ভ হয়ে ছেলের চোখের দিকে

'বাসু বলছিল, কোনো অসুবিধ

ন গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি, আবার গাড়ি
বৌকে বাড়ি পৌঁছে দেব।'
তো বুঝলাম।' একটা তেতো মতন
লেন গোকুলবাবু। 'কিন্তু তোরা
গেলি না কেন, তুইও বাড়িতে
ও বাড়িতে—আমি যে মাথামুণ্ড
তে পারছি না।'
ল্য হাই তুলল। তারপর হাত দুটো
শরীরের আলস্য ভাঙল।
মার ওসব নাচ ফাচ দেখতে ভাল লাগে
য় ওরা বলেছিল সঙ্গে যেতে, আমি
আমি গেলাম না, তাই বাচ্চাগুলোকে
তে দিলাম না, থামকা গিয়ে ওরা
যন্ত্রণা করত, এথক নৃত্যের কিছুই
না।'
আশ্চর্য, কি সাংঘাতিক কথা!'
বাবু ধপ্ করে অমূল্যর তক্তপোষের
বসে পড়লেন। 'এক দিনে এক
মধ্যে জিনিসটা এতখানি গড়িয়েছে,
কা একা বাসুর সঙ্গে বেরিয়ে গেল।'
মূল্য অল্প শব্দ করে হাসল।
মুস্কিল, বাসু তো অপরিচিত মানুষ
াড়ি আছে তাই রেখাকে নিয়ে যাওয়ার
হয়েছে, আবার গাড়ি করে ওকে বাড়ি
দেবে।
ফু, কতবড় অপদার্থ তুই, সব দিক
তোর জীবন কী ভয়ংকর ব্যর্থ শূন্য
য় তাই আমি সময় সময় ভাবি—'
াতর করুণ চোখ করে গোকুলবাবু
দিকে তাকালেন যেন সে ধীরে ধীরে
বে যাচ্ছিল।
তু অমূল্য মিটিমিটি হাসছিল।
কি মনে কর তোমার বৌমা বাসুর
য়ে যাবে?'
য়ে যাবে কি না জানি না।' এবার
ধ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।
ন শুনে এমন একটা দুশ্চরিত্র
রেখাকে একলা কী করে
হসে পাঠালি—এটাই আমার

ঠিক কিরে আসবে দেখো—বাসু
াড়ি করে ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে
াই তো বলি, তুই নিজের পায়ে নিজে
মারছিস; তুই জানিস না কোথাকার
থায় গড়াতে পারে।'
মি খুব ভাল করে জানি, রেখার
বে না, চালাক মেয়ে শক্ত মেয়ে সে
যেন সঙ্গে সঙ্গে অমূল্যও বেশ
উঠল। 'তুমি থামকা দুশ্চিন্তা করে
ম বুঝতে পারছ না—'
তারপর? বল্, বলে যা—গোকুল-
াকাশে চোখের তারা ছুঁচলো হয়ে
অমূল্য বলল, 'আমি ইচ্ছা করে ওকে
াঠিয়েছি—রেখাও ইচ্ছা করে বাসুর
বেখতে গেছে—'
তারপর?' গোকুলবাবু আবার
পড়লেন। আবার তিনি ভিতরের
উত্তেজনা নিয়ে থরথর করে কাঁপছিলেন। 'এর পেছনে তোদের কী মহৎ উদ্দেশ্য আছে আমি জানতে পারি কি?'

শরীরটা আবার ঢিলে করে ইজিচেয়ারে ছেড়ে দিয়ে অমূল্য টিপে টিপে হাসছিল।

'অ', গোকুলবাবু হাতের তেলো দুটো শূন্যে তুলে দিলেন। 'ছশ টাকার নেক্‌লেস উপহার পেয়েছে, এবার হাজার টাকার চেক্ নিয়ে বৌ ঘরে ফিরবে, এই তো?'

'তা মন্দ কি।' অমূল্য দেওয়ালের দিকে চোখ ফেরাল। 'সঙ্গে একটু বেড়াতে বেরিয়ে যদি হাজার টাকা ঘরে নিয়ে আসতে পারে—এমন সুবিধা আমি ছাড়ব কেন, এই সুযোগ আমি কাজে লাগাব না কেন তুমিই বল।'

'ছি ছি ছি!' যেন ছেলের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে গোকুলবাবুর ঘেন্না লাগল। সম্পূর্ণ ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। অ্যাঁ, জীবনে কিছুই করতে পারলি না, দুটো বাচ্চাকে বুড়ো বাপকে একটু দুধ পর্যন্ত খাওয়ার ক্ষমতা নেই তোর—এখন কি না একটা দুশ্চরিত্র মাতালের সঙ্গে বৌ পাঠিয়ে তার রোজগারে—'

কথাটা গোকুলবাবু শেষ করতে পারলেন না। অমূল্য জোরে হেসে উঠল।

'তা বাবা, অনেকেই তো অনেক কিছু করছে এখন সংসারে, এখন টাকাটাই হল বড় জিনিস, অর্থই এ যুগের সার কথা—দেখলাম বাসুর ওপর তোমার বৌমার যথেষ্ট অনুরাগ রয়েছে, আমিও ভাবলাম এই সুযোগ এই সুযোগ, বাসুর কাছ থেকে চুষে চুষে তোমার পুত্রবধূ পারে আদায় করুক না, দেখবে দুদিনেই আমি ফ্ল্যাট কিনতে পারব গাড়ি করতে পারব, তোমার এক পো করে দুধ বরাদ্দ হয়ে যাবে, ডেইলী দুখানা করে খবর-কাগজ পড়তে পারবে—।'

'তুই মরে যা মরে যা, বজ্জ পড়ে তোর এক্ষুণি মৃত্যু হওয়া উচিত—' গোকুলবাবু আর দাঁড়াতে পারছিলেন না, দরজার দিকে ছুটে আসছিলেন। বাধা পেলেন।

কাগজের মতন ফ্যাকাশে মুখ করে কাঁপতে কাঁপতে রেখা ঘরে ঢুকল।

'কি হল!' অমূল্য প্রথম কথা বলল, রেখার ত্রাস লাগা চোখ দুটো দেখে সে বুঝতে পারল একটা কিছু অঘটন ঘটেছে, চেয়ার ছেড়ে দূরে এসে সে স্ত্রীর কাছে দাঁড়াল। 'এমন করছ কেন?'

'ভীষণ ব্যাপার হয়ে গেছে, সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে গেল।'

'কখন, কোথায়?' এবার গোকুলবাবু মুখ খুললেন।

রেখা আঙুল দিয়ে বাইরেটা দেখাল। 'ঐ যে তৃপ্তি নিকেতনের কাছে—ওদিকে রাস্তাটা অন্ধকার মতন—'

'হুঁ, হেঁ, প্রহ্লাদের দোকান,—দোকানের সামনে রাস্তাটা একটু অন্ধকারই বটে রাস্তার পাশে দুটো ঝাঁকড়া মাথা তেঁতুল গাছ লাইটপোস্টের, আলোটাকে আড়াল করে রেখেছে। গোকুলবাবু যেন নতুন করে কাঁপছিলেন, 'কী হল সেখানে।'

'নাচ দেখে আমরা ফিরছিলাম, বাসুবাবু আমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গাড়ি নিয়ে আবার বেলেঘাটায় ফিরে যেতেন। সারা রাস্তা কোনোরকম বিপদ টিপদ হল না। এখানে পাড়ায় এসে, বাড়ির কাছে এসে—' যেন রেখার গলা বন্ধ হয়ে এল। কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমছিল। যেন শ্বাস ফেলতে তার কষ্ট হচ্ছিল।

'হুঁ, তারপর? তারপর বাড়ির কাছে এসে কী হল। অ্যাকসিডেন্ট?' গোকুল-বাবুও ঘামছিলেন। হাতের পিঠ দিয়ে কপালটা মুছে ফেললেন।

রেখা মাথা নাড়ল।

'দুটো লোক, দুটো মানুষ, মুখে কালি-ঝুলি মাখা, পরণে ট্রাউজার্স গায়ে সার্ট, কিন্তু রেখার চেহারা চেনার উপায় নেই, গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রিভলবার উঁচু করে ধরে আমাদের গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দিল। আমাদের দুজনকে গাড়ি থেকে নামতে বলল। বলছিল, একটু দেরী করলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। আমরা নেমে দাঁড়াতেই একজন হাতের রিভলবারটা আমাদের বুকের সামনে ধরে রাখল। আর একজন গাড়িটা ড্রাইভ করে তৃপ্তি নিকেতনের পেছনের গলিটা দিয়ে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল।'

'কী ভয়ংকর কথা, কী সাংঘাতিক ব্যাপার!' অমূল্য বিড়বিড় করে উঠল। 'এখনো তো তেমন একটা রাত হয়নি, পাড়ার মধ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটল!'

'বাসু কোথায়?' গোকুলবাবু অতি কষ্ট, একটা ঢোক গিললেন। 'বাসু কি এখনো সেখানে দাঁড়িয়ে?'

রেখা মাথা নাড়ল। 'রিভলবার উঁচু করে ধরে রেখে লোকটা আস্তে আস্তে পেছনের দিকে হটতে হটতে তারপর অন্ধকার মাঠের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। বাসুবাবু আমাদের এই সামনের রাস্তা দিয়ে আমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে তখনি বাস ধরতে ছুটে গেলেন। থানায় খবর দিয়ে তিনি বাড়ি যাবেন।'

'কী সাংঘাতিক কথা। রিভলবার দেখিয়ে তার গাড়িটা নিয়ে পালিয়ে গেল!' গোকুল-বাবু তক্তপোষের কোণাটায় আবার বসে পড়লেন। অমূল্য বলল, 'কলকাতা শহরে এই তো হচ্ছে রাতদিন, গাড়ি করেই এখন বেশি লুঠতরাজ হচ্ছে, তাই কথায় কথায় ওদের গাড়িরও দরকার—'

'কিন্তু তোমার গায়ে টায়ে তো ওরা হাত দেয়নি বৌমা?'

'ভাল কথা, তোমার নেক্‌লেসটা?' অমূল্য তখনি হাত বাড়িয়ে রেখার গলার সোনার হারটা ধরল। 'যাক গে ওটা যে ছিনিয়ে নেয়নি।' যেন ভয়ানক তৃপ্তি পেয়ে সে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

(শেষাংশ ২৭৬ পৃষ্ঠায়)

জীবন যখন গানের কলি

—দক্ষিণারঞ্জন বসু

একটি কবিতার দাম সাতশ' টাকা।

ভারতে কবিতার এ মূল্য অপ্রত্যাশিত, অথচ এক টুকরো কবিতার বিনিময়ে সত্যি সত্যি সাতশ' টাকা পেয়েছিলেন এ দেশেরই প্রায় অখ্যাত সেদিনের এক কবি।

গানের মতোই সে কবির এক একটি কবিতা, গানের কলির মতোই তাঁর জীবন প্রবাহ।

ইংরেজী জানেন না তিনি। তাঁর মুখের ভাষা বুকের ভাষা উর্দুতেই তিনি টুকরো টুকরো কবিতা রচনা করেন, গানের সুরে আবৃত্তি করেন এবং বন্ধু-বান্ধবদের শোনান।

কিছুদিন খবরের কাগজেও কাজ করেছিলেন কবি। নানা পত্র-পত্রিকায় লিখেও কিছু কিছু রুজি রোজগার করেছেন। কিন্তু তাতে সবার মুখে রুটি জোটানো সম্ভব হতো না। মাঝে মাঝে এ-কাগজে সে-কাগজে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হতো। সময় সময় সে-সব কবিতার জন্যে হয়তো পারিশ্রমিকও মিলতো। যত সামান্যই হোক না কেন পারিশ্রমিকের টাকাটা হাতে পড়লে কবির যে খুব আনন্দ হতো তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু শুধু আনন্দে তো বেঁচে থাকা যায় না, সংসারকে বাঁচানোর জন্যে যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন!

কবি তাই অর্থের অন্বেষণে একদিন কোথায় উধাও হয়ে গেলেন।

চারদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে গেল —কবি কোথায়, কবি কোথায়?

কিন্তু সন্ধান তাঁর কেউ পেলে না অনেক দিন পর্যন্ত। নানা রকমের গুজব, নানারকমের সব রটনা চালু হয়ে গেল রাজধানীর লেখক শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী মহলে। তার কোনোটা খুব রসালো, কোনোটা আবার অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও ভীতিজনক।

হঠাৎ এক সাংবাদিক কোথা থেকে এক সংবাদ শুনে এসেছেন, সংসারের দায়িত্ব পালনে কবি রোজগারে মন দিয়েছেন। তিনি নাকি দিল্লীর রোশনারা পার্কের কাছে কোথাও থাকেন।

এ সাংবাদিক দেখেন নি কে
কবিকে। তবে তাঁর কবিতা প
গানের কলির মতো করেই সাজা
এক একটি কবিতা। জীবনে
একটি টুকরো যেন সেই কবি
পড়তে খুবই ভালো লাগে। পড়
আপনা থেকেই কণ্ঠে সুর জেগে

সেই কবি সবার চোখের আ
গেলেন পেটের তাগিদে? আত্মগো
রোজগারের জন্যে তিনি কবিত
ছেড়ে দেবেন?

এ কিছুতেই হতে দেওয়া য
একটা হদিস যখন পাওয়া গেছে,
খুঁজে বার করতে হবেই। প্রতিজ্ঞা ক
তরুণ সাংবাদিক। কত অচেনা-অ
মানুষকেই তো খুঁজে পেতে বার
হয় সাংবাদিকদের, আর অচেনা
দেশের একজন কবির সন্ধান
যাবে না, এ হতেই পারে না।

হঠাৎ একটি প্রশ্ন মনে জ
সাংবাদিকের।

কবি যদি স্বেচ্ছায় নিখোঁজ হয়ে
থাকেন, ছদ্মবেশে যদি কোথাও গিয়ে
কাটাতে থাকেন তা হলে কি করে
রচনা নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হ

এসব পত্র-পত্রিকায় কবির ঠি
পাওয়া যেতে পারে আশা করে সাংবা
সেসব কাগজের সম্পাদকদের সঙ্গে
সাক্ষাৎ করলেন। কিন্তু সব জায়গা থে
তাঁকে নিরাশ হয়ে ফিরতে হলো। এ
কথা সব সম্পাদকের মুখে। যে সব
সম্প্রতি তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ পা
প্রকাশ করেছেন তার প্রত্যেকটিই
কবিতা, অনেক আগের পাঠানো
সেই পুরনো ঠিকানা থেকেই
অন্তর্হিত হয়েছেন!

তা'হলে নিশ্চয় এতো
নতুন নতুন গান, নতুন কবি
কবির কাছে! সাংবা
আশা। সেই অমূল্য গানের
সম্পদ উদ্ধার করতে হবেই। কা
ছদ্মবেশে আত্মগোপন করে থাকুন
জীবনের গান ক্ষণে ক্ষণে তাঁকে
তুলতে হবেই। নিশ্চয়ই কবি তাঁর
বাসে সেই শিল্পীর কাজই করে চলে

মির্জা গালিবের মতো ঈ
প্রতিবেশী হয়ে ঈশ্বরের বন্দনা গা
জন্যে কোনো মসজিদের ছায়ার
কুটীর তৈরি করে নেন নি তো ক
কিন্তু তা কেন তিনি করতে যা
কোথায়ই বা ঈশ্বর নেই? আমরা যেখ
থাকি না কেন সেখানেই তো
ঈশ্বরের প্রতিবেশী! তা ছাড়া গা
তো মসজিদের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছি
বার্ধক্যে, শেষ জীবনে। আমাদের কবি
তরুণ!

নক উল্টো-পাল্টা প্রশ্নেরই
যখন সাংবাদিকের মনে। কিন্তু
তা না-কল্পনা নয়। অনুমানকে
সে ওয়া নয়। এবার সরাসরি
গল এলাকাতে গিয়েই খুঁজে-
ক্তে হবে, যে কথাটা কানে
লো তদ্দুর সত্যি।
দুঃখু উড়ো কথাও সত্যি বলে
ত্য দাঁড়িয়ে যেতে পারে
একদিন বিকেলে রোশনারা
উপস্থিত হলেন সাংবাদিক।
াপাশে আগে ভালো করে
র নিলেন। তারপর পার্কের
শ কিছুক্ষণ ধরে ঘোরাঘুরি
নেক লোকেই চোখে পড়লো
কে। কিন্তু কবি বলতে যে
নায় ভেসে ওঠে একটি মুখেও
ছায়াপাত দেখা গেল না।
ক খানিকটা হতাশ হয়ে

ক সংবাদটা আদৌ সত্যি নয়?
ভাওতা?—নিজেকেই নিজে
সাংবাদিক। তারপর মনে মনে
যার কাছ থেকে এ তথ্য তিনি
রেছেন তাঁর কোনো স্বার্থই
র না এ ব্যাপারে। তা' ছাড়া
মাদ করার জন্যেও এ ধরণের
্য কথা বানিয়ে তাঁকে বলবেন
তিনি নন।
শেষ চেষ্টা একবার করে
ধান্ত নিলেন সাংবাদিক।
বেঞ্চিতে নিরিবিলিতে বসে
মি ন কতক্ষণ। তারপর হঠাৎ
পার্কের মালীর ঘরের দিকে
গিয়ে যেতে থাকলেন।
বু ক্ষ আপনার?—কুটীরের
তুই জো এসে কুর্ণিশ করে
সঙ্গে
—কোন সা াকাতেই কোথাও নাকি
কেন। বলতে পারো কোথায়
শ?
ম কবির বলতে পারেন?
বি বৈকি, কবির নাম ফিকর

নাদভি?
লী ভাই, ফিকর নাদভি।
ার কবি।
হব, ও নাম তো কখনো শুনা
তপ্লাটে!
এই উত্তর শুনে সাংবাদিক
আর কি। কোনোরকমে টাল
তিনি ফিরে চলেছেন, দু' পা
ছুটে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস
ুর, আপনার কি ঐ কবিকেই
কোনো ফিকর হলেও চলবে?

তার মানে?—আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেন সাংবাদিক।

মানে আর কিছুই নয় বাবুজী। কবি ফিকর নাদভিকে আমি জানি না, কিন্তু আরেক ফিকরকে আমি চিনি। সে বেল-ওয়ালা ফিকর। ডেকে দেবো সেই বেল-ওয়ালাকে (গোরুর গাড়ির চালক)?

রহস্য বেশ ঘনীভূত হয়ে ওঠে। সাংবাদিক এক সেকেন্ড কি ভেবে মালীকে বলেন, নিয়ে এসো তো তোমার বেল-ওয়ালা ফিকরকে। দেখা যাক সে আমার সেই কবি কিনা।

মালী এবার বেশ উৎসাহিত হয়ে ওঠে। যদি ঠিক ঠিক লোককে সে এনে হাজির করতে পারে, তা' হলে নিশ্চয়ই সে কিছু বখ্‌শিস পাবে সাহেবের কাছে। সেটাই তার উৎসাহের কারণ।

উৎসাহে গদ গদ হয়েই মালী শোঁ করে পার্কের একটা কোণের দিকে ছুটে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

যা হোক একটা খবর নিয়ে ফিরবে তো মালী? না কি একেবারেই চম্পট!—একটা বেঞ্চিতে গা এলিয়ে দিয়ে সাংবাদিক যখন এমনি একটা অনিশ্চয়তায় দোলা খাচ্ছিলেন ঠিক তখনই দেখতে পেলেন, দূর থেকে মালী একজনকে নিয়ে আসছে সঙ্গে সঙ্গে।

নিশ্চয়ই তা' হলে ঐ লোকটিই বেল-ওয়ালা ফিকর। সে জন্যেই অমন হন্তদন্ত হয়ে ছুটছে সে। হয়তো ভয় ঢুকেছে মনে, কে আবার এলো, কে তার খোঁজ করছে ভেবে।

হ্যাঁ, ঠিকই। এই তো বেল-ওয়ালা। ঐ যে তার হাতে 'বেল' পেটানোর চাবুক অর্থাৎ ষাড় বা গোরু পেটানোর লগুড়।

সাংবাদিকের সামনে এসে সেলাম ঠুকেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো বেল-ওয়ালা, আমায় ডাকছিলেন বাবুজী?

কেন?—কথার স্বর তার ভয় জড়ানো।

তেমন কিছু নয়, শুধু জানতে চাইছিলাম তুমি কি কবি?

না, না, সাহেব, গরীব মানুষ আমি। গোরুর গাড়ি চালাই, তাতে যে সামান্য আয় হয়, তা দিয়েই অতি কষ্টে সংসার চলে।

কে কে আছে তোমার সংসারে?

বৌ আছে, ছেলে-মেয়ে আছে।—খুবই লজ্জানত মুখে জবাব দেয় বেল-ওয়ালা।

শুধু গোরুর গাড়ি চালিয়ে এতো জনের খোরাক জোটাতে হয় তোমাকে? সত্যি তুমি কবি নও? অন্য আর কিছুই করো না তুমি গোরুর গাড়ি চালানো ছাড়া?

এবারের প্রশ্নে কবি-কণ্ঠ যেন মুক্ত হয়ে উঠলো। আর আত্মগোপন করা বুঝি সম্ভব হলো না। বেল-ওয়ালার জবাবে কবিতার পাঁপড়ি যেন ঝরে পড়তে লাগলো, গানের এক একটি কলি যেন ঝঙ্কৃত হতে থাকলো তাতে।

বেল-ওয়ালা বললে, বাবুজী, কবি হওয়া কি বড়ো সহজ কথা? জীবনকে জানতে হবে, তবে তো জীবনের গান গাওয়া সম্ভব হবে। ও খুব কঠিন কাজ। ঝটমুট ও চেষ্টা আমি করতে যাবো কেন?

সাংবাদিকের মনে সন্দেহ এবার দানা বেধে উঠলো। এমন সুন্দরভাবে সাজিয়ে তত্ত্ব কথা যে বলতে পারে সে কবি না হয়ে যায় না। তাই একরকম নিশ্চিত হয়েই তিনি প্রশ্ন করেন, তোমার নাম কি ফিকর নাদভি নয়?

হ্যাঁ হুজুর, একদিন ছিল যখন লোকে আমাকে ঐ নামেই ডাকতো। কিন্তু আজ আমি বেল-ওয়ালে ফিকর!—বলতে বলতে অশ্রুসজল হয়ে উঠলো ওর চোখ দুটি আর সাংবাদিকও কয়েকটি মুহূর্ত ধরে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন ওর সেই চোখের দিকে।

কবিতার হীরক-দ্যুতি জ্বলছে সেই চোখে! দৃষ্টিতে গানের ছন্দের খেলা চলেছে!

আর নীরব থাকতে পারলেন না সাংবাদিক। তিনি যে আবিষ্কার করেছেন কবিকে! কবির কাছে কবিতা তাঁর চাই-ই। জীবিকার জন্যে জীবনের গান স্তব্ধ হয়ে যাবে, তা' কখনো হয় না। বেল-ওয়ালা ফিকর গোবুর গাড়ি করে বাগানের খাদ বয়ে বেড়ালেও কবি ফিকর নাদভি তাতে ফুরিয়ে যেতে পারে না। কবি কখনো মরে না।

নীরবতা ভেঙে সাংবাদিক তাই চাইলেন, আমার যে কবিতা চাই ভাই!—হাত পাতলেন কবির সামনে।

কবিতা?

হ্যাঁ, কবিতা।

আরেকদিন আসুন তা' হলে।—একটু যেন সপ্রতিভ হয়ে উঠলেন ফিকর। মাটির দিকে তাকিয়ে থাকলেন মাথা নিচু করে।

কিন্তু আজই নয় কেন?—সাংবাদিক নাছোড়বান্দা। কবিতা তাঁর চাই-ই কবির কাছে।

অপ্রস্তুত কবি তখন অনুনয় করে বললেন, অজস্র ছেঁড়া টুকরো কাগজে জমা হয়ে আছে আমার অসংখ্য কবিতা, সে সব আমার জীবনেরই এক একটি গানের কলি। আরেকদিন আসবেন। আমি সব গুছিয়ে রাখবো। গান গেয়ে গেয়ে শোনাবো আপনাকে আমার সেই সব কবিতা। তার মধ্যে যে কয়টি আপনার ইচ্ছে আপনি বেছে নিয়ে যাবেন!

এর পর আর কিছু বলার থাকে না সাংবাদিকের। আবিষ্কারের আনন্দে তিনি

তখন অধীর। পেয়েছি, পেয়েছি' বলে দাঁড়িয়ে বিদায় নেন তিনি কবির কাছ থেকে।

'বলে যান, কালই আসছি কিন্তু। কিছু বখ্‌শিস দিয়ে যান মালীর হাতে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামছিল তখন রোশনারা পার্কে। কবি ফিকর নাদভির এক ঝলক হাসিতে আলোকিত হয়ে ওঠে সাংবাদিকের পথ।

পরদিন থেকেই এই তরুণ কবির কবিতার কি চাহিদা!

আরো কিছুকাল পরের কথা।

এক শাহান শা'র আগমনে রাজধানী দিল্লী তখন মুখর। সৌদি আরবের রাজা সৌদ এসেছেন ভারত সফরে।

সম্বর্ধনা ও ভাষণ, প্রতিভাষণ তো বটেই, তাঁর অনেক খাস-খেয়ালী এবং দান-খয়রাৎ-এর কাহিনীও খবরের কাগজের পাতায় পাতায় তখন প্রকাশিত হয়ে চলেছে। এদেশের মানুষের মধ্যে তা নিয়ে ভারি পুলক। গভীর আনন্দ।

'জীবন সুরা শূন্য হবার আগে
পাত্রখানি নাও ভরে নাও নিবিড়
অনুরাগে।'

অমর কবি ওমর খৈয়ামের একথা পৃথিবীর আরো বহু কবি-দার্শনিকেরই মনের কথা। জীবনের স্পন্দনকে গানের কলির মতোই অনুভব করতে চায়, উপ-ভোগ করতে চায় অসংখ্য মানুষ।

দু' দিন বইতো নয়, যতোটা পারো স্ফূর্তি লুটে নাও! এই ওমর খৈয়ামী জীবন-দর্শনে যারা বিশ্বাসী, জীবনের অনিশ্চয়তায় চিন্তিত হয়ে পড়ে যারা মনে করেন জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা তাঁদের মধ্যে অন্যতম সেরা হলেন রাজা সৌদ।

দু' পাশে বেগম-বাঁদী বাহিনী, আর মুঠোয় মুঠোয় মোহর নিয়ে যাঁর কারবার রূপকথার নায়ক বলে তাঁকে মনে হওয়া স্বাভাবিক। বাস্তবিক পক্ষে রাজা সৌদের অনেক কার্যকলাপ রূপকথার কাহিনীর সঙ্গেই তুলনীয়।

রাজা সৌদকে তাই রূপকথার রাজা বলে মনে হওয়াও অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নয়।

কল্পনা রাজ্যের রাজা এক এক জন কবি। ফিকর নাদভিও তাই। সেজন্যেই তাঁরও বোধহয় সখ হলো একবার রাজা সৌদকে তাঁর কবিতা শুনিয়ে দিতে।

'পান করে নাও প্রাণ ভরে হে রাজা,
যে ক'টা দিন এই জগতে জীবন
আছে তাজা।'

এতো সুখ-স্বপ্নময় জীবনের কথা। জীবনের যে আরেকটা দিকও আছে। দুঃখ-জর্জর সেই জীবনের গানও তো শোনা দরকার। শাহান শা বাদশা রাজা সৌদকে ফিকর নাদভি তেমনি একটি গান শোনাবেনই। জীবনের আরেক দিকের গান।

সুখ-দুঃখ যে জীবনের এপিঠ-ওপিঠ। শুধু সুখেই যার কাল কেটে যায় তার তো সম্পূর্ণ জীবনকে জানা হয় না।

'দুঃখেরই আরেক নাম সুখ বলি তারে—
সেই সুখ আর দুঃখ লয়ে
মানুষের মেলা বসে পৃথিবীর
কিনারে কিনারে...'

মরমী কবির হাতে সেই মেলার সকল শ্রেণীর মানুষের জীবনানুভূতিই তো ফুটে উঠবে।

রাজা সৌদের সঙ্গে ফিকর নাদভির মোলাকাৎ হলো।

সুখী জীবনের রাজাকে আরেক জীবনের গান শোনালেন কবি। গানের একটি কলি শুনেই রাজা মুগ্ধ হলেন, বিস্মিত হলেন।

কবিতাটি হাত বাড়িয়ে চেয়ে নিলেন রাজা। তারপর নিজের কুর্তার পকেট থেকে একগুচ্ছ নোট তুলে উপহার দিলেন কবিকে।

এ কি এ যে সাতশ টাকা!

হ্যাঁ, জীবন যখন এমনি গানের কলি হয়ে ফুটে ওঠে কবিতায়, তখন প্রত্যেকটি কবিতার দামই কম্‌সে কম সাতশ রুপেয়া!

বৈঠক তখনি শেষ হলো।

নতুন দিন

(২৭২ পৃষ্ঠার পর)

'ওটা আর নেবে কি!' রেখার হাসির মতন এতক্ষণ পর একটা হ 'ওটা আসলে সোনাই নয়, জিনিস। যে লোকটা রিভলবা ধরে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে ছি সে আমার গলায় দেখতেই হাত তারপর তখনি হাতটা সরিয়ে নি ছোঃ ঝুটো মাল, রোলগোল্ডের

'অ্যাঁ!' মুখটা ফ্যাকাশে গোকুলবাবুর চোখের দিকে তাকা বাবু তৎক্ষণাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে গলার হারটা ভাল করে দেখলেন, ঘাড় তুলে গোঁজ হয়ে দাঁড়ালেন। একটা বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠ

'বাসু কী বলল তখন?' ত যেন চিৎকার করে উঠল, 'ও নি শুনেছিল?'

'কিছুই বলল না, ঘাড় গুঁ বেখা আঁচল দিয়ে কপালটা মুছে 'লোকটা টিটকিরি দিয়ে দুবার ব নকল গয়না উপহার দিয়ে বন্ধু সঙ্গে পরিচিত করতে বেরিয়েছেন আপনি।'

কানে আঙুল দেবার মতন করে গোকুলবাবু তৎক্ষণাৎ মুখ নিলেন। বিড়বিড় করে বললেন, জানে, লোকের ঘরের হাঁড়ির ওরা রাখে।'

'তা না হলে আর কি করে অমুক সময় রেখাকে নিয়ে বা সোসাইটি হলে কথক নাচ দেখতে সময় গাড়ি নিয়ে তারা ফিরবে—ত মনে হয়, পাড়ার ভেতর যখন ব্যাপার —ওই রাধুগুণ্ডারই কাজ, বাধু দলের লোকেরা বাসুর গাড়িটা নিয়ে গেল।'

তৎক্ষণাৎ ছেলের দিকে ঘুরে গোকুলবাবু বড় করে একটা ভেংচি 'চোখে যখন দেখিসনি কী করে তুই দোষ দিচ্ছিস, আর হ্যাঁ—' অতর্কিতে চড়িয়ে দিলেন তিনি। 'যদি এ কথা আমি বলব দেশের কাজ করার জন্য এমন লুঠতরাজ করতে হয়, তাদের দরকার পড়ে—ওরা অনেক বেশি স বেশি ধার্মিক —নকল গয়না উপ পরের ঘরের বৌ-ঝির সর্বনাশ ক না ওরা!' দুপদাপ পা ফেলে ছেলের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন। বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলি
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্যঃ তিন টাকা

ছোট পরিবার সুখী পরিবার

• জননী ও শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা

• সুন্দরতর ও সমৃদ্ধতর জীবন

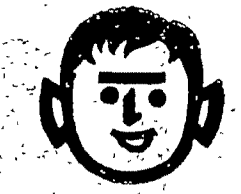

যে কোন নিকটবর্তী পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র
বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিনামূল্যে
চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

• কেন্দ্রীয় ফ্যামিলি প্ল্যানিং ব্যুরো, পশ্চিমবঙ্গ

সে কি! তুমি এখনও ব্যবহার করনি?
কিন্তু [illegible] না হলে আমার রাঁধতে মন চায়

কুকুমা

ওঁড়া মশলা

১৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড
পোস্তা · কলিকাতা-৭
মিল - কাশীপুর